আশ-শিফা

বিতা'রীফি হুকুকিল মুস্তফা

الشفا

بتعريف حقوق المصطفى ﷺ

ইমাম কাযী আয়ায আন্দুলুসী
(রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)
[৪৭৬ হি./১০৮৩ খ্রি. - ৫৪৪ হি./১১৪৯ খ্রি.]

হযরত মোল্লা আলী কারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-
'আমি যখনই 'শিফা' গ্রন্থটি দেখি তখন পবিত্র গুণাবলির অধিকারী সত্তা মহান নবীর সর্বোত্তম গুণকীর্তন দেখতে পাই।'

হযরত আল্লামা আহমদ শিহাব উদ্দিন খাফাজি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-
'সালফে সালেহীনের মতে, 'আশ-শিফা' গ্রন্থের পাঠ রোগের প্রতিষেধক এবং জটিলতার সমাধান। এটা পরীক্ষিত বিষয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতে এটার দ্বারা ডুবে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া এবং মহামারীর মতো ব্যাধি হতে মুক্তি মেলে। সঠিক ও বিশুদ্ধ আস্থা থাকলে মনের আকাঙ্ক্ষাও পূরণ হয়।'

[নাসীমুর রিয়াজ খ--১, পৃ. ৫২]

প্রথিতযশা ইতিহাসবিদ আল্লামা মুস্তাফা বিন আব্দুল্লাহ (যিনি হাজি খলিফা নামে প্রসিদ্ধ) বলেন-
'এটা অনেক উপকারী গ্রন্থ; ইসলামের ইতিহাসে এমন আর কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি। আল্লাহ তা'আলা গ্রন্থকারের প্রচেষ্টার প্রতিদান দান করুক এবং তাঁকে তাঁর করুণা ও অনুকম্পা দ্বারা সিক্ত করুক।'

[কাশফুজ জুনুন, খ--২, পৃ. ১০৫৩]

সনজরী পাবলিকেশন
৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫
৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০
e-mail: sanjarypublication@gmail.com

১ম খণ্ড

আশ-শিফা

বিতা'রীফি হুকুকিল মুস্তফা

الشفا
بتعريف حقوق المصطفى ﷺ

ইমাম কাযী আয়ায আন্দুলুসী
(রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)
[৪৭৬ হি./১০৮৩ খ্রি.-৫৪৪ হি./১১৪৯ খ্রি.]

সনজরী পাবলিকেশন

আশ-শিফা
বিতা'রীফি হুকুকিল মুস্তফা
الشفا
بتعريف حقوق المصطفى ﷺ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلشِّفَاءُ بِتَعْرِيْفِ حُقُوْقِ الْمُصْطَفٰى ﷺ

আশ-শিফা

বিতা'রীফি হুকুকিল মুস্তফা

[মুস্তফা ﷺ'র অধিকার ও মর্যাদা বর্ণনায় হৃদয়ের আরোগ্য]

اَلشِّفَاءُ بِتَعْرِيْفِ حُقُوْقِ الْمُصْطَفٰى ﷺ

আশ-শিফা

বিতা'রীফি হুকুকিল মুস্তফা

[মুস্তফা ﷺ'র অধিকার ও মর্যাদা বর্ণনায় হৃদয়ের আরোগ্য]

[১ম খণ্ড]

মূল
ইমাম কাযী আয়ায আন্দুলুসী
(রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)
[৪৭৬হি./১০৮৩খ্রি.-৫৪৪হি./১১৪৯খ্রি.]

অনুবাদ
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মজিদ

সম্পাদনায়
ড. কামাল উদ্দীন আল-আযহারী

সনুজরী পাবলিকেশন
৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫
৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

আশ-শিফা (১ম খণ্ড)
মূল : ইমাম কাযী আয়ায আন্দুলুসী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)

ভাষান্তর :
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মজিদ

সম্পাদনায় :
ড. কামাল উদ্দীন আল-আযহারী

প্রকাশক :
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী,

প্রকাশকাল :
১০ জানুয়ারি ২০১৭, ১১ রবিউস্ সানি ১৪৩৮, ২৭ পৌষ ১৪২৩ সাল।

প্রকাশনায় :
সন্‌জরী পাবলিকেশন
৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা- ১২০৫, মোবাইল : ০১৮৪২-১৬০১১১
৮১, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১
E-mail : Sanjarypublication@gmail.com
FB Page : Sanjary Publication - সনজরী পাবলিকেশন

পরিবেশনায় : সন্‌জরী বুক ডিপো, চট্টগ্রাম
আবতাহী ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

মূল্য : ৯০০ [নয়শত] টাকা মাত্র।

Ash-Shifa, By: Hazrat Kazi Aiaz Anduluchi Rahamatullahi Alihi, Translate By: Mawlana Mohammad Abdul Mazid, Edited By: Dr. Kamal Uddin Al-Azhari. Published By: Mohammad Abu Tayub Chowdhury. Price: Tk: 900/- USD $ 30.00

بسم الله الرحمن الرحيم

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ
مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ
وَالْفَرِيْقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَّمِنْ عَجَمِ
فَانْسُبْ إِلٰى ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ
وَانْسُبْ إِلٰى قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمِ

﴿صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ﴾

প্রকল্প পরিচালকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিজগতের জান ও প্রাণ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃজন করেছেন। দরূদ-সালাম অবতীর্ণ হোক আমাদের প্রিয় আকা ও মাওলা হাবীবে খোদার প্রতি যিনি বিশ্বজগতের রহমত ও উম্মতের কল্যাণকামী। তাঁর পুতঃপবিত্র পরিবার-পরিজন, সাহাবীদের প্রতি, যাঁরা হিদায়তের আকাশের নক্ষত্রতুল্য, সকল পুণ্যাত্মা আল্লাহর প্রিয়ভাজনদের প্রতিও পরিপূর্ণ রহমত অবতীর্ণ হোক।

ইমাম কাযী আয়ায (৪৭৬হি./১০৮৩খ্রি–৫৪৪হি./১১৪৯খ্রি) ছিলেন হিজরি পঞ্চ শতকের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকীহ্গণের অন্যতম। বিশেষতঃ সীরাতে রাসূলের উপর অনবদ্য গ্রন্থ 'আশ-শিফা'র জন্য ইলম মহলে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। হাদিস ও তাফসীরের ভাষ্যকারগণ যেখানে 'ক্বলাল কাযী' (قَالَ الْقَاضِيْ –কাযী বলেছেন) বলে যে উদ্ধৃতি পেশ করেন সেখানে এক কথায় ইমাম কাযী আয়াযকে বুঝিয়ে থাকেন। সীরাত গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'শিফা' স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবীদার। তিনি এ গ্রন্থে সীরাত ও শ্যামাইল-ই রাসূলকে এক অভিনব পন্থায় উপস্থাপন করার প্রয়াস পান। যা অন্যান্য সীরাতগ্রন্থগুলোতে প্রায় দেখা যায় না। বিশেষতঃ উম্মতের উপর সম্মানিত নবীগণের প্রতি কী কী দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, এ কর্তব্যগুলো পালন ও বিশ্বাস লালন না করলে কী শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি কীরূপ বিশ্বাসের উপর উম্মতের ঈমান-নির্ভরশীল ইত্যাদি বিষয়গুলোর বিস্তারিত বিবরণ এ গ্রন্থে রয়েছে। 'শিফা'র এ অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে উহার রচনাকাল থেকে এ গ্রন্থের উপর বড় বড় মুহাদ্দিসগণ মূল্যবান ভাষ্য রচনা করতে দেখা যায়। যা এ গ্রন্থের মাকবুলিয়াতের বড় দলীল। শুধু তা'নয় এ গ্রন্থটি প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে মাকবুল হয়েছে মর্মে অনেক বর্ণনাও পাওয়া যায়। ফলে গুরুতর রোগ থেকে আরোগ্য লাভ এবং বৈধ মনোবাসনা পূরণের জন্য অনেক আল্লাহর মাকবুল বান্দাগণ এ গ্রন্থের খতমের পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

ইমাম কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মূল্যবান গ্রন্থটি পৃথিবীর অনেক ভাষায় অনুবাদ হলেও বাংলাভাষায় এটি শিফার প্রথম অনুবাদ। মূল গ্রন্থের অনুবাদের শুরুতে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় আলেম-ই দ্বীন পাকিস্তান নিবাসী আল্লামা শরফ কাদেরী লিখিত ইমাম কাযী আয়ায-এর শিফা শরীফের উপর একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা এবং 'মিনহাজুল কুরআন ইন্টারন্যাশনাল'-এর প্রতিষ্ঠাতা শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী রচিত শিফা শরীফের উপর একটি মনোজ্ঞ আলোচনা (মা'রিফুশ্

শিফা' (مَعَارِفُ الشِّفَاء)'র অনুবাদ আমরা সংযোজন করেছি। উক্ত দু'টি রচনায় শিফা শরীফের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে অতি চমৎকার ভাষায়। আমরা এ দু'জন মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'সনৃজরী পাবলিকেশন' বিজ্ঞ অনুবাদ ও সম্পাদকের মাধ্যমে গ্রন্থটির অনুবাদ ও প্রকাশের দায়িত্ব পালন করে বাংলাভাষীদের পক্ষ থেকে ফরযে কিফায়ার দায়িত্ব পালন করেছে বলে আমার বিশ্বাস। এ জন্য আমি সকলের পক্ষ থেকে এ প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী জনাব আবু তৈয়ব চৌধুরীর শুকরিয়া আদায় করছি। বিশেষ করে বিজ্ঞ অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মজিদ ও সম্পাদক ড. কামাল উদ্দীন আযহারী, অঙ্গসজ্জায় মীর মুহাম্মদ খাইরুল্লাহ ও মুহাম্মদ রুবাইয়াত বিন মূসার শুকরিয়া আদায় করছি, যাদের দিনরাত পরিশ্রমে এ গ্রন্থটি আমরা প্রকাশ করতে পেরেছি। আল্লাহ তা'আলা সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমিন!

অনুবাদ ও প্রুফ নির্ভুল করার জন্য আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। তারপরও কোন-প্রকার ভুল-ত্রুটি কারো দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানিয়ে ধন্য করবেন। পরবর্তী সংস্করণে আমরা সংশোধন করার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসিলায় আমাদের এ প্রয়াস কবুল করুন। আমীন!

মাওলানা মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন
প্রকল্প পরিচালক
সনৃজরী পাবলিকেশন, বাংলাদেশ

সূচীপত্র

মূল গ্রন্থের সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

اَلْبَابُ الثَّالِثُ

ত্রিশতম পরিচ্ছেদ

خَاتِمَةٌ وَتَذْيِيْلٌ

পরিশিষ্ট/ ৭৪৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইমাম কাযী আয়ায ও তাঁর শিফা শরীফ : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে প্রশংসা-স্তুতি এবং ভালোবাসা ও সম্প্রীতির পুষ্পমাল্য অর্পণের ইতিহাস সৃষ্টিজগতের দীর্ঘতার মতো প্রলম্বিত ও বিস্তৃত। প্রশংসা ও স্তুতির যেরূপ মাল্যগ্রথন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের করা হয়েছে, সৃষ্টিজগতের অন্য কারো জন্য এটুকু করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে গোটা মানবজগতের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাপ্রদর্শন ঈমান এবং ঈমানের ভূষণ। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

اللہ کی سر تا بقدم شان ہیں یہ • ان سا نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ

قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں • ایمان یہ کہتا ہے مری جان ہیں یہ

এটা আল্লাহর আপাদমস্তক মর্যাদার নিরূপণ।
তিনি সাধারণের মতো মানুষ নন।
কুরআনের ভাষায় তিনি ঈমান;
ঈমান বলে, তিনি তো মোর প্রাণ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা-স্তুতি ও মর্যাদা-কীর্তনকারীদের মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছেন আল্লামা কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, যার গোটাজীবন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনের সেবায় এবং তাঁর গুণকীর্তনে অতিবাহিত হয়। নিঃসন্দেহে তাঁর জ্ঞান ও মর্যাদা শতশত বার প্রশংসার্হ এবং তাঁর বরকতময় জীবন শত-সহস্র বাগিচার মতো।

জন্ম ও বংশধারা

হাদিসের হাফিজ ইমাম আল্লামা কাযী আবুল ফযল আয়ায বিন আমর বিন ইয়াহসাবি[১] ৪৭৬[২] হিজরি (মোতাবেক ১০৮৩ খ্রি.)-এ 'সাবতাহ'[১] নামক

---

১. এটা হিমিয়ার-এর একটি গোত্রের নাম।

২. • হযরত শাহ আবদুল আযীয় মুহাদ্দিস দেহলভী রহমতুল্লাহি আলাইহি বুস্তানুল মুহাদ্দিসীনের ৩৪৬ পৃষ্ঠায় তাঁর জন্মসন ৪৪৬ লিখেছেন।
• ইমাম নববী তাহযীবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাতু-এর ৪৪ পৃষ্ঠায় ৪৯৬ হিজরীর শাবান মাসের মধ্যভাগে বলে উল্লেখ করেছেন।
• মোল্লা আলী ক্বারী রহমতুল্লাহি আলাইহি শরহুস শিফাতে এবং আল্লামা খফফাজি নাসিমুর রিয়াযে তাঁর জন্মসন ৪৭৬ লিখেছেন।

এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পূর্বপুরুষ স্পেনের অধিবাসী ছিল। তাঁর দাদা প্রথমে মরক্কোর 'ফেজ' নগরীতে স্থানান্তরিত হন। পরবর্তীতে 'সাবতায়' বসবাস করতে শুরু করেন।[২]

জ্ঞানার্জন

হযরত আল্লামা কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রথম দিকে ৩২ বছর বয়সে হাফেজে হাদিস কাযী আবু আলী গাস্সানি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে জ্ঞানার্জন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তিনি স্পেনে চলে যান। সেখানে বড় বড় মনীষীর সান্নিধ্য লাভ করে জ্ঞানার্জন করেন। তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে রয়েছেন–

১. মুহাম্মদ বিন হামদাইন আবু আলী বিন সাকরাহ।
২. আবুল হুসাইন সিরাজ।
৩. আবু মুহাম্মদ বিন ওসমান।
৪. হিশাম বিন আহমদ।
৫. আবু বাহর বিন আল-আস প্রমূখ উল্লেখযোগ্য।

ফিক্হশাস্ত্রে আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ঈসা তামিমী ও কাযী আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল-মুসবিলের কাছে উপকৃত হন।[৩]

আল্লামা যাহাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে আবু মুহাম্মদ বিন ইতাবের নাম উল্লেখ করেন।[৪]

হযরত শাহ আব্দুল আযীয রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে ইবনে আরশাদ ও ইবনুল হাজ্জ এর নামোল্লেখ করেন।[৫]

মুহাম্মদ ফরিদ ওয়াজদি লিখেন, আবুল কাসেম বিন বিশকাওয়াল 'কিতাবুস-সিলাহ' নাম গ্রন্থে লিখেছেন, "কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে স্পেন গমন করেন। অতঃপর তিনি কর্ডোভার এক প্রথিতযশা আলিমের কাছে শিক্ষা লাভ করেন; সেখানে তিনি হাদিসের বিশাল এক ভাণ্ডার সংকলন করেন। হাদিসের প্রতি তার অত্যাধিক ঝোঁক ছিল। তাই তিনি হাদিস

[১]. স্পেন ও মরক্কোর সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত একটি নগরী।
[২]. শামসুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ আয্-যাহাবী : তাযকিরাতুল হুফফাজ, ৪/৯৬।
[৩]. যাহাবী : তাযকিরাতুল হুফফাজ, ৪/৯৬।
[৪]. প্রাগুক্ত।
[৫]. আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী : বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, পৃ. ৩৪৬।

সংকলন করার প্রতি খুব গুরুত্ব দিতেন। জ্ঞানের জগতে তিনি পূর্ণতা ও নিশ্চয়তার স্তরে উপনীত হয়েছিলেন। উচ্চস্তরের মেধা, তীক্ষ্মতা, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। ফিক্হ-এর ক্ষেত্রে তিনি ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।[১]

আল্লামা যাহাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, কাযী আয়ায বিন মূসা বিন আয়ায (আবুল ফযল আল-ইয়হসাবি) সাবতার অধিবাসী, মালেকী মাযহাব অবলম্বনকারী, হাদিসের হাফিজ ও অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।[২]

বিচারকের দায়িত্ব

কিছুকাল তিনি সাবতায় এবং পরে গ্রানাডার বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন।[৩] তাঁর শিষ্য ইবনে বিশকাওয়াল বর্ণনা করেন, তিনি যখন কর্ডোবায় আগমন করেন, তখন আমরা তার কাছে শিক্ষার্জন করি। ফিক্হ-বিশারদ মুহাম্মদ বিন হামাদাহ সাবতি বলেন, হযরত কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ২৮ বছর বয়সে বিতর্কে অংশ নেন; ৩৫ বছর বয়সে বিচারকের আসনে অধিষ্ঠিত হন।[৪]

শিক্ষার্থীগণ

হযরত কাযী আয়াযের কাছে অগণিত শিক্ষার্থী বিদ্যার্জন করেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নরূপ–

১. আব্দুল্লাহ বিন আহমদ আল-উসায়রী।
২. আবু জা'ফর বিন আল-কাসির আল-গুরনাতি।
৩. আবুল কাসেম খালাফ বিন বিশকাওয়াল।[৫]
৪. হাফেজুল হাদিস, ফকিহ আবু মুহাম্মদ আল-আশিরি।
৫. আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আল-মাগরিবি।[৬]
৬. আবু বাকার আব্দুল্লাহ বিন তালহা বিন আহমদ বিন আতিয়্যাহ আল-মুহারিবি আল-গুরনাতি আল-মালিকি।[৭]

[১]. মুহাম্মদ ফরীদ ওয়াজদী : দায়েরায়ে মা'রিফুল কুরআন, ৬/৭৯৪, বৈরুত থেকে মুদ্রিত।
[২]. যাহাবী : আল ইবার, ৪/১২২।
[৩]. প্রাগুক্ত।
[৪]. যাহাবী : তাযকিরাতুল হুফফাজ, ৪/৯৭।
[৫]. প্রাগুক্ত : ৪/ ৯৮।
[৬]. যাহাবী : আল ইবার, ৪/১৭৫।
[৭]. প্রাগুক্ত : ৪/৩০৩।

কাব্য ও কবিত্ব

হযরত শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলবি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যেহেতু হযরত কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইলমে হাদিস, ফিক্হ, নাহু, আরবি সাহিত্য, আরবের ইতিহাস ও বংশ পরিক্রমায় পারদর্শী ছিলেন, সেহেতু তিনি মনোমুগ্ধকর ও চিত্তাকর্ষক কবিতা লিখতেন।[১] নিচে তার কবিতার কিছু অংশ তুলে ধরা হলো, যা তিনি কর্ডোবা হতে প্রত্যাবর্তনের সময় বলেছিলেন–

أَقُوْلُ وَقَدْ جَدَّ ارْتِحَالِيْ وَغَرَّدَتْ ... حُدَاتِيْ وَزُمَّتْ لِلْفِرَاقِ رَكَائِبِيْ

وَقَدْ عَمِشَتْ مِنْ كَثْرَةِ الدَّمْعِ مُقْلَتِيْ ... وَصَارَتْ هَوَاءً مِنْ فُؤَادِيْ تَرَائِبِيْ

رَعَى اللهُ جِيْرَانًا بِقَرْطَبَةَ الْعُلَى ... وَسَقَّى رُبَاهَا بِالْعِهَادِ السَّوَاكِبِ

غَدَوْتُ بِهِمْ مِنْ بِرِّهِمْ وَاحْتِفَائِهِمْ ... كَأَنِّيْ فِيْ أَهْلِ وَبَيْنَ أَقَارِبِ

কাব্যানুবাদ

নির্ণীত নিশ্চিত প্রস্থানকালে নির্গত এই পঙ্‌ক্তিমালা
বাঁশরি সুর বেজে ওঠে, প্রস্তুত বিদায়ের বাহন।
অক্ষিপট রুদ্ধ আমার অবিরাম ক্রন্দনের কারণে
বিষাদে বিরান চিত্ত আমার সুহৃদের অধৈর্য্য-বিহনে।
আল্লাহর অনুকম্পা হোক তাদের তরে
সিক্ত হোক সে ধরা তার অনন্ত বর্ষণে।
তাদের প্রীতি-হৃদ্যতায় খুঁজে পাই আমি
আমার কাল কাটে আপন বন্ধু সদনে।[২]

এক সময় হযরত কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এক বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন সেখানে দুলছিল বাগিচার রক্তিম প্রস্ফুটিত পত্রদল। সে সময় তিনি কবিতার কিছু চরণ বলেন–

أُنْظُرْ إِلَى الزَّرْعِ وَقَامَاتِهِ ... تَحْكِيْ وَقَدْ مَاسَتْ أَمَامَ الرِّيَاحْ

كَتِيْبَةٌ خَضْرَاءَ مَهْزُوْمَةٌ ... شَقَائِقُ النُّعْمَانِ فِيْهَا جِرَاحْ

---

[১]. আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী : বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, পৃ. ৩৪৬।
[২]. আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী : বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, পৃ. ৩৪৭।

কাব্যানুবাদ

লক্ষ্য করো ক্ষেতের শরীর
পুষ্পিত কাননের আবির;
বাতাসের চোটে হরিৎ সেনার
যেন পরাজিত পলায়ন।

গ্রন্থসমূহ

ফকীহ মুহাম্মদ বিন হামাদাহ সাবতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সময়কালে তাঁর মতো এতো বিপুল গ্রন্থের সংকলক আর কেউ ছিল না। তিনি নিজের নগরে এতোই সম্মানের অধিকারী ছিলেন, যা আর কারো ছিল না। তাঁর সেই জ্ঞান ও প্রজ্ঞা তাঁকে আরো অধিক মাত্রায় বিনয়ী করে তোলে।[১]

ইবনে খাল্লিকান বলেন, কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদিস ও হাদিস শাস্ত্র, নাহু ও অভিধান-বিজ্ঞান, আরবি ভাষা এবং আরবের ইতিহাস ও বংশধারা সংক্রান্ত জ্ঞানে সমসাময়িক কালের ইমাম ছিলেন।[২]

তাঁর প্রণীত গ্রন্থসমূহের তালিকা নিচে প্রদান করা হলো–

০১. আশ-শিফা বিতা'রীফি হুকুকিল মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম;
(اَلشِّفَا بِتَعْرِيْفِ حُقُوْقِ الْمُصْطَفَىْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)।[৩]

০২. তারতীবুল মাদারিক ওয়া তাকরিবীল মাসালিক ফি যিকরি ফুকাহায়ি মাযহাবি মালিক;
(تَرْتِيْبُ الْمَدَارِكِ وَتَقْرِيْبِ الْمَسَالِكِ فِيْ ذِكْرِ فُقَهَاءِ مَذْهَبِ مَالِكٍ)।

০৩. 'আল-আকীদা' (العَقِيْدَةُ) (আকিদা সংক্রান্ত গ্রন্থ);

০৪. 'শরহে হাদিসে উম্মে জারা' (شَرْحُ حَدِيْثِ أُمِّ زَرْعٍ)।

হযরত শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই পুস্তকের নাম 'আর-রা'য়িদ লিমা তাদ্বামানাহু হাদিসী উম্মে যারয়ি

---

[১]. যাহাবী : তাযকিরাতুল হুফফাজ, ৪/৯৭।
[২]. ইবনে খাল্লিকান : ওফায়াতুল আ'ইয়ান ৩/৪৮৩, দারুস সাকাফা বৈরুত থেকে মুদ্রিত।
[৩]. ● আল্লামা যাহাবী তাঁর তাযকিরাতুল হুফফাজে এর নাম 'আশ শিফা ফি শারফিল মুস্তাফা' উল্লেখ করেছেন।
● হাজী খলিফা কাশফুজ জুনূনের দ্বিতীয় খণ্ডের ১০৫২ পৃষ্ঠায় 'আশ শিফা ফি তা'রীফি হুকূকিল মুস্তাফা' উল্লেখ করেছেন।

মিনাল ফাওয়ায়িদি বাগিয়্যাহ' (الرَّائِدِ لِمَا تَضَمَّنَهُ حَدِيثُ أُمِّ زَرْعٍ مِنْ بَغِيَّةٍ) (الْفَوَائِدِ) বলে উল্লেখ করেন।

০৫. 'জামেউত তারীখ' (جَامِعُ التَّارِيْخِ)।

এই পুস্তকে স্পেন ও পাশ্চাত্যের নৃপতিদের ইতিহাস রয়েছে, যেখানে সাবতার ইতিহাস এবং সেখানকার আলিমদের কথাও পাওয়া যায়।

০৬. 'মাশারিকুল আনওয়ার ফী ইকতিফায়ি সহীহিল আসার' (مَشَارِقُ الْأَنْوَارِ فِيْ اِقْتِفَاءِ صَحِيْحِ الْآثَارِ);

এটা মুআত্তায়ে ইমাম মালেক, বুখারি শরিফ ও মুসলিম শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থের সমার্থক।

০৭. 'ইকমালুল মুয়াল্লিম ফী শরহি মুসলিম' (إِكْمَالُ الْمُعْلَمِ فِيْ شَرْحِ مُسْلِمٍ);

এটা ইমাম আবু আব্দুল্ল হ মুহাম্মদ বিন আলী আল-মা-জরি (ওফাত– ৫৩৬হি.) কর্তৃক প্রণীত মুসলিম শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আল মুয়াল্লিম বি ফাওয়ায়িদি কিতাবি মুসলিম' (اَلْمُعْلَمِ بِفَوَائِدِ كِتَابِ مُسْلِمٍ)'র পরিপূরক।

০৮. 'আত্-তানবীহাতুল মুসতানবিতাহ ফী শরহি মুশকিলাতিল মুদাভ্ভিনা ওয়াল মুখতালিতা' (اَلتَّنْبِيهَاتُ الْمُسْتَنْبِطَةُ فِيْ شَرْحِ مُشْكِلَاتِ الْمُدَوَّنَةِ وَالْمُخْتَلِطَةِ);

এটা হাদিস-শাস্ত্রে প্রণীত। এখানে ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান বিন আল-কাসিম (৯১হি.) কর্তৃক রচিত 'আল মাদুনাহ ফী ফুরূয়িল মালেকিয়া' (اَلْمُدَوَّنَةُ فِيْ فُرُوْعِ الْمَالِكِيَّةِ); গ্রন্থের কিছু কিছু বিষয়ে আপত্তিও রয়েছে।[১]

এই গ্রন্থ 'তানবীহাত' (تَنْبِيْهَاتٌ) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। হযরত শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দেসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এই শাস্ত্রে এটার মতো আর কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি।[২]

---

১. হাজী খলিফা : কাশফুজ জুনুন, ২/১৬৪৪।
২. আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী : বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, পৃ. ৩৪৫।

০৯. 'আল-ই'লাম বিহুদূদি কাওয়ায়িদিল ইসলাম' (اَلْإِعْلَامُ بِحُدُوْدِ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ);

১০. 'আল্-গুনিয়াহ' (اَلْغُنْيَةُ); নিজের শায়খ ও শিক্ষাগুরুদের আলোচনা সংবলিত।

১১. 'আল ইলমা'উ ফি যবতির রিওয়ায়াতি ওয়াতাকায়্যিদুস সিমা'ই' (اَلْإِلْمَاعُ فِيْ ضَبْطِ الرِّوَايَةِ وَتَقْيِيْدُ السَّمَاعِ)।

১২. 'আল মু'জাম ফি শরহি ইবনি সাকরা' (اَلْمُعْجَمُ فِيْ شَرْحِ اِبْنِ سُكْرَةِ);

হযরত শায়খ আবু আলী আল-হুসাইন বিন মুহাম্মদ আস-সারকাসতি আল-আন্দালুসি আস-সাদাফি (ওফাত– ৫১৪হি.) এবং তাঁর শায়খগণের আলোচনা সংবলিত পুস্তক।[১]

১৩. 'নিজামুল বুরহান আলা সুবহাতি জাযমিল আযান' (نَظْمُ الْبُرْهَانِ عَلَى صُبْحَةِ جَزْمِ الْأَذَانِ);

১৪. 'মাকাসিদুল হাসসান ফী মা ইয়ালযিমুল ইনসান' (مَقَاصِدُ الْحَسَّانِ فِيْ مَا يَلْزَمُ الْإِنْسَانَ);

১৫. 'গুনিয়াতুল কাতিব ওয়া বুগিয়াতুত তালিব' (غُنْيَةُ الْكَاتِبِ وَبُغْيَةُ الطَّالِبِ);[২]

১৬. 'আল উয়ূনুস সানাহ ফি আখবারিস সাবতা' (اَلْعُيُوْنُ السِّتَّةُ فِيْ أَخْبَارِ سَبْتَةِ);[৩]

১৭. 'আল আজওয়াবাতুল মুখায়্যারা আনিল আসআলাতিল মুহায়্যারা' (اَلْأَجْوِبَةُ الْمُخَيَّرَةُ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْمُحَيَّرَةِ)।

১৮. 'আখবারুল কারতাবিয়্যিন' (أَخْبَارُ الْقُرْطُبِيِّيْنَ)।

---

১. হাজী খলিফা : কাশফুজ জুনুন ২/১৭৩৬।
২. আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী : বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, পৃ. ৩৪৫।
৩. উমর রেযা কুহহালা : মু'জামুল মুয়াল্লিফীন ৮/১৬ মাকতাবাতুল মুসান্না, বৈরুত।

১৯. 'আস সায়ফুল মাসলূল আলা মান সাব্বা আসহাবার রাসূল'
(اَلسَّيْفُ الْمَسْلُوْلُ عَلَىٰ مَنْ سَبَّ أَصْحَابَ الرَّسُوْلِ)।

২০. 'আস সাফা বি তাজরীরিশ শিফা' (اَلصَّفَا بِتَحْرِيْرِ الشِّفَاءِ)।

২১. 'মাতালিহুল আফহাম ফী শারহিল আহকাম'
(مَطَالِحُ الْأَفْهَامِ فِيْ شَرْحِ الْأَحْكَامِ)।[১]

২২. 'গরীবুশ শিহাব' (غَرِيْبُ الشِّهَابِ)।[২]

ইন্তেকাল

হযরত ইমাম আল্লামা কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সমগ্র জীবন দ্বীন ও হাদিসে রাসূলের খেদমত করে ৫৪৪হিজরিতে (১১৪৯খ্রি.) মরক্কোয় ওফাতলাভ করেন। তাঁর পুত্র আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আয়ায (দায়েনার বিচারক) বর্ণনা করেন, তার ইন্তেকাল ঘটে ৯ জুমাদাল উখরা, জুমার দিন, রাত্রির মধ্যভাগে।[৩] অনেকের মতে এ কথা প্রচলিত আছে যে, এক ইহুদি তাকে বিবপান করান, যার প্রভাবে তাঁর ইন্তেকাল হয়।

শিফা শরীফ : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

আল্লামা ইমাম কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহির যাবতীয় গ্রন্থ বিপুল জ্ঞান ও প্রজ্ঞাবহুল। জ্ঞানীরা সেগুলোকে গুরুত্বসহকারে বরণ করেন এবং তা দ্বারা উপকৃত হন। ইমাম আল্লামা মুহিউদ্দিন বিন শারাফ আন-নববি মুসলিম শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থের প্রায় সর্বত্র তার উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। ইমাম বদরুদ্দিন আইনি রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে 'উমদাতুল কারী'তে এবং হাফেজুল হাদিস আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে 'ফতহুল বারী'তে প্রায়শঃ কাযী আয়াযের ব্যাখ্যা ও টীকা গ্রহণ করতে দেখা গেছে। ব্যাখ্যাকারগণ যেখানে "قَالَ الْقَاضِيْ" বলেন, সেখানে কাযী আয়াযকেই তারা বুঝিয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁর অসংখ্য গ্রন্থাবলির মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে– 'আশ-শিফা বিতা'রীফি হুকুকিল মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'

১. ইসমাঈল পাশা বাগদাদী : হাদীয়াতুল আরেফীন ১/৮০৫, মাকতাবাতুল মুসান্না, বৈরুত।
২. হাজী খলিফা : কাশফুজ জুনূন ২/১২০৭।।
৩. আল্লামা বুরহানুদ্দীন ইবন ফারহুন মালেকী প্রণীত আদ দীবাজুল মাযহাব গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে মুকাদ্দামায়ে শিফা মা'আ হাশিয়ায়ে আল্লামা শামিনী, পৃষ্ঠা- ৭, মাকতাবাতুত তুজ্জারিয়্যাতুল কুবরা, মিসর।

(اَلشِّفَاءُ بِتَعْرِيْفِ حُقُوْقِ الْمُصْطَفٰى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)। বিশেষজ্ঞ হাদিস-বিশারদগণ সেটাকে নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন; এবং পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ সেটাকে সিরাতে নবভীর মহান উৎসের মর্যাদা দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এই গ্রন্থ অন্তরের জ্যোতি এবং ঈমানের দীপ্তি স্বরূপ। এমনটা কেনই বা হবেই না! যেখানে তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণকীর্তন করেছেন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হাদিসের আলোকে।

রাসূলে পাকের দরবারে 'শিফা শরীফ'র গ্রহণযোগ্যতা

কোনো গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতার জন্য এর চেয়ে বড় সাক্ষী আর কী হতে পারে যে, সেটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে গ্রহণযোগ্য হয়! 'শিফা'র সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, একদিন তাঁর ভাতিজা স্বপ্নে দেখেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তিনি এক স্বর্ণাসনে বসে আছেন। এই দৃশ্য দেখে তিনি ভীত হয়ে পড়েন। হযরত কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর এই অবস্থা উপলব্ধি করে তাঁকে অভয় দিতে গিয়ে বলেন, "হে ভাতিজা! আমার কিতাব 'শিফা'কে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরো এবং এটাকে তুমি পথপ্রদর্শক হিসেবে নাও।" এ কথায় তিনি এই ইঙ্গিত দেয়ার চেষ্টা করেন যে, আমার এই মর্যাদা ও আসন এই গ্রন্থের কারণেই অর্জিত হয়েছে।[১]

ওলামায়ে কেরাম গদ্য ও কবিতায় এ গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। প্রথিতযশা ইতিহাসবিদ আল্লামা মুস্তাফা বিন আব্দুল্লাহ (যিনি হাজি খলিফা নামে প্রসিদ্ধ) বলেন, এটা অনেক উপকারী গ্রন্থ; ইসলামের ইতিহাসে এমন আর কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি। আল্লাহ তা'আলা গ্রন্থকারের প্রচেষ্টার প্রতিদান দান করুক এবং তাঁকে তাঁর করুণা ও অনুকম্পা দ্বারা সিক্ত করুক।[২]

লিসানুদ্দিন খতিব তিলমাসানি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

شِفَاءُ عِيَاضٍ لِلصُّدُوْرِ شِفَاءُ ‏ ‏ وَلَيْسَ لِلْفَضْلِ قَدْ حَوَاهُ خَفَاءُ

هَدِيَّةُ بِرٍّ لَمْ يَكُنْ لِجَزِيْلِهَا ‏ ‏ سِوَى الْأَجْرِ وَالذِّكْرِ الْجَمِيْلِ كِفَاءُ

وَفِيْ لِنَبِيٍّ حَقٌّ وَفَائِهِ ‏ ‏ وَأَكْرَمُ أَوْصَافِ الْكِرَامِ وَفَاءُ

১. যাহাবী : তাযকিরাতুল হুফফাজ, ৪/৯৮।
২. হাজী খলিফা : কাশফুজ জুনূন ২/১০৫৩।

وَجَاءَ بِهِ بَحْرًا يَفُوْقُ لِفَضْلِهِ ... عَلَى الْبَحْرِ طَعْمٌ طَيِّبٌ وَّصَفَاءُ

وَحَقُّ رَسُوْلِ اللهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ ... رَعَاهُ وَاِغْفَالُ الْحُقُوْقِ جَفَاءُ

هُوَ الْاَثَرُ الْمَحْمُوْدُ لَيْسَ يَنَالُهُ ... دُثُوْرٌ وَلَا يُخْشَى عَلَيْهِ عَفَاءُ

حَرَصْتُ عَلَى الْاِطْنَابِ فِيْ نَشْرِ فَضْلِهِ ... وَتَمْجِيْدِهِ لَوْ سَاعَدَتْنِيْ وَفَاءُ

<u>কাব্যানুবাদ</u>

আয়াযের শিফা চিত্ত তরে আরোগ্যস্বরূপ
যেখানে নেই অস্পষ্টতার কোনো আবরণ।
এটা এমন এক পবিত্র মনীষীর সংকলন
যার তওে শোভনীয় শুধু স্তুতি আর গুণকীর্তন।
নবীর কৃতজ্ঞতা তিনি যথার্থই দেখিয়েছেন;
বিশ্বস্ততার অভিব্যক্তিই তাদের সত্য ভূষণ।
বয়ে দিলো সে এক উত্তাল অনন্ত সমুদ্দুর
ধরাবারিদ যেথা মেনে চলে পরাজয়-বরণ।
রাসূলের শিক্ষা ধারণ করে তিরোধানের পরে;
মহা অত্যাচার হবে সেথা আলস্য-প্রদর্শন।
সে এক অনন্ত স্মারক, লুপ্ত বিনাশের পরশ
নেই আশঙ্কা জীর্ণতার, সে জীবন্ত অনুরণন।
তার প্রতি কৃতজ্ঞতা যদি আমায় সঙ্গ দেয়
তবে অনেক প্রলম্বিত হতো তার বর্ণন।[১]

হযরত আল্লামা আবুল হুসাইন জায়দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

كِتَابُ الشِّفَاءِ شِفَاءُ الْقُلُوْبِ ... قَدِ ائْتَلَقَتْ شَمْسُ بُرْهَانِهِ

اِذَا طَالَعَ الْمَرْءُ مَضْمُوْنَهُ ... رَسَىْ فِي الْهُدَىْ اَصْلُ اِيْمَانِهِ

جَاءَ بِرُوْضِ التُّقَىْ نَاشِقًا ... اَرَئِحُ اَزْهَارِ اَفْنَانِهِ

فَاَكْرِمْ بِهِ ثُمَّ اَكْرِمْ بِهِ ... وَاَعْظِمْ مَدَى الدَّهْرِ مِنْ شَانِهِ

وَنَالَ عُلُوْمًا تُرَقِّيْهِ فِيْ ... ثُرَيَّا السَّمَاءِ وَكَيْوَانِهِ

১. আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী : বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন- পৃ. ৩৪২।

فَلِلّٰهِ دَرُّ اَبِي الْفَضْلِ اِذْ ... جَرَىْ فِي الْوَرَىْ نَيْلُ اِحْسَانِهِ

يُقَرِّرُ قَدْرَ نَبِيِّ الْهُدَىْ ... وَخَيْرِ الْاَنَامِ بِتِبْيَانِهِ

فَجَازَاهُ رَبِّيْ خَيْرَ الْجَزَاءِ ... وَجَادَ عَلَيْهِ بِغُفْرَانِهِ

وَمِنْهُ الصَّلٰوةُ عَلَى الْمُجْتَبٰى ... وَاَصْحَابِهِ ثُمَّ اَعْوَانِهِ

مَدَى الدَّهْرِ لَا يَنْقَضِيْ دَائِمًا ... وَلَا يَنْتَهِيْ طُوْلَ اَزْمَانِهِ

<u>কাব্যানুবাদ</u>

এই শিফা হৃদয়ের জন্য আরোগ্যপ্রদ
যার প্রামাণ্য সূর্য উজ্জ্বল দীপ্তিপ্রদ।
এটার সম্মান করো শ্রদ্ধা করো;
অনন্তকাল তার গুণকীর্তন করো।
যখন কেউ সে পুস্তক অধ্যয়ন করে,
ঈমানের ভিত্তি তার বৃন্তে এসে ঝরে।
সে তাকওয়ার এক অনবদ্য কানন
সতত তার পুষ্পের গন্ধ-বিচরণ।
উপনীত সে প্রজ্ঞার সুউচ্চ গগনে
গ্রহ উপগ্রহ ছায়াপথের বিচরণে।
আয়াযের সে উৎকর্ষ স্রষ্টার নিদর্শন
করুণায় যার সারা মর্তে অবগাহন।
বলে চলে হেদায়তের নবীর সাতকাহন
স্থিত মানবের চূড়ায়, দ্যুতির বিচ্ছুরণ।
আল্লাহর কাছে সে কীর্তির প্রতিদান
পাপের মার্জনা বিষাদের অবসান।
রাসূলের তরে সালাতের বারিধারা
সাহাবি তার আপনজনে মর্তসারা।
যুগান্তর চলে যাবে, তার অন্ত নেই
কালান্তর চলে যাবে, তার সীমা নেই।[১]

১. হাজী খলিফা : কাশফুয যুনূন, ২/১০৫৫।

হযরত মোল্লা আলী কারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

لَمَّا رَأَيْتُ كِتَابَ الشِّفَاءِ فِيْ شَمَائِلِ صَاحِبِ الْاِصْطِفَاءِ

—(যখন) আমি দেখি এই গ্রন্থ, সেই পবিত্র গুণাবলির অধিকারী সত্তার গুণকীর্তন করে।

কোনো কোনো সাহিত্যিকের ভাষায়—

عُوِّضْتُ جَنَّاتِ عَدْنٍ يَا عِيَاضُ عَنِ الشِّفَاءِ الَّذِيْ أَلَّفْتَهُ عِوَضٌ

جَمَعْتَ فِيْهِ أَحَادِيْثًا مُصَحَّحَةً فَهُوَ الشِّفَاءُ لِمَنْ فِيْ قَلْبِهِ مَرَضٌ

<u>কাব্যানুবাদ</u>

হে আয়ায! তোমার তরে জান্নাত হোক
এ গ্রন্থের বিনিময়ে সুখের পসরা হোক।
জড়ো করে বিশুদ্ধ হাদিসের সম্ভার
করেছো রুদ্ধ যেথা রোগের সঞ্চার।[১]

আল্লামা ইউসুফ বিন ইসমাইল নাবহানি বলেন,

وَمِنْهُمْ مَنْ تَوَسَّطَ وَكَانَ مَذْهَبُهُ حُسْنُ الْإِقْتِصَادِ، فَمِنَ الْمُخْتَصِرِيْنَ الْإِمَامُ الْبَارِعُ الْقَاضِيْ عِيَاض وَحَسْبُكَ بِكِتَابِهِ الشِّفَاءِ الَّذِىْ سَارَ فِى الْآفَاقِ، وَوَقَعَ عَلَىٰ قُبُوْلِهِ الْإِتِّفَاقِ.

—সুউচ্চ মাকামের অধিকারী ইমাম কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সংক্ষিপ্তাকারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সিরাতের উপর গ্রন্থ লিখেছেন। সুপ্রসিদ্ধ ও সর্বজন-গৃহীত এই গ্রন্থ পড়ার ক্ষেত্রে তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।

أَجْمَعُ مَا صُنِّفَ فِيْ بَابِهِ مُجْمَلًا مِنَ الْاِسْتِيْفَاءِ لِعَدْمِ اِمْكَانِ الْوُصُوْلِ اِلَىٰ اِنْتِهَاءِ الْاِسْتِقْصَاءِ قَصَدْتُّ اَنْ اَخْدِمَهُ بِشَرْحٍ

—যখন আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চরিতবিবরণী সংক্রান্ত এই গ্রন্থ দেখলাম, যা মোটামুটি সংশ্লিষ্ট বিষয়কে সর্বোতভাবে অন্তর্ভুক্ত করে, তখন আমি এটার ব্যাখ্যা করার মনস্থ করলাম। কারণ

[১]. আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী : বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, পৃ. ৩৪৩-৩৪৪।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণকীর্তন সম্পূর্ণরূপে সম্ভব নয়। তখন আমি এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনার মাধ্যমে খেদমতের ইচ্ছা করি।[১]

হযরত আল্লামা আহমদ শিহাব উদ্দিন খাফাজি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

وَاسْمُهُ مُوَافِقٌ لِمُسَمَّاهُ فَإِنَّ السَّلَفَ الصَّالِحِيْنَ قَالُوْا إِنَّهُ جُرِّبَ قِرَاءَتُهُ لِشِفَاءِ الْأَمْرَاضِ، وَفَكِّ عُقَدِ الشَّدَائِدِ، وَفِيْهِ أَمَانٌ مِنَ الْغَرْقِ وَالْحَرْقِ وَالطَّاعُوْنَ بِبَرَكَةِ الْمُصْطَفَىٰ، وَإِذَا صَحَّ الْإِعْتِقَادُ حَصَّلَ الْمُرَادُ.

—'শিফা'র নামকরণ বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। কারণ সালফে সালেহীনের মতে, এই গ্রন্থের পাঠ রোগের প্রতিষেধক এবং জটিলতার সমাধান। এটা পরীক্ষিত বিষয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতে এটার দ্বারা ডুবে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া এবং মহামারীর মতো ব্যাধি হতে মুক্তি মেলে। সঠিক ও বিশুদ্ধ আস্থা থাকলে মনের আকাঙ্ক্ষাও পূরণ হয়।[২]

<u>'শিফা শরীফ'র উৎস ও সমালোচনা</u>

আল্লামা খাফাজি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, শিফা'র উৎস হচ্ছে 'شِفَاءُ اُبَنْ سَبْعٍ', যার অনুকরণের কারণে কাযী আয়াযের 'শিফা' গ্রন্থেও কিছু কিছু দুর্বল হাদিস ঢুকে গেছে। তবে খুব কম সমালোচক সেগুলোকে 'বানানো' বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'مَنَاهِلُ الصَّفَا فِيْ تَخْرِيْجِ أَحَادِيْثِ الشِّفَاءِ' গ্রন্থে সেসব হাদিসকে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। এমন জায়গায় আমরা এমন কোনো বিষয় ছেড়ে দেইনি, যা পাঠকের প্রয়োজন হতে পারে।[৩]

[১]. আলী ইবনে সুলতান মুহাম্মদ আল কারী : শরহুশ শিফা, (নাসীমুর রিয়াজের টিপ্পনী সমেত) ১/২ বৈরুত।
[২]. আহমদ শিহাব উদ্দীন খাফাজী : নাসীমুর রিয়াজ ১/৫২, বৈরুত।
[৩]. আহমদ শিহাব উদ্দীন খাফাজী : নাসীমুর রিয়াজ ১/৪, বৈরুত।

‘শিফা শরীফ’র বিষয়বস্তু
এই গ্রন্থে চার প্রকারের বিষয় রয়েছে।

প্রথম পর্ব
আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে কথা ও কর্মের মাধ্যমে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উচ্চ মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান।

এই পর্বে ৪টি অধ্যায় রয়েছে।

প্রথম অধ্যায়
আল্লাহর পক্ষ থেকে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণকীর্তন।

এ অধ্যায়ে ২টি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
এ অধ্যায়ে আল্লাহ তা‘আলা হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গঠন অবয়ব ও মহান চরিত্রের চিত্রায়ণ করেছেন।

এ অধ্যায়ে ২৭টি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়
সেসব বিশুদ্ধ হাদিস, যেগুলোতে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুউচ্চ মর্যাদার বিবরণ রয়েছে।

এ অধ্যায়ে ১২টি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়
সেসব নিদর্শন ও মু‘জিযা যা আল্লাহ তা‘আলা হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে বিকশিত করেছেন।

এ অধ্যায়ে ৩০টি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

দ্বিতীয় পর্ব
হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেসব অধিকার বর্ণিত হয়েছে, যা সমস্ত সৃষ্টির করণীয়।

এই পর্বে ৪টি অধ্যায় রয়েছে।

প্রথম অধ্যায়
হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁর আনুগত্যের অপরিহার্যতা প্রসঙ্গে।

এ অধ্যায়ে ৫টি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসা-পোষণ এবং তাঁর প্রতি নিষ্ঠাবান হওয়ার আবশ্যকীয়তা।

এ অধ্যায়ে ৬টি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়
হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অপরিহার্যতা।

এ অধ্যায়ে ৭টি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়
হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণের নির্দেশ প্রসঙ্গে।

এ অধ্যায়ে ২টি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

তৃতীয় ভাগ
ওইসব কর্ম, যা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য জায়িয এবং যা নিষিদ্ধ। এই বিভাগ হচ্ছে গ্রন্থের প্রাণ, যা পূর্ববর্তী দুটি বিভাগের ফলাফল। সে ক্ষেত্রে প্রথম দু‘বিভাগ ভূমিকাস্বরূপ।

এই বিভাগে ২টি অধ্যায় রয়েছে।

প্রথম অধ্যায় ঃ ধর্মীয় বিষয়াবলি।

এখানে ১৬টি পরিচ্ছেদ বিদ্যমান।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ পার্থিব বিষয়াবলি।

এখানে ৯টি পরিচ্ছেদ বিদ্যমান।

চতুর্থ ভাগ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কটাক্ষকারীর বিধান।

এই বিভাগে ৩টি অধ্যায় রয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি গাল-মন্দের শাস্তি বিধান।

এখানে ১০টি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অমার্জিত আচরণের বিধান ও শাস্তি।

তৃতীয় অধ্যায়

আল্লাহ তা'আলা, নবী-রাসূলগণ, ফেরেশতা, আসমানি গ্রন্থসমূহ এবং রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজনের প্রতি গালমন্দকরণের বিধান।

এখানে ৫টি পরিচ্ছেদ রয়েছে।[১]

শিফা শরীফের টীকা ও ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ

'শিফা শরীফ'র গ্রহণযোগ্যতার ধারণা লাভ করার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, গবেষকদের বিশাল একদল এই গ্রন্থের টীকা ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। অসংখ্য অজস্র মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। নিচে 'কাশফুজ জুনূন' এর উদ্ধৃতি দিয়ে কিছু টীকা ও ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম দেওয়া হলো।

(১) শায়খ মুহাম্মদ বিন আহমদ আসনবী শাফি'ঈ (ওফাত– ৭৬৩হি.) 'শিফা'র সংক্ষেপিত সংস্করণ করেছেন।

(২) শায়খ উস্তাদ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন হাসান বিন মাখলুফ আর-রাশেদি (যিনি বাবরকান নামে প্রসিদ্ধ) তিনটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। বড় গ্রন্থ 'اَلْغُنْيَةُ' (২ খণ্ডে), "اَلْغُنْيَةُ الْوُسْطَى' এবং ছোট গ্রন্থ এক এক খণ্ড লিখেছেন।

(৩) হাফেজ আব্দুল্লাহ বিন আহমদ বিন সাঈদ বিন ইয়াহইয়া আজ-জামুরি একটি ব্যাখ্যা লিখেছেন।

[১]. হাজী খলিফা : কাশফুজ জুনূন, ২/১০৫৩।

(৪) আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আলী বিন আবুল শরিফ আল-হাসানি আত-তিলমাসানি সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আল মানহালুল আসফা ফী শরহি মা তামিসাল হাজাতু ইলাইহি মিন আনফাযিশ্ শিফা' (اَلْمَنْهَلُ الْأَصْفَىٰ فِيْ شَرْحِ مَا تَمِسَّ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ مِنْ أَلْفَاظِ الشِّفَاءِ) নামে লিখেছেন। এই গ্রন্থ উপরিউক্ত ২য় ও ৩য় গ্রন্থের আলোকে রচিত, যা ১৪ সফর, ৯১৭ হিজরিতে সমাপ্ত হয়।

(৫) শামসুদ্দিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আদ-দালাজি আশ-শাফেয়ি আল-ওসমানি (ওফাত: ৯৪৭ হি.) 'আল ইসতিফায়ু লি বয়ানি মা'আনিশ্ শিফা' (اَلْاِصْطِفَاءُ لِبَيَانِ مَعَانِيْ الشِّفَاءِ) নামে লিখেছেন, যা ১২ শাওয়াল, ৯৩৫ হিজরিতে সমাপ্ত হয়।

(৬) ইমাম আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ বিন আল-কাহরাশ আশ-শাফেঈ ৮৬২ হিজরিতে একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন।

(৭) ওমর আল-আরাজি চার খণ্ডে একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন।

(৮) আবু জার আহমদ বিন ইবরাহিম আল-খালভী (ওফাত: ৮৮৪হি.) একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। কিন্তু তিনি সেটা সমাপ্ত করে যেতে পারেননি।

(৯) ইমাম আবুল মাহাসিন আব্দুল বাকি আল-ইয়ামানি 'আল ইকতিফা ফী শরহি আলফাজিশ্ শিফা' (اَلْاِكْتِفَاءُ فِيْ شَرْحِ أَلْفَاظِ الشِّفَاءِ) নামে একটি ব্যাখ্যা লিখেছেন।

(১০) আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ুতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'মানাহিলস্ সাফা ফী তাখরিজি আহাদিসিশ্ শিফা' (مَنَاهِلُ الصَّفَاءِ فِيْ تَخْرِيْجِ أَحَادِيْثِ الشِّفَاءِ) নামে লিখেছেন।

(১১) হাফেজ বুরহান উদ্দিন ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-হালাবি (ওফাত: ৮৪১হি.) 'আল মুকতাফা ফী হাল্লি আলফাযিশ্ শিফা' (اَلْمُقْتَفَى فِيْ حَلِّ أَلْفَاظِ الشِّفَاءِ) লিখেছেন।

(১২) আল্লামা তাকিউদ্দিন আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ আশ-শামিনি (ওফাত: ৮৭৩হি.) 'মুযিলুল খুফা আন আলফাযিশ্ শিফা' (مُزِيْلُ الْخَفَاءِ عَنْ أَلْفَاظِ الشِّفَاءِ) নামে টীকা লেখেন, যা ৮৪৭ হিজরিতে সমাপ্ত করে।

(১৩) মুহাম্মদ বিন খলিল বিন আবু বাকার আবু আব্দুল্লাহ আল হালাবি (যিনি আল-কাবাকিবী আল হানাফি নামে প্রসিদ্ধ) 'যুবদাতুল মুক্তাফা ফী তাহরীরি আলফাযিশ্ শুফা' (زُبْدَةُ الْمُقْتَفَى فِيْ تَحْرِيْرِ أَلْفَاظِ الشِّفَاءِ) নামে ৮৪৯ হিজরিতে একটি ব্যাখ্যা লেখেন। ১৩ ও ১২ নং ব্যাখ্যাগ্রন্থ আল্লামা বুরহান হালাবির ব্যাখ্যাগ্রন্থের আলোকে রচিত।

(১৪) আল্লামা শিহাব উদ্দিন আহমদ বিন হুসাইন বিন রাসলান আল-রামালি আশ-শাফেয়ি (ওফাত: ৮৪৪হি.) একটি টীকা লিখেছেন।

(১৫) ইমাদ উদ্দিন আবুল ফিদা ইসমাইল বিন ইবরাহিম বিন জামা'আ আল-কিনানি আল কুদসি (ওফাত: ৮৬১হি.) কতিপয় শব্দের ব্যাখ্যা লিখেছেন।

(১৬) সৈয়দ কুতুব উদ্দিন ঈসা আস-সাফাবি একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। তার গ্রন্থ মূলত সংমিশ্রণমূলক।

(১৭) আল্লামা জায়নুদ্দিন বিন আল-আশ-আ-কি আল-হালাবি।

(১৮) আল্লামা রজিউদ্দিন মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম (যিনি ইবনুল হাম্বলী আল-হালাবী নামে পরিচিত) 'মাওয়ারিদুস্ সফা ওয়া মাওয়ায়িদুশ্ শিফা' (مَوَارِدُ الصَّفَاءِ وَمَوَائِدُ الشِّفَاءِ) নামে একটি ব্যাখ্যা লেখেন।

(১৯) কুতুব উদ্দিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আল-হায়দারি (ওফাত: ৮৯৪হি.) 'আস্ সফায়ু বিতাহরিশ্ শিফা' (اَلصَّفَاءُ بِتَحْرِ الشِّفَاءِ) নামে।

(২০) ইমাম আবুল মাহাসীন আব্দুল বাকী আল ইয়ামানী (ওফাত : ৮৪৩হি.), তিনি 'আল ইকতিফা ফী শরহি আলফাযিশ্ শিফা' (اَلْاِكْتِفَاءِ فِيْ شَرْحِ أَلْفَاظِ الشِّفَاءِ) লিখেছেন।[1]

(২১) আল্লামা ইউসুফ বিন আবুল ফাতাহ আদ-দামাশকি আল-ইমাম আস-সুলতানি (যিনি সাকিফি নামে পরিচিত) (ওফাত– ১০৫৭হি.)।[2]

(২২) মুহাম্মদ বিন আব্দুস সালাম আল-বানানি 'নিদাউল হায়াদি ফী শরহিশ্ শিফা লিল কাযী আয়ায' (نِدَاءُ الْحِيَاضِ فِيْ شَرْحِ الشِّفَاءِ لِلْقَاضِيْ عِيَاضْ) নামে লিখেছেন।

[1]. হাজী খলিফা : কাশফুজ জুনূন ২/১০৫৪-১০৫৫।
[2]. ইসমাঈল পাশা বাগদাদী : ইযাহুল মাকনূন ফী যায়লি আলা কাশফিজ জুনূন ২/৫২।

(২৩) আল-হাজ্জ নজিবুল ঈ-নাতাবি, মদিনা মুনাওয়ারার শিক্ষক (১২১৯হি.)।[1]

(২৪) আশ-শায়খ হাসান আল-আদাওয়ি আল-হামজাওয়ি 'আল মাদ্দু ওয়াল ফায়াদ্ব' (اَلْمَدُّ وَالْفَيَاضُ) নামে লিখেছেন।[2]

(২৫) আল্লামা আহমদ শিহাব উদ্দিন আল-খাফাজি 'নসীমুর রিয়াজ ফী শরহিশ্ শিফা লিল কাযী আয়ায' (نَسِيْمُ الرِّيَاضِ فِيْ شَرْحِ الشِّفَاءِ لِلْقَاضِيْ عِيَاضْ) নামে লিখেছেন।

(২৬) আল্লামা আলী বিন সুলতান মুহাম্মদ আল-কারী (মোল্লা আলী কারী) 'শরহে শিফা' (شَرْحِ شِفَاءِ) নামে লিখেছেন।

বর্তমান সময়ে সর্বশেষ দুটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ খুব পরিচিত। মোল্লা আলী কারী প্রণীত 'শরহে শিফা' (شَرْحِ شِفَاءِ) এবং আল্লামা আহমদ শিহাব উদ্দিন এর টীকা 'নসীমুর রিয়ায' (نَسِيْمُ الرِّيَاضِ) চার খণ্ডে পাওয়া যায়। 'শিফা শরীফ' ১২৭৬ হিজরিতে মিসরে মুদ্রিত হয়। তার টীকায় আল্লামা সুয়ুতির ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'মানাহিলস্ সাফা ফী তাখরিজি আহাদিসিশ্ শিফা' (مَنَاهِلُ الصَّفَاءِ فِيْ تَخْرِيْجِ أَحَادِيْثِ الشِّفَاءِ) এবং আল্লামা হাসান আল-আদাওয়ি আল-হামজাওয়ি প্রণীত ব্যাখ্যা 'আল মাদ্দু ওয়াল ফায়াদ্ব' (اَلْمَدُّ وَالْفَيَاضُ) মুদ্রিত হয়। ১২৯০ হিজরিতে প্রথম খণ্ড 'খলিল আফেন্দি পাবলিকেশন্স' এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৩১২ হিজরিতে 'ওসমানিয়া পাবলিকেশন্স' কর্তৃক ছাপানো হয়। অপর দিকে ফেজে যথাক্রমে ১৩০৫ ও ১৩১৩ হিজরিতে ছাপানো হয়।[3] এরপর একাধিক সংস্করণ বের হয়। 'মোস্তাফা পাবলিকেশন্স', মিসর হতে আল্লামা শিমনির টীকা মুদ্রিত হয়। পাকিস্তানেও মিসরি সংস্করণ ছাপানো হয়।

উর্দু ভাষায় 'শিফা শরীফ' এর একাধিক অনুবাদগ্রন্থ বের হয়। এখন মাওলানা গোলাম মুঈন উদ্দিন নাঈমীর অনুবাদগ্রন্থ আমাদের সামনে রয়েছে, যা তিনি 'ইদারায়ে সাওয়াদে আ'জম, লাহোর' এর মাধ্যমে মুদ্রিত করেছেন।

[1]. ইউছুফ আল-ইয়ান সারকীস : মু'জাম, ২/১৩৯৭।
[2]. ইউছুফ আল-ইয়ান সারকীস : মু'জাম, ২/১৩৯৭।
[3]. ইউছুফ আল-ইয়ান সারকীস : মু'জাম, ২/১৩৯৭।

লাহোরের 'মাকতাবায়ে নবুভীয়া'র এটা বড়ই সৌভাগ্য যে, তারা খুব অল্প সময়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সাহিত্য-প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন। এখন তারা 'শিফা শরীফ' এর উর্দু অনুবাদ বের করার কথা ভাবছেন। প্রথম খণ্ডের অনুবাদ করেছেন মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হাকিম আখতার শাহজাহানপুরী এবং দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ করেছেন মাওলানা আল্লামা আতহার নাঈমী (করাচির আরামবাগ জামে মসজিদের খতিব; হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ ওমর নাঈমীর খলিফা)। জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে এ দুই ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। অনুবাদের উৎকর্ষের জন্য তাদের নামই যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলা এই অনুবাদকেও মূল গ্রন্থের মতো কবুল করুক। যারা এই পর্বে অংশগ্রহণ করেছেন, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম প্রতিদান দান করুক। আ-মীন। বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালীন।

মুহাম্মদ আব্দুল হাকীম শরফ কাদেরী
জামেয়া নিজামিয়া রিযভীয়্যা, লাহোর
১৭ রবিউল আউয়াল, ১৩৯৯ হিজরী
১৫ ফ্রেব্রুয়ারি, ১৯৭৯ খ্রি.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আশ-শিফা পরিচিতি

ভূমিকা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা, গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যের বিবরণে সমস্ত যুগে ইমাম ও পূর্বসূরিগণ অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার সাহায্যে মানুষের মনে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি প্রেম-ভালোবাসা ও মহত্ত্ব সুদৃঢ় হয়েছে। রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মর্যাদা ও গুণাবলির উপর প্রণীত গ্রন্থসমূহের মধ্যে কাযী আয়ায-রচিত গ্রন্থ এক বিশিষ্ট ও অনবদ্য অবস্থানে রয়েছে। এই অমূল্য রচনা আকিদার শুদ্ধতা আনয়নে নিঃসীম গুরুত্ব ও উপকারিতার দাবিদার, যা তার আলোচনা ও আলোচ্যবিষয় হতে স্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হয়। যেমনটা নাম হতে বোধ্য- 'আশ-শিফা বিতা'রীফি হুকুকিল মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' (اَلشِّفَاءُ بِتَعْرِيْفِ حُقُوْقِ الْمُصْطَفٰى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) যার সংক্ষিপ্ত মর্মার্থ হলো: রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মর্যাদা, রিসালত ও নবুওয়াতের পূর্ণতা, অধিকার ও শিষ্টাচারের আলোচনা- আপাদমস্তক শিফা-ই শিফা। সুতরাং যেখানে রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে পরিচিতির কথা রয়েছে, সেখানে মুস্তফার শানে বিলীন হওয়ার দ্বার খুলে যায়। যারা তার প্রতি বড়ত্ব ও মহত্ত্বের প্রকাশ ঘটায়, তাদের অন্তরের ব্যাধিসমূহের জন্য এটা প্রতিষেধক এবং অস্থির ও বিচলিত হৃদয়ের জন্য এটা প্রশান্তি; এটা অন্তরের সেসব রোগের মহৌষধ, যার কারণ হলো বিশ্বাসের ভ্রান্তি।

রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মর্যাদা-প্রশংসা, অধিকার ও শিষ্টাচারের সূত্রে রচিত এই গ্রন্থ সব ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস, রুহানি ও আধ্যাত্মিক ভ্রষ্টতা ও ব্যাধি এবং সব ধরনের সংশয় ও সন্দেহকে শুধু দূরীভূতই করে না, বরং আল্লাহর তাওফীকে এটা পরিপূর্ণ আরোগ্যলাভের ব্যবস্থাও করে দেয়। কিন্তু এই আরোগ্যলাভ রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অধিকার-সচেতনতা ও পালন ছাড়া সম্ভব নয়। উপরন্তু এই গ্রন্থের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হলো- এটা রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে উম্মতের সম্বন্ধকেই শুধু দৃঢ় করে না, বরং ঈমানের অবিচলতার লক্ষ্যে রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিক্ষার প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করে। এটাই দ্বীনের বাস্তব চরিত্র, যা পূর্বসূরিগণ হতে বংশান্তরে বর্ণিত হয়ে এসেছে। দুঃখের বিষয় হলো- আজ হতে দু'শতাব্দি পূর্বে মোস্তফার সত্তার সাথে সম্বন্ধের আলো নিভাতে এবং শুধু শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে এমন ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, যার বিরূপ প্রভাব এখনো পর্যন্ত কিছু সম্প্রদায়ের

কাছে পরিষ্কারভাবে উপলব্ধ রয়েছে। এটা চিন্তা ও দর্শনগত এমন এক ভ্রান্তি যা মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের ছায়াকে চারিদিকে বেষ্টন করে দিয়েছে।

উম্মতের উপর আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ যে, তিনি 'তাহরীক-ই মিনহাজুল কুরআন'কে এই বিশিষ্টতা ও মর্যাদা দান করেছেন যে, এটা যেখানে ঈমানের পূর্ণতার লক্ষ্যে মোস্তফা-সত্তার সাথে সম্বন্ধ স্থাপনের কথা বলেছে, সেখানে শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগকেও সাফল্যের একমাত্র উপায়রূপে চিহ্নিত করেছে এবং নিজেদের দার্শনিক ভিত্তিতে রেখেছে নিম্নবর্ণিত আয়াতঃ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ –(সুতরাং যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনে, তাঁকে সম্মান করে, তাঁকে সাহায্য করে এবং যে নূর তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে উহার অনুসরণ করে তারাই সফলকাম[১])। এখানে ঈমান ও শক্তিযোগানোর সম্পর্ক রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্তার সাথে এবং সহযোগিতা ও অনুসরণের সম্পর্ক রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিক্ষার সাথে। মোটকথা ইসলামি ইতিহাসের সর্বযুগে বিদ্যমান বিশ্বাস ও চিন্তার এই ধারাকে 'তাহরীক-ই মিনহাজুল কুরআন' শুধু প্রতিষ্ঠিত করেই ক্ষান্ত হয় নি, বরং সমাজে এটার প্রয়োগ ঘটিয়েছে। সত্তার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য মিলাদ মাহফিল এবং শিক্ষার সাথে সম্বন্ধ স্থাপনের লক্ষ্যে সিরাতুন্নবির মাহফিল প্রভৃতির আয়োজন করে যাচ্ছে।

আলোচনাধীন গ্রন্থ 'মা'রুফে শিফা বিতা'রীফি হুকুকিল মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' 'مَعَارِفُ الشِّفَاءِ بِتَعْرِيْفِ حُقُوْقِ الْمُصْطَفٰى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ' রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি প্রেম ও ভালোবাসার উপর ইসলামি চিন্তাবিদ ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরির উপস্থাপিত পাঠ, যা তিনি 'আশ্-শিফা' (اَلشِّفَاءُ)'র ভূমিকায় জামেয়া ইসলামিয়া মিনহাজুল কুরআনে ১৯৮৬-১৯৮৮-এর বিভিন্ন সময়ে ইরশাদ করেন। এসব পাঠের প্রত্যেকটা শব্দ যেন রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি প্রেম-ভালোবাসার দর্পণ। তার পাঠদানের বিশিষ্ট পদ্ধতিতে প্রবল আকর্ষণ রয়েছে, যে কারণে প্রত্যেকটা কথা মর্মস্থলে পৌঁছে যায়। অনেক বিজ্ঞ আলেমও ঘটনাক্রমে সেখানে উপস্থিত হন। ব্যাপক ও উপযুক্ত শব্দচয়নে দক্ষ বিপ্লবের পথিকৃৎ হজরতের পাঠদান-যোগ্যতার স্বীকার না করে কেউ পারেনি। ذٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ –'এটা আল্লাহর অনুগ্রহ; তিনি যাকে চান, দান করেন'।

---

১. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭:১৫৭।

এই গ্রন্থ যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জন্য অত্যন্ত উপকারী ও গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে সাবলীল ও সহজবোধ্য হওয়ার কারণে জনসাধারণের জন্যও আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রাসূলের অবস্থানের সাথে পরিচয় ঘটিয়ে তার সাথে প্রেম-ভালোবাসা-সম্প্রীতি-জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্বন্ধ স্থাপন করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

আশ-শিফা পরিচিতি

'আশ্-শিফা বিতা'রীফি হুকুকিল মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' (اَلشِّفَاءُ بِتَعْرِيْفِ حُقُوْقِ الْمُصْطَفٰى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)- নৈতিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর লিখিত ইমাম কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রণীত এক বিখ্যাত গ্রন্থ। প্রথিতযশা মনীষীগণ উম্মতের পাঞ্জেরি, সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ রাসূল এবং মানবতার পথপ্রদর্শক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা, গুণাবলি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে অগুনতি পুস্তক লিখেছেন; কিন্তু উম্মতের কাছে যে গ্রহণযোগ্যতা এই কিতাবের আছে, তা অন্য কোনো কিতাবের নেই। প্রকৃতপক্ষে ইমাম কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-প্রণীত 'আশ্-শিফা' (اَلشِّفَاءُ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর লিখিত পুস্তকপুঞ্জের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট, ব্যতিক্রমধর্মী ও উচ্চস্তরের।

'আশ্-শিফা' (اَلشِّفَاءُ) এই কিতাবের মূল নাম; সংযোজনীতে রয়েছে- 'বিতা'রীফি হুকুকিল মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' (بِتَعْرِيْفِ حُقُوْقِ الْمُصْطَفٰى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)। মূল নামের সাথে সংযুক্ত এই বাক্যাংশে কিতাবের মৌলিকতা ও বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত রয়েছে। কিতাবের নাম হতে এর অভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তু ও আলোচ্যবিষয় স্বাভাবিকভাবে বোঝা যায়।

'আশ্-শিফা' (اَلشِّفَاءُ)-এর আভিধানিক অর্থ

আরবি ভাষায় 'আশ্-শিফা' (اَلشِّفَاءُ) শব্দের ব্যুৎপত্তিগত দুটো রূপ পাওয়া যায়।

এক. اَلشَّفَاءُ (ش-বর্ণে জবর দিয়ে)।

দুই. اَلشِّفَاءُ (ش-বর্ণে জের দিয়ে)।

প্রথমটির সংজ্ঞা নিম্নরূপ

حَرْفُ كُلِّ شَيْئٍ وَحَدُّهُ: বস্তুর প্রান্ত ও সীমা।[১]

অর্থাৎ নদী, সমুদ্র, কূপ, গর্ত যেকোনো কিছুর প্রান্তকে الشَّفَاءُ বলা হয়।

কুরআন মাজীদে উক্ত অর্থে শব্দটির ব্যবহার

জাহিলিয়াত তথা অন্ধকার ও মূর্খতার যুগে কাফির ও মুশরিকদের ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার বিবরণে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে–

وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا.

–তোমরা আগুনের গর্তপ্রান্তে ছিলে; অতঃপর তিনি তোমাদের রক্ষা করেছেন।[২]

উদ্ধৃত আয়াতে 'শাফা হুফ্‌রাতিন' (شَفَا حُفْرَةٍ) দ্বারা গর্তের প্রান্তকে বোঝানো হয়েছে। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরববাসী সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, গোত্রগত, সভ্যতা ও সংস্কৃতিগত, জ্ঞান ও কর্মগত, চরিত্র-বিশ্বাস-জীবনধারণসহ সার্বিকভাবে অধঃপতনের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল। সর্বদিকে তাদের ধ্বংস ত্বরান্বিত ছিলো। অবশেষে আল্লাহর করুণা উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। ইসলামের আকৃতি নিয়ে রহমত বর্ষিত হয় এবং নবুওয়াত ও রিসালতের সর্বশেষ বাহকের আবির্ভাব ঘটে। আরবের উৎসাদিত মরুভূমি প্রান্তরে বসন্তের আগমন ঘটে এবং খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে আরবের সমুদয় পরিস্থিতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়।

কিতাবের নামের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

'আশ্-শিফা বিতা'রীফি হুকুকিল মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' (الشِّفَاءُ بِتَعْرِيْفِ حُقُوْقِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) -এর সাধারণ অর্থ হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা, নবুওয়াত ও রিসালতের পূর্ণতা, শিষ্টাচার ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আলোচনা শেফার অন্তর্গত।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা, প্রশংসা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য-সংবলিত পুস্তককে 'আশ্-শিফা' (اَلشِّفَاءُ) হিসেবে নামকরণ কতটুকু যুক্তিসংগত। এর উত্তর হলো- মূলত কুরআন মাজীদের

১. আল-মুনজিদ (ফীল লুগাতি ওয়াল ই'লাম) পৃ. ৩৯৫।
২. আল কুরআন : সূরা আলে-ইমরান, ৩:১০৩।

অনুকরণে উক্ত পুস্তকের নাম 'আশ্-শিফা' (اَلشِّفَاءُ) রাখা হয়েছে। কারণ আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদকে 'যিক্‌র' (ذِكْرٌ) নামে অভিহিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ.

–আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং এটার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমারই।[১]

একইভাবে অন্যত্র বলা হয়েছে,

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لك وَلِقَوْمِكَ.

–এই কুরআন তুমি ও তোমার উম্মতের জন্য যিক্‌র।[২]

অনুরূপভাবে অন্য জায়গায় এসেছে–

إِنَّ هٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلٰى رَبِّهِ سَبِيْلًا.

–নিশ্চয় এটা উপদেশের স্মারক; যার ইচ্ছা হয়, সে যেন আল্লাহর পথ অবলম্বন করে।[৩]

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদকে কোথাও 'যিকর' (ذِكْرٌ), কোথাও 'তাযকিরাহ' (تَذْكِرَةٌ) শব্দে ব্যক্ত করেছেন; সেখানে আল্লাহ ও তার রাসূলের কথা, শুভ নিয়ত ও পুণ্যকাজের আলোচনা এবং ভালো ও কল্যাণের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। মোটকথা- গোটা কুরআন মাজীদ ভালো ও কল্যাণের আলোচনায় পরিপূর্ণ। আল্লাহ এটাকে 'আশ্-শিফা' (اَلشِّفَاءُ) বলেছেন। এ দিকটা বিবেচনা করলে স্পষ্টরূপে বোঝা যায় যে, ইমাম কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কুরআনের ভাষা ও ভাব-রীতির অনুকরণ করতে গিয়ে নিজের কিতাবের নাম রাখেন 'আশ্-শিফা' (اَلشِّفَاءُ)। এভাবে নামকরণের সার্থকতা প্রমাণিত।

১. আল কুরআন : সূরা হিজর, ১৫:৯।
২. আল কুরআন : সূরা যুখরুফ, ৪৩:৪৪।
৩. আল কুরআন : সূরা মুযযাম্মিল, ৭৩:১৯।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ.

–তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছে উপদেশাবলি, তোমাদের জন্য এবং তোমাদের অন্তরের ব্যাধিসমূহের প্রতিষেধক।[১]

উদ্ধৃত আয়াতে কুরআন মাজীদকে উপদেশ ও মর্মব্যাধির প্রতিষেধক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটা মানুষের অভ্যন্তরীণ ব্যাধিসমূহের আরোগ্যের উপকরণ।

কুরআন মাজীদে যেভাবে আল্লাহ তা'আলার আলোচনা রয়েছে, সেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আলোচনাও স্থান পেয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ.

–হে মাহবূব! আমি আপনার জন্য আপনার চর্চাকে সমুন্নত করেছি।[২]

কুরআন মাজীদের যত্রতত্র আল্লাহ ও তার রাসূলের আলোচনা রয়েছে। এই কুরআনকে তিনি 'আশ্-শিফা' (اَلشِّفَاءُ) নামে অভিহিত করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন,

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.

–কুরআনরূপে তিনি যা অবতরণ করেছেন, তার সবই ঈমানদারগণের জন্য অনুগ্রহ ও আরোগ্যের উপকরণ।[৩]

'মিন' (مِنْ)-এর ব্যবহারগত প্রেক্ষাপট

এখানে 'মিন' (مِنْ)'র ব্যবহার 'তাবয়ীদ্বিয়্যাহ' (تَبْعِيْضِيَّةٌ) তথা আংশিকতাবাচক নয়। কারণ 'মিন' (مِنْ)-কে 'তাবয়ীদ্বিয়্যাহ' (تَبْعِيْضِيَّةٌ) ধরা হলে অর্থ দাঁড়ায়- কুরআন মাজীদের কিছু অংশ শেফা, আর কিছু অংশ নয়। এ ধরনের বিশ্বাস ভুল। কারণ কুরআন মাজীদ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শেফা। তাহলে বুঝাই যাচ্ছে, কুরআন হিসেবে আল্লাহ তা'আলা যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন, তার শুরু

[১]. আল কুরআন : সূরা ইউনুস, ১০:৫৭।
[২]. আল কুরআন : সূরা ইনশিরাহ, ৯৪:৪।
[৩]. আল কুরআন : সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:৮২।

থেকে শেষ পর্যন্ত শেফা এবং মু'মিনের জন্য রহমত। এ কারণে পুরো কুরআন মাজীদকে শেফা বলা হয়েছে। কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ দিক বিবেচনায় তার কিতাবের নাম রাখেন 'আশ্-শিফা' (اَلشِّفَاءُ)। এ কথার সমর্থনে কুরআন মাজীদের নিম্নবর্ণিত আয়াত পাওয়া যায়–

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا هُدًى وَشِفَاء.

–হে হাবীব! আপনি বলুন, এটা (কুরআন মাজীদ) মুমিনের জন্য হেদায়ত ও শেফা।[১]

এখানে 'হুয়া লিল্লাযীনা' (هُوَ لِلَّذِيْنَ) দ্বারা গোটা কুরআনকে বোঝানো হয়েছে। এ বিষয়টা স্পষ্ট করা উদ্দেশ্য যে, কুরআন মাজীদ শুধু ঈমানদারগণের জন্য রহমত ও শেফা। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে নিজের ও তার রাসূলের আলোচনাকে শেফা হিসেবে অভিহিত করেছেন। এ ধারনার অনুকরণ করতে গিয়ে ইমাম কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তার কিতাবের নাম রাখেন 'আশ্-শিফা' (اَلشِّفَاءُ), যেখানে তিনি সার্বিকভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আলোচনা করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা, চারিত্রিক সমগ্রতা, গুণাবলি ও শিষ্টাচারের বর্ণনায় কুরআন মাজীদে এসেছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ.

–হে মুমিনগণ, তোমরা অদৃশ্যের সংবাদদাতা নবির সামনে উচ্চঃস্বরে কথা বলো না।[২]

এভাবে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি উম্মতের করণীয় ও আচরণের কথা বিবৃত হয়েছে।

'আশ্-শিফা' (اَلشِّفَاءُ)'র নামকরণ

প্রথমে আমরা 'আশ্-শিফা' (اَلشِّفَاءُ) শব্দের বিস্তারিত আলোচনা করবো; তারপর নামকরণের প্রেক্ষাপট নিয়ে পর্যালোচনা করবো।

'আশ্-শিফা' (اَلشِّفَاءُ) শব্দের বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। নিচে এগুলোর আলোচনা করা হলো।

[১]. আল কুরআন : সূরা ফুস্‌সিলাত, ৪১:৪৪।
[২]. আল কুরআন : সূরা হুজরাত, ৪৯:২।

'আশ্-শিফা' (اَلشِّفَاءُ) শব্দের প্রথম অর্থ

'আশ্-শিফা' (اَلشِّفَاءُ) শব্দের প্রথম অর্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে– 'আত্-তাখলীস্ মিন সুয়িল ই'তিকাদ' (اَلتَّخْلِيْصُ مِنْ سُوْءِ الْاِعْتِقَادِ), অর্থাৎ ভ্রান্ত বিশ্বাস হতে মুক্তি ও নিষ্কৃতি অর্জন। অসুস্থতা বা ব্যাধির কোনো অবস্থা হতে পরিত্রাণের নামই হলো শেফা তথা আরোগ্যলাভ। এখানে অসুস্থতা ও ব্যাধি বলতে বিশ্বাসের ভ্রান্তি ও বিচ্যুতিকে বোঝানো হয়ে থাকে। কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই পুস্তকের নাম এভাবে রেখেছেন এ জন্য যে, এই পুস্তক পাঠ করে মানুষ উক্ত ব্যাধি হতে মুক্তি লাভ করবে। এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, এই পুস্তক পাঠে পাঠকের 'ভুল বিশ্বাস' কিভাবে দূরীভূত হবে? উত্তর হলো- এ পুস্তক যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণতা ও চারিত্রিক সমগ্রতা নিয়ে আলোচনা করে, সেহেতু পাঠক এখানে তার পূর্ণ পরিচিতি লাভে সমর্থ হবেন; এটাই বিশ্বাসের ভ্রান্তি দূরীকরণের নিশ্চয়তা দেয়। এখানে এ কথা স্পষ্ট করার জরুরি যে, পুস্তকের নামকরণের ক্ষেত্রে এ ধারণা লেখকের নিজস্ব নয়, বরং তিনি এটা কুরআন মাজীদের ভাবধারা হতে চয়ন করেছেন; এটাই তাকে 'আশ্-শিফা' (اَلشِّفَاءُ) নামকরণে উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে মর্যাদা দান করেছেন, তা যদি কারো কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তাহলে এটা তার মর্মব্যাধি দূর করতে সহায়তা করে; এটা তার সেসব ভ্রান্তিকে বিতাড়িত করে, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভুল বিশ্বাসের কারণে সৃষ্টি হয়েছিল। এ ধারণার বিবরণে কুরআন মাজীদের নিম্নবর্ণিত আয়াত লক্ষ্য করা যায়–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ.

–কিছু মানুষ এমন রয়েছে, যারা বলে যে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি; অথচ তারা আদৌ ঈমানদার নয়।[1]

উদ্ধৃত আয়াতে মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে। তারা কেবল আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকে যথেষ্ট মনে করে; আল্লাহর নবির উপর বিশ্বাস স্থাপনকে তারা আবশ্যক মনে করে না। এটা কোনো ঈমানদারের আচরণ হতে পারে না। কেউ যদি এ জাতীয় ধারণা পোষণ করে থাকে, তাহলে এটা রাসূল

[1]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:৮।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তার ভ্রান্ত বিশ্বাসের ফসল। মুনাফিকরা আল্লাহ ও কেয়ামত-দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলে মুমিনদের ধোঁকা দিতে চায়, এবং এভাবে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালতকে অস্বীকারের পথ খোঁজে। তাদের এই বিশ্বাস ও পাঁয়তারার স্বরূপ উদঘাটন করতে গিয়ে কুরআন মাজীদের পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে–

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ.

–তারা আল্লাহ ও মুমিনদের ধোঁকা দিতে চায়; কিন্তু তারা নিজেদেরই প্রতারিত করে, অথচ তারা তা অনুধাবনও করতে পারে না।[1]

উদ্ধৃত আয়াতে মুনাফিকদের ঈমানের আড়ালে লুকিয়ে থাকা কপটতাকে স্পষ্ট ভাষায় উন্মোচিত করা হয়েছে- তারা রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না। পরবর্তী আয়াতে সেটার বর্ণনা এভাবে এসেছে–

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا.

–তাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত; আল্লাহ তাদের ব্যাধিকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।[2]

উপরে বর্ণিত আয়াতে মুনাফিকদের ব্যাধিকে অন্তরের ব্যাধিরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। অথচ তারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান এনেছে; রিসালতের প্রতি অবিশ্বাসের কারণে তাদের বিরুদ্ধে কপটতার অভিযোগ এসেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যক্তিত্বের প্রতি তাদের আক্রোশ, শত্রুতা ও কার্পণ্যের কারণে তাদের ভেতরে এ রোগের জন্ম হয়েছে। এখন রোগের জন্য যেহেতু উপযুক্ত চিকিৎসা দরকার, সেহেতু যে রোগ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণে সৃষ্টি হয়েছে, সে রোগের একমাত্র চিকিৎসা হলো- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যক্তিত্ব, গুণাবলি ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা। এ দিক বিবেচনায় কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'আশ্-শিফা' (اَلشِّفَاءُ) নাম চয়ন করেন। এতে এ বিষয়টা স্পষ্ট করা হয়েছে যে, এই পুস্তক অন্তরের ব্যাধির জন্য আরোগ্যের উপকরণ। কুরআন মাজীদের আরেকটি আয়াতে এর সমর্থন পাওয়া যায়–

[1]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:৯।
[2]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:১০।

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُوْلِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا.

–তাদেরকে যখন আহ্বান করা হয় আল্লাহ যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন সেসবের প্রতি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, তখন মুনাফিকদের তুমি দেখতে পাবে তোমার দিকে ধাবিত হওয়া থেকে তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যাচ্ছে।[১]

উদ্ধৃত আয়াতে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বিবৃত হয়েছে যে, মুনাফিকদেরকে যখন আল্লাহ ও তার রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি আহ্বান করা হয়, তখন দেখা যায়- আল্লাহর প্রতি দাওয়াতে তারা আপাতদৃষ্টিতে কুণ্ঠাবোধ করে না, কিন্তু আল্লাহর প্রভুত্ব, শাসন ও একত্ববাদের স্বীকারোক্তি দেওয়ার পরও তারা রিসালাতকে স্বীকার করতে চায় না। কুরআন মাজীদের পরিভাষায় এই ব্যাধিকে 'আন্-নিফাক' (اَلنِّفَاقُ) তথা কপটতা বলা হয়েছে।

কুরআন মাজীদ স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মুনাফিকদের লক্ষণসমূহকে চিহ্নিত করেছে, যে কারণে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথ-অবলম্বনে বিমুখ থেকেছে। যখন এ কথা স্পষ্ট হলো যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভ্রান্ত বিশ্বাসই কপটতার ভিত্তি, তখন এ ব্যাধির চিকিৎসায় তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সম্যক পরিচিতি অর্জনের কোনোই বিকল্প নেই। সূরা মুনাফিকুন এর একটি আয়াতে বিষয়টাকে এভাবে স্পষ্ট করা হয়েছে-

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُه وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ.

–যখন মুনাফিকরা তোমার কাছে আসে, তারা বলে যে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি– নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল, আর আল্লাহ জানেন যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। (সাথে সাথে) আল্লাহ এ কথার সাক্ষ্য দেন যে, নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা মিথ্যুক।[২]

[১]. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:৬১।
[২]. আল কুরআন : সূরা মুনাফিকুন, ৬৩:১।

সূরা মুনাফিকুনের প্রথম আয়াত, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভ্রান্ত বিশ্বাসের ফলে সৃষ্ট কপটতার ধারণা চিত্রিত হয়েছে, সেখানে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণে সৃষ্ট মর্মব্যাধিকে কপটতারূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। উদ্ধৃত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যে ঘোষণা দিয়েছেন, মুনাফিকদের অভিব্যক্তিও ছিলো অভিন্ন। তবে যেখানে আল্লাহর ঘোষণা সত্য, সেখানে মুনাফিকদের অভিব্যক্তি মিথ্যে ছিলো। প্রকৃতপক্ষে উভয় কথার মাঝে কোনো বিরোধ নেই; শুধু এটুকু যে, তারা যা মুখে স্বীকার করে, অন্তরে তা বিশ্বাস করে না। এ জন্য তাদেরকে মিথ্যুক বলা হয়েছে। ড. ইকবালের মতে–

زباں سے کہ بھی دیا لاالہ تو کیا حاصل
دل ونگاہ مسلماں نہیں تو کچھ بھی نہیں

মুখে 'লা-ইলাহা বললে কিছুই হবে না,
যতক্ষণ অন্তর ইসলামকে গ্রহণ করে না।

এখানে কুরআন মাজীদ বাহির ও ভেতরের পার্থক্যকে স্পষ্টরূপে নিরূপিত করেছে। এখন মানুষ ঈমানের কথা মুখে যতোই বলুক না কেন, অথবা কাগজে-কলমে যতোই সাহিত্যের পসরা সাজাক না কেন- যতক্ষণ অন্তরে ভ্রান্ত বিশ্বাসের পরশ থাকবে, ততক্ষণ সে মুনাফিক। কপটতার এই ব্যাধি ইস্তেগফার, নফল প্রভৃতি দ্বারা সংশোধিত হয় না; প্রয়োজন পড়ে নিষ্ঠাসিঞ্চিত ও সত্যতাসিক্ত অন্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিচিতি অর্জন করা এবং তার মহত্ত্ব ও চারিত্রিক উৎকর্ষকে অনুধাবন করা। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যক্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলেই এই ব্যাধি হতে মুক্তি ঘটে। এটাই ওই মর্মব্যাধি হতে আরোগ্যলাভের একমাত্র উপায়।

'আশ্-শিফা' (اَلشِّفَاءُ) নামের সীমাবদ্ধতা

ইমাম কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক নির্ধারিত 'আশ্-শিফা' (اَلشِّفَاءُ) নামের অন্তরালে এক সুপ্ত সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। সেটা হলো- একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত পরিচিতি-লাভের মাধ্যমেই মর্মব্যাধি হতে পরিত্রাণ লাভ করা সম্ভব। সূরা মুনাফিকুনে এভাবে ধারণাটা বিশ্লেষিত হয়েছে–

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ.

–যখন তাদেরকে আহ্বান করা হয় যে, এসো- আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমাপ্রদর্শনের সুপারিশ করবেন, তখন তারা মাথায় (অবজ্ঞার) ঝাঁকুনি দেয়; তাদেরকে তুমি দেখতে পাবে, তারা দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়।[১]

মূলত তারা রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহত্ত্ব ও সুপারিশের অধিকারকে অস্বীকার করে। দাম্ভিকতার সাথে পৃষ্ঠপ্রদর্শনের কারণ হলো তাদের অন্তরের কপটতার ব্যাধি।

'আশ্-শিফা' (اَلشِّفَاءُ) শব্দের দ্বিতীয় অর্থ

আরবি ভাষায় 'আশ্-শিফা' (اَلشِّفَاءُ) শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হলো– قَضَاءُ الْحَاجَةِ তথা প্রয়োজন পূরণ।

نَالَ مُرَادَهُ، نَالَ حَاجَتَهُ فَطَابَتْ.

–সে তার উদ্দেশ্য পূরণ করলো। সে তার প্রয়োজন পূরণ করলো এবং তার অন্তর তৃপ্ত হলো।

'ত্বা, ইয়াত্বিবু', (يَطِيبُ–طَابَ) শব্দে আরাম ও সন্তুষ্টির অর্থ পাওয়া যায়। এভাবে এখানে 'আশ্-শিফা' (اَلشِّفَاءُ)'র দুটো অর্থ হয়। এক. প্রয়োজন পূরণ। দুই. তৃপ্তি অর্জন। এসব অর্থবিবেচনায় প্রয়োজন পূরণ এবং তৃপ্তি অর্জন হলেই 'আশ্-শিফা' (اَلشِّفَاءُ)'র অর্থ সাধিত হয়।

উপরিউক্ত ব্যাখ্যার আলোকে 'আশ্-শিফা' (اَلشِّفَاءُ) এমন একটি কিতাব, যা পাঠকের প্রয়োজন পূরণ করবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকার, চরিত্র, শিষ্টাচার, নবুওয়াত ও রিসালতের উৎকর্ষ আলোচনার কারণে অন্তরাত্মা তৃপ্তিবোধ করবে। এখানে 'আশ্-শিফা' (اَلشِّفَاءُ) শব্দের দুটো অর্থকে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে দেখা হলে একদিকে প্রয়োজন পূরণ, অপর দিকে তৃপ্তিলাভের মর্ম পাওয়া যায়।

---

[১]. আল কুরআন : সূরা মুনাফিকুন, ৬৩:৫।

কুরআন মাজীদে দ্বিতীয় অর্থের সমর্থন এভাবে পাওয়া যায়–

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ.

–তোমরা বিয়ে করো নারীদের মধ্য হতে যাকে তোমাদের পছন্দ হয়।[১]

'ত্বা' (طَابَ) শব্দে পছন্দের অর্থ বিদ্যমান; এমন পছন্দ, যা অন্তরকে মোহিত ও তৃপ্ত করে। এসব অর্থগত ব্যাখ্যা পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় যে, কাযী আয়ায প্রণীত এই পুস্তক পাঠকের প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম হবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনার মাধ্যমে অন্তরকে তৃপ্ত করে তুলবে।

'আশ্-শিফা' (اَلشِّفَاءُ) শব্দের তৃতীয় অর্থ

'আশ্-শিফা' (اَلشِّفَاءُ) শব্দের তৃতীয় অর্থ হলো– ভালো লাগা; প্রিয় বস্তু/বিষয়। এটাও ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা করা হলে ভালো লাগে। এতে আত্মপ্রশান্তি ও আস্বস্তি অর্জিত হয়। কুরআন মাজীদে এই অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.

–আল্লাহর যিক্‌রে অন্তরসমূহ প্রশান্তিবোধ করে।

প্রিয় ব্যক্তি বা সত্তার স্মরণে অস্থির হৃদয়ে স্থিরতা আসে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের স্মরণ অভিন্ন কথা। যেভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য এক ও অভিন্ন, সেভাবে তাদের স্মরণও এক ও অভিন্ন। আল্লাহর ইবাদত ও রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য, আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসন্তুষ্টি এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি একটি অপরটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অনুরূপভাবে আল্লাহ ও তার রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যিক্‌রও একটি অপরটি হতে পৃথক হতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দরুদ পৌঁছানো তার জিক্‌র এবং এটাই প্রকৃত অর্থে আল্লাহর জিক্‌র। এই গ্রন্থ হতে বোঝা যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্মরণে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। অস্থির ও দগ্ধ হৃদয় প্রশান্ত হয়। কাসিদা বুরদা পাঠ করলে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়।

---

[১]. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:৩।

বর্ণিত আছে যে, ইমাম বুসিরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কাসিদা বুরদা লেখার পর সকালে বের হলে এক দরবেশের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। দরবেশ বললেন, "হে বুসিরি, আমাকেও রাত্রের ওই কবিতা শোনান।" বুসিরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, "আমি তো কাউকে শোনাই নি; আপনি কী করে জানলেন?" তখন দরবেশ বললেন, "যখন আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পড়ে শোনাচ্ছিলেন, আর তিনি তা মনোযোগসহকারে শুনছিলেন, তখন আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম।" তারপর দরবেশ ওই কবিতার প্রথম শ্লোক পড়লেন–

أَمِنْ تَذَكُّرِ جِيْرَانٍ بِذِيْ سَلَمِ مَزَجْتَ دَمْعًا جَرَىٰ مِنْ مُقْلَةٍ بِدَمِ

সালম গাছের উদ্যানে তুমি; স্মরণ করে প্রতিবেশী পনে,
মিশালে কি তব নয়নের ঝরা, অশ্রুকে লাল রক্তের সনে?

দেখতে দেখতে এই কবিতাসমূহ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং বাদশার মন্ত্রী লিখে তা নিজের কাছে সংরক্ষিত রাখেন। একদিন ওই মন্ত্রীর সা'দ উদ্দিন ফারুকি নামের এক ভৃত্যের চোখে অসুস্থতা দেখা দেয়। সমস্ত চিকিৎসা ব্যর্থ হওয়ার পর একদিন তিনি স্বপ্নে দেখলেন, তাকে বলা হলো- "তুমি মন্ত্রীর কাছে যাও এবং কবিতা-লেখা পৃষ্ঠাসমূহ চোখে লাগাও; তোমার চক্ষু ভালো হয়ে যাবে।" তিনি তাই করলেন এবং সুস্থ হয়ে উঠলেন। দরূদের ফজিলতের হাদিসসমূহে দরূদের মাধ্যমে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার কথা প্রমাণিত আছে। অসংখ্য আলেম ও বুজুর্গ এ পক্ষে মত দিয়েছেন।

'আশ্-শিফা' (اَلشِّفَاءُ) শব্দের চতুর্থ অর্থ

'আশ্-শিফা' (اَلشِّفَاءُ) শব্দের চতুর্থ অর্থ হলো আবশ্যকতা ও অপরিহার্যতা। 'শিফায়ুন' (شِفَاءٌ) হতে 'ইসমে ফায়েল' (اِسْمِ فَاعِلٍ) হয় 'আশ্-শাফিয়ু' (اَلشَّافِيُّ)। বলা হয় 'জাওয়াবু শাফী' (جَوَابٌ شَافٍ): এমন উত্তর, যার পরে আর কোনো প্রশ্ন থাকে না। এটাকে 'জাওয়াবু ক্বাতি'য়ি ইউক্তাফা জাওয়াবুন' (جَوَابٌ قَاطِعٌ يُكْتَفٰى بِهٖ) (অকাট্য জবাব) বলা হয়ে থাকে। এটা এমন উত্তর, যা সব সংশয় দূর করে দেয়। এ জন্য অভিধানে 'আশ্-শিফা' (اَلشِّفَاءُ) শব্দের অর্থে লেখা হয় 'আত্-তাখলিসু মিনাশ্ শাকূক' (اَلتَّخْلِيْصُ مِنَ الشُّكُوْكِ): সন্দেহ ও সংশয় হতে মুক্তি পাওয়া।

মানুষের অন্তর সন্দেহ হতে তখনই মুক্তি পায়, যখন তার অন্তরের সমস্ত বিড়ম্বনা ও প্রশ্ন-আপত্তি দূর করা সম্ভব হয়, এবং যখন এমন কোনো উত্তর মেলে, যা তার সংশয় দূর করে। প্রশ্ন, আপত্তি ও সংশয়ের সর্বশেষ পরিস্থিতি- যার পরে আর কোনো সন্দেহ থাকে না, অন্তরে আস্বস্তি ও নিশ্চয়তা অর্জিত হয়, সেই পরিস্থিতিকে বোঝানোর জন্য 'আশ্-শিফা' (اَلشِّفَاءُ) শব্দ ব্যবহৃত হয়। ঈমানের ক্ষেত্রে তখনই সমস্ত সংশয় বিদূরিত হয়, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে পরিচিতি অর্জিত হয়। এই ধারণাকে স্পষ্ট করতে গিয়ে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে–

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهٖ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ.

–ইতোপূর্বে আমি তোমাদের মাঝে কিছু সময় অতিবাহিত করেছি। তবু কি তোমরা বোঝো না?[১]

আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র মুখ হতে এসব বাক্য নিঃসৃত করে তার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের পবিত্রতা সেসব মানুষের কাছে স্পষ্ট করতে চান, যারা ইসলাম ও আল্লাহর একত্ববাদে সংশয় পোষণ করে। তাদের সে সন্দেহ দূরীকরণে এটা অকাট্য প্রমাণ, যার পরে আর কোনো বক্তব্য বা দলিলের প্রয়োজন পড়ে না।

অনুরূপভাবে কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'কিতাবুশ্-শিফা' (كِتَابُ الشِّفَاءِ) প্রণয়ন করে অন্তরের সন্দেহ ও সংশয় দূর করে দিয়েছেন। আর অবশ্য এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যক্তিত্বের সাথে পরিচিত হবার কারণে সম্ভব হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কুরআন মাজীদের নিম্নলিখিত আয়াত লক্ষণীয়–

يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُبِيْنًا.

–হে লোকসকল, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এসেছে সুস্পষ্ট; আর আমি তোমাদের জন্য অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আলোকবর্তিকা।[২]

---

১. আল কুরআন : সূরা ইউনুস, ১০:১৬।
২. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:১৭৪।

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে সম্বোধন করে বলেন, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এমন অকাট্য প্রমাণ এসে গেছে, যার পরে আর কোনো সংশয়, বিরোধ, আপত্তি কিংবা প্রশ্নের অবকাশ নেই।

'বুরহান' (بُرْهَانٌ)-এর ব্যাখ্যা

ইমাম রাগেব ইস্পাহানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'বুরহান' (بُرْهَانٌ) শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন,

اَلْبُرْهَانُ أَوْكَدُ الدَّلَالَةِ وَهُوَ الَّذِيْ يَقْتَضِيْ الصِّدْقَ أَبَدًا.

–বুরহান হচ্ছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও সুদৃঢ় প্রমাণ, যা সবসময় সত্যতার নির্দেশ করে।

এসব বিবেচনায় রেখে কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এমনভাবে কিতাবের নামকরণ করেন, যাতে বোঝা যায়– যারা অন্তরের প্রশান্তি ও আস্থা অর্জন করতে চায়, তারা যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যক্তিত্ব ও চরিতসমগ্রতার সাথে পরিচিতি অর্জন করে। কারণ গোটা পৃথিবীতে একমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই সুদৃঢ় ও অনবদ্য প্রমাণ।

'আশ্-শিফা' (اَلشِّفَاءُ) শব্দের পঞ্চম অর্থ

'আশ্-শিফা' (اَلشِّفَاءُ) শব্দের পঞ্চম অর্থ হলো ওষুধ বা প্রতিকার। এটা 'মুক্ত রূপক' (مَجَازٌمُرْسَلٌ) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ تَسْمِيَةُ السَّبَبِ بِاسْمِ الْمُسَبَّبِ এখানে ওষুধ سَبَبٌ তথা কারণ বা উপকরণ এবং আরোগ্যলাভ বা প্রতিকার مُسَبَّبٌ তথা ফলাফল। এভাবে প্রতিকার বা আরোগ্যলাভ দ্বারা উপকরণ তথা ওষুধকেই বোঝানো হয়েছে।

عِلْمُ الْبَيَانِ আরবি ভাষার অলঙ্কার-শাস্ত্র। এটা এমন একটি শাস্ত্র, যা ব্যবহার করে একটি শব্দকে একাধিক অর্থে ব্যবহারের পদ্ধতি জানা যায়। কিছু শব্দ দ্ব্যর্থহীন অর্থ নির্দেশ করে, আর কিছু শব্দ দ্ব্যর্থবোধক; কিছু শব্দে স্পষ্টতার আধিক্য থাকে, আর কিছু শব্দে ন্যূনতা। অর্থাৎ স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতার তারতম্য বিদ্যমান।

নিচের তিনটি পদ্ধতিতে عِلْمُ الْبَيَانِ-এর উদ্দেশ্য অর্জিত হয়:

(১) উপমা/তুলনা,
(২) মৌলিক ও রূপক অর্থের ব্যবহার,
(৩) ইঙ্গিত।

উপরিউক্ত তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে এই শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। বিস্তারিত বর্ণনা ও শাখা-প্রশাখাসমূহ পরে আলোচিত হবে। তন্মধ্যে একটি 'হাকীকত' (حَقِيْقَةٌ), অপরটি 'মাজায' (مَجَازٌ)।

এক বিভাজনে مَجَازٌ-কে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা:

(১) مَجَازٌ مُرْسَلٌ: মুক্ত রূপক,
(২) اِسْتِعَارَةٌ: শব্দের সাধিত ব্যবহার।

مَجَازٌ مُرْسَلٌ: এর বেশ কটি প্রকারের মধ্যে নিচে কয়েকটি প্রকারের আলোচনা করা হলো:

(ক) تَسْمِيَةُ الشَّيْئِ بِاسْمِ الْجُزْءِ: অংশবিশেষ উল্লেখ করে পূর্ণ বস্তু বোঝানো।
(খ) تَسْمِيَةُ الشَّيْئِ بِاسْمِ الْكُلِّ: পূর্ণ বস্তু বোঝানোর জন্য পূর্ণ অর্থের ব্যবহার।

مَجَازٌ مُرْسَلٌ-এর পূর্বোক্ত প্রকার ছাড়াও কুরআন মাজীদে আরো কয়েকটি প্রকারের ব্যবহার রয়েছে। যেমন–

يَجْعَلُوْنَ أَصَابِعَهُمْ فِيْ آذَانِهِمْ

–তারা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট করে তাদের অঙ্গুলি।[১]

কানে শুধু আঙুলের মাথা ঢোকানো যায়, পুরোটা নয়। কুরআন মাজীদের এই আয়াতে أَصَابِعَهُمْ তথা পূর্ণ শব্দ ব্যবহার করে তার অংশবিশেষ তথা আঙুলের মাথা বোঝানো হয়েছে।

(খ) تَسْمِيَةُ السَّبَبِ بِاسْمِ الْمُسَبَّبِ: سَبَبٌ তথা কারণের উল্লেখ থাকবে, আর مُسَبَّبٌ (যার কারণ) উদ্দেশ্য করা হবে। যেমন আরবের লোককথায় প্রচলিত আছে,

---

[১]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:১৯।

وَأَمْطَرَتِ السَّمَاءُ نَبَاتًا.

–আকাশ উদ্ভিদ উৎপাদন করলো।

আকাশ প্রকৃতপক্ষে উদ্ভিদ উৎপাদন করতে পারে না। মূলত এরূপ বলা উচিত ছিলো– وَأَمْطَرَتِ السَّمَاءُ غَيْثًا। কিন্তু এখানে غَيْثٌ (যার অর্থ বৃষ্টি)-এর পরিবর্তে نَبَاتًا ব্যবহার করা হয়েছে, যা مَجَازٌ مُرْسَلٌ। এখানে বৃষ্টি হলো 'কারণ', আর উদ্ভিদ হলো 'ফসল'। এ বাক্য দ্বারা কথকের উদ্দেশ্য হলো, যখন বৃষ্টি বর্ষিত হবে, তখন উদ্ভিদ উৎপন্ন হবে। বৃষ্টির পরিবর্তে এখানে আকাশের উল্লেখ করে মূলত দুটিকেই বোঝানো হয়েছে।

عِلْمُ الْبَيَانِ-এর مَجَازٌ (শব্দের রূপক ব্যবহার) অত্যন্ত অর্থবহুল ও গভীর, যা বক্তার দাবিকে অত্যন্ত সুচারুরূপে ব্যক্ত করে।

কুরআন মাজীদে এ জাতীয় প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়; কিছুটা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ.

১. এবং আমার জন্য পরবর্তীদের মাঝে সত্যতার জিহ্বা তৈরি করো।[1]

সাধারণ ভাষায় উক্ত বাক্যের অর্থ হলো- وَاجْعَلْ لِي ذِكْرًا حَسَنًا فِي الْآخِرِينَ। অর্থাৎ পরবর্তীতে আসা মানুষের কাছে আমাকে স্মরণীয় করে রেখো। কুরআন মাজীদে لِسَانَ صِدْقٍ এসেছে, যার অর্থ সত্যতার জিহ্বা। জিহ্বার কথা উল্লেখ করে এখানে আলোচনা বা স্মরণকে বোঝানো হয়েছে। এটাকে বলা হয় تَسْمِيَةُ الشَّيْءِ بِاسْمِ الْآلَةِ। অর্থাৎ উপকরণের নাম উল্লেখ করে বস্তুকে বোঝানো।

২. إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا.

২. যখন তাদের সামনে কুরআনের আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।[2]

---

[1]. আল কুরআন : সূরা শু'আরা, ২৬:৮৪।
[2]. আল কুরআন : আনফাল, ৮:২।

প্রকৃত অর্থে আয়াত ঈমান বাড়াতে পারে না; ঈমান বাড়াতে পারেন আল্লাহ তা'আলা। আয়াত মাধ্যম মাত্র; মৌলিক কর্তা আল্লাহ তা'আলা। সুতরাং আয়াতের মূল অর্থ হলো- যখন তাদের সামনে কুরআনের আয়াত পাঠ করা হয়, তখন আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দেন। এটা مَجَازٌ مُرْسَلٌ-এর দৃষ্টান্ত।

৩. إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا.

৩. আমি আপনার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি- আপনাকে একটা বাচ্চা দান করার জন্য।[1]

কুরআন মাজীদের এই আয়াত হযরত জিবরিল আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে বিবৃত হয়েছে। তিনি হযরত মারইয়াম আলাইহাস্ সালাম-এর কাছে এসে সন্তান-প্রসবের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। আয়াতের لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا-অংশে দান করার কর্তা হলেন জিবরিল আলাইহিস্ সালাম। প্রকৃতপক্ষে তিনি সন্তান দিতে পারেন না; সন্তান দিতে পারেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। সুতরাং এটাও مَجَازٌ مُرْسَلٌ-এর উদাহরণ। এ বিষয়ে ধারণা না থাকলে কেউ কুরআনের দিকে শিরকের সম্বন্ধ করবে।

অনুরূপভাবে কেউ যদি বলে, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে অনুগ্রহ করেছেন; তার করুণায় আমার অমুক বিপদ দূর হয়েছে", অথবা কেউ যদি বলে, "অমুক দাতা আমাকে অনুগ্রহ করেছেন", তাহলে কুরআন মাজীদের অনুকরণে مَجَازٌ مُرْسَلٌ-এর ব্যবহার হিসেবে এভাবে বলা বৈধ হবে। কারণ অনুগ্রহকারী বা বিপদ দূরকারী কেবল আল্লাহ তা'আলা; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা আল্লাহর প্রিয় কোনো বান্দা উসিলা মাত্র। সুতরাং উসিলা বা মাধ্যমের দিকে কর্মের সম্বন্ধ স্থির করলে কোনো দোষ হবে না। কারণ এসব ক্ষেত্রে প্রকৃত কর্তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই।

مَجَازٌ مُرْسَلٌ-রূপে উল্লিখিত কুরআনের ধারণাটা একটি হাদিস দ্বারাও সমর্থিত হয়। হাদিসটা নাসায়ি শরীফে রয়েছে। হাদিসটা এ-রকম: একদিন সাহাবিরা একটি যুদ্ধে জয়লাভ করে ফিরছিলেন। তারা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে রাসূল

---

[1]. আল কুরআন : সূরা মরিয়ম, ১৯:১৯।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হন। সমস্ত সম্পদ তিনি সাহাবিদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। পরে যাদের কাছ থেকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ পাওয়া গিয়েছিল, তারা ইসলাম গ্রহণ করে। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ উপস্থিত হয়ে আরয করল,"হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি; আমাদের সম্পদ, ছেলে ও মেয়েদেরকে আমাদের মাঝে ফিরিয়ে দিন।" তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তা তো বণ্টিত হয়ে গেছে।"তারা আবার বললো, "আমাদের অনুগ্রহ করুন! আমাদের সম্পদ ফিরিয়ে দিন।"

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাদের একটা বাক্য শিখিয়ে দিচ্ছি। সাহাবিরা উপস্থিত হলে তোমরা দাঁড়িয়ে এটা পড়বে–

إِنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَوِ الْمُسْلِمِينَ فِي نِسَائِنَا وَأَبْنَائِنَا .

–আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে সাহায্য কামনা করছি- আমাদের সম্পদ, মহিলা ও ছেলেদের ব্যাপারে; (অথবা তারা বললো) আমাদের সম্পদ, মহিলা ও ছেলেদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য।[১]

এখানে نَسْتَعِينُ (আমরা সাহায্য প্রার্থনা করছি) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যেরূপ বান্দাদের নির্দেশনা দিয়ে গিয়ে সূরা ফাতিহায় ব্যবহৃত হয়েছে–

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ.

–আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।[২]

দুটি স্থানে ব্যবহৃত اَلْإِسْتِعَانَةُ শব্দের মাঝে কি কোনো পার্থক্য লক্ষণীয়? গভীরভাবে তাকালে বোঝা যাবে যে, স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা শিখিয়েছিলেন। "তোমরা দাঁড়িয়ে বলো যে, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সাহায্য কামনা করছি।" এখানে এটা বলা হয় নি যে, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উসিলায় সাহায্য কামনা করছি। এরূপ বলা হলে এখানে শব্দের মৌলিক অর্থ উদ্দিষ্ট

---

১. নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবু হিবাতিল মাশা'য়ি, ৬:১৭৭, হাদিস : ৬৪৮২।
২. আল কুরআন : সূরা ফাতিহা, ১:৪।

হতো। সুতরাং সূক্ষ্ম অর্থটা مَجَازٌ مُرْسَلٌ-এর উপর ভিত্তি করে। অর্থাৎ রূপকার্থে إِنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ اللهِ বলা হয়েছে। সাহায্য কেবল আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা যায়; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাধ্যম মাত্র।

اَلشِّفَاءُ শব্দের পূর্ববর্তী চারটি অর্থ মৌলিক ও প্রকৃত; পঞ্চম অর্থটি مَجَازٌ مُرْسَلٌ (রূপকার্থে ব্যবহৃত)। এই অর্থবিবেচনায় اَلشِّفَاءُ এমন একটি পুস্তকের নাম, যা ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণে সৃষ্ট ব্যাধির নিরাময় হয়।

'আশ্-শিফা' (اَلشِّفَاءُ) শব্দের ষষ্ঠ অর্থ

رُجُوْعُ الْأَخْلَاطِ إِلَى الْاِعْتِدَالِ, অর্থাৎ মানুষের দৈহিক চারটি উপাদানের মাঝে সমতা বিদ্যমান থাকা। এই অর্থটা জুরজানি রচিত كِتَابُ التَّعْرِيْفَاتِ হতে গ্রহণ করা হয়েছে।

মানব শরীরের সৌষ্ঠবের ভিত্তি চারটি বিষয়ের উপর। যথা: (১) পিত্ত, (২) শ্লেষ্মা, (৩) কৃষ্ণতা ও (৪) রক্ত। বিশেষজ্ঞগণের মতে এ-সবের কোনোটিতে ব্যত্যয় ঘটলে মানুষ অসুস্থ হয়। ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হলে আরোগ্য অর্জিত হয়।

'আশ্-শিফা' (اَلشِّفَاءُ) শব্দের যে-সব অর্থ উপরে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো আধ্যাত্মিক ব্যাধির ব্যাপারে ছিল। এই অর্থে শারীরিক রোগের ক্ষেত্রে শব্দটির ব্যবহার ঘটেছে। তাছাড়া শব্দটা ঈমানি, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক রোগ হতে মুক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

যেভাবে মানুষের শারীরিক উপাদানমূহের মাঝে অসমতা থাকলে রোগের জন্ম হয়, সেভাবে আকিদা ও বিশ্বাসে অসমতা থাকলে আধ্যাত্মিক রোগের সৃষ্টি হয়। যদি কোনো ব্যক্তি তাওহিদ-রিসালত, সাহাবা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে বিশ্বাসগত অসৌষ্ঠবের শিকার হয়, তাহলে বুঝতে হবে- লোকটা আধ্যাত্মিক রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তার রচিত গ্রন্থে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা ও চরিত্রকে অঙ্কিত করেছেন। এটা অধ্যয়ন করলে সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয়, ভ্রান্ত বিশ্বাসের সমাপ্তি ঘটে এবং শারীরিক, আধ্যাত্মিক ও মানসিক- সব রকমের ব্যাধি দূর হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-

এর মর্যাদা ও চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার ফলে এই আরোগ্য-লাভ সম্ভব হয়। এ ছাড়া মানুষ 'শিফা' পর্যন্ত উপনীত হতে পারে না।

'আত্-তা'আরীফ' (اَلتَّعْرِيْفُ) শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য

শেফা সংক্রান্ত আলোচনার পর আমরা এখন 'আত্-তা'আরীফ' (اَلتَّعْرِيْفُ) তথা সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করবো।

সংজ্ঞা তিন প্রকার। যথা–

(১) اَلتَّعْرِيْفُ اللَّفْظِيُّ: শাব্দিক সংজ্ঞা

(২) اَلتَّعْرِيْفُ النَّحْوِيُّ: নাহবি সংজ্ঞা

(৩) اَلتَّعْرِيْفُ الْحَقِيْقِيُّ: বস্তুগত সংজ্ঞা

(১) শাব্দিক সংজ্ঞা

ভাষাবিদগণ শাব্দিক সংজ্ঞাকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রথম ব্যাখ্যা

هُوَ مَا يَقْصُدُ بِالْإِشَارَةِ إِلَى صُوْرَةٍ حَاصِلَةٍ وَتَعْيِيْنِهَا مِنْ بَيْنِ الصُّوَرِ.

–যে শব্দ বা বাক্য দ্বারা কোনো চিত্রের প্রতি নির্দেশ করে তা অন্যগুলো থেকে আলাদা করা হয়।

এর ব্যাখ্যা এরূপ মনে করুন, আপনার সামনে বিভিন্ন চিত্র উপস্থিত রয়েছে। তন্মধ্যে একটির চিত্র আপনি মস্তিষ্কে ধারণ করলেন। এখন আপনি এটার প্রতি নির্দেশ করতে চান। তাহলে আপনার নির্দেশটা ওই নির্দিষ্ট বস্তুটার দিকে হবে, যা আপনি পূর্বে মস্তিষ্কে ধারণ করেছিলেন। এভাবে বিভিন্ন চিত্রের মধ্য থেকে নির্ধারণ করা, যেন এই সংশয় না থাকে যে, এটার দ্বারা এই চিত্র বোঝানো হয়েছে, নাকি অন্য কোনো চিত্র। সুতরাং কোনো শব্দ বা বাক্য দ্বারা যদি একাধিক চিত্র হতে একটি চিত্রকে নির্দিষ্ট করে আলাদা করা হয়, তাহলে সেটাকে বলা হয় 'শাব্দিক সংজ্ঞা' (اَلتَّعْرِيْفُ اللَّفْظِيُّ)।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা

শাব্দিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এভাবে দেওয়া হয়েছে,

أَنْ يَكُوْنَ اللَّفْظُ وَاضِحَةُ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمَعْنَى،

–নির্ধারিত শব্দ স্পষ্টরূপে তার অর্থ নির্দেশ করবে।

উল্লিখিত শাব্দিক সংজ্ঞার আলোকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই গ্রন্থে ব্যবহৃত اَلتَّعْرِيْفُ (সংজ্ঞা) শব্দটি তার মুখ্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে এবং পূর্বে মস্তিষ্কে ধারণকৃত চিত্রের একটিকে স্পষ্ট করে তোলে।

(২) নাহবি সংজ্ঞা

اَلتَّعْرِيْفُ النَّحْوِيُّ দ্বারা নাহুশাস্ত্রে আলোচিত مَعْرِفَةٌ তথা নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক বিশেষ্যকে বোঝানো হয়।

'মা'রিফাহ' (مَعْرِفَةٌ)'র সংজ্ঞা

مَا وُضِعَ لِيَدُلَّ عَلَى شَيْئٍ بِعَيْنِهِ،

–যে শব্দটি নির্দিষ্ট কোনো অর্থ বোঝানোর উদ্দেশ্য গঠিত, তাকে 'মা'রিফাহ' (مَعْرِفَةٌ) বলা হয়।

'মা'রিফাহ' (مَعْرِفَةٌ)'র প্রকারসমূহ

'মা'রিফাহ' (مَعْرِفَةٌ)'র সাতটি প্রকার রয়েছে। নিচে সেগুলোর আলোচনা করা হলো–

(১) اَلْمُضْمَرَاتُ: সর্বনাম।

(২) اَلْإِشَارَاتُ: নির্দেশসূচক বিশেষ্য।

(৩) اَلْمَوْصُوْلَاتُ: সম্বন্ধবাচক বিশেষ্য।

(৪) اَلْمَعْرِفَةُ بِاللَّامِ: اَلْ দ্বারা গঠিত مَعْرِفَةٌ।

(৫) أَعْلَامٌ: ব্যক্তি, বস্তু বা স্থানের নির্দিষ্ট নাম।

(৬) اَلْمَعْرِفَةُ بِالنِّدَاءِ: সম্বোধনসূচক অব্যয় দ্বারা গঠিত مَعْرِفَةٌ।

(৭) اَلْإِضَافَةُ: সম্বন্ধকারক।

(১) 'আল-মুযমিরাত' (اَلْمُضْمَرَاتُ): সর্বনাম

যে-সব বিশেষ্য উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ বা নাম পুরুষকে নির্দেশ করে, তাকে 'ইসমে মুযমার' (اِسْمُ مُضْمَرٌ) বা সর্বনাম বলা হয়। যেমন– 'হুওয়া' (هُوَ) (সে

[পুরুষ]), 'হিইয়া' (هِيَ) (সে [মহিলা]), 'আন্‌তা' (أَنْتَ) (তুমি [পুরুষ]), 'আন্‌তি' (أَنْتِ) (তুমি [মহিলা]) এবং 'আনা' أنَا (আমি [পুরুষ/মহিলা]) ইত্যাদি।

(২) 'আল ইসারাত' (اَلْإِشَارَاتُ): নির্দেশসূচক বিশেষ্য

ইসমে ইশারা ব্যবহার করার দ্বারা কোনো শব্দ নির্দিষ্ট হয়ে যায়। যেমন- ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ।

(৩) 'আল-মাওসুলাত' (اَلْمَوْصُوْلَاتُ): সম্বন্ধবাচক বিশেষ্য

ইসমে মাউসুল দ্বারাও শব্দের নির্দিষ্টতা অর্জিত হয়। যেমন– 'আল্লাযী' (اَلَّذِيْ)। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, هُوَ اللهُ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ।

(৪) 'আল-মা'রিফ বিল্‌-লাম' اَلْمَعْرِفُ بِاللَّامِ: اَلْ দ্বারা গঠিত 'মা'রিফাহ' (مَعْرِفَةٌ)

কোনো শব্দের শুরুতে 'আলিফ-লাম' (اَلْ) যোগ করা হলেও শব্দটি 'মা'রিফাহ' (مَعْرِفَةٌ) তথা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। 'আলিফ-লাম' (اَلْ) চারভাগে বিভক্ত। যথা–

(ক) 'আল-ইসতিগরাকী' (اَلْاِسْتِغْرَاقِيُّ): সমষ্টিবাচক 'আলিফ-লাম' (اَلْ) এটা যে শব্দের শুরুতে আসে, তার সমষ্টিকে বোঝায়। যেমন– إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ।

(খ) 'আল-জিনসী' (اَلْجِنْسِيُّ): জাতিবাচক 'আলিফ-লাম' (اَلْ)। এটা যে শব্দের শুরুতে আসে, তার জাতিসত্তা বা শ্রেণিকে নির্দেশ করে। যেমন- اَلرَّجُلُ خَيْرٌ مِنَ الْمَرْأَةِ।

(গ) 'আল 'আহদুল খারেজী' (اَلْعَهْدُ الْخَارِجِيُّ): এটা যে শব্দের শুরুতে আসে, তার নির্দিষ্ট একটি অংশকে বোঝায়। যেমন– فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ।

(ঘ) 'আল-আহদুয্ যাহনী' (اَلْعَهْدُ الذِّهْنِيُّ): এটা যে শব্দের শুরুতে আসে, তার অনির্দিষ্ট কোনো অংশকে বোঝায়। যেমন– اَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ।

'আলিফ-লাম 'আহদী' (اَلِفْ لَامْ عَهْدِيْ)'র দুটি প্রকার রয়েছে। যথা–

(ক) নির্দেশিত বস্তু কল্পনায় থাকলে 'আহদে যিহনী' (عَهْدِ ذِهْنِيْ) বলা হয়। যেমন– اَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ।

(খ) নির্দেশিত বস্তুর বাহ্যিক অবস্থিতি থাকলে 'আহদে খারেজী' (عَهْدُ خَارِجِيْ) বলা হয়। যেমন– আল্লাহর বনী: اللهُ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ، اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ.

(৫) 'আল-আ'আলাম' (اَلْأَعْلَامُ): ব্যক্তি, বস্তু বা স্থানের নির্দিষ্ট নাম। এটা দু প্রকারের। যথা–

(ক) 'আল-ইলমুশ্ শাখসী' (اَلْعِلْمُ الشَّخْصِيُّ): ব্যক্তিবাচক;

(খ) 'আল-ইলমুজ্ জিনসী' (اَلْعِلْمُ الْجِنْسِ): জাতি/শ্রেণিবাচক।

অনুরূপ 'আলাম' (عَلَمٌ)-এর আরো একটি প্রকার রয়েছে, যা নিম্নরূপ: 'আলাম' (عَلَمٌ) কখনো বিশেষ্য হয়। যেমন زَيْدٌ (জায়দ)। কখনো উপাধি হয়। যেমন– زَيْنُ الْعَابِدِيْنَ। কখনো উপনাম হয়। যেমন– أَبُوْ بَكْرٍ, أَبُوْ تُرَابٍ প্রভৃতি।

(৬) 'আল-মা'রিফা বিন্‌-নেদা' (اَلْمَعْرِفَةُ بِالنِّدَاءِ): সম্বোধনসূচক অব্যয়-যোগে গঠিত 'মা'রিফাহ' (مَعْرِفَةٌ): যেমন– يَا رَجُلُ।

(৭) 'আল-ইযাফাহ' (اَلْإِضَافَةُ): সম্বন্ধকারক। কোনো বিশেষ্যকে অপর কোনো বিশেষ্যের দিকে সম্বন্ধ করা হলে সেটা 'মা'রিফাহ' (مَعْرِفَةٌ) হয়ে যায়। যেমন– غُلَامُ زَيْدٍ।

উপরে বর্ণিত নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক উপকরণ-যোগে গঠিত 'মা'রিফাহ' (مَعْرِفَةٌ)কে 'তা'রীফু নাহভী' (تَعْرِيْفُ نَحْوِيْ) বলা হয়। কাযী আয়ায প্রণীত 'আশ্-শিফা বিতা'রীফি হুকুকিল মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' (اَلشِّفَاءُ بِتَعْرِيْفِ حُقُوْقِ الْمُصْطَفٰى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) গ্রন্থের বাক্যের 'তা'রীফ' (تَعْرِيْفٌ) শব্দটা 'তা'রীফু নাহভী' (تَعْرِيْفُ نَحْوِيْ)'র আওতাধীন নয়। উপরে 'তা'রীফু নাহভী'

(تَعْرِيفُ نَحْوِيٌّ)'র বর্ণনা দেওয়া হলো। সুফিগণের কাছে 'তা'রীফ' (تَعْرِيف) এর ভিন্ন সংজ্ঞা রয়েছে।

তাসাওফের দৃষ্টিতে 'মা'রিফাহ' (مَعْرِفَةٌ)'র পরিচয়

إِدْرَاكُ الشَّيْءِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ.

–কোনো বস্তুর বাস্তবতার জ্ঞান অর্জন করাকে তাসাওফের ভাষায় مَعْرِفَةٌ বলা হয়।

এই পরিচিতি অর্জনের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দরবারে দোয়া করতেন। তিনি বলতেন,

اَللّٰهُمَّ أَرِنِيْ حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ كَمَا هِيَ.

–হে আল্লাহ, আমাকে বস্তুর প্রকৃতিগত জ্ঞান দান করো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন, আল্লাহ যেন তার কাছে বস্তুগত সূক্ষ্মতা বিকশিত করে দেন।

'মা'রিফাহ' (مَعْرِفَةٌ) হতে 'মা'আরূফ' (مَعْرُوْفٌ) শব্দ গঠিত হয়। নাহুশাস্ত্রে 'মা'আরূফ' (مَعْرُوْفٌ) নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়, যার বিপরীত শব্দ 'মাজহূল' (مَجْهُوْلٌ) তথা অজানা। হাদিস-শাস্ত্রেও 'মা'আরূফ' (مَعْرُوْفٌ) শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়। এটা গ্রহণযোগ্য হাদিসের একটি প্রকার, যার বিপরীত শব্দ 'মুনকার' (مُنْكَرٌ)। মুনকার হাদিস বলা হয়– যে হাদিসে এমন কোনো বর্ণনাকারী রয়েছেন, যিনি অত্যধিক ভ্রান্তির শিকার অথবা যার ব্যাপারে পাপাচারে লিপ্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

হাদিস-শাস্ত্রে মুনকার হাদিসে সংজ্ঞা এভাবে এসেছে–

اَلْمُنْكَرُ حَدِيْثٌ رَوَاهُ ضَعِيْفٌ فَخَالَفَ لِمَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ مِنَ الثِّقَاتِ وَمَقَابِلُ بِالْمَعْرُوْفِ.

–যে হাদিস কোনো দুর্বল বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন, যা বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর বিরোধী হয়– তাকে মুনকার বলা হয়। এর বিপরীত হাদিসকে مَعْرُوْفٌ বলা হয়।

(৩) বস্তুগত সংজ্ঞা

মানতিক তথা দর্শন-শাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা ও উসুল-প্রণেতাদের কাছে 'তা'রীফ' (تَعْرِيْفٌ) শব্দের পৃথক পৃথক পরিচয় রয়েছে। এটা বস্তুগত সংজ্ঞার সেই অংশ, যা কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তার রচিত 'শিফা' গ্রন্থে ব্যবহার করেছেন।

যুক্তিবিদ্যার মতে 'তা'রীফ' (تَعْرِيْفٌ)'র সংজ্ঞা হলো– কিছু জ্ঞাত বা জানা যুক্তি, যা অজানা বিষয়ের পথ নির্দেশ করে।

اَلطَّرِيْقُ الْمُوْصِلُ إِلَى الْمَطْلُوْبِ التَّصَوُّرِيِّ.

–আবার, জানা বাক্যসমূহকে এভাবে সাজানো, যা অজানা বিষয়ের জ্ঞানার্জনে সহায়তা করে। অর্থাৎ গন্তব্য-প্রদর্শনকারী সরণীকে যুক্তিবিদ্যার ভাষায় تَعْرِيْفٌ বলা হয়। বলা হয়েছে–

اَلْمَطْلُوْبُ التَّصَوُّرِيُّ يُوْصَلُ إِلَيْهِ بِطَرِيْقِ التَّعْرِيْفِ.

–যে পদ্ধতি অবলম্বন করে গন্তব্যে পৌঁছানো যায়, তাকে مُعَرِّف বলা হয়।

কতিপয় যুক্তিবিদ বা দার্শনিক ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করলেও দার্শনিকদের মতে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা হলো নিম্নরূপ:

اَلتَّعْرِيْفُ ذِكْرُ شَيْءٍ تَسْتَلْزِمُ مَعْرِفَةُ شَيْءٍ آخَرَ.

–এভাবে কোনো বস্তুর উল্লেখ করা, যা দ্বারা অন্য কোনো বস্তুর জ্ঞানার্জন আবশ্যক হয়।

মোট কথা, 'তা'রীফ' (تَعْرِيْفٌ) এমন কোনো বস্তুর নাম, যা দ্বারা উদ্দিষ্ট বস্তুর পরিচয় লাভ করা সম্ভব হয়। দার্শনিকগণ এটাকে কিঞ্চিৎ ভিন্ন সুরে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু উদ্দেশ্য বা গন্তব্য-পরিচয়ের ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে কোনো তফাৎ নেই।

উসুল-প্রণেতাগণের কাছে 'তা'রীফ' (تَعْرِيْفٌ) বলতে 'হদ' (حَدٌّ)-কে বোঝানো হয়। 'তা'রীফ' (تَعْرِيْفٌ) দ্বারা সীমিত বা নির্ধারিত বস্তু বোঝানো হয়। সুতরাং পূর্বে উল্লিখিত সংজ্ঞার আলোকে 'আত্-তারীকুল মাওসুল' (اَلطَّرِيْقُ الْمُوْصِلُ) বা

'যিকরু শাইয়িন' (ذِكْرُ شَيْءٍ) হবে, যা মূলত مُعَرِّفٌ قَوْلًا شَارِحًا مُعَرِّفًا হবে। অর্থাৎ যে বস্তু অপর কোনো বস্তুর ব্যাখ্যা প্রদান করে, বা যা অন্য কোনো বস্তুর সূক্ষ্মতা বিকশিত করে দেয়।

উপরিউক্ত অর্থবিবেচনায় قَوْلُ شَارِحٍ ধারণাটি 'তা'রীফ' (تَعْرِيْفٌ)-এর সমার্থক; অপর দিকে উসুল-প্রণেতাদের 'তা'রীফ' (تَعْرِيْفٌ) হলো 'হদ' (حَدٌّ) বা সীমা। সুতরাং 'মুয়ার্‌রিফ' (مُعَرِّفٌ) দ্বারা নির্ধারিত বা বিশেষিত বস্তুই উদ্দেশ্য। 'আত্-তারীকুল মাওসুল' (اَلطَّرِيْقُ الْمَوْصَلُ) তথা গন্তব্য নির্দেশকারী পথ হলো- যা প্রতিকার, আরোগ্য, দোয়া, মুক্তি, সফলতা, সামঞ্জস্য, সন্তুষ্টি প্রভৃতির পথ সুগম করে দেয়। যে পথে এসব উপকার অর্জিত হয়, সেটা হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিষ্টাচার, মর্যাদা, পরিচিতি, চরিতসমগ্রতা প্রভৃতি হলো মানসিক রোগমুক্তির কারণ। এটা অন্তরের প্রশান্তি আনে এবং হৃদয়কে প্রফুল্ল করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিচিতি অর্জনের মাধ্যমে শেফা নসিব হয়। এ শেফাই আমাদের মৌলিক উদ্দেশ্য। কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কথা মতে এই গ্রন্থ পাঠ করার উদ্দেশ্য হলো- শেফার সমস্ত অর্থ সম্পর্কে অবগত হওয়া, যা পাঠকের রোগমুক্তির কারণ হয়। আর এই রোগমুক্তি অর্জিত হয় একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে পরিচিত হবার মাধ্যমে।

উসুল-প্রণেতাদের কাছে শেফার অর্জন সীমিত, যা একমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিচিতি অর্জনের উপর নির্ভরশীল। তারা এই ধারণাকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক রোগমুক্তির লক্ষ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্র-মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার বিকল্প নেই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিচিতি লাভ কেন জরুরি?

এই প্রশ্নের উত্তর হলো- অধিকার সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করলে মানুষ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তা সম্পর্কে অবগত হতে পারে। অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি না হলে তার সাথে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠবে না। বান্দার অধিকারসমূহ এ জন্য নির্ধারিত করা হয় যে, এগুলোর মাধ্যমে যেন

আল্লাহর বান্দাদের সাথে সুষ্ঠু সম্বন্ধ তৈরি করা সম্ভব হয়, এবং এটার সাহায্যে উপকারিতা, বরকত, সুফল ও সৌভাগ্য অর্জিত হয়। অধিকার-সচেতনতা সম্পর্কের শুদ্ধতার উপর নির্ভর করে, আর সম্পর্কের শুদ্ধতা নির্ভর করে অধিকার সম্পর্কে পরিচিত হওয়ার উপর।

কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই গ্রন্থের সাহায্যে এ ধারণা পাঠকের মাঝে উপ্ত করতে চান যে, অন্তর ও হৃদয়ের ব্যাধি, ঈমান ও আকিদার ভ্রান্তির একমাত্র চিকিৎসা হয় রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধিকার সম্পর্কে পরিচয় লাভ করার মাধ্যমে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধিকার সম্পর্কে পরিচিত হবার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো- তার প্রতি করণীয় ও কর্তব্য সুষ্ঠুরূপে আদায় করা। এটুকু সম্ভব হলে বরকত ও সৌভাগ্য অর্জিত হবে, যা সমস্ত ব্যাধির প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে।

এটা যেন গোটা পুস্তকের নামের সারমর্ম, যা কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বিশেষরূপে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। এখানে বিশেষিতকরণের পাশাপাশি বিপরীত ধারণাকে অস্বীকার করা হয়েছে। গুরুত্বের এই ব্যঞ্জনায় এক প্রগাঢ় পরিচয়-দর্শন নিহিত রয়েছে। গ্রন্থকার এখানে 'তা'রীফ' (تَعْرِيْفٌ) শব্দ ব্যবহার না করে এভাবে বলতে পারতেন 'আশ-শিফা বিতা'রীফি হুকুকিল মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' (اَلشِّفَاءُ بِتَعْرِيْفِ حُقُوْقِ الْمُصْطَفٰى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) এতে 'বা' (ب) অক্ষর তার সমুদয় অর্থে ব্যবহৃত হতে পারতো। বিশেষণ ছাড়াও সে-সব বিষয়ও এখানে বোধ্য হতে পারতো, যা তিনি 'তা'রীফ' (تَعْرِيْفٌ) শব্দ যোগ করে বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু বিশেষণের পাশাপাশি বিপরীত ধারণার না-বোধকতার লক্ষ্যে তিনি শব্দচয়নের এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

'তা'রীফ' (تَعْرِيْفٌ) শব্দ ব্যবহারের কারণ

কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'বিতা'রীফি হুকুকিল মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' (بِتَعْرِيْفِ حُقُوْقِ الْمُصْطَفٰى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) বাক্যাংশ যোগ করে পাঠকের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করতে চান যে, পাঠক যদি শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও বিশ্বাসগত রোগ হতে মুক্তির জন্য এটা ব্যবহার করতে চান, তাহলে সেটা প্রকৃত 'শিফা' রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিচিতি-লাভের সাথে বিশেষিত। শেফাকে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর অধিকার ও কর্তব্যের সাথে বিশেষিত করার কারণ হলো- এটা ব্যতীত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। মোটকথা, হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন তাঁর অধিকার সম্পর্কে পরিচিতি-লাভ এবং তা মেনে নেওয়ার মাঝে সীমাবদ্ধ। সুতরাং যার সাথে উক্ত দরবারের সম্পর্ক স্থাপিত হবে- এই সম্পর্কের মাধ্যমে- তার সৌভাগ্য অর্জিত হবে।

যুক্তি-শাস্ত্রের বিধানানুযায়ী এর ফলাফল পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, শেফা রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুগ্রহের সাথে সীমাবদ্ধ। بِتَعْرِيْفِ শব্দ দ্বারা অর্জিত তিন প্রকারের বিশেষিত অবস্থার সারমর্ম হলো- ঈমান ও আকিদাগত ভ্রান্তি এবং শারীরিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাধি দূরীকরণ একমাত্র সম্ভব হবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধিকার-করণীয় ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং তা অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নেওয়া সম্ভব হলে; অন্য কোনো পদ্ধতিতে নয়।

পর্যবেক্ষণ করলে তিন ধরনের বিশেষিত অবস্থা দৃষ্টিগোচর হয়। 'বা' (ب) অক্ষরটি এক ধরনের বিশেষিত অবস্থা নির্দেশ করে। পরবর্তী 'ইযাফাত' (إِضَافَتْ) (সম্বন্ধকারক)-এ আরেক ধরনের বিশেষণ বিদ্যমান। এটা যেন সম্বন্ধের মাঝে আরেক সম্বন্ধ এবং এক বিশেষণের মাঝে আরেক বিশেষণ। এতে গ্রন্থকার বোঝাতে চান যে, ঈমান, আকিদা, অন্তর ও আত্মার আরোগ্য কিছুতেই সম্ভব না- একমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামে র দরবারের সাথে পরিচিতি অর্জন ছাড়া। তিনি মানুষদের আহ্বান করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্তর, সৌন্দর্য ও গুণাবলির পরিচয় অর্জন করো; তার বড়ত্ব, মহত্ত্ব, উচ্চাসনের পরিচয় লাভ করো। এই দরবারের সাথে তোমাদের সম্পর্ক স্থির হলে এবং এটা বিশুদ্ধতার সাথে হলে সে-সব সৌভাগ্য তোমাদের ভাগ্যে জুটবে, যা ওই দরবারের সাথে বিশেষিত। সে-সব অনুগ্রহের দুয়ার তোমাদের জন্য খুলে গেলে তখন শুধু শেফাই শেফা। তখন জীবনে আর কোনো ধরনের ব্যাধির আক্রমণ থাকবে না। এটা হলো এই গ্রন্থের আলোচ্যবিষয়ের অর্থ ও তাৎপর্য।

'হুকূক' (حُقُوْق)-এর শাব্দিক আলোচনা

ব্যবহৃত হয়েছে। অভিধান ও ভাষাতত্ত্বের তথ্যানুযায়ী শব্দটির অনুরূপ অর্থসমূহ পাওয়া যায়।

'হক্কুন' (حَقٌّ) শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য

শব্দটা যে-সব অর্থে ব্যবহৃত হয়, তার বিস্তারিত আলোচনা দরকার। নিচে সেগুলো আলোচিত হলো।

(১) 'ইসমে ইলাহী' (اِسْمِ اِلٰهِي): আল্লাহর নাম হিসেবে

'হক্কুন' (حَقٌّ) শব্দের প্রথম অর্থ হলো- এটা আল্লাহর নামসমূহের একটি। কিন্তু মনে রাখা দরকার, শব্দটা 'হুকূক' (حُقُوْق) তথা বহুবচনে ব্যবহৃত হলে এটা আল্লাহর নাম হিসেবে থাকে না। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ.

—এটা এ জন্য যে, একমাত্র আল্লাহই সত্য।[১]

উদ্ধৃত আয়াতে আল্লাহকে 'হক্কুন' (حَقٌّ) বলা হয়েছে।

(২) 'দ্বিদ্দুল বাতেল' (ضِدُّ الْبَاطِلِ): বাতিলের বিপরীত অর্থ

বাতিলের বিপরীতার্থক হিসেবে 'হক্কুন' (حَقٌّ) শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে—

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.

—হক এসে গেলো; বাতিল বিলুপ্ত হলো। বাতিলের ধর্মই বিলুপ্ত হওয়া।[২]

উদ্ধৃত আয়াতকে বিপরীত অর্থবোধক আয়াত বলা হয়ে থাকে। কুরআন-বিশেষজ্ঞগণ হক দ্বারা ইসলাম এবং বাতিল দ্বারা কুফরিকে বুঝিয়ে থাকেন। তার প্রমাণ হলো নিচের আয়াত—

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ.

—হককে বাতিলের সাথে মিশ্রিত করো না।[১]

---

[১]. আল কুরআন : সূরা হজ্ব, ২২:৬।
[২]. আল কুরআন : সূরা বনী ইসরাইল, ১৭:৮১।

এই আয়াতও হক ও বাতিলের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। এটা হকের দ্বিতীয় ব্যবহারও বটে।

(৩) 'আল-আমরুল মুকতাদা' (اَلْأَمْرُ الْمُقْتَضٰى): গৃহীত সিদ্ধান্ত

'আল-আমরুল মুকতাদা' (اَلْأَمْرُ الْمُقْتَضٰى)-এর অর্থ হলো গৃহীত সিদ্ধান্ত। গৃহীত ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে হক বলা হয়। কুরআন মাজীদে এটা এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যে, সিদ্ধান্ত এভাবে দিতে হবে, যেন হক ও বাতিল স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ.

–যেন হককে হক প্রমাণিত করা হয় এবং বাতিলতে বাতিল সাব্যস্ত করা হয়; যদিও অপরাধীরা এটাকে অপছন্দ করে।[২]

উদ্ধৃত আয়াতে 'হক্কুন' (حَقٌّ) শব্দটা সিদ্ধান্ত ও ফায়সালার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(৪) 'হক্কু বি মা'আনাল আদল' (حَقٌّ بِمَعْنَى الْعَدْلِ): ন্যায়পরায়ণতা

নীতিভিত্তিক বিচারের প্রতি নির্দেশ করে হক শব্দটা কুরআন মাজীদে এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে–

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ.

–নিঃসন্দেহে আমি তোমার প্রতি সত্য সহকারে কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যেন তুমি আল্লাহ-প্রদর্শিত পন্থায় মানুষের মাঝে ফায়সালা করতে পারো।[৩]

উদ্ধৃত আয়াতে হককে ন্যায়পরায়ণতার অর্থে এ জন্য নেওয়া হয়েছে যে, এখানে বিচারের নির্দেশটা এরকম– لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর যেভাবে ওহি অবতরণ করেছে, সেভাবে মানুষের মাঝে বিচার করো।' কারণ তোমাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কে সঠিক পথে আছে, আর কে অসত্য পথ অবলম্বন করেছে। এ সংক্রান্ত আরেকটি উদাহরণ নিম্নরূপ:

[১]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:৪২।
[২]. আল কুরআন : সূরা আনফাল, ৮:৮।
[৩]. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:১০৫।

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ.

–হে প্রভু, আমাদের ও আমাদের গোত্রের মাঝে সত্যের সাথে বিচার করে দাও; আর তুমি সবচেয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত দানকারী।[১]

(৫) 'হক্কু বি মা'আনাল মাওতি' (حَقٌّ بِمَعْنَى الْمَوْتِ): মৃত্যুর অর্থে

হকের আরেকটি অর্থ মৃত্যু। অর্থাৎ নিশ্চয়তার কারণে হককে মৃত্যুর অর্থে ব্যবহার করা হয়। মূলত এখানে হক বলতে নিশ্চিত পরিস্থিতি বোঝানো উদ্দেশ্য। কারণ হকের মাঝে সংশয়ের কোনো মিশ্রণ থাকে না, যা প্রকৃতপক্ষে 'ইয়াক্বীন' (يَقِيْنٌ) তথা নিশ্চিত পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য। সুতরাং মৃত্যু এ জন্য হক যে, কারণ এতে কোনো সংশয় নেই। এটা অবশ্যম্ভাবী। কুরআন মাজীদে এসেছে–

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ.

–মৃত্যু আসা পর্যন্ত ইবাদত করতে থাকো।[২]

কিছু কিছু তাফসিরকারী এখানে 'ইয়াক্বীন' (يَقِيْنٌ)-কে মৃত্যুর অর্থে নিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদত করতে থাকো, যতক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু না আসে। এটার আরো বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা রয়েছে। এসব আমাদের আলোচনা-বহির্ভূত, তাই এড়িয়ে যাওয়া হলো।

(৬) 'হক্কু বি মা'আনল ইয়াক্বীন' (حَقٌّ بِمَعْنَى الْيَقِيْنِ): নিশ্চয়তার অর্থে

'হক্কুন' (حَقٌّ) শব্দের উল্লেখ কুরআন মাজীদে 'যন্নুন' (ظَنٌّ) তথা ধারণার বিপরীতে এসেছে। যেমন–

إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا.

–ধারণা হককে বিদূরিত করতে পারে না।[৩] এখানে মূলত 'ইয়াক্বীন' (يَقِيْنٌ) ও 'যন্নুন' (ظَنٌّ) উদ্দিষ্ট।

[১]. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭:৮৯।
[২]. আল কুরআন : সূরা হাজর, ১৫:৯৯।
[৩]. আল কুরআন : সূরা ইউনুস, ১০:৩৬।

(৭) 'হক্কু বি মা'আনাস্ সিদ্‌কি' (حَقٌّ بِمَعْنَى الصِّدْقِ): সত্যতার অর্থে

'হক্কুন' (حَقٌّ) শব্দটা 'সিদ্‌কুন' (صِدْقٌ) তথা সত্যতার অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ.

–তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য।[১]

'হক্কুন' (حَقٌّ) প্রকৃতপক্ষে 'আদালাত' (عَدَالَةٌ)'র অন্তর্গত বিষয়। বহুল ব্যবহারের কারণে লোক-কথার সাথে সামঞ্জস্য রাখা হয়। যেমন, 'আদ্‌লুন' (عَدْلٌ) শব্দের অর্থ হলো– ন্যায়পরায়ণতা। কিন্তু আধিক্য বোঝানোর জন্য শব্দটা 'আ-দিলুন' (عَادِلٌ) তথা ন্যায়পরায়ণের অর্থে ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে, 'রব্‌বুন' (رَبٌّ) শব্দের মূল অর্থ হলো- লালন পালন করা। কিন্তু অত্যাধিক বোঝানোর লক্ষ্যে শব্দটা 'মুরব্‌বী' (مُرَبِّيْ) তথা 'লালন-পালনকারী' অর্থে ব্যবহার করা হয়।

(৮) 'হক্কু বি মা'আনাস্ সাবিত ওয়াল মাওজুদ' (حَقٌّ بِمَعْنَى الثَّابِتُ وَالْمَوْجُوْدُ): 'বিদ্যমান' ও 'অস্তিত্বমান' অর্থে

অনেকে 'হক্কুন' (حَقٌّ)-এর অর্থ এভাবে লিখেছেন–

اَلْحَقُّ هُوَ مَا لَا يُفْتَقِرُ فِيْ وُجُوْدِهٖ اِلٰى غَيْرِهٖ،

–যা নিজের অস্তিত্বের জন্য অপরের মুখাপেক্ষী নয়।

এখানে সাধারণভাবে অস্তিত্বমান বস্তু বোঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং যা নিজে নিজে অস্তিত্বমান, তা-ই উদ্দেশ্য।

اَلْحَقُّ يُطْلَقُ عَلَى الْوُجُوْدِ الدَّائِمِ،

–যা স্থায়ীভাবে বিদ্যমান, তাকে হক বলা হয়।

লক্ষণীয় যে, যা নিজের অস্তিত্বের জন্য কারো মুখাপেক্ষী নয়, তাকে قَائِمٌ بِذَاتِهٖ বলা হয়; এবং সেটাকে وَاجِبُ الْوُجُوْدِ এবং دَائِمُ الْوُجُوْدِ ও مَوْجُوْدٌ بِذَاتِهٖ বলা

[১]. আল কুরআন : সূরা হুদ, ১১:৪৫।

হয়। এই বৈশিষ্ট্য যেহেতু আল্লাহর জন্য বিশেষিত, সেহেতু دَائِمُ الْوُجُوْدِ ও مَوْجُوْدٌ بِذَاتِهٖ হক।

(৯) 'হক্কু বি মা'আনাস্ সাবেত ওয়াল ওয়াজিব' (حَقٌّ بِمَعْنَى الثَّابِتُ وَالْوَاجِبُ): 'প্রমাণিত' ও 'অবধারিত' অর্থে

উল্লিখিত অর্থে শব্দটার ব্যবহার কুরআন মাজীদে এভাবে এসেছে–

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ.

–মু'মিনদের সাহায্য করা আমার জন্য অবধারিত।[১]

এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো কিছু নিজের জন্য অবধারিতরূপে গ্রহণ করেন এবং তা বাস্তবায়িত হয়, তখন তা আবশ্যক হয়ে যায়।

(১০) 'হক্কু বি মা'আনাল হায্‌যি' (حَقٌّ بِمَعْنَى الْحَظُّ): 'অংশ' অর্থে

অংশের অর্থে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন জায়গায় হক শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-

(١) وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ.

১. তাদের সম্পদে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের অংশ (অধিকার) রয়েছে।[২]

(٢) وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ.

২. ফসল-কর্তনের দিন তার অংশ প্রদান করো।[৩]

(٣) فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ معلوم لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ.

৩. তাদের সম্পদে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের জন্য রয়েছে নির্ধারিত অংশ।[৪]

(٤) وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ.

৪. আত্মীয়দের তাদের অংশ প্রদান করো; দরিদ্র ও মুসাফিরদেরও (প্রদান করো)।[৫]

[১]. আল কুরআন : সূরা রূম, ৩০:৪৭।
[২]. আল কুরআন : সূরা যারিয়াত, ৫১:১৯।
[৩]. আল কুরআন : সূরা আন'আম, ৬:১৪১।
[৪]. আল কুরআন : সূরা মা'আরিজ, ৭০:২৪।

উপরিউক্ত অর্থসমূহ ছাড়াও 'হক্কুন' (حَقٌّ)-এর আরো বিভিন্ন ধরন রয়েছে। যেমন–

(ক) 'মুতাবিক্বাল হুকুম' (مُطَابَقَةُ الْحُكْمِ): নির্দেশ-পালন

শাসক বা কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালন করা।

(খ) 'মুতাবিক্বাল ওয়াক্বিয়ি' (مُطَابَقَةُ الْوَاقِعِ): ঘটনার অনুরূপতা

বাস্তবিক কোনো ঘটনার সাথে অনুরূপ ও সাদৃশ্য পাওয়া গেলে তাকেও حَقٌّ বলা হয়।

(গ) 'সিফাত' (صِفَةٌ): গুণ

এখানে না-বোধকতার অর্থ পাওয়া যায়। অর্থাৎ যে-সব বস্তুর মাঝে মন্দ বা নিন্দনীয় কোনো বৈশিষ্ট্য থাকবে না, তাকে হক বলা হয়।

এ-সব হলো 'হক্কুন' (حَقٌّ) শব্দের কিছু অর্থ। এ ছাড়া কুরআন মাজীদে আরো বিভিন্ন অর্থে শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচনা দীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কায় এতটুকু উল্লেখ করা হলো।

'হক্কুন' (حَقٌّ) শব্দের বহুবচন ও সাধিত শব্দসমূহ

'হক্কুন' (حَقٌّ) শব্দের বহুবচন হলো 'হুকূক' (حُقُوقٌ)। 'হক্কুন' (حَقٌّ) হতে 'হাকীকত' (حَقِيقَةٌ) শব্দটা নির্গত হয়েছে, যা ব্যুৎপত্তি-অনুসারে 'ইয়াক্বীন' (يَقِينٌ) তথা নিশ্চয়তা নির্দেশ করে। শাস্ত্র-ভেদে এটার মর্মও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

'ইয়াক্বীন' (يَقِينٌ)'র স্তরসমূহ

বিশেষজ্ঞগণ ইয়াকিনের তিনটি স্তর নির্ধারণ করেছেন। যথা–

(১) 'ইলমুল ইয়াক্বীন' (عِلْمُ الْيَقِينِ): 'ঈমান বিল গায়েব' (إِيمَانٌ بِالْغَيْبِ) তথা অদৃশ্য বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা عِلْمُ الْيَقِينِ-এর স্তরে স্থিত, যা সচরাচর 'শরিয়ত'রূপে অভিহিত করা হয়।

১. আল কুরআন : সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:২৬।

(২) 'আইনুল ইয়াক্বীন' (عَيْنُ الْيَقِينِ): عِلْمُ الْيَقِينِ যখন ইখলাস ও নিষ্ঠার সাথে হয়, তখন তাকে عَيْنُ الْيَقِينِ বলা হয়।

(৩) 'হক্কুল ইয়াক্বীন' (حَقُّ الْيَقِينِ): প্রত্যক্ষ সত্যকে حَقُّ الْيَقِينِ বলা হয়।

ইহসানের মৌলিকতাও এখানে বিদ্যমান। নিশ্চয়তা যখন উচ্চশিখরে উপনীত হবে, তখন তাকে حَقُّ الْيَقِينِ-রূপে অভিহিত করা হবে।

উপরে বর্ণিত তিনটি অর্থই একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝা সম্ভব। যেমন, কোথাও আগুন জ্বলছে। আগুনের দহন সম্পর্কে কোনো ব্যক্তি উপরিউক্ত তিনটি পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে যেতে পারে। যেমন

(ক) দূর থেকে ধোঁয়া নির্গত হতে দেখা গেলে জানা যায় যে, আগুন জ্বলছে। এটা 'ইলমুল ইয়াক্বীন' (عِلْمُ الْيَقِينِ)-এর স্তর।

(খ) আরো কাছে এলে নিজ চোখে আগুনের দহন দেখতে পারে। এটা হলো 'আইনুল ইয়াক্বীন' (عَيْنُ الْيَقِينِ)।

(গ) নিজে আগুনে দগ্ধ হয়ে আগুনের বাস্তবতা উপলব্ধি করার নাম হলো 'হক্কুল ইয়াক্বীন' (حَقُّ الْيَقِينِ)।

'হাকীকত' (حَقِيقَةٌ) ও তার প্রকারসমূহ

حَقٌّ হতে حَقِيقَةٌ নির্গত হয়েছে, যার বিপরীত ধারণা হলো- مَجَازٌ। বিশেষজ্ঞগণ حَقِيقَةٌ-কে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যথা:

'হাকীকত' (حَقِيقَةٌ)-এর প্রথম ভাগ

এই ভাগের প্রকারসমূহ নিম্নরূপ:

(১) اَلْحَقِيقَةُ الشَّرْعِيَّةُ: শরয়ি হাকিকত।

(২) اَلْحَقِيقَةُ الْعُرْفِيَّةُ: প্রায়োগিক হাকিকত।

(১) 'আল হাকীকাতুশ্ শরয়্যিয়াহ' (اَلْحَقِيقَةُ الشَّرْعِيَّةُ): শরয়ি হাকিকত

এটাকে مَنْقُولٌ شَرْعِيٌّ-ও বলা হয়। যেমন صَلٰوةٌ শব্দটি শরিয়ত-প্রণেতা এক বিশেষ কাজের জন্য ব্যবহার করেছেন। অথচ আভিধানিকভাবে শব্দটা দোয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। পরবর্তীতে শব্দটা সাধারণের মাঝে নামাজের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে।

(২) 'আল হাকীকাতুল উরফিয়্যাহ' (اَلْحَقِيْقَةُ الْعُرْفِيَّةُ): প্রায়োগিক হাকিকত

এটাকে مَنْقُوْلٌ عُرْفِيٌّ-ও বলা হয়। যখন মানুষ কোনো সাধারণ শব্দকে বিশেষ কোনো অর্থে ব্যবহার করে, যেমন আভিধানিকভাবে دَابَّةٌ শব্দের অর্থ হলো- যা কিছু জমিনে বিচরণ করে। কিন্তু সাধারণ মানুষ শব্দটা 'চতুষ্পদ' জন্তুর জন্য ব্যবহার করে। পরবর্তীতে শব্দটার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিলুপ্ত হয়ে যায়। এটাকে حَقِيْقَتٌ عُرْفِيَّةٌ বলা হয়। অনুরূপভাবে বহুল ব্যবহারের কারণে عَدْلٌ যখন عَادِلٌ এর অর্থে ব্যবহৃত হবে, তখন এটাকে حَقِيْقَةٌ عُرْفِيَّةٌ বলা হবে।

'হাকীকত' (حَقِيْقَةٌ)-এর দ্বিতীয় ভাগ

এই ভাগের প্রকারসমূহ নিম্নরূপ:

(১) اَلْحَقِيْقَةُ الْكَامِلَةُ তথা পূর্ণাঙ্গ হাকীকত,

(২) اَلْحَقِيْقَةُ الْقَاصِرَةُ তথা অপূর্ণাঙ্গ হাকীকত।

(১) 'আল হাকীকাতুল কালেমা' (اَلْحَقِيْقَةُ الْكَامِلَةُ): প্রকৃত হাকিকত

যখন কোনো শব্দ এমন একটি অর্থ নির্দেশ করবে, যে অর্থের জন্য শব্দটা গঠিত হয়েছে, তখন তাকে حَقِيْقَةٌ كَامِلَةٌ বলা হবে। যেমন সিংহ, বাঘ ইত্যাদি। শরয়ী পরিভাষায় 'নামায' শব্দ দ্বারা সময়-মতে জামাতের সাথে আদায় করা বিশেষ প্রক্রিয়াতে বোঝানো হয়।

(২) 'আল হাকীকাতুল কাসেরাহ' (اَلْحَقِيْقَةُ الْقَاصِرَةُ): অপ্রকৃত হাকিকত

যখন কোনো শব্দ তার পূর্ণ অর্থ নির্দেশ না করে অংশবিশেষ নির্দেশ করে, তখন তাকে حَقِيْقَةٌ قَاصِرَةٌ বলা হয়। যেমন يَدٌ শব্দটা কাঁধ পর্যন্ত বোঝায়; কিন্তু মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারে এটা অংশবিশেষকে বোঝায়। كُلٌّ উল্লেখ করে جُزْءٌ-এর অর্থ নেওয়া مَجَازٌ-এর উদাহরণ। শরিয়তের পরিভাষায় জামাত-বিহীন সময়-মতে আদায় কারা নামাযকে 'নামায'রূপে অভিহিত করা حقيقة قاصرة-এর উদাহরণ।

'হাকীকত' (حَقِيْقَةٌ)-এর তৃতীয় ভাগ

এই তৃতীয় ভাগ দার্শনিকদের কাছে প্রচলিত আছে।

'হাকীকতে মুকাদ্দাসা' (حَقِيْقَةٌ مُقَدَّسَةٌ): দার্শনিকদের মতে حَقِيْقَةٌ مُقَدَّسَةٌ'র বিভিন্ন সংজ্ঞা রয়েছে। ইলমে কালামে আল্লাহর সত্তারূপ নির্ধারণে 'কালাম-শাস্ত্রবিদগণ' حَقِيْقَةٌ مُقَدَّسَةٌ শব্দের ব্যবহার করেন। অপর দিকে হুকামা (اَلْحُكَمَاءُ) ও দার্শনিকগণ নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দিয়েছেন।

اَلْوُجُوْدُ الدَّائِمُ الْقَائِمُ بِذَاتِهِ.

–এমন কোনো সত্তা, যিনি নিজে নিজেই অস্তিত্বমান ও বিদ্যমান।

'হাকীকত' (حَقِيْقَةٌ)-এর চতুর্থ ভাগ

'হাকীকত' (حَقِيْقَةٌ)-এর এই প্রকার সুফিগণের কাছে প্রচলিত। এ বন্টনানুসারে প্রকারসমূহ নিম্নরূপ:

(১) 'হাকীকতে মুত্লকা' (حَقِيْقَةٌ مُطْلَقَةٌ): حَقِيْقَةٌ مُطْلَقَةٌ বলতে অবশ্যম্ভাবীরূপে অস্তিত্বমান সত্তাকে বোঝানো হয়। এটা حَقِيْقَةٌ عُلْيًا।

(২) 'হাকীকতে মুকাইয়্যাদা' (حَقِيْقَةٌ مُقَيَّدَةٌ): এটা হলো বৈশ্বিক বাস্তবতা।

(৩) 'হাকীকতে আহাদিয়্যাহ' (حَقِيْقَةٌ أَحَدِيَّةٌ): اَلْجَمْعُ بَيْنَ الْإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيْدُ وَالْفِعْلُ وَالْاِنْفِعَالُ وَالتَّأْثِيْرُ وَالتَّأَثُّرُ. –এটা পূর্বোক্ত উভয়ের মিশেল।

ফকিহগণের মতে 'হক্কুন' (حَقٌّ) শব্দের ব্যবহার

ফকিহগণের কাছে হক বলতে অধিকারকে বোঝানো হয়, যা দিতে অপরজন বাধ্য থাকে। অর্থাৎ শরিয়ত কারো স্বাধীনতা নির্ধারণ করলে অপরজন তা রক্ষা করতে বাধ্য থাকবে।

এ সংজ্ঞায় দুটো বিষয় পাওয়া যায়। এক. ব্যক্তির অধিকার। দুই. অপরের উপর তা সংরক্ষণের আবশ্যকতা। কেউ এর ব্যত্যয় ঘটালে তা অত্যাচার বলে গণ্য হবে। এখানে حَقٌّ-এর বিপরীতে جُرْمٌ ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ اَلْجَرِيْمَةُ وَالْمَعْصِيَةُ বা পাপ ও অপরাধ।

অপরাধ (جُرْمٌ) ও পাপের (مَعْصِيَةٌ) মাঝে পার্থক্য

শরিয়তের দৃষ্টিতে অপরাধ ও পাপের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। শরিয়ত-পরিপন্থী কাজ করাকে বলা হয় পাপ; পক্ষান্তরে যে কর্মের জন্য জরিমানা নির্ধারিত করা

হয়, তা হলো অপরাধ। مَعْصِيَةٌ তথা পাপের জন্য শুধু আখিরাতের শাস্তির কথা রয়েছে। এ দিক-বিবেচনায় অপরাধের তুলনায় পাপ ব্যাপক অর্থ বহন করে। উভয়ের মাঝে عُمُوْمٌ وَخُصُوْصٌ مُطْلَقًا-এর সম্পর্ক রয়েছে, যার সম্প্রসারিত অর্থ হলো- সব পাপ অপরাধ নয়; কিন্তু সব অপরাধ পাপ।

ফিক্বহ ও ফিক্বহের আলোচ্য বিষয় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা

ফিক্বহের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে–

اَلْفِقْهُ عِلْمٌ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ،

–ফিক্বহ হলো শরয়ি বিধানসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার নাম, যা পালন করার সাথে সম্পৃক্ত।

ফিক্বহের আলোচ্য বিষয়

ফিক্বহের আলোচ্যবিষয় হলো حُكْمٌ (বিধান)।

حُكْمٌ (বিধান)-এর আলোচ্য বিষয়

এর আলোচ্যবিষয় তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যথা:

(১) বান্দার কর্মসমূহ।
(২) বান্দার অধিকারসমূহ।
(৩) বান্দার দায়িত্বসমূহ।

শরয়ি বিধান নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করে।

শরয়ি বিধানের অংশসমূহ

চারটি অংশের সমন্বয়ে এটা গঠিত। যথা–

(১) নির্দেশকারী আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
(২) নির্দেশ। কর্মবিষয়ে এটা আল্লাহর নির্দেশ।
(৩) যে কাজের জন্য নির্দেশ এসেছে।
(৪) যাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

'হুকূক' (حُقُوْقٌ) তথা অধিকারের শ্রেণিবিভাগ

ফিক্বহ–শাস্ত্রবিদগণের মতে অধিকারের চারটি প্রকার রয়েছে। প্রথমত দুটো আলোচনা করা হয়।

এক. আল্লাহর প্রতি করণীয়,
দুই. বান্দার প্রতি করণীয়।

প্রত্যেক প্রকারের আরেকটি প্রকার রয়েছে।। বিস্তারিত নিম্নরূপ:

(১) আল্লাহর অধিকার।
(২) বান্দার অধিকার।
(৩) প্রথমটির অগ্রাধিকারপূর্বক উভয়ের মাঝে সমন্বয়-সাধন।
(৪) দ্বিতীয়টির অগ্রাধিকারপূর্বক উভয়ের মাঝে সমন্বয়-সাধন।

(১) আল্লাহর অধিকার

আল্লাহর অধিকার বলতে ইবাদত, পূর্ণ ও অপূর্ণ শাস্তিকে বোঝানো হয়ে থাকে। পূর্ণ শাস্তি, যেমন حُدُوْدٌ। অপূর্ণ শাস্তি, যেমন উত্তরাধিকার-বঞ্চিত হওয়া হত্যা প্রভৃতি কারণে। এসব শাস্তি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। অনুরূপভাবে কাফফারা, উশর, ট্যাক্স, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ইত্যাদি حُقُوْقُ اللهِ'র অন্তর্ভুক্ত। সামাজিক অধিকারও حُقُوْقُ اللهِ'র আওতাধীন।

'হুকুকুল্লাহ' (حُقُوْقُ اللهِ)'র নামকরণের কারণ

এসব অধিকারকে حُقُوْقُ اللهِ এ জন্য বলা হয় যে, এগুলোর সংরক্ষণ বান্দার জন্য অপরিহার্য এবং সরকারের উপর এগুলো বাস্তবায়ন করা ওয়াজিব। এসব যেহেতু আল্লাহর অধিকার, তাই এগুলো কখনো বিলুপ্ত হয় না।

(২) বান্দার অধিকার

حُقُوْقُ الْعِبَادِ দ্বারা মানুষের মৌলিক অধিকারকে বোঝানো হয়, যা সমাজ-ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরস্পরের করণীয়রূপে নির্ধারিত। মোটকথা, মানুষের জন্য সুরক্ষিত অধিকারসমূহ حُقُوْقُ الْعِبَادِ-এর অন্তর্ভুক্ত। মানবাধিকারসমূহ নিম্নরূপ:

(১) حَقُّ النَّفْسِ (বেঁচে থাকার অধিকার)।
(২) حَقُّ الْحُرْمَةِ (মান-সম্মানের অধিকার)।
(৩) حَقُّ الْمِلْكِ (সম্পত্তির অধিকার)।
(৪) حَقُّ الزَّوْجِيَّةِ (বিয়ে করার অধিকার)।
(৫) حَقُّ الْوِلَايَةِ (পছন্দ-নির্বাচনের অধিকার)।

(৬) حَقُّ الْإِرْثِ (উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকার)।

(৭) حَقُّ التَّصَرُّفِ (সম্পদ-ব্যয়ের অধিকার)।

উপরে বর্ণিত অধিকারসমূহ মানুষের ইচ্ছাধীন। মানুষ ইচ্ছে করলে এগুলো বর্জন করতে পারে।

(৩) প্রথমটির অগ্রাধিকারপূর্বক উভয়ের মাঝে সমন্বয়-সাধন

যে-সব অধিকারে আল্লাহ ও বান্দার অধিকার একত্রে থাকে, সেগুলো তৃতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আল্লাহর দিকটা এখানে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হয়। যেমন حَدُّ الْقَذْفِ (অপবাদের শাস্তি)।

'আল-ক্বযফ্' (اَلْقَذْفُ)-এর সংজ্ঞা

আহনাফের মতে 'অপবাদ'কে তৃতীয় শ্রেণির তালিকাভুক্ত করার জন্য এখানে আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের অধিকারের সমন্বয় ঘটা জরুরি। এখানে মান-সম্মানের অধিকার হরণের বিষয়টা জড়িত, যা বান্দার অধিকার; কিন্তু আল্লাহর অধিকার জড়িত থাকায় মানুষ এটা ক্ষমা করতে পারে না। কারণ এখানে মানব-সত্তাকে অপমানিত করা হয়েছে।

শাফেয়িদের মতে, এখানে দ্বিতীয় শ্রেণির প্রাধান্য বিদ্যমান। তাই তারা এটাকে চতুর্থ শ্রেণির তালিকাভুক্ত করেন।

(৪) দ্বিতীয়টির অগ্রাধিকারপূর্বক উভয়ের মাঝে সমন্বয়-সাধন

মানুষ যে-সব অধিকার ছেড়ে (ক্ষমা করে) দিতে পারে, সেগুলো এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। যেমন প্রতিশোধের বিষয়টা। কেউ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করলে নিপীড়িত ব্যক্তি চাইলে হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিবে। এটা যদিও আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের অধিকার, তবু এখানে বান্দার অধিকারের অগ্রাধিকার রয়েছে। কারণ এখানে স্বাধীনতাকে বান্দার প্রতি সোপর্দ করা হয়েছে।

উপরিউক্ত বিভাগের আলোকে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধিকারসমূহ প্রথম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। কারণ সেগুলো আল্লাহর অধিকারের শ্রেণিভুক্ত।

এখানে মনে রাখা দরকার যে, মানুষের সমস্ত অধিকার 'মানবাধিকারের' আওতাভুক্ত। সুতরাং বেঁচে থাকার অধিকার ও মান-সম্মানের অধিকার 'মানবাধিকারের' অন্তর্গত। পক্ষান্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

সমস্ত অধিকার 'আল্লাহর অধিকারের' অন্তর্গত। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে, আল্লাহ ও রাসূলের অধিকারসমূহ একে অপরের সাথে সন্নিবদ্ধ। উভয়ের মাঝে 'পারস্পরিক পরিপূরকের' সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু আমার মতে তা মনে হয় না। কারণ আমি এ ক্ষেত্রে অভিন্নতার প্রবক্তা। উভয়ের মাঝে 'পরিপূরকের' সম্বন্ধ স্থির করা হলে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়; অথচ আল্লাহ ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অধিকারের মাঝে কোনোরূপ ভিন্নতা নেই। উভয়ের মাঝে অভিন্ন ও অনুরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান। এখানে যে একতা পাওয়া যায়, তা হলো ফলাফলগত একতা।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

উপরে বর্ণিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় এ-রকম যে, রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অধিকারসমূহ আল্লাহর অধিকারের আওতাভুক্ত, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অধিকারসমূহ খর্ব করা হলে তা ক্ষমা করে দিতে পারে কী করে?

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ক্ষমাপ্রদর্শনকারী ও পৃথিবীর জন্য রহমতরূপে প্রেরণ করেছেন। যদি অনুগ্রহবশত তিনি মার্জনা করে দেন, তবে এটা তাঁর ইচ্ছাধীন।

রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইচ্ছাধীন শরয়ি বিষয়সমূহ

আল্লাহ তা'আলা শরিয়তের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বাধীনতা দান করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ এটা উল্লেখ করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা নির্বিশেষে সমস্ত মৃত প্রাণীকে হারাম করেছেন। যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে–

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ.

–তোমাদের জন্য মৃতকে হারাম করা হয়েছে।[১]

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ.

–আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য মৃতকে হারাম করেছেন।[২]

---

১. আল কুরআন : সূরা মায়েদা, ৫:৩।
২. আল কুরআন : সূরা ২:১৭৩।

এ জাতীয় নিষেধাজ্ঞা কুরআন মাজীদের চারটি স্থানে এসেছে। কোথাও কোনো প্রাণীকে পৃথক করা হয় নি। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথক করে বলেন,

كُلُّ مَيْتَةٍ حَرَامٌ إِلَّا مَيْتَتَانِ: السَّمَكُ وَالْجَرَادُ.

–সমস্ত মৃত প্রাণী হারাম– একমাত্র মাছ ও ফড়িং ব্যতীত।[১]

কুরআন মাজীদে কোনো প্রাণীকে পৃথক করা হয় নি; তবু রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটো প্রাণীকে উক্ত বিধান হতে পৃথক করেছেন। এই স্বাধীনতা অবশ্য সুপ্ত ওহির মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে।

সুতরাং মনে রাখতে হবে যে, অনুগ্রহবশত কাউকে চাইলে তিনি ক্ষমা করে দিতে পারেন। এমনকি তিনি চাইলে কোনো বিধানকে বিশেষিত করতেও পারেন। কোনো মানুষের জন্য এই অধিকার নেই। তারা চাইলে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি অসদ্ব্যবহারকারীকে ক্ষমা করতে পারবে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধিকারসমূহ

কুরআন ও সুন্নাহকে পুরোপুরিভাবে অধ্যয়ন করলে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছয়টি অধিকার পাওয়া যায়। প্রত্যেক অধিকারের কিছু শর্ত, দাবি ও সৌজন্য রয়েছে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিতসমগ্রতার প্রতি নির্দেশ করে বলেন,

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

–অতঃপর যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো, তাকে সম্মান ও সহযোগিতা করলো এবং তার সাথে অবতীর্ণ আলোর অনুসরণ করলো, তারাই প্রকৃত সফলকাম।[২]

উদ্ধৃত আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চারটি অধিকার প্রমাণিত হয়। যথা–

১. বিশ্বাস-স্থাপন।

[১]. ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবুস্ সয়য়িদি, ২:১০৭৩, হাদিস : ৩২১৮।
[২]. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭:১৫৭।

২. সম্মান-প্রদর্শন।
৩. সাহায্য।
৪. অনুসরণ।

কুরআন ও সুন্নাহর সামগ্রিক পর্যালোচনায় যে ছয়টি অধিকার পাওয়া যায়, তা নিম্নরূপ:–

১. রিসালতের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন।
২. রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি ভালোবাসা।
৩. রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনুগত্য-করণ।
৪. রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুসরণ।
৫. রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি সম্মান-প্রদর্শন।
৬. সাহায্য-সহযোগিতা।

বলা বাহুল্য যে, কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তার গ্রন্থে সর্বশেষ অধিকারের আলোচনা করেন নি।

১. রিসালতের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন (প্রথম অধিকার)

রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি উম্মতের প্রথম করণীয়। এটা মনোনিবেশযোগ্য যে, কুরআন মাজীদের যেখানে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস-স্থাপনের কথা রয়েছে, সেখানে রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি বিশ্বাস-স্থাপনের কথাও এসেছে।

এটা গভীরভাবে ভাববার বিষয় যে, কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে ঈমানের কথা এসেছে। তবে সর্বোচ্চ দুটি জায়গা এমন রয়েছে, যেখানে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন, রিসালতের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন, ফেরেশতার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন, তাকদির ও আখিরাত এবং আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপনের কথা একত্রে এসেছে। কোনো কোনো আয়াতে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস-স্থাপনের নির্দেশ রয়েছে; আবার কোনো কোনো আয়াতে আখিরাত, ফেরেশতা প্রভৃতির প্রতি বিশ্বাস-স্থাপনের নির্দেশ। কিন্তু যেখানে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস-স্থাপনের নির্দেশ রয়েছে, সেখানেই রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি বিশ্বাস-স্থাপনের নির্দেশ রয়েছে। অথচ কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস-স্থাপনের মাঝে রাসূলের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপনের বিষয়টাও অন্তর্ভুক্ত। এটা রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মর্যাদাব্যঞ্জক। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

فَآمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَالنُّوْرِ الَّذِيْ أَنْزَلْنَا.

–বিশ্বাস স্থাপন করো আল্লাহ ও তার রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি, এবং সেই নুরের প্রতি, যা আমি অবতীর্ণ করেছি।[১]

অনুরূপভাবে আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا لِّتُؤْمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ.

–আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, এবং সুসংবাদ-দাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারীরূপে, যেন তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করো।[২]

উদ্ধৃত আয়াতে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি বিশ্বাস-স্থাপনকে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস-স্থাপনের জন্য ভিত্তিস্বরূপ স্থির করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন রাসূলের সাথে পরিচিতি-লাভ ছাড়া সম্ভব হয় না। সুতরাং ঈমানের ভিত্তিই হলো রাসূলের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন।

'শাহাদাত' (شَهَادَةٌ)-এর অর্থ

شَهَادَةٌ-এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ:

اَلْحُضُوْرُ مَعَ الْمُشَاهَدَةِ إِمَّا بِالْبَصَرِ أَوْ بِالْبَصِيْرَةِ.

–প্রত্যক্ষরূপে উপস্থিত থাকা; বহির্দৃষ্টি বা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে।

অর্থাৎ প্রত্যক্ষ উপস্থিতির ভিত্তিতে দর্শনকারী হওয়া। যাকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দর্শনকারী মনে করা হয়, তিনি সবসময় উপস্থিত হন। যেখানে যেখানে দর্শনের বিষয় জড়িত, সেখানে উপস্থিতির বিষয়টাও জড়িত থাকবে। যদি কোথাও দর্শন না হয়ে উপস্থিতি পাওয়া যায়, তাহলে সেখানে উপস্থিত হয়েও দর্শনের বিষয়টা প্রমাণিত হবে না। তখন প্রত্যক্ষ বিষয়েও উপস্থিতির কথা ভাবা যাবে না।

[১]. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭:১৫৮।
[২]. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৪৩:৪৫।

এই ব্যাখ্যা হতে একটি ধারণা পাওয়া যায় যে, প্রত্যেকটা বিষয়ে তিনি উপস্থিত হন- প্রত্যক্ষভাবে, পরোক্ষভাবে নয়। তবে পরোক্ষ উপস্থিতিও প্রত্যক্ষ উপস্থিতির কাজ দেয়। এভাবে 'হাযের-নাযের' বলার উদ্দেশ্য হলো- যেখানে মানুষ প্রত্যক্ষ করে, সেখানে সে প্রকৃত অর্থে উপস্থিত থাকে। এই ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে شَهَادَةٌ-এর অর্থ হবে- দর্শনের ভিত্তিতে উপস্থিত থাকা; সেটা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে হোক, বা বহির্দৃষ্টি দিয়ে হোক।

'শাহেদ' (شَاهِدٌ) ও 'শুহুদ' (شُهُوْدٌ)-এর উল্লিখিত ধারণার সমর্থনে কুরআনের আয়াত

'শুহূদ' (شُهُوْدٌ) হতে নির্গত শব্দসমূহ কুরআন মাজীদের যে-সব আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে সাধারণত শব্দটা উপস্থিতির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ- হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম-এর শেষ সময়ের বিবরণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে–

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ.

–তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম-এর কাছে মৃত্যু এসে পড়েছিল?[১]

অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে–

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.

–অতঃপর যে ব্যক্তি রমজান মাসে উপনীত হবে, সে যেন রোজা রাখে।[২]

মোটকথা, 'শুহূদ' (شُهُوْدٌ) ও তথনির্গত শব্দসমূহ কুরআন মাজীদের বহু আয়াতে উপস্থিতির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; অনুরূপভাবে 'দর্শনের' অর্থেও এটা বহুলভাবে হয়েছে।

সাক্ষী কী?

যে দর্শন করে এবং প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত থাকে, তাকে সাক্ষী বলা হয়। সাক্ষীর মূল শর্ত 'দর্শনকারী ও উপস্থিত' হওয়া। সে জন্য যে ব্যক্তি উপস্থিত থাকে

[১]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:১৩৩।
[২]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:১৮৫।

এবং দর্শন করে, তাকে সাক্ষী বলা হয়। এটার অর্থ 'সংরক্ষক'ও হতে পারে। কারণ সে প্রকৃত অর্থে উপস্থিত থেকে দর্শন করে।

রিসালতের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে প্রিয় রাসূল, আমি তোমাকে সাক্ষী, সুসংবাদ-দাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারী-রূপে প্রেরণ করেছি। রিসালতের এসব বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার কারণ হলো- মানুষ যেন পরবর্তী অংশ لِتُؤْمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهٖ-এর আলোকে আল্লাহ ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপর ঈমান আনে। অন্যভাবে যেন মনে হয়, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালতের মর্যাদাকে উন্নীত করে সাধারণ মানুষকে প্রণোদিত করে আল্লাহর উপর ঈমান আনার প্রেরণা দেওয়া হয়েছে। এ জন্য রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি বিশ্বাস-স্থাপনকে ইতঃপূর্বে ঈমানের ভিত্তিরূপে দেখানো হয়েছে।

আরেকটি আয়াতে মানুষকে ঈমানের দিকে আহ্বান করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

فَاٰمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ.

–ঈমান আনয়ন করো আল্লাহর উপর এবং তার রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপর, যিনি নবি উম্মি।[১]

অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন–

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَرَسُوْلِهٖ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ سَعِيْرًا.

–যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপর ঈমান আনে না, আমি তাদের জন্য দোজখের প্রজ্জ্বলিত অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি।[২]

এখানেও আল্লাহ ও তার রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপর একসাথে ঈমান আনার নির্দেশ রয়েছে।

যারা ঈমান আনার মিথ্যে দাবি করে, তাদের কথা বলতে গিয়ে কুরআন মাজীদের সূরা বাকারায় বলা হয়েছে–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ.

---

[১]. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭:১৫৮।
[২]. আল কুরআন : সূরা ফাতাহ, ৪৮:১৩।

–কিছু মানুষ এমন রয়েছে, যারা বলে "আমরা ঈমান এনেছি- আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি"; প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয়।[১]

উদ্ধৃত আয়াতে মুনাফিকদের কথা রয়েছে, যারা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপনের কথা বলে বেড়াতো। রিসালতের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপনের কথা অস্বীকার করার কারণে আল্লাহ তা'আলা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাদেরকে 'ঈমানদার' নয় বলে ঘোষণা করেন। এতে বুঝা যায়, রিসালতের প্রতি বিশ্বাস না করে কেউ ঈমানদার হতে পারে না। কেউ এরূপ দাবি করে থাকলে তা যেন নিম্নরূপ ঘটনার মতো হবে–

ایں خیال است و محال است و جنوں

এটা অলীক কল্পনা ও উন্মাদনা ছাড়া কিছুই নয়।

আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনা এবং রিসালতের প্রতি ঈমান না আনার পেছনে যে ব্যাধিটা রয়েছে, তা উল্লেখ করে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে–

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا.

–তাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত; আল্লাহ তাদের এই ব্যাধিকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।[২]

এতে বোধ্য হয় যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমান আনা ফরয; শুধু আল্লাহ ও কেয়ামত-দিবসের প্রতি ঈমান আনা যথেষ্ট নয়। যারা রাসূলকে (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছেড়ে শুধু আল্লাহর উপর ঈমান আনার কথা বলে, কুরআন মাজীদে তাদেরকে মুনাফিক অভিহিত করা হয়েছে। সারাংশ হলো- রিসালতের মাধ্যম ছাড়া ঈমানের দাবি করা অর্থহীন।

রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি বিশ্বাস-স্থাপনের মর্ম

ঈমানের সাধারণ অর্থ হলো- মুখে স্বীকার করা এবং অন্তর দিয়ে সত্য বলে ধরে নেওয়া। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন প্রসঙ্গে ঈমানের তাৎপর্য হবে- মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রিসালতকে সত্য বলে ধরে নেওয়ার পাশাপাশি তিনি যা কিছু (বিধানাবলি) এনেছেন, তাও সত্য বলে গ্রহণ করতে হবে। কারণ কুরআন যখনই রাসূলের

---

[১]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:৮।
[২]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:১০।

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি ঈমান আনার কথা বলে, তখনই তার আনীত সমস্ত বিধান গ্রহণ করার কথাও বলে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

فَالَّذِيْنَ آمَنُوْا بِهِ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْ أُنْزِلَ مَعَهُ.

—সুতরাং যারা ঈমান আনলো, তাকে সম্মান ও সাহায্য করলো এবং সেই নুরের অনুসরণ করলো- যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে।[১]

উদ্ধৃত আয়াতে প্রথমে ঈমানের কথা, তারপর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু এনেছেন, তা অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে।

অনুরূপ ধারণার বর্ণনায় একটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ.

—তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ আমার আনীত সমস্ত বিধানের প্রতি অনুগত হবে না।[২]

ঈমান-সংক্রান্ত নবুওয়াতের সমস্ত শিক্ষা এখানে নিহিত রয়েছে। তার এই বাণী মাইলফলক হিসেবে গৃহীত হয়।

ঈমানের অর্থ: পাঁচটি বিষয়ের সত্যায়ন

রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি ঈমান আনার জন্য নিচের পাঁচটি বিষয়ের সত্যায়ন জরুরি:

১. নবুওয়াতের প্রতি সত্যায়ন।
২. রিসালতের প্রতি সত্যায়ন।
৩. বাণীসমূহের প্রতি সত্যায়ন।
৪. কর্মসমূহের প্রতি সত্যায়ন।
৫. যে-সব হেদায়ত-সহ তিনি প্রেরিত হয়েছেন, সে-সবের প্রতি সত্যায়ন।

---

[১]. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭:১৫৭।
[২]. (ক) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, বাবুল ই'তিসামি বিল কিতাবি ওয়াস্ সুন্নাহ, পৃ. ৫১, হাদিস : ১৬৭।
(খ) বাগভী : শরহুস্ সুন্নাহ, বাবু রদ্দিল বিদা'য়ি..., ১:২১৩।
(গ) ইবনে আবী আসেম : আস্ সুনান, বাবু মা ইউযাবু আই ইয়াকুনা হাওয়ায়ু, ১:১২, হাদিস : ১৫।

ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত একটি হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমান আনার অধিকার প্রমাণিত। বর্ণনানুসারে হাদিসটা এ-রকম:

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

—আমাকে মানুষের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ তারা এ কথার সাক্ষ্য দেবে না যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল; এবং যতক্ষণ তারা নামায পড়বে না, যাকাত দেবে না। তারা যদি এরূপ করে, তাহলে তারা নিজেদের রক্ত ও সম্পদকে রক্ষা করলো- ইসলামের অধিকার ছাড়া। তাদের হিসাব-নিকাশ আল্লাহর কাছে।[১]

আল্লাহ ও তার রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ جَمِيْعُ مَا جَاءَ بِهِ অর্থাৎ যা কিছু তিনি এনেছেন, তার সবই রিসালতের অন্তর্ভুক্ত।

'হাদিসে জিবরিলের' চিত্রও অভিন্ন প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করে। উক্ত হাদিসে হযরত জিবরিল আলাইহিস্ সালাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন—

أَخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِسْلَامِ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَآلِكَ وَسَلَّمَ.

—হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলেন—

أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ.

—এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।[২]

---

[১]. তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, প্রথম পরিচ্ছেদ, কিতাবুল ঈমান, পৃ. ১১, হাদিস : ১২।
[২]. (ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু সুয়ালি জীবরাঈল..., ১:১৯, হাদিস : ৫০।
(খ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু ফীল ঈমান, ১:২৪, হাদিস : ৬৩।
(গ) বাযযার : আল মুসনাদ, ৯:৪১৯।

আরেকটি হাদিস মতে উল্লিখিত উত্তরটা ঈমান-সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে দেওয়া হয়েছে।

(২) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র প্রতি ভালোবাসা (দ্বিতীয় অধিকার)

রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি উম্মতের দ্বিতীয় করণীয় হলো- রাসূলকে (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভালোবাসা। কুরআন মাজীদে আল্লাহ ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভালোবাসাকে এক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে- এভাবে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ.

–বলো, যদি তোমাদের কাছে তোমাদের পিতাগণ, সন্তান-সন্ততি, ভাইবৃন্দ, স্ত্রীগণ, আত্মীয়-স্বজন, অর্জিত সম্পদ, সেই বাণিজ্য- যার ক্ষতিকে তোমরা ভয় কর, তোমাদের প্রিয় জায়গাসমূহ- অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তার রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা হতে, তাহলে তোমরা আল্লাহর আজাবের অপেক্ষা করো।[১]

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

–মানুষের জন্য প্রবৃত্তির মোহকে সুসজ্জিত করা হয়েছে- স্ত্রী ও সন্তানের মোহ, এবং পুঞ্জীভূত সোনা-রুপার মোহ।[২]

উল্লিখিত সব ভালোবাসার প্রকৃতিকে কুরআন মাজীদ অবশ্য স্বীকার করে। কারণ মানুষের স্বভাবে এসব প্রেম ও ভালোবাসা মজ্জাগতভাবে রয়েছে। তবে

(ঘ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, প্রথম পরিচ্ছেদ, কিতাবুল ঈমান, পৃ. ৯, হাদিস : ২।
[১]. আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:২৪।
[২]. আল কুরআন : সূরা আলে-ইমরান, ৩:১৪।

মনে রাখতে হবে যে, এসব ভালোবাসা যেন আল্লাহ ও তার রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি ভালোবাসাকে অতিক্রম না করে। পার্থিব মোহ আল্লাহ ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রেমকে ছাড়িয়ে গেলে আল্লাহর আজাবের জন্য অপেক্ষা করার হুশিয়ারি এসেছে।

হাদিসের সমর্থন

রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদিসে উক্ত ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

–তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের পিতা-সন্তান এবং সমস্ত মানুষ হতে আমার প্রতি তোমাদের ভালোবাসা বেশি হবে না।[১]

রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুধু ভালোবাসা যথেষ্ট নয়, বরং জগতের সবকিছু হতে বেশি ভালোবাসতে হবে।

কুরআন মাজীদে এটার বিশ্লেষণ এভাবে এসেছে–

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.

–এই নবি মুসলমানের কাছে তাদের প্রাণের চেয়েও উত্তম।[২]

এই আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মুমিনের কাছে তার প্রাণের চেয়েও প্রিয় বলা হয়েছে।

অপর একটি হাদিসে পাওয়া যায়–

لَنْ يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ.

–তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ আমি অধিক প্রিয় হবো না।[৩]

[১]. (ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু হুব্বির রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ১:১২, হাদিস : ১৫।
(খ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু ফীল ঈমান, ১:২৬, হাদিস : ৬৭।
(গ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ঈমান, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃ. ১০, হাদিস : ৭।
[২]. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৬।
[৩]. ক) আহমদ ইবনে হাম্বল : হাদিসে জদ্দে জুহরা ইবনে মা'বাদ, ৩৮:৪৩০, হাদিস নং : ১৮১৯৩।
খ) তাবরানী : মু'জামুল আওসাত, বাবুল মিন মিন ইসমিহি 'মুহাম্মদ', ১৩:৩০, হাদিস নং : ৫৯৫২।

পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবকিছু হতে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভালোবাসা অধিক হতে হবে। এটা রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অধিকার। এটা যেহেতু আল্লাহর অধিকারের অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু এটা অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যাবে।

(৩) আনুগত্যের আবশ্যকতা (তৃতীয় অধিকার)

কুরআন মাজীদে আনুগত্যের আলোচনায় আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের পাশাপাশি রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

قُلْ أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ.

–বলো! আল্লাহ ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনুগত্য করো।[১]

অপর একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ.

–হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনুগত্য করো।[২]

উক্ত আয়াতে ঈমানের পর আল্লাহ ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনুগত্যকে একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে।

আনুগত্যের এই ধারণা কুরআন মাজীদের আরেকটি আয়াতে এভাবে এসেছে–

أَطِيْعُوا اللهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

–আল্লাহ ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনুগত্য করো; এতে তোমরা করুণাসিক্ত হবে।[৩]

এক জায়গায় আনুগত্যকে হেদায়তের শর্ত হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয়েছে–

إِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا.

গ) বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, বাবু লা ইউমিনু আবদুন হাত্তা আকুনা আহাব্বা, ৪:৩৬, হাদিস নং : ১৪৭৮।

১. আল কুরআন : সূরা নূর, ২৪:৫৪।

২. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:৫৯।

৩. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:১৩২।

–যদি তোমরা তাকে অনুসরণ করো, তবে হেদায়তপ্রাপ্ত হবে।[১]

কুরআনের আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনুগত্যকে নিজের আনুগত্য বলে ঘোষণা করছেন এভাবে–

مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ.

–যে ব্যক্তি রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনুগত্য করলো, সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করলো।[২]

এই ধারণাকে আরো স্পষ্ট করে কুরআন মাজীদের একটি আয়াতে বলা হচ্ছে–

وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولٰئِكَ رَفِيْقًا.

–যারা আল্লাহ ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনুগত্য করে, তারা সে-সব লোকের দলে অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নেয়ামত দান করেছেন; অর্থাৎ নবি, সিদ্দিক (সত্যবাদী), শহিদ, পুণ্যবান ব্যক্তিগণ। তারা কতোই না উত্তম সঙ্গী![৩]

এ ধারণা বদ্ধমূল হওয়া দরকার যে, রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনুগত্যকে বাদ দিয়ে আল্লাহর আনুগত্যের কল্পনাও করা যায় না; ইসলাম বা কুরআনের কোথাও এ ধারণার সমর্থন নেই। এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি উম্মতের করণীয়, যা আল্লাহ তা'আলা নিজেই নিজের অধিকার-রূপে আবশ্যকীয় ঘোষণা করেছেন। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্যের অধিকার আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের মতো অত্যাবশ্যকীয় হলো, তাহলে এটা সত্য যে, আল্লাহ ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অধিকার অভিন্নভাবে পালনীয়। সুতরাং উভয়ের মাঝে কোনোরূপ পার্থক্য করা সমীচীন নয়।

নিচের আয়াতে ধারণাটা আরো স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে–

مَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا.

১. আল কুরআন : সূরা নূর, ২৪:৫৪।

২. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:৮০।

৩. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:৬৯।

–আল্লাহর রাসূল যা কিছু তোমাদের কাছে এনেছেন, তা গ্রহণ করো; এবং যাতে তিনি বারণ করেছেন, তা থেকে বিরত থেকো।[১]

বর্ণিত আয়াতে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনুগত্যকে অত্যাবশ্যকীয় এবং ইসলামের প্রবর্তক হিসেবে উম্মত-কর্তৃক অনুসৃত হওয়ার নির্দেশ রয়েছে; এটা আল্লাহর আনুগত্যের মতো ওয়াজিব।

আনুগত্যের তাৎপর্য

আনুগত্যের তাৎপর্য সম্পর্কে নিচের হাদিসটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উম্মতকে উদ্দেশ্য করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দেন–

فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

–যখন আমি কোনো বিষয়ে তোমাদের নিষেধ করি, তোমরা বিরত থেকো; আর কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে তা সাধ্যমতো পালন করো।[২]

বর্ণিত হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্যের দিকটার পাশাপাশি রহমতের দিকটাও প্রতিভাত হচ্ছে। যখন কোনো বিষয়ে নিষেধ করা হয়, তখন এ কথা বলেন নি যে, যতটুকু সম্ভব বিরত থেকো; বরং পুরোপুরি বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে নির্দেশের ক্ষেত্রে এটা সাধ্যের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ নিজেদের সামর্থ্যানুযায়ী আমল করার কথা বলেছেন।

এখানে একটা প্রশ্ন হতে পারে যে, আদেশ ও নিষেধ দুটোকে একসূত্রে গ্রন্থন করা হয় নি কেন? অথচ দুটোই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখনিঃসৃত। একটা নিষেধাজ্ঞা, অপরটা নির্দেশ। এই প্রশ্নের উত্তর হলো- এখানে আদেশ ও নিষেধের মাঝে কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান। নিষিদ্ধ বিষয়ে সাধারণত ক্ষতির উপাদান রয়েছে। এ জন্য اِجْتَنِبُوْهُ শব্দ দ্বারা পুরোপুরি বিরত থাকতে বলেছেন, যেন স্বল্পমাত্রার ক্ষতির আচড়ও না লাগে। অপর দিকে নির্দেশিত বিষয়ে উপকারিতা বিদ্যামন; তাই সাধ্যমতো উপকৃত হতে বলেছেন। কুরআন মাজীদেও অনুরূপ নির্দেশ এসেছে–

[১]. আল কুরআন : সূরা হাশর, ৫৯:৭।
[২]. বুখারী : আস্ সহীহ, বাবুল ইকতিদায়া বি সুনানির রাসূল, ৯:৯৪।

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ.

–কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করো– যতটুকু সম্ভব হয়।[১]

রহমতের দাবি এটাই যে, নিষিদ্ধ বিষয় হতে পূর্ণরূপে বিরত থাকা, আর নির্দেশিত বিষয়কে সাধ্যমতো লালন করা। সুতরাং আনুগত্যের অর্থ হলো- যখন কোনো বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হবে, তখন শক্তি ও সামর্থ্যানুযায়ী আমল করতে হবে।

একটি হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

كُلُّ أُمَّتِيْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى.

–আমার সমস্ত উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে- একমাত্র সেই ব্যক্তি ছাড়া, যে অস্বীকার করে।[২]

সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, অস্বীকারকারী কে? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

مَنْ أَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ أَبَى.

–যে আমার অনুসরণ করবে, যে জান্নাতে প্রবেশ করবে; যে অবাধ্যতা প্রদর্শন করলো, সে অস্বীকার করলো।

এখানে أَبَى দ্বারা সেই ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে যে নির্দেশ অস্বীকার করে। সুতরাং যে ব্যক্তি অস্বীকার করে না, কিন্তু আমলে আলস্য প্রদর্শন করে, সেই ব্যক্তি এই বিধানের আওতাধীন নয়। তবে এমন ব্যক্তি নিজের পাপের কারণে সাময়িকভাবে জাহান্নামে যেতে পারে, চিরস্থায়ীভাবে নয়। অপর দিকে আনুগত্যের নির্দেশকে অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যাবে। এটা বিশ্বাসগত কুফরির (كُفْرُ اِعْتِقَادِيْ) সমতুল্য। যদি নির্দেশ অস্বীকার করা না হয়, বরং কর্মে উদাসীনতা দেখা যায়, তাহলে এটা হবে কর্মগত কুফরি (كُفْرُ عَمَلِيْ), আর সেটা فِسْقٌ তথা পাপের সমতুল্য। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

[১]. আল কুরআন : সূরা মুযাম্মিল, ৭৩:২০।
[২]. (ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবুল ইক্তিদায়ি বি সুনানি রাসূল, ৯:৯২।
(খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, প্রথম পরিচ্ছেদ, বাবুল ই'তিসাম বিল কিতাবি ওয়াস্ সুন্নাহ, পৃ. ৫১।

مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ.

–যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ছেড়ে দিলো, সে যেন কুফরি করল।[১]

ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ছেড়ে দেওয়া কর্মগত হলে সেটা পাপ (فِسْقٌ), আর বিশ্বাসগত হলে কুফরি।

এতে আনুগত্যের ধারণা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। যে ব্যক্তি আনুগত্যকে মেনে নেয় এবং কিছু না কিছু আমল করে, সে কোনো না কোনো সময় জান্নাতে প্রবেশ করবে। এভাবে ব্যাখ্যা করলে নিচের হাদিসটার সাথেও সমন্বয় সাধিত হয়–

مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

–যে ব্যক্তি বলবে "আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই" সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২]

হযরত আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এই বাণী শুনে জিজ্ঞেস করলেন,

وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُوْلَ اللهِ.

–হে আল্লাহর রাসূল, যদিও সে ব্যভিচার বা চুরি করে?

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

نَعَمْ وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ!

–হ্যা; যদিও সে ব্যভিচার বা চুরি করে।

প্রশ্নকারী তিনবার প্রশ্নটা আবৃত্ত করার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধমকের সুরে বললেন,

وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

–ব্যভিচার বা চুরি করলেও সে (এক সময়) জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৩]

---

১. (ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, কিতাবুল ঈমান।
(খ) তাবরানী : মু'জামুল আওসাত, বাবু মিন ইসমিহি জা'ফর, ৩:৩৪৩, হাদিস : ৩৩৪৮।
২. তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু সুরাতির রহমান ওয়া তাবারাকা তা'আলা, ১০:২৮৫, হাদিস : ১১৪৯৭।
৩. (ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু সুরাতির রহমান ওয়া তাবারাকা তা'আলা, ১০:২৮৫, হাদিস : ১১৪৯৭।

এটার ব্যাখ্যা হলো এই যে, যখন বান্দা আনুগত্য প্রকাশ করল এবং আল্লাহর নির্দেশ মান্য করল, তখন পাপের শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাতে যাওয়ার আর কোনো বাধা থাকবে না। তাওবা বা সুপারিশের সাহায্যে তাকে ক্ষমা করা হতে পারে। এটা অবশ্য আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকার যে, যার ভেতরে বিন্দুমাত্র ঈমানের জ্যোতি বিদ্যমান থাকবে, সে অবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

أَبٰى শব্দের ব্যাখ্যায় عَصَانِيْ'র যে মর্ম ব্যক্ত করা হয়েছে, সেটার আলোকে বিপরীত ধারণা হিসেবে বান্দা পূর্ণাঙ্গ নির্দেশ পালন করতে না পারলেও তাকে অনুগত বলে গণ্য করা হবে। অনুরূপভাবে 'আনুগত্য' দ্বারা কখনো শুধু 'অনুগত থাকা', আবার মাঝে মাঝে 'অনুসরণ' করাকে বোঝানো হয়।

'আসানী' (عَصَانِيْ) শব্দের অর্থ

'আসানী' (عَصَانِيْ) শব্দটা দুটি অর্থ নির্দেশ করে; তবে সবসময় আনুগত্যের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়।

প্রথম ব্যবহার

যদি আনুগত্য দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মেনে নেওয়া বোঝানো হয়, তাহলে عَصَانِيْ দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অস্বীকার করা বোঝায়। অপর পক্ষে আনুগত্যের অর্থ যদি শুধু 'অনুগত থাকা' বোঝানো হয়, তাহলে عَصَانِيْ'র অর্থ হবে অস্বীকার করা। অর্থাৎ অবাধ্যতা প্রদর্শন করা।

দ্বিতীয় ব্যবহার

যদি আনুগত্যের অর্থ অনুসরণ হয়, তাহলে তার বিপরীতে عَصَانِيْ শব্দের অর্থ হবে আমলে অলসতা প্রদর্শন করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্যই আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য। রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনুগত্যই ঈমানের ভিত্তি। কবি বলেন,

ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں
اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے

(খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদে আবী হুরাইরাতা, ১৪:৩১১।
(গ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, বাবু সা'আতি রহমাতাল্লাহ, পৃ. ৭৩৩।

পরিচিতি

এটাই প্রমাণিত যে, সমস্ত ফরয আনুষঙ্গিক বিষয়;
একমাত্র তার আনুগত্যই প্রকৃত ইবাদত।

সহিহ্ বুখারি শরিফের একটি হাদিসে এসেছে—

مَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ.

—যে ব্যক্তি মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনুগত্য করে, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আনুগত্য করে; যে ব্যক্তি মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি অবাধ্যতা দেখায়, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর অবাধ্য। আর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী।[১]

হাদিসের ব্যাখ্যাকারীগণ এই পার্থক্যকে ঈমান ও কুফরের মধ্যবর্তী পার্থক্য বলে উল্লেখ করেছেন। শায়খ মুহাদ্দিসে দেহলভি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-সহ অনেক মুহাদ্দিস হাদিসের مُحَمَّدٌ فَرق بَيْنَ النَّاسِ-এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, أَيْ فَرْقٌ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ এবং فَرْقٌ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ। এখানে কাফির বলতে সেই ব্যক্তি উদ্দেশ্য, যে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্যকে পুরোপুরি অস্বীকার করে।

অনুরূপভাবে নামায সম্পর্কিত হাদিসে এসেছে— بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْعَبْدِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ - কাফির ও মুমিনের মাঝে পার্থক্য হলো নামায।

পূর্বে মুনাফিক সম্পর্কিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুনাফিকরা আল্লাহ ও কেয়ামত-দিবসের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপনের কথা স্বীকার করে; রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমানের কথা তারা চেপে যায়। তাই তাদেরকে মুনাফিক বলা হয়েছে। তাদের প্রতি এই ঘোষণাকে আল্লাহ তা'আলা وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। তারা কিভাবে ঈমানদার হতে পারে? তারা তো মুমিনকে ধোঁকা দেওয়ার পাঁয়তারা করে, যা নিচের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে—

يُخَادِعُوْنَ اللهَ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ.

[১]. বুখারী : আস্ সহীহ, বাবুল ই'তিক্বাদ বি সুনানি রাসূল, ৯:৯৭।

—তারা আল্লাহ ও মুমিনদের ধোঁকা দিতে চায়; এতে বাস্তবে তারা নিজেদেরই ধোঁকা দেয়, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না।[১]

তাদের আরো পরিচয় রয়েছে কুরআন মাজীদের নিম্নবর্ণিত আয়াতে—

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا.

—তাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত হয়েছে; আল্লাহ তাদের এই ব্যাধিকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।[২]

এসব আয়াত হতে এ কথা দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক। যারা শুধু আল্লাহ ও কেয়ামত-দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, রাসূলকে (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিশ্বাস করে না, কুরআন মাজীদের ভাষায় তারা মুনাফিক। সুতরাং যে ব্যক্তি নামাজের আবশ্যকতাকে অস্বীকার করবে, তার এই কাজ কুফরি হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নামাজের আবশ্যকতাকে স্বীকার করবে, কিন্তু আদায় করার ক্ষেত্রে অলসতা দেখায়, সে ব্যক্তি কাফির হবে না; তবে ফাসিক (পাপাচারী) নিশ্চয় হবে।

এসব বিবেচনায় আনুগত্যের সারমর্ম এই দাঁড়ালো যে, রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ পালন করা এবং নিষেধাজ্ঞা হতে বিরত থাকার নামই হলো আনুগত্য, যা অস্বীকার করা কুফরি; তবে অলসতা বা উদাসীনতা জঘন্য পাপ।

(৪) অনুসরণের আবশ্যকতা (চতুর্থ অধিকার)

আল্লাহ তা'আলা রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুসরণ করাকেও ঈমানের ভিত্তিরূপে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ.

—বলো (হে রাসূল), যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো; এতে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।[৩]

আনুগত্য ও অনুসরণের মাঝে পার্থক্য

[১]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:৯।
[২]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:১০।
[৩]. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:৩১।

আনুগত্য হলো নির্দেশ মেনে নেওয়া এবং অনুসরণ হলো অনুকরণ তথা নির্দেশ-পালন ও পদ্ধতি-অবলম্বন। অর্থাৎ রাসূল-কর্তৃক নির্ধারিত বিধানসমূহ বাস্তবে পরিণত করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ.

–তোমার পালনকর্তার শপথ! তারা ঈমানদার হতে পারবে না- যতক্ষণ না তারা নিজেদের সংঘাতময় বিষয়ে তোমাকে বিচারক হিসেবে মেনে নেয়।[১]

সকল দ্বান্দ্বিক বিষয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র নির্দেশকে নিজের জন্য আবশ্যকরূপে নেওয়া এবং তার সিদ্ধান্তকে অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করার নাম আনুগত্যও, অনুসরণও।

নিম্নবর্ণিত আয়াতে হেদায়তের জন্য অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে–

وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

–তাকে অনুসরণ করো, তোমরা হেদায়তপ্রাপ্ত হবে।[২]

রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ.

–তোমাদের কেউ ঈমানদার হতে পারবে না- যতক্ষণ পর্যন্ত আমার আনীত বিষয়ের প্রতি তোমাদের প্রবৃত্তি অনুগত হবে না।[৩]

নিজের প্রবৃত্তি ও সমস্ত বাসনাকে রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশের অনুগত করা, শরিয়ত হিসেবে যা কিছু তিনি প্রবর্তন করেছেন, তার প্রতি বাধ্য থাকার নামই হলো অনুসরণ। রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পথ অবলম্বন করা তার অনুসরণের অন্তর্ভুক্ত। এটাই নিচের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে–

[১]. আল কুরআন : প্রাগুক্ত।

[২]. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭:১৫৮।

[৩]. (ক) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, বাবুল ই'তিসামি বিল কিতাবি ওয়াস্ সুন্নাহ, পৃ. ৫৯, হাদিস : ১৬৭।
(খ) বাগভী : শরহুস্ সুন্নাহ, বাবু রদ্দিল বিদা'য়ি..., ১:২১৩।
(গ) ইবনে আবী আসেম : আস্ সুনান, বাবু মা ইউযাবু আহ ইয়াকুনা হাওয়ায়ু, ১:১২, হাদিস : ১৫।

إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا.

–নিঃসন্দেহে সবচেয়ে সুন্দর কথা হলো আল্লাহর কিতাব; সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পদ্ধতি; আর বিদ'আত হলো নিকৃষ্টতম কাজ।[১]

এখানে বিদ'আত বলতে গর্হিত কর্মকে বোঝানো হয়েছে, যা ধর্মে নূতনরূপে প্রচলিত হয়। যদি তা শরিয়ত-সম্মত হয়, তবে ভালো; অন্যথায় প্রত্যাখ্যাত হবে।

(৫) সম্মানের আবশ্যকতা (পঞ্চম অধিকার)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উম্মতের করণীয়। এই মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ.

–আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী (হাজের-নাজের), সুসংবাদ-দাতা এবং ভীতিপ্রদর্শনকারী-রূপে, যেন তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপর ঈমান আনো, তাকে সম্মান কর এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন কর।[২]

রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের বিষয়টাকে কুরআন মাজীদে এতো গুরুত্বের সাথে ব্যক্ত করার কারণ হলো- প্রস্তরের খোদাইয়ের মতো এটা মানুষের অন্তরে নিবদ্ধ করা। তাকে সাক্ষী, সুসংবাদ-দাতা, ভীতিপ্রদর্শনকারী ও ঈমানের কেন্দ্ররূপে প্রেরণ করেছেন, যেন মানুষ তাকে সম্মান করে। কারণ সম্মান পাওয়ার জন্য মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হয়। বড়ত্ব ও মহত্ত্বের কারণে মানুষ সম্মানের অধিকারী হয়। সম্মান

[১]. (ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবুল ই'তিকাদি বিসুনানি রাসূল, ৯:৯২, হাদিস : ৭২৭৭।
(খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবুয্ যুজয়িস্ সানি ওয়াল ইশরীনা, ২২:৩১৯, হাদিস : ১৪৪৩১।
(গ) বাগভী : শরহুস্ সুন্নাহ, বাবু রদ্দিল বিদা'আ ওয়াল আহওয়াহ, ১:২১১, হাদিস : ১০৩।

[২]. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৪৫।

করার জন্য ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা থাকতে হয়। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রিয় নবির মহত্ত্বের আলোচনা করেছেন। তার মহত্ত্ব ও বড়ত্ব পুরোদমে বিকশিত করার পর তাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করার নির্দেশ দেওয়া হলো।

'তুয়াযযিরুহু' (تُعَزِّرُوْهُ)'র হিকমত ও তাৎপর্য

এটা লক্ষণীয় ব্যাপার যে, কুরআন মাজীদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য تُعَظِّمُوْهُ প্রয়োগ না করে تُعَزِّرُوْهُ চয়ন করা হয়েছে। এখানে বিশেষ একটি হিকমত লুকায়িত রয়েছে। সম্মানের অতিরেক বোঝানোর উদ্দেশ্যে এভাবে শব্দ-চয়ন ঘটেছে। পিতা-মাতা ও শিক্ষকের সম্মান করা ওয়াজিব; কিন্তু তা অতিরঞ্জিত করা যাবে না। অন্য দিকে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত না হলে তা পূর্ণ সম্মানই হবে না। এ জন্য تَعْظِيْمٌ বাদ দিয়ে تَعْزِيْرٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

فَالَّذِيْنَ آمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ.

–সুতরাং যারা ঈমান আনলো এবং তাকে সম্মান করলো।[১]

রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বেলায় تُعَزِّرُوْهُ শব্দ-ব্যবহার অনেক তাৎপর্য ধারণ করে। تُعَظِّمُوْهُ শব্দ ব্যবহার করা হলে নিছক সম্মানের কথা বুঝা যেতো। যেমনটা কুরআন মাজীদের অন্য আয়াতে রয়েছে–

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ.

–যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, নিশ্চয়ই এটা তাকওয়ার পরিচয়।[২]

যখন কুরআন মাজীদ আল্লাহর নিদর্শনাবলি, নবিগণের সম্বন্ধ এবং পবিত্র স্থানসমূহের আলোচনা করে, তখন এগুলোকে সম্মান করতে বলে, এটা তাকওয়ার পরিচায়ক। কিন্তু যখন সবচেয়ে বড়ো নিদর্শন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

১. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭:১৫৭।
২. আল কুরআন : সূরা হজ্জ, ২২:৩২।

আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা করে, তখন বলে- শুধু সম্মান যথেষ্ট হবে না, অতিরঞ্জিত সম্মান হতে হবে। যেখানে অন্য নিদর্শনসমূহের শুধু সম্মান করার নির্দেশ, সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু সবেচেয় বড়ো নিদর্শন, সেহেতু তার সম্মানের আধিক্যও অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, সবকিছুর সম্মানের সীমারেখা রয়েছে। কোনো বস্তুর প্রতি অতিরঞ্জিত সম্মান-প্রদর্শন নিষিদ্ধ। কারণ সম্মানে অতিরঞ্জিত করা হলে তা ইবাদতের পর্যায়ে চলে যায়। তাই আল্লাহর নিদর্শনাবলির প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের সময় সীমারেখার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের সময় অতিরঞ্জিত করার অনুমতি রয়েছে। এটা যেন সম্মানের সীমারেখা ছাড়িয়ে গেছে।

একটি প্রশ্ন ও তার সমাধান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান সংক্রান্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানের কোনো সীমারেখা না থাকে, তাহলে সম্মান আর ইবাদতের মাঝে পার্থক্য কোথায়? অথচ ইবাদতের উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

উত্তর: সম্মান যখন সীমারেখা ছাড়িয়ে যাবে, তখনই তা ইবাদতে রূপান্তরিত হবে। কিন্তু সীমারেখা অতিক্রম করার জন্য আগে সীমানা নির্ধারিত থাকতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের যেহেতু কোনো সীমানা নেই, তাই এখানে ইবাদত হওয়ার আশঙ্কা অনুপস্থিত। যতোই তার সম্মান করা হোক না কেন, তা সম্মানই হবে, ইবাদত হবে না। অধিকন্তু এই বিশ্বাস থাকতে হবে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা। সুতরাং তার সাথে কৃত সমস্ত আচরণই পরিপূর্ণ বান্দার আচরণতুল্য হবে। বান্দা ও রাসূল হওয়ার বিশ্বাস থাকলে তা কখনো ইবাদতে রূপান্তরিত হতে পারে না। সুতরাং যতোই সম্মান করা হোক, তা সম্মানই থাকবে। এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই।

রাসূলুল্লাহর দরবারের সৌজন্য ও কুরআনের শিক্ষা

تَعْظِيْمٌ ও تَعْزِيْرٌ-এর মধ্যবর্তী পার্থক্য বোঝানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا.

–হে ঈমানদারগণ, তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে رَاعِنَا বলো না; বরং বলো اُنْظُرْنَا।[১]

এখানে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এ কথা বলা হচ্ছে যে, তোমরা ভুলেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করো না, যা রিসালতের ত্রুটি নির্দেশ করে। কেউ যেন জেনে বা না জেনে এমন কোনো শব্দ প্রয়োগ না করে, যা তার সম্মানের পরিপন্থী।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি শিষ্টাচার রক্ষার্থে কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ.

–হে ঈমানদারগণ! তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে উচ্চঃস্বরে ব থা বলো না।[২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে কেউ উচু আওয়াজে কথা বলুক- এতটুকু পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা সহ্য করেন না।

এরপর ইরশাদ করেন–

وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ.

–তোমরা যেভাবে একে অপরকে সম্বোধন কর, সেভাবে তাকে সম্বোধন করো না।[৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সৌজন্য-প্রদর্শনের শিক্ষা দিতে গিয়ে অন্য আয়াতে বলেন–

وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ.

–এবং তোমরা যেভাবে একে অপরকে ডাক, সেভাবে রাসূলকে (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ডাকবে না।[৪]

---

[১]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:১০৪।
[২]. আল কুরআন : সূরা হুজরাত, ৪৯:২।
[৩]. আল কুরআন : সূরা হুজরাত, ৪৯:২।
[৪]. আল কুরআন : সূরা নূর, ২৪:৬৩।

এসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে কীরূপ আচরণ করতে হবে, সেটার শিক্ষা দিয়েছেন। সাহাবিরা পরস্পরের সাথে যেরূপ আচরণ করতেন, যেভাবে একে অপরকে সম্বোধন করতেন, সেরূপ আচরণ যেন তারা রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে না করেন এবং সেভাবে যেন তাকে সম্বোধন না করেন- এটাই এখানে শেখানো হয়েছে। অর্থাৎ পুত্রকে পিতার, ছাত্রকে শিক্ষকের, মুরিদকে পীরের, এমনকি জনগণকে শাসকের সম্বোধনের যে পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, সেটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারের জন্য অসৌজন্যসূচক। আল্লামা ইকবাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر ♦ نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا

–আকাশের নিচে এমন একটি স্থান রয়েছে, যা আরশের চেয়েও নাজুক। যেখানে হযরত জুনাইদ ও বায়েজিদের মতো ব্যক্তিত্ব রুদ্ধশ্বাস নিয়ে ফিরে আসে।

অনুরূপ কোনো এক সাধক সেই দরবারের বর্ণনায় বলেন–

باخدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار

–আল্লাহর বিষয়ে উন্মাদনা ও প্রমত্ততার মূল্য আছে।কিন্তু রাসূলের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

মনসুরের মতো কেউ উন্মত্ততার বশে নিজেকে أَنَا الْحَقُّ (আমিই হক) দাবি করতে পারে। কিন্তু মুস্তফার দরবারের বিষয় আলাদা। এখানে উন্মাদনা চলে না। ভদ্রতা ও নম্রতার সাথে আদব রক্ষা করে যেতে হয়। অনেকে হতে পারে ফানা ফিল্লাহ, ফানা ফিশ-শায়খ প্রভৃতি; কিন্তু ফানা ফির-রাসূল হওয়ার বেলায় সতর্ক থাকতে হবে। এ জন্য কেউ ফানা ফির-রাসূল হয়ে أَنَا مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ আমি মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল বলেনি।

এখানে উদ্দেশ্য হলো– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারের আদবের বর্ণনা দেওয়া। অর্থাৎ যা অন্য মানুষের কাছে ভদ্রতার পরিচায়ক হয়ে থাকে, তাও এখানে অভদ্রতা হতে পারে। এ জন্য শুধু সম্মানই নয়, বরং অতিরঞ্জিত সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

ইহসান দানিশ এটাকে কতো সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন!

آہستہ سانس لے کہ خلاف ادب نہو ♦ نازک ہے آئینہ سی طبیعت حضور کی

–ধীরে-সুস্থে নিঃশ্বাস গ্রহণ করো, যেন অশিষ্টাচারিতা না হয়; কারণ রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বভাব দর্পণের চেয়েও নাজুক।

যারা রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র প্রতি ভদ্রতা বজায় রেখে নিচুস্বরে কথা বলতো, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى.

–নিঃসন্দেহে যারা রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সামনে নিচু আওয়াজে কথা বলে, আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য নিরীক্ষণ করে রেখেছেন।[১]

একটি সূক্ষ্ম বিষয়

উপরে বর্ণিত কুরআন মাজীদের আয়াতে امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ বাক্য দ্বারা তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য নির্বাচিত করার কথা রয়েছে। কুরআন মাজীদের অন্য আয়াতে রয়েছে– وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ। এখানেও নিদর্শনাবলির সম্মান ও তাকওয়ার জন্য অন্তরসমূহকে চয়ন করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার অন্যান্য সাধারণ নিদর্শনের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের ফলে যে তাকওয়া অর্জিত হয়, তা সাধারণ স্তরের তাকওয়া; এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি করণীয় আদায় করতে সক্ষম নয়। যে তাকওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মানের সাথে সম্পর্কিত, যা আওয়াজকে নিচু করে দেয়, সেই তাকওয়ার জন্য মুত্তাকি অন্তরসমূহ হতে কিছু কিছু অন্তরকে নির্বাচন করা হয়। উদ্ধৃত দুটি আয়াতের মাঝে অর্থ-সমন্বয় ঘটালে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আল্লাহর নিদর্শনাবলির প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের ফলে অন্তরের তাকওয়া অর্জিত হয়; কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের সূচনা ঘটে, তখন

[১]. আল কুরআন : সূরা হুজরাত, ৪৯:৩।

তাকওয়া অর্জনকারী অন্তরসমূহ হতে এমন কিছু অন্তর নির্বাচন করা হয়, যা রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানের অধিকার আদায় করতে সক্ষম হয়। যেভাবে বিষয়টা বোঝেন না কেন- এটা শুধু সম্মানের প্রসঙ্গ নয়; এটা অত্যধিক সম্মানের বিষয়।

(৬) সাহায্যের আবশ্যকতা (ষষ্ঠ অধিকার)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধর্মের ব্যাপারে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া। এটা সর্বশেষ অধিকার, যা উম্মতের করণীয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

مَنْ أَنْصَارِيْ إِلَى اللهِ.

–কে আমাকে আল্লাহর পথে সাহায্য করবে?[১]

এখানে আল্লাহর পথে সাহায্য করার অর্থ হলো নবিদের সহযোগিতা ও দ্বীনের মিশন বাস্তবায়নে সাহায্য করা। নবিদের সাহায্য এ জন্য যে, তারা সর্বদা ধর্মপ্রচারের কাজে নিয়োজিত থাকেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا.

–এমন কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করবে?[২]

এখানেও আল্লাহর বান্দাদের জন্য ব্যয় করা এবং ধর্মের সহযোগিতা করাকে উত্তম ঋণরূপে অভিহিত করা হয়েছে। কী অপূর্ব দৃষ্টান্ত! ধর্মের সহযোগিতায় যে-সব অর্থ-মুদ্রা ব্যয় করা হয়, তাকে আল্লাহ তা'আলা ঋণরূপে গণ্য করেছেন, যা তিনি নিজ কুদরতের হাতে উসুল করেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার যে মিশন নবিগণ নিয়ে এসেছেন, তার বাস্তবায়নে মেধা, শ্রম, অর্থ ও প্রচেষ্টা ব্যয় করাই হলো আল্লাহ, তার ধর্ম ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সহযোগিতা। ইসলামের ইতিহাস হতে জানা যায়, সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ডাকে সাড়া দেওয়ার পর নিজেদের গোটা জীবনকে ধর্মের জন্য উৎসর্গ করে দেন। ইসলাম ধর্মের বিজয় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

[১]. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:৫২।
[২]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:২৪৫।

كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِيْ.

–এটা আল্লাহর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যে, “নিশ্চিতরূপে আমি ও আমার রাসূলগণ বিজয় লাভ করবো।”[১]

হক-বাতিলের দ্বন্দ্ব অনন্তকাল ধরে অব্যাহত রয়েছে। ভালো ও মন্দ একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে সংঘর্ষ করে আসছে। রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আলোকবর্তিকার সাথে সাথে আবু লাহাবের বিদ্বেষ-দহনও আবহমানকাল ধরে আছে এবং থাকবে। কিন্তু শুভ পরিণতি একমাত্র ভালো ও সত্যের হয়ে থাকে। অকল্যাণ ও বাতিলের সমস্ত শক্তি পরাজিত হবে। এটাকে কুরআন মাজীদে এভাবে বলা হয়েছে–

يُرِيْدُ اللهُ أَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِيْنَ ● لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ.

–আল্লাহ চান যে, হককে নিজের কলিমা দ্বারা সত্য প্রমাণিত করবেন এবং কাফিরদের মূলোৎপাটন করবেন, যেন হক সাব্যস্ত এবং বাতিল বর্জিত হয়; যদিও এটা অপরাধীরা অপছন্দ করে।[২]

সত্যকে সত্যরূপে প্রমাণিত করা এবং মিথ্যাকে মিথ্যারূপে প্রতিপন্ন করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো এবং لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ- আল্লাহ পাকের এই অঙ্গীকার ও নবিগণের পবিত্র মিশন বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে পরিশ্রম ও সহযোগিতা করা উম্মতের এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

ইবাদত ছাড়া আল্লাহ ও রাসূলের সমস্ত অধিকার এক ও অভিন্ন

আল্লাহর অধিকারসমূহ স্বাধীনভাবে বিকশিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকারসমূহও আল্লাহর অধিকারের আওতাভুক্ত। তন্মধ্যে যেটা আল্লাহর একচ্ছত্র অধিকার, তা হলো ইবাদত। ইবাদতের প্রাপ্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলা; এতে কারো কোনো ধরনের হিস্সা বা সমকক্ষতা নেই। কিন্তু রিসালতের অধিকার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকার হওয়ার পাশাপাশি এটা আল্লাহর অধিকারও। আল্লাহ তা'আলা প্রিয় নবির অধিকারসমূহ নিজের অধিকারের পাশে স্থান দিয়েছেন এবং উভয়ের মাঝে

[১]. আল কুরআন : সূরা মুজাদালাহ, ৫৮:২১।
[২]. আল কুরআন : সূরা আনফাল, ৮:৭।

অভিন্নতা স্থির করেছেন। এ কথার সমর্থনের কুরআন মাজীদের একটি আয়াত প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা যায়–

وَاللهُ وَرَسُوْلُهٗ أَحَقُّ أَنْ يُّرْضُوْهُ إِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ.

–অবশ্য তারা যদি ঈমানদার হয়ে থাকে, তবে আল্লাহকে এবং তার রাসূলকে রাজি করা অত্যন্ত জরুরি।[১]

জরুরি জ্ঞাতব্য

উপরে বর্ণিত আয়াতে আল্লাহ ও রাসূলের অধিকারের আলোচনা রয়েছে। শব্দবিন্যাসে অবস্থিত সংযোজক অব্যয় উভয়ের মাঝে ভিন্নতা নির্দেশ করে, কিন্তু يُرْضُوْهُ'র সর্বনাম একবচন। অথচ ব্যাকরণিক নিয়ম হলো- ক্রিয়ার কর্তা প্রকাশমান থাকলে ক্রিয়া সবসময় একবচন হবে। যেমন قَامَ زَيْدٌ, قَامَ الزَّيْدَانِ, قَامَ الزَّيْدُوْنَ। অপর দিকে কর্তা সর্বনাম হলে ক্রিয়া ও কর্তার মাঝে সমতা বজায় রাখতে হবে। যেমন زَيْدٌ قَامَ, زَيْدَانِ قَامَا, زَيْدُوْنَ قَامُوْا। নিয়মানুসারে আল্লাহ ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জন্য দ্বিবচনের সর্বনাম ব্যবহার করা উচিত ছিল। অর্থাৎ বাক্যটা এভাবে হওয়া উচিত ছিল- وَاللهُ وَرَسُوْلُهٗ أَحَقُّ أَنْ يُّرْضُوْهُمَا। কিন্তু এখানে একবচনের সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে। একবচন ব্যবহার করার কারণ হলো- আল্লাহ ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সন্তুষ্টি মূলত একই বিষয়। সুতরাং আয়াতে এটাই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ ও রাসূলের অধিকারসমূহ মূলত এক ও অভিন্ন। এখানে উম্মতকে প্রণোদিত করা হচ্ছে যে, রাসূলকে সন্তুষ্ট করা তাদের করণীয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা উম্মতের জন্য রাসূলকে সন্তুষ্ট করার করণীয়কে নিজের করণীয়রূপে ঘোষণা করেছেন। এভাবে আল্লাহ ও রাসূলের অধিকারের মাঝে অভিন্নতা প্রমাণিত হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى.

–আপনার পালনকর্তা সত্বরই আপনাকে দান করবেন, অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হবে।[১]

[১]. আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:৬২।

আয়াত থেকে মনে হয়, রাসূলকে সন্তুষ্ট করাকে আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্য আবশ্যক করেছেন। সুতরাং এ কথা বাহুল্য হবে না যে, আল্লাহর অধিকারের মতো রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অধিকারও উম্মতের জন্য অপরিহার্য।

রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ.

–মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না।[২]

মুমিনদের সতর্ক করা হচ্ছে, কোনো আমলে যেন তারা রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে। লক্ষ্য যদিও ইবাদত, তবু সেটা যেন রাসূলের আগে না হয়। ইবাদতের বিষয়েও আল্লাহ তা'আলা রাসূলের আগে তাদের ইবাদত গ্রহণ করেন নি। এতে শুধু সম্মান নয়, অত্যধিক সম্মানের নির্দেশ রয়েছে।

বর্ণিত আয়াতের শানে নুযুল

হাদিসে এসেছে, কতিপয় সাহাবি রাসূলের আগে কুরবানির জন্তু জবাই করে দিয়েছিলেন। আরেক বর্ণনা মতে তারা আগে রোজা রেখে দিয়েছিল। কাজ দুটি যদিও ভালো, কিন্তু তারা রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আগে করে ফেলেছিলেন, যা আল্লাহ তা'আলার পছন্দ হয় নি। এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো- কর্মের প্রতিযোগিতা আল্লাহর সাথে নয়। তিনি তো কুরবানির প্রতি মুখাপেক্ষী নন। কর্মের প্রতিযোগিতা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত কোনো বিষয় নয়, বরং এটা রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে সম্পর্কিত।

এখানে আরেকটা লক্ষণীয় বিষয় হলো- সাহাবিগণ রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আগে কর্ম-সম্পাদন করেছিলেন। সে জন্য শুধু لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ الرَّسُوْلِ বলা যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু এ কথা বুঝানোর জন্য الله শব্দেরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলের সাথে প্রতিযোগিতা করা মূলত আল্লাহর

[১]. আল কুরআন : সূরা দোহা, ৯৩:৫।
[২]. আল কুরআন : সূরা হুজরাত, ৪৯:১।

সাথেই প্রতিযোগিতা করা। স্বাভাবিক বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে يَدَيِ اللهِ অংশকে প্রথমে আনা হয়েছে, যেন এ কথা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে পূর্বিতা অবলম্বন আল্লাহর সাথে পূর্বিতা অবলম্বনের সমতুল্য।

আরেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ.

–যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়।[১]

কষ্ট, বেদনা, যন্ত্রণা– এসব শারীরিক, মানসিক বা হৃদয়ের পরিস্থিতি বোঝায়, যা আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য নয়। বাস্তবে কেউ আল্লাহকে কষ্ট দেওয়ার শক্তি রাখে না। কিন্তু এখানে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কষ্টকে আল্লাহ নিজের কষ্টরূপে ব্যক্ত করেছেন।

আরেকটি আয়াতে কষ্টের সম্পর্ক শুধু রাসূলের দিকে করে বলা হয়েছে–

وَالَّذِينَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ.

–এবং যারা রাসূলকে কষ্ট দেয়।[২]

অনুরূপভাবে আরেক আয়াতে يُؤْذُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ রয়েছে। এভাবে একসাথে উল্লেখ করে এ কথাই বুঝানো হচ্ছে যে, রাসূলের কষ্ট আল্লাহকে কষ্ট দেয়। সুতরাং রাসূলের সাথে অসংগত আচরণ আল্লাহর সাথে অসংগত আচরণের শামিল।

রাসূলের অধিকারসমূহ আল্লাহর অধিকারের মতোই অপরিহার্য

এ ক্ষেত্রে দু ধরনের আয়াত রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অধিকারসমূহ চিহ্নিত করে। যে-সব আয়াতের সম্বন্ধ আল্লাহ ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দিকে হতে পারে, সেগুলোতে আনুগত্যের দাবি নিহিত। যেমন নিম্নবর্ণিত কিছু আয়াত–

(١) وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ

[১]. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৫৭।
[২]. আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:৬১।

১. এবং তারা হারাম জানে না– আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন।[১]

(২)وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

২. এবং এ নবী তাদের জন্য নিষিদ্ধ করেন অপবিত্র বস্তুসমূহ।[২]

(৩)لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ

৩. হে নবী আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, তা আপনি হারাম করছেন কেন?[৩]

বর্ণিত আয়াতসমূহে আলোচিত পরিস্থিতি আল্লাহ ও রাসূল উভয়ের সাথে সম্পর্কিত। অপর পক্ষে এমন কিছু আয়াত রয়েছে, যেগুলোর সম্বন্ধ বাস্তব অর্থে আল্লাহর দিকে হতে পারে না। নিচে এ জাতীয় কিছু আয়াত উল্লেখ করা হলো–

(১)يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ

১. তারা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে গনিমতের হুকুম। বলে দিন, গনিমতের মাল হলো আল্লাহর এবং রাসূলের।[৪]

এখানে বলা হচ্ছে, গনিমতের সম্পদ, যা দরিদ্রদের জন্য ব্যয় করা হয়, তা যেন আল্লাহর জন্য ব্যয় করা হয়।

(২)مَنْ يُشَاقِقِ اللهَ وَرَسُوْلَه.

২. বস্তুত যে লোক আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হয়।[৫]

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো– অবাধ্যতা বা বিরোধিতা আল্লাহ বা রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে হতে পারে।

(৩)مَنْ يُحَادِدِ اللهَ وَرَسُوْلَه.

–যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতা করে।[৬]

[১]. আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:২৯।
[২]. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭:১৫৭।
[৩]. আল কুরআন : সূরা তাহরীম, ৬৬:১।
[৪]. আল কুরআন : সূরা আনফাল, ৮:১।
[৫]. আল কুরআন : সূরা আনফাল, ৮:১৩।
[৬]. আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:৬৩।

অর্থাৎ বিরোধিতা আল্লাহর সাথেও সম্ভব, রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথেও সম্ভব।

উপরে বর্ণিত তিনটি আয়াতে বিরোধিতার সম্বন্ধ আল্লাহ ও রাসূল উভয়ের দিকে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে আয়াতসমূহে আল্লাহর বিরোধিতা উদ্দেশ্য নয়। তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উচ্চ মর্যাদা বোঝানোর জন্য বর্ণিত আয়াতসমূহে আল্লাহ ও রাসূলকে একসাথে সমন্বিত করা হয়েছে, যেন এ কথা প্রমাণিত হয় যে, এটা বান্দা হিসেবে মুহাম্মদের অধিকার নয়, বরং এই অধিকারটা 'আল্লাহর রাসূল' হিসেবে।

নিচে বর্ণিত আয়াতসমূহে রাসূল ও মুমিনের অধিকারের মাঝে পার্থক্য করা হয়েছে–

إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَه لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِيْنًا۝ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّإِثْمًا مُبِيْنًا.

–যারা আল্লাহ ও তার রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি। যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।[১]

দু প্রকার কষ্টের সূক্ষ্ম কথা

উপরে বর্ণিত আয়াতে দু ধরনের কষ্টের উল্লেখ রয়েছে। যথা:

(১) আল্লাহ ও রাসূলকে কষ্ট দেওয়া;

(২) মুমিনদের কষ্ট দেওয়া।

কষ্টের বিধানগত বৈচিত্র্য হতে জানা যায় যে, আল্লাহ পাকের দৃষ্টিতে রাসূল ও মুমিনের কষ্ট সমান নয়। রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে যারা অসংগত আচরণ করে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে অভিসম্পাত এবং অপমানজনক শাস্তি রয়েছে। পক্ষান্তরে যারা মুমিন-পুরুষ বা মুমিনা-নারীকে

[১]. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৫৭-৫৮।

কষ্ট দেয়, তারা অপবাদ ও পাপের বোঝা বহন করে। উভয়ের মাঝে পার্থক্য করার সূক্ষ্মতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

· ইবনে তাইমিয়া বর্ণিত আয়াতের নিচে مَنْ آذَى الرَّسُوْلَ فَقَدْ آذَى اللهَ শিরোনাম গঠন করে লিখেছেন–

أَحَدُهَا أَنَّهُ قَرَنَ أَذَاهُ بِأَذَائِهِ كَمَا قَرَنَ طَاعَتَهُ بِطَاعَتِهِ.

–আল্লাহ তা'আলা রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কষ্টকে নিজের কষ্টরূপে ব্যক্ত করেছেন, যেভাবে তার আনুগত্যকে নিজের আনুগত্যের মধ্যে গণ্য করেছেন।[১]

قَرْنٌ শব্দের অর্থ হলো- মেলানো; একত্র করা। اِقْتِرَانٌ এখান থেকে নির্গত শব্দ। এতে স্পষ্টরূপে বোঝা যায় যে, রাসূলকে কষ্ট দেওয়া আল্লাহকে কষ্ট দেওয়ার শামিল, যেভাবে আল্লাহ তা'আলা রাসূলের আনুগত্যকে নিজের আনুগত্য বলে উল্লেখ করেছেন।

শায়খ ইবনে তাইমিয়া বিস্তৃত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন–

فَمَنْ آذَاهُ فَقَدْ آذَى اللهَ، وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ مَنْصُوْصًا عَنْهُ وَمَنْ آذَى اللهَ فَهُوَ كَافِرٌ حَلَالُ الدَّمِ يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى جُعِلَ مَحَبَّةُ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَإِرْضَاءُ اللهِ وَرَسُوْلَهُ وَطَاعَةُ اللهِ وَرَسُوْلَهُ شَيْئًا وَاحِدًا.

–সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূলকে কষ্ট দেয়, সে যেন আল্লাহকে কষ্ট দেয়। এটা শরিয়ত-স্বীকৃত বিষয় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে কষ্ট দেয়, সে কাফির হয়ে যাবে, তার প্রাণবধ করা হালাল। কারণ এটা স্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলা নিজের ও রাসূলের ভালোবাসা, নিজের ও রাসূলের সন্তুষ্টি এবং নিজের ও রাসূলের আনুগত্যকে অভিন্ন বিষয়-রূপে ঘোষণা করেছেন।[২]

দুটো বিষয়কে অভিন্ন করার কারণে আর শিরকের আশঙ্কা থাকলো না। কারণ শিরকের আশঙ্কা থাকে সমগোত্রীয় দুটি বিষয়ে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–

---

১. ইবনে তাইমিয়া : আস্ সারেমুল মাসলুল, পৃ. ৪০।
২. ইবনে তাইমিয়া : আস্ সারেমুল মাসলুল, পৃ. ৪০।

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ...

–বলো, যদি তোমাদের পিতাগণ ও ভাইবৃন্দ...।[১]

এ সংক্রান্ত আলোচনা وَاللهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوْهُ-এর অধীনে বিস্তারিত অতিবাহিত হয়েছে।

এ সম্পর্কে নিচের আয়াতটা লক্ষ্য করা যায়–

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللهَ.

–যারা রাসূলের কাছে বায়আত করে, তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর হাতে বায়আত করে।[২]

বর্ণিত আয়াতে إِنَّمَا সীমাবদ্ধতাসূচক শব্দ। যা এ কথার নির্দেশ করে যে, যারা রাসূলের হাতে বায়আত গ্রহণ করে, তারা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার হাতেই বায়আত গ্রহণ করে। এ-রকম নয় যে, এখানে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে রাসূলের সন্তুষ্টি বানানো হয়েছে; বরং রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভালোবাসাকে আল্লাহর ভালোবাসা এবং রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সন্তুষ্টিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি বানানো হয়েছে।

উদ্ধৃত আয়াতে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাতে বায়আত করাকে নিজের বায়আত বলে ঘোষাণার করার মাধ্যমে রাসূলের অধিকার দৃঢ় করেছেন। এটা আল্লাহর প্রতি করণীয় হিসেবে নির্ধারিত। এই ধারণাকে কুরআন মাজীদের নিম্নবর্ণিত আয়াতে এভাবে স্পষ্ট করা হয়েছে–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ.

–তারা আপনার কাছে গনিমতের হুকুম জানতে চায়। বলে দিন, গনিত আল্লাহর এবং রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।[৩]

এই আয়াতেও গনিমতের অধিকার আল্লাহর অধিকারের আওতায় রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অধিকার ঘোষিত হয়েছে।

শায়খ ইবনে তাইমিয়া কষ্ট ও বিরোধিতার বিষয়ে আরো বলেন–

---

১. আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:২৪।
২. আল কুরআন : সূরা ফাতাহ, ৪৮:১০।
৩. আল কুরআন : সূরা আনফাল, ৮:১।

وَجَعَلَ شِقَاقَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَمُحَادَاتِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَأَذَى اللهِ وَرَسُوْلَهُ وَمَعْصِيَةُ اللهِ وَرَسُوْلِهِ شَيْئًا وَاحِدًا.

–আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিরোধিতা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিপক্ষাবলম্বন, আল্লাহ ও তার রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কষ্ট এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নাফরমানিকে অভিন্ন বিষয় ঘোষণা করেছেন।[১]

তারপর আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বলেন–

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ.

–এটা এ জন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিরোধিতা করল।[২]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া আরো বলেন–

وَفِيْ هَذَا وَغَيْرُهُ بِيَانٌ لِتَلَازِمِ الْحَقَّيْنِ.

–এতে এবং সংশ্লিষ্ট আরো বিবরণের পরিপ্রেক্ষিতে উভয় অধিকারের অভিন্নতা প্রতীয়মান হয়।[৩] অর্থাৎ–

وَإِنَّ جِهَةَ حُرْمَةُ اللهِ تَعَالَى وَرَسُوْلِهِ وَجْهَةٌ وَاحِدٌ.

–আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অধিকার অভিন্ন।[৪]

অর্থাৎ আল্লাহর সম্মান এবং রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্মান একই বিষয়।

فَمَنْ أَذَى الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَذَى اللهَ وَمَا أَطَاعَهُ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، لِأَنَّ الْأُمَّةَ لَايَصِلُوْنَ مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ إِلَّا بِوَاسِطَةِ الرَّسُوْلِ.

---

১. ইবনে তাইমিয়া : আস্‌ সারেমুল মাসলুল, ৪০।
২. আল কুরআন : সূরা হাশর, ৫৯:৪।
৩. ইবনে তাইমিয়া : আস্‌ সারেমুল মাসলুল, ৪১।
৪. ইবনে তাইমিয়া : আস্‌ সারেমুল মাসলুল, ৪১।

(সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার আদেশ-নিষেধ এবং বর্ণনা-বিবরণে নিজের স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছেন।[১]

সংবাদ দেওয়া জ্ঞান ছাড়া সম্ভব নয়। এ-সব বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা রাসূলকে (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেছেন।

পরে গিয়ে তিনি আরো বলেন–

فَلَا يَجُوْزُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ فِيْ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمُوْرِ.

–এসব বিষয়ের কোনোটাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাঝে পার্থক্য করা সংগত নয়।[২]

'মুস্তফা' (مُصْطَفَى) শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য

এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপাধি হিসেবে বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ। বহুলভাবে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে এটা রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জন্য বিশেষিত হয়ে গেছে। এটা আল্লাহর প্রিয় রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপাধি হিসেবে আল্লাহই এর অর্থ সম্পর্কে সম্যকরূপে অবগত। তবে আমরা এখানে কিছুটা আলোচনা করার চেষ্টা করছি।

'মুস্তফা' (مُصْطَفَى) নিম্নবর্ণিত অর্থসমূহে ব্যবহৃত হয়

(১) مُصَفًّى (নিষ্কলুষ), مُنَزَّه (ত্রুটিমুক্ত), مُزَكًّى (পূত), مُطَهَّر (পবিত্র)।

(২) مُخْتَار ও مُنْتَخَبٌ (নির্বাচিত; চয়িত)।

(৩) كَثِيْرُ الْفَضَائِلِ (অত্যধিক মর্যাদাবান)।

(৪) مَحْبُوْبٌ (অত্যন্ত প্রিয়)।

(৫) রহমত ও করুণার পাত্র।

(৬) অভিনবত্ব ও অনবদ্যতার আকর।

'মুস্তফা' (مُصْطَفَى) শব্দের অর্থ-বিশ্লেষণ এবং নির্গত শব্দসমূহ

مُصْطَفَى শব্দটি صُفُوٌّ মূলধাতু হতে নির্গত। অভিধানে এর বিভিন্ন রূপ পাওয়া যায়, যা কখনো صُفُوٌّ হতে আবার কখনো صَفَا হতে নির্গত হয়। কিন্তু صَفَا

---

১. ইবনে তাইমিয়া : আস্‌ সারেমুল মাসলুল, ৪১।
২. ইবনে তাইমিয়া : আস্‌ সারেমুল মাসলুল, ৪১।

صُفُوٌّ হতে নির্গত হয়েছে। অর্থাৎ মূল শব্দ হলো صُفُوٌّ। সুতরাং صَفَا ও صُفُوٌّ ব্যুৎপত্তিগতভাবে একই অর্থ ধারণ করে।

'সুফুভ্ভুন' (صُفُوٌّ)-এর আভিধানিক অর্থ

ইমাম রাগেবের اَلْمُفْرَدَاتُ-এ শব্দটির অর্থ সম্পর্কে লেখা হয়েছে–

خُلُوْصُ الشَّيْئِ مِنَ الشَّوْبِ.

পঙ্কিলতা হতে মুক্ত হওয়া।

যদি কোনো বস্তু এমন পাওয়া যায়, যা যাবতীয় পঙ্কিলতা হতে মুক্ত, যার অস্তিত্ব-উপাদানে কোনোরূপ বাহ্যিক বিরূপ প্রভাব থাকে না, যাতে কোনো ধরনের ত্রুটি থাকে না, তবে সেই বস্তুর জন্য صُفُوٌّ শব্দ ব্যবহৃত হয়।

'সফ্‌ফান' (صَفَا)'র আভিধানিক অর্থ

ইমাম রাগেবের اَلْمُفْرَدَاتُ-এ শব্দটির অর্থ সম্পর্কে লেখা হয়েছে–

اَلصَّفَا يُقَالُ لِلْحِجَارَةِ الصَّافِيَةِ.

–পাথরকে মাটি হতে এভাবে পবিত্র করা, যেন পাথরের উজ্জ্বলতা স্পষ্ট হয়।[১]

এটার সমর্থনের কুরআন মাজীদে নিম্নবর্ণিত আয়াত পাওয়া যায়–

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ.

–নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া পর্বত আল্লাহর নিদর্শনাবলির অন্তর্গত।[২]

এখানে صَفَا শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু صَفَا মূলত এমন পাথরকে বলা হয়, যা মাটি হতে এমনভাবে পবিত্র করা হয়– কোনোরূপ পঙ্ক থাকে না।

صَفَا ও صُفُوٌّ হতে مُصْطَفَى রূপটি গঠিত হয়েছে।

১. ইমাম রাগেব ইস্পাহানী : আল মুফরাদাত, পৃ. ২৮৩।
২. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:১৫৮।

'ইসতিফায়া' (اِصْطِفَاء)'র অর্থ

আভিধানিকভাবে শব্দটির অর্থ নিম্নরূপ:

تَنَاوُلُ صُفُوِّ الشَّيْئِ.

–কোনো বস্তুর সবচেয়ে পবিত্র, পূত, উজ্জ্বল ও পরিষ্কার অংশটা অর্জন করাকে বলা হয় اِصْطِفَاءٌ।

পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, ভালো মান ও উৎকর্ষে উপনীত হওয়ার নাম اِصْطِفَاءٌ। এখান থেকে ইসমে মাফউলের রূপে مُصْطَفَى গঠিত। সুতরাং مُصْطَفَى এমন আকরকে বলা হবে, যা পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও মানের উৎকর্ষে অধিষ্ঠিত। সে হিসেবে مُصْطَفَى'র অর্থ হবে পবিত্র, ত্রুটিমুক্ত, পরিচ্ছন্ন ও নিষ্কলুষ, যা যাবতীয় দুর্বলতা, পঙ্কিলতা ও সংশয় হতে মুক্ত।

জ্ঞাতব্য

এখানে মনে রাখা দরকার যে, সাধারণ মানুষের পবিত্রতা, নিষ্কলুষতা অর্জিত হয় তাকওয়া, পরিশ্রম প্রভৃতির সাহায্যে। কিন্তু যিনি মুস্তাফা হন, তাকে পূর্ব থেকে পবিত্র করে রাখা হয়, যেখানে পরিশ্রমের প্রয়োজন পড়ে না।

مُصَفًّى শব্দের অর্থ হলো- যাকে পরিষ্কার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে مُصْطَفَى'র অর্থ হলো– নির্বাচিত, চয়িত। সুতরাং مُصَفًّى এমন আকর, যাকে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, নিষ্কলুষ ও পরিচ্ছন্ন করে সৃষ্টি করেছেন। তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কষ্ট-সাধনা ও পরিশ্রম করেছেন, তা তার বরকত, সৌভাগ্য ও নেয়ামতের পরিধিকে বর্ধিত করেছে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্বের সমস্ত পঙ্কিলতা, অপবিত্রতা ও মানবীয় দুর্বলতা হতে পবিত্র হওয়া এবং নিম্নচরিত হতে মুক্ত থাকা তার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপর ভিত্তি করে নয়, বরং আল্লাহ তা'আলা তাকে পূর্ব থেকেই পবিত্র করে সৃষ্টি করেছেন।

مُصَفًّى শব্দের বর্ণিত অর্থে কর্মকারকের অর্থ (مَعْنَى الْمَفْعُوْلِيَّةِ) রয়েছে, কর্তৃকারকের অর্থ (مَعْنَى الْمُفَاعَلِيَّةِ) নয়। এটার কর্তা আল্লাহ তা'আলা। তিনি তার প্রিয় নবিকে এই পৃথিবীতে এমন সব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি দিয়ে প্রেরণ

করেছেন, যেখানে কোনোরূপ ক্রটি ছিল না। প্রথম থেকেই তাকে পবিত্র করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

এই পবিত্রতার কথা উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহর কবি হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিচের শ্লোকে বলেন–

وأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِيْ ◆ وأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ

خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ ◆ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

–তোমার মতো সুন্দর এ চোখ দেখে নি;
তোমার মতো অপূর্ব কোনো নারী জন্মাতে পারে নি।
সমস্ত ক্রটি হতে পবিত্র করে তুমি সৃষ্ট হয়েছো;
তুমি যেন সৃষ্ট হয়েছো, যেভাবে চেয়েছো।

শারীরিকভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত দোষ-ক্রটি ও অসংগতি হতে মুক্ত। এটাই তার مُصْطَفَى উপাধির সারমর্ম।

'ইসতিফায়া' (اِصْطِفَاء) ও 'ইজতিবায়া' (اِجْتِبَاء)-এর মাঝে সাদৃশ্য

অর্থের দিক-বিবেচনায় اِصْطِفَاء ও اِجْتِبَاء –এ দুটি শব্দের মাঝে কিছুটা সাদৃশ্য বিদ্যমান। সেটা হলো– اِصْطِفَاء শব্দটি চয়ন ও নির্বাচনের অর্থে ব্যবহৃত হয়; অনুরূপ অর্থে اِجْتِبَاء শব্দটিও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ শব্দ দুটির মাঝে নির্বাচন ও চয়ন একত্রে পাওয়া যায়।

শব্দ দুটি এই অর্থেও অভিন্ন অর্থ ধারণ করে যে, اِجْتِبَاء -এর স্তরে উপনীত হওয়ার জন্য বান্দার সাধনা যথেষ্ট নয়; অনুরূপভাবে اِصْطِفَاء'র স্তরে পৌঁছানোর জন্য আল্লাহর করুণার বিকল্প নেই। সুতরাং বুঝা গেলো, অর্থের দিক থেকে اِصْطِفَاء ও اِجْتِبَاء একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

اِجْتِبَاء'র ক্ষেত্রে বলা হয়– اِجْتِبَاءُ اللهِ الْعَبْدَ। অর্থাৎ আল্লাহ কর্তৃক কোনো বান্দাকে নির্বাচন করা। অনুরূপভাবে اِصْطِفَاء'র জন্য বলা হয়– اِصْطِفَاءُ اللهِ الْعَبْدَ। অর্থাৎ আল্লাহ কর্তৃক কোনো বান্দাকে নির্বাচন করা।

'ইসতিফায়া' (اِصْطِفَاء) ও 'ইজতিবায়া' (اِجْتِبَاء)-এর মাঝে বৈসাদৃশ্য

اِجْتِبَاء সম্পর্কে বলা হয়–

تَخْصِيصُهُ إِيَّاهُ بِفَيْضٍ إِلَهِيٍّ يَتَحَصَّلُ لَهُ بِلَا سَعْيٍ مِنَ الْعَبْدِ.

–আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বিশেষ কোনো বান্দাকে তার সাধনা বা প্রচেষ্টা ছাড়া নিজের অনুগ্রহে চয়ন করা।

অর্থাৎ বান্দার পক্ষ থেকে কোনোরূপ পরিশ্রম, প্রচেষ্টা ও সাধনা থাকবে না; আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহ ও করুণা দ্বারা তাকে সিঞ্চিত করবেন– এরূপ পরিস্থিতিকে اِجْتِبَاء বলা হয়। কুরআন মাজীদের যে-সব আয়াতে শব্দটা এসেছে, সেখানে বিনা পরিশ্রমের অর্থ নিহিত রয়েছে। যেমন–

اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ.

–আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন এবং যে তার অভিমুখী হয়, তাকে পথ প্রদর্শন করেন।[১]

উপরের আয়াতে يَهْدِيْ ও يُجْتَبِي'র কর্তা اللهُ। অর্থাৎ আল্লাহই নির্বাচন ও পথ প্রদর্শন করেন। লক্ষণীয় বিষয় হলো– أَجَابَةٌ তথা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বান্দার পক্ষ থেকে পরিশ্রমের কথা বলা হয় নি। এখানে يَجْتَبِي'র ফায়েল আল্লাহ, আর يُنِيبُ'র ফায়েল বান্দা। পক্ষান্তরে পথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বান্দার প্রচেষ্টা অপরিহার্য। এখানে أَنَابَةٌ-এর বিপরীত ধারণার জন্য أَجَابَةٌ প্রয়োগ করা হয়েছে। এতে বোঝা যায়, যখন বান্দা আল্লাহর দিকে অভিমুখী হয়, তখন তাকে পথ দেখান।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا.

–যারা আমার পথে সাধনা করে, আমি তাদের পথ প্রদর্শন করি।[২]

এই আয়াতের উদ্দেশ্য হলো– হেদায়তের জন্য বান্দার পক্ষ থেকে সাধনা ও পরিশ্রম অপরিহার্য। বান্দার পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা থাকলে আল্লাহ তাদের নিজের

১. আল কুরআন : সূরা শু'আরা, ৪২:১৩।
২. আল কুরআন : সূরা 'আনকাবুত, ২৯:৬৯।

পথে পরিচালিত করেন। কিন্তু পূর্বের আয়াতে يَجْتَبِيْ إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ-তে কর্মের সম্বন্ধ বান্দার দিকে নয়। এটা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তিনি যাকে চান, নিজের অনুগ্রহের জন্য মনোনীত করেন।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

مَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ.

–আল্লাহ কাউকে অদৃশ্য জগতের বিষয়সমূহ অবগত করান না; তবে রাসূলগণের মধ্য হতে তিনি যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন।[১]

ইলমে গায়বে বান্দার চেষ্টা ফলপ্রসূ নয়

উপরে বর্ণিত আয়াত হতে এ কথা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, বান্দা নিজের চেষ্টায় 'ইলমে গায়বের' অধিকারী হতে পারে না। ইলমে গায়ব বলতে যা মানুষ চেষ্টা না করেই অর্জন করে তাকে বুঝানো হয়। অপর দিকে যা মানুষ সাধনা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জন করে তাকে عِلْمٌ مُكْتَسَبٌ (অর্জিত জ্ঞান) বলা হয়।

বর্তমান যুগে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অগ্রগতির কারণে চিকিৎসকেরা বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে বাচ্চার লিঙ্গ সম্পর্কে জানতে পারেন। অথচ এটা অদৃশ্য জগতের বিষয়, যা মানুষ জানে না। তবে এটা যন্ত্র প্রভৃতির সাহায্যে চেষ্টার মাধ্যমে অর্জন করা হয় বলে এটাকে ইলমে গায়ব বলা হয় না। কারণ লিঙ্গ চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে চিকিৎসকেরা যন্ত্রের সাহায্য নেন। এটা বাহ্যিক বস্তুর সহায়তায় অর্জিত জ্ঞান বলে এটাকে ইলমে গায়ব না বলে ইলমে মুকতাসাব বলা হবে।

ইলমে গায়ব সম্পর্কে বলা হয়েছে, এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের অবগত করান না; তবে রাসূলদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি মনোনীত করেন। এতে বোঝা যায় যে, এখানে বান্দার চেষ্টার কোনো হাত নেই। এটার মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

গোটা কুরআন মাজীদ অধ্যয়ন করলে জানা যাবে, যেখানে ইলমে গায়বের বিষয়ে অবগত না করানোর কথা থাকবে, সেখানে চেষ্টা যথেষ্ট না হওয়ার কথা

[১]. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:১৭৯।

থাকবে; আর যেখানে অবগত করানোর ধারণা থাকবে, সেখানে আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণার উল্লেখ থাকবে। এই সূক্ষ্ম বিষয়টা অনুধাবন করতে পারলে সংশ্লিষ্ট সমস্ত সংশয় দূর হয়।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

(১) قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ.

–বলুন, আল্লাহ ব্যতীত নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে কেউ গায়বের খবর জানে না।[১]

(২) عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُوْلٍ.

–তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। তিনি অদৃশ্য বিষয় কারো কাছে প্রকাশ করেন না। তার মনোনীত রাসূল ব্যতীত।[২]

اِرْتِضَاءٌ শব্দেও اِجْتِبَاءٌ শব্দের অর্থ রয়েছে। গায়বের বিষয়ে অবগত করা কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার দান। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ; তিনি যাকে ইচ্ছা, এ ব্যাপারে অবগত করান। যেখানে বান্দার পক্ষ থেকে প্রচেষ্টার কথা থাকবে, সেখানে ইলমে গায়বের না-বোধকতা থাকবে। ওই না-বোধকতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হোক বা সাধারণভাবে হোক- তা বিবেচ্য নয়।

'ইজতিবায়া' (اِجْتِبَاءٌ)'র শর্তসমূহ

اِجْتِبَاءٌ'র ক্ষেত্রে দুটি শর্ত পাওয়া যায়। যথা:

(১) এখানে প্রচেষ্টা বান্দার পক্ষ থেকে থাকবে না।

(২) কোনো ব্যক্তিকে কোনো কাজের জন্য চয়ন করা হবে।

اِجْتِبَاءٌ'র এই বিশিষ্টতার ধারণা عُمُوْمٌ তথা সাধারণের ধারণা থেকে সৃষ্ট। কোনো বস্তুর কোনো না কোনোভাবে– ব্যক্তি, জাতি বা শ্রেণির দিক থেকে– অস্তিত্বমান থাকলে عُمُوْمٌ তথা সাধারণের ধারণার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এর মধ্য থেকে কাউকে আলাদা করাকে خَاصٌ বা বিশিষ্ট বলা হয়।

[১]. আল কুরআন : সূরা নমল, ২৭:৬৫।
[২]. আল কুরআন : সূরা জ্বীন, ৭২:২৬।

এতে مُجْتَبى ও مُصْطَفى শব্দদ্বয়ের এই পার্থক্য জানা যায় যে, যাকে গোটা সৃষ্টিজগত হতে চয়ন করা হয়, তাকে مُجْتَبى বলা হয়। অপর দিকে যখন কারো অস্তিত্ব থাকে না, তখন مُصْطَفى'র আবির্ভাব ও চয়ন ঘটানো হয়।

'ইসতিফায়ুল্লাহি আবদা' (اِصْطِفَاءُ اللهِ الْعَبْدَ)-এর ব্যাখ্যা

اَلْمُفْرَدَاتُ-এ এটার অর্থে বলা হয়েছে–

اِيْجَادُهُ تَعَالَى اِيَّاهُ صَافِيًا عَنِ الشَّوْبِ الْمَوْجُوْدِ فِيْ غَيْرِهِ.

–শূন্যতা থেকে এমনভাবে সৃষ্টি করা, যেখানে কোনো পঙ্ক থাকে না–যা অপরের মাঝে থাকে।[১]

যে সত্তাকে সমস্ত আবর্জনা ও পঙ্কিলতা হতে পবিত্র করে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে বলা হয় مُصْطَفى। যখন রাসূলকে (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সৃষ্টি করা হয়, তখনই তাকে সেসব অপবিত্রতা হতে পবিত্র রাখা হয়, যা সৃষ্টিকালে অন্যদের মাঝে থাকে।

اِصْطِفَاءُ'র অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তা'আলা কাউকে পঙ্কিলতা হতে পবিত্র করে সৃষ্টি করবেন। কারো কারো এটা সংশয় হতে পারে যে, এ জগতের আবর্জনা হতে তাকে পবিত্র করে সৃষ্টি করা হয়েছে। অথচ প্রকৃত ঘটনা হলো–তার উপাদানে পঙ্কিলতা থাকা তো দূরের কথা, তিনি তো সে-সব মিশ্রণ হতেও মুক্ত, যা সচরাচর অন্যদের মাঝে থাকে।

জ্বীন ও মানব-সম্প্রদায়, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সমুদয় সৃষ্টি, প্রাণী, উদ্ভিদ, ফেরেশতা– মোটকথা সমস্ত সৃষ্টিজগতের পূর্বে আল্লাহ তা'আলা রাসূলকে (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সৃষ্টি করেছিলেন। গোটা সৃষ্টিজগৎ রাসূলের (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরে সৃষ্টি করা হয়। এটাকেই বলা হয়– اِصْطِفَاءُ اللهِ الْعَبْدَ। যিনি যাবতীয় পঙ্কিলতা ও সংমিশ্রণ হতে পবিত্র হয়ে সৃষ্ট, তিনিই হলেন مُصْطَفى। তার সৃষ্টি ঘনত্ব হতে পবিত্র, তাই তাতে অপচ্ছায়া থাকবে কী করে? এ কারণেই তো তার ঘামে দুর্গন্ধ থাকে না। কবি বলেন–

[১]. ইমাম রাগেব ইস্পাহানী : আল মুফরাদাত, পৃ. ২৮৩।

پیکر ڈھلا ہے نور کی سانچے میں سر بہ سر
اس ذات کا ہے جس کا پسینہ گلاب کا

–তিনি আপাদমস্তক নুরে নুরানি,
যার ঘামে গোলাবের ঘ্রাণ মুহুমুহ করে।

তার উচ্ছিষ্ট অপবিত্র কিভাবে হবে? অপবিত্রতার কারণ তো দৈহিক ঘনত্ব। তার সৃষ্টিতেই যেহেতু পঙ্কের উপাদান ছিল না, তাই তাতে মশা-মাছি বসবে কী করে? মশা-মাছি তো দৈহিক অবস্থিতির পঙ্ক চুষে বেড়ায়। কারণ এসবের মাঝে সৃষ্টিগত পঙ্ক বিদ্যমান।

'মুস্তফা' (مُصْطَفى)'র অর্থ-বিশ্লেষণে হাদিসের সমর্থন

হাদিসটা শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আবি জুমরা প্রণীত بَهْجَةُ النُّفُوْسِ গ্রন্থে সংকলিত আছে, যা ইমাম ইবনে সাবা' شِفَاءُ الصُّدُوْرِ গ্রন্থে কা'ব আল-আহবারের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন। যখন আল্লাহ তা'আলা বশরীয়্যতে মুহাম্মদীকে (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সৃষ্টি করার ইচ্ছা পোষণ করলেন, তখন জিবরিলকে নির্দেশ দিলেন– মাটির অন্তর এবং সবচেয়ে উচ্চ স্তরের কিছু মাটি নিয়ে আসার জন্য, যেন এটাকে নূর দ্বারা সজ্জিত করা যায়।

فَهَبَطَ جِبْرِيْلُ فِيْ مَلَائِكَةِ الْفِرْدَوْسِ وَمَلَائِكَةِ الرَّفِيْعِ الْأَعْلَى فَقَبَضَ قَبْضَةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَوْضِعِ قَبْرِهِ الشَّرِيْفِ وَهِيَ بَيْضَاءُ مُنِيْرَةٌ فَعُجِنَتْ بِمَاءِ التَّسْنِيْمِ فِيْ مَعِيْنِ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ حَتَّى صَارَتْ كَالدُّرَّةِ الْبَيْضَاءِ وَلَهَا شِعَاعٌ عَظِيْمٌ.

–অতঃপর জিবরিল আলাইহিস্ সালাম ফেরদাউস ও উচ্চস্তরের ফেরেশতাদের সাথে নিয়ে অবতরণ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমাধি হতে কিছু মাটি আহরণ করেন, যা শুভ্র বর্ণের জাজ্বল্যমান মাটি ছিল। তারপর তা জান্নাতের চকমকে স্নিগ্ধ পানিতে সিক্ত করেন। তারপর এটা শুভ্র মুক্তোর মতো জ্বলজ্বল করতে থাকে, যার বিস্তীর্ণ কিরণ ছিল।[১]

[১]. যুরকানী : আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যাহ, ১:৮।

এই আলোকিত উপাদানের মাধ্যমে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সৃষ্টি সম্পন্ন হয়। এই হাদিস আমাদের উপরে বর্ণিত সেই অর্থকে সমর্থন করে, যা ইতঃপূর্বে 'اِيْجَادُهُ تَعَالَى اِيَّاهُ صَافِيًا عَنِ الشَّوْبِ الْمَوْجُوْدِ فِيْ غَيْرِهِ'-এর আওতায় বর্ণনা করা হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সৃষ্টি সংক্রান্ত বর্ণিত হাদিসও সেই একই অর্থ বুঝায়, যা আমরা একটু আগে ব্যাখ্যা করেছি। উভয়ের মাঝে প্রকৃতপক্ষে কোনো ধরনের পার্থক্য নেই।

ছায়াবিহীন হওয়ার ব্যাখ্যা

সৃষ্টিগতভাবে যেহেতু তিনি মুস্তাফা, তাই তাঁর ছায়া থাকার যৌক্তিকতা নেই। অবশ্য তিনি মানুষের পোশাকে আবৃত থাকতেন। এ প্রসঙ্গে কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

اَنَّهُ كَانَ لَا ظِلَّ شَخْصَهُ فِيْ شَمْسٍ وَلَا قَمَرٍ لِاَنَّهُ كَانَ نُوْرًا.

–তার ব্যক্তিত্বের কোনো ছায়া ছিল না– সূর্য বা চাঁদের আলোতে। কারণ তিনি ছিলেন নুর।[১] এতে বোঝা যাচ্ছে যে, মানুষের আদলে তিনি আপাদমস্তক নুর ছিলেন।

'মুস্তফা'(مُصْطَفٰى) শব্দের অর্থের সমর্থনে হযরত ওমর ফারুক ও ওসমান গনির উক্তি

হযরত ওমর ফারুকের এই উক্তি اِصْطِفَاءٌ'র বর্ণিত ব্যাখ্যার সমর্থন করে।

اِنَّ اللهَ عَصَمَكَ مِنْ وُقُوْعِ الذُّبَابِ عَلَى جِلْدِكَ، لِاَنَّهُ يَقَعُ عَلَى النَّجَاسَاتِ فَيَتَلَطَّخُ بِهَا فَلَمَّا عَصَمَكَ اللهُ مِنْ ذٰلِكَ الْقَذْرِ مِنَ الْقَذْرِ فَكَيْفَ لَا يَعْصِمُكَ عَنْ صُحْبَةِ مَنْ تَكُوْنُ مُتَلَطِّخَةً بِمِثْلِ هٰذِهِ الْفَاحِشَةِ.

–হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ আপনার দেহ মোবারককে মাছির উপদ্রব হতে সুরক্ষিত রেখেছেন। কারণ মাছি আবর্জনায় বসে এবং পঙ্ক-মিশ্রিত হয়। সুতরাং আল্লাহ আপনাকে এমন স্ত্রী হতে কেন রক্ষা করবেন না, যে এ-রকম অশ্লীল সঙ্গে কলুষিত হয়![২]

[১]. কাযী আয়ায : আশ্ শিফা বি তা'রিফে হুকুকিল মুস্তফা, ১:২৪৩।
[২]. আলাউদ্দীন বাগদাদী : তাফসীর খাযেন, ৩:৩২১।

হযরত ওমরের এই উক্তি অপবাদের ঘটনা সংক্রান্ত, যখন মুনাফিকরা হযরত আয়েশা সিদ্দিকার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছিল। উক্ত ঘটনার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক সাহাবির সাথে পৃথক পৃথক-ভাবে পরামর্শ করেছিলেন। হযরত ওমরকে বলা হলে তিনি এ মন্তব্য করেন।

যখন হযরত ওসমানকে জিজ্ঞেস করা হয়, তখন তিনি বলেন–

اِنَّ اللهَ مَا اَوْقَعَ ظِلَّكَ عَلَى الْاَرْضِ لِئَلَّا يَضَعُ اِنْسَانٌ قَدَمَهُ عَلَى ذٰلِكَ الظِّلِّ، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ اَحَدًا مِنْ وَضْعِ الْقَدَمِ عَلَى ظِلِّكَ كَيْفَ يَمْكِنُ اَحَدًا مِنْ تَلْوِيْثِ عَرْضِ زَوْجَتِكَ!

–আল্লাহ তা'আলা আপনার ছায়াকে মাটিতে পড়তে দেন নি, এতে মানুষের পা পড়বে বলে। সুতরাং তিনি যেখানে আপনার ছায়ায় কারো পা পড়তে দেন নি, সেখানে কিভাবে কাউকে আপনার স্ত্রীর সম্ভ্রম নষ্ট করার সুযোগ দেবেন?[১]

'মুস্তফা' (مُصْطَفٰى)'র অর্থসমূহের মাঝে পার্থক্য

مُصْطَفٰى শব্দের একটি অর্থ হলো– চয়িত ও নির্বাচিত। এটা اِصْطِفَاءٌ হতে ইসমে মাফউলের সিগাহ। কুরআন মাজীদের একটি আয়াতে শব্দটির ব্যবহার এভাবে এসেছে–

اَللهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ.

–আল্লাহ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য থেকে রাসূল মানোনীত করেন।[২]

বর্ণিত আয়াত হতে একটি সংশয় সৃষ্টি হতে পারে যে, মুস্তাফা কি একাধিক হতে পারে?

এর উত্তর সামনে আসবে। এখানে মনে রাখা দরকার যে, উপরে আয়াতে اِصْطِفَاءٌ শব্দের ব্যবহার আপেক্ষিক। স্বাভাবিকভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে اِصْطِفَاءٌ তথা চয়িত হওয়ার কথা স্বীকৃত। সুতরাং বলতে সেই এক জন সত্তা, যাকে সৃষ্টিকাল থেকেই পবিত্র করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

[১]. আলাউদ্দীন বাগদাদী : তাফসীর খাযেন, ৩:৩২১।
[২]. আল কুরআন : সূরা হজ্ব, ২২:৭৫।

'মুস্তফা' (مُصْطَفٰى)– মাহবুব-এর অর্থে

مُصْطَفٰى শব্দের একটি অর্থ হলো– مَحْبُوْبٌ তথা আল্লাহর প্রিয় বান্দা। ঠিক যেভাবে اِصْطِفَاءٌ اِجْتِبَاءٌ হতে উৎকৃষ্ট, সেভাবে এই ভালোবাসাও অন্যসব ভালোবাসা হতে উত্তম ও উৎকৃষ্ট। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বন্ধু, যা অন্যান্য বন্ধু হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অন্য কোনো বন্ধু আল্লাহর কাছে এই স্তরে উপনীত হতে পারে না।

صَفْوٌ ও صَفَا ধাতু হতে নির্গত اَلصَّفِيُّ বা اَلصَّفِيَّةُ হলো আন্তরিক বন্ধু, সুহৃদ; অন্তরঙ্গ সঙ্গী। صَفِيٌّ'র বহুবচন أَصْفِيَاءُ। صَفْوٌ হতে صَفِيٌّ বা এ জাতীয় যতো শব্দ নির্গত হয়, সবগুলোই একই অর্থ ধারণ করে। সুতরাং صَفِيٌّ'র অর্থানুসারে মুস্তাফার অর্থ হলো– সেই সত্তা, যার সাথে আল্লাহর গভীর বন্ধুত্ব, ভালোবাসা ও হৃদ্যতা বিদ্যমান।

'সফিয়ুন' (صَفِيٌّ)'র সংজ্ঞা

আরবি ভাষায় صَفِيٌّ'র সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া হয়েছে–

اَلصَّفِيُّ مَا يُصْطَفَيْهِ الرَّئِيْسُ لِنَفْسِهٖ قَبْلَ الْقِسْمَةِ.

–প্রধান ব্যক্তি যা বণ্টনের পূর্বে নিজের জন্য গ্রহণ করে।[১]

এই দিক-বিবেচনায় مُصْطَفٰى'র অর্থ দাঁড়ায়– যখন আল্লাহ তা'আলা রুহ তথা আত্মা সৃষ্টি করলেন, তখন তাদের মধ্য থেকে কিছু আত্মা নিজের জন্য বেছে বেছে নেন। যেমন হাদিসে আছে–

اَلْأَرْوَاحُ جُنُوْدُهٗ بِجُنْدِهٖ.

–আত্মার জগতে আত্মাসমূহ দলবদ্ধভাবে রয়েছে।[২]

মূলত ভালোবাসা আত্মার জগতেই বণ্টিত হয়ে যায়। এই صَفِيٌّ হতে مُصْطَفٰى নির্গত হয়েছে। যার অর্থ দাঁড়ায়– প্রেম ও ভালোবাসা সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মনোনীত করে নেন।

---

[১]. ইমাম রাগেব ইস্পাহানী : আল মুফরাদাত, পৃ. ২৮৩।
[২]. বুখারী : আস্ সহীহ, কিতাবুল আম্বিয়া, ১:৪৬৯।

তারপর ভালোবাসাকে একে অপরের মাঝে বণ্টন করে দেন। যেমন মাকে সন্তানের ভালোবাসার জন্য, ভাইকে ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসার জন্য ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 'মুযহিরিয়্যাত' (مُظْهَرِيَّةٌ)

রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ জন্য মুস্তাফা বলা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সুপ্রিয় ব্যক্তির স্থানে অধিষ্ঠিত করে নিজের জন্য মনোনীত করেন। এ দিক থেকে তিনি সাধারণভাবে অন্যান্য প্রিয় ব্যক্তিগণের মতো নন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য ভালোবাসার যে স্তর নির্ধারিত, তা مُصْطَفٰى শব্দ হতে অনুধাবন করা যায়। এটাই সবচেয়ে উচ্চ স্থান, যেখানে তার কোনো সমকক্ষ নেই।

লক্ষণীয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই প্রিয়তা একান্তই তার, যা অন্য কোনো নবির ছিল না।

'মুযহিরিয়্যাত' (مُظْهَرِيَّةٌ)-এর প্রকারসমূহ

مُظْهَرِيَّةٌ-এর চারটি প্রকার রয়েছে। যথা–

(১) مُظْهَرِيَّةُ الذَّاتِ
(২) مُظْهَرِيَّةُ الصِّفَاتِ
(৩) مُظْهَرِيَّةُ الْأَسْمَاءِ
(৪) مُظْهَرِيَّةُ الْأَفْعَالِ

এই বিভাজনে আল্লাহর ওলিদের তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকারের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে উক্ত বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

فَإِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سَاجِدِيْنَ.

–অতঃপর যখন তাকে ঠিকঠাক করে নেব এবং তাকে আমার রুহ থেকে ফুঁক দেব, তখন তোমরা তার সামনে সেজদায় পড়ে যেয়ো।[১]

---

[১]. আল কুরআন : সূরা হিজর, ১৫:২৯।

রূহ ফুঁক দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম-এর মধ্যে উক্ত বৈশিষ্ট্য উপ্ত করেন। আর সেই বৈশিষ্ট্য জ্ঞানের ব্যাপারে ছিল, যা নিচের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে–

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا.

–আর আদমকে শেখালেন নামসমূহ।[১]

এখানে হযরত আদমের (আলাইহিস্ সালাম) জন্য নামসমূহের উল্লেখ রয়েছে, যেন তার বৈশিষ্ট্যে নাম, কর্ম ও গুণের সমাবেশ ঘটে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য প্রিয়তা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য একান্তই ব্যক্তিসংশ্লিষ্ট ছিল। কারণ এটাই তার مُصْطَفَائِيَّتْ তথা একান্তভাবে চয়িত হওয়ার দাবি। এ জন্য কুরআন মাজীদে নবিগণ ও সৎকর্মশীলদেরকে 'আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রত্যাশী' বলা হয়েছে।

নবীগণের মধ্যে হযরত সুলাইমানের (আলাইহিস্ সালাম) মতো নবী আরজ করে বলেন–

وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.

–হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার সেই নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি এবং নিজ অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর।[২]

কিন্তু নিজের প্রিয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে বলেন–

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى.

–সত্বরই আপনার পালনকর্তা আপনাকে দান করবেন; অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হবেন।[৩]

[১]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:৩১।
[২]. আল কুরআন : সূরা নমল, ২৭:১৯।
[৩]. আল কুরআন : সূরা দ্বোহা, ৯৩:৫।

এটা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর اِصْطِفَائِيَّتْ এর পরিস্থিতি। ভালোবাসার দাবিতে– বান্দা নিজের রবের সন্তুষ্টি আশা করে, আর মুস্তাফার পরিস্থিতিতে– আল্লাহ নিজের প্রিয়তমের সন্তুষ্টি আশা করে।

اِصْطِفَاءْ'র ক্ষেত্রে সাধনা যথেষ্ট নয়। কারণ প্রিয়তমের ক্ষেত্রে এটা শুভনীয় নয়। এটা অবশ্য প্রেমিকের জন্য প্রযোজ্য। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চয়ন 'প্রিয়তম' হিসেবে।

'লাকা' (لَكَ)-শব্দ 'প্রিয়তমের' অবস্থাসূচক

রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মনোনীতকরণের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ.

–আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি।[১]

বর্ণিত আয়াতে 'লাকা' (لَكَ) শব্দ দ্বারা মনোনয়নের ধারণা নিশ্চিত করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাকে নিজের জন্য মনোনীত করেন এবং তার আলোচনাকে সমুচ্চ করেন।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ.

–আমি কি আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেই নি?[২]

বর্ণিত আয়াতে শুধু أَلَمْ نَشْرَحْ صَدْرَكَ বললেও যথেষ্ট হতো। কিন্তু তা না বলে বলা হয়েছে– أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ। অনুরূপভাবে وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ না বলে وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ বলা হয়েছে। এখানে لَكَ ভঙ্গিটা লক্ষণীয়, যা মনোনয়নের বার্তা বহন করে। এবং এটা করা হয়েছে রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে।

অনুরূপভাবে আরেকটি আয়াতে 'প্রিয়তমের' এই ভালোবাসাকে আরেকটি আয়াতে অত্যন্ত সুচারুরূপে বর্ণনা করেছেন–

[১]. আল কুরআন : সূরা ইনশিরাহ, ৯৪:৪।
[২]. আল কুরআন : সূরা ইনশিরাহ, ৯৪:১।

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا.

–নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বারবার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব, অবশ্যই আমি আপনাকে সে কেবলার দিকে ঘুরিয়ে দেব যেটা আপনি পছন্দ করেন।[১]

যেখানে হযরত সুলাইমানের (আলাইহিস্ সালাম) আলোচনা ছিল, সেখানে تَرْضَاهُ বাক্য ছিল। অর্থাৎ হে আল্লাহ, যাতে আপনি সন্তুষ্ট থাকেন। কিন্তু রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যাপারে বলা হয়েছে تَرْضَاهَا। অর্থাৎ আমি আপনাকে সেই কেবলার দিকে ঘুরিয়ে দেবো যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন। এটা রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মনোনয়নের চিত্র (شَانِ الْمُصْطَفَائِيَّةِ)।

আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুস্তাফা বানান, অর্থাৎ নিজের জন্য মনোনীত করেন। তাই মনোনয়নের এটাই দাবি যে, পদে পদে আল্লাহ তা'আলা তাকে তুষ্ট রাখবেন। রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যাপারে এটাই আল্লাহর সিদ্ধান্ত।

মর্যাদাসম্পন্ন নবী

আরবি ভাষায় صُفُوٌ বা صَفَا মূলধাতু হতে একটি শব্দ নির্গত হয় اَلصَّفَايَا।

اَلصَّفَايَا يُقَالُ لِلنَّخْلَةِ الْكَثِيْرَةِ الْحَمْلِ.

–এক প্রকারের খেজুর বৃক্ষ, যাতে প্রচুর ফল ধরে এবং অতিরিক্ত ফলের কারণে শাখা-প্রশাখা দৃষ্টিগোচর হয় না।[২]

ফল বা খেজুর হলো গাছের মর্যাদার স্মারক। গাছে খেজুর না থাকলে তার কোনো মূল্য থাকে না। সুতরাং গাছকে মূল্যবান হওয়ার জন্য ফলবান হতে হবে। صَفَايَا শব্দের অর্থ যদি এটাই হয়, তাহলে এই শব্দ হতে নির্গত সমস্ত শব্দে উক্ত অর্থের সমাগম থাকবে। সুতরাং صَفَايَا হতে নির্গত مُصْطَفَى শব্দের অর্থ হবে– যে সত্তা অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। যে সত্তার শাখায়-প্রশাখায় শুধু মর্যাদা

[১]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:১৪৪।
[২]. ইমাম রাগেব ইস্পাহানী : আল মুফরাদাত, পৃ. ২৮৩।

আর মর্যাদা দেখা যাবে। তার এই পূর্ণতা ও মর্যাদার কোনো সীমা-পরিসীমা থাকবে না– সেই সত্তাকে বলা হয় مُصْطَفَى।

'মুস্তফা' (مُصْطَفَى) শব্দের সমন্বিত তাৎপর্য

উপরে বর্ণিত ব্যাখ্যা হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে,

كَثِيْرُ الْفَضَائِلِ مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ.

–অধিক মর্যাদাবিশিষ্ট, যার কোনো সীমারেখা নেই। এটাই রাসূলের নামের (مُحَمَّدٌ) প্রকৃত ও যথার্থ অর্থ।

'মুহাম্মদ' (مُحَمَّدٌ) শব্দের ব্যাখ্যা

'মুহাম্মদ' শব্দটির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে–

(১) اَلَّذِيْ يُحْمِدُ حَمْدًا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ- যে সত্তার বারবার প্রশংসা করা যায়।

(২) اَلَّذِيْ حَمِدَ حَمْدًا كَرَّةً بَعْدَ كَرَّةٍ مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ- যিনি বারবার প্রশংসিত; যার কোনো সীমারেখা নেই।

(৩) مُحَمَّدٌ هُوَ الَّذِيْ كَثُرَتْ خِصَالُهُ الْمَحْمُوْدَةُ- যার প্রশংসনীয় গুণাবলি অত্যাধিক।

উক্ত অর্থের পেছনে কুরআনের সমর্থন

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ.

–নিশ্চয়ই আমি আপনাকে 'কাউসার' দান করেছি।[১]

كَوْثَرٌ 'فَوْعَلٌ'র ওজনে 'مُبَالَغَةٌ'র সিগাহ, যা বস্তুর অতিরেক নির্দেশ করে। সুতরাং বাক্যের অর্থ হবে– হে হাবীব! আমি আপনাকে শুধু অধিক মর্যাদা নয়, সীমাহীন মর্যাদা দান করেছি। كَثِيْرٌ নয়, كَوْثَرٌ দান করেছি। এখানে কাউসার শব্দের প্রচলিত অর্থও অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে হাউজে কাউসারের অর্থ সীমিত, যেখানে কাউসারের ব্যাপক অর্থ অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই ব্যাপক অর্থ ধরা হলে অন্যান্য গুণের পাশাপাশি হাউজে কাউসারও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

[১]. আল কুরআন : সূরা কাওসার, ১০৮:১।

উক্ত অর্থের পেছনে হাদিসের সমর্থন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ أُعْطِيْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْأَرْضِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّوْنَ.

–আমাকে অন্য নবিগণের উপর ছয়টি বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা দান করা হয়েছে। (১) আমাকে এমন বাক্যের জ্ঞান দান করা হয়েছে, যা অল্প শব্দে ব্যাপক অর্থ ধারণ করে (বহুমুখী/সর্বব্যাপী/ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ)। (২) প্রতাপ সঞ্চারকারী ভীতি দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। (৩) গনিমতের মাল আমার জন্য হালাল করা হয়েছে। (৪) গোটা ভূপৃষ্ঠকে আমার জন্য মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়েছে। (৫) আমাকে গোটা বিশ্ববাসীর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এবং (৬) আমার মাধ্যমে নবুওয়াতের ধারাকে সমাপ্ত করা হয়েছে।[১]

গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ

উপরে বর্ণিত আয়াতে كَوْثَرْ শব্দটি অতিরঞ্জনের অর্থ-সহ ব্যবহৃত হয়েছে। অতিরেকের অতিরেক বলা হয়– যেখানে অতিরেকের সমস্ত প্রশস্ততা সমাপ্ত হয়। যে স্থান হতে অতিরেক নির্গত হয় এবং যেখানে সমস্ত অতিরেকের সমাপ্তি ঘটে, সেটাকে বলা হয় অতিরেকের অতিরেক। যা থেকে সমুদয় অতিরেক বের হয় এবং যেখানে এসে সমাপ্ত হয়, সেটা হলো وَحْدَةٌ তথা এককতার স্তর। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে–

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ.

বলুন, তিনি আল্লাহ এক।[২]

অর্থাৎ যে স্তর হতে সমস্ত অতিরেক বের হচ্ছে এবং যেখানে সমস্ত অতিরেক সমাপ্ত হচ্ছে, সেটা হলো আল্লাহর স্তর। এখন কাউসারের অর্থ হবে- হে প্রিয়তম, তুমি আর কী চাইবে? স্বয়ং আমি তোমার ভেতরে মিশে গেলাম। এখন আর কী অবশিষ্ট রইল? আমি আমার সত্তা তোমাকে অর্পণ করেছি। এখন

[১]. তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু ফাযায়িলি সায়্যিদিল মুরসালীন, পৃ. ৫১২।
[২]. আল কুরআন : সূরা ইখলাস, ১১২:১।

অন্যান্য অর্থের সাথেও সাযুজ্য পাওয়া যাবে। কাউকে নিজের ভালোবাসার জন্য বেছে নেওয়া হলে তখন বলা হয় "আমি তোমার হয়ে গেলাম।" আল্লাহর সত্তাকে পাওয়ার অর্থও এটাই। অর্থাৎ তার ভালোবাসা, নৈকট্য ও দর্শন লাভ করা। তখনই "আল্লাহকে পাওয়া" বলা হয়। এরই ভিত্তিতে আল্লাহ বলেছেন– আমি তোমাকে আমার ভালোবাসার জন্য নির্বাচিত করেছি এবং মনোনীত করেছি।

সুতরাং إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ-এর অর্থ হবে– মানুষ আমাকে পাওয়ার জন্য উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ পায়, আবার কেউ পায় না। আমি তোমার সাথে এভাবে মিশে গেলাম যে, সবকিছু তোমার হয়ে গেলো। আর যার কাছে আল্লাহ ধরা দেন, তার কাছে সবকিছু খুব সহজতার সাথে প্রাপণীয়।

এখন মুস্তাফার অর্থ হবে– সেই সত্তা, যার মর্যাদা এতোই বেশি যে, আল্লাহর আলোকবর্তিকা সেখানে দৃষ্টিগোচর হবে এবং সেখানে গোটা সৃষ্টি জগতের মর্যাদাসমূহের সমাবেশ থাকবে।

করুণার আকর

صَفَا ও صَفْوٌ হতে নির্গত আরেকটি শব্দ হলো صَفْوَانٌ। কথিত আছে يَوْمٌ صَفْوَانٌ। আরেকটি নির্গত রূপ হলো صَافِيٌ। বলা হয় يَوْمٌ صَافِيٌ।

يَوْمٌ صَفْوَانٌ-এর অর্থ হলো يَوْمٌ بَارِدٌ। অর্থাৎ খুব ঠাণ্ডা দিন। এমন শীতলতা, যেখানে উষ্ণতার ছায়া পর্যন্ত থাকে না। শীতলতা ও উষ্ণতা দুটো পরস্পরবিরোধী অবস্থা। উষ্ণতা আগুন নির্দেশ করে, যা ক্রোধ, রোষ ও রাগের দর্পণ। পক্ষান্তরে শীতলতা নির্দেশ করে রহমত, প্রশান্তি, অনুরাগ ও ভালোবাসা। শীতলতায় অন্তর প্রশান্ত হয়, আরাম-বোধ করে। উষ্ণতায় মানুষ অস্থৈর্য অনুভব করে। এ জন্য কেয়ামতের দিনকে উষ্ণ করা হয়েছে, যেন মানুষ সীমাহীন অস্থৈর্যে থাকে। যদি কেয়ামতের দিন শীতল হতো, তাহলে কেউ কেউ প্রশান্তিতে ঘুমিয়ে পড়তো।

صَفَا ও صَفْوٌ হতে শীতলতার অর্থ প্রমাণিত, যা করুণা ও বিশ্রামের দর্পণ। এ থেকেই مُصْطَفَى গঠিত। অর্থাৎ যে সত্তার মাঝে রয়েছে রহমতের শীতলতা ও প্রশান্তি; যার ভেতরে উষ্ণতা, রাগ বা আক্রোশের পরশ নেই এবং যেখানে বিন্দুমাত্র ক্রোধ বা রোষ নেই।

<u>উক্ত ব্যাখ্যার সমর্থনে কুরআন মাজীদের আয়াত</u>

মুস্তাফার উপরে বর্ণিত অর্থের সমর্থনে কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.

—আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি গোটা বিশ্বজগতের জন্য রহমতরূপে।[১]

এখানে ধারণাগত সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। مَا দ্বারা না-বোধকতা এবং إِلَّا দ্বারা হাঁ-বোধকতা 'সীমাবদ্ধতার' নির্দেশক। حَصْرٌ বা সীমাবদ্ধতার ধারণা এই যে, কখনো বিশেষণ বিশেষ্যের সাথে সীমাবদ্ধ থাকে, আবার কখনো বিশেষ্য বিশেষণের সাথে সীমাবদ্ধ থাকে। এখানে দ্বিতীয়টা ঘটেছে। অর্থাৎ আমি আপনাকে শুধু রহমত এবং রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি। তিনি যেহেতু মুস্তাফা, তাই তার ভেতরে ক্রোধ বা রোষের উষ্ণতা নেই। যদি ক্রোধের পরশ থাকতো, তাহলে তার দ্বারা কারো না কারো কষ্ট পাওয়ার সম্ভাবনা থাকতো। অথচ আল্লাহর জন্য দুটো দিকই নির্ধারিত। রহমতের শীতলতাও রয়েছে, আবার ক্রোধের উষ্ণতাও। আল্লাহ তা'আলা পরম করুণাময়ও, এবং প্রবল পরাক্রমশালীও। কিন্তু রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুধু রহমতরূপে প্রেরণ করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে কাউকে স্পর্শ করলে শীতলতা ও খুশবো দুটোই অনুধাবন করা যেতো। কুরআন মাজীদে রয়েছে—

حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ.

—তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।[২]

তিনি শুধু রহমতরূপেই প্রেরিত হয়েছেন। তাই তোমাদের কষ্টসমূহ তার পক্ষে দুঃসহ। তোমাদের যন্ত্রণা ও বেদনা তিনি সহ্য করতে পারেন না।

<u>ক্রোধের উষ্ণতার অনুপস্থিতি</u>

রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাঝে ক্রোধ ও রাগের অনুপস্থিতির উল্লেখ করে কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

[১]. আল কুরআন : সূরা আম্বিয়া, ২১:১০৭।
[২]. আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:১২৮।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ.

—আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছে। পক্ষান্তরে আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন-হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো।[১]

যারা তার নিকটবর্তী হয়, তারা শীতলতার পরশ অনুভব করে, প্রশান্তি ও আরাম-বোধ করে। কারণ তিনি শুধু রহমতরূপেই প্রেরিত হয়েছেন। ক্রোধ ও রাগের অনুভূতি থেকে তাকে দূরে রাখা হয়েছে।

<u>এককতা ও অভিনবতার আকর</u>

صَفَا ও صَفْوٌ-এর আরেকটি অর্থ হলো দ্বন্দ্ব-নিরসন ও মীমাংসা-সাধন। বলা হয় تَصَاوَفُوْا أَيْ تَوَافَقُوْا। দু জনের মধ্যবর্তী দ্বন্দ্বের মীমাংসা ঘটলে এরূপ বলা হয়। এটাও মূলত صَفْوٌ তথা স্বচ্ছতার জন্য। অন্তরের কুটিলতাকে স্বচ্ছতায় রূপান্তরিত করার নাম হলো صَفْوٌ। صَفْوٌ তথা স্বচ্ছতা কুটিলতার বিপরীত ধারণা। শত্রুতা ও বিদ্বেষ হলো অন্তরের কুটিলতা; তা থেকে অন্তরকে পবিত্র করাকেই বলা হয় صَفْوٌ তথা স্বচ্ছতা। অন্তরকে কুটিলতামুক্ত করার জন্যই বন্ধুত্ব করা হয়। সুতরাং صَفْوٌ-এর অর্থ হলো অন্তরকে দ্বন্দ্ব ও শত্রুতা হতে মুক্ত রাখা। তাহলে মুস্তাফার অর্থ হবে- যার অস্তিত্বের কারণে বন্ধুত্ব, ভালোবাসা ও সম্প্রীতির নহর প্রবাহিত হয়। যার সৃষ্টির কারণে হিংসা-বিদ্বেষ এবং শত্রুতা দূরীভূত হয়। দ্বান্দ্বিক হৃদয় পরস্পরের মাঝে দ্রবীভূত হয়। কুটিলতাপূর্ণ হৃদয় ভালোবাসা-সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সুতরাং যে সত্তা বন্ধুতা, ভালোবাসা ও অন্তরঙ্গতার আকর, তাকে বলা হয় মুস্তাফা। এ ধারণাকে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে এভাবে বলেছেন—

فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا.

—আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর

[১]. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:১৪৫।

আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তার অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ।[১]

فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ: তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا: তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়েছো। অর্থাৎ ভ্রাতৃত্ব ও অন্তরঙ্গতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছো। এই ভালোবাসা-সম্প্রীতি, বন্ধুত্ব-ভ্রাতৃত্ব হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কারণে সম্ভব হয়েছে।

-----□□□-----

[১]. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:১০৩।

আশ-শিফা
বি তা'রীফি হুকুকিল মুস্তফা
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَسَلِّمْ

ফকীহ কাযী ইমাম হাফিজ আবুল ফযল আয়ায বিন মূসা বিন আয়ায স্পেনী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ তায়ালার, যিনি নিজ একক গুণে সমুন্নত। তিনি স্বীয় ইজ্জতে একক সম্মানিত ও সুরক্ষিত। যার কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা কিছুই নেই। তিনি অসীম। আর তাঁর সত্তা ব্যতীত অন্য কিছুই নেই। তিনি প্রকাশ্যে মানবীয় ধ্যান-ধারণার অনেক অনেক উর্ধ্বে। তিনি গোপনীয় তবে, তিনি সেই দিক থেকেও অতি পবিত্র মহান। তাঁর কোনো হীনতা ও নিচুতা নেই। তাঁর রহমত ও ইলম সারা জগতকে আবৃত করে আছে। তিনি তাঁর নৈকট্যভাজন বন্ধুদের ব্যাপক আকারে প্রদান করেছেন স্বীয় নিয়ামত। তাঁদের মধ্যে এমন পবিত্র সত্তাকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেন যিনি আরব-অনারব সকলের চাইতে সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী। সকলের চাইতে সর্বাধিক সম্মানিত, জ্ঞানী, ধীরস্থির, বীরত্বের অধিকারী। জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তায় সবার উর্ধ্বে। ইচ্ছা ও প্রত্যয়ে সর্বাধিক সুদৃঢ়। দয়া ও স্নেহের আধার। শারীরিক ও আত্মিক উভয় দিক থেকে পূতঃপবিত্র। সকল প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে সম্পূর্ণ নিখুঁত। তাঁকে আল্লাহ তায়ালা ইলম ও হিকমত দুটি অমূল্য বস্তু প্রদান করেছেন। তাঁর মাধ্যমে তিনি অন্ধদের হিদায়াতের আলো দান করেন। সুপ্তাত্মাকে করেন জাগ্রত। বধিরদের দান করেছেন শ্রবণশক্তি। সুতরাং যার তকদিরে আল্লাহ তায়ালা কল্যাণ লিপিবদ্ধ করেছেন সেই ঈমান এনেছে। সে তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করেছে তাঁকে সাহায্য-সহায়তা করেছে। আর যার ভাগ্যে অনন্তকালীন দুঃখ-কষ্ট রয়েছে সে তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং তাঁর সমুজ্জ্বল মু'জিযা দেখার পরও তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِۦٓ أَعۡمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ أَعۡمَىٰ

—এবং যে ব্যক্তি এ জগতে অন্ধ হয়, সে পরকালেও অন্ধ।[১]

আল্লাহ তায়ালা আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর প্রতি রহমত অবতীর্ণ করুক যা সর্বদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকবে। অনুরূপ রহমত তাঁর সহচর ও পরিবারবর্গ সবার উপর অবতীর্ণ হোক।

[১]. আল কুরআন : সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:৭২।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবার অন্তরকে ঈমান ও সুদৃঢ় বিশ্বাসের আলোকে আলোকিত করে আমাদের সবার উপর ওই রহমত অবতীর্ণ করুন যা তাঁর নৈকট্যভাজন বন্ধুদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। যাদেরকে তিনি দয়া ও অনুগ্রহের প্রবণতার সাথে স্বীয় ইশক ও মুহাব্বতে তন্ময় করে দেন। যার কারণে তারা সেই মহান সত্তা ব্যতীত অন্য সবকিছু পরিত্যাগ করেছে। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মারিফাত বা পরিচিতির জ্ঞান দান করেছেন। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাজত্ব ও মালাকুতের অতি আশ্চর্য নিদর্শনাবলী কুদরতের কারিশমা প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। যার কারণে তাঁর অন্তর খুশিতে আত্মহারা হয়েছে। তাঁর পবিত্র আকল আল্লাহ তায়ালার সত্তার আযমতকে প্রত্যক্ষ করে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। সুতরাং তিনি সকল প্রকার চিন্তা-ভাবনা পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার ইশক ও মুহাব্বতের চিন্তাকে নিজের জন্য নির্ধারণ করেছেন। তিনি দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে ওই মহান সত্তাকে নিজের লক্ষ্যস্থল স্থির করেছেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার জামাল ও জালালকে প্রত্যক্ষ করার স্বাদ উপভোগ করেছেন। তাঁর অসীম কুদরতের নিদর্শনাবলী ও আযমতের মধ্যে প্রতিনিয়ত বিস্ময়ের লীলা খেলা চলেছে। এ সব কিছুর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি সেই মহান সত্তা ব্যতীত আর কারও উপর ভরসা না করে একান্ত নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে আল্লাহ তা'আলার বাণীর উপর নিজেকে পরিচালিত করেন।

قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ۝

—বলুন! আল্লাহই যথেষ্ট অতঃপর তাদেরকে ছেড়ে দিন তাদের অনর্থক কাজের মধ্যে খেলতে।[১]

আপনারা আমাকে দীর্ঘদিন যাবৎ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মর্যাদা ও ফযীলত সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনার জন্য অনুরোধ করে আসছেন। যাতে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বাধিক সুমহান মর্যাদা ও সমুন্নত ফযিলতের ব্যাপক আলোচনা করা হয়। তিনি যার উপযুক্ত। তাঁর সুমহান মর্যাদা সমুন্নত ফযিলতের ব্যাপক আলোচনা করবো। অথচ আমি তাঁর সমুন্নত মর্যাদা ও হাকীকত সম্পর্কে যা কিছু আলোচনা করি না কেন তা তাঁর আযমতের শান ও সমুন্নত মর্যাদার তুলনায় কিছুই নয়। আপনারা আমাকে অনুরোধ করে বলেছেন যেন আমি আপনাদের জন্য আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গ ও ইমামদের হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

১. আল কুরআন : সূরা আন'আম, ৬:৯১।

ওয়াসাল্লাম) এর শানে বর্ণিত অমূল্য বাণীসমূহ যা তাঁরা বিভিন্ন সময়ে উল্লেখ করেছেন, সেগুলোকে একত্রে সন্নিবেশ করি এবং ঐ সমস্ত বুজুর্গদের অভিমতসমূহকে উদাহরণ ও উপমা হিসেবে স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরি। কিন্তু এ কথা অবশ্যই স্মরণ রাখবেন যে, আপনারা আমার উপর কঠিন দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন। সত্যকথা বলতেকি আপনারা আমাকে এ কাজের দায়িত্ব দিয়ে ভীষণ বিপদ ফেলেছেন। আমার মনে হয় আপনারা আমার উপর এ কঠিন দায়িত্ব ন্যাস্ত করে আমাকে এক বিরাট উঁচু টিলার উপর দাঁড় করে দিয়েছেন। যার কারণে আমার অন্তর ভীষণভাবে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। কোথায় আমি অধম, আর কোথায় হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রশংসনীয় গুণাবলী সুমহান মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব। কেননা তাঁর মহান সত্তার গুণাবলী বর্ণনা করতে হলে তা নীতি-নির্ধারণ অনুযায়ী আলোচনা করতে হবে। তাঁর প্রশংসনীয় গুণাবলীর প্রতিটি বিষয়কে পৃথক পৃথক করে স্পষ্টভাবে আলোচনা করতে হবে। ইলমের সূক্ষ্ম বিষয়াবলী স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে হবে। কেননা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মহান সত্তার সাথে তা সম্পর্কিত। তাঁর সাথে সাথে এ কথাও বর্ণনা করতে হবে যে, তাঁর মহান সত্তার জন্য কোন বিষয় কতটুকু জায়িয আর কোনটি তাঁর জন্য নাজায়িয তাও উল্লেখ করতে হবে। আর সে বিষয় আলোচনা করতে হলে নবী-রাসূলদের মর্যাদা, নবুওয়াত ও রিসালাতের মাকাম সম্পর্কে অবশ্যই জানতে ও বুঝতে হবে। মুহাব্বত ও বন্ধুত্ব আর সেই সমুন্নত মর্যাদার বিশেষত্ব সম্পর্কে জানতে হবে। সেটা বিরাট এক ফুলের বাগান সদৃশ। যেখানে দ্রুতগতি ও তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন পাখিও হতভম্ব হয়ে পড়ে। তার চলার শক্তি স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মুবারক সীরাতের বাগান এমন এক-বাগান যে বাগানে পরিভ্রমণ করতে গেলে বিচক্ষণ ব্যক্তিদের বিচক্ষণতা লোপ পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। তবে যে স্বীয় জ্ঞানের আলোকে পবিত্র কৃপা দৃষ্টি লাভ করতে সক্ষম হবে সে হয়তো বা কিঞ্চিত বুঝতে পারবে। তাঁর পবিত্র সীরাতের ময়দান কতো ব্যাপক প্রসারিত আল্লাহ তা'আলা সাহায্য না করলে বা সামর্থ না দিলে সেখানে প্রতিটি পদক্ষেপে পদস্খলনের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

আমি শুধু আপনাদের অনুরোধ রক্ষা ও সাওয়াবের আশায় আল্লাহ তা'আলার করুণা ও অনুগ্রহের আশাবাদী। কেননা আমি এক পবিত্র সত্তার প্রশংসা ও সমুন্নত মর্যাদার আলোচনা করেছি। তাঁর মহান চরিত্র, মহিমান্বিত গুণাবলীর বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্যসমূহের আলোচনা করেছি। সে সমস্ত গুণাবলী তাঁর পূর্বে আর কোন সৃষ্টি জীবের মধ্যে সমবেত হয়নি। আর তাঁর সেই অধিকারসমূহের কথা আলোচনা

করেছি যাতে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে ও সর্বদিক দিয়ে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমান্বিত।

لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِيمَـٰنًا ۙ

–যাতে আহলে কিতাবদের ঈমান সুদৃঢ় হয় এবং মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।[১]

এ কারণে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদি ও নাসারাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। তারা যেন হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সত্যবাদিতার কথা মানুষের নিকট প্রকাশ করে। তাঁর হাকীকত যেন গোপন না করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো যে, ইয়াহুদি ও নাসারাগণ তা করেনি। তারা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে চেনার পরও প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে তাঁর নবুওয়াতের সত্যতা ও মহিমান্বিত গুণাবলীকে আড়ালাবৃত করে রেখেছে। সুতরাং মুসলমান ওলামাদের দায়িত্ব হলো দুনিয়াতে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মান মর্যাদা প্রকাশ করা। যেমন–

হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

–কোনো আলেমকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হল, আর সে জেনে শুনে তা গোপন করল, তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে।[২]

এই হাদীসের আলোকে আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র সীরাত আলোচনায় বিশেষ তৎপর হয়েছি। যাতে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব থেকে আমি অতি তাড়াতাড়ি মুক্ত হয়ে আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করতে পারি। আমি এ কাজ অতি দ্রুত সমাধান করার চেষ্টা করছি। কেননা মানুষের দেহ মন সর্বদা কামনা-বাসনায় লিপ্ত থাকে। এই পরিশ্রম ও কামনা-বাসনাকে শৃঙ্খলের মত গলায় পরিয়ে দেয়া হয়েছে মানুষ সেই শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভ করবে কিভাবে। কেননা মানুষ কামনা-বাসনার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হবার কারণে ফরয, নফল ইত্যাদি কাজে উদাসীন হয়ে আছে। যার ফলে যে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব সেই মানুষ পরিণত

---

১. আল কুরআন : সূরা মুদ্দাস্‌সির, ৭৪:১।

২. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফী কিতমানিল ইলমি, ৯:২৪৭।
খ) আবু দাউদ : আস্ সুনান, কারাহিয়্যাতু মানয়িল ইলমি, ১০:৭৩।
গ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, মান সুয়িলা আন ইলমিন..., ১:৩০৮।

হয়েছে সৃষ্টির সব নিকৃষ্ট জীবে। যদি আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে কোনো বান্দাকে আনন্দিত করতে ইচ্ছে করেন; তাহলে তাকে এ ধরনের আমল করার সামর্থ দান করেন। যার ফলে সে কিয়ামতের মাঠে প্রশংসার যোগ্য হবে। আর তার এমন কোনো দোষত্রুটি থাকবে না যার ফলে তাকে জবাবদিহী করতে হবে। কিয়ামতের মাঠে শেষ পরিণতি দু'ধরনের হবে। হয়তো জান্নাতের অফুরন্ত নিয়ামতের অধিকারী হবে। কিংবা জাহান্নামের কঠিন আযাবের অংশীদার হবে। তাই বুদ্ধিমান মানুষের কাজ হলো স্বীয় প্রবৃত্তির বিষয় চিন্তা-ভাবনা করা ও তাকে অনর্থক কথা ও কাজ থেকে মুক্ত করে নেক আমল ও কল্যাণকর জ্ঞান লাভ করার কাজে নিয়োজিত করা। যাতে সে পরকালে উপকৃত হতে পারে এবং জনসাধারণের উপকার করতে সক্ষম হয়।

আল্লাহ তা'আলার নিকট আমার আকুল আবেদন তিনি যেন আমাদের অন্তরের খারাপ চিন্তাচেতনা দূর করে পাপসমূহ মার্জনা করে দেন। যার ফলে আমরা নাজাত লাভের অধিকারী হতে পারি। আল্লাহ তা'আলা যাতে আমাদেরকে তাঁর রহমত ও করুণার সামান্যতম অংশ দান করেন।

আমি আমার রচিত কিতাব এক অভিনব পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করছি। এবং কিতাবের নামকরণ করছি 'আশ-শিফা বিতা'রিফি হুকুকীল মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'। আমি আমার সম্পূর্ণ আলোচনাকে চার পর্বে বিভক্ত করেছি।

প্রথম পর্ব–
আল্লাহ তা'আলা কাজ ও কথায় হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে কিরূপ সম্মান প্রদর্শন করেছেন সে বিষয় আলোকপাত করছি।

দ্বিতীয় পর্ব–
আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর সম্মানার্থে মানুষের প্রতি আরোপিত বিষয়সমূহ উল্লেখ করছি।

তৃতীয় পর্ব–
হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সম্পর্কে মানুষের কোন কোন বিষয় আলোচনা করা উচিত, আর কোন কোন বিষয় আলোচনা করা অনুচিত সে বিষয়ে আলোচনা করছি।

চতুর্থ পর্ব–
হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শানে কটুক্তি কিংবা বেয়াদবী করলে তাকে কি শাস্তি দেয়া হবে, সে বিষয় আলোচনা করছি।

আশাকরি বিন্যাসের উক্ত ধারায় বক্ষমান গ্রন্থটি এবং পূর্ণতা লাভ করবে যা দ্বারা ঈমানের ললাটে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হবে এবং জীবন চরিতের মুকুটে এমন উজ্জ্বল মণিমুক্তা প্রজ্জ্বলিত হবে, যা সকল সন্দেহ ও সংশয়কে বিদূরীত করে ঈমানদারদের বক্ষগুলোকে ব্যধিমুক্ত করবে। সত্যকে প্রকাশ করবে, অধিকিন্তু মূর্খরা মুখ ফিরিয়ে থাকবে। অতএব মহান আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি, যিনি ব্যতীত কোন প্রভু নেই।

اَلْقِسْمُ الْاَوَّلُ

প্রথম পর্ব

فِيْ تَعْظِيْمِ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى لِقَدْرِ هٰذَا النَّبِيِّ ﷺ قَوْلًا وَفِعْلًا

আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক হুযুর (ﷺ) এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন

কাজী আয়ায (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ওই ব্যক্তিকে নেক কাজের তাওফিক দান করেন এবং তাকে সত্যের পথে দৃঢ়তা দান করেন, যাকে তিনি জ্ঞানের দৌলত দান করেন অথবা প্রকৃতিগতভাবে যাকে সঠিক আকল দান করেন। সে অতি সহজে বুঝতে সক্ষম হয় যে, আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে কতো সমুন্নত মর্যাদার অধিকারী করেছেন। আর তাঁকে যে মহিমান্বিত মর্যাদা ও সৌন্দর্য প্রদান করেছেন তা অগণিত ও সীমাহীন। মানুষের জ্ঞান তা অনুভব করতে অক্ষম। তাঁর মহিমান্বিত মর্যাদা এতো ব্যাপক যার বিবরণ পেশ করতে মানুষের কলম ও ভাষা অক্ষম। তাঁর অনেক মহিমান্বিত গুণাবলির বিষয় আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজীদে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করে তাঁর সমুন্নত মর্যাদার কথা মানুষকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। তন্মধ্যে তাঁর পবিত্র আখলাক, আচার-আচরণ ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের তাঁর অনুসরণ-অনুকরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। মূলতঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এমন ফযিলত দান করে শ্রেষ্ঠ মহিমান্বিত করেছেন। তিনি তাঁকে সকল প্রকার ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে পূতঃপবিত্র করেছেন। তারপর তাঁর পরিশুদ্ধতা ও সৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর কামালাতের উপর তিনি অফুরন্ত ফয়েজ দান করেছেন। সুতরাং সকল প্রকার সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ তা'আলার। সূচনাতেও তিনি আবার সমাপ্তিতেও তিনিই। আর পূর্বাপর সকল প্রশংসা ও পবিত্রতা তাঁরই।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কামালাতের মধ্যে কতিপয় কামালাতের কথা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টজীবের নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। আর যে সমস্ত মানুষ হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দীদার লাভে ধন্য হয়েছে তাঁরা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ওই সৌন্দর্য ও তাঁর প্রশংসনীয় আখলাক, তাঁর অগণিত অসংখ্য ফযিলত স্বচক্ষে অবলোকন করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁরা এটাও অবলোকন করতে সক্ষম হয়েছেন যে, তাঁর সমুজ্জ্বল মু'জিযা, নবুয়তের স্পষ্ট দলীল প্রমাণের শ্রেষ্ঠত্ব দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কিভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁকে দেখার যাদের সৌভাগ্য হয়েছে তারা ঐ সমস্ত

বিষয়াবলী ভালোভাবে দেখতে পেয়েছেন। আর সেই নিশ্চিত জ্ঞান বা ইলম সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে আমাদের নিকট পৌঁছেছে। তাই আমরা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নূরের আলোকচ্ছটায় ব্যাপকভাবে আলোকিত হয়েছি।

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে,

أُتِيَ بِالْبُرَاقِ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ مُلْجَمًا مُسْرَجًا فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ أَبِمُحَمَّدٍ تَفْعَلُ هَذَا فَمَا رَكِبَكَ أَحَدٌ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْهُ قَالَ فَارْفَضَّ عَرَقًا،

–মি'রাজ রজনীতে যখন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আরোহণ করানোর জন্য বোরাককে হাওদা পরানো হয় তখন বোরাককে নড়াচড়া করতে দেখে হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) বোরাককে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে এ কী ধরনের আচরণ করছো? স্মরণ রেখো, আল্লাহ তা'আলার নিকট হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী এমন আর কেউ তোমার উপর আরোহণ করেনি। অতএব, তোমাকে তোমার এ মর্যাদার জন্য আনন্দিত হওয়া উচিত। ওই মহান সত্তা যিনি আজ তোমার পিঠে আরোহণ করবেন, তাঁর চাইতে অধিক ইজ্জতের অধিকারী আল্লাহ তা'আলার নিকট আর কেউ নেই। একথা শুনে লজ্জায় বোরাক ঘর্মসিক্ত হয়ে স্থির হয়ে যায়।[১]

---

১. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ওয়ামিন সূরাতি বনী ইসরাঈল, ১০:৪০৫।
খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদে আনাস ইবনে মালেক, ২৫:২৫৭।

اَلْبَابُ الْأَوَّلُ

প্রথম অধ্যায়

فِيْ ثَنَاءِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَإِظْهَارِهِ عَظِيْمَ قَدْرِهِ لَدَيْهِ

আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক হুযুর (ﷺ) এর প্রশংসা ও তাঁর সমীপে তাঁর মহান মর্যাদা

এখন এই অধ্যায় হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এমন মহিমান্বিত মানমর্যাদা-সম্মান ও ফযিলত সম্পর্কে আলোচনা করবো, যা কুরআন মাজীদের অসংখ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। পবিত্র কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ব, উচ্চমর্যাদা-সম্মান ও প্রশংসা বিভিন্ন বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। আর মানুষকে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে ইজ্জত ও সম্মান করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি ওই আয়াতসমূহ উল্লেখ করছি যে সমস্ত আয়াতের মূল উদ্দেশ্য সকলের নিকট সুবিধিত। আর সেই আয়াতসমূহকে দশটি পরিচ্ছেদে সন্নিবেশিত করেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

فِيمَا جَاءَ فِي الْمَدْحِ وَالثَّنَاءِ

কুরআনের আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলার হুযুর (ﷺ) এর প্রশংসা করা

মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজীদে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রশংসা করে এরশাদ করেন–

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

–নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য থেকে ঐ রাসূল তাশরীফ এনেছেন যা তোমাদেরকে বিপন্ন করে তা তাঁর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি তিনি দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।[১]

আল্লামা সমরকন্দি (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, কোনো কোনো লোক 'আনফুসিকুম' (أَنفُسِكُمْ) এর স্থলে 'আনফাসিকুম' (أَنفَسِكُمْ) অর্থাৎ "ফা" বর্ণে জবর যোগে পড়ে। তবে অধিকাংশ মুসলমান পেশ যোগে পড়ে।

ইমাম কাযী আবুল ফযল (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)! আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সৌভাগ্যবান করুন! তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা বিশ্বের সকল মুসলমান, চাই সে আরবী হোক বা মক্কাবাসী হোক বা দুনিয়ার যেকোন স্থানের অধিবাসীই হোক না কেন, (তাফসীরকারকদের মতভেদ থাকা সত্ত্বেও) এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট এমন একজন রাসূলের আগমন ঘটেছে যাঁকে তোমরা খুব ভালোভাবে চিনো। তাঁর মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে তোমরা ভালোভাবে অভিহিত। আর সেই মহিমান্বিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে তোমরা কোনো দিন মিথ্যাবাদী কিংবা অহিতাকাঙ্খী হিসেবে অভিযুক্ত করতে পারনি অথচ তিনি তোমাদের মাঝে ছিলেন। আর না তাঁর বংশের সাথে তোমাদের দূরের ও কাছের আত্মীয়তার বন্ধন ছিলো, এমনও তো নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) ও অপর একদল তাফসীরবিশারদগণের মতে পবিত্র কুরআন মাজীদের আয়াত–

[১]. আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:১২৮।

إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ

–কিন্তু নিকটাত্মীয়ের ভালবাসা।[১]

এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটাই যে, তিনি তাদের সকলের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত, সুউচ্চ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন অর্থাৎ 'আনফাসিকুম' (أَنفَسِكُمْ) শব্দে যদি জবরের সাথে পড়া হয় তাহলে অর্থ দাঁড়াবে "তিনি তোমাদের মধ্যে বিশেষ এবং শ্রেষ্ঠতম"। অতঃপর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রশংসনীয় গুণাবলির উল্লেখ করে অসংখ্য মর্যাদার বিবরণ পেশ করেছেন।

তাঁর তীব্র বাসনা এবং আত্মপ্রত্যয় ছিলো মানুষ সঠিক পথে আসুক, হিদায়াত গ্রহণ করুক। আর মুসলমানদের কষ্টে পতিত হওয়া তাঁর নিকট বড়ই মর্মবিদারক পীড়াদায়ক ব্যাপার। দুনিয়া ও আখিরাতে তোমরাও ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন হবে এটা ছিলো তাঁর নিকট অসহনীয়। এর হাকীকত হলো– তিনি মুসলমানদের প্রতি পরিপূর্ণ দয়ার্দ্র, স্নেহশীল ও মায়ামমতা পোষণকারী। কোনো কোনো আলেমদের অভিমত হলো– আল্লাহ তা'আলা তাঁর আপন নামসমূহের মধ্য থেকে তাঁকে 'রাউফ' ও 'রাহীম' নামদ্বয় প্রদান করেছেন।

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾

–নিশ্চয়ই আল্লাহ মহান অনুগ্রহ করেছেন মুসলমানদের উপর যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তার আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব হিকমত শিক্ষা দেন, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল।[২]

[১]. আল কুরআন : সূরা শুরা, ৪২:২৩।
[২]. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:১৬৪।

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّۦنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾

–তিনিই উম্মী লোকদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যে তাদের নিকট আবৃত্তি করেন তাঁর আয়াতসমূহ; তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত; ইতিপূর্বে তো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।[১]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا۟ تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾

–যেমন আমি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করেছি, যে আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট তিলাওয়াত করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয় আর তোমরা যা জানতে না তা শিক্ষা দেয়।[২]

উক্ত আয়াতসমূহে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রশংসা করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী– 'মিন আনফুসিকুম' (مِنْ أَنْفُسِكُمْ) এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন–

نَسَبًا وَصِهْرًا وَحَسَبًا لَيْسَ فِيْ آبَائِيْ مِنْ لَدُنْ آدَمَ سِفَاحٌ، كُلُّنَا نِكَاحٌ.

[১]. আল কুরআন : সূরা জুম'আহ, ৬২:২।
[২]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:১৫১।

–হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের মধ্যে বংশে ও শ্বশুরের বংশে উৎস 'হযরত আদম (আলাইহিস্ সালাম) থেকে আমার পিতা, পিতামহ কেউ ব্যভিচারী ছিলো না। তাঁরা সবাই বিবাহিত ছিলেন।'

হযরত ইবনে কালবী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَمِائَةَ أُمٍّ، فَمَا وَجَدْتُ فِيْهِنَّ سِفَاحًا وَلَا شَيْئًا مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةِ.

–আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উর্ধ্বতন দাদী-নানীদের পাঁচশ'জনের নাম সংগ্রহ করেছি। কিন্তু তাঁদের মধ্যে একজনও ব্যভিচারী পাইনি। আর তাঁদের কাউকে জাহেলি যুগের অজ্ঞতা ও কাউকে স্পর্শ করতে পারেনি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে,

وَتَقَلُّبَكَ فِى ٱلسَّٰجِدِينَ ﴿٢١٩﴾

–আর আমি আপনাকে নামাযীদের মধ্যে স্থানান্তরিত করেছি।[১]

এ আয়াতের অর্থ হলো–

مِنْ نَبِيٍّ إِلَى نَبِيٍّ حَتَّى أَخْرَجَكَ نَبِيًّا،

–আপনার মহান সত্তা এক নবী থেকে অপর নবীর মধ্যে স্থানান্তরিত হয়েছে। অতঃপর আমি আপনাকে নবী হিসেবে প্রকাশ করেছি।

হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণনা করেছেন; আল্লাহ তা'আলা জানতেন যে, কোনো সৃষ্টিজীবই তাঁর ইবাদতের হক আদায় করতে পারবে না। তাই আল্লাহ তা'আলা উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য চাইলেন মাখলুকের নিকট স্বীয় পরিচয় প্রদান করতে যাতে তারা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে উচ্চমর্যাদা লাভ করতে পারে। তাতেও তিনি দেখলেন তারা অক্ষম। তাই তিনি এক মাখলুক সৃষ্টি করেন। যিনি তাদেরই স্বশ্রেণীভুক্ত। তাঁকে সৃষ্টি করে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গুণাবলী থেকে রহমত ও মেহেরবানীর পোশাকে আচ্ছাদিত করে মাখলুকের নিকট স্বীয় দূত হিসেবে প্রেরন করেণ।

[১]. আল কুরআন : সূরা শু'আরা, ২৬:২১৯।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাগণের পক্ষ থেকে রাসূলের আনুগত্য করাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর আনুগত্য এবং তাঁর আনুকূল্য স্বয়ং তাঁর আনুকূল্য হিসেবে কবুল করেন।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন মাজীদে এরশাদ হয়েছে–

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ

–যে ব্যক্তি রাসূলের নির্দেশ মান্য করেছে নিঃসন্দেহে সে আল্লাহরই আনুগত্য করেছে।[১]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِينَ ﴿١٠٧﴾

–আর আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য রহমত করেই।[২]

হযরত আবু বকর মুহাম্মদ বিন তাহের (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আল্লাহ তা'আলা হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রহমতের সৌন্দর্যে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। তাঁকে রহমতের এমন মূর্তপ্রতীক করেছেন যে, যার সকল শামায়েল ও সিফাতসমূহ মাখলুকের জন্যই শুধু রহমত। সুতরাং তাঁর মুবারক অস্তিত্ব বিশ্বজগতের জন্য রহমত হয়ে যায়। সেহেতু সে রহমতের অংশ যাঁর ভাগেই পড়েছে সেই দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে সকল প্রকার বিপদ-আপদ থেকে নাজাত পেলো এবং দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে যা তার পছন্দনীয় তাই সে পাবে। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না মহান আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে এরশাদ করেছেন–

وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِينَ ﴿١٠٧﴾

–আর আমি আপনাকে বিশ্বজগতের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।[৩]

সুতরাং হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পবিত্র হায়াতও রহমত ওফাতও রহমত। যথা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ،

---

১. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:৮০।
২. আল কুরআন : সূরা আম্বিয়া, ২১:১০৭।
৩. আল কুরআন : সূরা আম্বিয়া, ২১:১০৭।

–আমার জীবন এবং ওফাত উভয়টিই তোমাদের জন্য রহমত।[১]

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ رَحْمَةَ أُمَّةٍ، قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا، وَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا وَسَلَفًا،

–আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো উম্মাতের উপর রহমত নাজিল করার ইচ্ছা করেন তখন তাদের নবী উঠিয়ে নিতেন। তিনি তাদের পূর্বে আল্লাহ তা'আলার দরবারে পৌঁছে তাদের মাগফিরাত কামনা করতেন।[২]

'রহমাতাল লিল আলামীন' (رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِينَ) এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আল্লামা ফকীহ আবু লাইস সমরকন্দী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, يَعْنِي لِلْجِنِّ وَالْإِنْسِ অর্থাৎ হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সমগ্র মানব ও জীনজাতির জন্য রহমত। অপর একদল ওলামাদের অভিমত হলো– হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সমগ্র সৃষ্টি জীবের জন্য রহমত।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুমিনদের জন্য রহমত হিদায়াতের মাধ্যমে, মুনাফিকদের জন্য রহমত তাঁর উপস্থিতিতে হত্যা করা থেকে নিরাপত্তা প্রাপ্তির মাধ্যমে। আর কাফিরদের জন্য রহমত আল্লাহ তা'আলার আযাব-গজব বিলম্বিত হওয়ার মাধ্যমে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুমিনদের জন্য যেমনি রহমতস্বরূপ, তেমনি কাফিরদের জন্যও রহমত। কেননা তাঁর উপস্থিতিতে কাফিররা ওই সমস্ত আযাব থেকে নাজাত পেয়েছে যা পূর্ববর্তী উম্মাতরা তাদের নবীগণকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করার কারণে যে শাস্তি পেতো।

এক বর্ণনায় এসেছে একবার হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম)কে জিজ্ঞেস করেন– هَلْ أَصَابَكَ مِنْ هٰذِهِ الرَّحْمَةِ

---

১. ক) বাযযার : মুসনাদে বায্যার, ৫:৩০৮;
খ) হাকেম : আত্ তিরমিযী, বাবু ফী তনীনিল আযান, ৪:১৭৬;
গ) ইবনে আবী আসেম : বাগিয়াতুল হারেস, ১:২৮৮।
২. ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ইযা আরাদাল্লাহ রহমাতান..., ১১:৪০৭, হাদিস : ৪২৪১।
খ) তাবরীযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু ফদ্বলি সায়্যিদিল মুরসালীন, পৃ. ৩০৩, হাদিস : ৫৯৬৮।
গ) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ক্বিত'আতু মিনাল মাফকুত, ২০:১৮৪, হাদিস : ১৬১২।
ঘ) ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, বাবু যিকরিল বয়ান মা ওয়াসাফনা..., ২৭:৩৩৯, হাদিস : ৬৭৭৩।

شَيْءٍ؟ অর্থাৎ বলুনতো আমার রহমত আপনি কিভাবে লাভ করেছেন? তদুত্তরে হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) বললেন, হ্যাঁ প্রথমে আমি আমার শেষ পরিণতি সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। কিন্তু যখন পবিত্র কুরআন মাজীদে এইভাবে আমার প্রশংসা করা হয়েছে–

ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾

–তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী, আরশাধিপতির দরবারে সম্মানিত। সেখানে তাঁর আদেশ পালন করা হয়, যিনি আমানতদার।[১]

এখন আমি আমার শেষ পরিণতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছি। আপনার উসিলাতেই আমি নিরাপত্তা লাভ করেছি। এভাবেই আমি আপনার রহমতের অংশ লাভ করেছি।

হযরত জাফর সাদেক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) পবিত্র কুরআন মাজীদের আয়াত–

فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩١﴾

–তবে হে মাহবুব! আপনার উপর সালাম হোক, ডানপার্শ্বস্থদের পক্ষ থেকে।[২]

এর তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন– أَيْ بِكَ، إِنَّمَا وَقَعَتْ سَلَامَتُهُمْ مِنْ أَجْلِ كَرَامَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ অর্থাৎ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উসিলাতে নেককারগণ নিরাপত্তা প্রাপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ নেককার লোকেরা নিরাপত্তার যে দৌলত লাভ করেছে তা একমাত্র হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কারণেই লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

অপর এক আয়াতে আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ

[১]. আল কুরআন : সূরা তাকভীর, ৮১:২০-২১।

[২]. আল কুরআন : সূরা ওয়াক্বিয়াহ, ৫৬:৯১।

زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾

–আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীনের আলো, তার আলোর উপমা এমনই যেমন একটা দীপাধার, যার মধ্যে রয়েছে প্রদীপ, ঐ প্রদীপ একটা ফানুসের মধ্যে স্থাপিত। ঐ ফানুস যেন একটি নক্ষত্র, মুক্তার মত উজ্জ্বল হয় বরকতময় বৃক্ষ যয়তুন দ্বারা, যা না প্রাচ্যের, প্রতীচ্যের; এর নিকটবর্তী যে, সেটার তৈল প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে যদিও আগুন সেটাকে স্পর্শ না করে। আলোর উপর আলো। আল্লাহ আপন আলের প্রতি পথ নির্দেশনা দান করেন যাকে ইচ্ছা, এবং আপন উপমাসমূহ বর্ণনা করেন মানুষের জন্য। এবং আল্লাহ সবকিছুই জানেন।[১]

হযরত কা'ব আহবার ও হযরত সাঈদ বিন জোবায়ের (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন,

الْمُرَادُ بِالنُّورِ الثَّانِيْ هَهُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى مَثَلُ نُوْرِهِ أَيْ نُوْرُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

–এখানে নূর অর্থ হলো হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী– مَثَلُ نُوْرِهِ 'তাঁর নূরের উদাহরণ' এর অর্থও হলো হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নূর।

হযরত সাহল বিন আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, এ আয়াতের অর্থ হলো– আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও যমীনের অধিবাসীদের হিদায়াতদানকারী। অতঃপর বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নূরের উদাহরণ হলো যখন তিনি পবিত্র পিঠসমূহে বিদ্যমান ছিলেন তা 'দীপাধারে'র মতো। তাঁর এই প্রশংসিত গুণাবলি এমনই। প্রদীপ এর অর্থ হলো– হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র হৃদয়। আর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র বক্ষ হচ্ছে ফানুস সদৃশ, যাতে ঈমান ও হেকমতের উজ্জ্বল জ্যোতি ঝলমল করছে। আর ঐ চেরাগ যা এক মুবারক গাছের তৈল দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করা হয়। আর

[১]. আল কুরআন : সূরা নূরা, ২৪:৩৫।

সেই মুবারক গাছের অর্থ হলো হযরত ইবরাহীম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নূর। এখানে তাঁকে উপমা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর আল্লাহ তা'আলার বাণী–

يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيٓءُ

–এর নিকটবর্তী যে, সেটার তৈল প্রজ্বলিত হয়ে উঠবে।[১]

অর্থাৎ অচিরেই হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নবুওয়াত প্রকাশিত হবে। যেন তা যয়তুনের তেল। এই আয়াতের আরও অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। এছাড়াও অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে 'সিরাজুম মুনিরা' (سِرَاجًا مُّنِيرًا) 'আলো ও আলোক প্রদানকারী প্রদীপ' উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

এজন্য অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَٰبٌ مُّبِينٌ

–নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা নূর এসেছে এবং স্পষ্ট কিতাব।[২]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِۦ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿٤٦﴾

–নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি উপস্থিত পর্যবেক্ষণকারী করে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে, এবং আল্লাহর প্রতি তাঁর নির্দেশে আহবানকারী আর আলোকোজ্জ্বলকারী সূর্যরূপে।[৩]

এপ্রসঙ্গে অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴿٢﴾ ٱلَّذِىٓ أَنقَضَ ظَهْرَكَ ﴿٣﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا

১. আল কুরআন : সূরা নূর, ২৪:৩৫।
২. আল কুরআন : সূরা মায়েদা, ৫:১৫।
৩. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৪৫-৪৬।

﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب ﴿٨﴾

–আমি কি আপনার বক্ষ প্রশস্থ করিনি? আর আমি আপনার বোঝা অপসারণ করেছি, যা আপনার জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক ছিল, এবং আমি আপনার জন্য আপনার স্মরণকে সমুন্নত করেছি। সুতরাং নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্থি রয়েছে। নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্থি রয়েছে। অতএব, আপনি যখন নামায থেকে অবসর হবেন তখন একান্তে দোয়া প্রার্থনা করুন এবং আপন প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করুন।[১]

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'শরহ' (شَرْحٌ) অর্থ প্রশস্থ করা। আর 'সদর' (صَدْرٌ) অর্থ হৃদয়। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মুবারক বক্ষকে ইসলামের জ্যোতি দ্বারা উজ্জ্বল করেছেন।

হযরত সাহল (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রিসালতের নূর দ্বারা প্রশস্ত করেছেন। হযরত হাসান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আল্লাহ তা'আলা জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ করার মাধ্যমে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মুবারক বক্ষকে সম্প্রসারিত করেছেন।

অপর একদল তাফসীরবিদের মতে, এর অর্থ হলো– আমি কি আপনার বক্ষকে পবিত্র করিনি, যে শয়তান কুমন্ত্রণা দিতে না পারে।

وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴿٢﴾ ٱلَّذِىٓ أَنقَضَ ظَهْرَكَ ﴿٣﴾

–আর আপনার উপর থেকে আপনার সেই বোঝা নামিয়ে নিয়েছি, যা আপনার পৃষ্ঠ ভেঙ্গেছিলো।[২]

একদল ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো– বোঝার অর্থ হলো নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বে সংগঠিত ভুলত্রুটিসমূহ।

১. আল কুরআন : সূরা ইনশিরাহ, ৯৪:১।
২. আল কুরআন : সূরা ইনশিরাহ, ৯৪:২-৩।

অপর একদল ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো- জাহিলিয়াতের অন্ধকার যুগের বোঝা, অর্থাৎ জাহিলিয়াতের অন্ধকার যুগের লোকদের নৈতিক অধঃপতন দেখা তাঁর জন্য তা ভীষণ কষ্ঠদায়ক ছিল।

অপর একদল ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো- নবুওয়াত লাভের পর উম্মতের নিকট আল্লাহর বাণী পৌছানোর যে গুরুদায়িত্বের ভার তাঁর উপর অর্পিত হয়েছিলো। আল্লামা মাওয়ার্দী ও সুলামী (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)ও এ অভিমতের সমর্থক।

ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দি (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও অপর একদল ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো- "আমি আপনাকে গুনাহের বোঝা থেকে মুক্ত করেছি। যদি আপনাকে মা'সূম বা নিষ্পাপ করা না হয়। তাহলে নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বের ভুলত্রুটির কারণে আপনার কোমর মুবারক ভেঙ্গে যাবে।

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾

-আর আমি আপনার আলোচনাকে সমুন্নত করে দিয়েছি।[১]

হযরত ইয়াহ্ইয়া বিন আদম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, আল্লাহ তা'আলা নবুওয়াত প্রদানের মাধ্যমে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আলোচনাকে সমুন্নত করে দেন।

অপর একদল ওলামায়ে কেরামগণের অভিমত হলো, যখন আমার জিকির করা হবে তখন আপনার জিকিরও করা হবে। এই কারণে কালেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ) এর সাথে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' (مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ)ও উচ্চারণ করা হয়। সুতরাং যখন আল্লাহ তা'আলার নাম স্মরণ করা হবে, তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নামও স্মরণ করা হবে।

অপর একদল ওলামায়ে কেরামগণের অভিমত হলো যে, এখানে আযান ও ইকামতে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নাম উচ্চারিত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কাযী আবুল ফযল আয়ায (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, উক্ত আয়াতের দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কতো মহিমান্বিত, সুউচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের

[১]. আল কুরআন : সূরা ইনশিরাহ, ৯৪:৪।

অধিকারী। আর আল্লাহ তা'আলা তার অপূর্ব নিয়ামতরাজি দ্বারা কিভাবে তাঁকে সুশোভিত করেছেন। তাঁর মুবারক ক্বালবকে ঈমান ও হিদায়তের মাধ্যমে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তাঁর বক্ষ মুবারক এতো অধিক পরিসরে প্রশস্থ ও উন্মুক্ত করা হয়েছে যাতে তা অগণিত অসংখ্য সীমাহীন ইলম ও হিদায়াত ধারণ করার মর্যাদা লাভ করেছে। আর আল্লাহ তা'আলা অন্ধকার যুগের সত্য বিমূখতার স্বভাব থেকে তাকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে দেন। যার ফলে তাঁর দীন অন্যান্য দীনের উপর পুরোপুরিভাবে বিজয়ী হতে পারে। তারপর নবুওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব অর্পিত হবার পর তাঁর উপর যে গুরুদায়িত্বের বোঝা ন্যস্ত করা হয়েছে সেই বোঝাকেও আল্লাহ তা'আলা দ্বীন পৌছানোর দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে মুক্ত করে দেন। আল্লাহ তা'আলা এটাকেও যথেষ্ট মনে করেননি তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর মর্যাদা, সম্মান ও আলোচনাকে আরও সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র নামখানাকে তাঁর স্বীয় মহান নামের সাথে যুক্ত করে দেন।

হযরত কাতাদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে- "আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আলোচনাকে সমুন্নত করেছেন। তাই ইসলামের কালেমা, আযান, নামায ও খোতবাসমূহে এমন কোনো খোতবাদানকারী নেই, এমন কোন তাশাহহুদ পাঠকারী নেই এবং এমন কোনো নামায আদায়কারী নেই যে, "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এর সাথে "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" পাঠ করে না।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বর্ণনা করেছেন,

أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ : إِنَّ رَبِّيْ وَرَبَّكَ يَقُوْلُ : تَدْرِيْ كَيْفَ رَفَعْتُ ذِكْرَكَ؟

قُلْتُ : اللهُ و رَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ : إِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِيْ،

-একদিন হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) এসে আরয করেন, আমার ও আপনার রব জিজ্ঞেস করেছেন, কোন জিনিসের সাথে আপনার মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন। আমি বললাম এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবহিত। তখন হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- আপনার নাম আমার নামের সাথে উচ্চারিত হবে।[১]

[১]. ক) ইবনে আবী হাতেম : তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম, ১২:৪২৬।
খ) জালাল উদ্দীন সুয়ূতী : আদ্ দুররুল মানসুর ফীত্ তা'বিলে বিল্ মা'সূর, ১০:২৯০।

হযরত ইবনে আতা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি পরিপূর্ণ ঈমানকে নির্ভরশীল করেছি আমার নামের সাথে আপনার নাম উচ্চারণের বিধান দিয়ে। অর্থাৎ আপনার নাম বাদ দিয়ে শুধু আমার উপর ঈমান আনলে কখনো মুমিন হবে না। তিনি আরও বাড়িয়ে বলেছেন, শুধু তাই নয়, আপনার জিকিরকে আমার জিকির, অর্থাৎ যে আপনার জিকির করলো সে মূলতঃ আমারই জিকির করলো। আপনার নাম বাদ দিয়ে আমার জিকিরে কোনো লাভ হবেনা।

ইমাম জাফর সাদেক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, যে রিসালতের সাথে আপনার জিকির করবে, সে মূলতঃ রুবুবিয়াতের সাথে আমার জিকির করলো। অর্থাৎ যে আপনাকে রাসূল রূপে স্বীকার করলো, সে প্রকারান্তে আমাকে রব বলে স্বীকার করলো।

একদল ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো– এখানে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শাফায়াতের মাকামের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা নিজের সাথে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জিকির হলো যে, আনুগত্যকে হুযুরের আনুগত্যের সাথে এবং হুযুরের পবিত্র নামকে তাঁর মহান নামের সাথে মিলিত করা।

যেমন পবিত্র কুরআন মাজীদে এরশাদ হয়েছে–

وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ

–আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য কর।[১]

فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ

–আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো।[২]

উক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ ও রাসূল শব্দদ্বয় সংযোগবোধক অব্যয় 'ওয়াও' দ্বারা সংযুক্ত। এভাবে আল্লাহ তা'আলার নামের সাথে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র নাম ব্যতীত অন্য কারও নাম মিলানো জায়িয নেই।

গ) শামী : সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ, ১:৪৬৬।
[১]. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:১৩২।
[২]. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭:১৫৮।

হযরত হুযায়ফা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন যে,

لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلَانٌ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ،

–তোমরা কেউ কখনো এরূপ কথা বলবে না যে, আল্লাহ তা'আলা ও অমুক ব্যক্তি যা চান বরং এরূপ বলবে যে, আল্লাহ তা'আলা যেরূপ চান অতঃপর অমুক ব্যক্তি সেরূপ চায়।[১]

ইমাম খাত্তাবী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, এই হাদীসে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ আদব শিক্ষা দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও এরাদাকে সর্বদা গায়রুল্লাহর কামনা বাসনার উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ কারণে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরবী শব্দ 'সুম্মা' (ثُمَّ) ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ প্রথমে আল্লাহ তা'আলার কথা ইরশাদ করেন, তারপর অপর ব্যক্তি ইচ্ছা করে। 'ওয়াও' (واو) কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাতে এ বিষয়ে সন্দেহের সূচনা দেয়া দেয় যে, ইরাদা করার সাথে আল্লাহ তা'আলা ও গায়রুল্লাহ উভয়ই ইচ্ছা করে। (এটা বেয়াদবী)। একারণে ইচ্ছার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কেউ অংশগ্রহণ করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা কার্যকরী হয়, তাঁর ইচ্ছার সমান কারও ইচ্ছা হতে পারেনা। এর উদাহরণ এক হাদীসে বিদ্যমান।

জনৈক ভাষণদানকারী হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনে এভাবে ভাষণ দিচ্ছিলো–

مَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا،

–যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করলো সে হিদায়াত পেলো, আর যে তাদের উভয়ের নাফরমানী করলো। এই কথা শুনে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন,

بِئْسَ خَطِيْبُ الْقَوْمِ أَنْتَ قُمْ، أَوْ إِذْهَبْ.

–তুমি জাতির অতি মন্দ ভাষণ দানকারী, তুমি আমার সামনে থেকে চলে যাও।

---

[১]. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু লা ইয়াকুলু খবুসাত নফসী, ১৩:১৫৯, হাদিস : ৪৩২৮।
খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু হাদিসি খদিজাতু ইবনে ইয়ামন..., ৫:৩৮৪, হাদিস : ২৩২৬৫।
গ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, ১ম পরিচ্ছেদ, বাবুস্ সালাম, ৩:৩৫, হাদিস : ৪৭৭৮।

হযরত আবু সোলায়মান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে এ কথা ভীষণ অপছন্দ হয় যে, ওই ভাষণদানকারী ইঙ্গিতবোধক শব্দের মাধ্যমে ওই পবিত্র নাম দু'খানাকে একত্রে সমবেত করেছে। যাতে উভয় পবিত্র নাম দু'খানার মধ্যে সমতা দেখা দিয়েছে। আর একদল ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো– সেই ভাষণদানকারী 'ইয়া'সিহিমা' (يَعْصِهِمَا) শব্দের পর 'ফাক্বদ গাওয়া' (فَقَدْ غَوَى) অর্থাৎ সে পথভ্রষ্ট হয়েছে বলেছিলো। আর 'মাই ইয়াসিহিমা' (مَنْ يَعْصِهِمَا) এরপর যেভাবে লোকেরা বলে ঐ ব্যক্তি সেভাবে না বলে থেমে যায়।

তাফসীরবিদ ও শব্দতাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী–

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

–নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর ফিরিশতাগণ ঐ নবী উপর দুরূদ প্রেরণ করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাঁর উপর দুরূদ পাঠ কর এবং উত্তমরূপে সালাম প্রেরণ কর।[১]

এখানে 'ইউসাল্লুনা' (يُصَلُّونَ) শব্দে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ও ফিরিশতাগণ উভয় দুরূদ প্রেরণ করে কিনা?

সুতরাং একদল ওলামায়ে কেরামের বলেন, উভয়ের জন্য প্রযোজ্য হবে। অপর দলের মতে, এরূপ ধারণা করা জায়িয হবে না। কেননা এ অবস্থায় ফিরিশতাবৃন্দ আল্লাহ তা'আলার সাথে একই কাজে জড়িত হয়ে যায়। (এটা জায়িয নয়) তারা বলেন 'ইউসাল্লুনার যমীর' শুধু ফিরিশতাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাদের মতে এই আয়াতের অর্থ হবে–

إِنَّ اللهَ (يُصَلِّيْ) وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ،

–নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রহমত অবতীর্ণ করেন। আর তাঁর ফিরিশতাবৃন্দ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর দুরূদ প্রেরণ করেন।

[১]. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৫৬।

হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মর্যাদাকে এভাবে প্রকাশ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর আনুগত্যকে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আনুগত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যথা পবিত্র কুরআন মাজীদে এরশাদ হয়েছে–

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ

–যে ব্যক্তি রাসূলের নির্দেশ মান্য করেছে, নিঃসন্দেহে সে আল্লাহরই নির্দেশ মান্য করেছে।[১]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾

–হে মাহবুব! আপনি বলে দি , হে মানবকুল যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাক, তবে আমার অনুগত হয়ে যাও। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ভালবাসবেন।[২]

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন মক্কার কাফিররা বলতে শুরু করলো মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চান যে, আমরা যেন তাঁকে দয়াময় রব বানিয়ে নিই। যেভাবে খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) কে তাদের রব বানিয়ে ছিলো। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন–

قُلْ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾

–হে মাহবুব! আপনি বলে দিন, আদেশ মান্য করো আল্লাহ ও রাসূলের আর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখো যে, নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদের পছন্দ করেন না।[৩]

[১]. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:৮০।
[২]. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:৩১।
[৩]. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:৩২।

এইভাবে আল্লাহ তা'আলা তাদের সন্তুষ্টির বিপরীতে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আনুগত্যকে তাঁর আনুগত্যের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। আর তাফসীরবিদগণের মতে সূরা ফাতিহার এ আয়াতের অর্থেও মতবিরোধ দেখা দিয়েছে–

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

–আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করুন, তাঁদের পথে যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন।[১]

যথা- হযরত আবুল আলীয়া ও হযরত হাসান বসরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, 'সিরাতুল মুসতাকীম' (الصراط المستقيم) স্বয়ং হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পূত-পবিত্র চরিত্র ও তাঁর পরিবার-পরিজন আহলে বায়ত ও সাহাবায়ে কেরাম। এতে প্রমাণিত হয় যে, 'সিরাতুল মুস্তাকিম' হলো আহলে সুন্নাতেরই অনুসৃত পথ। যাঁরা আহলে বায়ত, সাহাবায়ে কিরাম, কুরআন ও সুন্নাহ এবং বৃহত্তম জামাআত সবাইকে মান্য করে।

হযরত আবুল হাসান মাওয়ারদী ও হযরত মক্কী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এ অভিমতের সমর্থক। তবে হযরত মক্কী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আরও অতিরিক্ত বর্ণনা করে বলেন– এর অর্থ হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা)।

ইমাম আবুল লাইস সমরকন্দি (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও হযরত আবুল আলীয়া (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)'র সূত্রে 'সিরাতুল মুসতাকীম' (الصراط المستقيم) সম্পর্কে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হযরত হাসান বসরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হযরত আবুল আলীয়া (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর এ ব্যাখ্যা জানতে পেরে বললেন, 'আল্লাহর কসম! তিনি সত্য কথাই বলেছেন। তিনি অতি উত্তম কথাই বলেছেন'।

ইমাম আবুল হাসান মাওয়ারদী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ব্যাখ্যাটি হযরত আবদুর রহমান বিন জায়িদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবু আবদুর রহমান আস সুলামী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) একদল ওলামায়ে কেরাম থেকে আল্লাহ তা'আলার বাণী–

১. আল কুরআন : সূরা ফাতিহা, ১:৬-৭।

فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ

–সে এমন এক মজবুত গ্রন্থি ধারণ করেছে যা, কখনো খোলার নয়।[১]

এ আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে যে এখানে 'মজবুত গ্রন্থির' অর্থ হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কেউ বলেছেন, ইসলাম, আবার কেউ বলেছেন, তাওহীদের সাক্ষ্যবাণী।

আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا

–আর যদি আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ গণনা করো তবে সেগুলোর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবেনা।[২]

আর এসব অনুগ্রহ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উসীলায় প্রদত্ত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

–আর তিনিই যিনি এ সত্য নিয়ে তাশরীফ এনেছেন এবং ঐসব লোক যারা তাঁকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে। তারাই ভীতিসম্পন্ন।[৩]

অধিকাংশ তাফসীরবিদদের অভিমত হলো– সত্য নিয়ে আগমনকারী হলেন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আর একদল তাফসীরকারকের অভিমত হলো– সত্যায়নকারী হলেন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। এক কিরআতে 'সাদ্দাকা' (صَدَّقَ) এর তাশদীদের স্থলে 'সদাকা' (صَدَقَ)ও পড়া যায়। অপর একদল তাফসীরবেত্তাদের মতে সত্যায়নকারী হলো সাধারণ মুমিনগণ। কারও মতে হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। আর একদলের মতে হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। অনুরূপ এ সম্পর্কে আরো অনেক বর্ণনা বর্ণিত আছে।

১. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:২৫৬।
২. আল কুরআন : সূরা নাহল, ১৬:১৮
৩. আল কুরআন : সূরা যুমার, ৩৯:৩৩।

হযরত মুজাহিদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী–

أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ

–শুনে নাও আল্লাহর স্মরণেই অন্তরে প্রশান্তি রয়েছে।[১]

এর অর্থ হলো হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীদের স্মরণ দ্বারা অন্তরকে প্রশান্ত করে নেয়া।

[১]. আল কুরআন : সূরা রা'আদ, ১৩:২৮।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

فِي وَصْفِهِ تَعَالَى لَهُ بِالشَّهَادَةِ

হুযুর (ﷺ) এর সাক্ষ্যদানকারীর গুণ প্রসঙ্গে

আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানের প্রশংসা বর্ণনা করে ঘোষনা করেছেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِۦ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿٤٦﴾

–হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা নবী! নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি উপস্থিত পর্যবেক্ষণকারী করে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে।[১]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, উচ্চমর্যাদা সম্মান ও প্রশংসায় বিভিন্ন বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন।

সুতরাং একদিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর উম্মতকে সাক্ষ্যদাতা বলে উল্লেখ করেছেন। আপনি উম্মতের নিকট আমার বিধান পৌছে দিয়েছেন, এটা আপনার বিশেষত্ব। অনুগত সম্প্রদায়ের জন্য সুসংবাদদানকারী, ভয় প্রদর্শনকারী। আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ ও ইবাদতের প্রতি আহবানকারী আপনাকে উপাধী দেয়া হয়েছে। আর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আলোক প্রদানকারী প্রদীপ বানিয়েছেন। অর্থাৎ আপনি এমন এক মহিমান্বিত সত্তা যার মাধ্যমে মানুষ হিদায়াত ও সৎপথের সন্ধান লাভ করেছে।

হযরত আতা বিন ইয়াসার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মহিমান্বিত কিছু গুণাবলীর উল্লেখ করুন। তদুত্তরে তিনি বললেন,

أَجَلْ وَاللهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي

[১]. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৪৫-৪৬।

سَمَّيْتُكَ الْمتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ الله حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا.

–আমি অবশ্যই তাঁর গুণাবলীর বিবরণ পেশ করবো। আল্লাহর কসম! তাঁর অনেক অনেক গুণাবলীর কথা তাওরাত শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে। হে নবী! আমি আপনাকে পূববর্তী জাতি সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদানকারী, অনুগত জাতির জন্য সুসংবাদ প্রদানকারী, ভীতি প্রদর্শনকারী এবং উম্মী সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য আশ্রয়দানকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি। আপনি আমার বান্দা ও রাসূল। আমি আপনার নামকরণ করেছি "মুতাওয়াককিল" অর্থাৎ যাবতীয় কাজের ফলাফল আমার উপর নির্ভরশীল। তাঁর কথায় কোনো প্রকার কঠোরতা ও রুক্ষতা নেই, তিনি বাজারে উচ্চস্বরে অনর্থক হৈচৈকারী নন। তিনি মন্দকে মন্দ দিয়ে প্রতিহত করতেন না। বরং তিনি লোকদের ক্ষমা করে দিতেন এবং ক্ষমার জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করতেন। আল্লাহ তা'আলা কখনো তাঁর প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেবেন না, যতক্ষণ না বক্রজাতিকে সংশোধন করবেন এবং যতক্ষণ না মানুষ কালেমা "লা-ইলাহা" বলে তাওহীদের স্বীকৃতি প্রদান করে। আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মাধ্যমে এমন দৃষ্টিহীন লোকদেরকে চক্ষুদান করে দেবেন যারা সত্যপথ দেখে না। এমন বধির কর্ণকে খুলে দেবেন যারা সত্যকথা শ্রবণ করতে অক্ষম আর অলস ক্বালবকে খুলে দেবেন যারা কিছু বুঝে না বা প্রকৃত জ্ঞান প্রাপ্ত হয় না।[১]

হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম ও হযরত কা'ব আল আহবার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)ও অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এরূপ প্রশংসিত গুণাবলীর বিবরণ তাওরাত শরীফে বর্ণিত আছে। আর

[১]. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু কারাহিয়্যাতুস্ সাহবি ফিস্ সূক, ৭:৩২১।
খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনুল আস, ১৩:৩৭১।
গ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু ফাযায়িলি সায়্যিদিল মুরসালীন, পৃ. ২৫০।

তাওরাত শরীফের কোন কোন বর্ণনা হযরত ইবনে ইসহাক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বাজারে ডাকাডাকি করবেন না এবং অশ্লীল কথাবার্তা বলবেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি তাঁকে সকল সৌন্দর্য ও উৎকর্ষমণ্ডিত করবো। আমি তাঁকে যাবতীয় পবিত্র স্বভাবে ভূষিত করবো। প্রশান্তি, স্থিরতা ও ধীরতাকে তাঁর পরিচ্ছেদ বানাবো। কল্যাণ হবে তাঁর আদব। তাকওয়া বা পরহেযগারী দ্বারা তাঁর অন্তরকে ভরপুর করে দেবো। হেকমত হবে তার বুদ্ধিমত্তা। সত্যবাদিতা ও অঙ্গীকার পালন তাঁর স্বভাবে পূর্ণাঙ্গ রূপে পূর্ণতা দান করা হবে।

ক্ষমা ও কল্যাণ হবে তাঁর আখলাকের সৌন্দর্য। ইনসাফ ও ন্যায়বিচার হবে তাঁর চরিত্র। হক্ব হবে তাঁর শরীয়াত। হিদায়াত হবে তাঁর ঈমান। ইসলাম হবে তাঁর মিল্লাত। আমি তাঁর নাম রাখবো আহমদ। আমি তাঁর মাধ্যমে পথভ্রষ্টদের সঠিক পথের দিশা পাবে।

তাঁর মাধ্যমে মানুষ অজ্ঞতার পর পুনরায় সঠিক জ্ঞান লাভ করবে। স্বল্প পরিচিতির পর তাঁর নাম পৃথিবীর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে। স্বল্পতার পর তাঁকে প্রাচুর্যতা দান করবো। দারিদ্র্যতার পর আমি তাকে সম্পদশালী করবো। আমি তার মাধ্যমে মানুষকে নিম্নস্তর থেকে ইজ্জত সম্মান দান করবো। বিরুদ্ধবাদী ও বিক্ষিপ্ত, অভিলাষী ও বিচ্ছিন্ন অন্তরসমূহের মধ্যে আমি তার মাধ্যমে প্রেম ভালবাসা এমনভাবে ঢেলে দেবো যার ফলে তাদের বিচ্ছিন্ন অন্তরসমূহকে একই সূত্রে গেঁথে দেবো। বিক্ষিপ্ত জাতিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করে দেবো। আমি এই রাসূলের উম্মতকে সর্বোত্তম উম্মত মনোনীত করব।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে। আল্লাহ তা'আলা তাওরাত শরীফে তাঁর প্রশংসনীয় গুণাবলীকে এভাবে বর্ণনা করেছেন,

عَبْدِيْ أَحْمَدِ الْمُخْتَارِ، مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ، وَمُهَاجِرُهُ بِالْمَدِيْنَةِ أَوْ قَالَ طَيْبَةَ أُمَّتُهُ الْحَمَّادُوْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

–আমার বান্দা হবেন আহমদ মুখতার (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। পবিত্র মক্কানগরী হবে তার জন্মস্থান। মদিনা নগরী হবে তার হিজরতের স্থান। তার উম্মত সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার প্রশংসাকারী ও কৃতজ্ঞচিত্ত হবে।[১]

[১]. দারেমী : আস সুনান, বাবু সিফাতিন নবী, ১/১৫৮ হাদীস নং ৭।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন–

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلْأُمِّىَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا
عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ
ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلنُّورَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ
هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾ قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ
إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ لَآ إِلَٰهَ
إِلَّا هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۖ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِىِّ ٱلْأُمِّىِّ
ٱلَّذِى يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

–ওইসব লোক যারা অনুসরণ করবে এ বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যার উল্লেখ আছে তাওরাত ও ইন্‌জীলে, যা তাদের নিকট আছে তাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে, যিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করবেন এবং অপবিত্র বস্তুসমূহ তাদের জন্য হারাম করবেন এবং তাদের উপর থেকে সে কঠিন কষ্টের বোঝা ও গলার শৃঙ্খল যা তাদের উপর ছিল, নামিয়ে অপসারিত করবেন। সুতরাং ওইসব লোক, যারা তাঁর উপর ঈমান এনেছে, তাকে সম্মান করেছে, যা তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে, তারাই সফলকাম হয়েছে। আপনি বলুন, হে মানবকূল! আমি তোমাদের সবার প্রতি ঐ আল্লাহরই রসূল হই যে, আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব একমাত্র তাঁরই। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং ঈমান আনো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল, উম্মী অদৃশ্যের সংবাদদাতার উপর। যিনি আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহের উপর ঈমান আনেন এবং তাঁরই অনুসরণ করো, তবেই তোমরা সুপথ পাবে।[১]

[১]. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭: ১৫৭, ১৫৮।

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ
لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى
ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ

–অতঃপর কেমনই আল্লাহর কিছু দয়া হয়েছে যে, হে মাহবুব! আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। আর যদি আপনি রূঢ় বা কঠোর চিত্ত হতেন তবে তারা নিশ্চয় আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য সুপারিশ করুন। আর কার্যাদিতে তাদের সাথে পরামর্শ করুন, আর যখন কোন কাজের দৃঢ় সংকল্প করবেন তখন আল্লাহর উপর নির্ভর করুন। নিশ্চয় আল্লাহ নির্ভরকারীদের ভালোবাসেন।[১]

আল্লামা সমরকন্দি (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন- আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতে মানুষের প্রতি বিরাট ইহসান করার কথা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে মুমিনদের জন্য স্নেহশীল কোমল হৃদয়ের অধিকারী ও প্রিয়ভাজনকারী বানিয়েছেন। এর বিপরীতে যদি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্কশভাষী কঠোরচিত্ত হতেন তাহলে লোকেরা তাঁর আশপাশ হতে পেরেশান হয়ে দূরে পালিয়ে যেত। কিন্তু তার উপর এটা আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন যে, তাকে সাহসিকতা, দানশীলতা দান করে, সকলের সাথে হাস্যোজ্জ্বল মুখে সাক্ষাতকারী, কল্যাণকামী ও অনুকম্পা প্রদর্শনকারী বানিয়েছেন।

হযরত দোহাক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)ও এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ
وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ

[১]. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৫৯।

–আর কথা হলো এই রূপ যে- আমি তোমাদেরকে সব উম্মাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির উপর সাক্ষী হও। আর রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হন।[১]

হযরত আবুল হাসান কালবী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তার সম্মানিত উম্মাতের মর্যাদাকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন।

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

–আর এ কুরআনে যাতে রাসূল তোমাদেরও সাক্ষী হন। এবং তোমরা অন্যান্য লোকদের উপর সাক্ষী দাও।[২]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿٤١﴾

–তবে কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মাত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করবো এবং হে মাহবুব! আপনাকে তাদের সবার উপর সাক্ষী ও পর্যবেক্ষণকারীরূপে উপস্থিত করবো।[৩]

আর আল্লাহ তা'আলার বাণী– 'ওয়াসাতান' (وَسَطًا) শব্দের অর্থ ইনসাফকারী উত্তম উম্মাত। এ আয়াতের অর্থ হলো আমি যেভাবে তোমাদেরকে হিদায়াত প্রদান করেছি। অনুরূপভাবে তোমাদেরকে কতিপয় বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছি। যেমন– আমি তোমাদেরকে মনোনীত, ন্যায়পরায়ণ ও ইনসাফকারী উম্মাত বানিয়েছি যে, তোমরা অন্যান্য নবীদের সাক্ষী হবে। কিয়ামতের দিন যখন অন্যান্য নবীদের উম্মাত বলবে যে, ঐ সমস্ত নবী আল্লাহর পয়গাম তাঁদের নিকট পৌঁছায় নি। সেই দিন নবীদের বক্তব্যের সত্যায়ন করবেন হুযুর সাল্লাল্লাহু

[১]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২: ১৪৩।
[২]. আল কুরআন : সূরা হজ্ব, ২২:৭৮।
[৩]. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪: ৪১।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের মাঠে হযরত আম্বিয়া (আলাইহিস্ সালাম) কে জিজ্ঞাসা করবেন আপনারা আমার পয়গাম উম্মাতের নিকট পৌঁছিয়েছেন কী? তখন হযরত আম্বিয়া (আলাইহিস্ সালাম) বলবেন, হ্যাঁ। তখন হযরত আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) এর উম্মাতগণ বলবে না। আমাদের নিকট কোনো ভীতিপ্রদর্শনকারী, সুসংবাদ প্রদানকারী আগমন করেন নি। তখন হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উম্মাত হযরত আম্বিয়া (আলাইহিস্ সালাম) এর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে বলবে যে, এরা মিথ্যাবাদী। সমস্ত আম্বিয়া (আলাইহিস্ সালাম) স্ব-স্ব উম্মাতকে শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন, নিয়ামতের সুসংবাদ দিয়েছেন। অতঃপর আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উম্মাতের সাক্ষ্য সত্যায়ন ও তাদেরকে পবিত্র করবেন। একদল ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো যে, এ আয়াতের অর্থ হলো, আমরা উম্মাতে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যারা হযরত আম্বিয়া (আলাইহিস্ সালাম) এর বিরোধীতাকারী তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবো। আর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের পক্ষে সাক্ষী হবেন। আল্লামা সমরকন্দি এ অভিমতের সমর্থক।

আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ

–আর ঈমানদারগণকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার নিকট সত্যের মর্যাদা রয়েছে।[১]

হযরত কাতাদা, হযরত হাসান বসরী, হযরত জায়িদ বিন আসলাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) বলেন, (قَدَمَ صِدْقٍ) 'কাদামু সিদকীন' এর অর্থ হলো হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পূতঃপবিত্র সত্তা। যিনি কিয়ামতের মাঠে নিজ উম্মাতের জন্য শাফায়াত করবেন। আর তার শাফায়াতের উসিলায় মুমিনদের মর্যাদা উচ্চস্তরে উপনীত হবে।

হযরত হাসান বসরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে, 'কাদামু সিদকীন' (قَدَمَ صِدْقٍ) এর অর্থ হলো, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ওফাত। কেননা আল্লাহ তা'আলা পূর্বে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[১]. আল কুরআন : সূরা ইউনুস, ১০:২।

ওয়াসাল্লাম) কে তাঁর নিকট উঠিয়ে নিয়ে উম্মাতের মাগফিরাতের আয়োজন করেছেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। "কাদামু সিদকীন" এর অর্থ হলো– হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শাফায়াত। তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট সব চাইতে বেশী শাফায়াত করবেন।

হযরত সাহাল বিন আবদুল্লাহ তাসতরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রহমতের সব চাইতে বড় অংশ হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে প্রদান করেছেন।

হযরত মুহাম্মদ বিন আলী তিরমিযী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুনিয়ার সকল সত্যবাদী ও সিদ্দিকীনদের ইমাম। তিনি শাফায়াতকারী। তাঁর শাফায়াত গৃহীত হবে। তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট আবেদন করবেন। তাঁর আবেদন গৃহিত হবে। হযরত সুলামী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

فِيمَا وَرَدَ مِنْ خِطَابِهِ إِيَّاهُ مَوْرِدَ الْمُلَاطَفَةِ وَالْمَبَرَّةِ

আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক হুযুর (ﷺ) কে স্নেহ ও মুহাব্বতের সাথে সম্বোধন করা

আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি মুহাব্বত ও মেহেরবানী প্রসঙ্গে এরশাদ করেছেন–

عَفَا اللّٰهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ

–আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, আপনি তাদেরকে কেন অনুমতি দিলেন?[১]

হযরত আবু মুহাম্মদ মক্কী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বক্তব্যের সূচনাতে এমনভাবে সম্বোধন করেছেন যাতে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার অসন্তোষ প্রকাশ করার উদ্দেশ্য নয় বরং হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সংশোধন, তাঁর সম্মান ও মর্যাদাকে আরো বেশি সমুন্নত দেয়া।

হযরত আওন বিন আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে অভিহিত করার পূর্বে তাঁকে ক্ষমা করার সুসংবাদ শুনিয়েছেন।

আল্লামা সমরকন্দি (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, হে পবিত্র অন্তরের অধিকারী! আল্লাহ তা'আলা আপনার ত্রুটি ক্ষমা করেছেন। কিন্তু আপনি কেন ঐ সকল মুনাফিকদের যুদ্ধে যোগদানে বিরত থাকার অনুমতি দিলেন?

আল্লামা সমরকন্দি (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, যদি আল্লাহ তা'আলা তাঁর বক্তব্যের সূচনাতে তাঁকে ক্ষমা করে দেয়ার স্থলে এরূপ বলতেন যে, আপনি

---

(১) আল কুরআন : সূরা, তাওবা, ৯:৪৩।
তবুক যুদ্ধের সময় মুনাফিকরা শঠতার আশ্রয় নিয়ে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট যুদ্ধে যোগদান না করার জন্য আপত্তি করে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে যুদ্ধে যোগদান করা থেকে বিরত থাকার অনুমতি দেন। তখন উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। আপনি কেনো তাদেরকে যুদ্ধে যোগদানে বিরত থাকার অনুমতি দিলেন?

কেন তাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন? তাহলে এ ধরণের আতঙ্কজনক বক্তব্যের ভয়ে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ক্বালব মুবারক ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতো। কিন্তু এটা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি পরিপূর্ণ রহমত ও একান্ত মুহাব্বতের বহিঃপ্রকাশ। তাই আল্লাহ তা'আলা প্রথমে ক্ষমা করার সুসংবাদ প্রদান করেন, যাতে তাঁর ক্বালব মুবারক পূর্ণাঙ্গ প্রশান্ত হয়ে যায়। তার পর তাঁকে স্বীয় ক্রুটির কথা অভিহিত করে বলেছেন, কেনো আপনি তাদেরকে যুদ্ধে যোগদানে বিরত থাকার অনুমতি দিয়েছেন? যদি আপনি এরূপ না করতেন তাহলে বিশ্বাসী মুমিন ও কপট বিশ্বাসী মুনাফিকদের মধ্যে সঠিক পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব হতো। আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সম্বোধন করার মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কতো মহিমান্বিত গৌরবান্বিত মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। এ বিষয় সকল জ্ঞানীগণ ভালোভাবে অভিহিত।

এছাড়াও যে ব্যক্তি অভিহিত যে, আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে কতো বেশী মর্যাদা ও সম্মান প্রদান করেছেন তার পক্ষে এটা বুঝতে কখনো কষ্ট হবে না। আল্লাহ তা'আলা যদি বিন্দুমাত্রও হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন একথা বুঝতে পারতেন তাহলে দুঃখ বেদনা ও চিন্তায় হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অন্তর আত্মা শুকিয়ে ওফাত হয়ে যেতো।

হযরত নাফতুবিয়া (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, কেউ কেউ উক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বলে মনে করেছে। অথচ হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন বরং বাস্তব কথা হলো যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অনুমতি দেয়া না দেয়ার পূর্ণ ইখতিয়ার ছিলো এবং হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ বিষয় স্বাধীন ছিলেন। কিন্তু আপনি যদি ঐ সমস্ত মুনাফিকদেরকে যুদ্ধে যোগদানে বিরত থাকার অনুমতি না দিয়ে তাদেরকে যুদ্ধে যোগদানে বাধ্য করতেন এবং কঠোর ভাষায় বলতেন যে, তোমাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে যুদ্ধে যোগদান করতেই হবে। যদি তারা আপনার নির্দেশ অমান্য করে যুদ্ধে যোগদান না করতো তাহলে তারা মুনাফিক বলে চিহ্নিত হতো। এ অবস্থায় তাদের মুনাফিকী প্রকাশ পেয়ে যেতো।[১]

([১]) তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণে বিরত থাকার অনুমতি প্রদান করার কারণে তাদের কপটতা গোপন থেকে যায়। ফলে তাদের এ কথা বলার সুযোগ হয়েছে যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে যুদ্ধে যোগদানের নির্দেশ দিতেন, তাহলে আমরা যুদ্ধে যোগদান করতাম। তিনি যেহেতু আমাদেরকে যোগদানে অনুমতি দেননি সেহেতু আমরা যুদ্ধে যোগদান করিনি।

মোটকথা যদি আপনি তাদেরকে যে-কোন অবস্থায় যুদ্ধে যোগদানের নির্দেশ দিতেন তাহলে ক্ষতির কিছুই ছিলো না। তাদেরকে অনুমতি দেয়ার কারণে আপনার মর্যাদায় কোনো প্রকার প্রতিক্রিয়া দেখা দিতো না।

কাজী আয়ায রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু (আল্লাহ তাঁকে সৌভাগ্যমণ্ডিত করুন) বলেন, যে মুসলমান স্বীয় প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করতে ইচ্ছুক ও যার আখলাক শরীয়াতের অনুসারী তার কর্তব্য হলো, কুরআনের আদব অনুযায়ী আদব শিক্ষা করা,আর কুরআনের আদব অনুযায়ী কথা, কাজ, আদান-প্রদান ও চরিত্র গঠন করা। কেননা কুরআন হলো প্রকৃত জ্ঞানের ভাণ্ডার, দীন-দুনিয়ার শিষ্টাচারের সাজানো বাগান। কেননা একজন সাচ্চা মুসলমান যে কুরআনের আদব অভিহিত তাকে কুরআনের অপূর্ব বাচনভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য করতে হবে যে, তার বহিঃপ্রকাশক হলেন স্বয়ং মহান রব আল্লাহ তা'আলা। সকলে তাঁরই নিয়ামতের মুখাপেক্ষী কিন্তু তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।

মুসলমানদের এ আয়াতের প্রতি গভীরভাবে মনোযোগী হবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ আয়াতের প্রতি গভীর মনোযোগী হলে অনেক বেশী উপকৃত হবে। আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কোনো কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করার পূর্বে কিরূপ তাযীম ও সম্মান প্রদর্শনের সাথে বক্তব্যের সূচনা করেছেন। তাঁর ক্রুটি প্রকাশ করার পূর্বে কিভাবে ক্ষমা করার কথা বর্ণনা করে কিভাবে তাঁকে অন্তরঙ্গ করে নিয়েছেন। অথচ ঐ সকল মুনাফিকদের অনুমতি দেয়া তাঁর ভুল হয়নি। আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَلَوْلَآ أَن ثَبَّتْنَٰكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾

–এবং যদি আমি আপনাকে অবিচলিত না রাখতাম তবে এ কথা নিকটবর্তী ছিলো যে, আপনি তাদের প্রতি সামান্য কিছু ঝুঁকে পড়তেন।[১]

কোনো কোনো মুফাসসিরগণ বলেন, অন্যান্য হযরতে আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) এর ক্রুটি-বিচ্যুতি হবার পর আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ করতেন। কিন্তু আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ক্রুটি হবার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অসন্তোষের কথা জানিয়ে দিতেন। যাতে তিনি সে ক্রুটির নিকটবর্তী না হন। এটা আল্লাহ

১. আল কুরআন : সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:৭৪।

তা'আলার হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি একান্ত মুহাব্বত ও অনুরাগের ব্যাপার। এটা তাঁর প্রতি আল্লাহ তা'আলার একান্ত মহানুভবতা। তারপরও এ বিষয়ে একটু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, তাঁর ত্রুটির বিষয় প্রকাশ করার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অবিচল রাখতেন এবং সকল প্রকার ত্রুটি ও ভ্রান্তি থেকে সংরক্ষণ করেছেন। যদি তাঁর দ্বারা ত্রুটি সংঘটিত হয়ে যায়। তবে সে সম্পর্কেও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে অবিচল রাখার কারণে তিনি সকল প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে নিরাপদ ছিলেন। এই মর্যাদাও আল্লাহ তা'আলা তাঁকে প্রদান করেছেন। যদি কখনো কোনো বিষয় তাঁকে আগাম জানিয়ে দেয়ার প্রয়োজন দেখা দিতো তখনও তাঁর প্রশংসনীয় গুণাবলীর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হতো। এধরনের কথা উক্ত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُۥ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ

وَلَـٰكِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾

–আমি জানি যে, আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে ঐ কথা যা এরা বলছে। অতঃপর তারা তো আপনাকে অস্বীকার করছে না বরং যালিমগণই আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করছে।[১]

হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, আবু জাহেল অধিকাংশ সময় বলতো যে, আমরা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে মিথ্যাবাদী বলি না। বরং তাঁর আনীত দীনকে মিথ্যা বলি। যা তিনি নিয়ে এসেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন।

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, যখন মক্কাবাসী হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করলো তখন তিনি ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। তখন হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) আগমন করে বললেন, আপনি কেনো চিন্তিত হচ্ছেন? হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন– كَذَّبَنِي قَوْمِي আমার সম্প্রদায় আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। তখন হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) বললেন, এর বাস্তবতা হলো এই যে, তারা অন্তরে আপনাকে সত্য বলে জানে। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

এখন দেখুন উক্ত আয়াতে নিহিত সূক্ষ্ম তত্ত্ব হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অশান্ত হৃদয়কে প্রশান্ত করার ইচ্ছে করেছেন। এটা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[১]. আল কুরআন : সূরা আন'আম, ৬:৩৩।

ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ মহানুভবতার বহিঃপ্রকাশ যা তিনি প্রমাণ করেছেন যে, কাফিররাও আপনাকে সত্যবাদী বলে জানে। সঠিক অর্থে তাঁরা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে না এবং তারা একথাও জানে যে আপনি কথায় ও কাজে সত্যবাদী। আর এ কারণে তারা আপনাকে নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বে 'আল-আমিন' (اَلْأَمِيْنُ) 'বিশ্বাসভাজন' উপাধীতে ভূষিত করেছে। এ ধরনের আলোচনার মাধ্যমে তাঁকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করে তাঁর অন্তরে যে ব্যথা দিয়েছে সেই ব্যথা বেদনাকে আল্লাহ তা'আলা দূর করে দেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা 'জাহেদীন' (جَاحِدِيْنَ) বা 'অস্বীকারকারী' ও 'যালেমীন' (ظَالِمِيْنَ) বা 'অত্যাচারী' বলে কাফিরদের ঘৃণা ও নিন্দা প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন মাজীদে এরশাদ হয়েছে–

وَلَـٰكِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ

–বরং যালিমগণই আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করছে।[১]

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সকল প্রকার মিথ্যা অপবাদ থেকে পূতঃপবিত্র ঘোষণা করেন। আর তাঁর বিপরীতে কাফিরদের গলায় অবাধ্যতা ও আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলার অপরাধে অপরাধী হবার অভিশাপের রশি পরিয়ে দেন কেননা যে মানুষ জেনেশুনে স্বজ্ঞানে সত্যকে অস্বীকার করে তাকে 'যালেম' বলা হয়।

অপর এক আয়াতে এরশাদ হয়–

وَجَحَدُوا۟ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ

–আর সেগুলোকে অস্বীকার করলো অথচ তাদের অন্তরগুলোতে সেগুলোর সত্যতার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিলো, যুলুম ও অহংকারবশতঃ।[২]

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে প্রশান্তি দান করেছেন এবং তাঁকে সাহায্য করার নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে এরশাদ করা হয়েছে–

[১]. আল কুরআন : সূরা আন'আম, ৬:৩৩।
[২]. আল কুরআন : সূরা নামল, ২৭:১৪।

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٤﴾

–আর আপনার পূর্বেও বহু রাসূলকে অস্বীকার করা হয়েছে। তখন তারা ধৈর্য্যধারণ করেছিলেন এ অস্বীকার করা ও কষ্ট পাওয়ার উপর, যে পর্যন্ত তাদের নিকট আমার সাহায্য এসেছে। এবং আল্লাহর বাণীসমূহ পরিবর্তনকারী কেই নেই এবং আপনার নিকট রাসূলগণের খবরাদি এসে গেছে।[১]

উক্ত আয়াত দু'ভাবে পাঠ করা যায়। যে সকল লোক সাকিন সহকারে يُكْذِبُونَكَ পাঠ করেন তখন এর অর্থ হবে যে, এই কাফিররা আপনাকে মিথ্যাবাদী পাবে না। ফার্‌রা ও কাসায়ী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, এর অর্থ হলো তাঁরা বলে না যে, আপনি মিথ্যাবাদী। কেউ কেউ বলেছেন এর অর্থ হলো এই যে, আপনার মিথ্যাবাদী হবার বিষয়ে তারা কোনো দলীল পে শ করতে পারেনা। আর না তারা আপনার মিথ্যাকে প্রমাণিত করতে পারছে। আর যারা يُكَذِّبُونَكَ কে তাশদীদ যোগে পাঠ করে তার অর্থ হলো যে, কাফিররা মিথ্যাকে আপনার সাথে সম্পর্কিত করেনা।

কেউ কেউ বলেন যে, এর অর্থ হলো- তারা এ ধারণায়ও বদ্ধমূল নয় যে আপনি মিথ্যাবাদী। (আল্লাহ মাফ করুন) হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বিশেষত্বের মাধ্যমে এটাও এক বিশেষত্ব যে, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজীদে সমস্ত আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) কে নাম ধরে সম্বোধন করেছেন, যথা– হে আদম! হে নূহ! হে ইবরাহিম! হে মূসা! হে ঈসা! হে জাকারিয়া! হে ইয়াহিয়া! কিন্তু হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে কখনো নাম ধরে সম্বোধন করেন নি। বরং তাঁকে সম্বোধন করেছেন এভাবে যথা– হে রাসূল! হে নবী! হে কম্বলধারী! হে মুদ্দাসসির! বলে। এরূপ প্রেমময়ী শব্দের মাধ্যমে আহবান করা মুহাব্বতের নিদর্শন।

[১]. আল কুরআন : সূরা আন'আম, ৬: ৩৪।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

فِي قَسَمِهِ تَعَالَى بِعَظِيمِ قَدْرِهِ

হুযুর (ﷺ) এর শানে আল্লাহ তা'আলার শপথ করা প্রসঙ্গে

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বন্ধুর মর্যাদা শান ও মহত্বের স্মরণে শপথ করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন–

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٢﴾

–হে মাহবুব! আপনার জীবন শপথ নিশ্চয় তারা আপন নেশায় উদ্দেশ্যহীনভাবে বিচরণ করছে।[১]

সকল তাফসীরকারক এ বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র জীবনের কসম করেছেন। মূলতঃ এ 'আমর' জবর যুক্ত হয়েছে। এর অর্থ হলো হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার স্থায়িত্ব ও অমরত্বের শপথ। অথবা অন্যদের অভিমত হলো যে, আপনার জীবনের শপথ। এই শপথের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বন্ধুর প্রতি সীমাহীন সম্মান ও চূড়ান্ত পর্যায়ের অনুগ্রহ ও মহিমা প্রকাশ করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেন, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টজীবের মধ্যে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চেয়ে অধিক মর্যাদাবান আর কাউকে সৃষ্টি করেন নি। তিনিই হলেন তাঁর কাছে অধিক মর্যাদার অধিকারী। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বন্ধুর পবিত্র জীবনের শপথ করেছেন। আল্লাহ অন্য কোনো সৃষ্টজীবের জীবনের শপথ করেন নি।

হযরত আবুল জাওয (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সত্তা ব্যতীত অন্য কারও শানে কসম করেছেন এমনটি ঘটেনি। কেননা তাঁর সত্তা আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক সম্মানিত।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন–

يس ﴿١﴾ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾

– য়া-সীন, প্রজ্ঞাময় কুরআনের শপথ।[১]

[১]. আল কুরআন : সূরা হিজর, ১৫:৭২।

"ইয়া-সীন" শব্দের তাফসীর সম্পর্কে তাফসীরবিদদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

হযরত আবু মুহাম্মদ মক্কী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

لِيْ عِنْدَ رَبِّيْ عَشَرَةَ أَسْمَاءٍ، ذَكَرَ أَنَّ مِنْهَا طٰهٰ وَيٰسٓ اِسْمَانِ لَهٗ.

–আল্লাহ তা'আলার নিকট আমার দশখানা নাম আছে। তম্মধ্যে আল্লাহ তা'আলা 'তোয়া-হা' (طه) ও 'ইয়াসীন' (يس) এই দু'খানা নামের উল্লেখ করেছেন।[২]

হযরত আবদুর রহমান সুলামী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে "ইয়াসীন" শব্দ দ্বারা সম্বোধন করেছেন। "ইয়াসীন" শব্দের অর্থ হলো– হে সরদার।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেন, "ইয়াসীন" শব্দের অর্থ হলো, হে ব্যক্তি বা হে মানুষ। এখানে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মুবারক সত্তাকে বুঝানো হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে, এটা একটি শপথ ও আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নামসমূহের মধ্যে একখানা পবিত্র নাম।

হযরত যুজায (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, "ইয়াসীন" শব্দের অর্থ- ইয়া মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। কারও কারও মতে এর অর্থ হলো হে ব্যক্তি বা হে মানুষ।

ইবনে হানাফীয়া (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, "ইয়াসীন" শব্দের অর্থ হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

হযরত কা'ব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, "ইয়াসীন" শব্দের অর্থ আকাশ-যমীন সৃষ্টির দু'হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা শপথ করে ঘোষণা করেছেন, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! নিশ্চয়ই আপনি আমার রাসূল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

[১]. আল কুরআন : সূরা ইয়াসীন, ৩৬:১-২।
[২]. ক) কুরতুবী : আল জামে' লি আহকামিল কুরআন, বাবু তাফসীর ইয়াসীন, ১৫:৪।
খ) শাওকানী : ফতহুল কদীর, ৪:৪৯২।

وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ۝٢ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۝٣

-হিকমতময় কুরআনের শপথ। নিশ্চয়ই আপনি প্রেরিত রাসূল।[১]

যদি একথা স্বীকার করা হয় যে, "ইয়াসীন" হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র নামসমূহের মধ্যে একখানা নাম। তাহলে এটার সঠিক শব্দার্থ হলো– এটা একটা শপথ। তাহলে এর অর্থ হবে– হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সমুন্নত মর্যাদার প্রথমবার শপথ করার পর দ্বিতীয় বার শপথ করার মাধ্যমে প্রথম শপথের প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। আর এক শপথকে অপর শপথের সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

আর যদি একথা বলা হয় যে, এ আয়াতে "ইয়াসীন" শব্দের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সম্বোধন করেছেন। তাহলে এর অর্থ হবে– "আর বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ" এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রিসালাত ও হিদায়াতের সাক্ষ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাম ও কিতাবের নামে শপথ করেছেন। অতঃপর ঘোষণা করেন যে, আপনি প্রেরিত রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত। তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি ওহী প্রেরণ করেন। আর সাথে সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, নিঃসন্দেহে আপনি সরল-সঠিক পথে সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। এ পথে কোন প্রকার বক্রতা ও তির্যকতা নেই। এপথ সত্য ও স্খলনমুক্ত।

হযরত নাক্কাশ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যতীত অন্য আর কোনো নবীর নবুওয়াত ও রিসালাতের শপথ করেন নি। এরূপ করার একমাত্র কারণ হলো হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শান ও মহত্ত্বের প্রকাশ করা। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে "ইয়াসীন" নামে সম্বোধন করেছেন।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ اٰدَمَ وَلَا فَخْرَ

–আমি সমস্ত আদম সন্তানের সর্দার। এতে আমার কোন গৌরব নেই।[২]

[১]. আল কুরআন : সূরা ইয়াসীন, ৩৬: ২-৩।
[২]. ক) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু যিকরিশ্ শাফা'আত, ১২:৩৬৬।
খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু তাফদ্বিলু নাবিয়্যিনা..., ১১:৩৮৩।

আল্লাহ তা'আলার বাণী–

لَآ أُقْسِمُ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ۝ وَأَنتَ حِلٌّۢ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ۝

–আমার এ শহরের শপথ। যেহেতু হে মাহবুব! আপনি এ শহরে তাশরীফ রেখেছেন।[১]

অধিকাংশ তাফসীরবিদের অভিমত হলো– হে মাহবুব! যদি আপনি এই শহরে তাশরীফ না আনতেন তাহলে আমি এই শহরের শপথ করতাম না। অর্থাৎ অধিবাসীর কারণে স্থান ইজ্জত-সম্মানের অধিকারী হয়।

হযরত মক্কী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এ অভিমতের সমর্থক।

কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেছেন– لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ বাক্যে "লা" শব্দটি অতিরিক্ত। অর্থাৎ আমি এই শহরের শপথ করছি। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি এই শহরের বৈধ নাগরিক। অর্থাৎ আপনি এই শহরে অবস্থান করে যা কিছু করবেন সব বৈধ। এটা দ্বিতীয় প্রকার তাফসীর।

ওলামায়ে কেরামের মতে– শহরের অর্থ- মক্কার শহর।

হযরত ওয়াসেতী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ তা'আলার এই শহরের নামে শপথ করার কারণ হলো আপনার এই শহরে জন্মগ্রহণ ও বসবাস করার কারণে এই শহর সম্মানের অধিকারী হয়েছে। আর আপনার মদিনাতে অবস্থান ও ওফাতের পর মদিনা নগরী সম্মানের অধিকারী হয়েছে। কিন্তু প্রথমোক্ত কথা অতি বিশুদ্ধ ও সঠিক মনে হয়। যেহেতু এই সূরা মক্কা মুয়াজ্জমায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর উক্ত সূরার প্রথমাংশ যথা– وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ "আপনি এই শহরে তাশরীফ রাখছেন।[২]"

হযরত আতা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন–

وَهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۝

–এবং কসম ঐ নিরাপদ শহরের।[৩]

গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ২২:১০৯।
[১]. আল কুরআন : সূরা বালাদ, ৯০:১-২।
[২]. আল কুরআন : সূরা বালাদ, ৯০:২।
[৩]. আল কুরআন : সূরা তীন, ৯৫:৩।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এই শহরে তাশরীফ রাখার কারণে আল্লাহ তা'আলা এই শহরকে নিরাপত্তার শহর বানিয়ে দেন। কেননা আপনার মুবারক সত্তার উপস্থিতিই স্বয়ং নিরাপত্তা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন–

وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ۝

–আর শপথ পিতা ইবরাহিমের এবং তাঁর বংশধরের।[১]

উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে যারা বলেন, এখানে পিতার অর্থ হলো হযরত আদম (আলাইহিস্ সালাম), তারা এই আয়াতের অর্থ ব্যাপক অর্থবোধক মনে করেন। আর যারা এখানে পিতা অর্থে হযরত ইবরাহিম (আলাইহিস্ সালাম) কে স্থির করেন। তারা বলেন, তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় পুত্র অর্থে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বুঝানো হয়েছে। মোটকথা উক্ত সূরায় আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শপথ দু'বার করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার বাণী–

الٓمٓ ۝ ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝

–আলিফ লাম মীম, ঐ কিতাবের মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহ নেই, যা খোদাভীরুদের জন্য পথপ্রদর্শক।[২]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেন, আলিফ, লাম, মীম এটা একটা শপথ। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) ও অন্যান্য তাফসীরবিদগণ ভিন্ন অভিমত প্রকাশ করেছেন।

হযরত সাহল বিন আবদুল্লাহ তাসতরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আলিফ অর্থ-আল্লাহ, লাম অর্থ- জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) আর "মীম" অর্থ হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। তাঁর নামে কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হয়েছে। যাতে কোনো প্রকার সন্দেহ ও সংশয় নেই। প্রথমোক্ত অবস্থায় শপথের সম্ভাবনা রয়েছে। ঐ কিতাব সত্য তাতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। আর এ অবস্থায় তিনি ঐ মর্যাদায় ভূষিত হবেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নামের সাথে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নাম একত্রে সন্নিবেশিত করেছেন। যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

[১]. আল কুরআন : সূরা বালাদ, ৯০:৪।
[২]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:১-২।

হযরত ইবনে আতা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) আল্লাহ তা'আলার বাণী–

قٓ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ۝١

–ক্বা-ফ; সম্মানিত কুরআনের শপথ।[১]

এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ক্বালব মুবারকের শক্তির শপথ করেছেন। কেননা তাঁর ক্বালব মুবারক আল্লাহ তা'আলার সম্বোধন ও নূরের ঝলক সহ্য করতে সক্ষম। আল্লাহ তা'আলার তাজাল্লীর এক ঝলকে তুর পর্বত জ্বলে ভস্ম হয়ে যায় স্বয়ং হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) বেহুশ হয়ে পড়েন। কিন্তু সেই নূরের বিচ্ছুরণ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ক্বালব মুবারকে কোন প্রকার প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেনি। কেননা তাঁর মধ্য ওই তাজাল্লীর ধারণ ক্ষমতা অনেক বেশি ছিলো।

কোনো কোনো ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো, 'ক্বাফ' কুরআন হাকীমের একখানা নাম। কেউ কেউ বলেন, এটা পাহাড়ের নাম যা যমীনকে ঘিরে রেখেছে। কেউ কেউ আবার ভিন্ন অভিমত প্রকাশ করেছেন।

হযরত জাফর বিন মুহাম্মদ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "নজম" অর্থ হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ক্বালব মুবারক। আর "হাওয়া" শব্দের অর্থ হলো– হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র ক্বালব নূরের দ্বারা সম্প্রসারিত হওয়া এবং গায়রুল্লাহ থেকে তাঁর ক্বালব সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হওয়া।

وَٱلْفَجْرِ ۝١ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝٢

–শপথ প্রত্যুষের আলোক রশ্মির, এবং দশ রজনীর।[২]

এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আতা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, 'ফজর' অর্থ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। কেননা ঈমানের আলোকচ্ছটা তাঁর পবিত্র সত্তা থেকে বিচ্ছুরিত হয়েছে।

[১]. আল কুরআন : সূরা ক্বা-ফা, ৫০:১।
[২]. আল কুরআন : সূরা ফাজর, ৮৯, ১-২।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

فِي قَسَمِهِ تَعَالَى جَدُّهُ لَهُ لِتَحَقُّقِ مَكَانَتِهِ عِنْدَهُ

আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক হুযুর (ﷺ) এর সম্মান ও তাযীমের কসম করা

আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَٱلضُّحَىٰ ۝١ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝٢ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝٣ وَلَلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ۝٤ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰٓ ۝٥ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَـَٔاوَىٰ ۝٦ وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدَىٰ ۝٧ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنَىٰ ۝٨ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝٩ وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝١٠ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝١١

–পূর্বাহ্নের শপথ, এবং রাত্রের, যখন পর্দা আবৃত করে, আপনার রব আপনাকে পরিত্যাগ করেননি এবং না অপছন্দ করেছেন। এবং নিশ্চয় পরবর্তী জীবন আপনার জন্য পূর্ববর্তী জীবন অপেক্ষ উত্তম। এবং নিশ্চয় অচিরেই আপনার রব আপনাকে এ পরিমাণ দেবেনে যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। তিনি কি আপনাকে এতিম পাননি? অতঃপর আশ্রয় দিয়েছেন এবং আপনাকে স্বীয় প্রেমে আত্মহারা পেয়েছেন, তখন নিজের দিকে পথ দেখিয়েছেন। এবং আপনাকে অভাবগ্রস্ত পেয়েছেন, অতঃপর ধনী করে দিয়েছেন; সুতরাং এতিমের উপর চাপ সৃষ্টি করবেন না এবং ভিক্ষুককে ধমকাবেন না। আর আপনার রবের নেয়ামতের খুব চর্চা করুন।[১]

উক্ত পবিত্র সূরা-র শানে নুযুলে তাফসীরবিদদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেছেন, বিশেষ কোনো কারণে কারণে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাতের কিয়াম ছেড়ে দেন। তখন কাফির মহিলা আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল অশ্লীল ভাষায় গালি-গালাজ করে। আল্লাহ তা'আলা তখন উক্ত সূরা অবতীর্ণ করেন।

[১]. আল কুরআন : সূরা দ্বোহা, ৯৩:১-১১।

আর কারো কারো অভিমত হলো যে, বিশেষ কোন কারনে কিছু কাল পর্যন্ত হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর ওহী অবতরণ বন্ধ ছিলো। এতে মুশরিকরা অশ্লীল ভাষা বলাবলি করতে লাগলো। তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত সূরা অবতীর্ণ করেন।

কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সৌভাগ্য মণ্ডিত করুন) বলেন, উক্ত সূরায় আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি বিশেষ মর্যাদা তাযীম, তাকরীম ও নিয়ামত প্রদান করেছেন। তা ছয় প্রকার। যথা-

প্রথমত ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্মানিত নামে শপথ করে তাঁর দুনিয়া ও আখিরাতের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে তাঁকে অভিহিত করে এরশাদ করেছেন–

وَٱلضُّحَىٰ ۝١ وَٱلَّيۡلِ إِذَا سَجَىٰ ۝٢

–পূর্বাহ্নের শপথ এবং রাত্রের, যখন পর্দা আবৃত করে।[১]

দ্বিতীয়ত ঃ উক্ত সূরার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে জানিয়ে দেন যে, আপনি আমার নিকট অতীব সম্মানিত ও মহিমান্বিত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী–

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝٣

–না আপনার রব আপনাকে বর্জন করেছেন আর না অপছন্দ করেছেন।[২]

অর্থাৎ আপনার রব আপনাকে নবুওয়াত ও রিসালাতের জন্য মনোনীত করার পর কিভাবে আপনাকে পরিত্যাগ করবেন।

তৃতীয়ত ঃ এর পর আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে ভবিষ্যতের সুসংবাদ অভিহিত করে এরশাদ করেছেন–

وَلَلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ لَّكَ مِنَ ٱلۡأُولَىٰ ۝٤

–আর নিশ্চয় পরবর্তী জীবন আপনার জন্য পূর্ববর্তী জীবন অপেক্ষা উত্তম।[৩]

---

[১]. আল কুরআন : সূরা দোহা, ৯৩:১-২।
[২]. আল কুরআন : সূরা দোহা, ৯৩:৩।
[৩]. আল কুরআন : সূরা দোহা, ৯৩:৪।

আল্লামা ইবনে ইসহাক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, উক্ত আয়াতের মর্মার্থ হলো এই যে, প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে উচ্চ মর্তবা ও মর্যাদা এবং নিয়ামতসমূহ দুনিয়াতে দান করে যাচ্ছেন তার চেয়ে উন্নততর নিয়ামত তাঁর জন্য আখিরাতে নির্ধারণ করে রেখেছেন।

হযরত সাহল (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, উক্ত আয়াতের মর্মার্থ হলো– শাফায়াত ও মাকামে মাহমুদ নামক সম্মানিত স্থান যা আমি তাঁর জন্য আখিরাতে নির্ধারণ করে রেখেছি। দুনিয়াতে আমি তাঁকে যে সমস্ত নিয়ামত দান করেছি সেগুলোর তুলনায় এগুলো অনেক উন্নততর ও বিশাল।

চতুর্থত ঃ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন–

وَلَسَوۡفَ يُعۡطِيكَ رَبُّكَ فَتَرۡضَىٰٓ ۝٥

–অচিরেই আপনার রব আপনাকে এ পরিমাণ দান করবেন, যাতে আপনি আনন্দিত হয়ে যাবেন।[১]

উক্ত আয়াতে বিভিন্ন প্রকার মু'জিযা, সৌভাগ্যশীলতা, দুনিয়া ও আখিরাতের দয়া মহানুভবতা, দান-ক্ষমা ইত্যাদি নিয়ামতের সম্পৃক্ততার কথা বলা হয়েছে।

হযরত ইবনে ইসহাক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন এর মর্মার্থ হলো– ইহকালে আপনাকে সফলতা দিয়ে ও পরকালে পূন্য দ্বারা আপনাকে সন্তুষ্ট করে দেবেন।

কেউ কেউ বলেছেন, এর মর্মার্থ হলো হাউজে কাউসার ও শাফায়াত। (উক্ত উভয় মর্যাদা আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিনে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে প্রদান করবেন।)

কেউ কেউ বলেছেন– একজন আহলে বাইত বর্ণনা করেছেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সন্তুষ্ট করা সংক্রান্ত কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহের মধ্যে উপরোক্ত আয়াত সবচেয়ে বেশি অর্থবহ। কেননা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর একজন উম্মাত যতক্ষণ জাহান্নামে অবস্থান করবে ততক্ষণ তিনি সন্তুষ্ট হবেন না।

পঞ্চমত ঃ উক্ত সূরায় আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে যে নিয়ামতসমূহ দান করেছেন তার সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন। আর সূরা অবশিষ্টাংশে আল্লাহ তা'আলা ঐ সমস্ত

---

[১]. আল কুরআন : সূরা দোহা, ৯৩:৫।

নিয়ামতের কথা বলেছেন যেগুলো আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর হিদায়তের দায়িত্ব অর্পন করার পর বা তাঁকে দিশারী মনোনীত করার মাধ্যমে দান করেছেন। আর সেই সমস্ত নিয়ামতের কথা অতি সংক্ষিপ্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তাঁর ধন-সম্পদ ছিলনা। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিত্তশালী করেছেন। একথা স্বীকার করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নূরানী ক্বালবকে অমুখাপেক্ষীতার মহান দৌলতে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনাথ অসহায় ছিলেন, সুতরাং তাঁর চাচাকে তাঁর জন্য দয়ালু বানিয়ে দেন। চাচার নিকট তাঁর আশ্রয় স্থির করেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে নিজের আশ্রয়ে নিয়েছেন।

কোনো কোনো আলেমের অভিমত হলো– হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন (يَتِيمًا) ইয়াতিম ছিলেন যা তুলনাবিহীন কিন্তু আল্লাহ তা'আলা অতঃপর তাঁকে নৈকট্যে স্থান দিয়েছেন। নিজ তত্ত্বাবধানে তাঁকে শত্রুদের মাঝে লালন-পালন করেছেন।

কোনো কোনা আলেম বলেন, উক্ত আয়াতসমূহের মর্মার্থ হলো, আমি কি আপনাকে অসহায় পাইনি? আপনার মাধ্যমে আমি পথভ্রষ্ট লোকদেরকে পথের দিশা দান করেছি। দরিদ্রদেরকে বিত্তশালী করে দিয়েছি। আপনার মাধ্যমে অসহায় ইয়াতিমদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। উক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিয়ামত প্রদানের কথা প্রকাশ করেছেন। সকল তাফসীরবিদের অভিমতে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা কখনো তাঁকে পরিত্যাগ করেন নি। চায় তা বাল্যকালেই হোক বা অসহায় অবস্থায় হোক বা ইয়াতিম অবস্থায় হোক। বা ঐ সময়ই হোক যখন তিনি তাঁর নিজের মর্যাদা সম্পর্কে অভিহিত ছিলেন না। তাঁর রব তাঁকে বর্জন করেন নি এবং তাঁর প্রতি বৈরীও হননি। এই সব অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বর্জন করেন নি। তাহলে বলুন নবুওয়াত ও রিসালাতের দায়িত্ব প্রদানের জন্য তাঁকে মনোনীত করার পর কিভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর থেকে কৃপাদৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন?

ষষ্ঠত ঃ আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি আপনাকে যে নিয়ামত, মর্যাদা, সম্মান, মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি সেগুলোর কথা বর্ণনা করুন। এবং এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। তাই নিয়ামত প্রকাশ করা এবং সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾

–আর আপনার রবের নিয়ামতের খুব চর্চা করুন।[১]

এ আয়াতের মর্মার্থ হলো– আপনি নিয়ামতসমূহের কথা মানুষের নিকট আলোচনা করুন। এ নির্দেশ আপনার জন্য বিশেষভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এটা আপনার উম্মতের জন্য ব্যাপক করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহকে গোপন করা যাবে না, বরং তা মানুষের নিকট প্রকাশ করুন।

আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿١﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿٢﴾ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾ عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ﴿٥﴾ ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ﴿٦﴾ وَهُوَ بِٱلْأُفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿٧﴾ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ﴿٨﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴿٩﴾ فَأَوْحَىٰٓ إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَآ أَوْحَىٰ ﴿١٠﴾ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰٓ ﴿١١﴾ أَفَتُمَٰرُونَهُۥ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴿١٢﴾ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿١٣﴾ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿١٤﴾ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰٓ ﴿١٥﴾ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴿١٦﴾ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿١٧﴾ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَٰتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰٓ ﴿١٨﴾

–ওই প্রিয় উজ্জ্বল নক্ষত্র মুহাম্মদের শপথ, যখন তিনি মি'রাজ থেকে অবতরণ করেন; তোমাদের 'সাহিব' না পথভ্রষ্ট হয়েছেন, না বিপথে চলেছেন। আর তিনি কোন কথা নিজ প্রবৃত্তি থেকে বলেন না। তা তো ওহীই, যা তাঁর প্রতি (নাযিল) করা হয়। তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন প্রবল

১. আল কুরআন : সূরা দোহা, ৯৩:১১।

শক্তিসমূহের অধিকারী, শক্তিমান।অতঃপর ওই জ্যোতি ইচ্ছা করলেন; আর তিনি উচ্চাকাশের সর্বোচ্চ দিগন্তে ছিলেন। অতঃপর খুব নেমে আসলো। অতঃপর ওই জ্যোতি ও এ মাহবূবের মধ্যে দু'হাতের ব্যবধান রইলো; বরং তদপেক্ষাও কম। তখন ওহী করলেন আপন বান্দার প্রতি যা ওহী করার ছিলো। অন্তর মিথ্যা বলে নি যা দেখেছে। তবে কি তোমরা তাঁর সাথে তিনি যা দেখেছেন তাতে বিতর্ক করেছো? এবং তিনি তো ওই জ্যোতি দু'বার দেখেছেন; সিদরাতুল মুন্তাহার নিকটে। সেটার নিকট রয়েছে 'জান্নাতুল মা'ওয়া'। যখন সিদরার উপর আচ্ছন্ন করছিলো যা আচ্ছন্ন করছিলো; চক্ষু না কোন দিকে ফিরেছে, না সীমাতিক্রম করেছে। নিশ্চয় আপন রবের বহু বড় নিদর্শনাদি দেখেছেন।[১]

'নজম' শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীরবেত্তাদের মতানৈক্য রয়েছে। এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করেছেন। তবে তারা সকলে বাহ্যিক প্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করেছেন যে- এর মর্মার্থ হলো- পবিত্র কুরআন মাজীদ।

হযরত জাফর বিন মুহাম্মদ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, এর মর্মার্থ হলো হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র ক্বালব মুবারক।

আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ۝ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلطَّارِقُ ۝ ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ ۝

–আসমানের শপথ এবং রাতে আগমনকারীর; এবং আপনি কি কিছু জেনেছেন সেই রাতে আগমনকারী কী? তা হচ্ছে অত্যন্ত উজ্জ্বল তারকা।[২]

এখানেও 'নজম' এর মর্মার্থ হলো- হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।হযরত সালমী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও এই অভিমতের সমর্থক।

উক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মর্যাদা সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের সীমা ও সংখ্যাহীন প্রশংসা করেছেন। অন্য কোনো আয়াতে এরূপ বর্ণনা করা হয়নি। এই সমস্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা শপথ করে

[১]. আল কুরআন : সূরা নজম, ৫৩:১-১৮।
[২]. আল কুরআন : সূরা আত্ তারিক্ব, ৮৬:১-৩।

তাঁর হিদায়াত ও প্রবৃত্তির অপ-আকাঙ্ক্ষা থেকে তাঁকে পবিত্র করেছেন এবং সত্যবাদিতায় সুসজ্জিত করেছেন। আর এ কথাও স্পষ্ট করেছেন যে, তাঁর পঠিত আয়াতসমূহ সত্য। তিনি নিজের প্রবৃত্তি প্রসূত কোনো কথা বলেন না। তিনি তাই বলেন যা তাঁর নিকট ওহী করা হয়। আর এই ওহী তাঁর কাছে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) নিয়ে আসেন। হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) কোনো সাধারণ সত্তা নন বরং তিনি অত্যন্ত শক্তিধর। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মিরাজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

সে বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তাঁকে সিদরাতুল মুন্তাহায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে তাঁর চক্ষু যা প্রত্যক্ষ করেছে তা সত্যিই প্রত্যক্ষ করেছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মি'রাজ সফরে আল্লাহ তা'আলার মহান নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করেন। এরূপ নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করার কথা সূরা ইসরার প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মি'রাজ ভ্রমণে আলমে জাবারুত ও আলমে মালাকুতের সে সমস্ত অভূতপূর্ব দৃশ্যাবলী পর্যবেক্ষণ করেন, সেগুলোর বর্ণনা কোনো শব্দের গণ্ডিতে আনা সম্ভব নয়। আর না কোনো সাধারণ জ্ঞানে এ সম্পর্কে সামান্যতম ধারণা সম্ভব হবে। এ কারণে এমন বিস্ময়কর ও সঙ্গীন পরিস্থিতির বর্ণনা আল্লাহ তা'আলা শুধু ইশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমেই প্রদান করেন যা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মাহাত্ম্য ও সম্মানের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। সুতরাং এই মর্মে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন–

فَأَوْحَىٰٓ إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَآ أَوْحَىٰ ۝

–তখন ওহী করলেন আপন বান্দার প্রতি যা ওহী করার ছিলো।[১]

আর এ ধরণের কালামকে ভাষাবিদ ওলামাগণ ইঙ্গিতধর্মী নামে নামকরণ করেছেন। তাদের মতে এটা হলো অতি উচ্চ স্তরের বিস্ময় বা অলৌকিকত্ব।

আর আল্লাহ তা'আলা বাণী–

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَٰتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰٓ ۝

– নিশ্চয়ই আপনি রবর বহু বড় নিদর্শন দেখেছেন।[২]

[১]. আল কুরআন : সূরা আন্ নজম, ৫৩:১০।
[২]. আল কুরআন : সূরা আন্ নজম, ৫৩: ১৮।

মানুষের বিবেক এই ওহীর মর্মার্থ অনুধাবণ করতে অক্ষম। আর মানুষ এ সম্পর্কে কোনো প্রকার চিন্তাই করতে পারেনা যে, আল্লাহ তা'আলা মি'রাজ সফরে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে কী ধরণের নিদর্শনাবলী দেখিয়েছেন।

কাযী আবুল ফযল আয়ায (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, উক্ত আয়াতসমূহের বিষয়বস্তুর দ্বারা একথা প্রকাশিত হয়েছে যে, মি'রাজ সফরে আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উজুদ মুবারককে পবিত্র করে দেন। ঐ সফরে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সকল প্রকারের বিপদ থেকে হেফাজত করেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুবারক ক্বালব, জবান ও পুরো দেহকে পরিশোধিত করেদেন। মুবারক ক্বালবকে পরিশোধিত করার কথা এভাবে বর্ণনা করেন–

مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰٓ ﴿١١﴾

–অন্তর মিথ্যা বলেনি যা দেখেছে।[১]

আর জবান মুবারক পরিশোধিত করার কথা এভাবে বলা হয়েছে–

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾

–এবং তিনি কোন কথা নিজ প্রবৃত্তি থেকে বলেন না।[২]

আর চক্ষুর পরিশোধিত হবার কথা এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে–

مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿١٧﴾

–চক্ষু না কোনো দিকে ফিরেছে, না সীমাতিক্রম করেছে।[৩]

আল্লাহ তা'আলার বাণী–

فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلْخُنَّسِ ﴿١٥﴾ ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنَّسِ ﴿١٦﴾ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿١٧﴾ وَٱلصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ﴿٢٢﴾

১. আল কুরআন : সূরা আন্ নজম, ৫৩: ১১।
২. আল কুরআন : সূরা আন্ নজম, ৫৩: ৩।
৩. আল কুরআন : সূরা আন্ নজম, ৫৩: ১৭।

وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأُفُقِ ٱلْمُبِينِ ﴿٢٣﴾ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿٢٤﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَٰنٍ رَّجِيمٍ ﴿٢٥﴾

–সুতরাং তারই শপথ যা প্রত্যাবর্তন করে। সোজা চলে, স্থিত থাকে এবং রাতের শপথ, যা পৃষ্ঠ প্রদান করে, আর প্রভাতের শপথ, যখন শ্বাস গ্রহণ করে। নিশ্চয় এটা সম্মানিত প্রেরিতের বাণী, যিনি শক্তিশালী, আরশাধিপতির দরবারে সম্মানিত, সেখানে তাঁর আদেশ পালন করা হয়, যিনি আমানতদার। তোমাদের মুনিব তোমাদের সাথে আছেন, পাগল নন, এবং নিশ্চয় তিনি তাঁকে আলোকিত প্রান্তে দেখলেন, আর এ নবী অদৃশ্য বিষয় বর্ণনা করার ব্যাপারে কৃপণ নন এবং কুরআন বিতাড়িত শয়তানের বাণী নয়।[১]

'লা উকসিমু' (لَا أُقْسِمُ) এর মর্মার্থ আমি শপথ করছি অর্থাৎ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ পয়গাম বাহকের কথায় যিনি প্রে রণকারী অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিকট বিরাট সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। ذِي قُوَّةٍ অর্থাৎ যে ওহী পৌছানোর জন্য তার উপর ন্যস্ত করা হয়, তার ভার বহন করতে সক্ষম। مَكِينٍ অর্থাৎ পৌছানোর কাজে ভীষণ পারদর্শী। আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর মর্যাদা অধিক উর্ধ্বে। আর অনেক মাখলুক তাঁর আজ্ঞাবহ। مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ –আর তিনি হলেন আসমানে ওহীর প্রকৃত আমানতদার।

হযরত আলী বিন ঈসা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের অভিমত– 'সম্মানিত রাসূল' এর মর্মার্থ হলো হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। অতঃপর যে সমস্ত প্রশংসনীয় গুণাবলীর বর্ণনা করা হয়েছে, সেই সমস্ত প্রশংসনীয় গুণাবলী হলো হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর।

অপর একদল আলেম বলেন– 'সম্মানিত রাসূল' এর মর্মার্থ হলো হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম)। এ সমস্ত প্রশংসনীয় গুণাবলীও হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম)'র। আর এ আয়াতে বর্ণিত 'ওয়া লাকাদ্ রাআহু' (وَلَقَدْ رَاٰهُ) এ বাক্যের মর্মার্থ হলো– হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মি'রাজ সফরে আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন।

১. আল কুরআন : সূরা তাকভীর, ৮১:১৫-২৫।

কেউ কেউ বলেছেন– হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) কে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছেন। আয়াতে কারীমা,

وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۝٢٤

–এবং এ নবী অদৃশ্য বিষয় বর্ণনা করার ব্যাপারে কৃপন নন।[১]

আর যারা এখানে 'দোয়াত' পাঠ করে তাদের মতে এর অর্থ হলো কৃপণ। অর্থাৎ হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানুষের কল্যাণে দোয়া করায় তাদেরকে ওয়াজ-নসিহত ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যাপারে কার্পণ্য করেন না। সমস্ত ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন যে, এটা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রশংসনীয় গুণাবলী'র অন্যতম।

আর আল্লাহ তা'আলার বাণী–

نٓ ۚ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝١

–নু-ন। ক্বলম ও তাদের লিখার শপথ।[২]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বিরাট এক শপ[থ] করেছেন। আর এই কলমের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবী হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে কাফিররা যে সমস্ত মিথ্যা কথা বলতো সেগুলো থেকে তাঁকে পবিত্র করেদেন। আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আনন্দিত করে তাঁর মাঝে আনন্দের হিল্লোল বয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে তাঁকে একান্ত মনোরম ভাষায় সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন–

مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۝٢

–আপনি আপনার রবের অনুগ্রহে উন্মাদ নন।[৩]

সত্য কথা বলতে কি আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সকল প্রকার মিথ্যা অপবাদ থেকে মুক্ত করার জন্য এক অতি আশ্চর্যজনক প্রাঞ্জল ভাষায় সম্বোধন করেছেন। লক্ষ্য করুন আল্লাহ তা'আলা কী অপূর্ব ভঙ্গিমায় হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সম্বোধন করেছেন। অতঃপর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে অভিহিত করা হয়েছে যে, আপনাকে পরকালীন

১. [আ]ল কুরআন : সূরা আত্ তাকভীর, ৮১:২৫।
২. [আ]ল কুরআন : সূরা ক্বলাম, ৬৮:১-১৬।
৩. আল কুরআন : সূরা ক্বলাম, ৬৮:২।

জীবনের অফুরন্ত অনন্তকালীন নিয়ামতসমূহ প্রদান করা হবে। আর আপনাকে এরূপ অপূর্ব ফয়েজ প্রদান করা হবে যা কোনো দিন শেষ হবে না। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পরাভূতও করেন নি। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীব (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে পুরস্কার প্রদানের কথা এভাবেই এরশাদ করেছেন–

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۝٣

–এবং অবশ্যই আপনার জন্য অশেষ পুরস্কার রয়েছে।[১]

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে যে সমস্ত নিয়ামত ও পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে পূর্ণতা দান করেছেন, তাঁর মহিমান্বিত শানের প্রশংসা করে এরশাদ করেছেন–

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝٤

–আপনি মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।[২]

কেউ কেউ বলেছেন "খুলুকুন আযীম" অর্থ কুরআন মাজীদ। আবার কেউ বলেছেন "ইসলাম"।

কেউ কেউ বলেছেন– হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সুমহান চারিত্রিক গুণাবলী।

কেউ কেউ এরূপ বলেছেন যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মনোযোগ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর অন্য কারও প্রতি আকৃষ্ট ছিলো না।

আল্লামা ওয়াসেতী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন– আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সুন্দর স্বীকারোক্তির প্রশংসা করে বর্ণনা করেছেন আমি তাঁকে এই সমস্ত নিয়ামত প্রদান করেছি। এর বদৌলতে আমি তাঁকে আমার আপন সত্তা ব্যতীত অন্যান্য সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রদান করেছি। এই কারণে তাঁকে এরূপ সমুন্নত আখলাকের উপর সৃজন করেছি। সুতরাং তিনি পূত-পবিত্র তিনি দয়াদ্র, দয়ালু, দানশীল। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য সকল কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। আর সেইদিকে তাঁর আকর্ষণ সৃষ্টি করে দেন। আর সেই কল্যাণকর কাজ বাস্তবায়নকারীর প্রশংসা করেছেন এবং

১. আল কুরআন : সূরা ক্বলাম, ৬৮:৩।
২. আল কুরআন : সূরা ক্বলাম, ৬৮:৪।

তাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করেছেন। তিনি পূতঃপবিত্র, তাঁর দান ব্যাপক, পুরষ্কার সীমা সংখ্যাহীন। তাঁর দয়া ও স্নেহ ব্যাপক। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কাফিরদের অশালীন আচরণের পর শান্ত্বনা প্রদান করে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, এ ধরণের অপবাদের জন্য তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে।

এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ۝ بِأَييِّكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ۝ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۝

–সুতরাং অবিলম্বে আপনিও দেখে নেবেন এবং তারাও দেখে নেবে যে, তোমাদের মধ্যে কে উন্মাদ ছিলো। নিশ্চয় আপনার রব ভালভাবে জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি ভালোভাবে জানেন তাদেরকে, যারা সত্য পথে রয়েছে।[১]

উক্ত তিনটি আয়াতে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রশংসা ও তাঁর শত্রুদের নিন্দাবাদকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং কাফিরদের মন্দ স্বভাবের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। তাদের দোষত্রুটিকে চিহ্নিত করে প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁর প্রতি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন এবং তাঁকে সাহায্য করেছেন। সুতরাং সেই প্রসঙ্গে এরশাদ করা হয়েছে–

فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۝

–আপনি মিথ্যাবাদীদের কথা শুনবেন না।[২]

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَٰتُنَا قَالَ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۝

–যখন তার নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন বলে এতো পূর্ববর্তীদের কাহিনী।[৩]

অবশেষে তাঁর সত্য প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করে বলেছেন, আমি তাদের জন্য অনন্তকালীন দুর্ভোগ ও ধ্বংস নির্ধারণ করে রেখে দিয়েছি।

[১]. আল কুরআন : সূরা ক্বলাম, ৬৮:৫।
[২]. আল কুরআন : সূরা ক্বলাম, ৬৮:৮।
[৩]. আল কুরআন : সূরা ক্বলাম, ৬৮:১৫।

এই প্রসঙ্গে এরশাদ করা হয়েছে–

سَنَسِمُهُۥ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ ۝

–অতিসত্বর আমি তার শুড়রূপী থুতনীর উপর দাগ দেবো।[১]

আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার সাহায্য তাঁর নিজের সাহায্য থেকে অনেক উত্তম। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তার দুশমনদের উপর বিজয়ী করেছেন। এটা কিন্তু তিনি নিজে লাভ করতে সক্ষম হননি। আর তাঁর বিজয়ী হবার বিষয় তাঁর বীরত্বের খাতায় উল্লেখযোগ্য প্রমাণ হয়ে রয়েছে।

[১]. আল কুরআন : সূরা ক্বলাম, ৬৮:১৬।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

فِيمَا وَرَدَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي جِهَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْرِدَ الشَّفَقَةِ وَالْإِكْرَامِ

হুযুর (ﷺ) এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানী ও দয়া প্রসঙ্গে

আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে দয়া ও মেহেরবাণীর কেন্দ্রবিন্দু বানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী–

طه ۝١ مَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰٓ ۝٢

– তোয়াহা। হে আমার প্রিয় হাবীব! আমি আপনার উপর কুরআন এজন্য অবতীর্ণ করিনি যে আপনি কষ্টে পতিত হবেন।[১]

কেউ কেউ বলেন, "তোহা" শব্দের মর্মার্থ হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নামসমূহের মধ্যে এক অন্যতম নাম।

কেউ কেউ বলেছেন "তোহা" অর্থ আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের মধ্যে একখানা নাম।

কেউ কেউ বলেছেন– "তোহা" শব্দের অর্থ - হে ব্যক্তি।

আবার কেউ কেউ বলেছেন "তোহা" অর্থ- হে ইনসান বা পুরুষ।

কেউ কেউ বলেছেন, এটা হরফে মুকাত্তায়াত এর অর্ন্তভুক্ত। এর একাধিক অর্থ রয়েছে।

আল্লামা ওয়াসেতী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন– "তোহা" শব্দের মর্মার্থ হলো ইয়া তাহিরো, ইয়া হাদী।

আবার কেউ কেউ বলেছেন– 'তোয়া-হা' (طه) শব্দের অর্থ পায়ে চলা,আহবানকারী অব্যয়। আর 'হা' হলো যমীনের প্রতি ইঙ্গিত সূচক অব্যয়। অর্থাৎ আপনি আপনার পদযুগলের উপর দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবেন না। এজন্য আপনাকে ভীষণ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। তখন আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন, হে হাবীব (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি দুঃখ-কষ্ট নিপতিত হবেন এজন্য তো আমি আপনার উপর কুরআন অবতীর্ণ করিনি।

[১]. আল কুরআন : সূরা ত্বোয়া-হা, ২০:১-২।

উক্ত আয়াত এজন্যই অবতীর্ণ হয়েছে যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইবাদত-বন্দেগীতে বিশেষ করে রাত্রিজাগরণ করতেন। সারা রাত নামাযে দাঁড়িয়ে থাকার মাধ্যমে ভীষণ কষ্ট করতেন।

কাজী আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি হযরত রবীয়া বিন আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাতে এক পায়ের উপর দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন। আর অপর পা উপরে উঠিয়ে রাখতেন। তখন আল্লাহ তা'আলা "তোহা" উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। হে হাবীব মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি কদমযুগল যমীনের উপর রেখে দাঁড়ান।

مَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰٓ ۝٢ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ۝٣ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلْعُلَى ۝٤

–হে মাহবুব! আমি আপনার উপর এ কুরআন এ জন্য অবতীর্ণ করিনি যে, আপনি ক্লেশে পড়বেন। হ্যাঁ, তারই জন্য উপদেশ যে ভয় করে, তাঁরই অবতীর্ণ, যিনি যমীন ও সুউচ্চ আসমানসমূহ সৃষ্টি করেছেন।[১]

এই কথা গোপনীয় নয় যে, এই সব কিছু তাঁর উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে ইজ্জত সম্মান দান করেছেন। তাঁর প্রতি সুন্দর আচরণ করেছেন।

যদি আমরা ধারণা করি যে, 'তোহা' (طه) হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নামসমূহের মধ্যে একখানা নাম। এ নামের শপথ করেছেন। অথবা এ ধরণের যে-কোন অভিমতই প্রকাশ করা হোক না কেন তবুও একথা স্বীকার করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি একান্ত বিনয়ী হয়ে তাঁকে স্নেহের সাথে সম্বোধন করেছেন। এই প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে এরশাদ করা হয়েছে–

فَلَعَلَّكَ بَٰخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ۝٦

[১]. আল কুরআন : সূরা ত্বোয়া-হা, ২০:২।

–তবে সম্ভবত! আপনি আত্মবিনাশী হয়ে পড়বেন তাদের পেছনে যদি তারা এ বাণীর উপর ঈমান না আনে, আক্ষেপে।[১]

অর্থাৎ তাদের ঈমান না আনার কারণে আপনি আপনার নিজেকে ধ্বংস করবেন না। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে এরশাদ করা হয়েছে–

لَعَلَّكَ بَٰخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

–হয়তো আপনি আপন প্রাণ বিনাশী হয়ে যাবেন এ দুঃখে যে তারা ঈমান আনেনি।[২]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَٰقُهُمْ لَهَا خَٰضِعِينَ ﴿٤﴾

–যদি আমি ইচ্ছা করি তাহলে আসমান থেকে তাদের উপর কোনো নিদর্শন অবতরণ করবো, যাতে তাদের উচুঁ উচুঁ গ্রীবাগুলো সেটার সামনে বিনত হয়ে যাবে।[৩]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

فَٱصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾ إِنَّا كَفَيْنَٰكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴿٩٥﴾ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾

–অতএব, প্রকাশ্যভাবে বলে দিন যে কথার আপনাকে নিদের্শ দেয়া হয়েছে এবং মুশরিকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। নিশ্চয় সেই বিদ্রূপকারীদের স্থির করে, সুতরাং শীঘ্রই তারা জেনে যাবে, এবং নিশ্চয় আমার জানা আছে যে, তাদের কথায় আপনার অন্তর সংকুচিত হয়।[৪]

---

[১]. আল কুরআন : সূরা কাহাফ, ১৮:৬।
[২]. আল কুরআন : সূরা শু'আরা, ২৬:৩।
[৩]. আল কুরআন : সূরা শু'আরা, ২৬:৪।
[৪]. আল কুরআন : সূরা হিজর, ১৫: ৯৪-৯৭।

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُوا۟ مِنْهُم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٠﴾

–এবং নিশ্চয় হে মাহবুব! আপনার পূর্বে রাসূলগণের সাথেও ঠাট্টা বিদ্রুপ করা হয়েছে। তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতেছিল পরিণামে তা-ই বিদ্রুপকারীকে পরিবেষ্টন করেছে।[১]

আল্লামা মক্কী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন– উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সান্ত্বনা দান করে কাফিররা তাঁকে যে দুঃখ কষ্ট দিয়েছিলো সেগুলোকে হালকা করে দেন। আর একথাও অভিহিত করে দেন যে, যারা আপনাকে এ বিষয়ে কষ্ট দেবে তাদেরকে আমি পূর্ববর্তী উম্মাতদের মতো আযাব দেবো। আর আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সান্তনা দান প্রসঙ্গে এরশাদ করেছেন–

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ ۚ

–এবং যদি এরা আপনাকে অস্বীকার করে তবে নিশ্চয়ই আপনার পূর্বে কত রাসূলকেই অস্বীকার করা হয়েছে।[২]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

كَذَٰلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا۟ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٥٢﴾

–এমনিভাবেই যখন তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট কোন রাসূল তাশরীফ এনেছেন, তখন তারা এটাই বলেছে, যাদুকর বা উন্মাদ।[৩]

উক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী উম্মাত ও তাদের আচার-আচরণ সম্পর্কে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে অভিহিত করে বলেছেন যে,

---

[১]. আল কুরআন : সূরা আন'আম, ৬: ১০।
[২]. আল কুরআন : সূরা ফাতির, ৩৫:৪।
[৩]. আল কুরআন : সূরা যারিয়াত, ৫১:৫২।

আপনাকে যেভাবে দুঃখ-কষ্ট দেয়া হচ্ছে অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী আম্বিয়া (আলাইহিস্ সালাম) কেও দুঃখ-কষ্ট দেয়া হয়েছে।

এভাবে আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সান্ত্বনা প্রদান করে বলছেন যে, আপনাকে মক্কার কাফিরদের শত নির্যাতন ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে। সুতরাং আপনিই প্রথম ব্যক্তি নন যে আপনাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। তারপর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সন্তুষ্ট করা হয়েছে। আর তাঁর আপত্তিকে এভাবে এরশাদ করা হয়েছে–

فَتَوَلَّ عَنۡهُمۡ

–সুতরাং হে মাহবুব! আপনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।[১]

অতঃপর এরশাদ করা হয়েছে–

فَمَآ أَنتَ بِمَلُومٍ

–তাহলে আপনার কোন দোষ হবেনা।[২]

কেননা আপনি রিসালাতের বাণী প্রচার করেছেন। দাওয়াত ও পথপ্রদর্শনে পূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং আপনি স্বীয় প্রচেষ্টার মধ্যে বিন্দুমাত্র ত্রুটিও করেননি।

অতঃপর এরশাদ করা হয়েছে–

وَٱصۡبِرۡ لِحُكۡمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعۡيُنِنَا ۖ وَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٨﴾

–এবং হে মাহবুব! আপনি আপন রবের আদেশের উপর স্থির থাকুন। কারণ, নিশ্চয় আপনি আমার রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছেন এবং আপন রবের প্রশংসাকারী হয়ে তার পবিত্রতা ঘোষণা করুন! যখন আপনি দণ্ডায়মান হোন।[৩]

অনুরূপ অনেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সান্ত্বনা প্রদান করেছেন।

---

১. আল কুরআন : সূরা যারিয়াত, ৫১:৫৪।
২. আল কুরআন : সূরা যারিয়াত, ৫১:৫৪।
৩. আল কুরআন : সূরা তূর, ৫২:৪৮।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

فِيمَا أَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى بِهِ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ مِنْ عَظِيمِ قَدْرِهِ وَشَرِيفِ مَنْزِلَتِهِ عَلَى الأَنْبِيَاءِ وَحَظْوَةِ رتبته عَلَيْهِم

হুযুর (ﷺ) কে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক চূড়ান্ত পর্যায়ের ফযীলত ও মর্যাদা প্রদান প্রসঙ্গে

আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মহিমান্বিত মর্যাদার উল্লেখ ও অন্যান্য আম্বিয়া (আলাইহিস্ সালাম) এর উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের উল্লেখ করে পবিত্র কুরআন মাজীদে বর্ণনা করেছেন–

وَإِذۡ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ لَمَآ ءَاتَيۡتُكُم مِّن كِتَٰبٖ وَحِكۡمَةٖ ثُمَّ جَآءَكُمۡ رَسُولٞ مُّصَدِّقٞ لِّمَا مَعَكُمۡ لَتُؤۡمِنُنَّ بِهِۦ وَلَتَنصُرُنَّهُۥۚ قَالَ ءَأَقۡرَرۡتُمۡ وَأَخَذۡتُمۡ عَلَىٰ ذَٰلِكُمۡ إِصۡرِيۖ قَالُوٓاْ أَقۡرَرۡنَاۚ قَالَ فَٱشۡهَدُواْ وَأَنَا۠ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّٰهِدِينَ ﴿٨١﴾

–হে রাসূল! আপনি ঐ সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ তা'আলা নবীগণের নিকট থেকে তাঁদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, "আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও হিকমত প্রদান করবো, অতঃপর তাশরীফ আনবেন তোমাদের নিকট রাসূল", যিনি তোমাদের কিতাবগুলোর সত্যায়ন করবেন, তখন তোমরা নিশ্চয় তাঁকে সাহায্য করবে। এরশাদ করলেন, তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ সম্পর্কে আমার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করলে? সবাই আরয করলো! আমরা স্বীকার করলাম। এরশাদ করলেন, তবে তোমরা একে অপরের উপর সাক্ষী হয়ে যাও এবং আমি নিজেই তোমাদের সাথে সাক্ষীদের মধ্যে রইলাম।[১]

আবুল হাসান ক্বাবিসী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন– আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে যেরূপ শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রদান করেছেন অন্য কোন নবীকে অনুরূপ মর্যাদা প্রদান করেননি। উক্ত আয়াতে তাই বর্ণনা করা হয়েছে।

---

১. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:৮১।

মুফাসসিরানে কেরাম বলেন– আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে হযরত আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) এর নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। আর আল্লাহ তা'আলা এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি, যার নিকট হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মর্যাদা ও প্রশংসার কথা বলেননি। ঐ প্রতিশ্রুতিতে বলা হয়েছে যে, তুমি যখন শেষ নবীর সময়কালে পাবে তখন তাঁর উপর ঈমান আনবে। অথবা এরূপ প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক নবী স্ব-স্ব গোত্রের লোকদের ঐ বিষয় অভিহিত করবে এবং তাদের নিকট থেকে আরো প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছে যে, তারা তাদের আগত বংশধরদেরও হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আগমন সম্পর্কে অভিহিত করবে।

আল্লাহ তা'আলা– 'সুম্মা জা-আকুম' (ثُمَّ جَاءَكُمْ) এর দ্বারা ওইসব আহলে কিতাবদের সম্বোধন করেছেন, যারা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দ্বারা আমান বা নিরাপত্তা পেয়েছে।

হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে–

لَمْ يَبْعَثِ اللهُ نَبِيًّا اٰدَمَ فَمَنْ بَعْدَهُ، إِلَّا أَخَذَ عَلَيْهِ الْعَهْدَ فِيْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَئِنْ بُعِثَ، وَهُوَ حَيٌّ، لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ ، وَلَيَنْصُرَنَّهُ، وَيَأْخُذُ الْعَهْدَ بِذَالِكَ عَلَى قَوْمِهِ،

–হযরত আদম (আলাইহিস্ সালাম) থেকে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যমানা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এমন কোনো নবী প্রেরণ করেননি, যাদের নিকট থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়নি যে, তোমরা যদি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে পাও তাহলে অবশ্যই তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। আল্লাহ তা'আলা হযরত আম্বিয়া (আলাইহিস্ সালাম) এর নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন।

তাঁরা যেনো স্ব-স্ব উম্মাতের নিকট এই মর্মে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে– যখন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আগমন করবেন তখন তোমরা সকলে তাঁর উপর অবশ্যই ঈমান আনবে এবং তাঁকে সার্বিকভাবে সাহায্য করবে। অনুরূপ বর্ণনা হযরত কাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। তাঁরা বলেছেন উক্ত আয়াতে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চূড়ান্ত মর্যাদা ও ফযীলতের কথা বলা হয়েছে।[১]

[১]. বাগভী : মা'আলিমুত তানযীল, ২:৬২; শাওকানী : ফতহুল কদীর, ১:৪৮৯।

আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٧﴾

–হে রাসূল! স্মরণ করুন, যখন আমি নবীগণের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছি এবং আপনার নিকট থেকে এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা, মরিয়ম পুত্র ঈসা থেকে। আর আমি তাদের থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছি।[১]

আল্লাহ তা'আলার বাণী–

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا

–নিঃসন্দেহে হে রাসূল! আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করেছি যেমন নূহ ও তাঁর পরবর্তী নবীগণের প্রতি প্রেরণ করেছি। এবং আমি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁদের পুত্রগণ এবং ঈসা, আইয়ূব, ইউনুস, হারূন ও সোলাইমানের প্রতি প্রেরণ করেছি এবং আমি দাউদকে যাবুর দান করেছি।[২]

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾

–এবং ঐ রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি যাদের উল্লেখ আমি আপনার নিকট পূর্বে করেছি, এবং ঐ সব রাসূলকে যাদের উল্লেখ আপনার নিকট করিনি। আর আল্লাহ মূসার সাথে প্রকৃত অর্থে কথা বলেছেন।[৩]

[১]. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৭।
[২]. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:১৬৩।
[৩]. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:১৬৪।

رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

–রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী করে, যাতে রাসূলগণের পরে আল্লাহর নিকট মানুষের কোন অভিযোগের অবকাশ না থাকে এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[১]

لَّٰكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ ۖ أَنزَلَهُۥ بِعِلْمِهِۦ ۖ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿١٦٦﴾

–কিন্তু হে রাসূল! আল্লাহ সেটারই সাক্ষী যা তিনি আপনার প্রতি অবতারণ করেছেন। তিনি তা স্বীয় জ্ঞান থেকে অবতীর্ণ করেছেন এবং ফিরিশতারাও সাক্ষী রয়েছে এবং আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট।[২]

হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে এ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ওফাতের পর তিনি বললেন–

بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ! لَقَدْ بَلَغَ مِنْ فَضِيْلَتِكَ عِنْدَ اللهِ أَنْ بَعَثَكَ آخِرَ الْأَنْبِيَاءِ. وَذَكَرَكَ فِيْ أَوَّلِهِمْ.

–হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। আল্লাহ তা'আলা আপনার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের এভাবে প্রকাশ করেছেন যে তিনি আপনাকে সমস্ত আম্বিয়া কেরামের পরে প্রেরণ করেছেন, কিন্তু আলোচনা আগে করেছেন। কুরআন মাজীদের বর্ণিত আয়াত–

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَٰقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٧﴾

–হে রাসূল! স্মরণ করুন যখন আমি নবীগণের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছি এবং আপনার নিকট থেকে এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা, মরিয়ম পুত্র ঈসা থেকে। আর আমি তাদের থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি।[১]

[১]. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:১৬৫।
[২]. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:১৬৬।

بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ! لَقَدْ بَلَغَ مِنْ فَضِيْلَتِكَ عِنْدَهُ أَنَّ أَهْلَ النَّارِ يَوَدُّوْنَ أَنْ يَكُوْنُوْا أَطَاعُوْكَ بَيْنَ أَطْبَاقِهَا يُعَذَّبُوْنَ يَقُوْلُوْنَ: يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُوْلَا،

–হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। আপনার মর্যাদাকে আল্লাহ তা'আলা এভাবে প্রকাশিত করেছেন যে, জাহান্নামের মাঝে মানুষ আযাব ভোগ করতে থাকবে। কিন্তু ঐ অবস্থায় তারা আক্ষেপ করে বলতে থাকবে, আফসোস! যদি আমরা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতাম এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মান্য করতাম, তাহলে আমাদেরকে এরূপ কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হতোনা।

হযরত কাতাদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

كُنْتُ أَوَّلَ الْأَنْبِيَاءِ فِي الْخَلْقِ، وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ،

–আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) এর মধ্যে সর্বপ্রথম আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে সকলের পরে।[২] এখানে হযরত নূহ (আলাইহিস্ সালাম) এর আগে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লামা সমরকান্দি (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন– সমস্ত আম্বিয়া কেরামের প্রথমে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আলোচনা করা হয়েছে অধিকন্তু তিনি সকলের শেষ। এটাই তার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের উল্লেখযোগ্য প্রমাণ।

আর ঐ কথা আল্লাহ তা'আলা যখন সমস্ত আম্বিয়া কেরাম থেকে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন এই ঘটনা তখন সংঘটিত হয়েছে যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আলাইহিস্ সালাম) এর পৃষ্ঠদেশ থেকে সমস্ত আম্বিয়া কেরামকে পিপীলিকার ন্যায় বের করেছেন।

[১]. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৭।
[২]. ক) সুয়ূতী : দুররে মনসুর, ৮:১২৯।
খ) তাবারী : জামিউল বয়ান ফী তা'ভীলিল কুরআন, ২০:২১৩।

আল্লাহ তা'আলার বাণী–

تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۘ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ ۖ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَٰتٍ ۚ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَيَّدْنَٰهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ وَلَٰكِنِ ٱخْتَلَفُوا۟

–এঁরা রাসূল আমি তাঁদের মধ্যে এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠ করেছি। তাদের মধ্যে কারো সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবঙ কেউ এমনও আছেন, যাঁকে সবার উপর মর্যাদাসমূহে উন্নীত করেছেন। আর আমি মারিয়ম তনয় ঈসাকে নিদর্শনসমূহ প্রদান করেছি। এবং পবিত্র রূহ দ্বারা তাকে সাহায্য করেছি। এবং আল্লাহ ইচ্ছা করতে তাদের পরবর্তীগণ পরস্পর যুদ্ধ করতো না এরপর যে, তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এসেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়ে গেছে।[১]

وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের অভিমত হলো– কোনো নবীকে অপর নবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দানের মর্মার্থ হলো– আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন। কেননা তাঁকে আরব-অনারব সবার প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে। তাঁর জন্য গণিমতের মাল হালাল করা হয়েছে। তাঁর পবিত্র হাতে অসংখ্য মু'জিযা প্রকাশিত হয়েছে। আর যে নবীকে যে মর্যাদা ও ফযিলত দান করা হয়েছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে অবশ্যই সেই মর্যাদা ও ফযিলত দান করা হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদগণের অভিমত হলো যে, আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য আম্বিয়া কেরামকে পবিত্র কুরআন মাজীদে নাম ধরে সম্বোধন করেছেন। আর আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে নবুওয়াত ও রিসালাতের উপাধির সাথে সম্বোধন করেছেন। যথা– হে নবী, হে রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

[১]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:২৫৩।

আল্লামা সমরকান্দী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) হযরত কালবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِۦ لَإِبْرَٰهِيمَ ﴿٨٣﴾

–এবং নিশ্চয় ইবরাহীম তারই অনুগামী দলের অর্ন্তভুক্ত।[১]

উক্ত আয়াতের 'হি' সর্বনাম হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি প্রবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অনুগামী। তাঁর দীন ও সুন্নাতের অনুসারী ছিলেন।

প্রখ্যাত নাহুবিদ ফাররা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আরবী ব্যাকরণের সূত্রানুযায়ী আপন বলা জায়িয। হযরত মক্কী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও এ অভিমতের সর্মথক।

কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা হযরত নূহ (আলাইহিস্ সালাম) কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম হযরত নূহ (আলাইহিস্ সালাম) এর অনুগামী ছিলেন।

[১]. আল কুরআন : সূরা সাফ্ফাত, ৩৭:৮৩।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

فِيْ إِعْلَامِ اللهِ تَعَالَى خَلْقَهُ بِصَلَاتِهِ عَلَيْهِ وَوِلَايَتِهِ لَهُ وَرَفْعِهِ الْعَذَابَ بِسَبَبِهِ

হুযুর (ﷺ) এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ করা তাঁর প্রতি দুরূদ পাঠ করা, সাহায্য করা তাঁর উসিলায় আযাব দূর করা প্রসঙ্গে

আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ

–এবং আল্লাহর কাজ এ নয় যে, তাদেরকে শাস্তি দেবেন যতক্ষণ পর্যন্ত হে মাহবুব আপনি তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন।[১]

অর্থাৎ আপনি যতদিন মক্কার যমীনে অবস্থান করবেন, আপনার উপস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা মক্কাবাসীদের আযাবে পতিত করবেন না। পরে যখন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কা ত্যাগ করে মদিনাতে হিযরত করেন, কতিপয় মুসলমান মক্কাতে থেকে যায়। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে অবতীর্ণ করলেন–

وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

–এবং আল্লাহ তাদের শাস্তিদাতা নন যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ক্ষমা প্রার্থনারত থাকছে।[২]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا

–আর যদি তারা পৃথক হয়ে যেতো তাহলে অবশ্যই আমি শাস্তি দিতাম।[৩]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ

১. আল কুরআন : সূরা আনফাল, ৮:৩৩।
২. আল কুরআন : সূরা আনফাল, ৮:৩৩।
৩. আল কুরআন : সূরা ফাতাহ, ৪৮:২৫।

–এবং যদি এমন না হতো যে, কিছু সংখ্যক মুসলমান পুরুষ ও কিছু সংখ্যক মুসলমান নারী, যাদের সম্পর্কে তোমরা অবগত নও, তাদের তোমরা পদদলিত করবে, অতঃপর তোমাদেরকে তাদের দিক থেকে অজ্ঞাতসারে কোন অবাঞ্ছিত বিষয় স্পর্শ করবে, তবে আমি তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দিতাম, তাদের এ পরিত্রাণ এ জন্য যে, আল্লাহ আপন অনুগ্রহে প্রবিষ্ট করেন যাকে চান।[১]

অতঃপর যখন সব মুসলমান মক্কা থেকে হিযরত করে মদিনায় চলে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন–

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ

–এবং তাদের কী বা আছে যে, আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না?[২]

উক্ত আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আপনার উপস্থিতির কারণে আল্লাহ তা'আলা মক্কাবাসীদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। আপনার হিযরত করার পরও আপনার সাহাবীদের উপস্থিতির কারণে আযাব অবতীর্ণ হতে বারণ করা হয়েছে। যখন মক্কানগরীতে একজন মুসলমানও ছিলোনা, তখন আল্লাহ তা'আলা মক্কা নগরীর উপর মুসলমানদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেন। মুসলমানগণ কাফিরদের উপর বিজয়ের গৌরব অর্জন করে। তাদের তরবারী মীমাংসা করার দায়িত্ব প্রাপ্ত হলো। এই মুসলমানগণ যারা অল্প কিছু দিন পূর্বে এই মক্কাতে দুর্বল ও অসহায় ছিলো, আল্লাহ তা'আলা এখন তাঁদেরকে কাফিরদের আবাসভূমিও তাদের স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন।

হযরত আবু মূসা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ أَمَانَيْنِ لِأُمَّتِي ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ فَإِذَا مَضَيْتُ تَرَكْتُ فِيهِمُ الْاِسْتِغْفَارَ

–আল্লাহ তা'আলা আমার উপর আমার উম্মাতের জন্য দুটি আমানত অবতীর্ণ করেছেন। তন্মধ্যে এক হলো– এবং আল্লাহর শান এ নয় যে, তাদেরকে শাস্তি দেবেন যতক্ষণ পর্যন্ত হে মাহবুব আপনি তাদের মধ্যে

১. আল কুরআন : সূরা ফাতাহ, ৪৮:২৫।
২. আল কুরআন : সূরা আনফাল, ৮:৩৪।

উপস্থিত থাকবেন। আর দ্বিতীয় হলো—এবং আল্লাহ তাদেরকে শাস্তিদাতা নন যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ক্ষমা প্রার্থনারত থাকছে। সুতরাং যখন আমার ওফাত হবে, তখন আমি তোমাদের নিকট তাওবা ও ইসতিগফার রেখে যাবো।

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ﴿١٠٧﴾

—এবং আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য রহমত করেই প্রেরণ করেছি।[১]

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

أَنَا أَمَانٌ لِأَصْحَابِي.

—আমি আমার সাহাবীদের জন্য নিরাপত্তাস্বরূপ।[২]

কেউ কেউ বলেছেন, নিরাপত্তার অর্থ হলো বিদা'আতসমূহ থেকে নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন হওয়া।

কেউ কেউ বলেছেন, নিরাপত্তার অর্থ হলো- মতানৈক্য ও ফিতনা থেকে নিরাপদ হওয়া। অর্থাৎ যতক্ষণ আমি আমার সাহাবীদের মধ্যে উপস্থিত থাকবো ততদিন তাদের মধ্যে মতানৈক্য ও ফিতনা দেখা দেবেনা।

কেউ কেউ বলেছেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলেন সর্বাধিক নিরাপত্তাদানকারী ও আশ্রয়দানকারী। তিনি জীবিত আছেন। তাঁর ওফাতের পর তাঁর সুন্নাত যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন সেই নিরাপত্তা ও আশ্রয় অবশিষ্ট থাকবে। কিন্তু যখন সুন্নাত বিলুপ্ত হয়ে যাবে তখন বিপদ আপদ, ফিতনা ও বিপর্যয়ের অপেক্ষা করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ﴿٥٦﴾

[১]. আল কুরআন : সূরা আম্বিয়া, ২১:১০৭।
[২]. ক) তাবরানী : মু'জামুল আওসাত, বাবুল মীম মিন ইসমিহী মুহাম্মদ, ১৪:৪৫৪।
খ) হাকেম : আল মুস্তাদরাক আলাস্ সহীহাইন, বাবু তাফসীরে যুখরুফ, ৮:৩৪৭।

—নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতাগণ দুরূদ প্রেরণ করেন মহান নবীর প্রতি। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও যথাযোগ্য মর্যাদায় তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম পেশ করো।[১]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মর্যাদাকে এভাবে প্রকাশ করেছেন যে, তিনি তাঁর প্রিয় হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর দুরূদ প্রেরণ করেন এবং তাঁর ফিরিশতাগণও তাঁর প্রতি দুরূদ প্রেরণ করেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর দুরূদ প্রেরণ করার আদেশ দান করেছেন। হযরত আবু বকর বিন ফাউরাক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কোনো কোনো ওলামায়ে কেরাম থেকে বর্ণনা করে বলেন- হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণী—

جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ.

—সালাতকে আমার চোখের শীতলতাস্বরূপ করা হয়েছে।[২]

এই হাদীসের মর্মার্থ হলো হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর দুরূদ পাঠ করা। আর আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর ফিরিশতারা দুরূদ পাঠ করেন। তাঁর উম্মাতদের কিয়ামত পর্যন্ত দুরূদ পাঠ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। ফিরিশতাদের দুরূদের মর্মার্থ হলো ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা। আমাদের দুরূদ পাঠের করার মর্মার্থ হলো হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করা। আল্লাহ তা'আলার দুরূদ পাঠের করার মর্মার্থ হলো হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি রহমত নাযিল করা।

কেউ কেউ বলেছেন- 'ইউসাল্লুনা' (يُصَلُّونَ) এর মর্মার্থ হলো বরকত প্রদান করা।

কিন্তু হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'সালাত' শব্দের ব্যাখ্যা করে দুরূদ ও বরকতের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে দেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহর ইচ্ছায় সালাত বিষয়ক অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

মুতাকাল্লিমীন ওলামাদের মতে- 'ক্বাফ, হা, ইয়া, আইন, সোয়াদ' (كهيعص) এ বাক্যসমূহের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে- "ক্বাফ" এর মর্মার্থ হলো আল্লাহ তা'আলাই

[১]. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৫৬।
[২]. তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ১৫:৩৫৪;

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী–

أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ

–আল্লাহ কী আপন বান্দাদের জন্য যথেষ্ট নন?[১]

আর 'হা' এর মর্মার্থ হলো হিদায়াত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَيَهْدِيَكَ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا

–আর আপনাকে সোজা পথ দেখিয়ে দেন।[২]

আর 'ইয়া' এর মর্মার্থ হলো সাহায্য। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী–

أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِۦ

–আপনাকে শক্তি প্রদান করেছেন স্বীয় সাহায্যে।[৩]

আর 'আইন' এর মর্মার্থ হলো, নিরাপত্তা দান। এ প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে–

وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ

–আর আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করবেন মানুষের অনিষ্ট থেকে।[৪]

আর 'সাদ' এর মর্মার্থ হলো হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি দুরূদ প্রেরণ করা। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী–

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ

–নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতাগণ দুরূদ প্রেরণ করেন ঐ নবীর প্রতি।[৫]

[১]. আল কুরআন : সূরা যুমার, ৩৯:৩৬।
[২]. আল কুরআন : সূরা ফাতাহ, ৪৮:২।
[৩]. আল কুরআন : সূরা আনফাল, ৮:৬২।
[৪]. আল কুরআন : সূরা মায়িদা, ৫:৬৭।
[৫]. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৫৬।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন–

إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۖ وَإِن تَظَٰهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَىٰهُ وَجِبْرِيلُ وَصَٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ﴿٤﴾

–এবং যদি তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে জোট বাঁধো (পরস্পর সাহায্য করো)। তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাহায্যকারী এবং জিব্রাঈল ও সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনগণ এবং এরপর ফিরিশতাগণ সাহায্যকারী রয়েছেন।[১]

উক্ত আয়াতে বর্ণিত "মাওলার" মর্মার্থ হলো অলি ও বন্ধু। আর সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনের মর্মার্থ হলো কারও মতে আম্বিয়া (আলাইহিস্ সালাম)। আর কারও মতে ফিরিশতাগণ। আর কারো কারো মতে হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা)। কারো মতে হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। আর কারো মতে সাধারণ মুসলমানগণ।

[১]. আল কুরআন : সূরা তাহরীম, ৬৬:৪।

নবম পরিচ্ছেদ

فِيمَا تَضَمَّنَتْهُ سُورَةُ الْفَتْحِ مِنْ كَرَامَاتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সূরা ফাতহ এ বর্ণিত হুযুর (ﷺ) এর প্রতি পরিপূর্ণ নিয়ামতরাজীর বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿١﴾ لِّيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٢﴾ وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿٣﴾ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا۟ إِيمَٰنًا مَّعَ إِيمَٰنِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾ لِّيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٥﴾ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَٰتِ ٱلظَّآنِّينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ ۚ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ ٱلسَّوْءِ ۖ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿٦﴾ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٧﴾ إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لِّتُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ

১। নিশ্চয় আমি আপনার জন্য সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।

২। যাতে আল্লাহ আপনার কারণে পাপ ক্ষমা করে দেন আপনার পূর্ববর্তীদের ও আপনার পরবর্তীদের এবং আপন নিয়ামতসমূহ আপনার উপর পরিপূর্ণ করে দেন। আর আপনাকে সোজা পথ দেখিয়ে দেন;

৩। এবং আল্লাহ আপনাকে বড় ধরণের সাহায্য করেন।

৪। তিনিই হন, যিনি ঈমানদারদের অন্তরসমূহে প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন, যাতে তাদের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাসের উপর দৃঢ় বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়; এবং আল্লাহরই মালিকানাধীন সমস্ত বাহিনী আসমানসমূহ ও যমীনের; এবং আল্লাহ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়।

৫। যাতে ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে বাগানসমূহে নিয়ে যান, যেগুলোর নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান, তারা সেগুলোর মধ্যে স্থায়ীভাবে থাকবে; এবং তাদের পাপরাশি তাদের থেকে মোচন করে দেন। আর এটা আল্লাহর নিকট মহা সাফল্য।

৬। এবং শাস্তি দেন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদেরকে এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদেরকে, যারা আল্লাহ সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করে মন্দ ধারণা। তাদের উপর রয়েছে মহাবিপদ এবং আল্লাহ তাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং তাদের উপর অভিসম্পাত করেছেন। আর তাদের জন্য জাহান্নাম তৈরী করেছেন আর তা কতই মন্দ পরিনাম।

৭। এবং আল্লাহরই মালিকানাধীন আসমানসমূহ ও যমীনের সমস্ত বাহিনী এবং আল্লাহ সম্মান ও প্রজ্ঞাময়।

৮। নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি উপস্থিত-প্রত্যক্ষকারী করে এবং সুসংবাদদাতা ও সর্তককারী করে;

৯। যাতে হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনো এবং রাসূলের মহত্ব বর্ণনা ও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো এবং সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করো।

১০। নিশ্চয় ঐ সকল লোক যারা আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছে তারা তো আল্লাহরই নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছে। তাদের হাতগুলোর উপর আল্লাহর হাত রয়েছে।[১]

---

১. আল কুরআন : সূরা ফাতাহ, ৪৮:১-১০।

উক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সমুন্নত মর্যাদা, প্রশংসনীয় গুণাবলী, পরিপূর্ণ নিয়ামতরাজির কথা উল্লেখ করেছেন, যা অগণিত অসংখ্য। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা উক্ত সূরা-র শুরুতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন। আপনি আপনার দুশমনদের উপর বিজয় লাভ করবেন। আপনার দীন ও শরীয়াতের মর্যাদা সমুন্নত হবে। আল্লাহ তা'আলা আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ ক্ষমা করে দেন। সুতরাং ঐ ভুলত্রুটিসমূহ যা তাঁর দ্বারা সংঘটিত হয়েছে সেগুলোর সম্পর্কে না প্রশ্ন করা হবে আর না তাঁর দ্বারা ভুলত্রুটি সংঘটিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ওলামায়ে কেরামের একদলের অভিমত হলো, এখানে মাগফিরাত ও ক্ষমা করার কথা বুঝানো হয়েছে। চাই তাঁর দ্বারা ভুলত্রুটি সংঘটিত হোক বা না হোক। সর্বাবস্থায় তাঁকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইহসানকে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মাগফিরাতের কারণ নির্ধারিণ করেছেন। মূলতঃ কথা হলো যা হবার তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হবে। তিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি আল্লাহর তা'আলার পক্ষ থেকে বিরামহীনভাবে একের পর এক নিয়ামত ও কল্যাণ নাযিল হয়ে চলছে। যার কোনো প্রকার বিরতি নেই।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكَ

–এবং আপন নিয়ামতসমূহ আপনার উপর পরিপূর্ণ করে দেন।[1]

এর মর্মার্থ পৃথিবীর সমস্ত দাম্ভিক অহংকারীদের মস্তক আপনার সামনে অবনত করে দেবো।

কেউ কেউ বলেছেন এর মর্মার্থ হচ্ছে মক্কা ও তায়েফ বিজয়।

কেউ কেউ বলেছেন এর মর্মার্থ হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আলোচনাকে পৃথিবীব্যাপী সমুন্নত করে দেন। তাঁকে সাহায্য ও তাঁকে ক্ষমা করবেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাঁর উপর পরিপূর্ণ নিয়ামতরাজি দান করেছেন। কেননা সমস্ত দাম্ভিক ও অহংকারীদের মস্তক

---

[1]. আল কুরআন : সূরা ফাতাহ, ৪৮:২।

তাঁর সামনে অবনত করে দেন। আরবের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ শহর তাঁর করতলগত করে দেন এবং সেই শহরে তাঁর একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে দেন। যা তাঁর নিকট অতি প্রিয় শহর ছিলো। তাঁর আলোচনাকে সমুন্নত করে দেন। সোজা সরল পথের সন্ধান দেন যার মাধ্যমে তিনি জান্নাতের অশেষ কল্যাণ লাভ করতে পারেন।

তাঁকে পরিপূর্ণভাবে সাহায্য করা হয়েছে। উক্ত সূরার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি আরও অনুগ্রহ করার কথা বলছেন যে, আমি আপনার মুমিন-উম্মাতদের অন্তরসমূহকে প্রশান্ত ও প্রফুল্ল করে দিয়েছি। আর ঐ সমস্ত নিয়ামতের সুসংবাদ দিয়েছি যা আপনার জন্য বিশেষভাবে নির্ধারণ করে রেখেছি। তা হলো চূড়ান্ত বিজয়। মাগফিরাত, রহমত ও ভুলত্রুটিসমূহ গোপন করার খবর। আরো জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আপনার শত্রুরা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত এবং ধ্বংস হবে। তাদের প্রতি সবর্দা অভিশাপ বর্ষিত হতে থাকবে এবং তারা রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। মোটকথা হলো উম্মাতে মুহাম্মদির দুশমনদের শেষ পরিণতি সর্বদা শোচনীয় হবে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِۦ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿٤٦﴾

–নিশ্চয়ই আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি 'উপস্থিত' (হাযির-নাযির) পর্যবেক্ষণকারী করে সুসংবাদদাতা এবং সর্তককারীরূপে। এবং আল্লাহর প্রতি তাঁর নির্দেশে আহবানকারী আর আলোকজ্জ্বলকারী সূর্যরূপে।[1]

لِّتُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾

–হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনো এবং রাসূলকে শক্তি যোগাও ও তাঁকে সম্মান করো; সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।[2]

---

[1]. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৪৫।
[2]. আল কুরআন : সূরা ফাতাহ, ৪৮:৯।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রশংসনীয় তাঁর বৈশিষ্ট্য রিসালাতের দায়িত্ব পালনার্থে আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলী উম্মাতদের কাছে পৌছানোর কাজে তাঁর পর্যবেক্ষণকারী বলে ঘোষণা করেছেন।

অপর একদল আলেম বলেন, এর মর্মার্থ হলো হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আল্লাহ তা'আলার একত্বের সাক্ষ্য উম্মাতের সামনে পেশ করা ও তাদেরকে অশেষ সাফল্য ও সাওয়াবের সুসংবাদ জানিয়ে দেয়া এবং তাঁর শত্রুদেরকে আল্লাহ তা'আলার আযাব সম্পর্কে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা।

কেউ কেউ বলেন, তিনি তাদেরকে পথভ্রষ্টতা থেকে উদ্ধার করেছেন। যাতে লোকেরা তাঁর প্রতি ঈমান আনতে সক্ষম হয়। কেননা যারা তাঁর উপর ঈমান আনবে তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অশেষ কল্যাণ বর্ষিত হবে।

আর এক আয়াতে বর্ণিত 'ইউয়াজ্জিরুহু' (يُعَزِّرُوْهُ) এর অর্থ হচ্ছে সম্মান প্রদর্শন করা। কেউ কেউ বলেছেন এর অর্থ হলো– সাহায্য করা।

কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হলো তাঁর সম্মানে অতিশয়োক্তি করা। আর 'ইয়ুআক্কিরুহু' (يُوَقِّرُوْهُ) এর মর্মার্থ হলো– তাঁর তাযীম, তাওকীর ও সম্মান প্রদর্শন করা। কেউ কেউ 'ইউয়াজ্জিরুহু' (يُعَزِّرُوْهُ) কে 'ইয়ুআয্‌যিযুহু' (يُعَزِّزُوْهُ) পাঠ করেন। প্রকাশ থাকে যে, এ শব্দটি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শানে অবতীর্ণ হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন 'ওয়াসাব্বিহু' (وَسَبِّحُوْا) অর্থ– তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো।[১] এ শব্দ আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট।

হযরত ইবনে আতা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, উক্ত সূরায় আল্লাহ তা'আলা সমস্ত নিয়ামতের কথা একত্রে সমবেত করেছেন, যা তিনি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে "ফাতহে মুবিন" বা প্রকাশ্য বিজয় নাম প্রদান করেছেন। আর এটা হচ্ছে তাঁর দোয়াসমূহ কবুল হওয়া, ক্ষমা ঘোষণার আলামত মুহব্বতের বহিঃপ্রকাশ ও নিয়ামতের চুড়ান্ত নিদর্শন। উক্ত আয়াতসমূহের দ্বারা একথা প্রকাশিত হয়েছে যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার দরবারে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। তিনি হিদায়াত প্রাপ্ত হয়েছেন এবং

১. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৪২।

বিশ্ববাসীর হাদী বা পথপ্রদর্শক ছিলেন। এগুলো হলো তাঁর বন্ধুত্ব ও ক্ষমা প্রাপ্তির নিদর্শন। আর মাগফিরাত লাভের অর্থ তো হলো সকল প্রকার ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে পূত-পবিত্র হওয়া এবং তাঁর প্রতি আল্লাহ তা'আলার চূড়ান্ত পর্যায়ের নিয়ামত অবতীর্ণ হওয়া। এই অর্থের দিক থেকে তাঁকে পূর্ণতাময় বুযুর্গী ও হিদায়াতের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত করা হয়েছে। আর তাঁকে আল্লাহ তা'আলার কুদরতের নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করার জন্য আহবান করা হয়েছে।

হযরত জাফর বিন মুহাম্মদ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন– হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি পরিপূর্ণ নিয়ামতরাজি অবতীর্ণ করার অর্থ হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলার তাঁকে মাহবুব মনোনীত করা,তাঁর মুবারক জীবনের শপথ করা। তাঁর দ্বারা পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহের বিলুপ্তি ঘোষণা করা। তাঁকে মি'রাজ রজনীতে উর্ধ্বলোকে পরিভ্রমণ করানো। আর মি'রাজ ভ্রমণে তাঁকে সকল প্রকার ক্ষতি থেকে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে, ফলে আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করার সময়ও আল্লাহ তা'আলার তাজাল্লী প্রত্যক্ষ করার সময় তাঁর চক্ষু না কোন দিকে ফিরেছে না সীমাতিক্রম করেছে।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আরব-অনারব সবার প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে। তাঁর নিজের জন্য ও তাঁর উম্মাতের জন্য গণিমাতের মাল হালাল করে দেয়া হয়েছে। তাঁকে শাফায়াতের অধিকারী করা হয়েছে এবং তাঁর শাফায়াত কবুল হওয়ার মর্যাদা লাভে ধন্য করা হয়েছে। তাঁকে সকল আদম সন্তানের সর্দার মনোনীত করা হয়েছে। তাঁর আলোচনাকে আল্লাহর আলোচনার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। তাঁর সন্তুষ্টিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে একত্রিত করে নিয়েছি। আর তাঁর নামকে আল্লাহর একত্ববাদের রুকন হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী–

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ

–নিশ্চয় ঐসব লোক যারা আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করছে তারা তো আল্লাহরই নিকট বায়আত গ্রহণ করছে।[১]

উক্ত আয়াত বায়'আতে রিদওয়ানের সময় অবতীর্ণ হয়েছে। এর মর্মার্থ হলো যে আপনার পবিত্র হাতে বায়'আত করা মূলতঃ আল্লাহ তা'আলার হাতেই বায়আত করা। আর يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ অর্থ– আল্লাহ তা'আলার হাত তাদের হাতের

১. আল কুরআন : সূরা ফাতাহ, ৪৮:১০।

উপর।[১] অর্থাৎ– বায়আত গ্রহণের সময় তাদের হাতের উপর আল্লাহ তা'আলার হাত ছিলো।

কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার হাতের মর্মার্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও ক্ষমতা।

কেউ কেউ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলার প্রতিদান।

কেউ কেউ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ।

কেউ কেউ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি। এই সবকিছুই রূপক ও সাদৃশ্যপূর্ণ কথা। মূলতঃ এই সমস্ত কথার দ্বারা বায়'আত গ্রহণের গুরুত্বকে প্রকাশ করে সুদৃঢ় করে দেয়া এবং এর সাথে সাথে বায়'আতগ্রহণকারীদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বকে প্রকাশ করা উদ্দেশ্য।

অনুরূপভাবে অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ

–অতঃপর তোমরা তাদেরকে হত্যা করোনি। বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। এবং হে মাহবুব! সেই মাটি, যা আপনি নিক্ষেপ করেছিলেন, আপনি নিক্ষেপ করেননি বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন।[২]

সুতরাং প্রথম আয়াত (আল্লাহর হাত) রূপক অর্থে বলা হয়েছে। আর এই আয়াতে বলা হয়েছে– মূলতঃ হত্যাকারী হলেন আল্লাহ তা'আলা এবং মাটি নিক্ষেপকারীও হলেন আল্লাহ তা'আলা। ঐ সমস্ত কর্মের স্রষ্টা হলেন আল্লাহ তা'আলা। তিনিই হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দ্বারা মাটি নিক্ষেপ করিয়েছেন এবং মাটি নিক্ষেপ করার শক্তি দান করেছেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতিটি কাজে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও প্রত্যয় সম্পৃক্ত ছিলো। নচেৎ কোনো মানুষের এরূপ শক্তি নেই যে, সে একমুঠো মাটি নিক্ষেপ করবে আর তার নিক্ষিপ্ত সেই মাটি সমস্ত কাফিরদের চোখে পতিত হবে।[৩]

---

[১]. আল কুরআন : সূরা ফাতাহ, ৪৮:১০।

[২]. আল কুরআন : সূরা আনফাল, ৮:১৭।

(৩) হুনায়েনের যুদ্ধের প্রাক্কালে কাফিররা প্রথমে মুসলমানদের উপর হামলা করে। মুসলমানগণ যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করতে শুরু করে। কাফিররা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে একাকী পেয়ে চতুর্দিক থেকে একযোগে আক্রমণ করে। তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক মুষ্ঠি মাটি হাতে নিয়ে

অনুরূপভাবে ফিরিশতা কর্তৃক কাফিরদের হত্যা করাও এভাবে হয়েছে।[১]

কোনো কোনো তাফসীরবিদগণ শেষ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন যে, রূপক অর্থে এরূপ বলা হয়েছে। অর্থাৎ না তোমরা তাদেরকে হত্যা করেছো আর মূলতঃ তোমরা তাদের প্রতি মাটি নিক্ষেপ করেছো। যার কারণে তাদের মুখমণ্ডল ধূলিকণায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। বরং তোমাদের মাটি নিক্ষেপ করার পর আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দেন। আর মাটি নিক্ষেপের উপকারিতা তোমরা এভাবে লাভ করার কারণে তারা ভীত হয়ে পড়ে। এটা তো মূলতঃ আল্লাহ তা'আলারই কাজ। এ কারণে প্রকৃত হত্যাকারীতো আল্লাহ তা'আলাই। প্রকৃত অর্থে তিনিই মাটি নিক্ষেপ করেছেন, তোমরা নামসর্বস্ব ছিলে মাত্র।

شَاهَتِ الْوُجُوْهُ বলে কাফিরদের প্রতি নিক্ষেপ করে। ঐ এক মুষ্ঠি মাটি প্রায় ছয় হাজার কাফিরের চোখে পড়ে। ফলে তারা আর কিছুই দেখতে পাইনি এবং সামনেও অগ্রসর হতে পারেনি। এ অবস্থা দেখে পলায়নরত মুসলমানগণ যুদ্ধের মাঠে ফিরে আসে এবং কাফিরদের প্রতি পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে বিজয় লাভ করে।

(১) বদরের যুদ্ধে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। মুসলমানদের সাহায্যে আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদের পাঠিয়েছেন। তাঁরা কাফিরদের হত্যা করে।

দশম পরিচ্ছেদ

فِيمَا أَظْهَرَهُ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ مِنْ كَرَامَتِهِ عَلَيْهِ وَمَكَانَتِهِ عِنْدَهُ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক হুযুর (ﷺ)'র সম্মান ও নৈকট্যের বহিঃপ্রকাশ প্রসঙ্গে

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি যতো প্রকারের ফযিলত ও কারামতের কথা কুরআন মাজীদের একাধিক স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য কারামত হলো মি'রাজ সফরের কারামত। এ কারামতের বিবরণ আল্লাহ তা'আলা সূরা ইসরা ও সূরা আন-নজমে উল্লেখ করেছেন। ঐ সফরে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মর্যাদাপূর্ণ ফযিলত আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভে ধন্য হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আহবান করে তাঁর কুদরতের অতি আশ্চর্য নিদশর্নাবলী দেখিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ

–আর আল্লাহ তা'আলা আপনাকে রক্ষা করবেন মানুষের ক্ষতি থেকে।[১]

অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে–

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَـٰكِرِينَ ﴿٣٠﴾

হে মাহবুব স্মরণ করুন! যখন কাফিররা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলো যে, আপনাকে বন্দী করে রাখবে কিংবা শহীদ করবে অথবা নির্বাসিত করবে এবং তারা নিজেদের মতো ষড়যন্ত্র করছে, আর আল্লাহ নিজের গোপন কৌশল করছিলেন, এবং আল্লাহর গোপন কৌশল সর্বাপেক্ষা উত্তম।[২]

[১]. আল কুরআন : সূরা মায়েদা, ৫:৬৭।
[২]. আল কুরআন : সূরা আনফাল, ৮:৩০।

আল্লাহ তা'আলার বাণী–

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ثَانِىَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَـٰحِبِهِۦ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُۥ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلسُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِىَ ٱلْعُلْيَا ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾

–যদি তোমরা 'মাহবূব'কে সাহায্য না করো, তবে নিশ্চয় আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেছেন যখন কাফিরদের কারণে তাঁকে বাইরে তাশরীফ নিয়ে যেতে হয়েছে- শুধু দু'জন থেকে (একজন হলেন তিনি) যখন তাঁরা উভয়ই গুহার মধ্যে ছিলেন, যখন অ.পন সঙ্গীকে ফরমাচ্ছিলেন, 'দুঃখিত হয়োনা, নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর উপর আপন প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন এবং তাঁকে এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা সাহায্য করেছেন, যা তোমরা দেখো নি এবং তিনি কাফিরদের কথা নিচে নিক্ষেপ করেছেন; আল্লাহর কথাই সর্বোপরি; এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[১]

উক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা ঐ সমস্ত ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যখন কাফিররা আপনার উপর অত্যাচার নির্যাতন করতো এবং আপনাকে হত্যা করার সংকল্প করে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তাদের সেই সকল দুঃখ-কষ্ট ও ঘৃণ্য ইচ্ছা থেকে রক্ষা করেছেন। তারা যখন আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো, তখন আমি আল্লাহ তাদের চোখের সামনে আড়াল আচ্ছাদিত করে দিই। হিজরতের সময় আপনি যখন সাওর পর্বতের গুহায় আত্মগোপন করেন, কিন্তু তারা যখন পর্বতের নিকটে পৌছে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের আকলের উপর পর্দা ঢেলে দেন। ফলে তখন তারা আপনাকে খুঁজে পায়নি। ঐ সময় আল্লাহ তা'আলার কুদরতের অসংখ্য নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। ঐ ধরণের বিপদসংকুল

[১]. আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:৪০।

অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা আপনার মুবারক ক্বালবে প্রশান্তি ও প্রফুল্লতা দান করেন।

অনুরূপভাবে হিজরতের সময় সূরাকা বিন মালেকের সাথে সংঘটিত ঘটনা ও অন্যান্য ঘটনা যা হাদিসবেত্তা ও জীবনীকারীগণ বর্ণনা করেছেন, তা আপনার ফযিলত ও মর্যাদা প্রকাশের জন্য যথেষ্ট।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদাকে প্রমাণ করার আয়াতসমূহের মধ্যে এটাও এক উল্লেখযোগ্য আয়াত। যথা–

إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ ۝١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ۝٢ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ۝٣

–হে মাহবুব! নিশ্চয় আমি আপনাকে অসংখ্য গুণাবলী দান করেছি। সুতরাং আপনি আপনার রবের জন্য নামায পড়ুন এবং কুরবানী করুন। নিশ্চয় যে আপনার দুশমন সেই সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।[১]

তাকে যা যা প্রদান করা হয়েছে সে ব্যাপারে আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

"কাউসার" অর্থ হলো হাওযে কাউসার।

কেউ কেউ বলেন, এটা হলো বেহেশতের নহরসমূহের মধ্যে একটি নহর।

কেউ কেউ বলেন, "কাওসার" হলো অধিক কল্যাণ। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে "শাফায়াত"।

কেউ কেউ বলেছেন– মু'জিযাসমূহ। কেউ কেউ বলেছেন- নবুওয়াত।

কেউ কেউ বলেছেন– এর অর্থ হলো মা'রিফাত তথা আল্লাহ তা'আলার পরিচিতিমূলক জ্ঞান। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পক্ষ থেকে তাঁর শত্রুদেরকে নিম্নোক্ত ভাষায় জবাব দিয়েছেন–

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ۝٣

–নিশ্চয় যে আপনার দুশমন সেই সকল প্রকার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।[২]

---

[১]. আল কুরআন : সূরা কাওসার, ১০৮:১-৩।
[২]. আল কুরআন : সূরা কাউসার, ১০৮:৩।

অর্থাৎ আপনার শত্রু আপনার প্রতি ঘৃণা পোষণকারী আবতার, নির্বংশ, বরকতহীন।[১]

"আবতার" অর্থ লাঞ্ছিত ও অসম্মানিত হওয়া।

অথবা এমন লোক যে, একাকী ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় থেকে যায়। অথবা যে নির্বংশ হয়ে যায়।

অথবা এরূপ ব্যক্তিকে বলা হয় যার মধ্যে কল্যাণের বিন্দুমাত্র নিদর্শন বিদ্যমান পাওয়া না যায়। আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَٰكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِى وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ۝٨٧

–নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সপ্ত আয়াত প্রদান করেছি যেগুলো পুনঃ পুনঃ আবৃত হয় এবং শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন কুরআন।[২]

কোনো কোনো ওলামায়ে কেরাম বলেন, "সাবয়ি মাসানী" অর্থ হলো ঐ সাতটি দীর্ঘ সূরা- যা কুরআনের প্রথমে সাজানো হয়েছে।

আর কেউ কেউ বললেন, "সাবয়ি মাসানী" অর্থ হলো সূরা ফাতিহা। আর কুরআনে আযীম হলো সমস্ত কুরআন।

আহকাম যথা আদেশ, নিষেধ, সুসংবাদ, আল্লাহর আযাব সম্পর্কে ভয়-ভীতি দেখানো, উদাহরণ-উপমাসমূহ আর কুরআন মাজীদে বর্ণিত নিয়ামতসমূহ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– আমি আপনাকে কুরআনে আযীমের খবর দিয়েছি।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, সূরা ফাতিহাকে "সাবায়ি মাসানী" বলার কারণ হলো এই সূরা নামাযের প্রত্যেক রাকাতে পাঠ করা হয়।

কেউ কেউ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা এ সূরাকে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্য বিশেষিত করেছেন। তাঁকে ছাড়া অন্য কোনো নবীকে এরূপ উচ্চমানের প্রশংসা বাণী দান করেননি।

---

[১]. হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রাণপ্রিয় পুত্র হযরত ইবরাহীম (রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু) এর ওফাতের পর আবু জাহেল ও অন্যান্য কাফিররা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে "আবতার"– নির্বংশ বলে কটূক্তি করতে শুরু করে। তখন আল্লাহ তা'আলা নিজেই হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পক্ষ থেকে জবাব দিয়ে বললেন, আপনার বংশধারা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। কিন্তু দুশমনদের কোনো নাম নিশানা ও নাম উচ্চারণের কেউ অবশিষ্ট থাকবেনা। তাদের বংশধারা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বাস্তবে হয়েছেও তাই। (নাসীমুর রিয়াজ)
[২]. আল কুরআন : সূরা আল-হিজর, ১৫:৮৭।

আর কুরআন মাজীদকে "সাবায়ি মাসানী" বলার কারণ হলো এই যে, কুরআন মাজীদে বর্ণিত ঘটনাসমূহকে একাধিকবার বর্ণনা করা হয়েছে।

কোনো কোনো ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো– "আমি আপনাকে সাবয়ি মাসানী দান করেছি"। এর মর্মার্থ হলো ঐ সাত প্রকারের কারামত মর্যাদা- যথা হিদায়াত, নবুওয়াত, রহমত, শাফায়াত, বিলায়াত, আযমত, প্রশান্তি বা আত্মিক প্রফুল্লতা।

আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

–এবং হে মাহবুব! আপনার প্রতি এ স্মৃতি অবতীর্ণ করেছি যেন আপনি লোকদের নিকট বর্ণনা করেন, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যাতে তারা তাতে চিন্তাভাবনা করে।[১]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

–এবং হে মাহবুব! আমি আপনাকে এমন রিসালাত সহকারে প্রেরণ করেছি যা সমস্ত মানবজাতিকে পরিব্যাপ্ত করে নেয় সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে।[২]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

–হে মাহবুব! আপনি বলুন, হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সবার প্রতি প্রেরিত আল্লাহরই রাসূল হই।[৩]

কাজী আয়ায (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন– এটাও হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এক বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ সমস্ত আম্বিয়া (আলাইহিস্ সালাম) কে কোনো না কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য নবী করে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু হুযুর

---

১. আল কুরআন : সূরা নাহল, ১৬:৪৪।
২. আল কুরআন : সূরা সাবা, ৩৪:২৮।
৩. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭:১৫৮।

(সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সমস্ত বিশ্ব মানবতার জন্য নবী বানিয়ে পাঠানো হয়েছে।

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

–এবং আমি প্রত্যেক রাসূলকে তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে প্রেরণ করেছি যেন তিনি তাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দেন।[১]

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সমস্ত জীবের প্রতি নবী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। যথা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ،

–আমি রক্তিমবর্ণ ও কৃষ্ণাঙ্গ (আরব-অনারব) সকলের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।[২]

আল্লাহ তা'আলার বাণী–

ٱلنَّبِىُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمْ ۗ

–এ নবী, মুসলমানদের তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক মালিক এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা।[৩]

মুফাসসিরীন ওলামায়ে কেরাম বলেন– النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (-নবী মু'মিনদের জন্য তাদের জীবনের চেয়েও অধিক প্রিয়।[৪]) মর্মার্থ হলো হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতিটি আদেশ প্রত্যেক মু'মিনের জন্য এভাবে কার্যকরী হবে যেভাবে মনিবের আদেশ গোলামের উপর কার্যকরী হয়।

---

১. আল কুরআন : সূরা ইবরাহীম, ১৪:৪।
২. ক) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ..., ২৮:২১৪।
খ) ইবনে আবী শায়বা : আল মুসান্নাফ, ৭:৪১০।
গ) তাবরানী : মু'জামুল আওসাত, বাবুল মীম মিন ইসমিহি মুহাম্মদ, ১৬:২২৮।
৩. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৬।
৪. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবুস্ সালাতু আলা মান তারাকা দ্বীনা, ৮:২৩৬।
খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, মুসনাদে আবী হুরাইরা, ১৭:১০৮।
গ) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ৯:১২১।
ঘ) বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, বাবুল হামদি লিল্লাহি লাযী হাদানী..., ৪:৩৩।
ঙ) তাহাবী : মুশকিলুল আসার, ২:২০।

কেউ কেউ বলেছেন– এর মর্মার্থ হলো হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতিটি আদেশ পালন করা মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব। আর وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ এর মর্মার্থ হলো– নিজ গর্ভধারিণী মাকে বিবাহ করা যেমন হারাম, অনুরূপভাবে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পূত-পবিত্রা স্ত্রীগণকে বিবাহ করা মুসলমানদের জন্য হারাম। এটাও হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ইজ্জত ও শ্রেষ্ঠত্বের বৈশিষ্ট্য। আর তাঁদের বিবাহ করা হারাম হবার আরও এক কারণ হলো- তাঁরা বেহেশতেও হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর স্ত্রীরূপে তাঁর সাথে অবস্থান করবেন।

এক বর্ণনায় এসেছে– هُوَ أَبٌ لَهُمْ অর্থাৎ– হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদের পিতৃতুল্য। এ বাক্য যেহেতু কুরআন মাজীদে নেই, তাই এরূপ ধারণা করা অবৈধ। আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

–আর আল্লাহ আপনার উপর কিতাব ও হিকমত অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা কিছু আপনি জানতেন না। আর আপনার উপর আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রয়েছে।[১]

কেউ কেউ বলেছেন– এর মর্মার্থ হলো, ঐ মর্যাদা ও ফযীলত যা নবুওয়াত দান করার মাধ্যমে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে প্রদান করা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা ঐ মর্যাদার প্রতি ইশারা করা হয়েছে যা রোজে আযলে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে প্রদান করা হয়েছে।

আল্লামা ওয়াসেতী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন– ঐ মর্যাদার প্রতি ইশারা করা হয়েছে যা আল্লাহ তা'আলার তাজাল্লী দর্শন করার মাধ্যমে লাভ করেছেন। অধিকন্তু হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) আল্লাহ তা'আলার সম্মানিত নবী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার তাজাল্লীর ঝলক সহ্য করতে না পেরে চেতনাহীন হয়ে যমীনে পতিত হন। কিন্তু হুযুর (সঃ) তাজাল্লীর ঝলক সহ্য করতে সক্ষম হন।

---

[১]. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:১১৩।

اَلْبَابُ الثَّانِي

দ্বিতীয় অধ্যায়

فِي تَكْمِيلِ اللهِ تَعَالَى لَهُ الْمَحَاسِنَ خَلْقًا وَخُلُقًا وَقِرَانِهِ جَمِيعَ الْفَضَائِلِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ فِيهِ نَسَقًا

হুযুর (ﷺ) এর প্রশংসনীয় আখলাক ও আঙ্গিক গঠনগত সৌন্দর্যের দিক থেকে ইহকালীন ও পারলৌকিক সর্বাধিক পূর্ণ কামালাতের আধার

দ্বিতীয় অধ্যায়

فِي تَكْمِيلِهِ تَعَالَى لَهُ الْمَحَاسِنَ خَلْقًا وَخُلُقًا وَقِرَانِهِ جَمِيعَ الْفَضَائِلِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ فِيهِ نَسَقًا

হুযুর (ﷺ) এর প্রশংসনীয় আখলাক ও আঙ্গিক গঠনগত সৌন্দর্যের দিক থেকে ইহকালীন ও পরলৌকিক সর্বাধিক পূর্ণ কামালাতের আধার

যে ব্যক্তি ঐ মহান সত্তা ও মনোনীত নবী হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে মুহাব্বত করবে এবং তাঁর মানসম্মান ও মর্যাদা সঠিকভাবে অনুধাবন করবে তাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, মানুষের সৌন্দর্য (জামাল) ও পূর্ণতা (কামাল) দু'প্রকার। এক. দুনিয়াবী কামালাত বা পার্থিবপূর্ণতা যা মানুষ স্বভাবগতভাবে দাবী করে এবং তা মানুষের জন্য দুনিয়ার জীবনে বেশী প্রয়োজন। দুই. দীনী কামালাত বা পরিপূর্ণতা মানুষ ঐগুলো কঠোর সাধনা মেহনত ও রিয়াযতের মাধ্যমে লাভ করে। সে কারণে মানুষ প্রশংসার দাবীদার এবং আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভকারী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

অন্যদিক থেকে মানুষের জামাল ও কামাল দু'ধরণের । প্রথমটি শুধু একটি সিফাত বা বিশেষ গুণাবলীর কারণে বিশেষিত হয়। দ্বিতীয়টি অন্যান্য গুণাবলীর সাথে মিলে মিশে হয়।

প্রথমোক্ত প্রয়োজনীয় বিষয় লাভ করার ব্যাপারে মানুষ সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। ঐসব গুণাবলী মানুষ নিজের শ্রম, সাধনা, প্রচেষ্টা ও রিয়াযত-মুজাহাদার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গতা-আঙ্গিক ও গঠনগত সৌন্দর্য, আকলের পরিপক্কতা ও সূক্ষ্ম ভাবগম্ভির বাক্য উচ্চারণ করা। তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুষ্ঠুতা সামঞ্জস্যপূর্ণ আচার আচরণ, বংশ মর্যাদার কুলীনতা , তাঁর গোত্রের মান সম্মান, তাঁর জন্মস্থানের মর্যাদা ইত্যাদি।

এছাড়া ঐ বিষয় যা জীবন-যাপনের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত তথা পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছেদ, বাড়ী-ঘর, বিবাহ-শাদী, ধন-সম্পদ, জ্ঞান-গরীমা ও আত্মমর্যাদা ইত্যাদি। যদি এসব বিষয়ে তাকওয়ার অনুশীলন করা হয় এবং সে অনুযায়ী দেহ-মনকে অভ্যস্ত করা হয় আর ঐসব প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য শরীয়াতের নির্ধারিত সীমা রেখা বহাল রাখা হয় তাহলে ঐসব অভ্যাস আখিরাতের আমল হিসেবে কাজে আসবে। অর্থাৎ এর জন্য আখিরাতে সাওয়াবের অধিকারী হবে।

আর ইহ ও পরকালীন বিষয়সমূহের কামালত বা পরিপূর্ণতা মানুষ তার প্রচেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে লাভ করতে সক্ষম। সেগুলো হলো সকল প্রকার চারিত্রিক

গুণাবলী, শরীয়তের আদব, দীন ও দুনিয়ার ইলম, ধৈর্য-সহিষ্ণুতা, ক্ষমাগুণ, বিনয়, শিষ্টাচার, সদাচরণ, দানশীলতা, বীরত্ব, বাহুবল, লাজ-লজ্জা, মায়া-মমতা, দয়া, মায়া, মেহেরবাণী, অনুকম্পা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও বন্ধুত্বের মর্যাদা প্রদান আত্মীয়তার সুসম্পর্ক, সেবা-শুশ্রুষা, ন্যায়-পরায়ণতা, আমানতদারী, বিশ্বস্ততা, সত্যভাষণ, চারিত্রিক পবিত্রতা, মান-মর্যাদা, শান-শওকত, নীরবতা, ধীরতা, স্থিরতা, ব্যক্তিত্ব ও এধরণের আরো অনেক গুণাবলী চারিত্রিক পবিত্রতার অন্তর্ভুক্ত। কখনো কখনো ঐসকল চারিত্রিক গুণাবলী মানুষের স্বভাবধর্মী হয়। আর কোনো কোনো লোকের স্বভাবগত হয়না। কিন্তু কঠোর শ্রম সাধনার মাধ্যমে এগুলো নিজের আয়ত্বে নিয়ে নেয়। তবে এর জন্য প্রয়োজন হলো এর উৎসমূল মানুষের স্বভাবে থাকা। এ সম্পর্কে সামনে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। ইনশাআল্লাহ। কিন্তু চারিত্রিক ঐ সমস্ত গুণাবলী যখন আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ ও পরকালীন কল্যাণের উদ্দেশ্যে না হয় তখনই ঐগুলো দুনিয়ার জন্য হয়ে যায়।

তবুও চারিত্রিক গুণাবলীর মর্যাদা সর্বাবস্থায় প্রশংসনীয়। এ বিষয়ে সকল সুষ্ঠু বিবেকবান ব্যক্তিবর্গ ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তবে উল্লেখিত চারিত্রিক গুণাবলী সমূহের মধ্যে কোনো গুণাবলীকে কোন গুণাবলীর উপর প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়ে মত বিরোধ রয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

اَلْكَمَالُ وَالْجَلَالُ

হুযুর (ﷺ) এর পরিপূর্ণ ও মর্যাদাময় গুণাবলী

কাজী আয়ায (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আমি যে সকল চারিত্রিক গুণাবলী মর্যাদার আলোচনা করছি, তার নমুনা হলো এরূপ আমাদের মধ্যে ওইসব গুণাবলীর দু'একটি গুণাবলী বিদ্যমান পাওয়া যায়। চাই তা বংশগত দিক থেকে যথা বীরত্ব বা বাহুবল, বা জ্ঞান-প্রজ্ঞা, বা শক্তি-সামর্থ বা দানশীলতা হোক। তাহলে ঐ ধরণের লোক সমাজে উচ্চমর্যাদার অধিকারী হয়। তার নাম উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হয়। আর ঐ ব্যক্তি উক্ত গুণাবলীর কারণে মানুষের অন্তরে শ্রদ্ধাপূর্ণ স্থান লাভ করে। যার ফলে দীর্ঘদিন পর্যন্ত মানুষ তার গুণকীর্তন প্রকাশ করে।

তাহলে এখন আপনারাই বলুন, যে মহান সত্তার মহিমান্বিত আখলাক ও শরাফতে সর্বাধিক কামালাতের পূর্ণতার আধার রয়েছে। যা ছিলো সীমাতীত, উর্ধ্বে ও ধারণ ক্ষমতার বাইরে। তার বিবরণ উল্লেখ করা মানুষের সাধনার বাইরে নয় কী? আর মানুষের পক্ষে হাজারো রকমের চেষ্টা-সাধনা করার পরও তা অর্জন করা আদৌ সম্ভব নয়। তাঁর স্থান ও মর্যাদা কতো সমুন্নত হবে। তা মানবীয় চিন্তার অনেক উর্ধ্বে। এটা ছিলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি বিশেষ সম্মান। তিনি তাঁকে স্বীয় নিয়ামত প্রদানের জন্য মনোনীত করেন। তাঁকে মি'রাজ তথা উর্ধ্বজগত পরিভ্রমণ করানোর মাধ্যমে সম্মানিত করেন। স্বীয় দীদার লাভে ধন্য করেন। স্বীয় নৈকট্য লাভের মর্যাদা প্রদান করেন। তাঁর উপর ওহী অবতীর্ণ করেন। তাঁকে হাশরের মাঠে শাফায়াতকারী মনোনীত করেন। উসীলার মাকাম প্রদান করেন। সকল প্রকার মর্যাদা, ফযিলত ও সমুন্নত মর্তবা প্রদান করেছেন। বোরাকে আরোহণ করিয়ে মিরাজে আহবান করেন। তাঁকে সকল সৃষ্টজীবের প্রতি নবী হিসেবে প্রেরণ করেন। মসজিদে আকসায় সমস্ত আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) এর ইমাম মনোনীত করেন।

তাঁকে সমস্ত আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) ও তাঁদের উম্মাতদের সাক্ষী বানিয়েছেন। তাঁকে সমস্ত আদম সন্তানদের সর্দার বানিয়েছেন। কিয়ামতের ময়দানে "লিওয়ায়ে হামদ" বা প্রশংসার ঝাণ্ডা তাঁর হাতে অর্পণ করা হবে। তাঁকে সুসংবাদ প্রদানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী বানিয়েছেন। আরশের অধিপতির নিকট তাঁকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করা হয়েছে। তাঁর আনুগত্য করা সকলের জন্য

ওয়াজিব করা হয়েছে। তাঁকে পথপ্রদর্শক ও "আমীন" বিশ্বস্তভাজন উপাধীতে ভূষিত করা হয়েছে। তাঁকে সারা বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছে। আর তাঁকে সন্তুষ্ট করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। তাঁর সমস্ত চাওয়া পাওয়া পূরণ করা হবে। তাঁর কথা শুনা হবে। তাঁকে "সাকীয়ে কাউসার" উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করেন। তাঁর পূর্বাপর যাবতীয় ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর বক্ষ মুবারককে গোপন ভেদসমূহের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এসব চিন্তা ভাবনা ও দায়িত্ব বহনের কারণে তাঁর পবিত্র পিঠ মুবারক বাঁকা হয়েছে। সে বোঝাসমূহ তাঁর উপর থেকে অপসারণ করা হয়েছে। তাঁর আলোচনাকে সমুন্নত করা হয়েছে। তাঁকে সাহায্য সহায়তার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। তাঁর পবিত্র ক্বালব মুবারককে প্রফুল্ল ও প্রশান্ত করা হয়েছে। স্বীয় ফিরিশতাদের দ্বারা তাঁকে সাহায্য করা হয়েছে। কিতাব ও হিকমত প্রদানের মাধ্যমে তাঁকে সাহায্য করা হয়েছে। তাঁকে "সাবয়ি মাসানী" বা "সপ্ত আয়াত" বিশিষ্ট সূরা প্রদান করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন মাজীদ দান করা হয়েছে। তাঁর মাঝে সংশোধনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যাতে তিনি উম্মাতের আত্মীক পরিশুদ্ধি করতে পারেন। আর তাঁকে অতি সুউচ্চ মহান মর্যাদা দান করা হয়েছে যে, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর ফিরিশতাগণ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম পাঠ করে।

তাঁকে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা অনুযায়ী লোকদেরকে পরিচালনা করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। যার কারণে তিনি গোলামীর শৃঙ্খল থেকে মানুষকে মুক্তি দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র নামের শপথ করেছেন। তাঁর দোয়াসমূহ কবুল করা হয়েছে। পাথর তাঁর সাথে কথা বলেছে। জীব-জন্তু তাঁর সামনে মস্তক অবনত করে তাঁকে সম্মান জানিয়েছে। তিনি মৃতকে জীবিত করেছেন। বধিরদের শ্রবণ শক্তি দান করেছেন। তাঁর পবিত্র আঙ্গুলিসমূহ থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত হয়েছে। তিনি অল্পবস্তুকে ফয়েজ দানের মাধ্যমে অনেক বেশী করে দেন। তিনি চন্দ্রকে দ্বি-খণ্ডিত করেছেন। অস্তমিত সূর্যকে পুনরায় উদিত করেছেন। তিনি বস্তুসমূহের স্বরূপ পরিবর্তন করে দেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর স্বভাবে 'রু'ব' বা ভীতি প্রদান করেছেন। যার ফলে তাঁকে দেখলেই শত্রুরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়তো। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীবকে সাহায্য করেছেন। তাঁকে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন। আকাশের মেঘমালা তাঁর মাথার উপর ছায়া প্রদান করতো। তাঁর পবিত্র হাতে কংকরসমূহ তাসবীহ পাঠ করেছে। দুঃখ-পীড়িত লোকজন তাঁর নিকট এসে নিরাময় হয়ে যেতো। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা মানুষের ক্ষতি থেকে নিরাপদ

রেখেছেন। মোটকথা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সীমাহীন সৌন্দর্য ও কামালাত প্রদান করেছেন যাহা বর্ণনা করা বা গণনা করে শেষ করা অসম্ভব।

তাঁর কামালাত ও ফযিলত একমাত্র তিনি জানেন, যিনি তাঁকে সেগুলো প্রদান করেছেন। তাঁকে এসব মর্যাদা প্রদান করেছেন। তিনি ব্যতীত অন্য আর কোনো মাবুদ নেই। এগুলো ছাড়াও আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য অগণিত অসংখ্য কারামত, সমুন্নত মর্যাদা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। সে স্থান অতিক্রম করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আর না তা কেউ অনুমান করতে পারবে। অন্য কেউ সে স্থানে পৌছে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

صِفَاتُهُ الْخَلْقِيَّةُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হুযুর (ﷺ) এর আকর্ষণীয় অবয়ব

হে পাঠকবৃন্দ! আল্লাহ তা'আলা আপনারদেরকে ইজ্জত-সম্মান দান করুন। যদি আপনারা বলেন যে, আমার আলোচনার মাধ্যমে আমি সংক্ষিপ্ত আকারে তা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মর্যাদার দিক থেকে সর্বাধিত সমুন্নত ও মহিমান্বিত, চারিত্রিক গুণাবলীর দিক থেকে সর্বাধিক কামালাতের অধিকারী। আর আমি তাঁর এসব মহিমান্বিত ও প্রশংসনীয় গুণাবলী বর্ণনায় সঠিক পথ অবলম্বন করেছি। কিন্তু আমি এ বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে আমার অন্তর মুহাব্বতের উৎসাহ ও আবেগে প্রজ্জলিত হয়ে উঠে। তাই আশা করছি তাঁর মহিমান্বিত মর্যাদাসমূহ ধারাবাহিকভাবে আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরতে চেষ্টা করব। যাতে আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলের অন্তরে তাঁর মুহাব্বতের জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় করে দেন। আর আমাদের সকলের অন্তরে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মুহাব্বতকে আরো বাড়িয়ে দেন। যদি আমরা ঐ মহিমান্বিত মর্যাদাপূর্ণ কামালাতের প্রতি লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে, এগুলো শ্রম, সাধনা ও মেহনত করে অর্জন করা সম্ভব নয়। বরং এগুলো মানুষের স্বভাবগত বিষয়। তাহলে তখন আমরা অনুধাবন করতে পারবো যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন ঐসমস্ত কামালাত ও ফাযায়েলের সমাহার। হাদিস বর্ণনাকারী সকলে এ বিষয় ঐক্যমত পোষণ করেছেন, শুধু তাই নয় বরং এ সংক্রান্ত বর্ণনাসমূহ চুড়ান্ত নিশ্চয়তা লাভ করেছে। তাঁর মনমোহনী আকর্ষণীয় অবয়বের সৌন্দর্য ও সৌকর্য, তাঁর পবিত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আঙ্গিক সৌষ্টবের অসংখ্য বিবরণ প্রসিদ্ধ ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে হযরত আলী, হযরত আনাস বিন মালেক, হযরত আবু হোরায়রা, হযরত বারা বিন আযেব, হযরত আয়েশা, হযরত ইবনে আবী হালা, হযরত আবু জুহাইফা, হযরত জাবির বিন সামুরা, হযরত উম্মে মা'বদ, হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত মাহাররায বিন মা'ঈকীব, হযরত আবু তুফাইল, হযরত আদ্দা বিন খালিদ, হযরত খোরাইম বিন ফাতেক, হযরত হাকিম বিন হেযাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) ও অন্যান্য উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

كَانَ أَزْهَرَ اللَّوْنِ، أَدْعَجَ ، أَنْجَلَ، أَشْكَلَ، أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ، أَبْلَجَ، أَزَجَّ، أَقْنَى، أَفْلَجَ، مُدَوَّرَ الْوَجْهِ، وَاسِعَ الْجَبِينِ، كَثَّ اللِّحْيَةِ تَمْلَأُ صَدْرَهُ، سَوَاءَ الْبَطْنِ وَالصَّدْرِ، وَاسِعَ الصَّدْرِ، عَظِيمَ الْمَنْكِبَيْنِ، ضَخْمَ الْعِظَامِ، عَبْلَ الْعَضُدَيْنِ وَالذِّرَاعَيْنِ وَالْأَسَافِلِ، رَحْبَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، سَائِلَ الْأَطْرَافِ، أَنْوَرَ الْمُتَجَرَّدِ، دَقِيقَ الْمَسْرُبَةِ، رَبْعَةَ الْقَدِّ، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ، وَلَا الْقَصِيرِ الْمُتَرَدِّدِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَكُنْ يُمَاشِيهِ أَحَدٌ، يُنْسَبُ إِلَى الطُّولِ إِلَّا طَالَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَجِلَ الشَّعْرِ، إِذَا افْتَرَّ ضَاحِكًا افْتَرَّ عَنْ مِثْلِ سَنَا الْبَرْقِ، وَعَنْ مِثْلِ حَبِّ الْغَمَامِ، إِذَا تَكَلَّمَ رُئِيَ كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِنْ ثَنَايَاهُ، أَحْسَنَ النَّاسِ عُنُقًا، لَيْسَ بِمُطَهَّمٍ وَلَا مُكَلْثَمٍ، مُتَمَاسِكَ الْبَدَنِ، ضَرْبَ اللَّحْمِ.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দেহ মুবারক ছিলো উজ্জ্বল বর্ণের ও বড় চোখ বিশিষ্ট। তাঁর আঁখি যুগলের রং ছিলো কালো ও লাল মিশ্রিত। অর্থাৎ চোখের পুতুলির সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম রগগুলি ছিলো লাল রংয়ের। তাঁর ভ্রুযুগল ছিলো লম্বা ধনুক সদৃশ ঘন চুল টানটান ভ্রু। চেহারা মুবারক ছিলো উজ্জ্বল গোলাকার। ললাট মুবারক ছিলো প্রশস্ত। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দাড়ি মুবারক ঘন ছিলো। বক্ষ মুবারক প্রশস্ত এবং দর্শনীয় ছিলো। তিনি ছিলেন বিশাল স্কন্ধের অধিকারী। মুবারক পাঞ্জাদ্বয় ছিলো মোটা, উভয় কদম মুবারক বড় ও মাংশালো ছিলো। হাতদ্বয়ের তালু ছিলো প্রশস্ত। তাঁর হস্ত ও পদযুগল ছিলো লম্বা। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র দেহের যে অংশ পোশাকের বাইরে অনাচ্ছাদিত অবস্থায় থাকতো সে অংশে থেকে উজ্জ্বল আলো বের হতো। তাঁর মুবারক বক্ষে উপর থেকে নাভী পর্যন্ত ডোরার মতো লম্বা পশম রাজি ছিলো। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অঙ্গসৌষ্ঠব ছিলো আকর্ষণীয় আঁটসাট, না খর্বাকৃতির। আবার অধিক লম্বাও ছিলো না। এরূপ হওয়া সত্ত্বেও যদি লম্বা কোন লোক তাঁর সামনে দাঁড়াতো তাহলে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে তার তুলনায় লম্বা দেখা যেতো (এটাও ছিলো তাঁর এক মু'জিযা)। তাঁর চুল মুবারক ছিলো নরম লম্বা ও থোকা বাঁধা। তিনি যখন হাসি দিতেন তখন তাঁর দাতেঁর নূর বিজলীর ন্যায়

ঝিলিক মারতো, আর মুবারক দাঁতগুলো মুক্তার মতো শুভ্র ছিলো। তিনি যখন কথা বলতেন তখন তাঁর সামনের দাঁত থেকে নূর বা আলোক বিচ্ছুরিত হতো। আর তাঁর গর্দান মুবারক সবচেয়ে বেশী সুন্দর ছিলো। তাঁর পবিত্র চেহারা মসৃণ সঠিক ও আঁটসাট ছিলো। মধ্যামাকৃতি ও ভারসাম্যময় ছিলো। অতি ক্ষীণও ছিলো না, অতি মোটাও ছিলো না। কিন্তু হালকা কোমল মাংশলো ছিলো।[১]

হযরত বারা বিন আযিব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

–আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চেয়ে চুল কাঁধ পর্যন্ত লম্বা লাল পোশাকে আবৃত সুন্দর আর কোনো লোককে দেখিনি।[২]

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ وَإِذَا ضَحِكَ يَتَلَأْلَأُ فِي الْجُدُرِ،

–আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চেয়ে অধিক সুন্দর কোনো ব্যক্তিই দেখিনি। সূর্যের উজ্জ্বলতা তাঁর চেহারা মুবারকে বিচ্ছুরিত হতো। তিনি যখন হাসতেন তখন পার্শ্ববর্তী দেয়াল আলোকিত হয়ে যেতো।[৩]

হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَكَانَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ السَّيْفِ؟ قَالَ لَا، بَلْ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَكَانَ مُسْتَدِيرًا،

---

১. শামায়েলে মুহাম্মাদিয়া;
২. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জাআ ফীর রুখসাতি ফীস্ সাওবিল আহমারি..., ৬:৩১১।
খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ফী সিফাতিন্ নবী..., ১১:৪৯২।
৩. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ফী সিফাতিন্ নবী..., ১২:১০৪।
খ) আবদুর্ রায্যাক : আল মুসান্নাফ, ১১:২৬০।

–এক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চেহারা মুবারক কী তরবারির মতো ছিলো? তখন আমি বললাম, না। বরং সূর্য ও চাঁদের উজ্জ্বলতার মতো, গোলাকৃতিও বিদ্যমান ছিলো।[১]

হযরত উম্মে মা'বদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চেহারা মুবারকের বর্ণনা দিয়ে বলেন,

أَجْمَلُ النَّاسِ مِنْ بَعِيْدٍ وَأَحْلَاهُ وَأَحْسَنُهُ مِنْ قَرِيْبٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ.

–তাঁকে দূর থেকে দেখতে সুন্দর, কাছে থেকে দেখতে কোমল ও অত্যন্ত আকর্ষণীয় মনে হতো। আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুক, যখন যিক্‌রকারীগণ তাঁকে স্মরণ করবে এবং যখন অলসগণ তাঁর স্মরণ থেকে উদাসীন থাকবে।[২]

হযরত আবু হালা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

يَتَلَأْلَأُ وَجْهُهُ تَلَأْلُؤَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ،

–দর্শনকারীর দৃষ্টিতে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন একজন মহিমান্বিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর চেহারা মুবারক পূর্ণিমার শশীর মতো ঝলমল করতো।[৩]

হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

مَنْ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ، وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ. يَقُوْلُ نَاعِتُهُ: لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রশংসা বর্ণনার শেষে তাঁর সাথে হঠাৎ সাক্ষাতকারী ব্যক্তি ভীত হয়ে পড়তো। আর তাঁর সাথে মেলামেশাকারীর রগরেশা তাঁর মুহাব্বতে একাকার হয়ে যেতো। তখন

---

১. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু সিফাতিন নবী, ১১:৩৮৭।
খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু শবিহিন্ নবী, ১২:১৩।
২. রশিদ বিন আলী রেযা : তাফসীরে মানার, ৯:২২৮।
৩. ক) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ১৬:২৬।
খ) তিরমিযী : শামায়েলে মুহাম্মাদিয়া, ১:৩৭৪।

শেষ পর্যন্ত সে তাঁর প্রশংসা করতে অপারগ হয়ে পড়তো। তিনি প্রথম দেখায় যে রূপ সুন্দর ছিলেন, পরবর্তী দর্শনেও অনুরূপ লাবণ্যময় ছিলেন।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মহিমান্বিত গুণাবলীর প্রশংসায় অসংখ্য প্রসিদ্ধ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো বর্ণনা করে আমি আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে চাইনা। আমি শুধু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অতি সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করবো। যাতে তাঁর মহিমান্বিত গুণাবলীর চূড়ান্ত সীমায় সহজে উপনীত হওয়া যায়।

আর ঐ পরিচ্ছেদসমূহে আমি এরূপ বিস্তারিত হাদীসের মাধ্যমে সমাপ্ত করবো। তাহলে ইনশাআল্লাহ! আপনারা ঐ সংক্রান্ত হাদিসসমূহ সম্পর্কে অবগতি লাভ করবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

نَظَافَتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হুযুর (ﷺ) এর শারীরিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মুবারক দেহের পবিত্রতায় সুঘ্রাণ ও তাঁর শরীর মুবারক থেকে নির্গত ঘামে মনোলাভা সুরভী ও তাঁর সকল প্রকার দেহ বর্জ্যের পবিত্রতায় বিবরণ।

আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মুবারক দেহে এমন বিশেষত্ব দান করেছেন, যা অন্য কারো দেহে পাওয়া যায়নি। তারপর উক্ত পবিত্র দেহকে শরীয়াতের প্রবর্তিত পবিত্রতায় দশটি স্বভাবগত অভ্যাসের মাধ্যমে কামালাত বা পরিপূর্ণতা প্রদান করেছেন।

যথা তিনি এরশাদ করেছেন– بُنِيَ الدِّيْنَ عَلَى النَّظَافَةِ "দীনের ভিত্তি হলো পবিত্রতা"।[১]

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

مَا شَمَمْتُ عَنْبَرًا قَطُّ وَلَا مِسْكًا وَلَا شَيْئًا أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

–যতো প্রকারের সুগন্ধি আছে চাই তা মেশক হোক বা আম্বর হোক, আমি তার ঘ্রাণ গ্রহণ করেছি। কিন্তু কোনো সুগন্ধিই হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্রতম দেহের সৌরভের সমতুল্য হতে পারেনা।[২]

হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে। তিনি বলেন,

مَسَحَ خَدِّي قَالَ فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا أَوْ رِيحًا كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُوْنَةِ عَطَّارٍ،

–একদা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার গণ্ডদেশে তাঁর পবিত্র হাত সঞ্চালন করেন। আমি তাঁর পবিত্র হাত মুবারক থেকে এমন

[১]. রাযী : মাফাতিহুল গায়িব, ৫:৪৮৭।
[২]. মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু তীবি রায়িহাতিন নবী, ১১:৪৭৭।

শীতলতা ও সুঘ্রাণ অনুভব করি, যেনো হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এইমাত্র আতর বিক্রেতার কৌটা থেকে তার হাত মুবারক বের করে এনেছেন।[১]

হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ব্যতীত অন্যান্য রাবীগণ বলেছেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর পবিত্র হাতে খুশবু ব্যবহার করতেন বা না করতেন কিন্তু যে ব্যক্তি একবার তাঁর সাথে মুসাফাহা করতো, সে সারা দিন নিজের হাত থেকে সুঘ্রাণ নিতে পারতো। তার হাত থেকে মেশক আম্বরের চেয়ে অধিক সুঘ্রাণ বের হতো। যদি তিনি কখনো কোনো শিশুর মাথায় স্নেহের হাত বুলাতেন, তাহলে ঐ শিশুকে অন্যান্য শিশুদের মধ্যে ঐ সুগন্ধির কারণে চেনা যেতো।

একবার হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বাড়ীতে বিশ্রাম নিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর পবিত্র শরীর থেকে ঘাম নির্গত হচ্ছিল। হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর মা একখানা শিশিতে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ঘাম মুবারক জমা করতে থাকে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘুম থেকে জাগ্রত হলে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, এটা কী করছো? আমার মা বললেন,

نَجْعَلُهُ فِي طِيبِنَا وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ.

–আমাদের ব্যবহৃত সুগন্ধির সাথে এটা জমা করে রাখবো। এরপর থেকে আমাদের সুগন্ধ সব চেয়ে বেশী সুঘ্রাণ বিশিষ্ট হয়।[২]

হযরত ইমাম বোখারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর পবিত্র "তারিখে কবীর" গ্রন্থে হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন,

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُّ فِي طَرِيقٍ، فَيَتْبَعُهُ أَحَدٌ، إِلاَّ عَرَفَ أَنَّهُ سَلَكَهُ، مِن طِيبِ عَرْفِهِ.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে রাস্তায় গমন করতেন সে রাস্তা তাঁর সুগন্ধে সুরভিত হয়ে যেতো, তাঁর পেছনে গমনকারী ব্যক্তি সহজে অনুভব করতে পারতো যে, এ রাস্তা দিয়ে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গমন করেছেন।[৩]

[১]. মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু তীবি রায়িহাতিন নবী, ১১:৪৭৭।
[২]. মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু তীবি ইরকাতিন্ নবী, ১১:৪৮০।
[৩]. বুখারী : আত্ তারিখুল কবীর, ১:৩৯৯।

হযরত ইসহাক ইবনে রাহ্‌বীয়া (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মুবারক দেহ থেকে নির্গত খোশবু কোন সুগন্ধি ব্যবহার করার কারণে সুরভীত হতো না, বরং তাঁর দেহ মুবারকই সুগন্ধময় ছিলো।

হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, একদা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাহনের উপর তাঁর পেছনে আমাকে উঠিয়ে নিলেন। তখন আমি মোহরে নবুওয়াতকে চুম্বন করি। আমি তখন মোহরে নবুওয়াত থেকে মেশক আম্বরের সুগন্ধি অনুভব করি।

কোনো কোনো হাদিস বর্ণনাকারীগণ বর্ণনা করেছেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন প্রাকৃতিক কর্ম সম্পাদনের ইচ্ছা করতেন তখন মাটিতে ফাটলের সৃষ্টি হয়ে যেতো, তিনি পায়খানা বা প্রশ্রাব করলে মাটি তা নিজের ভিতর লুকিয়ে নিতো এবং সে স্থান থেকে শুধু সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়তো।

একদিন হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট আরয করলেন,

يَا رَسُوْلَ اللهِ تَأْتِي الْخَلَاءَ فَلَا يُرَى مِنْكَ شَيْءٌ مِنَ الْأَذَى ، فَقَالَ : أَوَمَا عَلِمْتِ يَا عَائِشَةُ أَنَّ الْأَرْضَ تَبْتَلِعُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَلَا يُرَى مِنْهُ شَيْءٌ.

–হে আল্লাহর রাসূল! আপনি পায়খানা-পেশাব শেষে শৌচাগার থেকে বের হন কিন্তু আমরা সেখানে প্রবেশ করে পায়খানার কোনোরূপ আলামত দেখতে পাইনা। তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে আয়েশা! তুমি জানোনা, আম্বিয়া কেরামের পেট থেকে যা কিছু বের হয় যমীন তা শোষণ করে নেয়। কাজেই তোমরা তা দেখতে পাওনা।[১]

যদিও এই হাদিস এতো প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। কিন্তু অধিকাংশ আলেমদের অভিমত হলো যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র দেহবর্জ্য পবিত্র ছিলো। হযরত ইমাম শাফি'ঈ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও তাঁর কোনো কোনো অনুসারী এ অভিমতের সমর্থক।

তাঁদের উভয়ের এ অভিমতকে হযরত আবু বকর বিন সাদেক মালেকী তাঁর রচিত 'আল বিদায়া ও ফী কুরূয়িল মানিয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

১. ইবনে সা'দ : তাবাকাতুল কুবরা, ১:১৪৪।

আর এ মাসায়ালায় শাফি'ঈ মতাবলম্বীদের কোন প্রকার কার্যকারিতা নেই।

কিন্তু এ বিষয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রমাণ হলো যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দেহ মুবারক থেকে অপবিত্র কোন কিছুই বের হতোনা। যার থেকে অপার্থিব গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে।

হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে। তিনি বলেন,

غَسَّلْتُ رَسُوْلَ اللهِ فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ مَا يَكُوْنُ مِنَ الْمَيِّتِ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، وَكَانَ طَيِّبًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَيًّا وَمَيِّتًا.

–আমি ওফাতের পর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে গোসল দিয়েছি। আমি খুব মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করে দেখেছি, কিন্তু আমি তাঁর দেহ থেকে এমন কোনো কিছুই বের হতে দেখিনি যা স্বাভাবিকভাবে মৃতদেহ থেকে বের হয়। তখন আমার মুখ দিয়ে অনায়াসে উচ্চারিত হয়েছে যে, তিনি জীবিত থাকা অবস্থায় পবিত্র ছিলেন, ওফাতের পরও পবিত্র রয়েছেন।[১]

হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আরো বেশী বর্ণনা করেছেন,

وَسَطَعَتْ مِنْهُ رِيْحٌ طَيِّبَةٌ لَمْ نَجِدْ مِثْلَهَا قَطُّ.

–তাঁর দেহ মুবারক থেকে যে সুঘ্রাণ বের হতো আমি সে ধরনের সুরভী অন্য আর কোনো সুগন্ধির মধ্যে পাইনি।[২]

অনুরূপ এক বর্ণনা হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণনা করেছেন,

حِيْنَ قَبَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَوْتِهِ.

–ওফাতের পর তিনি যখন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ললাট মুবারক চুম্বন করেন, তখন তিনি অনুরূপ সৌরভ অনুভব করেন।[৩]

অনুরূপ এক বর্ণনা হযরত মালেক বিন সিনান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সম্পর্কে বর্ণিত আছে। উহুদের যুদ্ধে যখন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

১. হাকেম : মুসতাদ্‌রাক আলাস্‌ সহীহাইন, ৩:৩৬৫।
২. হাকেম : মুসতাদ্‌রাক আলাস্‌ সহীহাইন, ৩:৩৬৫।
৩. বুখারী : আস্‌ সহীহ্‌, বাবু মরদ্বিন নবী, ১৩:৩৬৩।

নিজের বর্মের আঘাতে আহত হবার পর হযরত মালেক বিন সিনান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নিজের জিহ্বা দিয়ে ঐ রক্ত পান করেন, তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

لَنْ تُصِيبَهُ النَّارُ.

–তাঁকে কখনো দোযখের আগুন স্পর্শ করবে না।

একবার সিঙ্গা লাগানোর সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র রক্ত পান করেন। তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

وَيْلٌ لَكَ مِنَ النَّاسِ، وَوَيْلٌ لِلنَّاسِ مِنْكَ.

–লোকেরা তোমার হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর তুমিও লোকদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[১]

কিন্তু হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে রক্ত পান করতে নিষেধ করেননি। অনুরূপ এক অপর বর্ণনায় এক মহিলা সম্পর্কে বর্ণিত আছে। যে ভুলবশতঃ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পেশাব পান করেছিল। তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

لَنْ تَشْتَكِي وَجَعَ بَطْنِكِ أَبَدًا.

–এখন থেকে তোমার পেটের পীড়া হবে না।

আর তিনি তাকে মুখ ধৌত করার নির্দেশও দেননি বা ভবিষ্যতে এরূপ কাজ করতে নিষেধও করেননি। পেশাব পানকারিণী ঐ মহিলার বর্ণনা সহীহ সূত্রে

(১) ক) হাকেমঃ মুসতাদ্‌রাক আলাস্ সহীহাইন, বাবু যিকরি আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর..., ৩:৬৩৮।
খ) আবূ নঈম ইস্পাহানী : মা'রিফাতুস্ সাহাবা, বাবুস্ যায়ী মিন বাবিল আইনী, ১১:৪৬৮।
গ) দারে কুতনী : ১:২২৮।

[হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র দেহ মুবারক এতো বেশী জ্যোতির্ময় ছিলো যার দেহে ঐ পবিত্র রক্ত প্রবেশ করতো তার আপাদমস্তক উজ্জ্বল হয়ে যেতো। এ কারণে রক্তপানকারীর পক্ষে মস্তক অবনত করা অসম্ভব ছিলো। সুতরাং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথে আবদুল মালেক বিন মারওয়ানেরও ঐ একই অবস্থা হয়েছে। তিনি আবদুল মালেকের আনুগত্য অস্বীকার করে স্বয়ং খিলাফতের দাবী করে। যার ফলশ্রুতিতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ পবিত্র মক্কা নগরী আক্রমণ করে মিনজানিকের সাহায্যে অগ্নি বর্ষণ করার ফলে কাবা গৃহের গিলাফে আগুন ধরে যায়। দীর্ঘ দিন থেকে মক্কা নগরীকে অবরুদ্ধ করে রাখার পর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বিজয়ী হন এবং সে হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে শহীদ করে ফেলে। এভাবে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ভবিষ্যৎবাণী বাস্তবায়িত হয়েছে যে, লোকেরা তোমার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর তুমিও লোকদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং হাজ্জাজের হামলায় পবিত্র কাবাগৃহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মক্কার বাসিন্দারা ভীষণ বিপদে পতিত হয়। আর অসংখ্য লোক নিহত হয়।]

বর্ণিত হয়েছে। এ বর্ণনা ইমাম দারে কুতনী বর্ণনা করেছেন। ইমাম বোখারী ও মুসলিম (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে যেরূপ সর্তকতা অবলম্বন করতেন, ইমাম দারে কুতনীও অনুরূপ বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করতেন। পেশাব পানকারিণী মহিলার নাম "বারকাত"। তবে তাঁর বংশ তালিকায় মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন সেই মহিলা হলেন উম্মে আইমান, যিনি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বলেন,

قَالَتْ: وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَحٌ مِنْ عِيدَانٍ، يُوضَعُ تَحْتَ سَرِيرِهِ، يَبُولُ فِيهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَبَالَ فِيهِ لَيْلَةً، ثُمَّ افْتَقَدَهُ، فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْئًا. فَسَأَلَ بَرَكَةَ عَنْهُ، فَقَالَتْ: قُمْتُ، وَأَنَا عَطْشَانَةٌ، فَشَرِبْتُهُ وَأَنَا لَا أَعْلَمُ،

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটা কাঠের পাত্র ছিলো। সে পেয়ালা তাঁর খাটের নিচে রাখা হতো। যাতে রাতের বেলায় তিনি পেশাব করতেন। এক রাতে তিনি ঐ পাত্রে পেশাব করে পাত্রটি উক্ত স্থানে রেখে দেন। যখন তিনি পাত্রটি দেখেন কিন্তু তাতে পেশাব ছিলোনা। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন বারকতকে পাত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তখন বারকত বললো, রাতে আমার পানির পিপাসা পেয়েছে, তাই আমি ঘুম থেকে উঠে অন্ধকারে পাত্রে রাখা জিনিস পান করে ফেলি। এ বর্ণনা ইবনে জোরাইজ ও আইনী বর্ণনা করেছেন।[১]

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে এটাও এক বৈশিষ্ট্য ছিলো যে,

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ وُلِدَ مَخْتُونًا، مَقْطُوعَ السُّرَّةِ،

–তিনি মাতৃগর্ভে থেকে খতনাকৃত, নাভী কাটা পাক-সাফ অবস্থায় ভূমিষ্ট হয়েছেন।[২]

মা জননী সাইয়্যেদা আমেনা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেন,

وَلَدْتُهُ نَظِيفًا، مَا بِهِ قَذَرٌ،

১. ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ইকরাতিদ্ যরিফ ওয়া ফযলি ইসারিহি, ১০:৩৮১।
খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু হাদিসি মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ, ৪৮:৩৩২।
২. ক) শামী : সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ, বাবু মুকাদ্দামাতুল মুসান্নাফ, ১:৭।
খ) ইবনে কাসীর : সিরাতে নবুবিয়্যাহ, ১:২০৯।

–আমি তাঁকে পাক-সাফ অবস্থায় ভূমিষ্ঠ করেছি, তাঁর সাথে কোন কদর্যতা ছিল না।

স্বাভাবিকভাবে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় নারীদেহ থেকে যে সমস্ত ময়লা বের হয়, আমার দেহ থেকে সেই ধরণের কোন প্রকার ময়লা বের হয়নি। তাঁর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়ও এরূপ কোনো কিছু বের হয়নি।

হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেন,

مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ.

–আমি সারা জীবনে কখনো হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর লজ্জাস্থান দেখিনি।[১]

হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

أَوْصَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُغَسِّلُهُ غَيْرِي «فَإِنَّهُ لَا يَرَى أَحَدٌ عَوْرَتِي إِلَّا طُمِسَتْ عَيْنَاهُ،

–হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে অসিয়ত করেছেন যেন তাঁর ওফাতের পর আমি ব্যতীত অন্য কেউ তাঁকে গোসল না দেয়। কেননা আমি ব্যতীত যদি অন্য কেউ তাঁর লজ্জাস্থানের প্রতি তাকায় তাহলে সে দৃষ্টিহীন হয়ে যাবে।

হযরত ইকরামা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেন,

أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَامَ حَتَّى سُمِعَ لَهُ غَطِيطٌ، فَقَامَ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ،

–একবার হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শয়ন করে ঘুমান, এমনকি তার নাকের শব্দ শুনা যায়। কিন্তু তিনি ঘুম থেকে জেগে নামায আদায় করেন। অযু করেননি।[২]

---

[১]. ক) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবুন্ নাহী আই ইউরা আওরাতি আবিহি, ২:৩৪০।
খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুন নযরি ইলাল মাখতুবিয়্যাহ ওয়া বয়ানুল আওরাত, ২:২০৮।
গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবুল মুসনাদুস্ সাবেক, ৫২:৪৯।
ঘ) বায়হাকী : সুনানুল কুবরা, ৭:৯৪।
ঙ) তিরমিযী : শামায়েলে মাহমুদিয়্যাহ, ১:৪০২।

[২]. ক) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু বিদয়াতি মুসনাদি আবদিল্লাহ ইবনে আব্বাস, ৫:১১৭।
খ) বায়হাকী : সুনানুল কুবরা, ১:১২২।
গ) আবদ ইবনে হুমাইদ : আল মুসনাদ, ২:২৩৪।

হযরত ইকরামা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

لِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَحْفُوظًا.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে ঘুমান্ত অবস্থায় অযু ভঙ্গ হওয়া থেকে হেফাযত করা হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

وُفُورُ عَقْلِهِ وَفَصَاحَةِ لِسَانِهِ وَقُوَّةِ حَوَاسِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হুযুর (ﷺ) এর পবিত্র ইলম, আকল ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি

এখন প্রশ্ন হলো হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ইলম ও আকল সিদ্ধান্ত প্রদানে তাঁর বুদ্ধিমত্তা, গভীরতা, তদবীরে দৃঢ়তা, চিন্তা-চেতনায় অলংকারপূর্ণ বাণী, ভারসাম্যপূর্ণ সদাচরণ, সুন্দর শামায়েল, দুর্লভ ও সূক্ষ্ম আচরণসমূহ সর্বাধিক পরিপূর্ণ ছিলো। এবিষয় কোন সন্দেহ বা সংশয়ের অবকাশ নেই যে, তিনি সমস্ত আদম সন্তানের মধ্যে সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী ও সর্বাধিক বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন। যদি কেউ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অবস্থা সুন্দর শামায়েল এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম আচরণসমূহ বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় রক্ষণাবেক্ষনের বিষয় চিন্তাভাবনা করে তাহলে সে কিঞ্চিৎ আঁচ করতে পারবে যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিরূপ প্রশংসনীয় চরিত্র ও সুমহান মর্যাদায় পরিপূর্ণ ছিলেন। তাঁর চারিত্রিক গুণাবলী কতো প্রশংসনীয় ছিলো। তাঁর এই সমস্ত মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের কথা বাদ দিলেও দেখা যায় যে, ইলমে এলাহী ও শরীয়াতের বিধান প্রকাশ ও তাঁর বর্ণনা তিনি যা লাভ করেছেন, তা বর্ণনাতীত। না তিনি কোথায়ও নিয়মিত অধ্যয়ন করেছেন, না প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোথায়ও শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, না অনুশীলন করেছেন। আর না পুথিগতভাবে কোনো গ্রন্থ অধ্যায়ন করেছেন। এর দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, তাঁর আকল কত সুগভীর ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ছিলো। আর এটা এমন এক হাকীকত যার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। বরং তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ও স্বীকৃত।

হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

قَرَأْتُ فِي أَحَدٍ وَسَبْعِينَ كِتَابًا، فَوَجَدْتُ فِي جَمِيعِهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرْجَحُ النَّاسِ عَقْلًا، وَأَفْضَلُهُمْ رَأْيًا.

–আমি আলেমদের রচিত একাত্তরখানা কিতাব অধ্যায়ন করেছি। ঐ সমস্ত কিতাবে আমি দেখতে পেয়েছি যে, সমস্ত আদম সন্তানের মধ্যে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সব চেয়ে বেশী আকলের অধিকারী ও সিদ্ধান্ত প্রদানে দৃঢ়তাসম্পন্ন ছিলেন।[১]

---

১. ক) আল মাজালিসাতু ওয়া জাওয়াহিরুল ইলমি : ৪:৪৩১ হাদীস নং ১৬২৪।
খ) হিলইয়াতুল আউলিয়া : ৪:২৬।

অপর এক বর্ণনায় হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

فَوَجَدْتُ فِي جَمِيعِهَا، أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يُعْطِ جَمِيعَ النَّاسِ مِنْ بَدْءِ الدُّنْيَا إِلَى انْقِضَائِهَا، مِنَ الْعَقْلِ فِي جَنْبِ عَقْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا كَحَبَّةِ رَمْلٍ مِنْ بَيْنِ رِمَالِ الدُّنْيَا.

–আমি ঐ কিতাবসমূহে দেখেছি যে, আল্লাহ তা'আলা মানবমণ্ডলীকে যে পরিমাণ জ্ঞান ও আকল প্রদান করেছেন এবং করবেন, তাদের সকলের জ্ঞানকে যদি একত্রিত করা হয় তাহলে এ সমষ্টিক আকল ও জ্ঞান হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আকল মুবারকের এক বিন্দুতুল্য হবেনা। সারা পৃথিবী যদি মরুভূমিতে পরিণত হয়, তাহলে সে মরুভূমির বালুকারাশির সমতুল্য হবে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মুবারক ইলম ও আকল। যার এক কণা বিন্দুতুল্য হবে সারা পৃথিবীর ইলম ও আকল।

হযরত মুজাহিদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণনা করেছেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ يَرَى مِنْ خَلْفِهِ كَمَا يَرَى مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ. وَبِهِ فُسِّرَ قَوْلُهُ تَعَالَى: «وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ».

–হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় পেছনেও সেভাবে দেখতে পেতেন যেভাবে সামনে দেখতে পেতেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ –এবং নামাযীদের মধ্যে আপনার পরিদর্শনার্থে ভ্রমণকেও।[১]

মুয়াত্তা গ্রন্থের এক বর্ণনায় এসেছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي

–আমি তোমাদেরকে পশ্চাৎ দিক থেকেও দেখতে পাই।[২]

---

১. আল কুরআন : সূরা শু'আরা, ২৬:২১৯।
২. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু আসতিল ইমামিম নাস ফী ইতমামিস্ সালাত, ২:১৮৫।
খ) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবুল আমলি ফী জিমায়িস্ সালাত, ২:২৫।

এধরণের বর্ণনা সহীহ বোখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে। অনুরূপ বর্ণনা হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) এর বর্ণনায়ও এসেছে। তিনি বলেন, পশ্চাৎ দিক থেকে দেখাও এক বৈশিষ্ট্য যা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবুওয়াতের প্রমাণ স্বরূপ প্রদান করেছেন।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

إِنِّي لَأَنْظُرُ مِنْ وَرَائِي كَمَا أَنْظُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ.

–আমি তোমাদেরকে সামনের দিক থেকে যেভাবে দেখতে পাই, পেছন দিক থেকেও ঠিক সেভাবে দেখতে পাই।[১]

কোনো কোনো বর্ণনায় এরূপ এসেছে যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

إِنِّي لَأُبْصِرُ مِنْ قَفَايَ كَمَا أُبْصِرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ.

–আমি তোমাদেরকে সম্মুখ-পশ্চাৎ উভয় দিক দিয়েই দেখতে পাই।[২]

হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) এর বর্ণনায় এসেছে,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَى فِي الظُّلْمَةِ كَمَا يَرَى فِي الضَّوْءِ.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্ধকারেও সেরূপ দেখতে পেতেন যেরূপ দিবালোকে দেখতে পেতেন।[৩]

গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আবি হুরাইরা, ১৬:২২২।
ঘ) তাবরানী : মু'জামুল আওসাত, বাবু মিন ইসমিহি আহমদ, ৫:১৪২।
ঙ) তাহাভী : মুশকিলুল আসার, বাবু আকিমু সুফূফাকুম..., ১২:৩২৬।
১. ক) ইবনে হুমাইদ : আল মুসনাদ, বাবু বাকিয়্যাতি হাদিসী আজলানি, ১:৪১১।
খ) ইবনে আসাকীর : আল মু'জাম, ১:২৫৫।
গ) কুরতুবী : আল ইসতিযকার, বাবুল আমালি ফী জামিউস্ সালাত, ২:৩৩০।
ঘ) হাইছুমী : কাশফুল ইসতার আন যাওয়ায়িদে বাযযার, বাবু তাসভীয়াতুস সুফূফ, ১:২৪৫।
ঙ) হাইছুমী : মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ ওয়া মামবাউল ফাওয়ায়িদ, বাবু ফীস্ সুফূফ লিস্ সালাত, ২:৮৯।
চ) সুয়ূতী : জামিউল আহাদিস, বাবু আন্নাল মুশাদ্দাদাতি মা'আল হামযা, ১০:২০০।
ছ) সুয়ূতী : জামিউল কবীর, বাবু হরফুল হামযা, ১:৯৭৫২।
জ) মুহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী শামী : সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ ফী সিরাতি খায়রিল ইবাদ, ১০:৪৫০।
২. আন্দুলুসী : আল আইয়াতুল বাইয়্যিনাত ফী যিকরি মা ফী আযায়ির রাসূল, ১:৩৮৮।
৩. ক) ইবনে জাওযী : আল ওয়াফা বি তা'রিফে ফাযায়িলে মুস্তফা, বাবু মু'জিযাতিহি, ১:২৫৬।
খ) জুরজানী : আল কামেল, ৫:৩৬৫।
গ) খতীবে বাগদাদী : তারিখে বাগদাদ, ৫:৪৪৮।

এ সম্পর্কিত অসংখ্য বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। যেগুলোর দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফিরিশতামণ্ডলী ও শয়তানদের দেখতে পেতেন।

আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাসীর ওফাত হয় আবিসিনিয়াতে কিন্তু মদীনা নগরীতে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে তাঁর জানাযা দেখানো হয়েছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনাতে তাঁর জানাযা নামায আদায় করেন।

মি'রাজ সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর কাফিররা যখন বায়তুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে প্রশ্ন করা আরম্ভ করে, তখন পুরো বায়তুল মুকাদ্দাসকে তাঁর সামনে হাযির করে দেয়া হয়। আর তিনি তখন চোখে দেখেদেখে তাদের প্রশ্নের উত্তর দেন। যখন মসজিদে নববী নির্মাণ আরম্ভ হয় তখন পবিত্র কাবা গৃহের দিক লক্ষ্য করার প্রয়োজন হয়। তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে পবিত্র কাবাগৃহ দেখানো হয়েছে।

এক বর্ণনায় এসেছে,

أَنَّهُ كَانَ يَرَى فِي الثُّرَيَّا أَحَدَ عَشَرَ نَجْمًا.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দৃষ্টিশক্তি এতো প্রখর ছিলো যে, তিনি সুরাইয়া নক্ষত্ররাজীর অভ্যন্তরে এগারটি নক্ষত্র পরিস্কার দেখতে পেতেন। এসব কিছুই তিনি স্বচক্ষে অবলোকন করেছেন।[১]

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এ অভিমতের সমর্থক।

কেউ কেউ বলেছেন দেখার অর্থ শুধু চোখ দিয়ে দেখা নয়, বরং এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। অথচ বাহ্যিক বর্ণনা এর বিপরীত। চোখ দিয়ে দেখা অসম্ভব কিছু নয়। কেননা এটা হলো আম্বিয়া (আলাইহিস্ সালাম) এর মু'জিযা। যথা হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর এক বর্ণনায় এসেছে,

---

ঘ) শামসুদ্দীন যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল ফী নাকদির রিজাল, ২:৪৮৭।
ঙ) ইবনে হাজর আসকালানী : লিসানুল আরব, বাবু মিন ইসমিহি আবদিল্লাহ, ৩:৩৩৩।
১. ক) কুরতুবী : আল জামে' লি আহকামিল কুরআন, বাবু সুরাতিন্ নজম, ১৭:৮৩।
খ) শিহাবুদ্দীন : আল মাওয়াহিবুল লাদুনি, প্রথম পরিচ্ছেদ, বাবু ফী কামালি খলক্বিহি ওয়া জামালি সুরাতিহি, ২:১১৫।
গ) শামী : সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ, বাবুত্ তানবিহাত, ২:২৫।
ঘ) তাহতাভী : নিহাইয়াতিল ইজায, বাবু মাসআলাতিল গারানিক, ১:১১৫।

مَا تَجَلَّى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يُبْصِرُ النَّمْلَةَ عَلَى الصَّفَا، فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ، مَسِيرَةَ عَشَرَةِ فَرَاسِخَ.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) কে তাঁর তাজ্জালী দেখিয়েছেন, তখন তাঁর দৃষ্টিশক্তি এতো প্রখরতা লাভ করেছে যে, তিনি দশ ফরখস দূরত্ব পর্যন্ত পাথরের উপর যাতায়াতকারী পিপীলিকা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পান।[১]

এ বর্ণনার উপর ভিত্তি করলে দেখা যায় যে, এ বিষয় অসম্ভব কোন কিছুই নয় যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মি'রাজ সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলীকে একের পর এক প্রত্যক্ষ করেই চলেছেন।

অন্যান্য বর্ণনাসমূহে এসেছে যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'রুকানার' মতো বিখ্যাত কুস্তিগীরকে অবলীলায় ধরাশায়ী করে ফেলেন এবং তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। অনুরূপভাবে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জাহিলীয়াতের যুগে 'রুকানার' পিতাকে ধরাশায়ী করেছেন। অথচ তার শারীরিক শক্তি অনেক বেশী ছিলো। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে পরপর তিনবার ধরাশায়ী করে মাটিতে ফেলে দেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে। তিনি বলেন,

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَشْيِهِ، كَأَنَّمَا الْأَرْضُ تُطْوَى لَهُ؛ إِنَّا لَنُجْهِدُ أَنْفُسَنَا، وَهُوَ غَيْرُ مُكْتَرِثٌ.

–আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চেয়ে অধিকতর দ্রুত চলতে আর কাউকে দেখিনি। মনে হতো তাঁর কদম মুবারকের নীচে যমীন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আমরা তাঁর সাথে চলতে গেলে ক্লান্ত হয়ে পড়তাম এবং শ্রান্তি অনুভব করতাম। তাঁর সাথে হাঁটতে গেলে আমাদেরকে রীতিমতো দৌড়তে হতো এবং আমাদের নিঃশ্বাস ফুলে

[১]. ক) ইবনে কাসীর : তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৩:৪৭৩।
খ) নকী উদ্দীন মুকরেযী : ইমতিনাউল আসমা, ১০:৩৩১।
গ) যুরকানী : শরহে যুরকানী ফী মাওয়াহিবে লাদুনি, প্রথম পরিচ্ছেদ, বাবু কামালি খলক্বিহি ওয়া জামালি সুরাতিহি, ৫:২৬৮।

উঠতো, কিন্তু তাঁর কোনো কষ্ট অনুভব হতো না। তিনি স্বাভাবিক গতিতে কোনো প্রকার কৃত্রিমতা ছাড়াই হেঁটে চলেছেন।[১]

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আরও এক বৈশিষ্ট্য হলো যে,

أَنَّ ضَحِكَهُ كَانَ تَبَسُّمًا، إِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا، وَإِذَا مَشَى مَشَى تَقَلُّعًا، كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ.

–তিনি যখনই হাসতেন তখন মুচকি হাসি হাসতেন । যদি তিনি কারো প্রতি তাকাতেন তাহলে পুরো শরীর তার দিকে ঘুরিয়ে তাকাতেন। পথচলার সময় কদম মুবারক খুব দৃঢ়তা ও দ্রুততার সাথে উঠাতেন। তখন মনে হতো তিনি কোনো উঁচুস্থান থেকে নীচুস্থানের দিকে অবতরণ করছেন।

[১]. ক) মহিউদ্দীন বাগভী : তাফসীরে বাগভী, বাবু সুরাতি বনী ইসরাঈল, ৩:১৩৪।
খ) খাযেন : তাফসীর খাযেন, ৩:১৩০।
গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ২:৩৫০।
ঘ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ফী সিফাতিন্ নবী, ৬:৪২।
ঙ) তিরমিযী : শামায়েলে মাহমুদিয়্যাহ, বাবু মা জা-আ ফী মাশিয়্যাতি রাসূল, ১:১১২।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

فَصَاحَةُ لِسَانِهِ وَبَلَاغَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হুযুর (ﷺ) এর বাগ্মিতা ও ভাষালংকার প্রসঙ্গে

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জবান মুবারক থেকে নির্গত ভাষা কিরূপ বিস্ময়তার অলংকরণপূর্ণ ও হৃদয়স্পর্শী ছিলো তা বলা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। এ বিষয়েও হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিশেষ বৈশিষ্ট্যে ও গুণাবলীতে সমুহান ও সমুন্নত ছিলেন। একথা তো প্রসিদ্ধ যে, তাঁর স্বভাব মুবারক ছিলো অনাড়ম্বর, তাঁর নিঃসৃত ধ্বনির মাধুর্য ছিলো চিত্তাকর্ষক। তাঁর কালাম ছিলো সর্বাধিক সংক্ষিপ্ত অথচ অধিক অর্থবোধক। তাঁর বাক্যে সঠিকতা ও বিশুদ্ধতা ছিলো। তাঁর বাক্য ছিলো ব্যাপক অর্থবোধক। আর প্রতিটি বাক্য ছিলো চাটুকারীতাহীন। তাঁকে "জাওয়ামিউল কালিম" বা 'এক বাক্যে বহু বাক্যের সমাবেশ' এর বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে।[১]

তাঁর প্রতিটি বাণী ছিলো গোপন রহস্যাবলীর আধার। তাঁকে আরবের ভিন্ন গোত্রের ভাষার জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে। তিনি প্রতিটি অঞ্চলের অধিবাসীদের মাতৃভাষায় ও আঞ্চলিক প্রচলিত ভাষায় কথা বলতে পারতেন। তাদের মাতৃভাষায় তাদের সাথে কথা বলতে পারতেন। এমনভাবে কথা বলতেন তখন তারা আমতা আমতা করতে শুরু করতো। অন্যান্য সাহাবীগণ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট বাক্যের অর্থ জানার জন্য আবেদন করতো। যে ব্যক্তি তাঁর কালাম নিয়ে চিন্তাভাবনা করতো তাহলে সে ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারতো যে, তিনি যে কতো গভীর ভাবসম্পন্ন বাক্য ও আশ্চর্য ধরণের প্রকাশ ভঙ্গিমায় কুরাইশ, আনসার, নজদ ও হিজাযবাসীদের সাথে কথা বলতেন।

অনুরূপভাবে তিনি আরবের খ্যাতনামা কবি হামদানী, তাহাফা আন-নাহদী, কাতান বিন হারেসা আলীমী, আস'আস বিন কায়েস ও ওয়ায়েল বিন হাজর আল-কিন্দীর সাথে কথা বলতেন। তারা সকলে হাজরমউত ও ইয়ামানের সরদার ছিলো। তাদের মাতৃভাষা ছিলো বিভিন্ন। হামদানীর নিকট লিখিত হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পত্রখানা পাঠ করে দেখুন–

[১]. তিনি অতি সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক অলংকারপূর্ণ হৃদয় স্পর্শী বাক্য উচ্চারণ করতেন। কিন্তু তার অর্থ ছিলো সমুদ্রতুল্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়– اَلصِّدْقُ يُنْجِيْ وَالْكِذْبُ يُهْلِكُ অর্থাৎ সত্য মানুষকে মুক্তি দেয় আর মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে।

তিনি চিঠিতে লিখেছেন,

إِنَّ لَكُمْ فَرَاعَهَا، وَوِهَاطَهَا وَعَزَازَهَا تَأْكُلُونَ عِلَافَهَا، وَتَرْعَوْنَ عَفَاءَهَا، لَنَا مِنْ دِفْئِهِمْ، وَصِرَامِهِمْ مَا سَلَّمُوا بِالْمِيثَاقِ وَالْأَمَانَةِ، وَلَهُمْ مِنَ الصَّدَقَةِ الثِّلْبُ وَالنَّابُ، وَالْفَصِيلُ، وَالْفَارِضُ الدَّاجِنُ، وَالْكَبْشُ الْحَوَارِيُّ، وَعَلَيْهِمْ فِيهَا الصَّالِغُ وَالْقَارِحُ.

–নিশ্চয় তোমাদের এলাকার ভূমি অসমতল ও অনুর্বর। তোমাদের এলাকার সরকারী খাস যমীনে বিচরণকারী জন্তুদের রাখালগণ! তোমরা বিচরণকারী জন্তু ও খেজুর থেকে চুক্তির শর্তানুযায়ী যাকাতের মাল বিশ্বস্ততার সাথে আমাদের নিকট পাঠিয়ে দেবে। প্রাপ্তবয়স্ক উটের বাচ্চা ও বেশী বয়স্ক গাভী যেগুলি চলতে অক্ষম সেগুলি যাকাত হিসেবে পাঠাবে না। লাল রংয়ের ভেড়া ছেড়ে দেবে। ওগুলোর জন্য যাকাত হিসেবে গাভী বা বকরী পাঠাতে হবে। যেগুলোর বয়স দু'বছর হয়েছে, আর পাঁচ বছরের ঘোড়া পাঠাবে।[১]

তিনি ইয়ামানের নাহাদ গোত্রকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

اَللّٰهُم بَارِكْ لَهُمْ فِيْ مَحْضِهَا وَمَخْضِهَا، وَمَذْقِهَا، وَابْعَثْ رَاعِيَهَا فِي الدَّثْرِ، وَافْجُرْ لَهُ الثَّمَدَ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي الْمَالِ وَالْوَلَدِ. مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ كَانَ مُسْلِمًا، وَمَنْ آتَى الزَّكَاةَ كَانَ مُحْسِنًا، وَمَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ كَانَ مُخْلِصًا، لَكُمْ يَا بَنِيْ نَهْدٍ وَدَائِعُ الشِّرْكِ، وَوَضَائِعُ الْمُلْكِ، لَا تُلْطِطْ فِي الزَّكَاةِ، وَلَا تُلْحِدْ فِي الْحَيَاةِ، وَلَا تَتَثَاقَلْ عَنِ الصَّلَاةِ.

–আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে খাঁটি দুধ পানির মতো দান করেছেন। হে আল্লাহ! তাদের দুধে বরকত দান করুন। তাদের বাদশাহকে ঐশ্বর্যশালী করে দিন। তাদের অল্প পানিকে বেশী পানিতে পরিণত করে দিন। তাদের মাল ও সন্তানে বরকত দিন। নামায আদায়কারী, যাকাত

[১]. ক) শিহাব উদ্দীন মিসরী : আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়াহ, প্রথম পরিচ্ছেদ, বাবু ফী কামালি খলকিহী ওয়া জামালি সিফাতিহি, ২:৫৭।
খ) শামী : সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ, বাবু মা'রিফাতিহ বিলাহজাতিল আরবি, ২:১০১।

প্রদানকারী মুসলমানকে নেককার বানিয়ে দিন। যে ব্যক্তি এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই সে হবে সত্যিকার মুসলমান। হে নাহদের বংশধরগণ! শিরকের যুগের আমানতসমূহ তোমাদের নিকট রক্ষিত আছে। তা এভাবে অবশিষ্ট থাকবে। বাদশাহী পুরস্কারও তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে। হুশিয়ার! যাকাত প্রদানে অলসতা করবে না। জীবনযাপনে সীমা অতিক্রম করবে না। নামায আদায়ে অলসতা করবে না।[১]

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে যাকাত প্রদানের নেসাব লিখে পাঠিয়ে দেন,

فِي الْوَظِيفَةِ الْفَرِيضَةِ، وَلَكُمُ الْفَارِضُ وَالْفَرِيشُ، وَذُو الْعِنَانِ الرَّكُوبُ، وَالْفَلُوُّ الضَّبِيسُ، لَا يمنع سَرْحُكُمْ، وَلَا يُعْضَدُ طَلْحُكُمْ، وَلَا يُحْبَسُ دَرُّكُمْ، مَا لَمْ تُضْمِرُوا الرِّمَاقَ، وَتَأْكُلُوا الرِّبَاقَ. مَنْ أَقَرَّ فَلَهُ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ، وَالذِّمَّةِ، وَمَنْ أَبَى فَعَلَيْهِ الرِّبْوَةُ.

–বৃদ্ধ উট, গাভী ও বাছুর এবং সাওয়ারীর কাজে ব্যবহৃত ঘোড়ার জন্য যাকাত দিতে হবে না। আর পাগল ঘোড়ারও যাকাত দিতে হবে না। তোমাদের জন্তু জানোয়ারসমূহকে চারণভূমি থেকে বঞ্চিত করা হবে না। তোমাদের এলাকার বড় বড় বৃক্ষ কাটা হবে না। দুগ্ধবতী প্রাণীকে বাঁধা দেওয়া হবে না। যতদিন তোমরা তোমাদের অন্তরে নিফাক বা কপটতাকে লালন করে না রাখবে এবং প্রকাশ্যে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না করবে। যে ব্যক্তি এ প্রতিশ্রুতির অঙ্গীকার করবে তার কর্তব্য হলো তা পূরণ করা। যে ব্যক্তি এ প্রতিশ্রুতি অস্বীকার করবে তাকে জিজিয়া কর দিতে বাধ্য করা হবে।[২]

তিনি ওয়ায়িল বিন হাজর ও ইয়ামানের বড়ো বড়ো আমীর-উমরাহগণের নিকট প্রেরিত পত্রে উল্লেখ করেছেন,

[১]. ক) শামী : সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ, বাবু মা'রিফাতিহ বিলাহজাতিল আরবি, ২:১০০।
খ) যুরকানী : শরহে যুরকানী আলা মাওয়াহিবিল লাদুনি, প্রথম পরিচ্ছেদ, বাবু ফী কামালি খলকিহী ওয়া জামালি সিফাতিহি, ৫:৪১০।

[২]. ইবনে শিবাহ : তারিখুল মদীনা, আল ওয়াফূদ, ২:৫৬৫।

فِي التِّيعَةِ شَاةٌ، لَا مُقَوَّرَةُ الْأَلْيَاطِ وَلَا ضَنَاكِ، وَأَنْطُوا الثَّبَجَةَ . وَفِي السُّيُوبُ الْخُمُسُ. وَمَنْ زَنَى مِمْ بِكْرٍ فَاصْقَعُوهُ مِائَةً، وَاسْتَوْفِضُوهُ عَامًا، وَمَنْ زَنَى مِمْ ثَيب فضرّجوه بِالْأَضَامِيمِ وَلَا تَوْصِيمَ فِي الدِّينِ، وَلَا عَمَّةَ فِي فَرَائِضِ الله. وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَوَائِلُ بْنُ حُجْرٍ يَتَرَفَّلُ عَلَى الْأَقْيَالِ.

–চল্লিশ বকরীর জন্য একটি বকরী যাকাত হিসেবে দিতে হবে। সেটা মধ্যম অবস্থার হতে হবে। দুর্বলও হবেনা আর বেশী সতেজও হবেনা। যদি তোমরা কোনো গুপ্তধন পেয়ে যাও তাহলে সে গুপ্তধনের এক পঞ্চমাংশ ইসলামী রাষ্ট্রকে প্রদান করবে। তোমাদের কোন যুবক ব্যভিচার করলে তাকে এক'শ বেত্রাঘাত করবে। এবং এক বছরের জন্য দেশান্তর করবে। তবে বিবাহিত কোনো ব্যক্তি ব্যভিচার করলে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করে ফেলবে। দীনের কাজে অলসতা ও উদাসীনতা করবে না। আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত ফরয কাজে কোনো প্রকারে সীমা অতিক্রম করবে না। সকল প্রকার মাদক দ্রব্য হারাম করা হয়েছে। হযরত ওয়ায়েল বিন হাজর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর নামে পত্র প্রেরণ করার কারণে সে গর্ববোধ করেছে।

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট লিখিত পত্রের মুকাবিলায় তার পত্রের ভাষা ছিলো সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এরূপ করার কারণ হলো, ইয়ামানবাসীদের বালাগাত বা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যথোপযুক্ত বাক্য প্রয়োগ ছিলো ব্যতিক্রমধর্মী।

তারা ভিন্ন ধরণের শব্দ ব্যবহার করতো। একারণে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের নিকট প্রেরিত পত্রে তাদের মধ্যে প্রচলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। যাতে তারা প্রেরিত পত্রের মর্মার্থ ভালোভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। তাঁর উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তিনি সে অনুযায়ী কথা বলেছেন। যারা তাঁর মর্যাদা সঠিকভাবে অনুধাবন করেছে তারা বুঝতে সক্ষম হয়েছে তাঁর ভাষা কতো অলংকরণপূর্ণ ছিলো।

যথা হযরত আতীয়া আস্ সা'দী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাদীসে এসেছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْطِيَةُ، وَالْيَدَ السُّفْلَى هِيَ الْمُنْطَاة. قَالَ: فَكَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلُغَتِنَا.

–দাতার হাত গৃহীতার হাত থেকে উত্তম। হযরত আতীয়া (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নির্দ্বিধায় বলে ছিলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের মাতৃভাষায় কথা বলেছেন।

আর হযরত আমেরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে। যখন আমরা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট কোনো বিষয় জানার ইচ্ছা করতাম, তখন তিনি আমাদেরকে বলতেন, سَلْ عَنْكَ أَيْ سَلْ عَمَّا شِئْتَ. وَهِيَ لُغَةُ بَنِي عَامِرٍ "তোমার মাতৃভাষায় জিজ্ঞেস করো"। অর্থাৎ তোমার মন যা চায় তা জিজ্ঞেস করো। বনী-আমেরদের ভাষায় এরূপ প্রচলিত ছিলো যে, যদি কেউ কারো নিকট কোন কিছু জিজ্ঞেস করতো, তখন বলা হতো, "তোমার মাতৃভাষায় জিজ্ঞেস করো"।

এখন কথা হলো তাঁর দৈনন্দিন অলংকারপূর্ণ বাক্য যা সর্বাধিক সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক ও সৌন্দর্যতার রূপায়ণ ছিলো।

তাঁর গাঠনিক পূর্ণতা, বাক্যবলীর বিষয় মানুষ দফতরে দফতরে লিপিবদ্ধ করে জমা করে রেখেছে। তাঁর বক্তব্যের শব্দাবলী ও এর মর্মার্থ বিভিন্ন কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ করে রেখেছে। তাঁর অলংকারপূর্ণ সমষ্টিভূত বাক্যের মুকাবিলায় কারো ভাষা স্থির হয়ে দাঁড়ানোর উপায় ছিল না।

যথা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এ বাণী–

الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ.

–মুসলমানদের রক্ত মর্যাদাপূর্ণ। তাতে ছোট-বড়ো-ধনী-দরিদ্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। অতি নগণ্য কোনো মুসলমান কাউকে যদি নিরাপত্তা প্রদান করে, তাহলে তা যথাযোগ্যভাবে পালন করতে হবে।[১]

অন্যের মুকাবিলায় সকল মুসলমানের হাত ঐক্যবদ্ধ।

[১]. ক) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ২:৪১৯।
খ) বায়হাকী : সুনানুল কুবরা, ৮:২৯।
গ) হাকেম : আল মুস্তাদ্রাক আলাস্ সহীহাইন, ৬:২২৮।

অথবা তাঁর বাণী–

النَّاسُ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ.

–প্রত্যেক মুসলমান চিরুনীর দাঁতের মতো সমান।[১]

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ.

–যে ব্যক্তি যাকে ভালোবাসবে সে তার সাথী হবে।[২]

لَا خَيْرَ فِي صُحْبَةِ مَنْ لَا يَرَى لَكَ مَا تَرَى لَهُ.

–ঐ ব্যক্তির সংশ্রবে কোন কল্যাণ নেই যে তোমার জন্য তা পছন্দ করে না, যা নিজের জন্য পছন্দ করে।[৩]

وَالنَّاسُ مَعَادِنُ.

–মানুষ স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনির মতো।[৪]

مَا هَلَكَ امْرُؤٌ عَرَفَ قَدْرَهُ.

–যে নিজের মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞাত সে ধ্বংস হয়না।

اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ وَهُوَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، رَحِمَ اللهُ عَبْدًا قَالَ خَيْرًا فَغَنِمَ، أَوْ سَكَتَ فَسَلِمَ.

–যার নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহন করা হয় সে উক্ত কথার আমানাতদার। কেননা এ বিষয় কথা বলা না বলা তার ব্যক্তিগত ইখতিয়ার। আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির প্রতি কৃপা করেন যে উত্তম কথা বলে। যদি সত্যই এরূপ করে তাহলে সে গণিমত লাভ করল। আর নীরবতা অবলম্বনকারী নিরাপত্তা লাভ করল।

[১]. কাযাযী : মুসনাদুশ্ শিহাব, ১:১৪৫।
[২]. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু আলামাতি হুব্বিল্লাহ, ৮:৩৯।
খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবুল মারয়ি মা'আ মান আহাব্বা, ৪:২০৩৪।
গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৩:১০৪।
[৩]. আবু শায়খ ইস্পাহানী : আমসালুল হাদীস, ১:৮৫।
[৪]. বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু আলামাতিন্ নবুয়াতি ফীল ইসলাম, ৪:১৯৬।
[অর্থাৎ খনি থেকে উত্তোলিত স্বর্ণরূপা যেভাবে এক প্রকার হয়না। কোনোগুলো উন্নতমানের আবার কোনোটা নিম্নমানের। অনুরূপভাবে মানুষের মাঝেও স্বভাব চরিত্রের দিক থেকে ব্যতিক্রম রয়েছে। কারো স্বভাব উত্তম। আবার কারো স্বভাব নিকৃষ্ট প্রকৃতির।]

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এমন বাণী–

أَسْلِمْ تَسْلَمْ ﴿أَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ﴾ .

–নিরাপত্তা দিলে নিরাপত্তা পাবে। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দ্বিগুণ সাওয়াব দান করবেন।[১]

إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجَالِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، الْمُوَطَّؤُونَ أَكْنَافًا، الَّذِينَ يَأْلَفُونَ وَيُؤْلَفُونَ.

–তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আমার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয় যার চরিত্র উত্তম আর সে কিয়ামতে আমার সর্বাপেক্ষা বেশী নিকটবর্তী হবে। বিনয়ী ও ধৈর্য্যশীল ব্যক্তি মানুষের নিকট পছন্দনীয়। আর সে নিজেও মানুষকে মুহাব্বত করে।[২]

অপর এক ব্যক্তি সম্পর্কে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

لَعَلَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِمَا لَا يَعْنِيهِ وَيَبْخَلُ بِمَا لَا يُغْنِيهِ.

–যে অশ্লীল কথা বলে সকল কাজে কৃপণতা করে তার কোনো মর্যাদা নেই।[৩]

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এরূপ বলা যে,

ذُو الْوَجْهَيْنِ لَا يَكُونُ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا.

–দ্বি-মুখী ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট পছন্দনীয় হয় না।[৪]

আর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে জিজ্ঞেসের প্রেক্ষিতে ব্যক্ত ঐ সকল বাণী যথা–

---

১. ক) জালাল উদ্দীন সুয়ূতী : তাফসীরে সা'লাবী, ২:৩৪০।
   খ) ইবনে হাজর : ফতহুল বারী, বাবু তা'লিমির রজুলি উম্মাতিহি ওয়া আহলিহি, ১:১৯১।
   গ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃ. ১৮৪।
২. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফী মু'আলিমি আখলাক, ৭:৩০৯।
   খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, প্রথম পরিচ্ছেদ, বাবুস্ সালাম, পৃ. ৪০।
   গ) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ৯:৩৭।
৩. ক) বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, বাবু ফসলি ফী মা ইয়াকুনুল আতাস..., ২২:২৪৫।
   খ) শামী : সুবুলুল হুদা ওয়ার্ রশাদ, বাবু ফী ফাসাহাতিহি, ২:৯৬।
৪. ক) বদরুদ্দীন আইনী: উমদাতুল কারী শরহে সহীহুল বুখারী, বাবু মা ক্বিলা ফী যিল ওয়াজহাইন, ৩২:২৩৯।
   খ) মালেকী : মুশারিকুল আনোয়ার আলা সহীহিল আসার, ২:৫৬২।
   গ) শামী : সুবুলুল হুদা ওয়ার্ রশাদ, ২:৯৬।

وَنَهْيُهُ عَنْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَمَنْعٍ وَهَاتِ وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ وَوَأْدِ الْبَنَاتِ.

–সমালোচনা করা, অধিক প্রশ্ন করা, অপচয় করা, অতি ক্ষুদ্র জিনিস না দেওয়া, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া, কন্যা সন্তানকে জীবিত কবর দেয়াকে তিনি নিষেধ করেছেন।[১]

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এরূপ বলা যে,

اتَّقِ اللهَ حَيْثُ كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ.

–সর্ব অবস্থায় আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো। যদি তোমার দ্বারা কোনো গুনাহের কাজ হয়ে যায় তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে নেকীর কাজ কর। কেননা সৎকর্ম গুনাহকে মিটিয়ে দেয়। মানুষের সাথে সদাচরণ ও উত্তম ব্যবহার করো।[২]

خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَاطُهَا.

–মধ্যমপন্থাই উত্তম।[৩]

أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا، عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا.

–বন্ধুর সাথে বন্ধুত্বের সমতা রক্ষা করো। হতে পারে কখনো সে তোমার শত্রু হয়ে যাবে।[৪]

---

১. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু মা ইয়াকরাহু মান ক্বিলা ওয়া ক্বালা, ২০:১১৩।
   খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৩৭:১৩৯।
   গ) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ১৫:৩১৫।
   ঘ) তাবরানী : মু'জামুল আওসাত, বাবুল মীম মিন ইসমিহী, ১৬:২৫০।
   ঙ) ইবনে হুযাইমা : আস্ সহীহ, বাবুত্ তাহলীলে ওয়াস্ সানায়ি, ৩:২০৯।
২. ক) হাকেম : আল মুস্তাদ্রাক, ১:১২১।
   খ) কাযায়ী : মুসনাদুশ্ শিহাব, বাবু কুলিল হাক্কি ওয়া ইন কানা মাররান, ১:৩৭৯।
৩. ক) ইবনে আবী শায়বা : আল মুসান্নাফ, ১৩:৪৭৯।
   খ) আবু নঈম ইস্পাহানী : হিলিয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবকাতুল আসফিয়া, ২:২৮৬।
   গ) বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, বাবুল ইকতিসাদ ফীন্ নুফকাহ, ৮:৫১৮।
৪. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফীল ইকতিসাদ, ৩:৪২৮।
   খ) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ১৩:৭০।
   গ) বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, বাবু ফসলি ফী সিওয়াকি লি ক্বিরআতিল কুরআন, ৫:২৬০।

الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

–জুলুম কিয়ামতের মাঠে অন্ধকারের কারণ হবে।[১]

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কোনো দোয়াসমূহে এরূপ দোয়া করা যে,

اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ، تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، تَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَعَثِي، وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِي، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي، وَتُلْهِمُنِي بِهَا رُشْدِي، وَتَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِي، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ؛

اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْفَوْزَ عِنْدَ الْقَضَاءِ، وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ، وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ، وَالنَّصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ.

–হে আল্লাহ! আমি তোমার রহমত কামনা করি, যা তোমার নিকট রয়েছে। তুমি আমার ব্যাকুলতাকে স্থিতিশীল করে দাও। আমার ক্লান্তিকে বিদূরিত করে দাও। আমার অন্তর সঠিক করে দাও। আমার বাহ্যিক বিষয়াদি সমুন্নত করে দাও। আমার আমল পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে দাও। আমাকে সঠিক পথে অবিচল রাখো। আমার মুহাব্বতকে তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করে দাও। আমাকে সকল প্রকার অনিষ্ট হতে হেফাযত করো। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তাকদীর কার্যকরী হবার বিষয়ে সফলতা কামনা করি। মেহমানদারী করার সুযোগ নেক জীবনযাপন ও শত্রুর উপর বিজয়ী হবার জন্য তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি।[২]

অনুরূপভাবে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণীসমূহ, ভাষণ দান, আলোচনা অনুষ্ঠান করা, দোয়ার মাহফিলে দোয়া করা, বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা, বিভিন্ন বিষয়ে চুক্তিপত্র স্থাপন করা ইত্যাদি বিষয়ে হাদিস বিশারদগণ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তবে তাঁরা সকলে এ বিষয় ঐক্যমতে উপনীত হয়েছেন

[১]. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবুয্ যুলমি যুলমাতুন ইয়াওমাল ক্বিয়ামাহ, ৮:৩১৯।
খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু তাহরিমীয্ যুলমি, ১২:৪৫৬।
গ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুল ইনফাক্বি ওয়া কারাহিয়্যেতিল ইমসাক, ১:৪২০।

[২]. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, ১২:৩৩৯।
খ) তিরমিযী : আস্ সুনান, ৫:৪৮২।
গ) বায্যার : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি ইবনে আব্বাস, ১১:৩৯৬।

যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র অলঙ্কাকারপূর্ণ বানীসমূহ অতুলনীয় ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। যার উদাহরণ পেশ করা মানুষের পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

তাছাড়া হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জবান মুবারক থেকে নিঃসৃত বাণী কতো উচ্চাঙ্গের মর্যাদাসম্পন্ন ছিলো তা কল্পনাই করা যায়না। আর না কোনো মানুষের পক্ষে সেই বাণীর মতো বাণী পেশ করা সম্ভব ছিলো।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এরূপ বলা যে, حَمِيَ الْوَطِيسُ - চুলা প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। অর্থাৎ যুদ্ধ তুমুল হয়ে উঠেছে। যথা مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ - তার নিজের হাতে মরণ হয়েছে। অথবা এরূপ বলা لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ - মুমিন এক গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হবেনা। অথবা তাঁর এরূপ বলা যে, السَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ - সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যে অন্যের থেকে উপদেশ গ্রহণ করে।

অনুরূপভাবে তাঁর আরও অসংখ্যবাণী যেগুলির বিষয়বস্তু মানুষকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়েছে। এ ধরণের বাক্য উচ্চারণ করতে দুনিয়ার মানুষের কণ্ঠ স্তব্দ হয়ে পড়েছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর স্বাভাবিক কালামের অবস্থা যদি এরূপ বিস্ময়কর হয়ে থাকে তা হলে তাঁর বুনিয়াদী ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কালামের স্থান কতো উর্ধ্বে ছিলো। সত্যিই তা অকল্পনীয়। তাঁর কালামে অভিভূত হয়ে সাহাবায়ে কেরাম বলেছেন,

مَا رَأَيْنَا الَّذِي هُوَ أَفْصَحُ مِنْكَ.

–আমরা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চেয়ে অধিক বাগ্মী ও অলঙ্কারগুণসম্পন্ন অন্য কাউকে দেখিনি।

সাহাবীদের এ উক্তি মিথ্যা নয়। আর না এ বিষয়ে সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ রয়েছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

وَمَا يَمْنَعُنِي؟ وَإِنَّمَا أُنْزِلَ الْقُرْآنُ بِلِسَانِي، لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ.

–কোন বস্তু আমাকে অলংকারগুণসম্পন্ন বাক্যালাপ করতে বাধা দেবে। পবিত্র কুরআন মাজীদ নিশ্চয় আমার মাতৃভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। যা প্রাঞ্জল আরবী ভাষা।[১]

একবার হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন,

أَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ بِيْدَ أَنِّي مِنْ قُرَيْشٍ، وَنَشَأْتُ فِي بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ.

–আরববাসীদের মধ্যে আমিই সর্বাধিক অলংকারগুণসম্পন্ন ব্যক্তি। কেননা আমি কুরাইশদের সাথে সম্পৃক্ত। আমি বাল্যকালে লালিত-পালিত হয়েছি বনী-সা'আদ গোত্রে।[২]

ঐ গোত্র ছিলো আমার ধাত্রী মাতা হযরত হালিমা সাদীয়া (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) এর গোত্র। এর ফলশ্রুতিতে আমার কথায় বেদুঈনের ভাষা প্রয়োগের ধাঁচ আর শহরবাসীদের ভাষার অলংকরণ ও মাধুর্যতা উভয় সৌন্দর্যের সন্নিবেশ ঘটেছে। আমার এ দৃঢ়তা খোদায়ী সাহায্য স্বরূপ ওহীর সমাবেশ হয়েছে।

এই ঐশী ক্ষমতা কোনো মানুষ লাভ করতে পারেনি। হযরত উম্মে মা'বদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রশংসনীয় গুণাবলী উল্লেখ করে বলেন,

حُلْوُ الْمَنْطِقِ، فَصْلٌ، لَا نَزْرٌ، وَلَا هَذْرٌ كَأَنَّ مَنْطِقَهُ خَرَزَاتٌ نُظِمْنَ. وَكَانَ جَهِيرَ الصَّوْتِ، حُسْنَ النَّغْمَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কণ্ঠস্বর ছিলো সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক। তিনি বেশী কথা বলতেন না। আর প্রয়োজনের চেয়ে কমও বলতেন না। তাঁর বাক্যগুলো মুক্তার ন্যায় পৃথক পৃথক গণনা করা সম্ভব হতো। তাঁর আওয়াজ ছিলো উচ্চ ও মাধুর্যপূর্ণ। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।[৩]

---

১. ক) সালেহী : কানযুল উম্মাল, ৬:১৭৪।
খ) শামী : সুবুলুল হুদা ওয়ার্ রশাদ, ২:৯৯।

২. ক) কাতী : শরহুস্ সুন্নাহ, বাবু ফযায়িল জুমু'আ, ৪:২০২।
খ) বায়হাকী : দালায়িলুন্ নবুয়াত, বাবু মা আসাবান্ নবী, ৩:৪৩২।

৩. ক) হাকেম : আল মুস্তাদ্রাক আলাস্ সহীহাইন, বাবু মা হাযিহিশ্ শাতি..., ১০:৫৮।
খ) বায়হাকী : দালায়েলুন্ নবুয়াত, বাবু হাল বিহা মিন লাবানিন..., ১:২৬৬।
গ) ইবনে কাসীর : আস্ সিরাতুন্ নবভীয়্যাহ, ২:২৬১।

ষষ্ট পরিচ্ছেদ

شَرَفُ نَسَبِهِ وَكَرَمُ بَلَدِهِ وَمَنْشَئِهِ

হুযুর (ﷺ) এর বংশীয় কৌলিণ্য ও মর্যাদা

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বংশমর্যাদা, জন্মভূমি ও জন্মস্থানের মর্যাদা কতো মহিমান্বিত ও সুউচ্চ তা প্রমাণ উপস্থাপনের অপেক্ষা রাখেনা। সে বিষয়ে সারা বিশ্বের লোকজন অবহিত। তিনি বনী-হাশেম গোত্রের সর্বাধিক মনোনীত ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। যা কুরাইশ বংশের মূলের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো। তাঁর সম্মানিত মাতা-পিতা উভয় বংশ মর্যাদায় আভিজাত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি পবিত্র মক্কা নগরীর বাসিন্দা ছিলেন। পবিত্র মক্কা নগরী সারা বিশ্বের শহরসমূহ ও তাদের অধিবাসীদের নিকট শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাপূর্ণ শহর।

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ مِنْهُ.

–আমি আদম সন্তানদের প্রত্যেক যুগের সর্বোত্তম শ্রেণীতে যুগের পর যুগ স্থানান্তরিত হয়ে এসেছি। অবশেষে ঐ যুগে জন্মগ্রহণ করি যে যুগে আমি বর্তমানে আছি।[১]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে, একদা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِهِمْ مِنْ خَيْرِ قَرْنِهِمْ ثُمَّ تَخَيَّرَ الْقَبَائِلَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ قَبِيلَةٍ ثُمَّ تَخَيَّرَ الْبُيُوتَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ بُيُوتِهِمْ فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمَا بَيْتًا،

---

১. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু সিফাতি খলক্বি রাসূলিল্লাহ, ৩:১৪৯৬।
খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু ফাযায়িলি সায়্যিদিল মুরসালীন, পৃ. ২৪৭।
গ) আহমদ ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু মুসনাদে আবী হুরাইরা, ১৮:৪৪।
ঘ) বায়হাকী : দালায়িলুন্ নবুয়াত, ১:৯৭।

–আল্লাহ তা'আলা যখন সমস্ত মাখলূক সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি আমাকে সর্বোত্তম সৃষ্টির ও সর্বোত্তম যুগের অন্তর্ভুক্ত করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা গোত্রসমূহের প্রতি লক্ষ্য করেন, আমাকে সর্বোত্তম গোত্রে সৃষ্টি করেন। অতঃপর পরিবারের প্রতি লক্ষ্য করেন। তন্মধ্যে সর্বোত্তম পরিবারে আমাকে সৃষ্টি করেন। অতএব আমি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উভয় দিক থেকে উত্তম।[১]

হযরত ওয়াসিলা বিন আসকা' (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

إن اللهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ بَنِي كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ،

–আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) এর বংশে হযরত ইসমাঈল (আলাইহিস্ সালাম) কে মনোনীত করেছেন। অতঃপর হযরত ইসমাঈল (আলাইহিস্ সালাম) এর বংশে বনু কেননাকে মনোনীত করেন। অতঃপর কেননার খান্দান হতে কুরাইশ বংশকে মনোনীত করেন। অতঃপর কুরাইশ বংশ হতে বনু হাশেম পরিবারকে মনোনীত করেন। অতঃপর বনু হাশেমের সবচেয়ে অভিজাত পরিবার থেকে আমাকে মনোনীত করেন।[২]

ইমাম তিরমিযী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এই হাদিস সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিক তাবারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) হযরত ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ اخْتَارَ خَلْقَهُ فَاخْتَارَ مِنْهُمْ بَنِي آدَمَ ثُمَّ اخْتَارَ بَنِي آدَمَ فَاخْتَارَ مِنْهُمُ الْعَرَبَ ثُمَّ اخْتَارَ الْعَرَبَ فَاخْتَارَ مِنْهُمْ قُرَيْشًا ثُمَّ اخْتَارَ قُرَيْشًا فَاخْتَارَ

[১]. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ফদ্বলিন্ নবী, ১২:৫৩।
খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৪:২১৯।
গ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু ফদ্বলি সায়্যিদিল মুরসালীন, ২৫১।

[২]. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ফী ফদ্বলিন্ নবী, ৬:৫।
খ) আবু শায়বা : আল মুসান্নাফ, ৭:১২২।
গ) ইবনে কাসীর : আস্ সিরাতে নববিয়্যাহ, বাবু যিকরি নিসবাতিশ্ শরীফ..., ১:১৯১।

مِنْهُمْ بَنِي هَاشِمٍ ثُمَّ اخْتَارَ بَنِي هَاشِمٍ فَاخْتَارَنِي مِنْهُمْ فَلَمْ أَزَلْ خِيَارًا مِنْ خِيَارٍ أَلَا مَنْ أَحَبَّ الْعَرَبَ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَ الْعَرَبَ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ.

–আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মাখলূকাতকে মনোনীত করার ইচ্ছে করেন এবং মাখলূকাতের মধ্যে ইনসানকে মনোনীত করেন। অতঃপর মানুষদের মধ্যে আরবদের নির্বাচিত করেন। আরবদের মধ্যে কুরাইশদের নির্বাচিত করেন। কুরাইশদের মধ্যে বনু হাশেমকে মনোনীত করেন এবং তাদেরকে সবচেয়ে বেশী সম্মান প্রদান করেন। সুতরাং এভাবে আমি পবিত্র বংশে স্থানান্তরিত হতে থাকি। তোমরা ভালো করে স্মরণ করো, তোমরা যারা আরবীয়দের মুহাব্বত করবে তারা যেনো আমাকে মুহাব্বত করলে। যারা আরবদের সাথে শত্রুতা পোষণ করছো তারা যেনো আমার সাথে শত্রুতা পোষণ করছো।[১]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত আদম (আলাইহিস্ সালাম) কে সৃষ্টি করার দু'হাজার বছর পূর্বে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রূহ মুবারক নূরের আকৃতিতে আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত করে রাখা হয়। তখন সেই মুবারক নূর আল্লাহ তা'আলার যিকিরে মশগুল ছিলো। তাঁর তাসবীহ পাঠ শুনে ফিরিশতারা তাসবীহ পাঠ করত। অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আলাইহিস্ সালাম) কে সৃষ্টি করেন এবং সেই মুবারক নূর তাঁর পিঠে স্থানান্তরিত করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

فَأَهْبَطَنِي اللهُ إِلَى الْأَرْضِ فِي صُلْبِ آدَمَ وَجَعَلَنِي فِي صُلْبِ نُوحٍ وَقَذَفَ بِي فِي صُلْبِ إِبْرَاهِيمَ ثُمَّ لَمْ يَزَلِ اللهُ تَعَالَى يَنْقُلُنِي مِنَ الْأَصْلَابِ الْكَرِيمَةِ وَالْأَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ حَتَّى أَخْرَجَنِي مِنْ أَبَوَيَّ لَمْ يَلْتَقِيَا عَلَى سِفَاحٍ قَطُّ.

[১]. ক) শিহাবুদ্দীন : আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যাহ, বাবু তাহারাতি নসবিহি, ১:৫৮।
খ) ইউসুফ নাবহানী : ওয়াসায়িলিল উসূল ইলা শ্যামায়িলির রসূল, প্রথম পরিচ্ছেদ, বাবু নসবিহিশ শরীফ, ১:৪৯।

–আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আলাইহিস্ সালাম) এর পৃষ্ঠে রেখে আমাকে দুনিয়াতে অবতরণ করেন। অতঃপর আমাকে হযরত নূহ (আলাইহিস্ সালাম) এর পৃষ্ঠে স্থানান্তর করেন। হযরত নূহ (আলাইহিস্ সালাম) থেকে হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) এর পৃষ্ঠদেশে আমাকে স্থানান্তর করেন। হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) থেকে আমি ধারাবাহিকভাবে সম্মানিত পৃষ্ঠদেশ ও পবিত্র রেহেম (গর্ভে) সমূহে স্থানান্তরিত হতে থাকি। এভাবে অবশেষে আমার মাতা-পিতার মাধ্যমে আমাকে প্রকাশ করেন। আমার পূর্ব পুরুষগণ কেউ কখনো অসৎকর্মে লিপ্ত হননি।[১]

এ হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা ও বিশুদ্ধতার প্রমাণ হলো হযরত আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) এর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রশংসায় রচিত কবিতাসমূহ।

[১]. জালাল উদ্দীন সুয়ূতী : খাসায়েসে কুবরা, বাবু লাতিফাতি উখরা ফী আন আখযাল মিসাক, ১:৬৬।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

حَالَتُهُ فِي الضَّرُوْرِيَاتِ ﷺ

হুযুর (ﷺ) এর পবিত্র জীবনযাপন

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র জীবনযাপন সম্পর্কে আমি পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাঁর জীবন যাপনের পদ্ধতি তিন প্রকার। এক. অল্পে পরিতুষ্টি লাভ করার মর্যাদা। দুই. মর্যাদায় আধিক্য। তিন. তাঁর অবস্থা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের হওয়া। তবে একথা সর্বস্বীকৃত যে, জীবন যাপনে অল্পে পরিতুষ্টি লাভ করা প্রশংসনীয় কাজ। অভ্যাস ও শরীয়াত উভয়ে এ কথার সমর্থন রয়েছে যে, অধিক শয়ন ও অধিক পানাহার উত্তম নয়।

ইসলাম পূর্ব যুগে আরবের জ্ঞানী-গুণী লোকেরা কম নিদ্রা ও স্বল্প পানাহারের প্রশংসা করতো। অধিক পানাহার ও শয়ন তাদের নিকট নিন্দনীয় ছিলো। কেননা অতিরিক্ত পানাহার লোভ ও কাম প্রবৃত্তির দাসত্বেও প্রমাণ। এর ফলে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রভূত পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। যথা অধিক পানাহারে অসুস্থতা দেখা দেয়, দেহ মোটা ও মস্তিষ্ক মেধাশূন্য হয়। আর কম আহার ও অল্পে পরিতুষ্টি লাভ পছন্দনীয় ও নিজের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও কামভাব দমনের প্রমাণ। এর ফলে দেহ ও মন সুস্থ থাকে। স্বভাব ও চিন্তা চেতনায় শক্তি বৃদ্ধি লাভ করে। অনুরূপ অধিক শয়ন করা দুর্বলতা ও অক্ষমতার প্রমাণ। এর ফলে মস্তকে অলসতা ও অবসন্নতা দেখা দেয়। মানবজীবন অনর্থক কাজে নষ্ট হয়ে যায়। যার কারণে অন্তরে কঠোরতা ও অলসতা দেখা দেয়ার ফলে মানব আত্মার অপমৃত্যু হয়।

ওইসব বিষয় অনন্তর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও নির্ভরযোগ্য ঘটনাবলীর মাধ্যমে প্রতিনিয়ত প্রমাণিত হয়ে আসছে। প্রাচীনকাল থেকে এ সমস্ত বিষয়ের যথার্থতা বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। প্রাচীনকালের জ্ঞানী গুণী ও আরবের প্রাচীন কবি সাহিত্যিকদের কবিতা ও কাব্যে এ বিষয়ের অসংখ্য উদাহরণ বিদ্যমান। সহীহ হাদিসসমূহ ও পূর্ববর্তী আলেমদের বক্তব্যে এ ব্যাপারে এতো বেশী প্রমাণ বিদ্যমান পাওয়া যায় যাতে এ সম্পর্কে অতিরিক্ত দলিল-প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। একারণে এ বিষয় আমি বিস্তারিত আলোচনা না করে বিষয়টি সংক্ষিপ্ত করা যথেষ্ট মনে করি।

কেননা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই পানাহারে অংশ নিয়েছেন। আর তাঁর সীরাত মুবারকের বৈশিষ্ট্য হলো যে, এ বিষয়কে তাঁর সীরাত মুবারক থেকে আলাদা করা কোনো মতেই সম্ভব নয়। কেননা তিনি শুধু নিজে এগুলোর উপর আমল করেননি বরং তিনি অন্যান্যদেরকেও এরূপ করার আদেশ দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। বিশেষ করে এ দু'টি বিষয় (পানাহার ও শয়ন) একটি অপরটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

যেমন হযরত মিকদাদ বিন মা'দী কারাব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

مَا مَلأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ، حَسْبُ ابْنُ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ،

فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ.

–সব চেয়ে নিকৃষ্ট পাত্র হলো পেট যা মানুষ পূর্ণ করে। মানুষের ঐ কয়েক লোকমাই যথেষ্ট যা তার মেরুদণ্ডকে সঠিকভাবে দাঁড়িয়ে রাখতে সক্ষম করে তোলে। কিন্তু যদি এর বিপরীতে খাবার খাবারই হয়, তাই তার উচিত হলো পেটের এক তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানি পানের জন্য আর অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের জন্য খালি রাখা।[১] কেননা অধিক পানাহারে নিদ্রাও বেশী হয়।

এ প্রসঙ্গে হযরত সুফিয়ান সাওরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন,

بِقِلَّةِ الطَّعَامِ يُمْلَكُ سَهَرُ اللَّيْلِ.

–কম আহারের মাধ্যমে অতি প্রশান্তভাবে রাত্রিজাগরণের শক্তি সঞ্চার হয়। (অর্থাৎ প্রশান্তির সাথে রাতে ইবাদত করতে পারে)।

কোনো কোনো পূর্ববর্তী ওলামাদের অভিমত হলো যে,

لَا تَأْكُلُوا كَثِيرًا فَتَشْرَبُوا كَثِيرًا فَتَرْقُدُوا كَثِيرًا فَتَخْسَرُوا كَثِيرًا.

–অতিরিক্ত খাদ্য খাবেও না, আর অতিরিক্ত পানিও পান করবেনা। নচেৎ বেশী সময় শুয়ে থাকতে হবে এবং বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে।

[১]. ক) তাবরানী : মুসনাদুশ্ শামেয়ীন, বাবু মা ইনতাহা ইলাইনা মিন মুসনাদি মুহাম্মদ, ৬:৫১।
খ) সালেহী : সুবুলুল হুদা ওয়ার্ রশাদ, ১২:১০২।

বর্ণনাসমূহে এসেছে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন, সবচেয়ে পছন্দনীয় হলো ঐ খাবার, যে খাবারের উপর অধিক হাত পড়ে। অর্থাৎ অনেক লোক একত্রিত হয়ে যে খাবার খায়।

হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) থেকে বর্ণিত আছে,

لَمْ يَمْتَلِئْ جَوْفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَعًا قَطُّ، وَأَنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ لَا

يَسْأَلُهُمْ طَعَامًا وَلَا يَتَشَهَّاهُ إِنْ أَطْعَمُوهُ أَكَلَ وَمَا أَطْعَمُوهُ قَبِلَ وَمَا سَقَوْهُ

شَرِبَ.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনো উদর পূর্তি করে আহার করেননি। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গৃহে তাশরীফ এনে আমাদের নিকট খাবার চেয়ে খেতেন না। আমরা যা খেতে দিতাম তিনি তা খেতেন। আমরা যা পান করতে দিতাম তিনি তাই পান করতেন।[১] এ হাদিসকে হযরত বারীরা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাদীসের বিপরীত বলা যাবেনা।

যে বর্ণনায় বলা হয়েছে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ فِيهَا لَحْمٌ.

–আমি দেখতে পাচ্ছি যে, চুলায় গোশত রান্না করা হচ্ছে।[২]

এ কারণে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুধাবন করেছেন যে, সাদকার গোশত তাঁরা আমার জন্য হারাম মনে করেছে। তখন তিনি সুন্নাতের প্রয়োগ প্রয়োজন ও যৌক্তিক মনে করেন। তাঁর ধারণা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। তিনি তাদেরকে সঠিক মাসায়ালা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে এরশাদ করেন,

[১]. ক) শিহাবুদ্দীন : আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যাহ, ২:১৪৫।
খ) ইউসুফ বিন নাবহানী : ওয়াসায়িলিল উসূল ইলা শামায়িলির্ রসূল, বাবু ওয়া আম্মা খুবযির রসূল, ১:১৫৫।
[একদা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গৃহে তাশরীফ এনে খাবার খেতে চান। পূণ্যবর্তী স্ত্রীগণ বললেন ঘরে খাবার কিছুই নেই। তাঁর মুবারক দৃষ্টি চুলার দিকে পড়ে। চুলার উপর এক হাড়ি গোশত রান্না করা হচ্ছে। তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন চুলায় কী রান্না করা হচ্ছে? তাঁরা বললেন, এগুলো হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বাঁদী হযরত বারীরা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) এর দেয়া গোশত। যা আপনার জন্য হালাল নয়। গ্রন্থকার বলেন– বাহ্যিক দৃষ্টিতে হযরত বারীরা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাদীস হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) এর হাদীসের বিপরীত বলে মনে হয়। বাস্তবে কিন্তু তা নয়।]
[২]. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু লা ইয়াকুনু বাইউল আমাতি তৃলিকান, ১৬:৩২৬।
খ) নাসায়ী : আস্ সুনান, ৩:৩৬৪।

هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.

–এই গোশত বারীরার জন্য সাদকা, কিন্তু আমার জন্য হাদিয়া নয়।[১]

হযরত লোকমান (আলাইহিস্ সালাম) এর উপদেশপূর্ণ বাণীসমূহের মধ্যে এটাও ছিলো যে, তিনি স্বীয় পুত্রকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

يَا بُنَيَّ إِذَا امْتَلَأَتِ الْمِعْدَةُ نَامَتِ الْفِكْرَةُ وَخَرِسَتِ الْحِكْمَةُ وَقَعَدَتِ الْأَعْضَاءُ عَنِ الْعِبَادَةِ.

–হে বৎস! যখন আহারের কারণে পাকস্থলি পরিপূর্ণ হয়ে যায় তখন চিন্তাশক্তি নিস্তেজ হয়ে যায়। বুদ্ধিমত্তা বধির হয়ে যায়। এ অবস্থায় দেহ ইবাদত করতে অপারগ হয়ে যায়।

হযরত সাহনুন (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন,

لَا يَصْلُحُ الْعِلْمُ لِمَنْ يَأْكُلُ حَتَّى يَشْبَعَ.

–যে উদরপূর্ত করে আহার করে তাকে কোন জ্ঞান সংশোধন করতে পারে না।

সহীহ হাদিসসমূহে বর্ণিত আছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ مُتَّكِئًا.

–আমি ঠেস দিয়ে বসে আহার করিনা।[২]

হেলান দিয়ে বসার নমুনা হলো এরূপ মানুষ আটঁসাট হয় পেছনে কোনো কিছুর সাথে হেলান দিয়ে বসা। এ অবস্থায় বসলে পুরো নিশ্চয়তার সাথে বসা যায় আর তখন দেহের উপরের অংশের পুরা চাপ দেহের নিচের অংশের উপরে পড়ে। এ

[১]. প্রাগুক্ত;
[বিধান হলো এই যে, যদি কেউ কোনো মিসকীনকে কোনো কিছু সাদকা হিসেবে দান করে তাহলে সে মিসকীন তার মালিক হয়ে যায়। পরে মিসকীন যদি ইচ্ছা করে তাহলে সে সাদকার মাল যে কোনো সম্পদশালী ব্যক্তিকে হাদিয়া বা উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করতে পারবে। কেননা ওটা মিসকীনদের জন্য সাদকা। কিন্তু তা ওই বিত্তবানের জন্য হাদিয়া হবে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ ঘটনায় এ মাসায়ালাকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করার ইচ্ছা করেন। এ কারণে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খাবার খেতে চান। তাঁকে গোশত খেতে না দেয়ায় তিনি জানতে চাইলেন এগুলো কিসের গোশত রান্না করা হচ্ছে?]

[২]. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফী কারাহিয়্যাতিল আকলি, ৩:৩৩৭।
খ) বায্যার : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদে আবী হুযাইফা, ১০:১৪৭।
গ) তাবরানী : মু'জামুল আওসাত, ৭:৮৪।

অবস্থায় উপবিষ্ট ব্যক্তি বেশী পরিমাণে আহার করতে সক্ষম হয় কিন্তু হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন খেতে বসতেন তখন আকুঞ্চন বসতেন।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ.

–নিশ্চয় আমি বান্দা, অতএব বান্দা যেভাবে খায় আমিও সেভাবে খাই। আর বান্দা যেভাবে বসে আমিও সেভাবে বসি।[১]

সত্যান্বেষী আলেমদের মতে, হেলান দেয়া সংক্রান্ত হাদীসের অর্থ এরূপ নয় যে, একদিকে ঝুকে বসা যাবেনা।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ঘুমানোর অবস্থাও ছিলো অনুরূপ। এ সম্পর্কিত বহু সহীহ হাদিস বর্ণিত আছে। যথা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي.

–আমার চোখ দুইটি ঘুমায়, কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না।[২]

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ডান দিকে কাত হয়ে শয়ন করতেন। এভাবে শয়ন করার কারণ হলো কম শয়নের অভ্যাসে অভ্যস্ত হওয়া। কেননা বামদিকে কাত হয়ে শয়ন করলে ক্বালব নীচে নেমে যায়। ফলে দেহের আভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহ গভীর নিদ্রায় সুষুপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে স্বভাবে অলসতা পরিলক্ষিত হয়। আর নিদ্রা গভীর ও দীর্ঘায়িত হয়। এর বিপরীতে যদি ডান দিকে কাত হয়ে শয়ন করে তাহলে ক্বালব নিচে না হওয়ার কারণে অচেতন হয়না। এভাবে শয়ন করলে নিদ্রা থেকে সহজে জাগ্রত হওয়া যায়। সার্বিকভাবে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হবার ভয় থাকেনা।[৩]

[১]. ক) আহমদ ইবনে হাম্বল : আয্ যুহদ, ১:২০।
খ) ইস্পাহানী : আখলাকুন্ নবী, ২:১৩৪।
[হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খাবার খেতে বসলেও বিনয় ও নম্রতার সাথে বসতেন। তিনি সম্পূর্ণভাবে এমনভাবে বসতেন যেমন কোনো গোলাম তার মনিবের সামনে আদবের সাথে বসে আছে বা আহার করছে।]

[২]. ক) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু সালাতিন্ নবী, ২:১৬৪।
খ) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু ক্বিয়ামিন নবী, ২:৫৩।
গ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু সালাতিল লাইলি..., ১:৫০৯।
ঘ) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু ফী সালাতিল লাইলি, ২:৪০।
ঙ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফী ওয়াসফি সালাতিন নবী, ১:৫৬৩।

[৩]. আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান অনেক উন্নত হয়েছে। প্রতিদিন নতুন নতুন বিষয় নিয়ে গবেষণা করছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞগণ ক্বালব বা হার্টের ব্যাপারে এ মন্তব্যে একমত হয়েছে যে, বাম দিকে কাত হয়ে শয়ন

অষ্টম পরিচ্ছেদ

زَوَاجُهُ ﷺ

হুযুর (ﷺ) এর বৈবাহিক জীবন

জীবনযাপনের দ্বিতীয় পদ্ধতি যার আধিক্যের প্রশংসা ও গৌরববোধ করা যায়। অধিক বিবাহে জাঁকজমক ও উচ্চ মর্যাদা নিহিত আছে। বিবাহ তো অনেক উত্তম কাজ। শরীয়াতের প্রচলিত রীতি-নীতিতে প্রশংসার যোগ্য। কেননা এটা পূর্ণতা ও পুরুষত্বের প্রমাণ। প্রাচীনকালে অধিক বিবাহ করা নিয়ে গর্ববোধ করা হতো। আর স্বাভাবিকভাবে মানুষ একাধিক বিবাহ করতো। এখন বাকী রইলো শরীয়াতের দৃষ্টিভঙ্গি। শরীয়তে বহু বিবাহ সুন্নাত হিসেবে স্বীকৃত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তোমাদের মধ্যে যার স্ত্রী অধিক সে উত্তম। আর এ সম্পর্কে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণী হলো,

تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا فَإِنِّي مُبَاهٍ بِكُمُ الْأُمَمَ.

–বিবাহ করো বংশ বিস্তার করো। কেননা আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্যে কিয়ামতের মাঠে অন্যান্য উম্মাতদের মুকাবিলায় গৌরব করবো।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিবাহ না করাকে নিরুৎসাহিত করেছেন। কেননা বিবাহের মাধ্যমে কাম উত্তেজনা প্রশমিত হয় এবং দৃষ্টিশক্তি সংযত হয়। এ কারণে বিবাহের ব্যাপারে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জোর নির্দেশ দিয়েছেন,

مَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ.

–যার বিবাহ করার সামর্থ রয়েছে সে যেন বিবাহ করে।[১] কেননা বিবাহ করার কারণে দৃষ্টি অবনত হয় এবং লজ্জাস্থান সংরক্ষিত হয়।

সম্ভবতঃ এ কারণে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম বিবাহকে জুহ্দ বা অনাসক্তির পরিপন্থি বলে উল্লেখ করেন নি।

করা "ক্বালব" বা হার্টের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এর ফলে ক্বালব বা হার্টে অনেক ব্যাধির সৃষ্টি হতে পারে। কেননা বাম দিকে কাত শয়ন করলে সমস্ত দেহের চাপ ক্বালব বা হৃদপিণ্ডের উপর পতিত হয়। যার ফলে সারা দেহের রক্ত সঞ্চালনে ভীষন শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। ফলে হৃদপিণ্ড ব্যাধিগ্রস্ত হয়।

[১]. তবরানী : আল মু'জামুল কাবীর, ১০:১২১ হাদীস নং ১০১৬৬।

হযরত সাহল বিন আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট স্ত্রীলোক খুবই প্রিয় ছিলো। তাহলে বলুন! বিবাহ থেকে বিরত থাকা কি করে উত্তম হতে পারে? অনুরূপ বর্ণনা হযরত ইবনে আইনিয়্যা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকেও বর্ণিত আছে। এটাও এক প্রকার হাকীকত যে, অনেক আবেদ-জাহেদ ও সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা এরূপ ছিলো যে,তাদের স্ত্রী ও বাঁদীর সংখ্যা অনেক বেশী ছিলো। তাঁরা অধিক সংখ্যক বিবাহ করেছেন।

এ বর্ণনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত আলী, হযরত হাসান, হযরত ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম অধিক সংখ্যক বিবাহ করেছেন। সংখ্যাধিক্য সাহাবায়ে কেরামের নিকট বৈধব্য অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা অপছন্দনীয় ছিলো।

তারপরও যদি দ্বিমত পোষণ করে বলা হয় যে, অধিক সংখ্যক বিবাহ করা কি করে প্রশংসনীয় কাজ হতে পারে? আল্লাহ তা'আলা যেখানে হযরত ইয়াহয়া (আলাইহিস্ সালাম) এর মর্যাদা বর্ণনা করে পবিত্র কুরআন মাজীদে এরশাদ করেছেন, তিনি স্ত্রীদের প্রতি অভিলাষী ছিলেন না। তাহলে বলুন! আল্লাহ তা'আলা কিভাবে একাজ বাদ দেয়ার পর তাঁর মর্যাদার প্রশংসা করেছেন। তিনি যা করতে সক্ষম ছিলেন। অর্থাৎ যদি বিবাহ করা কোনো প্রকার উত্তম কাজ হতো তাহলে বিবাহ পরিত্যাগ করার পরও আল্লাহ তা'আলা কি করে হযরত ইয়াহয়া (আলাইহিস্ সালাম) এর প্রশংসা করেছেন।

অনুরূপভাবে হযরত ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) এর প্রশংসায়ও উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি বিবাহ করেননি। স্ত্রীলোক থেকে দূরে থেকেছেন। সুতরাং বিবাহ করা যদি উত্তম কাজ হতো তাহলে হযরত ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) অবশ্যই বিবাহ করতেন?

এ অভিমতের প্রতিউত্তর ভালো করে শুনে রাখুন। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজীদে হযরত ইয়াহয়া (আলাইহিস্ সালাম) এর প্রশংসায় যে "হাছুরা" অর্থাৎ স্ত্রীর প্রতি অনাসক্ত ছিলেন উল্লেখ করেছেন- এর অর্থ কিন্তু পুরুষত্বহীন নয়। যা কোনো কোনো তাফসীরবিদগণ মনে করেছেন। অথবা তিনি গোপন অঙ্গহীন ছিলেন তাও নয়। বরং খ্যাতনামা সমস্ত তাফসীরবিদগণ এ অভিমত প্রত্যাখান করেছেন। পুরুষত্বহীন হওয়া ত্রুটি ও দোষনীয়। হযরাত আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) সকল প্রকার দৈহিক দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত ছিলেন। বরং এই আয়াতের প্রকৃত অর্থ হলো হযরত ইয়াহয়া (আলাইহিস্ সালাম) গুনাহ থেকে মুক্ত ও মাসূম

ছিলেন। আর তাঁর অবস্থাও এরূপ ছিলো যেনো তাঁকে গুনাহ থেকে বারণ করা হয়েছে।

কোনো কোনো মুফাসসির এরূপ অর্থও করেছেন যে, তিনি স্বীয় কামভাবের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আবার কেউ কেউ এরূপ অর্থও করেছেন যে, স্ত্রীর প্রতি তাঁর কোনরূপ আসক্তিই ছিলোনা। সুতরাং এখন একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়েছে যে, বিবাহের সামর্থ না থাকাও এক প্রকার দোষ।

একারণে এবিষয়ের উপর মর্যাদা হলো যে,বিবাহের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মানুষের স্বীয় কাম-উত্তেজনাকে কঠোর রিয়াজত বা সাধনার মাধ্যমে প্রতিহত করা। যেমন হযরত ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) করেছেন। অথবা আল্লাহ তা'আলা যদি এরূপ কোনো ব্যবস্থা করে দেন যার মাধ্যমে কাম-উত্তেজনা দমন করা যায়। যথা হযরত ইয়াহয়া (আলাইহিস্ সালাম) এর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তা করা হয়েছে। তাহলে এ অবস্থায় বিবাহ না করা অতিরিক্ত মর্যাদা হিসেবে গণ্য হবে। কেননা যে-কোন অবস্থায় পরিবার-পরিজনের প্রতি আসক্ত হয়ে মানুষ স্বাভাবিকভাবে দুনিয়ার প্রতি কিছু না কিছু মনোযোগী হয়েই থাকে। তাই বিবাহ করা ঐ ব্যক্তির জন্য অনেক উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ কাজের প্রমাণ যাকে বিবাহ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে আর একাজে মনোযোগী হবার পর এক মুহূর্তের জন্য ও যদি আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ না হয়।

সেই সম্মানিত মাকাম লাভ করেছেন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। তিনি অধিক সংখ্যক স্ত্রী থাকার পরও আল্লাহ তা'আলার ইবাদত থেকে এক মুহূর্তের জন্য বিরত হননি। বরং অধিক সংখ্যক স্ত্রীই তাঁকে ইবাদতে অতিমাত্রায় উৎসাহিত করেছে। কেননা তিনি তাঁদেরকে পূণ্যাত্মায় রূপান্তরিত করে দেন। তিনি তাঁদের হক আদায় করেছেন। তাদের সকল প্রকার প্রয়োজন পূর্ণ করেছেন। তিনি তাঁদেরকে হিদায়াতের পথের অনুসন্ধিৎসু বানিয়ে দেন। বরং তিনি দ্ব্যর্থহীন জবান মুবারকে ঘোষণা করেছেন, "অধিক সংখ্যক স্ত্রী দুনিয়ার স্বাদ উপভোগের সামগ্রী নহে। যদিও লোকেরা দুনিয়ার স্বাদ উপভোগ করার জন্য অধিক সংখ্যক বিবাহ করে।" সুতরাং হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ.

–আমার নিকট তোমাদের দুনিয়ার এ বস্তুদ্বয় পছন্দনীয় করা হয়েছে।[১]

[১]. ক) বায়হাকী : সুনানুল কুবরা, বাবুর রাগবাতি ফীন্ নিকাহ, ৭:১২৪।

এই হাদীসের দ্বারা ওইকথাই প্রমাণ হয় যে, নারী ও সুগন্ধি। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যতীত অন্যান্য লোকজন এ দু'টি বস্তুকে দুনিয়ার স্বাদ উপভোগ করার জন্য ব্যবহার করেছে। কিন্তু হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্যান্যদের দুনিয়ার স্বাদ উপভোগের বস্তুকে আখিরাতের কাজে ব্যবহার করেছেন। তিনি স্ত্রীদের মাধ্যমে আখিরাতের কাজে অধিক পরিমাণে উপকৃত হয়েছেন। (আমি এ বিষয় ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি) ফিরিশতাগণ হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে মোলাকাত করতো। তাই তিনি সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। কেননা সুগন্ধি ফিরিশতাদের অতি প্রিয় বস্তু। সুগন্ধির দ্বারা সহবাসের আকাংখা সৃষ্টি হয়। গোপন অংগে অনুভূতি ও উত্তেজনা দেখা দেয়। অথচ হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই দু'টি বস্তু- স্ত্রী ও সুগন্ধিকে- আখিরাতের কল্যাণে ও কাম উত্তেজনা দমন করার কাজে ব্যবহার করেছেন। তাঁর সকল প্রকার মুহাব্বতের মাকাম ছিলো আল্লাহ তা'আলার জাতের প্রতি সম্পৃক্ত। তিনি তাঁর কুদরত ও নিদর্শনের মুশাহাদায় বিভোর হয়ে স্বীয় পালনকর্তার সমীপে দোয়া ও মুনাজাতে ব্যাপৃত থাকতেন। এ কারণে তিনি উভয় প্রকারের মুহাব্বত ও উভয় অবস্থার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছেন।

তিনি এরশাদ করেছেন,

وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ.

–নামাযের মধ্যে আমার চোখের শীতলতা রয়েছে।[১]

যদি এ বিষয় গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা হয় তাহলে জানা যাবে যে, এ দিক থেকে হযরত ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) হযরত ইয়াহয়া (আলাইহিস্ সালাম) এর সমকক্ষ ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের উভয়কে নারীদের ফিতনা থেকে হেফাযত করেছেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেও হেফাযত করেছেন । অপরদিকে তাঁদের উভয়ের মুকাবিলায় হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনেক বেশী মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। কেননা তিনি বিবাহ করেছেন স্ত্রীদের হক অধিকার ও দায়িত্বকে

খ) যাহাবী : আত্-তিবুন্ নববী, বাবু ফযলি ফীজ্ জিমা'আ, ১:৯২।

[১]. ক) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবু হুব্বিন্ নিসা, ১২:২৮৯।
খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ২৮:৭৪।
গ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, প্রথম পরিচ্ছেদ, কিতাবুর রিকাক, ৩:১৪০।
ঘ) বায়হাকী : সুনানুল কুবরা, ৭:৭৮।
ঙ) হাকেম : আল মুস্তাদ্রাক আলাস্ সহীহাইন, বাবু হুব্বি ইলান্ নিসা, ৬:২৮৪।

সঠিকভাবে পালন করেছেন। স্ত্রীর অধিকারের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হবার জন্য যে সমস্ত গুণাবলীর প্রয়োজন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে ঐ সমস্ত গুণাবলীর পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। যার ফলে তিনি তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে সক্ষম হন। এ কারণে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে যত সংখ্যক স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে তাঁর উম্মাতের অন্যান্য লোকদেরকে ঐ পরিমাণ স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয়া হয়নি।

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে,

كَانَ يَدُوْرُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشَرَةً.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দিনে ও রাতে তাঁর স্ত্রীর নিকট গমন করতেন। আর তাঁদের সংখ্যা ছিলো এগারজন।[১]

হযরত তাউস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, স্ত্রীসহবাস সংক্রান্ত বর্ণনায় এসেছে–

أُعْطِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا فِي الْجِمَاعِ.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে চল্লিশজন পুরুষের শক্তি প্রদান করা হয়েছে।

হযরত সাফওয়ান বিন সুলাইম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা বর্ণিত আছে।[২]

হযরত সালমা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেছেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক রাতে তাঁর নয়জন স্ত্রীর নিকট গমন করতেন এবং এক স্ত্রীর নিকট থেকে অন্য স্ত্রীর নিকট গমন করার পূর্বে জানাবতের গোসল করতেন। তিনি এরশাদ করেছেন,

هَذَا أَطْيَبُ وَأَطْهَرُ،

–এরূপ করা অতি উত্তম ও পবিত্রময়।

---

[১]. ক) নাসায়ী : আস সুনানুল কুবরা, ৮:২০৭ হাদীস নং ৮৯৮৪।
খ) আবু ইয়ালা : আল মুসনাদ, ৫:৩১৮ হাদীস নং ২৯৪১।
গ) ইবনে খুযামা : আস সহীহ, ১:১১৫ হাদীস নং ২৩১।

[২]. তিনি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আযাদকৃত বাদী ছিলেন। হযরত সুফিয়া (রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহা) এরও বাদী ছিলেন। হযরত আবু রাফে (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর স্ত্রীও হযরত ফাতেমা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ধাত্রী ছিলেন।

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, একারণে আমরা পরস্পরে বলাবলি করতাম যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে ত্রিশ জন পুরুষের ক্ষমতা দান করা হয়েছে। ইমাম নাসায়ী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) উক্ত বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

অনুরূপ বর্ণনা হযরত আবু রাফে থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে। হযরত সোলাইমান (আলাইহিস্ সালাম) বলেছেন,

لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ أَوْ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ، وَأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ،

–আমি আজ রাতে আমার একশ' বা নিরানব্বই স্ত্রীর সহবাস করবো। আর তিনি করেছেনও তাই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেন,

كَانَ فِي ظَهْرِ سُلَيْمَانَ مَاءُ مِائَةِ رَجُلٍ وَكَانَ لَهُ ثَلَاثُمِائَةِ اِمْرَأَةٍ وَثَلَاثُمِائَةِ سَرِيَّةٍ،

–হযরত সোলাইমান (আলাইহিস্ সালাম) এর পিঠে একশ'সন্তানের বীর্য্য ছিলো। তাঁর তিনশ' স্ত্রী ও তিনশ' বাদী ছিলেন।

হযরত নাক্কাশ ও অন্যান্য আলেমগণ বর্ণনা করেছেন, হযরত সোলাইমান (আলাইহিস্ সালাম) এর সাতশ'স্ত্রী ও তিনশ' বাদী ছিলো। এছাড়াও হযরত দাউদ (আলাইহিস্ সালাম) বড়ো আবিদ ও জাহিদ ছিলেন। তিনি নিজের হাতে উপার্জন করে নিজের জীবনযাপনের প্রয়োজন পূরণ করতেন। তাঁরও তো নিরানব্বই জন স্ত্রী ছিলো। এরপরও তিনি উরিয়া বিন হান্নানের তালাক দেয়া স্ত্রীকে বিবাহ করে স্ত্রীর সংখ্যা একশ' পূর্ণ করেন।[১]

---

[১]. উরিয়া বিন হান্নানের স্ত্রীকে বিবাহ করার বিষয় ইহুদীদের রচিত গ্রন্থে অলিক কল্প কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে। তাদের এ বিভ্রান্তির কথা কতিপয় মুসলমান আলেমও নিজেদের রচিত গ্রন্থসমূহে উল্লেখ করেছে। যথা আবুল ফারাজ ইস্পাহানী তাঁর 'আননিসা' নামক কিতাবে সেই মিথ্যা ঘটনার উল্লেখ করেছে। কিন্তু হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণনা করেন, যদি কেউ এই ধরণের মিথ্যা অপবাদে হযরত দাউদ (আলাইহিস্ সালাম) এর মতো নবীকে অভিযুক্ত করে, তাহলে অপবাদকারী ব্যক্তিকে একশ'ষাট বেত্রাঘাত করতে হবে। হযরত আম্বিয়া (আলাইহিস্ সালাম) কে মিথ্যা অপবাদ দেয়ার শাস্তি এটাই। সঠিক ঘটনা হলো এই যে, উরিয়া বিন হান্নানের এক স্ত্রী ছিলো। তার স্ত্রী হযরত দাউদ (আলাইহিস্ সালাম) এর পছন্দ হয়। তিনি জানতে পারেন যে, উরিয়া তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। তাই হযরত দাউদ (আলাইহিস্ সালাম) সে মহিলাকে বিবাহ করেন।
হযরত দাউদ (আলাইহিস্ সালাম) এর এই বিবাহে কোন প্রকার ত্রুটি হয়নি। কিন্তু তিনি আল্লাহ তা'আলার সম্মানিত রাসূল ছিলেন। সেহেতু তাঁর একাজ আল্লাহ তা'আলার নিকট অপছন্দনীয় হয়। তাই আল্লাহ তা'আলা দু'জন ফিরিশতা পাঠিয়ে তাঁকে এই বিষয় সর্তক করে দেন। ফিরিশতাদ্বয় হযরত দাউদ (আলাইহিস্ সালাম) এর নিকটে এসে আকারে-ইঙ্গিতে তাঁর নিকট ন্যায়বিচারের আবেদন পেশ করে যে আমার ভাইয়ের

এজন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আলাইহিস্ সালাম) কে সর্তক করে দিয়েছেন। উক্ত ঘটনার বিবরণ পবিত্র কুরআন মাজীদে এরশাদ করা হয়েছে–

إِنَّ هَٰذَآ أَخِى لَهُۥ تِسۡعٌ وَتِسۡعُونَ نَعۡجَةً

–নিশ্চয় এ আমার ভাই। তার নিকট নিরানব্বইটি মাদী দুম্বা আছে।[১]

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

فُضِّلْتُ عَلَى النَّاسِ بِأَرْبَعٍ: بِالسَّخَاءِ وَالشَّجَاعَةِ وَكَثْرَةِ الْجِمَاعِ وَقُوَّةِ الْبَطْشِ.

–আমাকে সমস্ত মানুষের উপর চারটি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। (১) দানশীলতায় (২) বীরত্ব ও বাহুবলে (৩) অধিক সঙ্গমে (৪) নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করায়।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আকলের যে মাকামে উপনীত হয়েছেন দুনিয়ার কোনো মানুষের পক্ষে সেস্থানে পৌছা সম্ভব নয়। কেননা আত্মসম্মানের কারণে মানুষের অন্তরে মর্যাদার আসন লাভ করা যায়।

পবিত্র কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসা (আলাইহিস্ সালাম) এর প্রশংসায় বর্ণনা করেছেন–

وَجِيهًا فِى ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ

–মর্যাদাবান হবে দুনিয়া ও আখিরাতে।[২]

তবে একথা স্বীকৃত যে, মান সম্মান ও মর্যাদার মধ্যে অনেক বিপদ লুকিয়ে থাকে। আর অনেক লোকের জন্য তা ক্ষতির কারণও হয়। কেননা এর কারণে মানুষ অনেক সময় পরকাল সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যায়। এই কারণে কোনো কোনো বুযুর্গ ব্যক্তি এরূপ মান-সম্মানের নিন্দাও প্রকাশ করেছেন। এর বিপরীত তারা নাম খ্যাতিহীনতার প্রশংসা করেছেন। শরীয়াতে খ্যাতিহীনতার প্রশংসা ও পৃথিবীতে প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ করার আকাঙ্কাকে নিন্দনীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

নিরানব্বইটি বকরী আছে। আর আমার আছে শুধুমাত্র একটি বকরী। তবুও আমার ভাই আমার ঐ একটি বকরী নিতে চায়। হযরত দাউদ (আলাইহিস্ সালাম) এ ঘটনা শুনে স্বীয় ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট কান্নাকাটি করে তাওবা করেন।

[১]. আল কুরআন : সূরা সোয়াদ, ৩৮:২৩।

[২]. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:৪৫।

কিন্তু হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে যে মান-মর্যাদা, ইজ্জত-সম্মান প্রদান করা হয়েছে। মানুষের অন্তরে তিনি মর্যাদার আসন লাভ করেছেন, তাঁর সুমহান মর্যাদা নবুয়ত প্রকাশের পূর্বে অজ্ঞতা ও অন্ধকার যুগেও প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পর মক্কার কাফির গোষ্ঠি তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে হেয় প্রতিপন্ন করেছে। তাঁর সাথীদের উপর অত্যাচারের স্টিমরোলার চালিয়েছে। তারা মনে মনে তাঁকে কষ্ট দেয়ার জঘণ্যতম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কিভাবে তাঁকে ঘায়েল করা যায়। কিন্তু যখনই তারা তাঁর সামনে আসত তখনই তারা তাঁর অমিয় বাণীর সম্মানে শির অবনত করতে বাধ্য হতো। তারা যা কিছু করার ইচ্ছা পোষণ করতো তা তিনি অবলীলায় বলে দিতেন। এ সম্পর্কে অসংখ্য বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। সামনে এ বিষয় আলোকপাত করা হবে।

যে ব্যক্তি তাঁকে পূর্বে কখনো দেখেনি সে প্রথম দর্শনেই তাঁর প্রতি মুগ্ধ হয়ে যেতো। তাঁকে দেখার পর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যেতো। কায়লাহ সম্পর্কে এ ধরণের বর্ণনা বর্ণিত আছে। সে প্রথম হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে দেখেই কাঁপতে শুরু করে। তাকে কাঁপতে দেখে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

يَا مِسْكِينَةُ عَلَيْكِ السَّكِينَةُ.

–হে মিসকীন নারী! স্থির হও।[১]

হযরত আবু মাস'উদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে হাযির হয়ে কাঁপতে শুরু করে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে কাঁপতে দেখে বললেন,

هَوِّنْ عَلَيْكَ فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ.

–স্থির থাকো, ভয় পেয়োনা। কেননা আমি তো কোনো বাদশাহ নই।[২]

তিনি নবুওয়াত ও রিসালাতের কারণে এরূপ মান-মর্যাদা ও ইজ্জত-সম্মানের অধিকারী হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মনোনীত করেছেন।

---

[১]. ক) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, বাবু কুবলাহ বিনতে মুখরামাহ, ২৫:৮।
খ) কাযী আয়ায : আল গুনিয়াহ, ১:১১২।

[২]. ক) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, মুকাদ্দামাহ, ১০:৪৮।
খ) তাবরানী : মু'জামুল আওসাত, ৩:২৭৪।
গ) বায়হাকী : দালায়িলুন্ নবুয়াত, ৫:১০১।

তাঁকে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্যাদা ও সম্মান প্রদান করা হয়েছে। তাঁকে দুনিয়াতে মর্যাদা ও সম্মানের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। তিনিই আখিরাতে সমস্ত আদম সন্তানের সরদার হবেন। আমি এ পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সন্নিবেশ করেছি।

নবম পরিচ্ছেদ

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ وَالْمَتَاعِ

সম্পদ ও উপকরণ সংশ্লিষ্ট মর্যাদা

মর্যাদা লাভের তৃতীয় কারণ যা স্থান, কাল ভেদে প্রশংসা ও গৌরবের কারণ হয় এবং এর কারণে বিশেষ মর্যাদা লাভ হয়। যেমন– ধন-সম্পদের আধিক্য। সাধারণ লোকদের মধ্যে সম্পদশালী ব্যক্তিও ইজ্জত ও সম্মান লাভের কারণ হলো যে, জনসাধারণ ধারণা করে যে, প্রয়োজনের সময় তারা তার সম্পদ দ্বারা উপকৃত হবে এবং স্বীয় উদ্দেশ্য পূরণ করবে। নচেৎ মূলতঃ ধন-সম্পদের স্বতন্ত্র কোনো মর্যাদা নেই। সুতরাং ঐ ধরনের ধন-সম্পদ যদি কারো নিকট সঞ্চিত থাকে, যদি সম্পদের মালিক মানুষের প্রয়োজনে সে সম্পদ ব্যয় করে বা কোন প্রার্থী তার নিকট প্রয়োজন পূরণের আবেদন করে বা নিজের প্রয়োজনে সম্পদ ব্যয় করে। তাহলে ওই সম্পদের মালিক মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হয়। তখন মানুষও তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে তাকে অন্তরের গভীরে স্থান দেয়। এই ধরণের সম্পদের মালিক দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণের অধিকারী হবে। কিন্তু তা তখনই সম্ভব হবে যখন সম্পদের মালিক স্বীয় সম্পদকে নেক ও পূণ্যময় কাজে ব্যয় করবে। আর ঐ সম্পদ দ্বারা শুধু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও পরকালীন কল্যাণ উদ্দেশ্যে হবে। তাহলে এ মর্যাদা সর্বদা অক্ষুন্ন থাকবে এবং সুনাম অর্জনের কারণ হবে। এর বিপরীতে যদি সম্পদের মালিক কৃপণ স্বভাবের হয় এবং সদাসর্বদা সম্পদ সঞ্চয়ের চিন্তায় মগ্ন থাকে, তাহলে তার ঐ সম্পদ আধিক্যের মধ্যে মূলতঃ কোনো কল্যাণ নেই। বরং ঐ সম্পদ তার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তার ঐ সম্পদ তাকে শান্তির পথে দাঁড়া করাবেনা। বরং তাকে অসম্মানের আস্তাকুড়ে নিমজ্জিত করবে।

সুতরাং প্রতীয়মান হলো যে, সত্তাগত দিক থেকে ধন-সম্পদের মধ্যে কোনো প্রকার মানসম্মান নেই। বরং সম্পদের ব্যবহার ও জনকল্যাণই মানসম্মানের কারণ হয়।

সুতরাং সম্পদ সঞ্চয়কারী যদি সম্পদ কল্যাণজনক কাজে ব্যয় না করে বা কোনো প্রয়োজনপ্রার্থীর প্রয়োজন নিজের সম্পদ দ্বারা পূরণ না করে, সে না প্রকৃত ধনী হবে, আর না কোনো জ্ঞানীব্যক্তি তার প্রশংসা করবে। এ ধরনের লোক সর্বদা মুখাপেক্ষী থাকবে। আর না সে কখনো সম্পদ দ্বারা প্রকৃত উদ্দেশ্য লাভ করতে

পারবে। কেননা এ অবস্থায় যে সম্পদ তার হাতে আছে তা তার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনকারী নয়। সুতরাং তার উদাহরণ হলো ঐ কোষাধ্যক্ষের ন্যায় যে অন্যের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। কিন্তু ওই সম্পদ খরচ করার তার নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। আসলে সে এমন যার ধনসম্পদ কিছুই নেই সে একেবারে অসহায়। আর নেককাজে সম্পদ ব্যয়কারী সঠিক অর্থে ধনী। কেননা সে সম্পদ দ্বারা পুরোপুরি সফলতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। সম্পদ ব্যয় করার কারণে যদিও সে শূন্যহস্ত হয়।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা যদি আমাদের প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সীরাত মুবারকের প্রতি লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো তাঁর মাকাম ও মর্যাদা কতো উর্ধ্বে।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে যমীনের ধনভাণ্ডারের মালিক বানানো হয়েছে। শহরসমূহের চাবিগুচ্ছ তাঁর হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। তাঁর জন্য গণীমতের মাল হালাল করা হয়েছে, যা তাঁর পূর্ববর্তী আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) এর জন্য হালাল করা হয়নি। তাঁর জাহেরী হায়াত মুবারকে হিজায, ইয়ামান ও সমস্ত আরব উপদ্বীপ ও আশপাশের এলাকাসমূহ যথা– ইরাক, পারস্য প্রভৃতি তাঁর করতলে এসেছিল। সেসকল বিজিত অঞ্চল থেকে গণীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ জিজিয়া সদকা বা যাকাতের মালসমূহ আসতে শুরু করে, এতো বিপুল ধনরাশি এসেছে যা বড়ো বড়ো নৃপতি ও সম্রাটদের উপঢৌকন হিসেবে ভাগ্যে কমই জুটেছে।

অন্যান্য রাজ্যসমূহের রাজা-বাদশাহদের নিকট থেকে অনেক মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী এসেছে। কিন্তু তিনি কোনোদিনও সেগুলোর মুকাবিলায় নিজের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেননি। আর না সে সম্পদ থেকে নিজের জন্য সামান্য এক দেরহাম বাঁচিয়ে রেখেছেন। বরং যা আসতে ছিলো তা তিনি সঠিকখাতে খরচ করে দেন। অন্যদের ধনবান ও সম্পদশালী করে দেন। ঐ সম্পদ দ্বারা মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি করে দেন। তারপরও এব্যাপারে তার আরও উল্লেখযোগ্য ঘোষণা হলো যে, তিনি এরশাদ করেছেন,

مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِيْ أُحُدًا ذَهَبًا يَبِيتُ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا دِينَارٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ، وَأَتَتْهُ دَنَانِيرُ مَرَّةً فَقَسَمَهَا وَبَقِيَتْ،مِنْهَا سِتَّةٌ فَدَفَعَهَا لِبَعْضِ نِسَائِهِ فَلَمْ يَأْخُذْهُ نَوْمٌ حَتَّى قَامَ وَقَسَمَهَا.

–যদি আমার নিকট ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও এসে যায়, তাহলেও তা থেকে আমি এক দীনার খরচ না করে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করবে, আর না তা নিয়ে রাত অতিবাহিত করবো। তবে যদি ওই এক দীনার ঋণ পরিশোধের জন্য হয়, একবার তাঁর নিকট কিছু স্বর্ণমুদ্রা এসেছিলো। তিনি সেগুলো আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেন। কিন্তু ছয়টি মুদ্রা বাকী থেকে যায় তিনি সেগুলো তার কোন স্ত্রীর নিকট রাখেন আর রাতে তাঁর ঘুম আসেনি। তিনি উঠে স্বর্ণমুদ্রাগুলো সাদকা করে দেন। অতঃপর বললেন, (اَلْآنَ اسْتَرَحْتُ) –এখন আমি প্রশান্তি লাভ করলাম।[১]

আর তাঁর ওফাত এমন অবস্থায় হয়েছে যে, তাঁর একটি বর্ম যা কোনো এক ইহুদীর নিকট পরিবারের খরচাদির অর্থ সংগ্রহের জন্য বন্ধক রাখা হয়েছে।[২]

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুধু তাঁর নিজের ও পরিবার-পরিজনের ব্যয়ভার নির্বাহ, পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও ঘরবাড়ীর জন্য একান্ত প্রয়োজন ছিলো তা-ই গ্রহণ করতেন। এছাড়া তিনি সবকিছুই পরিত্যাগ করতেন। তিনি যা পেতেন তা-ই পরিধান করতেন। অধিকাংশ সময় তিনি মোটা চাদর ও লুঙ্গি পরিধান করতেন। আর তাঁর নিকট উপস্থিত লোকদেরকে রেশমী সোনালী কারুকাজ খচিত জামা দান করে দিতেন। অনুপস্থিতদের মাঝে দান করার জন্য রেখে দিতেন। কেননা ঝলমলে বাহারী রংয়ের পোশাক পরিচ্ছদ ও বিলাসিতাপূর্ণ আরাম-আয়েশের দ্রব্যসামগ্রী, শান-শাওকাত ও মান সম্মানের বস্তু নয়। এগুলো শুধু স্ত্রীলোকের শোভা। উত্তম পোশাক হলো পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও মাধ্যম মানের এবং যা সঙ্গী সাথীরা পরিধান করে। আবার পোশাক-পরিচ্ছদ যেন এরূপ না হয় যে, সহপাঠীদের দৃষ্টিতে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের কারণ হবে। আর পোশাক-পরিচ্ছদ যেনো অহংকারের কারণও না হয়। যেহেতু শরীয়তের দৃষ্টিতে এ ধরণের পোশাক পরিচ্ছদ নিন্দনীয়।

সাধারণতঃ মানুষ এ সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে গর্ববোধ করে যে, আমার নিকট প্রচুর ধন-সম্পদ আছে। আমি বিরাট বিলাসবহুল বাড়ির মালিক। উন্নতমানের আধুনিক ফ্যাশনের বিপুল পরিমাণ ফার্নিচার ও আসবাবপত্র আছে। চাকর-বাকর খেদমতে নিয়োজিত। ব্যবহারের জন্য দামী গাড়ী হাজির আছে। কিন্তু কিঞ্চিত পরিমাণ যদি

১. ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু তাগলিযী উকুবাতী..., ২:৬৮৭।
খ) বাযযার : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি সামুরা ইবনে জুনদুব, ১০:৪৭৫।
গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আবী হুরাইরা, ১৬:৭৭।
২. ইবনে মাজাহ : পৃ. ২৪৩৯।

আমরা সেই নিষ্কলুষ পুত-পবিত্র মহিমান্বিত গৌরবান্বিত জীবনের প্রতি তাকাই তাহলে আমরা কী দেখতে পাবো? তিনি সারা দুনিয়ার মালিক ছিলেন। দূর-দুরান্ত থেকে ধন-সম্পদ দৌড়ে এসে তাঁর পদচুম্বন করেছে। তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে নিজের আরাম-আয়েশের মনোরম সুখের বাগান সাজাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা কখনো করেননি। বরং এগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। কেননা তিনি তো ছিলেন ধন সম্পদের মালিক এবং সকল প্রকার মর্যাদার আধার। তিনি ভালোভাবে জানতেন ধনসম্পদে গৌরবান্বিত হওয়ার মাধ্যম কিসে নিহিত। গৌরববোধ করার মাধ্যম হলো সম্পদ সঠিক খাতে ব্যয় করা এবং এর মাধ্যমে আর্তমানবতার দুঃখ-বেদনা দূর করা।

এরূপ করার হাকীকত হলো, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন মহানুভবতার আধাঁর। তিনি নশ্বর দুনিয়ার আস্বাদনকে বেপরওয়াভাবে উপেক্ষা করেছেন। লোকেরা যেখানে কৃপণতা করতো তিনি সেখানেই অনায়াসে সম্পদ খরচ করতেন।

দশম পরিচ্ছেদ

اَلْأَخْلَاقُ الْحَمِيْدَةُ

হুযুর (ﷺ) এর সুপ্রশংসিত চরিত্র প্রসঙ্গে

যেসব অভ্যাস অর্জন করে মানুষ আপন চরিত্রকে সুন্দর করে মহিমান্বিত গুণাবলীর ধারক বাহক হয়, তা এমন এক মহিমান্বিত গুণাবলী যার সম্পর্কে সারা দুনিয়ার জ্ঞানীগণ ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন যে, এরূপ চারিত্রিক গুণাবলীসম্পন্ন ব্যক্তি সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

কারো স্বভাবে যদি ওইসব চরিত্র থেকে একটি গুণাবলী বিদ্যমান থাকে তাহলে সে ব্যক্তি ইজ্জত-সম্মানের অধিকারী হয়। যদি কোনো ব্যক্তির মধ্যে ওই প্রশংসিত গুণাবলীসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান পাওয়া যায় তাহলে বলুন সে ব্যক্তি কি ধরণের ইজ্জত-সম্মানের অধিকারী হবে। শরীয়াত ওইসমস্ত উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর প্রশংসা করেছে। আর সে সমস্ত গুণাবলী অর্জন করার জোর তাগিদ দিয়েছে। এ সমস্ত গুণাবলীর অধিকারীদের অনন্তকালীন কল্যাণের সুসংবাদ প্রদান করেছে। এসমস্ত প্রশংসনীয় গুণাবলীর কতেক গুণাবলী এমন ধরণের যেগুলোকে নবুওয়াতের অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর সেই গুণাবলীকে "উত্তম চরিত্র" আখ্যায়িত করা হয়েছে। মূলতঃ উত্তম চরিত্র তো তাকে বলা হয়, যা মানুষের দোষ-ত্রুটির শক্তিতে সমতা সৃষ্টি করে যাতে মানুষ কোনো বিষয়ের প্রতি একতরফাভাবে আকৃষ্ট হয়ে না পড়ে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র সত্তায় আল্লাহ তা'আলা মর্যাদাময় আখলাক ও প্রশংসনীয় গুণাবলীর পূর্ণতার সমাহার ঘটিয়েছেন। এমনকি স্বয়ং আল্লাহই এর প্রশংসা করে পবিত্র কুরআন মাজীদে এরশাদ করেছেন–

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

–এবং নিশ্চয় আপনার চরিত্র তো মহা মর্যাদারই।[১]

হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ يَرْضَى بِرِضَاهُ وَيَسْخَطُ بِسَخَطِهِ.

–তাঁর আখলাক ছিলো পবিত্র কুরআন। কুরআনের পছন্দই ছিলো তাঁর পছন্দ। আর কুরআনের অসন্তুষ্টিই ছিলো তাঁর অসন্তুষ্টি।[১]

[১]. আল কুরআন : সূরা নূন, ৬৮:৪।

মোটকথা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সন্তুষ্টি ছিলো আল্লাহ তা'আলার হুকুমের যথাযথ বাস্তবায়নে। আর তাঁর অসন্তুষ্টি ছিলো আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের অস্বীকৃতি ও অবাধ্যতায়"।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ.

–আমি উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণতা দানের জন্য প্রেরিত হয়েছি।[২]

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন চারিত্রিক গুণাবলীতে সর্বোত্তম ব্যক্তি।[৩]

হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা বর্ণিত আছে। সত্যপন্থি আলেমদের অভিমত হলো যে, সমস্ত আম্বিয়া (আলাইহিস্ সালাম) এর মহিমান্বিত চরিত্র ছিলো প্রকৃতিগত ও জন্মগত। কোনোটিই অর্জিত ছিলোনা। তাঁরা সেগুলি আমলের মাধ্যমে অর্জন করেননি। তাদের ঐ চরিত্রসমূহ তাঁদের অবস্থা অনুযায়ী ওজুদে এলাহীর মনোনয়ন ও আল্লাহ তা'আলার অসীম ফযল ও অনুগ্রহের ফয়েজ থেকে আগত। কেননা আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সকল প্রকার আখলাক ও কামালাত দ্বারা পরিপূর্ণ করে প্রেরণ করেছেন। সমস্ত আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) এর ব্যাপারে ঐ একই ধারা অনুসৃত হয়েছে। হযরত আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) এর বাল্যকালীন অবস্থা থেকে শুরু করে নবুওয়াত প্রকাশ লাভ পর্যন্ত তাঁদের জীবনচরিত্র অধ্যয়ন করলে এ বিষয়টি ভালোভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। যথা– হযরত ঈসা, হযরত মূসা, হযরত ইয়াহয়া, হযরত সোলাইমান (আলাইহিমুস্ সালাম) ও অন্যান্য আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) এর আখলাকে কারীমার মধ্যে ঐসব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান দেখতে পাওয়া যায়। তাঁদের চারিত্রিক গুণাবলী স্বভাবজাত

[১]. আবু বকর বুখারী হানাফী : বাহরুল ফাওয়ায়েক, ১:৩৩৫।
[২]. ক) বায়হাকী : সুনানুল কুবরা, ১০:১৯২।
খ) বদরুদ্দীন আইনী : উমদাতুল কারী শরহে সহীহুল বুখারী, বাবু হুসনিল খুলক্বি ওয়াস..., ৩২:২১৭।
গ) শামী : সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ, ৭:৬।
[৩]. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু ইসতিখদামিল ইয়াতীম, ৪:১১ এবং বাবু হুসনিল খুলুক, ৮:১৪।
খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু জাওয়াযিজিল জামা'আত ফীন্ নাফেলাহ, ১:৪৫৭।
গ) ইবনে শায়বা : তারিখে মদীনা, ২:৬৩৭।

প্রকৃতিগত ও জন্মগতভাবে স্বভাবের অর্ন্তভুক্ত করে সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে রাখা হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা হযরত আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) এর স্বভাবকে রোজে আজলে বা সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে ইলম ও হিকমত দ্বারা পরিপূর্ণতা দান করেছেন। যথা পবিত্র কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে–

وَءَاتَيْنَهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا

–এবং আমি তাকে শৈশবেই নবুওয়াত প্রদান করেছি।[১]

তাফসীরবিদগণ বলেন– আল্লাহ তা'আলা হযরত ইয়াহয়া (আলাইহিস্ সালাম) কে বাল্যকালেই কিতাবের ইলম প্রদান করেছেন।

হযরত মু'আম্মার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, হযরত ইয়াহয়া (আলাইহিস্ সালাম) এর বয়স যখন দু'তিন বছর ছিলো তখন তাঁর সমবয়সী ছেলেরা তাঁকে বললো, আপনি আমাদের সঙ্গে খেলাধুলায় অংশ গ্রহণ করেন না কেনো? প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, আমাকে তো আল্লাহ তা'আলা খেলাধুলা করার জন্য সৃষ্টি করেননি? আল্লাহ তা'আলার বানী–

مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللهِ

–যে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা কালেমার সত্যায়ন করবে।[২]

এ আয়াতে কারীমায় একথা বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইয়াহয়া (আলাইহিস্ সালাম) যখন এ "তাসদীক বা সত্যায়ন" করেন, তখন তাঁর বয়স ছিলো তিন বছর। হযরত ইয়াহয়া (আলাইহিস্ সালাম) সাক্ষ্য দিয়েছেন যে,হযরত ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) আল্লাহর কালেমা এবং রূহ।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হযরত ইয়াহয়া (আলাইহিস্ সালাম) তাঁর মায়ের পবিত্র গর্ভে থাকা অবস্থায় হযরত ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) এর সত্যায়ন করতে শুরু করেন। কেননা হযরত ইয়াহয়া (আলাইহিস্ সালাম) এর মা অধিকাংশ সময় হযরত মরিয়াম (আলাইহাস্ সালাম) কে বলতেন, আমি বুঝতে পারতেছি যে, আমার গর্ভের সন্তান তোমার গর্ভের সন্তানের সম্মানে তাঁর সামনে অবনত হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজীদে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, হযরত ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) মাতৃউদর থেকে ভূমিষ্ট হবার সাথে সাথে

[১]. আল কুরআন : সূরা মরিয়ম, ১৯:১২।
[২]. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:৩৯।

কথা বলা আরম্ভ করেন। সুতরাং তিনি হযরত মারয়াম (আলাইহাস্ সালাম) কে উদ্দেশ্য করে বলেন– أَلَّا تَحْزَنِي অর্থ– আপনি চিন্তিত হবেন না।[১] এই আয়াতের কোন কিরাআতের মধ্যে مِن تَحْتِهَا যে শব্দ এসেছে। এর এক তাফসীরে বলা হয়েছে, হযরত ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) শিশুকালেই কথা বলেছেন। পবিত্র কুরআন মাজীদে একথাও বর্ণিত আছে। দোলনাতে থাকা অবস্থায় হযরত ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) এরশাদ করেছেন–

إِنِّى عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِىَ ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلَنِى نَبِيًّا

–নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর বান্দা, তিনি আমাকে কিতাব দান করেছেন, এবং আমাকে নবুওয়াত প্রদান করেছেন।[২]

হযরত সোলাইমান (আলাইহিস্ সালাম) এর সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মাজীদে এরশাদ করা হয়েছে–

فَفَهَّمْنَٰهَا سُلَيْمَٰنَ ۚ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ

–আমি ঐ বিষয়টা সোলাইমানকে বুঝিয়ে দিয়েছি এবং উভয়কে রাষ্ট্র শাসন ক্ষমতা ও জ্ঞান প্রদান করেছি।[৩]

হযরত সোলাইমান (আলাইহিস্ সালাম) এর জ্ঞান-প্রজ্ঞা সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি যখন অন্যান্য শিশুদের মতো আনন্দ-উল্লাসে শৈশবকাল অতিবাহিত করেন। তিনি তখন মিথ্যা অপবাদে অভিযুক্ত মহিলার বিষয় মীমাংসা করেন।[৪]

---

[১]. আল কুরআন : সূরা মরিয়ম, ১৯:২৪।

[২]. আল কুরআন : সূরা মরিয়ম, ১৯:৩০।

[৩]. আল কুরআন : সূরা আম্বিয়া, ২১:৭৯।

[৪]. বর্ণিত আছে যে, হযরত দাউদ (আলাইহিস্ সালাম) এর যুগে এক ব্যক্তি এক মহিলার সাথে খারাপ কাজ করার ইচ্ছা করে। তাই সে মহিলাকে ব্যভিচারে লিপ্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু মহিলা ব্যভিচারে লিপ্ত হতে রাজি হয়নি। সুতরাং লোকটি চারজন মিথ্যা সাক্ষী হাজির করে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করে। ঐ মোকাদ্দমা হযরত দাউদ (আলাইহিস্ সালাম) এর নিকট পেশ করা হলে তিনি সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করার পর ফয়সালা করেন যে, মহিলাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হোক। ঐ সময় হযরত সোলাইমান (আলাইহিস্ সালাম) শৈশবকাল অতিক্রম করেন। তিনি তাঁর পিতা হযরত দাউদ (আলাইহিস্ সালাম) এর ফয়সালা শুনে দ্বিমত পোষণ করে তিনি মোকাদ্দমা নিজের হাতে তুলে নেন। হযরত সোলাইমান (আলাইহিস্ সালাম) সাক্ষীদের একজন একজন করে পৃথক পৃথকভাবে সাক্ষ্য গ্রহণ করে। ফলে সাক্ষীদের সাক্ষ্যদান বিভিন্ন ধরণের হয় এবং তাতে তাদের সাক্ষ্য প্রদান মিথ্যা প্রমাণ হয়। হযরত দাউদ (আলাইহিস্ সালাম) স্বীয় পুত্রের ফয়সালা সমর্থন করেন। এভাবে একজন নিরাপরাধ মহিলার প্রাণ বেঁচে যায়।

দ্বিতীয় ঘটনা হলো যে, দু'মহিলার বিচারপ্রার্থী হওয়ার বিষয়। দু'মহিলার নিজ নিজ শিশুদের নিয়ে বিচারপ্রার্থী হয়। তারা উভয় নিজ নিজ শিশুকে একস্থানে শয়ন করে রেখে যায়। হঠাৎ বাঘ এসে এক শিশুকে নিয়ে যায়।

আল্লামা তাবারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, হযরত সোলাইমান (আলাইহিস্ সালাম) যখন রাজত্ব পরিচালনা করেন তখন তাঁর বয়স ছিলো মাত্র বারো বছর।

অনুরূপ ঘটনা হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) ও ফিরাউনের সম্পর্কে বর্ণিত আছে। হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) যখন ফিরাউনের দাড়ি ধরে টান দেন, তাও এরকম বয়সেই ঘটেছে।

হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মাজীদে এরশাদ করা হয়েছে–

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَآ إِبْرَٰهِيمَ رُشْدَهُۥ مِن قَبْلُ

–এবং নিশ্চয় ইবরাহীমকে পূর্ব থেকেই তার সৎপথ দান করেছি।[১]

হযরত মুজাহিদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও অন্যান্য তাফসীরকারকগণ বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) কে বাল্যকালেই হিদায়াত প্রদান করা হয়েছে।

হযরত ইবনে আতা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) কে সৃষ্টি করার পূর্বে নবুওয়াত ও রিসালাতের জন্য মনোনীত করেন।

কোনো কোনো তাফসীরবিদগণ বলেন, হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) ভূমিষ্ট হবার পর আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাগণকে তাঁর নিকট পাঠান। তাঁকে একথা জানানোর জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, 'অন্তর দিয়ে আমার পরিচয় অর্জন করুন আর জিহ্বা দিয়ে আমার জিকির করুন।' প্রত্যুত্তরে

আর তখন উভয় মহিলা এক শিশুকে নিজের সন্তান বলে দাবী করে। অতঃপর তখন উভয় মহিলা এ বিষয় হযরত দাউদ (আলাইহিস্ সালাম) এর নিকট মীমাংসার বিচার প্রার্থী হয়। হযরত দাউদ (আলাইহিস্ সালাম) সেই যুগের আইন অনুযায়ী শিশুর ব্যাপারে বয়স্কা মহিলার পক্ষে রায় দেন। উভয় মহিলা তাঁর দরবার থেকে বের হয়ে যাচ্ছে ঐ সময় হযরত সোলাইমান (আলাইহিস্ সালাম) এসে উপস্থিত হন এবং বিচারের ভার নিজের হাতে তুলে নেন। তিনি উভয় মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা উভয় এই শিশুকে নিয়ে ঝগড়া করছো। তোমাদের উভয়ের ঝগড়া নিষ্পত্তি করার উত্তমপন্থা হলো শিশুকে দু'ভাগে ভাগ করে দু'জনকে দিয়ে দেওয়া হোক। তখন যে মহিলা শিশুর মিথ্যা দাবিদার, সে তাৎক্ষণিকভাবে রাজী হয়ে যায়। আর যে মহিলা শিশুর প্রকৃত মা, সে ঐ মীমাংসা অস্বীকার করে বললো, এই শিশু ঐ মহিলাকে দিয়ে দেওয়া হোক তবুও শিশুর জীবন এভাবে নষ্ট করা না হোক। মহিলার কথা শুনে হযরত সোলাইমান (আলাইহিস্ সালাম) তাৎক্ষনিকভাবে সঠিক রায় ঘোষণা করেন যে, শিশুটি এই মহিলার। কেননা সে শিশুর দাবী পরিত্যাগ করতে রাজি তবুও সে শিশুর মৃত্যু সহ্য করতে রাজী নয়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজীদে উভয় ঘটনার প্রতি এভাবে ইংগিত করেছেন যে, এই মীমাংসা আমি হযরত সোলাইমান (আলাইহিস্ সালাম) কে শিখিয়ে দিয়েছি।

[১]. আল কুরআন : সূরা আম্বিয়া, ২১:৫১।

হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) বলেন যে, আমি পূর্বে এ দু'টি কাজ করেছি। তিনি কিন্তু একথা বলেননি যে, এ দু'টি কাজ আমি করবো। এর দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) প্রেরিত হওয়ার পূর্বে হিদায়াত প্রাপ্ত হন।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) কে নমরূদ যখন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে, তখন তাঁর বয়স ছিলো ষোল বছর। হযরত ইসমাঈল (আলাইহিস্ সালাম) কে যখন জবেহ করার আদেশ করা হয়, তখন হযরত ইসমাঈল (আলাইহিস্ সালাম) বয়স ছিলো সাত বছর। যখন চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রের উদয় ও অস্তের মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) আল্লাহ তা'আলার একত্ব ও তার কুদরতের নিদর্শনের স্বীকৃতি প্রদানের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, তখন তাঁর বয়স ছিলো মাত্র পনের বছর।

অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে, হযরত ইউসুফ (আলাইহিস্ সালাম) কে যখন তাঁর ভাইয়েরা কূপে নিক্ষেপ করেছে তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেন যে, তোমার ভাইয়েরা তোমাকে কূপে নিক্ষেপ করবে। তাও বাল্যকালেই সংঘটিত হয়েছে।

এসম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَـٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

–এবং আমি তাঁর প্রতি ওহী প্রেরণ করলাম, 'নিশ্চয় তুমি তাদেরকে তাদের একাজের কথা জানিয়ে দেবে এমনি সময় যে, তারা অনুধাবন করতে পারবে না।'[১]

সীরাতবিদগণ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আমেনা বিনতে ওহাব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেছেন-আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুভ জন্মের সময় তাঁর উভয় হাত যমীনের দিকে প্রসারিত করে রাখেন। আর মাথা মুবারক আকাশের দিকে উত্তোলন করে রাখেন।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

(لَمَّا نَشَأْتُ بُغِّضَتْ إِلَيَّ الْأَوْثَانُ وَبُغِّضَ إِلَيَّ الشِّعْرُ وَلَمْ أَهِمَّ بِشَيْءٍ مِمَّا كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تَفْعَلُهُ إِلَّا مَرَّتَيْنِ فَعَصَمَنِي اللهُ مِنْهُمَا ثُمَّ لَمْ أَعُدْ،

১. আল কুরআন : সূরা ইউসুফ, ১২:১৫।

–আমার যৌবনকালেই আমার অন্তরে মূর্তিপূজা ও অশ্লীল কবিতা আবৃত্তির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে। জাহেলী যুগের আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি আমি দু'বারের বেশী আকর্ষণ বোধ করিনি। কিন্তু দু'বারই আল্লাহ তা'আলা আমাকে রক্ষা করেছেন। এরপর আর কোনো দিন আমি ওইসব কাজের প্রতি আকৃষ্ট হইনি।[১]

বাল্যকাল থেকে সম্মানিত নবীগণ (আলাইহিমুস্ সালাম) কে আখলাকে হাসানার বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে। আর তাঁদের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অনবরত পবিত্র সুবাস বর্ষিত হতে থাকে। তাঁদের অন্তর মারিফাতের নূরে প্রজ্জ্বলিত হতে থাকে। এভাবে তাঁরা চূড়ান্ত পর্যায়ের উন্নত মর্যাদা এবং পূর্ণতার চূড়ান্ত সোপানে উন্নীত হন। তখনই তাঁদেরকে নবুওয়াত ও রিসালাতের জন্য মনোনীত করা হয়। তারা এসব লাভ করেন কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা ছাড়াই। যেমন, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন–

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَٱسْتَوَىٰٓ ءَاتَيْنَـٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ

–এবং যখন আপন যৌবনে উপনীত হলো, এবং পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হলো তখন আমি তাকে হুকুম ও জ্ঞান দান করলাম।[২]

হযরাত আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) ব্যতীত উপরোক্ত গুণাবলীর অংশবিশেষ অন্যান্য কোনো লোকের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। তবুও তাঁদের মধ্যে উপরোক্ত গুণাবলী পূর্ণাঙ্গভাবে পাওয়া যায়নি। তবে কেউ কেউ এরূপ কোনো আখলাকে হাসানার কারণে আল্লাহ তা'আলার ফয়েয ও রহমতের বদৌলতে এই ধরণের আখলাকে হাসানা অর্জন করা তাদের জন্য সহজতর হয়ে যায়। যেমন, আমরা কোনো কোনো শিশুকে বাল্যকালে দেখতে পাই যে, তাদের মন-মেজাজ শান্ত ও কোমল প্রকৃতির, সত্যভাষী ও দানশীলতার গুণাবলী বিদ্যমান।

আবার কোনো কোনো শিশুর স্বভাবে বাল্যকালে অপবিত্রতা ও দোষণীয় অভ্যাস দেখা যায়। পরিশ্রম ও কঠোর সাধনার মাধ্যমে ত্রুটিপূর্ণ আখলাককে উত্তম আখলাকে রূপান্তরিত করা যায়। উপরোক্ত গুণাবলীর যা তার মধ্যে নেই তা লাভ করে আখলাককে প্রশংসনীয় করা যায়।

১. বাল্যকালে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতিবেশীর বাড়ীতে বিবাহ উপলক্ষে গান বাজনা হচ্ছিলো। তাই তিনি সেখানে যান। কিন্তু তিনি সেখানে পৌছা মাত্রই নিদ্রায় মগ্ন হয়ে পড়েন এবং সকাল পর্যন্ত নিদ্রায় মগ্ন থাকেন। দ্বিতীয় দিনও আবার সেখানে যান। দ্বিতীয় দিনেও ঐ একই অবস্থা হয়। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে গান শুনা থেকে রক্ষা করেন।
২. আল কুরআন : সূরা ক্বাসাস, ২৮:১৪।

এ দু' অবস্থার পরিবর্তনের কারণে মানুষের মর্যাদায় বিভিন্ন প্রকারের পার্থক্য হয়।

وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ

–আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রত্যেক মানুষকে অন্তর্ভুক্ত প্রকৃতিগত জন্মগত স্বভাবের অর্ন্তভূক্ত করে সৃষ্টি করা হয়।[১]

এ কারণে এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। এগুলো অর্জনযোগ্য বিষয় যা বান্দা চর্চা, সাধনা ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে অর্জন করে।

আল্লামা তাবারী ও অন্যান্য সকল ওলামাদের অভিমত হলো-উত্তম আখলাক জন্মগতগুণ। মানুষের স্বভাবের মধ্যে সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে তা প্রদান করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ ও হযরত হাসান বসরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এ অভিমতের সমর্থক। তবে এ সম্পর্কে সঠিক কথা হলো যা আমি পূর্বে আলোচনা করেছি।

হযরত সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

كُلُّ الْخِلَالِ يُطْبَعُ عَلَيْهَا الْمُؤْمِنُ إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ،

–মিথ্যা ও খিয়ানত ব্যতীত মানুষের মধ্যে প্রতিটি স্বভাব জন্মগতভাবে প্রদান করা হয়েছে।[২]

হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে আরো অতিরিক্ত বর্ণনা রয়েছে,

والْجُرْأَةُ وَالْجُبْنُ غَرَائِزُ يَضَعُهُمَا اللهُ حَيْثُ يَشَاءُ.

–বীরত্ব ও দুর্বলতা এ দু'টি অভ্যাস আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে যা প্রদান করা যুক্তিসংগত মনে করেন তা প্রদান করেন।[৩]

উত্তম ও প্রশংসিত চরিত্র অসংখ্য। কিন্তু আমি ওগুলোর কতিপয় বুনিয়াদী রীতি-নীতি উল্লেখ করবো, যার ফলে স্পষ্টভাবে জানা যাবে যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আখলাকে সেগুলোর কিরূপ অপূর্ব সমাবেশ ছিলো।

---

১. ক) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু ফীল কদরি, ১:৯৯।
খ) মোল্লা আলী কারী : মিরকাতিল মাফাতিহ আল শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ঈমান, ১:২০৯।
২. কাসেম ইবনে সালাম : বাবুল খুরুজি মিনাল ঈমান, ১:৩৩।
৩. ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু মা ইয়াকুনু ফী হিশ্ শাহাদাত, ১:৩৬৭।

একাদশতম পরিচ্ছেদ

كَمَالُ عِلْمِهِ وَعَقْلِهِ ﷺ

হুযুর (ﷺ) এর ইলম ও আকলের পূর্ণতা

আখলাকে ফাযীলার মূল উৎস ও উৎপত্তিস্থল হলো আকল। কেননা আকল থেকেই ইলম ও মারিফাতের বীজ অংকুরিত হয়। তা থেকেই সিদ্ধান্ত প্রদানে দৃঢ়তা, চিন্তা-চেতনায় স্বাচ্ছন্দ্য, সততা, পরিণামদর্শন, নফসের কল্যাণসমূহ, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ, সুন্দর শাসন ও প্রতিপালন ও সৌন্দর্যের প্রচার-প্রসার ও নিকৃষ্টতর মন্দস্বভাব চিরতরে বর্জন ও পরিত্যাগ করা ইত্যাদি গুণাবলীর উদ্ভব হয়।

আমি পূর্বে আলোচনা করেছি যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রশংসনীয় আখলাক সুমহান ও সর্বাধিক পরিপূর্ণ ছিলো। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এমন ছিলেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মানুষ সেস্তরে উপনীত হয়নি।

যদি কেউ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সমুন্নত মর্যাদা, তাঁর প্রশংসনীয় গুণাবলী ও সৌন্দর্যময় কার্যাবলী অনুসন্ধান করে তাহলে তাকে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জামে কালামের (ব্যাপক অর্থবহ বাণীমালা) অনুশীলন করতে হবে এবং তাঁর প্রশংসনীয় গুণাবলী বুঝার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তাঁর হাকীকত হলো এটাই। তাঁর সুমহান মাকাম ও মর্যাদা সম্পর্কে ঐ ব্যক্তি জানতে সক্ষম হবে যে ব্যক্তি তার প্রতিটি কার্যাবলী, অমীয় বাণীসমূহের তত্ত্ব, তাওরাত, ইঞ্জিল ও অন্যান্য আসমানী কিতাবসমূহে তাঁর সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে সেগুলো জানতে সক্ষম হয়। জ্ঞানীদের প্রজ্ঞা অতীত জাতিরসমূহের ইতিবৃত্ত, অতীতকালের ইতিহাস, উদাহরণ ও উপমা প্রদান, প্রশাসনিক পরিচালনা, শরীয়তের বিধানের প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন, মর্যাদামণ্ডিত শিষ্টাচার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে সুন্দর চারিত্রিক গুণাবলীর প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়।

এভাবে আলেমদের হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণী সমূহকে নিজেদের পথ প্রদর্শনের মাধ্যম বলে স্থির করা, দুর্লভ ও সূক্ষ্ম আচরণকে দলিল প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, তাঁর সৌন্দর্যমণ্ডিত ইবাদতের আলোকে নিজেদের ইবাদতকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা চিকিৎসা বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, ফারায়েজ বা মৃতের সম্পত্তি বন্টনের জ্ঞান লাভ, বংশতালিকার ইতিহাস ইত্যাদি ছাড়াও আরো অনেক বিষয় যার বিবরণ ইনশাআল্লাহ আমি

মু'জিযা অধ্যায়ে আলোচনা করবো। বিশ্ববাসী তাঁর নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেছে। অথচ তিনি কোনো বিদ্যালয়ের পাঠ্য কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেননি। না এ সকল বিষয় অনুশীলন করেছেন। আর না তিনি বিষয়াবলী সম্বলিত কোনো গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন। না তিনি কোনো জ্ঞানীগুণী লোকদের মজলিসে যাতায়াত করেছেন। আর না উপরোক্ত বিষয়সমূহে তাঁর সুখ্যাতি ও প্রসিদ্ধি ছিলো। বরং তাঁর উপাধি ছিলো "নবীয়ে উম্মী"। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বক্ষ মুবারক কিরূপ প্রসারিত করেছেন, গুপ্ত রহস্যাবলী কিভাবে তাঁর নিকট প্রকাশ করেছেন। তাঁকে তালিম ও আদব শিক্ষা দান করেন আল্লাহ তা'আলা নিজেই। এ সমস্ত বিষয় যদি কেউ অধ্যয়ন করে তাহলে সে হয়তো অনুধাবন করতে পারবে যে, হুযুর মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেমন পরিপূর্ণ মহামানব ছিলেন। এসবই তাঁর নবুওয়াতের অকাট্য দলিল। আমি এখানে তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ ঘটনাবলীর বিস্তারিত আলোচনা করে কলেবর বৃদ্ধি করার পক্ষপাতি নই।

বাস্তবে তাঁর বিচক্ষণতাপূর্ণ ভাণ্ডার এতো প্রশস্ত ও সুবিশাল যে, তা একত্রে সন্নিবেশ করা কোনো মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। আর না কোনো ব্যক্তির পক্ষে সেগুলো স্মৃতিপটে আবদ্ধ করা সম্ভব হবে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আকল এতো পরিপূর্ণ ও প্রশস্ত ছিলো সে হিসেবে তাঁর বিচক্ষণতাপূর্ণ বাণীও ছিলো ব্যাপক। আরও উল্লেখযোগ্য কথা হলো যে, ভবিষ্যতের ইলমসমূহের বহুবিধ গুপ্ত রহস্যাবলী কিভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অভিহিত করেছেন। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা আপন কুদরতের বিস্ময়কর রহস্যাবলী ও নিদর্শনাবলী অবলোকন করিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন–

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

–এবং আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা কিছু আপনি জানতেন না এবং আপনার উপর আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রয়েছে।[১]

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি আল্লাহ তা'আলা যে মহা অনুগ্রহ করেছেন সে সম্পর্কে চিন্তা করলে মানববিবেক স্থবির এবং মুখ বোবা হয়ে যাবে। যেভাবেই প্রশংসা করা হোক না কেন, তাঁর প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনাতীত।

১. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:১১৩।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

اَلْحِلْمُ وَالْاِحْتِمَالُ وَالْعَفْوُ

হুযুর (ﷺ) এর ধৈর্য সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাগুণ

এসকল মহিমান্বিত গুণাবলীর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যাবতীয় শক্তি-সামর্থ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মানুষের স্বীয় আবেগ-অনুভূতির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করাকে 'হিলম' (حِلْمٌ) বলা হয়। আর 'ইহতিমাল' (اِحْتِمَالٌ) বলা হয় দুঃখ-কষ্টে বিপদ-আপদে মানুষের ধৈর্য ও জ্ঞানহারা না হওয়া। এটা প্রায় "সবর" শব্দের কাছাকাছি। প্রতিশোধ গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ গ্রহণ না করাকে 'আফুউ' (عَفْوٌ) বলা হয়। এসব শিষ্টাচার আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে শিক্ষা দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে এরশাদ করেছেন–

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

–হে মাহবুব! ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করুন আর সৎ কর্মের নিদের্শ দান করুন এবং অজ্ঞদের এড়িয়ে চলুন।[১]

বর্ণিত আছে যে, যখন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি এ আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) এর নিকট এ আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করেন। প্রত্যুত্তরে হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) বললেন, আমি যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলার নিকট এ বিষয় জানতে না পারবো, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে এ বিষয় কিছু বলতে পারবো না। একথা বলে হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) চলে যান। কিছুক্ষণ পর হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) ফিরে এসে বললেন,

يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ وَتَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ،

–হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আদেশ দিয়েছেন, আপনার সাথে যে সম্পর্ক ছিন্ন করবে তার

১. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭:১৯৯।

সাথে সম্পর্ক জুড়বেন, যে আপনাকে বঞ্চিত করবে আপনি তাকে দান করবেন এবং যে আপনার প্রতি অত্যাচার করবে আপনি তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আদেশ দিয়েছেন–

وَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ

–এবং যে বিপদাপদে তোমার উপর আপতিত হয় সেটার উপর ধৈর্যধারণ করো।[১]

অপর এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে–

فَٱصۡبِرۡ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلۡعَزۡمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ

–সুতরাং আপনি ধৈর্যধারণ করুন যেমনিভাবে দৃঢ়প্রত্যয়ী রাসূলগণ ধৈর্যধারণ করেছেন।[২]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

وَلۡيَعۡفُواْ وَلۡيَصۡفَحُوٓاْۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغۡفِرَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٌ

–এবং তাদের উচিত যেন তাদেরকে ক্ষমা করে দেয় এবং দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরক ক্ষমা করুক, এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৩]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ ﴿٤٣﴾

–এবং নিশ্চয় যে ধৈর্যধারণ করছে এবং ক্ষমা করেছে, তবে এটা অবশ্যই সৎসাহসের কাজ।[৪]

---

১. আল কুরআন : সূরা লোকমান, ৩১:১৭।
২. আল কুরআন : সূরা আহকাফ, ৪৬:৩৫।
৩. আল কুরআন : সূরা নূর, ২৪:২২।
৪. আল কুরআন : সূরা শুরা, ৪২:৪৩।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যধারণ করার অসংখ্য ঘটনা রয়েছে যা গণনা করে নির্ধারণ করা অসম্ভব এবং সেগুলি গোপনীয়ও নয়। মহান মহান ধৈর্যশীল ব্যক্তিদের পদস্খলনের ঘটনা ঘটেছে। তারা অসংখ্য বিষয়ে ভুল করেছে। কিন্তু আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে যতো কষ্ট দেয়া হয়েছে, নির্যাতন করা হয়েছে, তাঁর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ততবেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। আরবের অজ্ঞ-লোকেরা তাঁর প্রতি যতই অত্যাচার করেছে, তাঁকে যত কষ্ট দিয়েছে, ততই তাঁর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা বেড়েই চলেছে।

হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) থেকে বর্ণিত আছে,

مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ تَعَالَى فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ بِهَا.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে যখন দু'টি বিষয় থেকে একটি বেঁছে নেয়ার স্বাধীনতা দেয়া হতো, তখন তিনি সহজসাধ্য বিষয়টি বেঁছে নিতেন, যদি কাজটি গোনাহের কাজ না হতো। যদি কাজটি গোনাহের হতো তাহলে তিনি তা থেকে সর্বাধিক দূরে অবস্থান করতেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবনে কখনো তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারে বা ধন-সম্পদের কারণে কারও উপর প্রতিশোধ নেননি। তবে যখন কেউ আল্লাহ তা'আলার হালালকৃত বস্তুকে হারাম করেছে, তখন তিনি তার থেকে প্রতিশোধ নিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি।[১]

বর্ণিত আছে যে, উহুদ যুদ্ধের দিনে যখন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দাঁত মুবারক শহীদ করে দেয়া হয়, তাঁর চেহারা মুবারক রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। এ দৃশ্য সাহাবায়ে কেরামের নিকট অত্যন্ত দুঃখজনক ও কষ্টকর ছিল। এই অসহনীয় অবস্থা দেখে সাহাবায়ে কেরাম হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট আরয করেন, যদি আপনি এই লোকদের প্রতি অভিসম্পাত করতেন। দয়া ও অনুগ্রহের সিন্ধু আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন,

---

১. ক) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু ফীত্ তাজাভিজি ফীল আমরি, ৪:২৫০।
খ) আবু ইয়ামন কিন্দী : তাওয়ালিয়ে মালেক, ১:৩৪৭।

إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا وَلَكِنِّي بُعِثْتُ دَاعِيًا وَرَحْمَةً، اللهمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ،

–আমি মানুষকে অভিসম্পাত করার জন্য প্রেরিত হইনি। বরং আমি আল্লাহর পথে আহ্বানকারী ও রহমত হয়ে প্রেরিত হয়েছি। তিনি দোয়া করেন, হে আল্লাহ! আপনি আমার সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করুন। তারা আমাকে চিনতে পারেনি।

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সম্পর্কে বর্ণিত আছে। একদা তিনি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। হযরত নূহ (আলাইহিস্ সালাম) তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য বদদোয়া করেন। পবিত্র কুরআন মাজীদে এরশাদ করা হয়েছে-

رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ دَيَّارًا

–হে আল্লাহ! যমীনের উপর কাফিরদের মধ্যে কোন বসবাসকারী রেখোনা।[১]

হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি যদি আমাদের জন্য বদদোয়া করেন তাহলে আমরা সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়। অথচ আপনার পিঠ মুবারক বাঁকা হয়ে পড়েছে। আপনার চেহারা মুবারক রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেছে। আপনার দাঁত মুবারক শহীদ করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আপনি সর্বদা আমাদের কল্যাণের জন্য দোয়া করছেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করলেন,

اللهمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ،

–হে আল্লাহ! আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন। তারা আমাকে চিনতে পারেনি।[২]

কাযী আবুল ফযল আয়ায (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সৌভাগ্যমণ্ডিত করুন। একথার প্রতি গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে,

[১]. আল কুরআন : সূরা নূহ, ৭১:২৬।
[২]. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু হাদীসিল গার, ৪:১৭৫।
খ) আবু জাফর তাহাবী : মুশকিলুল আসার, ৬:২৮৭।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে ধৈর্য সহিষ্ণুতা, আখলাকে ফাযিলা, ক্ষমার মহান গুণাবলী কিভাবে প্রদান করা হয়েছে। কেননা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রচণ্ড নির্যাতন ভোগ করা সত্ত্বেও যে শুধু ধৈর্যধারণ করেছেন, তাদেরকে ক্ষমা করেছেন তা নয়, বরং তাদের প্রতি করুনা ও দয়া প্রদর্শন করেছেন। ভালোবাসায় তাদের অন্তর বিগলিত করে দেন। তাদের কল্যাণে দোয়া করে তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট সুপারিশ করেছেন, হে আল্লাহ! আপনি তাদের হিদায়াত দান করুন। তাদের ক্ষমা করে দিন।

অতঃপর 'কাওমী' (قَوْمِي) 'আমার কাউম' শব্দের উল্লেখ করে তাদের প্রতি দয়া ও অনুরাগ প্রদর্শন করেছেন। তাদের অক্ষমতার কথা তুলে ধরে বলেছেন, তারা অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে আমার প্রতি অত্যাচার ও নির্যাতন করেছে।

অপর এক ঘটনায় এক ব্যক্তি অত্যন্ত অশালীন ভাষায় হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে উদ্দেশ্য করে বলল, আপনি ইনসাফের ভিত্তিতে কাজ করুন, কেননা আপনি যেভাবে বন্টন করছেন তা ইনসাফের ভিত্তিতে হচ্ছেনা। এর প্রত্যুত্তরে তিনি তাকে অতিরিক্ত কোনো কথাই বলেননি। বরং লোকটি যা জানত না তাকে তা জানিয়ে দেন। তাকে উপদেশ দান করে বললেন,

وَيْحَكَ ﴿فَمَنْ يَعْدِلُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ؟ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ﴾.

–তোমার জন্য আক্ষেপ। আমি যদি ইনসাফ না করি তাহলে আর কে ইনসাফ করবে? যদি আমি ইনসাফ না করি তাহলে আমি অতি নিকৃষ্ট হয়ে যাবো। তিনি তাকে উপদেশ দান করেন।[১]

এক সাহাবী এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে উদ্যত হলো, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে হত্যা করতে সেই সাহাবীকে নিষেধ করলেন।[২]

একবার হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গাছের নীচে শুয়ে বিশ্রাম নেন। অন্যান্য সাহাবীগণও তখন ঘুমিয়ে পড়েন হঠাৎ চোখ খুলে দেখতে পান যে,

[১]. খাইবারের যুদ্ধের সময় হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গণিমতের মাল বন্টন করতে ছিলেন। এমন সময় আবদুল্লাহ বিন যুল খোয়াইসারা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বন্টনে অসন্তুষ্ট হয়ে দ্বিমত পোষণ করে। কিন্তু ধৈর্যের পাহাড় আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পূর্ণাঙ্গ সহিষ্ণুতার সাথে তাকে জবাব দেন। ইমাম বোখারী ও মুসলিম এ বর্ণনা উল্লেখ করে বলেছেন যে, যুলখোয়াইসারা মুনাফিক ছিলো। হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাতে সে নাহরাওয়ানের যুদ্ধে নিহত হয়। (নাসিমুর রিয়াজ: ২:২৮)
[২]. ক) বুখারী আস সহীহ : হাদীস নং ৩১৫০।
খ) মুসলিম : আস সহীহ ১০৬২।

গোরাছ বিন হারেশ উন্মুক্ত তরবারী হাতে নিয়ে তাঁর শির মুবারকের নিকট দাঁড়িয়ে আছে।[১] তখন সে বললো,

يَا مُحَمَّدُ! مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ فَقَالَ: اللهُ، فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ: فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ كُنْ خَيْرَ آخِذٍ، فَتَرَكَهُ وَعَفَا عَنْهُ، فَجَاءَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدَ خَيْرِ النَّاسِ.

–হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! এখন আমার তরবারীর আক্রমণ থেকে আপনাকে কে রক্ষা করবে? হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অতীব ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, আল্লাহ! এ কথা শুনে তার হাত থেকে তরবারী নীচে পড়ে যায়। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তরবারী হাতে তুলে নিয়ে বললেন, এখন তোমাকে কে রক্ষা করবে? সে বললো, আপনি মহানুভব ও ক্ষমাকারী। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে ক্ষমা করে ছেড়ে দেন। এরপর সে তার কাউমের লোকদের নিকট গিয়ে বলতে লাগলো, ওহে! তোমরা শোনো! আজ আমি সর্বোত্তম ব্যক্তির নিকট থেকে এসেছি।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ক্ষমাশীলতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ঐ ইহুদী মহিলার ঘটনায় বর্ণিত আছে, যে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বিষমিশ্রিত বকরীর গোশত খাইয়েছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করার পর সে তার অপরাধের কথা স্বীকার করে। কিন্তু সহীহ বর্ণনাসমূহে বর্ণিত আছে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে নির্দ্বিধায় ক্ষমা করে দেন।[২]

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে লবীদ বিন আসেম যাদু করে। কিন্তু তিনি তার থেকে কোন প্রকার প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। অথচ এ বিষয় তাঁকে ওহীর মাধ্যমে সবকিছু জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তার সমস্ত কুকীর্তি তাঁর সামনে

৩. সহীহ বোখারী ও বায়হাকী শরীফে বর্ণিত আছে। যাতুর রিকার যুদ্ধ থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের সময় এ ঘটনা সংঘটিত হয়।

২. আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে। বিষ মিশ্রণকারিণী মহিলার নাম ছিলো যয়নাব বিনতে হারেছ। সে মারহাব ইহুদীর বোন ছিলো। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু হযরত বারা বিন আযেব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ঐ গোশত খাওয়ার কারণে ইন্তেকাল করেন। তাই তাঁর মৃত্যুতে কিসাস হিসেবে ওই মহিলাকে হত্যা করা হয়।

ভেসে উঠেছে। কিন্তু তাকে শাস্তি দেয়া তো দূরের কথা বরং নির্দ্বিধায় তাকে ক্ষমা করে দেন। এমনকি তার প্রতি অসন্তুষ্টির ভাবও দেখাননি।

অনুরূপভাবে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই ও তার সঙ্গী-সাথীদের নিকট থেকেও প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। অথচ তিনি তাদের সকল প্রকার কুকর্ম ও চক্রান্ত সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। বরং তখন কোনো সাহাবী ঐ মুনাফিকদের হত্যা করতে উদ্যত হলে তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবীদেরকে এই বলে হত্যা করতে নিষেধ করেন যে,

لَا، لِئَلَّا يَتَحَدَّثُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ.

–না, লোকেরা বলবে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাথীদের হত্যা করে ফেলছে।

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ فَجَبَذَهُ أَعْرَابِيٌّ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً حَتَّى أَثَّرَتْ حَاشِيَةُ الْبُرْدِ فِي صَفْحَةِ عَاتِقِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ احْمِلْ لِي عَلَى بَعِيرَيَّ هَذَيْنِ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ فَإِنَّكَ لَا تَحْمِلُ لِي مِنْ مَالِكَ وَلَا مِنْ مَالِ أَبِيكَ، فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ الْمَالُ مَالُ اللهِ وَأَنَا عَبْدُهُ، ثُمَّ قَالَ وَيُقَادُ مِنْكَ يَا أَعْرَابِيُّ مَا فَعَلْتَ بِي قَالَ لَا، قَالَ لِمَ؟ قَالَ لِأَنَّكَ لَا تكافي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُحْمَلَ لَهُ عَلَى بَعِيرٍ شَعِيرٌ وَعَلَى الْآخَرِ تَمْرٌ.

–একদা আমরা এক সফরে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে ছিলাম। ঐ সময় হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাঁধ মুবারকের উপর শক্ত ডোরা কাটা একখানা নাজরানী চাদর ছিলো। তখন এক বেদুঈন এসেই হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ কাঁধ মুবারকে থাকা চাদরখানাকে সজোরে চেপে ধরেন। সে এতো জোরে টান দেয় যে চাদরের চাপে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাঁধ মুবারকের চামড়া কিঞ্চিৎ খসে যায়। তারপর সে বলতে লাগলো, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি যে দুটি উট নিয়ে

এসেছি আল্লাহ প্রদত্ত মাল থেকে সে উট দুটি বোঝাই করে দেওয়ার হুকুম দিন। কেননা আপনি আপনার নিজের সম্পদ কিংবা বাপদাদার সম্পদ থেকে আমাকে দিচ্ছেন না। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বেদুঈনের কথা শুনে কিছুক্ষণ নীরবতা পালন করেন। অতঃপর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, হাকীকত হলো যে, সম্পদ তো আল্লাহ তা'আলার, আমি তো তাঁর একজন বান্দা মাত্র।

অতঃপর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, হে বেদুঈন! তুমি আমার সাথে যেরূপ ব্যবহার করছো, আমি কি তোমার নিকট থেকে তার প্রতিশোধ নেবো? বেদুঈন বললো, আপনি তা নিতে পারবেন না। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কেনো নিতে পারবো না? প্রত্যুত্তরে বেদুঈন বললো– আপনি মন্দ-কাজের বদলা মন্দ-কাজ দিয়ে নেন না। বেদুঈনের কথা শুনে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃদু হেসে বললেন, এ লোকের এক উট খেজুর আর অপর উট যব দিয়ে বোঝাই করে দাও।

হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) থেকে বর্ণিত আছে,

مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْتَصِرًا مِنْ مَظْلَمَةٍ ظُلِمَهَا قَطُّ مَا لَمْ تَكُنْ حُرْمَةً مِنْ مَحَارِمِ اللهِ وَمَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَرَبَ خَادِمًا وَلَا امْرَأَةً.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবনে কখনো তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারও উপর থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি; তবে যখন কেউ আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করতো তখন তিনি প্রতিশোধ নিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'জিহাদ-ফী-সাবিলিল্লাহ' ছাড়া কাউকে কখনো নিজের হাতে প্রহার করেননি। তিনি কোনো খাদেম ও মহিলাকে কখনো প্রহার করেননি।[১]

একদিন সাহাবায়ে কেরাম হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট নিয়ে এসে বললো, এই ব্যক্তি আপনাকে হত্যা করার সুযোগের অপেক্ষায় আছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন,

[১]. মুসনাদে হুমাইদি, বাবু মুসনাদি আয়েশা, ১:১৭৫।

لَنْ تُرَاعَ لَنْ تُرَاعَ وَلَوْ أَرَدْتَ ذٰلِكَ لَمْ تُسَلَّطْ عَلَيَّ.

–তোমরা কোনো চিন্তা করোনা। তারপর লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, যদি তুমি আমাকে হত্যা করার উদ্দেশে এসে থাকো, তাহলে জেনে রেখো তা কখনো সম্ভব হবেনা। কারণ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে আমার উপর সফল হতে দেবেন না।

যায়িদ বিন সা'না ইহুদী আলেম ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট থেকে তার পাওনা আদায় করে নেয়ার জন্য এসে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চাদর সজোরে চেপে ধরে কঠোর রাগতস্বরে বললো, আবদুল মোত্তালিবের বংশধর হয়েও তুমি আমার পাওনা আমাকে পরিশোধ করছো না। হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাকে ধমক দিয়ে অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় জবাব দেন, অথচ হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃদু হেসে বললেন–

وَأَنَا وَهُوَ كُنَّا إِلَى غَيْرِ هٰذَا مِنْكَ أَحْوَجُ يَا عُمَرُ: تَأْمُرَنِي بِحُسْنِ الْقَضَاءِ وَتَأْمُرُهُ بِحُسْنِ التَّقَاضِي.

–হে ওমর! আমরা উভয়ে তোমার মুখ থেকে এর বিপরীত কথা শুনার আশাবাদী ছিলাম। অর্থাৎ হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এটা বোঝাতে চেয়েছেন যে, এ ব্যক্তির পাওনাটা তুমি আমার নিকট থেকে উত্তমভাবে আদায় করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারতে। আর তাকেও সুন্দর ব্যবহারের বিষয় শিক্ষা দিতে পারতে। অতঃপর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

لَقَدْ بَقِيَ مِنْ أَجَلِهِ ثَلَاثٌ، وَأَمَرَ عُمَرَ يَقْضِيهِ مَالَهُ وَيَزِيدُهُ عِشْرِينَ صَاعًا لِمَا رَوَّعَهُ فَكَانَ سَبَبَ إِسْلَامِهِ.

–এখন এ তোমার পাওনা আদায় করার তিনদিন সময় বাকী আছে। এরপর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বললেন, হে ওমর! এখন যাও! তার পাওনা আদায় করে দাও। অধিকন্তু তুমি তাকে যে ধমক দিয়ে ভয় দেখিয়েছো, সেজন্য আরও বিশ সা' খেজুর ধমকের জরিমানা স্বরূপ দিয়ে দাও। যায়িদ বিন

সা'না হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এ মহিমান্বিত আখলাক প্রত্যক্ষ করে অভিভূত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

যায়িদ বিন সা'না বর্ণনা করেন, আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র জ্যোতিময় মুখমণ্ডলে নবুওয়াতের সমস্ত আলামত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবলোকন করি। কিন্তু দু'টি বিষয়ে আমি সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারিনি। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে– তাঁর এই সহিষ্ণুতা; অধৈর্যতার উপর প্রবল আকার ধারণ করা। অপরটি হচ্ছে, কঠিন অত্যাচার-যুলুম-নির্যাতন তাঁর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতাকে বাড়িয়ে দেয়া। এ দু'টি বৈশিষ্ট্য জানার জন্য আমি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি। কিন্তু আমি তার সাথে রূঢ় আচরণ করার মাধ্যমে তাঁর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা জেনে নিয়েছি। আমি তাঁর সাথে যে ধরণের কঠোর আচরণ করেছি আর তিনি তা অত্যন্ত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে বরণ করেন। মোটকথা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উদার স্বভাব, ধৈর্য-সহিষ্ণুতা, ক্ষমাগুণের বিষয় বর্ণিত ঘটনা অসংখ্য হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। সেই সমস্ত ঘটনা উল্লেখ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি এখানে শুধু ঐ সমস্ত ঘটনাবলীর উল্লেখ করছি, যা সহীহ হাদিসগ্রন্থসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে। তাওরাতের ঐ বর্ণন সমূহ নিশ্চয়তার স্তরে পৌছেছে। সেগুলোই এখানে আলোচনা করছি। জাহিলীয়াতের অন্ধকার যুগে কুরাইশরা তাঁর উপর কতইনা অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে। কিন্তু তিনি তাদের সে কঠোর অত্যাচার ও অমানুষিক নির্যাতনকে অত্যন্ত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে বরণ করেন। এভাবে একদিন সময় এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কুরাইশদের উপর বিজয়ী করে দেন। তিনি তাদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। কুরাইশদের দৃঢ়বিশ্বাস ছিলো যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেবেন। ধরাপৃষ্ঠ থেকে তাদের নাম-নিশানা মুছে দেবেন। অথচ তিনি মহানুভবতা ও অনুকম্পা প্রদর্শন করা ছাড়া আর কিছুই দেখাননি। তিনি তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, فَمَا زَادَ عَلَى أَنْ عَفَا وَصَفَحَ তোমরা আমার নিকট থেকে কেমন ব্যবহার আশা করো? প্রত্যুত্তরে তারা বললো,

مَا تَقُولُونَ إِنِّي فَاعِلٌ بِكُمْ؟ قَالُوا خَيْرًا، أَخٌ كَرِيمٌ وَابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ، فَقَالَ أَقُولُ كَمَا قَالَ أَخِي يُوسُفَ: لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْآيَةَ، اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ.

–আমরা আপনার থেকে কল্যাণ ব্যতীত আর কিছু আশা করিনা। আপনি একজন সম্মানিত ভাই ও সম্মানিত ভাইয়ের পুত্র। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমার ভাই ইউসুফ (আলাইহিস্ সালাম) তাঁর ভাইদের সাথে যেরূপ ব্যবহার করেছেন, আজ আমিও তোমাদের

সাথে সেরূপ ব্যবহার করবো। আজকের দিনে তোমাদের নিকট থেকে কোনো প্রকার প্রতিশোধ গ্রহন করা হবেনা। যাও তোমরা সবাই মুক্ত স্বাধীন।

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

هَبَطَ ثَمَانُونَ رَجُلًا مِنَ التَّنْعِيمِ صَلَاةَ الصُّبْحِ لِيَقْتُلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخِذُوا فَأَعْتَقَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى (وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ) الْآيَةَ.

–একদা আশিজন লোক তানয়ীম থেকে ফজরের নামাযের সময় হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এসেছিলো। তাদের সবাইকে বন্দী করা হয়। অথচ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের সবাইকে মুক্ত করে দেন। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে এরশাদ করা হয়েছে–وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ –এবং তিনিই হন যিনি তাদের হাতকে তোমাদের থেকে প্রতিরুদ্ধ করেছেন।[১]

আর সেই আবু সুফিয়ান যে তার স্বগোত্রকে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বিরুদ্ধে চরমভাবে উত্তেজিত করে তোলে। সে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চাচাকে হত্যা করেছে। তাঁর সাহাবাদের শহীদ করেছে। তাঁদের মৃত দেহের অসম্মান করেছে। নাক, কান, কেটে ফেলছে। চোখ উপড়ে ফেলেছে। কিন্তু যখন তাকে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনে হাযির করা হয়, তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন। অনুকম্পা দেখান। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন,

وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ أَلَمْ يَأْنِ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ؟ فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا أَحْلَمَكَ وَأَوْصَلَكَ وَأَكْرَمَكَ.

–হে সুফিয়ান আল্লাহ তা'আলা তোমার মঙ্গল করুন? এখনও কী তোমার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলার সময় আসেনি? তদুত্তরে আবু সুফিয়ান বলল! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক। আপনি কতই সহিষ্ণু,

১. আল কুরআন : সূরা ফাতাহ, ৪৮:২৪।

আত্মীয়তার সাথে কতইনা সুন্দর আচরণকারী, আপনি কতইনা সম্মানিত।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খুব কমই রাগান্বিত হতেন। যদি কারও উপর অসন্তুষ্ট হতেন, তাহলে অতি শীঘ্রই সন্তুষ্ট হয়ে যেতেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

اَلْجُوْدُ وَالْكَرَمُ

হুযুর (ﷺ) এর দানশীলতা ও মহানুভবতা

জুদ, সাখাওয়াত, সামাহাত এ শব্দগুলোর আভিধানিক অর্থ একই, তবে কেউ কেউ এই শব্দসমূহের অর্থের পার্থক্য নিরূপন করেছেন। তাদের মতে 'করম' (كَرَمْ) শব্দের অর্থ হলো, এমন বস্তু যা মানুষ মনের খুশিতে এমন স্থানে খরচ করে যে স্থানে খরচ করা উত্তম হয় এবং লোকেরা বেশী পরিমাণে উপকৃত হবে বলে আশা করে। মানুষ এটাকে 'হুররিয়্যত' (حُرِّيَّتٌ) বা স্বাধীনতা বলে। এটা 'নুযালাত' (نَذَالَتٌ) বা 'নীচতা' মন্দভাব এর বিপরীত।

আর 'সামাহাত' (سَمَاحَتٌ) শব্দের অর্থ হলো 'ক্ষমাশীলতা'। কোনো ব্যক্তি নিজে অধিক উপযোগী হওয়া সত্ত্বেও মনের খুশীতে অন্যকে দান করে দেয়া। এর বিপরীত শব্দ হলো 'শাকাসাহ' (شَكَاسَةٌ), এটা 'বুখল' (بُخْلٌ), বা 'কৃপণতার' বিপরীত।

আর 'সাখাওয়াত' (سَخَاوَتٌ) এর অর্থ হলো, সহজভাবে কোন কিছু খরচ করা এবং যা নিজের জন্য ভালো নয় তা থেকে বিরত থাকা। এটা হলো 'জুদ' (جُوْدٌ), যা 'সংকীর্ণতা' (اَلتَّقْتِيْرُ) বিপরীত। সুতরাং হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যাবতীয় গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মানুষ যতোটুকু অবগত সে সমস্ত গুণাবলীতে তাঁর সমকক্ষ হবে এমন কেউ আছে কি?

যেমন, হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

مَا سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا.

-হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো দান প্রার্থীকে কোনো দিন 'লা' (لَا) না কথাটি উচ্চারণ করেনি।[১]

[১]. ইবনে হিব্বান : আস সহীহ, ১৪:২৯০ হাদীস নং ৬৩৭৬।

অনুরূপ বর্ণনা হযরত আনাস ও হযরত সাহল (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা) বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ مَا كَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَكَانَ إِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বাধিক দানশীল ছিলেন। রমযান মাস আসলে তাঁর দানশীলতা আরও বৃদ্ধি পেতো। কেননা রমযান মাসে হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) প্রতিদিন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। ফলে তাঁর দানশীলতা প্রবাহিত বায়ুর চেয়ে অধিক গতিশীলতা লাভ করতো।

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে,

سَأَلَهُ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ، وَقَالَ: أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لَا يَخْشَى فَاقَةً.

–একদা এক ব্যক্তি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট কিছু যাঞ্চ্না করে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে এতো বেশি পরিমাণে দান করেন যাতে তার দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান ভরপুর হয়ে যায়। সে তার কাউমের লোকদের নিকট গিয়ে বলতে শুরু করে, এসো সকলে মুসলমান হয়ে যাও। কেননা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এতো বেশী পরিমানে দান করেন, যার ফলে অভুক্ত থাকার ভয় থাকেনা।

এধরণের ঘটনা একবার নয় অনেক বার ঘটেছে।

وَأَعْطَى غَيْرَ وَاحِدٍ مِئَةً مِنَ الْإِبِلِ. وَأَعْطَى صَفْوَانَ مِئَةً ثُمَّ مِئَةً.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার একব্যক্তিকে একশ' একশ' করে উট দান করেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাফওয়ানকে প্রতিবারে একশ' করে তিনশ' উট দান করেন।

তাঁর এই দানশীলতা নতুন কোনো কিছু নয়। বরং নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বেও তাঁর স্বভাবে এরূপ দানশীলতা বিদ্যমান ছিলো। একারণে ওরাকা বিন নওফল বলেন,

إِنَّكَ تَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ.

–আপনি তো দুর্বল ও অসহায়দের দায়িত্বভার বহন করেন, অসহায় ও অক্ষমদের জন্য উপার্জন করেন।

এই হলো তাঁর উদারতার সামান্যতম দৃষ্টান্ত। তিনি হাওয়াজেন গোত্রের বন্দীদেরকে মুক্ত করে দেন। অথচ তাদের সংখ্যা ছিলো ছয় হাজার। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে এতো বেশী পরিমাণে স্বর্ণ দান করেন, যা তিনি বহন করে নিয়ে যেতে সক্ষম হননি।

একবার হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট নব্বই হাজার দিরহাম আসে। তিনি সেগুলি চাটাইয়ের উপর রেখে বন্টন করতে আরম্ভ করেন। কোনো যাঞ্চাকারীকে বঞ্চিত করেননি। এভাবে তিনি সমস্ত দিরহাম দান করে দেন।

وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «مَا عِنْدِي شَيْءٌ، وَلَكِنِ ابْتَعْ عَلَيَّ، فَإِذَا جَاءَنَا شَيْءٌ قَضَيْنَاهُ». فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَا كَلَّفَكَ اللهُ مَا لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ فَكَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنْفِقْ، وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا، فَتَبَسَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعُرِفَ الْبِشْرُ فِي وَجْهِهِ، وَقَالَ: «بِهَذَا أُمِرْتُ».

–এক ব্যক্তি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনে উপস্থিত হয়ে যাঞ্চা করে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন, আমার নিকট তো তেমন কিছু নেই। তুমি যাও কারো নিকট থেকে কর্জ করে নাও, পরে আমার নিকট মাল আসলে পরিশোধ করে দেবো। একথা শুনে হযরত উমর ফারুক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আরয করেন, 'আল্লাহ তো আপনাকে সাধ্যের বাইরে কষ্ট দেন নি' এ কথা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপছন্দ করেন। তখন আনসারের জনৈক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি মুক্ত হস্তে দান করুন। যিনি আরশের অধিপতি তাঁর নিকট থেকে কোনো স্বল্পতার আশংকা করবেন না। একথা শুনে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃদু হাসলেন। তাঁর চেহারা মুবারকে উৎফুল্লতাভাব পরিলক্ষিত হয়। আর তিনি বললেন, আমাকে এরূপ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। ইমাম তিরমিযি এই বর্ণনা উল্লেখ করেন।

হযরত মু'আওভিজ বিন আফরা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ- يُرِيدُ طَبَقًا-، وَأُجْرِ زُغْبٍ - يُرِيدُ قِثَّاءَ- فَأَعْطَانِي مِلْءَ كَفِّهِ حُلِيًّا وَذَهَبًا.

–আমি একদিন একঝুড়ি খেজুর ও একটি লাঠি হাদিয়া হিসেবে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে পেশ করি। তিনি আপনাকে দু'হাতে অঞ্জলি ভরে স্বর্ণ ও অলংকারাদি দান করেন।

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَّخِرُ شَيْئًا لِغَدٍ.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের জন্য কিছুই জমা রাখতেন না।[১]

মোটকথা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দানশীলতার অসংখ্য ঘটনা বিদ্যমান আছে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে,

أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ، فَاسْتَلَفَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصْفَ وَسْقٍ، فَجَاءَ يَتَقَاضَاهُ فَأَعْطَاهُ وَسْقًا، وَقَالَ: «نِصْفُهُ قَضَاءٌ وَنِصْفُهُ نَائِلٌ».

–এক ব্যক্তি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট কিছু চাইলো। তিনি লোকটিকে অর্ধ ওসক (তিন সা) যব দান করেন। ইত্যবসরে অপর এক ব্যক্তি তার পাওনা আদায়ের জন্য আসে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে এক ওসক দেয়ার জন্য আদেশ করে বললেন, অর্ধ ওসক তোমার পাওনা হিসেবে আর বাকী অর্ধ ওসক তোমাকে দান করা হলো।

---

[১]. বায়হাকী : শু'য়াবুল ঈমান, ৩:৫৯ হাদীস নং ১৩৯১।

চর্তুদশ পরিচ্ছেদ

الشَّجَاعَةُ وَالنَّجْدَةُ

হুযুর (ﷺ) এর বীরত্ব ও বাহুবল

শক্তির প্রাচুর্যকে বিবেকের অনুগত করার নাম "শুজাআত" বা বীরত্ব। আর "নাজদত" হলো মৃত্যুর সময় প্রবৃত্তির উপর সন্তুষ্ট থাকা। এরূপ হওয়া সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এগুণে বদান্যতার গুণের মতোই পরিপূর্ণ ছিলেন। একথা সকলে অভিহিত যে, অনেক সময় দেখা যায় যে, কঠিন বিপদের সময় যেখানে বড়ো বড়ো খ্যাতনামা নির্ভীক লোকেরা কোনো কোনো সময় স্বস্থান ছেড়ে পলায়ন করে পেছনে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দৃঢ়তার সাথে সামনে অগ্রসর হয়েছেন। বিন্দুমাত্র পিছপা হননি। হযরত বারা ইবনে আযেব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। একব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করে যে, হুনায়েনের যুদ্ধের সময় আপনারা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে ছেড়ে পলায়ন করেছেন কী? প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বস্থান থেকে একটুও নড়াচড়া করেননি। আমি নিজের চোখে দেখেছি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাদা ঘোড়ার উপর আরোহী অবস্থায় ছিলেন। আবু সুফিয়ান তার ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন এরশাদ করলেন–

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ.

–আমি নবী তাতে কোনো সন্দেহ নেই, আমি আবদুল মোত্তালিবের সন্তান।[১]

সেদিন হুনাইন যুদ্ধের প্রান্তরে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চাইতে অধিক নির্ভীক, দুঃসাহসী বীরপুরুষ কাউকে দেখা যায়নি। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর ঘোড়ার উপর থেকে নীচে অবতরণ করেননি।

---

[১]. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু বুগলাতিন্ নবী..., ৯:৪৯১।
খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ফী গযওয়াতি হুনাইন, ৯:২৪০।
গ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা-আ ফী সুবাতি ইনাদাল কতল, ৬:২৬৮।
ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু হাদিসি বারা ইবনে আযেব, ৩৭:৪২৫।
ঙ) ইবনে আবী শায়বানী : আল মুসান্নাফ, ৬:১৮১।

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে,

فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْكِضُ بَغْلَتَهُ نَحْوَ الْكُفَّارِ وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَامِهَا، أُكُفُّهَا إِرَادَةَ أَنْ لا تُسْرِعَ، وَأَبُو سُفْيَانَ آخِذٌ بِرِكَابِهِ، ثُمَّ نَادَى :يَا لَلْمُسْلِمِينَ.

–যখন মুসলমানরা কাফিরদের সম্মুখীন হয় তখন যুদ্ধের প্রথম দিকে মুসলমানগণ পিছপা হয়ে যায়। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর ঘোড়াকে উত্তেজিত করে কাফিরদের দিকে অগ্রসর হন। হযরত আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি তাঁর ঘোড়ার লাগাম শক্ত করে ধরে রাখি, যাতে তাঁর ঘোড়া দ্রুতগতিতে সামনে অগ্রসর হতে না পারে। আবু সুফিয়ান তার ঘোড়ার উপর আরোহণ করে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য আহবান করতে থাকে।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَضِبَ- وَلَا يَغْضَبُ إِلَّا لِلهِ- لَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ شَيْءٌ.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুধু আল্লাহ তা'আলার জন্য রাগান্বিত হতেন। তিনি রাগান্বিত হলে কেউ তার সামনে দাঁড়াতে পারতো না।

হযরত ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেন,

مَا رَأَيْتُ أَشْجَعَ وَلَا أَنْجَدَ وَلَا أَجْوَدَ وَلَا أَرْضَى مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

–আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চেয়ে অধিক বীরপুরুষ নির্ভীক, দানশীল ও আল্লাহ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট অন্য কাউকে দেখিনি।

হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

إِنَّا كُنَّا إِذَا حَمِيَ الْبَأْسُ- وَيُرْوَى اشْتَدَّ الْبَأْسُ- وَاحْمَرَّتِ الْحَدَقُ، اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يَكُونُ أَحَدٌ أَقْرَبَ إِلَى الْعَدُوِّ مِنْهُ. وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ بَدْرٍ وَنَحْنُ نَلُوذُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى الْعَدُوِّ، وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بَأْسًا.

–যুদ্ধের লেলিহান শিখা যখন দাউ দাউ করে জ্বলতো এবং মুজাহিদগণের চক্ষুসমূহ রক্তিম বর্ণ ধারণ করতো, তখন আমরা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আশ্রয় গ্রহণ করতাম। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বদর যুদ্ধের দিনে আমরা এভাবে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আশ্রয় গ্রহণ করি। এমতাবস্থায় হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শত্রুদের সবচেয়ে বেশী নিকটে অবস্থান করতেন এবং সামনে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন এবং বলতেন তাঁকেই নির্ভীক বলা হয় যে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সব চাইতে নিকটবর্তী হয়। এমন সংকটময় অবস্থায় হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শত্রুদের সর্বাধিক নিকটে অবস্থান করতেন এবং যুদ্ধের ময়দানে তিনি কঠিন ব্যক্তিত্বে পরিণত হতেন।

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ. لَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً، فَانْطَلَقَ نَاسٌ قِبَلَ الصَّوْتِ فَتَلَقَّاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعًا، قَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ، وَقَدْ اسْتَبْرَأَ الْخَبَرَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ، وَالسَّيْفُ فِي عُنُقِهِ وَهُوَ يَقُولُ: «لَنْ تُرَاعُوا».

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বাধিক সুন্দর, সবচেয়ে দানশীল এবং সর্বাধিক সাহসী ছিলেন। এক রাতে মদিনা নগরীতে বিকট শব্দ শোনা যায়, তাতে সকলেই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কিছু লোক মিলিত হয়ে যেদিকে শব্দ হয়েছে সে দিকে অগ্রসর হয়। রাস্তায় হুযুর

(সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে তাঁদের সাক্ষাত হয়। তিনি সকলের আগে আওয়াজের দিকে তাশরীফ নিয়ে যান। আর যখন সেস্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করে খবর নিয়ে আসেন, তিনি হযরত আবু তালহা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ঘোড়ার খালি পিঠে আরোহন করেন। তরবারী তাঁর কাধেঁ ঝুলানো ছিলো। তিনি লোকদেরকে বললেন, ভয় পাবার মতো কিছু ঘটেনি।

হযরত ইমরান বিন হোসাইন (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

مَا لَقِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِيبَةً إِلَّا كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَضْرِبُ. وَلَمَّا رَآهُ أُبَيُّ بْنُ خَلَفٍ يَوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ يَقُولُ: أَيْنَ مُحَمَّدٌ؟ لَا نَجَوْتُ إِنْ نَجَا وَقَدْ كَانَ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَدَى يَوْمَ بَدْرٍ: عِنْدِي فَرَسٌ أَعْلِفُهَا كُلَّ يَوْمٍ فَرَقًا مِنْ ذُرَةٍ أَقْتُلُكَ عَلَيْهَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَا أَقْتُلُكَ إِنْ شَاءَ اللهُ».

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কোনো শত্রুর মুখোমুখি হতেন তখন তিনিই সর্বপ্রথম আক্রমণ করতেন। ওহুদের যুদ্ধের দিনে ওবাই বিন খলফ হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে দেখে বললো- মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোথায়? যদি তিনি আজ প্রাণে বেঁচে যান, তাহলে স্মরণ রাখতে হবে যে আমার আর রক্ষা নেই। এই সেই উবাই বিন খলফ যাকে মুক্তিপণের বিনিময়ে বদরের যুদ্ধের পর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুক্তিদান করেন। তখন সে বলেছিলে, যে আমার ঘোড়াকে প্রতিদিন এক টুকরো ছোলা খাওয়াবো। আমি এর উপর আরোহণ করে আপনার সাথে যুদ্ধ করবো। তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ইনশাআল্লাহ! আমি তোমাকে হত্যা করবো।

ওহুদের যুদ্ধের দিনে যখন সে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে দেখে দ্রুতগতিতে ঘোড়া হাঁকিয়ে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দিকে অগ্রসর হয়, মুজাহিদগণ তাকে বাধা দিতে চাইলে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে করে বললেন, তাকে বাধা দিওনা, আসতে দাও। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন হারেস বিন সামাহ

(রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট থেকে বর্শা হাতে নিয়ে তাকে ডাকেন এসো আমার নিকটে এসো। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বর্শা হাতে দেখে কাফিররা এমনভাবে পালাতে শুরু করে যেভাবে উট পিঠ নীচু করে পলায়ন করে। সে তার দেহ নড়াচড়া করে। অতঃপর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উবাই ইবনে খলফের সামনে গিয়ে ভীষণ জোরে তার ঘাড়ের দিকে বর্শা নিক্ষেপ করেন। যার ফলে সে চিৎপটাং হয়ে ঘোড়ার উপর থেকে মাটিতে পড়ে যায়।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে তার এক পাশের হাড় ভেঙ্গে যায়। সে চিৎকার করে কুরাইশদের দিকে দৌড়াতে শুরু করে আর বলতে থাকে যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে মেরে ফেলেছে। কুরাইশরা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, ভয় পাবার কিছু নেই, সামান্য আঘাত লেগেছে। তুমি সুস্থ হয়ে যাবে। উবাই বললো, আমি যে আঘাত পেয়েছি সেই আঘাত তোমরা পেলে সকলে মরে যেতে। মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে হত্যা করবেন একথা কী বলেননি? খোদার কসম! যদি তিনি আমার উপর থুথুও নিক্ষেপ করেন তাহলেও আমি ধ্বংস হয়ে যাবো। ওহুদ যুদ্ধে থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে সরফ নামক স্থানে তার মৃত্যু হয়।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

الْحَيَاءُ وَالْإِغْضَاءُ

হুযুর (ﷺ) এর লজ্জাশীলতা ও এড়িয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে

যখন মানুষের দ্বারা অশোভনীয় কাজ সংঘটিত হয় তখন মানুষের চেহারা নিন্দা ও অপবাদের মুখোমুখি হবার ভয়ে ভীত হয়। অথবা যে কাজ না করা তার জন্য উচিত ছিলো তাকে হায়া বা লজ্জাশীলতা বলা হয়। আর মানুষ স্বভাবগত যা অপছন্দ করে থাকে তা থেকে উদাসীন ও এড়িয়ে চলাকে ইগদ্বা বলা হয়।

লজ্জাশীলতায় হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন সবচেয়ে অগ্রণী। তিনি ছিলেন অধিক পরিমাণে মন্দকাজ পরিহারকারী। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে—

إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِىَّ فَيَسْتَحْىِۦ مِنكُمْ ۖ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْىِۦ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ

—নিশ্চয় তাতে নবীর কষ্ট হতো। অতঃপর তিনি তোমাদের উঠিয়ে দিতে সংকোচবোধ করতেন কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচবোধ করেন না।[১]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا. وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ. وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَطِيفَ الْبَشَرَةِ، رَقِيقَ الظَّاهِرِ، لَا يُشَافِهُ أَحَدًا بِمَا يَكْرَهُهُ، حَيَاءً، وَكَرَمَ نَفْسٍ.

—হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্তঃপুরবাসিনী কুমারিদের চেয়ে সর্বাধিক লজ্জাশীল ছিলেন। যদি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো জিনিস অপছন্দ করতেন তা তাঁর পবিত্র চেহারা মুবারকে ফুটে উঠতো। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র চেহারা মুবারক ছিলো কোমল নমনীয় সুশ্রী। আর ত্বক ছিলো মসৃণ। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর লজ্জাশীলতাপূর্ণ স্বভাব এরূপ ছিলো যে, অপছন্দনীয় কিছু দেখলে তিনি মুখ খুলে কিছুই বলতেন না।

১. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৫৩।

হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَلَغَهُ عَنْ أَحَدٍ مَا يَكْرَهُهُ لَمْ يَقُلْ: مَا بَالُ فُلَانٍ يَقُولُ كَذَا وَلَكِنْ يَقُولُ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَصْنَعُونَ أَوْ يَقُولُونَ كَذَا» يَنْهَى عَنْهُ، وَلَا يُسَمِّي فَاعِلَهُ.

—যদি কোনো ব্যক্তি থেকে অপছন্দনীয় কোনো কিছু দৃষ্টিগোচর হতো তখন তিনি এমন কথা বলতেন না যে, অমুক ব্যক্তি এমন কথা বলে বা এমন কাজ করে। বরং তিনি এরূপ বলতেন, এই সম্প্রদায়ের যে কি হয়েছে তারা এরূপ কথা বলে বা এরূপ কাজ করে। তিনি সে কাজ করতে নিষেধ করতেন। কিন্তু তিনি তাদের নাম উচ্চারণ করতেন না।

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে,

أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ بِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَيْئًا وَكَانَ لَا يُوَاجِهُ أَحَدًا بِمَا يَكْرَهُهُ فَلَمَّا خَرَجَ، قَالَ: «لَوْ قُلْتُمْ لَهُ يَغْسِلُ هَذَا» وَيُرْوَى يَنْزِعُهَا.

—এক ব্যক্তি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট আসল। তার মুখে হলুদ রংয়ের জাফরান মাখা ছিলো। কিন্তু হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে কিছুই বললেন না। তিনি কারও অপছন্দনীয় কাজের জন্য তার সামনে কাউকে কিছু বলতেন না। লোকটি যখন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট থেকে চলে গেল, তখন তিনি একজনকে বললেন, যদি তোমরা তাকে বলতে সে যেন তার মুখের উপর থেকে রং ধুয়ে ফেলে। অন্য এক বর্ণনায় ধুয়ে ফেলার পরিবর্তে কাপড় খুলে ফেলা এসেছে।

হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে,

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَّاشًا، وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَلَا صَخَّابًا فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ.

—হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অশ্লীলভাষী ছিলেন না। তিনি কাউকে মন্দ বলতেন না। উচ্চস্বরে কোনো কথা বলতেন না। হাটে-বাজারেও কোনো প্রকার শোরগোল করতেন না। তিনি মন্দ কাজের

বদলা মন্দ কাজ দ্বারা নিতেন না। বরং ক্ষমা ও বাৎসল্যই ছিলো তাঁর মহান চারিত্রিক গুণাবলীর বিশেষত্ব।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এরকম গুণাবলীর বিবরণ তাওরাত কিতাবেও বর্ণিত রয়েছে। এর সমর্থনে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ও হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত রয়েছে।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি পবিত্র লজ্জাশোভিত অবস্থার কারণে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে কারো চেহারার প্রতি দৃষ্টিপাত করতেন না। কারো অপছন্দনীয় কিছু দেখলে তিনি কাউকে মুখের উপর কিছু বলতেন না। যদি কাউকে কিছু বলার নিতান্তই প্রয়োজন হতো বা যদি তিনি কিছু বলতে বাধ্য হতেন তাহলে আকার ইঙ্গিতে তাকে বুঝানোর চেষ্টা করতেন।

হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেন,

مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ.

–আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম লজ্জাস্থান কখনো দেখিনি।[১]

[১]. ক) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবুন্ নাহয়ি আই ইউরা আওরাতি আখিহি, ২:৩৪০।
খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবুল মুসনাদিস্ সাবেক, ৫২:৪৯।
গ) বায়হাকী : সুনানুল কুবরা, ৭:৯৪।

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ

حُسْنُ الْعِشْرَةِ وَالْأَدَبِ وَبَسْطِ الْخُلُقِ

হুযুর (ﷺ) এর মহান সদাচার, শিষ্টাচার ও মাধুর্যপূর্ণ চরিত্র প্রসঙ্গে

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মহান ও মহিমান্বিত গুণাবলীর বিস্তারিত বিবরণ হাদিস গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান।

হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মহান চরিত্র ও মহিমান্বিত গুণাবলী প্রসঙ্গে বলেন,

كَانَ أَوْسَعَ النَّاسِ صَدْرًا، وَأَصْدَقَ النَّاسِ لَهْجَةً، وَأَلْيَنِهِمْ عَرِيْكَةً، وَأَكْرِمِهِمْ عِشْرَةً.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদার হৃদয়ের, সত্যভাষী, কোমল স্বভাব ও সর্বোত্তম আভিজাত্যের অধিকারী ছিলেন।

হযরত কায়েস বিন সাআদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

زَارَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ قِصَّةً فِي آخِرِهَا- فَلَمَّا أَرَادَ الِانْصِرَافَ قَرَّبَ لَهُ سَعْدٌ حِمَارًا، وَطِأَ عَلَيْهِ بِقَطِيفَةٍ، فَرَكِبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ سَعْدٌ: يَا قَيْسُ، اصْحَبْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ قَيْسٌ: فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ارْكَبْ» فَأَبَيْتُ. فَقَالَ: «إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ، وَإِمَّا أَنْ تَنْصَرِفَ» فَانْصَرَفْتُ.

–একদা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুগ্রহ করে আমাদের ঘরে তাশরীফ আনেন। তারপর তিনি পুরো ঘটনা বর্ণনা করে বলেন। অতঃপর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রত্যাবর্তনের সময় হযরত সাআদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বাহন হিসেবে কম্বল আবৃত একটি খচ্চর তাঁর সামনে পেশ করলেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এটার উপর আরোহণ করলেন। অতঃপর হযরত সাআদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর পুত্র এর সাথে যাও! হযরত

কায়েস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন, কায়েস তুমি আমার সঙ্গে বসো। আমি আদবের প্রতি লক্ষ্য করে আপত্তি করি। তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হয় তুমি আমার সাথে বসো , নতুবা চলে যাও। সেহেতু আমি ফিরে আসি।

অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন হযরত কায়েস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বললেন,

اِرْكَبْ أَمَامِي فَصَاحِبُ الدَّابَّةِ أَوْلَى بِمُقَدَّمِهَا.

–তুমি আমার সামনে আরোহণ করো। কেননা বাহনের মালিকের অধিকার হলো সামনে বসা।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আচার-ব্যবহার এতই উত্তম ও সুন্দর ছিলো যে, তিনি সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের মন জয় করতেন। তিনি কখনো কারো প্রতি অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ করতেন না, যাতে লোকজন তাঁর নিকট থেকে দূরে সরে না যায়।

তিনি সকল গোত্রের সর্দারদের সম্মান করতেন এবং তাদেরকে স্ব-স্ব গোত্রের বিচারক নিযুক্ত করতেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ বিষয় সর্তক দৃষ্টি রাখতেন। আল্লাহ না করুন যাতে কেউ মনে কষ্ট না পায়। বা এরূপ অবস্থা যাতে না হয় যে তাকে তা থেকে বিরত থাকতে হয়।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মহিমান্বিত চরিত্রের মাধুর্য এমন ছিলো যে, তিনি সাহাবায়ে কেরামগণকে কি অবস্থায় আছেন তাঁদের সে সব বিষয় খোঁজ খবর নিতেন, তিনি এভাবে সাহাবাদের মনজয় করতেন। তিনি তাঁর সাথী, সহচর, অনুচর, সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি ও গুরুত্ব দিতেন। যার কারণে তাঁরা সকলেই মনে মনে ধারণা করতো, মনে হয় তিনিই অন্যান্য সকলের তুলনায় হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অধিক নৈকট্য লাভে ধন্য হয়েছেন। কোন প্রয়োজন প্রার্থী বিশেষ কোনো প্রয়োজনে তাঁর নিকট আসলে বা তাঁর খেদমতে অবস্থানকারী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় চলে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি অধীর আগ্রহ ও ধৈর্যসহকারে তাদের কথা না শুনা পর্যন্ত উঠতেন না। তিনি তাদের কথা শুনতে অপারগতা প্রকাশ করতেন না বা এখন শুনার সময় নেই কখনো এরূপ কথা বলতেন না। যদি কোনো প্রয়োজন প্রার্থী স্বীয় প্রয়োজনের কথা তাঁর নিকট পেশ

করতো, তিনি প্রয়োজন পূর্ণ করে তাকে বিদায় দিতেন। তারপরও তার সাথে এমন মিষ্টি কথা বলতেন যাতে আগন্তুক ব্যাক্তি পরিতুষ্ট হয়ে যেতো।

তাঁর মহিমান্বিত চারিত্রিক গুণাবলীর প্রসন্নতা ও প্রফুল্ল চিত্ততার কারণে তিনি সকলের কাছে পিতৃতুল্য ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে সকল মুসলমান ছিলো এক সমান।

হযরত ইবনে আবি হালা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে,

وَكَانَ دَائِمَ الْبِشْرِ، سَهْلَ الْخُلُقِ، لَيِّنَ الْجَانِبِ، لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ، وَلَا صَخَّابٍ وَلَا فَحَّاشٍ، وَلَا عَيَّابٍ، وَلَا مَدَّاحٍ، يَتَغَافَلُ عَمَّا لَا يَشْتَهِي، وَلَا يُؤْيِسُ مِنْهُ.

–তাঁর স্বভাবে সদা-সর্বদাই প্রাণবন্ততা, প্রফুল্লতা, হাসি-খুশি ও মধুর ভাষা বিদ্যমান ছিলো। তিনি কখনো কটু কথা বলতেন না। কর্কশভাষী ছিলেন না। তিনি উচ্চস্বরে কথা বলতেন না। তিনি অশ্লীল কথা বা কারো কোন দোষের কথা বলতেন না এবং লোকদের অহেতুক প্রশংসাও করতেন না। তিনি অপছন্দনীয় বস্তু সর্বদা পরিহার করতেন এবং কোন বিষয় কখনো হতাশ বা নিরাশ হতেন না।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন মাজীদে এরশাদ হয়েছে–

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ

–অতঃপর কেমনই আল্লাহর কিছু দয়া হয়েছে যে, হে মাহবুব! আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। আর যদি আপনি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হতেন, তবে তারা নিশ্চয় আপনার আশপাশ থেকে সরে যেতো।[১]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ ۚ

–সর্বোত্তম পূণ্য দ্বারা মন্দের মুকাবিলা করো।[১]

১. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:১৫৯।

যে কেউ তাঁকে দাওয়াত দিতো তিনি সানন্দ চিত্তে সে দাওয়াত কবুল করতেন। সে দাওয়াতী খানায় যা কিছু ব্যবস্থা করা হতো তা তিনি সানন্দচিত্তে গ্রহণ করতেন। যদি কেউ সামান্য এক টুকরো গোশত তাঁকে হাদিয়া দিতো, তিনি তাকেও হাদিয়া দিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না।

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي: «أُفٍّ» قَطُّ، وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ: لِمَ صَنَعْتَهُ؟ وَلَا لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ: لِمَ تَرَكْتَهُ؟!

–আমি দশ বছর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে নিয়োজিত ছিলাম। কিন্তু আমি তাঁকে কোন দিন কখনো 'উহ' বলতে শুনিনি বা তিনি কোন দিন আমাকে বলেননি যে, এ কাজ কেন করোনি, বা এ কাজ কেনো করেছো?[২]

হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেন,

مَا كَانَ أَحَدٌ أَحْسَنُ خُلُقًا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا دَعَاهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَلَا أَهْلِ بَيْتِهِ إِلَّا قَالَ: «لَبَّيْكَ».

–প্রশংসিত স্বভাবের ক্ষেত্রে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চেয়ে অধিক উত্তম কেউ ছিলো না। সাহাবায়ে কেরাম অথবা পরিবার-পরিজনের মধ্যে কেউ যদি কখনো তাঁকে সম্বোধন করতো তখন তিনি 'লাব্বাইক' বলে জবাব দিতেন।

হযরত জারির বিন আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ.

[১]. আল কুরআন : সূরা মু'মিন, ২৩:৯৬।

[২]. আব্দুর রায্যাক : আল মুসান্নাফ, ৯:৪৪৩ হাদীস নং ১৭৯৪৬।
ক) আহমদ: আল মুস্নাদ, ৩:১৯৭।
খ) দারেমী : আস সুনান, ১:২০৫ হাদীস নং ৬৩।
গ) মুসলিম : আস সহীহ, ৪:১৮০৪ হাদীস নং ২৩০৯।
ঘ) বায্যার : আল মুসনাদ, ১৩:৬০ হাদীস নং ৬৩৮৬।
ঙ) ইব্ন হিব্বান : আস সহীহ, ৭:১৫৩ হাদীস নং ২৮৯৪।
চ) তবরানী : আল মু'জামুল কাবীর, ২০/৩৩০।

–আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে তাঁর খেদমতে হাযির হতে নিষেধ করেন নি। যখনই আমি তাঁকে দেখেছি তখনই তাকে হাস্যোজ্জ্বল প্রফুল্ল দেখেছি।[১]

তিনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে মজলিসে বসে হাসি-খুশি করতেন। তাদের সাথে খোলাখুলি কথা বলতেন, তাদের বাচ্চাদের কোলে তুলে আদর করতেন। তিনি আযাদ, দাস-দাসী, দরিদ্র, মিসকীন সকলের দাওয়াত গ্রহণ করতেন। নগরীর শেষ প্রান্তে গিয়েও দুস্থ-রোগীদের সেবা শুশ্রূষা করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। তিনি যে কোনো প্রয়োজন প্রার্থীর প্রয়োজন পূর্ণ করতেন।

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

مَا الْتَقَمَ أَحَدٌ أُذُنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُنَحِّي رَأْسَهُ، حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يُنَحِّي رَأْسَهُ، وَمَا أَخَذَ أَحَدٌ بِيَدِهِ، فَيُرْسِلُ يَدَهُ حَتَّى يُرْسِلَهَا الْآخَذُ، وَلَمْ يُرَ مُقَدِّمًا رُكْبَتَيْهِ بَيْنَ يَدَيْ جَلِيسٍ لَهُ. وَكَانَ يَبْدَأُ مَنْ لَقِيَهُ بِالسَّلَامِ، وَيَبْدَأُ أَصْحَابَهُ بِالْمُصَافَحَةِ، لَمْ يُرَ قَطُّ مَادًّا رِجْلَيْهِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ حَتَّى يُضَيِّقَ بِهِمَا عَلَى أَحَدٍ، يُكْرِمُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ، وَرُبَّمَا بَسَطَ لَهُ ثَوْبَهُ، وَيُؤْثِرُهُ بِالْوِسَادَةِ الَّتِي تَحْتَهُ، وَيَعْزِمُ عَلَيْهِ فِي الْجُلُوسِ عَلَيْهَا إِنْ أَبَى، وَيُكَنِّي أَصْحَابَهُ، وَيَدْعُوهُمْ بِأَحَبِّ أَسْمَائِهِمْ، تَكْرِمَةً لَهُمْ، وَلَا يَقْطَعُ عَلَى أَحَدٍ حَدِيثَهُ، حَتَّى يَتَجَوَّزَ فَيَقْطَعُهُ بِنَهْيٍ أَوْ قِيَامٍ.

–কোনো লোক যদি তাঁর কানের নিকট এসে গোপন কোনো কথা বলতো, তিনি তার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত শুনতেন। যে পর্যন্ত গোপন আলাপকারী তার চেহারা না সরাতো ততক্ষণ তিনি চেহারা সরাতেন না। কেউ তাঁর হাত ধরলে যতক্ষণ না সে স্বেচ্ছায় হাত ছাড়তো, ততক্ষণ

[১]. ক) আহমদ : আল মুসনাদ, ওয়া মিন হাদীসি জরীর ইবনে আব্দিল্লাহ, ৪:৩৫৮ হাদীস নং ১৯১৯৬।
খ) বুখারী : আস সহীহ, ৪:৬৫ হাদীস নং ৩০৩৫।
গ) মুসলিম : আস সহীহ, ৪:১৯২৫ হাদীস নং ২৪৭৫।
ঘ) ইব্ন মাজাহ : আস সুনান, ১:৫৬ হাদীস নং ১৫৯।
ঙ) তিরমিযী : আস সুনান, ৫:৬৭৯ হাদীস নং ৩৮২১।
চ) ইবনে হিব্বান : আস সহীহ, ১৬:১৭৫ হাদীস নং ৭২০০।

স্বীয় মুবারক হাত তার হাত থেকে সরিয়ে নিতেন না। সাহাবায়ে কেরামের সামনে কখনো তাঁকে পা মুবারক লম্বা করতে দেখিনি। কেউ তাঁর নিকট আসলে তিনি সর্বপ্রথম তাকে সালাম করতেন এবং তিনি সাহাবাদের সাথে প্রথমে মুসাহাফা করতেন। তিনি কখনো তাঁর সাথী সহচরদের মধ্যে পা মুবারক লম্বা করে বসতেন না, যা দ্বারা অন্য কাউকে তুচ্ছ মনে করা হয়। কেউ তাঁর নিকট এলে তিনি তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং তাঁর স্বীয় চাদর মুবারক বিছিয়ে দিতেন। যদি আগন্তুক ব্যক্তি তাঁর পবিত্র চাদরে বসতে রাজি না হতো, তাহলে তিনি তাকে বসার জন্য পীড়াপীড়ি করতেন। তিনি সাহাবীদের জন্য 'কুনিয়াত' বা উপনাম নির্ধারণ করতেন এবং তাঁদেরকে সুন্দরতম নামে আহবান করতেন। তিনি কারো কথা বলা মাঝখান থেকে বন্ধ করে দিতেন না। যদি কেউ সীমালংঘন করার আশংকা করতো তখন তাকে সীমা অতিক্রম করতে নিষেধ করতেন বা তখন দাঁড়িয়ে যেতেন।[১]

এক বর্ণনায় এমনও এসেছে যে, আগন্তুক সাক্ষাৎপ্রার্থীর খাতিরে নফল নামায সংক্ষিপ্ত করতেন এবং তার প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞেস করতেন এবং আগন্তুকের প্রয়োজন মিটিয়ে দিয়ে পুনরায় নামাযে মনোনিবেশ করতেন।

তিনি সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল ও পবিত্র অবস্থায় থাকতেন। তবে তিনি যখন ওয়াজ-নসিহত করতেন বা কোনো বিষয় ভাষণ দিতেন বা তাঁর উপর ওহী অবতীর্ণ হতো, তখন আর তাঁর মধ্যে সে অবস্থা বিদ্যমান থাকতো না।

হযরত আবদুল্লাহ বিন হারেসা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا، مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

–আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চেয়ে অধিক মুচকি হাসতে আর কাউকে দেখিনি।[২]

---

[১]. আবু দাউদ : আস সুনান, ৪:২৫১ হাদীস নং ৪৭৯৪।
[২]. ক) আহমদ : আল মুসনাদ, ৪:১৯১ হাদীস নং ১৭৭৫০।
খ) তিরমিযী : আস সুনান, ৬:৩৮ হাদীস নং ৩৬৪১।
গ) বায়হাকী : শু'য়াবুল ঈমান, ১০:৩৯৫ হাদীস নং ৭৬৮৭।
ঘ) বাগাবী : শরহুস সুন্নাহ, ১২:৩১৭ হাদীস নং ৩৩৫০।

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

كَانَ خُدَّمُ الْمَدِيْنَةِ يَأْتُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ، بِآنِيَتِهِمْ فِيهَا الْمَاءُ، فَمَا يُؤْتَى بِآنِيَةٍ أَلَّا غَمَسَ يَدَهُ فِيهَا، وَرُبَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ، يُرِيْدُوْنَ بِهِ التَّبَرُّكَ.

–মদিনার বাঁদীরা ফজরের নামাযের পর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট পাত্র ভর্তি পানি নিয়ে আসতো। তিনি প্রতিটি পানির পাত্রে পবিত্র হাত স্থাপন করতেন। তিনি ঠাণ্ডা অনুভব করা সত্ত্বেও শীতের সময়ও পানি স্পর্শ করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। তারা বরকত লাভের জন্য এরূপ করত।[১]

---

[১]. মুসলিম : আস সহীহ, হাদীস নং ২৩২৪।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

اَلشَّفَقَةُ وَالرَّحْمَةُ

হুযুর (ﷺ) এর দয়া ও অনুগ্রহ

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক সৃষ্টিজীবের প্রতি স্নেহ ও মেহেরবাণীর কথা পবিত্র কুরআন মাজীদে এভাবে এরশাদ হয়েছে–

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

–নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য থেকে এমন এক রাসূল আগমন করেছেন, যাঁর নিকট তোমাদের কষ্টে পড়া কষ্টদায়ক, তোমাদের কল্যাণ অতিমাত্রায় কামনাকারী, মুসলমানদের উপর পূর্ণ দয়ার্দ্র দয়ালু।[১]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠٧﴾

–এবং আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বের রহমত করে প্রেরণ করেছি।[২]

কোনো কোনো আলেমদের অভিমত হলো যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মর্যাদাসমূহের মধ্যে এটাও একটা মর্যাদা যে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ মহান দু'নামে ভূষিত করেছেন।[৩] যথা এরশাদ করা হয়েছে–

بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

–মুসলমানদের উপর পূর্ণ দয়ার্দ্র ও দয়ালু।[৪]

হযরত ইউনুস ইবনে শিহাব থেকে বর্ণনা করেন,

غَزَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةً، وَذَكَرَ حُنَيْنًا، قَالَ: فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ مِئَةً مِنَ النَّعَمِ، ثُمَّ مِئَةً، ثُمَّ مِئَةً.

১. আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:১২৮।
২. আল কুরআন : সূরা আম্বিয়া, ২১:১০৭।
৩. আল্লাহ তা'আলা হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দয়ার্দ্র দয়ালু স্বীয় দু'টি সম্মানিত নামে ভূষিত করেছেন।
৪. আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:১২৮।

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হুনায়েনের যুদ্ধে যোগদান করেন। তিনি সাফওয়ান বিন উমাইয়াকে একশ', একশ' করে মোট তিনশ' বকরী দান করেন।[১]

হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সাফওয়ান আমাকে বললেন,

وَاللهِ لَقَدْ أَعْطَانِي مَا أَعْطَانِي وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ الْخَلْقِ إِلَيَّ، فَمَا زَالَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ.

–আমাকে দান করার পূর্বে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার নিকট সবচেয়ে খারাপ ব্যক্তি ছিলেন। (নাউজুবিল্লাহ) কিন্তু আমাকে দান করার পর থেকে তিনি আমার নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত হন।[২]

أَنَّ أَعْرَابِيًا جَاءَهُ يَطْلُبُ مِنْهُ شَيْئًا فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَحْسَنْتُ إِلَيْكَ» ؟ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ: لَا، وَلَا أَجْمَلْتَ فَغَضِبَ الْمُسْلِمُونَ وَقَامُوا إِلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ كُفُّوا، ثُمَّ قَامَ وَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَهُ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ «أَحْسَنْتُ إِلَيْكَ» قَالَ: نَعَمْ فَجَزَاكَ اللهُ مِنْ أَهْلٍ وَعَشِيرَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّكَ قُلْتَ مَا قُلْتَ، وَفِي نَفْسِ أَصْحَابِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ فَقُلْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مَا قُلْتَ بَيْنَ يَدَيَّ، حَتَّى يَذْهَبَ مَا فِي صُدُورِهِمْ عَلَيْكَ» قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ، أَوِ الْعَشِيُّ جَاءَ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذَا الْأَعْرَابِيَّ قَالَ مَا قَالَ فَزِدْنَاهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ رَضِيَ. أَكَذَلِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ فَجَزَاكَ اللهُ مِنْ أَهْلٍ وَعَشِيرَةٍ خيرا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

১. মুসলিম : আস সহীহ, ৭:৭৫।
২. ক) তিরমিযী : আস সুনান, ২:৪৬ হাদীস নং ৬৬৬।
খ) ইবনে হিব্বান : আস সহীহ, ১১:১৫৯ হাদীস নং ৪৮২৮।
গ) আবু উয়ানা : আল মুসনাদ, ১:২১৬।

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلِي وَمَثَلُ هَذَا رَجُلٍ لَهُ نَاقَةٌ شَرَدَتْ عَلَيْهِ، فَاتَّبَعَهَا النَّاسُ فَلَمْ يَزِيدُوهَا إِلَّا نُفُورًا، فَنَادَاهُمْ صَاحِبُهَا: خَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ نَاقَتِي فَإِنِّي أَرْفَقُ بِهَا مِنْكُمْ وَأَعْلَمُ، فَتَوَجَّهَ لَهَا بَيْنَ يَدَيْهَا، فَأَخَذَ لَهَا مِنْ قُمَامِ الْأَرْضِ، فَرَدَّهَا، حَتَّى جَاءَتْ وَاسْتَنَاخَتْ، وَشَدَّ عَلَيْهَا رَحْلَهَا وَاسْتَوَى عَلَيْهَا. وَإِنِّي لَوْ تَرَكْتُكُمْ حَيْثُ قَالَ الرَّجُلُ مَا قَالَ فَقَتَلْتُمُوهُ دَخَلَ النَّارَ».

–একবার জনৈক বেদুঈন ব্যক্তি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আবেদন করে। তিনি তাকে কিছু মাল দান করেন। অতঃপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, আমি কি তোমার সাথে উত্তম আচরণ করেছি? বেদুঈন বলল, না। আপনি আমার প্রতি কোন ইহসান করেন নি। একথা শুনে মুসলমানগণ রাগান্বিত হয়ে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইঙ্গিত করে তাদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেন। তারপর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উক্ত স্থান থেকে উঠে ঘরে তাশরীফ নিয়ে যান। বেদুঈনকে সেস্থান থেকে ডেকে নিয়ে দ্বিতীয়বার আরো কিছু দান করেন। অতঃপর তিনি বেদুঈন লোককে জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা এবার বলতো আমি তোমার প্রতি ইহসান করেছি কি? বেদুঈন বললো, হ্যাঁ! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আপনার আহাল ও খান্দানের মধ্যে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তার কথা শুনে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করলেন, এখন তুমি সঠিক কথাই বলছো। আমি ধারণা করছি তোমার পূর্বের কথায় আমার সাথীদের অন্তরে তোমার সম্পর্কে প্রতিহিংসা রয়েছে। যদি তুমি পছন্দ করো তাহলে আমার সামনে যা বলছো, আমার সাহাবীদের সন্মুখে দ্বিতীয়বার তা বলো। তাহলে তাদের অন্তরে তোমার ব্যাপারে যে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে তা দূর হয়ে যাবে। তখন বেদুঈন ব্যক্তি বললো, ঠিক আছে। তাই পরদিন সকালে অথবা সন্ধ্যায় বেদুঈন পুনরায় ফিরে আসে। তাকে দেখে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, বেদুঈন প্রথমে যা বলেছিল তা ঠিক বলেনি। কিন্তু পরে যখন আমি তাকে আরো দান করি তখন আশা করা যায় যে, সে আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। ব্যাপারটা এ ধরণের নয় কী? বেদুঈন বললো, হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ও আপনার খান্দানকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। অতঃপর

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন যে, আমার ও ঐ ব্যক্তির উদাহরণ হলো ঐ পলায়নকারী উটের মতো যে, লোকজন যতই উটের ধরার জন্য তার পেছনে দৌড়াতে থাকে। কিন্তু লোকজন যতই উটকে ধরার জন্য তার পেছনে দৌড়াতে থাকে। উট ভয়ে তত বেশী দৌড়াতে শুরু করে। এমতাবস্থায় উটের মালিক যদি চিৎকার করে লোকদেরকে বলে যে, তোমরা আমার উটকে আমার হাতে ছেড়ে দাও। কেননা আমি তোমাদের চেয়ে তার প্রতি বেশী দয়ালু ও তার অভ্যাস সম্পর্কে অবগত। তারপর উটের মালিক লোকজনকে সরিয়ে দিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে উটের নিকট পৌছে ঘাস দেখিয়ে তাকে ঘরে বসিয়ে ফেলে। অতঃপর তার পিঠের উপর হাওদা বেঁধে বসে যায়। আমি যদি তোমাদেরকে ছেড়ে দিতাম তাহলে তোমরা অনর্থক কথার জন্য তাকে হত্যা করে ফেলতে আর তার জন্য তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ করতে।

এক বর্ণনায় এসেছে যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

لَا يُبَلِّغْنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِي شَيْئًا فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ.

–তোমাদের মধ্যে কেউ যেনো এমন কথা আমার নিকট না পৌঁছায় যা আমি অপছন্দ করি। কেননা আমি কামনা করি আমার সীনা পাক সাফ থাকুক। (যেন কারো বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখা না দেয়।)[১]

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মাতের প্রতি এতো বেশী স্নেহপরায়ণ ছিলেন। তিনি শরীয়াতের বিভিন্ন বিধানের সহজ সাধ্যতা ও লঘুত্বের দিকে লক্ষ্য রাখতেন। আর কোনো কোনো বিষয় তিনি ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে পরিহার করতেন। যাতে উক্ত আমল উম্মাতের উপর ফরয হয়ে না যায়। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর এরূপ বলা যে,

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ.

–যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্ট কর না হতো তাহলে প্রত্যেক নামাযের অযুর সাথে মিসওয়াক করা ফরয করে দিতাম। অনুরূপভাবে তারাবীহ নামায সংক্রান্ত বিষয় বর্ণিত হাদিস।[১]

১. ক) বায়হাকী : সুনানুল কুবরা, ৮:১৬৬।
খ) বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, বাবুল ফযলি ফী মা ইয়াকুলুল আতাস, ২২:৪৯৪।
গ) আবু শায়খ ইস্পাহানী : আখলাকুন্ নবী, ১:৮৪।

অনুরূপভাবে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবীদেরকে সাওমে বিসাল বা ধারাবাহিকভাবে রোযা পালন করতে নিষেধ করেন।[২]

অনুরূপভাবে কা'বা গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে নামায আদায় করা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অপছন্দ করতেন। কেননা তাতে উম্মাত কষ্টের মধ্যে পড়তে পারে।

অনুরূপভাবে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করতেন। আমি যদি কাউকে ভাল-মন্দ কিছু বলি বা রাগান্বিত হয়ে লা'নত করি, তাহলে আপনি আমার এ লা'নতকে রহমতে রূপান্তরিত করে দিন।

উম্মাতের প্রতি স্নেহপরায়ণতার কারণে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামায সংক্ষিপ্ত করতেন।

তিনি উম্মাতের প্রতি বেশী স্নেহপরায়ণতার কারণে আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে,

أَيُّمَا رَجُلٍ سَبَبْتُهُ، أَوْ لَعَنْتُهُ، فَاجْعَلْ ذَٰلِكَ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً، وَصَلَاةً وَطُهُوْرًا، وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

–যদি আমি কাউকে ভাল-মন্দ কিছু বলি বা লা'নত করি, তাহলে আতমর এ লা'নতকে আল্লাহ তা'আলা যেনো তার জন্য রহমত নৈকট্য

[১]. ক) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবুস্ সিওয়াকি লিস্ সায়েম, ২:১৯৮।
খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ২:৪৬০।
গ) ইবনে হুযাইমা : আস্ সহীহ, বাবুয্ যিকরিদ্ দলীলে আলা আন্নাল আমরা বিস্ সিওয়াক, ১:৭৩।

হযরত যাবেত বিন সাবেত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, একদা রমযান মাসে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারাবীহ নামায পড়েন। তাঁর সাথে সাহাবায়ে কেরামও নামায পড়েন। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে মসজিদে আসতে দেরি করে। সাহাবায়ে কেরাম তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে করতে অধৈর্য্য হয়ে পড়ে। তাই তাঁরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আহবান করে বা দরজায় কড়া নাড়া দেয়। তিনি রাগান্বিত অবস্থায় ঘর থেকে বের হয়ে বললেন, আমি আশংকা করছি যে, যদি তোমার এ কাজে বেশী আগ্রহী হও তাহলে তা তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া হবে। সুতরাং তোমরা তারাবীহ নামায ঘরে পড়ে নেবে। (বুখারী ও মুসলিম)

[২]. বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওমে বিসাল বা একাধারে কয়েক দিন রোযা রাখতেন। তাঁকে এভাবে রোযা রাখতে দেখে সাহাবায়ে কেরামও সাওমে বিসাল রাখা শুরু করে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তা জানতে পারেন, তখন তিনি সাহাবীদের নিষেধ করেন। তাঁরা বললো, আপনি যে সাওমে বিসাল আদায় করেন। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা আমার মতো নয়। আল্লাহ তা'আলা আমাকে রূহানীভাবে পানাহার করান। লোকদের কষ্টের কারণে তিনি এরূপ করতে নিষেধ করেছেন।

ও কুফুরী থেকে পবিত্রতা লাভের উসিলা বানিয়ে দেন। যাতে সে কিয়ামতের দিন তোমার নৈকট্য লাভ করতে পারে।

আর যখন তাঁর বংশধরগণ তাঁকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করতে শুরু করে, তখন হযরত জিবরাইল (আলাইহিস্ সালাম) হাযির হয়ে বললেন, আপনার কাউমের লোকেরা আপনার সম্পর্কে যা বলেছে আল্লাহ তা'আলা তা শুনেছেন। তারা আপনার কথা প্রত্যাখ্যান করছে, তাও আল্লাহ তা'আলা জেনেছেন। এ কারণে তিনি পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিশতাদের হুকুম করেছেন, আপনি যা বলবেন তাঁরা যেনো তা পালন করে। এমতাবস্থায় পাহাড়ের নিয়ন্ত্রণকারী ফিরিশতা এসে সালাম করে বললো, আপনি যদি চান আমাদেরকে আদেশ করুন। আপনি যদি চান আমরা এ পাহাড়দ্বয়কে একত্রিত করে তাদেরকে মাঝখানে রেখে শেষ করে দিই । তাদেরকে ধ্বংস করে দিই। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করলেন,

بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.

–আমি আশা করি যে, হয়তো এদের বংশধরদের থেকে এমন লোক বেরিয়ে আসবে, যারা আল্লাহ তা'আলাকে এক বলে স্বীকার করবে তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করবে না।[১]

ইবনুল মুনকাদেরের বর্ণনায় এসেছে,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَالْجِبَالَ أَنْ تُطِيعَكَ فَقَالَ: «أُوَخِّرُ عَنْ أُمَّتِي لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ».

–হযরত জিবরাইল (আলাইহিস্ সালাম) এসে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীন ও পাহাড়কে আপনার আনুগত্য করার আদেশ করেছেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, আমার উম্মাতের উপর আযাব প্রদানে যেনো বিলম্ব করা হয়। আমি আশা করি যে, তাদেরকে তাওবা করার সুযোগ দেয়া হবে।

হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেন,

مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا.

[১]. ক) নাসায়ী : সুনানুল কুবরা, ৪:৪০৬।
খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু ফাযায়িলি সায়্যিদিল মুরসালীন, ৩:২৭১।

–আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে যখনই হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে দু'টি পন্থার যে, কোন একটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা দেওয়া হতো, তখনই হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সহজতর পন্থাটি গ্রহণ করতেন।[১]

হযরত ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওয়াজ-নসিহত ও উপদেশ প্রদানকালে আমাদের মন-মেজাজের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন, যাতে শ্রোতাদের মন বিগড়ে না যায়।

হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেন,

أَنَّهَا رَكِبَتْ بَعِيرًا وَفِيهِ صُعُوبَةٌ فَجَعَلَتْ تُرَدِّدُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ» .

–একবার আমি একটি দুষ্ট প্রকৃতির উটের উপর আরোহণ করি উটটিকে আগে-পেছনে হেলাতে শুরু করি যাতে সে বশীভূত হয়ে যায়। তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, জীবজন্তুর সাথে নমনীয়তা অবলম্বন করো।

১. ক) আহমদ ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু হাদীসি সায়্যিদি আয়শা, ৫০:৩৫৮।
খ) ইবনে হাজর : ফতহুল বারী, বাবু ইকামাতিল হুদূদ, ১২:৬৬।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

اَلْوَفَاءُ وَحُسْنُ الْعَهْدِ وَصِلَةُ الرَّحِمِ

হুযুর (ﷺ) এর প্রতিশ্রুতি পালন ও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা প্রসঙ্গে

হযরত ইবনে আবুল হামাসা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে আমি তাঁর নিকট থেকে কোনো একটি জিনিস ক্রয় করি, তবে কিছু মূল্য বাকী ছিলো। আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বললাম, আপনি অপেক্ষা করুন আমি বাকী মূল্য নিয়ে এক্ষুনি আসছি। কিন্তু আমি বাড়ি গিয়ে আমার সে প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যাই। তিনদিন পর আমার সে কথা স্মরণ হলে সেখানে গিয়ে দেখি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেখানে অবস্থান করছেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে দেখে বললেন,

يَا فَتَى لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ، أَنَا هُنَا مُنْذُ ثَلَاثٍ أَنْتَظِرُكَ.

–যুবক! তুমি আমাকে কঠিন অবস্থায় ফেলেছো। আমি তিনদিন যাবৎ তোমার অপেক্ষায় এখানে রয়েছি।[১]

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, যখন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট কোন বস্তু হাদিয়া আনা হতো– তিনি তখন বলতেন,

اذْهَبُوا بِهَا إِلَى بَيْتِ فُلَانَةَ، فَإِنَّهَا كَانَتْ صَدِيقَةً لِخَدِيجَةَ، إِنَّهَا كَانَتْ تُحِبُّ خَدِيجَةَ.

–এগুলো অমুক মহিলার নিকট নিয়ে যাও। কেননা সে হযরত খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা)'র বান্ধবী। সে হযরত খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বেশী মুহাব্বত করতো।[২]

হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন,

مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا، وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيُهْدِيهَا إِلَى خَلَائِلِهَا.

১. ক) শায়খ খুদুরী : নুরুল ইয়াকীন ফী সীরাতি সায়্যিদিল মুরসালীন, ১:২৫৯।
খ) ইউসুফ বিন ইসমাঈল নবাহানী : ওয়াসায়িলুল উসূল ইলা শামায়িলির রসূল, ১:২৭৯।
২. উয়ূনুল আসার, ২:৪২৫।

–হযরত খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) এর প্রতি আমার এতো বেশী ঈর্ষা হতো যে অন্য কারো প্রতি এরকম হতো না। কেননা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর কথা খুব বেশী স্মরণ করতেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যদি একটি বকরীও জবাই করতেন, তবে অবশ্যই তা থেকে কিছু অংশ হযরত খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) এর বান্ধবীদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন।

একদা হযরত খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) এর এক বোন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট আসার অনুমতি প্রার্থনা করে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অত্যন্ত আনন্দের সাথে তাঁকে আসার অনুমতি দেন এবং তাঁকে দেখে ভীষণ খুশি হন, তাঁকে যথেষ্ট সম্মান করেন। হাসিমুখে তাঁর সাথে কুশল বিনিময় করেন। আর ওই মহিলা সে স্থান থেকে চলে যাবার পর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

إِنَّهَا كَانَتْ تَأْتِينَا أَيَّامَ خَدِيجَةَ، وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ.

–এ মহিলা খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর জীবদ্দশায় তাঁর নিকট আসা যাওয়া করতো। আরো বললেন, কারও বৈশিষ্ট্যকে সদাচরণের সাথে লালন করা ঈমানের অংশ।[১]

কেউ কেউ হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বৈশিষ্ট্যের এভাবে প্রশংসা করেছেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর নিকটাত্মীয় ব্যতীত অন্যান্য লোকদের মধ্যে উত্তমকে অধমের উপর প্রাধান্য দিতেন। সকলের প্রতি নম্র ব্যবহার করতেন।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

إِنَّ آلَ بَنِي فُلَانٍ لَيْسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ، غَيْرَ أَنَّ لَهُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا.

–যদিও অমুকের পিতার বংশধর আমার উত্তরাধিকারী নয়। কিন্তু তাদের সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকার কারণে আমি তাদেরকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রক্ত সম্পর্ক ও নিকটাত্মীয়দের প্রতি কিরূপ গুরুত্ব দিতেন তার বাস্তব নমুনা হলো এই যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি

---

১. ক) ফয়জুল কদীর, ২:৫৬৭।
খ) আবদুর রহমান সালামী : আদাবুস্ সাহাবা, ১:৬৫।
গ) উইয়ুনুল আসার, ২:৪২৫।

ওয়াসাল্লাম) উমামা বিনতে যয়নব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে কোলে তুলে নিতেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন নামায আদায় করতেন, তখন তিনি তাঁর ঘাড় মোবারকের উপর বসতেন। আবার যখন সিজদায় যেতেন তখন নামিয়ে দিতেন। আবার যখন দাঁড়াতেন কাধে উঠিয়ে নিতেন।[১]

হযরত আবু কাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। একবার বাদশাহ নাজ্জাশীর প্রেরিত এক প্রতিনিধিদল হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে আগমন করে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাঁড়িয়ে তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করেন। সাহাবায়ে কেরামগণ বলেন যে, তাদের খেদমতের জন্য আপনার সাথীগণই যথেষ্ট। আপনি আরাম করুন। তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

إِنَّهُمْ كَانُوا لِأَصْحَابِنَا مُكْرِمِينَ، وَإِنِّي أُكَافِئُهُمْ،

–হিজরতের সময় এরা আমার সাহাবীদের সম্মান(সাহায্য) করেছে। তাই আমি নিজেই তাদের খেদমতের বিনিময় পরিশোধ করতে চাই।[২]

যখন হাওয়াযীন গোত্রের বন্দীদের মধ্যে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দুধ বোন শীমা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) কে আনা হয়, তিনি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট স্বীয় পরিচয় প্রদান করলে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর জন্য নিজের চাদর বিছিয়ে দেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

---

১. হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রিয়তমা কন্যা হযরত যয়নাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার ইন্তেকালের পর তাঁর শিশু কন্যা হযরত উমামা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম লালন-পালন করতেন। তাঁর মা ইহজগতে নেই। তাই হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতি বেশি যত্নবান ছিলেন। নামায পড়া অবস্থায়ও তাঁকে ত্যাগ করা পছন্দ করতেন না। সহীহ বুখারীর বর্ণনায় এসেছে, এ ঘটনা ফজরের নামাযের সময় সংঘঠিত হয়। এখন প্রশ্ন হলো, নামাযরত অবস্থায় শিশুকে উঠানো এবং পড়ে নামিয়ে দেয়া জায়েয কি না? এর প্রতিউত্তর হলো, যখন আমলে কাসীরের কারণে নামায ভংগ হতো না, এটা তখনকার ঘটনা। নামাযে এরূপ করা হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য মুবাহ ও জায়েয ছিলো। হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে হযরত উমামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে কাঁধের উপর উঠানোর কারণ হলো, যাতে আরববাসীরা জানতে পারে যে কন্যা সন্তান ও স্নেহ-মমতা পাওয়ার অধিকারী। কেননা আরববাসীদের নিকট কন্যা সন্তান ঘৃণার পাত্রী ছিলো।

২. ক) বায়হাকী : দালায়িলুন নবুয়্যাত, ২:১৮৩।
খ) তাবরানী : আল আহাদিসুত্ তাওয়াল, বাবু কানু লি আসহাবী মুকরিমীন, ১:২৭।
গ) ইবনে কাসীর : আস্ সিরাতুন্ নববিয়্যাহ, ২:৩১।

إِنْ أَحْبَبْتَ أَقَمْتَ عِنْدِيْ مُكَرَّمَةً مُحَبَّةً، أَوْ مَتَّعْتُكِ وَرَجَعْتِ إِلَى قَوْمِكِ» .

فَاخْتَارَتْ قَوْمَهَا فَمَتَّعَهَا.

–আপনি যদি আমাদের এখানে বসবাস করতে চান তাহলে বলুন, আপনাকে যথাযোগ্য মর্যাদায় এখানে রাখা হবে। আর যদি নিজ গোত্রের নিকট ফিরে যেতে চান তারও ব্যবস্থা করা হবে। তিনি আপন গোত্রে ফিরে যাওয়া পছন্দ করেন, তাই হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাজ-সরঞ্জাম ও পাথেয় সহকারে তাঁকে সসম্মানে তাঁর গোত্রের নিকট পাঠিয়ে দেন।

হযরত আবু তোফায়েল (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا غُلَامٌ، إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ حَتَّى دَنَتْ مِنْهُ، فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: أُمُّهُ الَّتِيْ أَرْضَعَتْهُ.

–আমি একদা বাল্যকালে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে দেখি যে, তাঁর নিকট এক মহিলা আসেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওই মহিলার জন্য নিজের চাদর বিছিয়ে দেন। মহিলা চাদরের উপর বসে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আগন্তুক মহিলা কে? তখন সাহাবীগণ বললেন, ইনি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দুধ মা হযরত হালিমা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা)।[১]

হযরত ওমর বিন সায়েব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَالِسًا يَوْمًا، فَأَقْبَلَ أَبُوهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَوَضَعَ لَهُ بَعْضَ ثَوْبِهِ، فَقَعَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَتْ أُمُّهُ فَوَضَعَ لَهَا شِقَّ

[১]. খাফাজি নাসিমুর রিয়াজ ২য় খণ্ড-৯১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বে হযরত হালিমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা একবার মক্কায় আসলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে চল্লিশটি বকরী ও একটি উট হাদিয়া প্রদান করেন। হাওয়াজেন বিজয়ের পরে আগমনের ঘটনা সঠিক নয়। সম্ভবত আগন্তুক মহিলা হযরত হালিমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কন্যা হযরত শিমা রাদিয়অল্লাহু আনহা। তিনি পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইমাম যাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আগন্তুক মহিলা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুগ্ধপানকারিণী হযরত সুয়াইবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা। ইমাম যাহাবী রাদিআল্লাহু আনহুর এ বর্ণনা সঠিক নয়। কেননা হযরত হালিমা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহা হাওয়াজেন বিজয়ের পূর্বে ৭ম হিজরীতে ইহজগত ত্যাগ করেন।

ثَوْبِهِ مِنْ جَانِبِهِ الْآخَرِ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ أَخُوهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَامَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ. وَكَانَ يَبْعَثُ إِلَى ثُوَيْبَةَ، مَوْلَاةِ أَبِي لَهَبٍ مُرْضِعَتِهِ بِصِلَةٍ وَكِسْوَةٍ، فَلَمَّا مَاتَتْ سَأَلَ مَنْ بَقِيَ مِنْ قَرَابَتِهَا، فَقِيلَ: لَا أَحَدَ.

–একদা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপবিষ্ট ছিলেন। অতঃপর সেখানে তাঁর দুধ পিতা আগমন করেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর জন্য স্বীয় চাদর বিছিয়ে দেন। তিনি সেটার উপর উপবিষ্ট হন। কিছুক্ষণ পর তাঁর দুধ মাতা আসেন এবং তাঁকেও চাদরের এক প্রান্তে বসিয়ে দেন। এর কিছুক্ষণ পর তাঁর দুধ ভাই আসে; তিনি তাঁকে দেখে দাঁড়িয়ে যান এবং তাঁকে সামনে নিয়ে বসান। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সৌহার্দ্যস্বরূপ আবু লাহাবের আজাদকৃত দাসী ও তাঁকে দুধ পানকারিণী ছুয়াইবিয়ার জন্য পোশাক-পরিচ্ছদ ও নগদ অর্থ প্রদান করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লোকদের জিজ্ঞেস করেন, তাঁর কোনো নিকটাত্মীয় আছে কী? লোকেরা বললো, না। তার কোন নিকটাত্মীয় নেই।

হযরত খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) এর হাদীসে উল্লেখ আছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন হেরা গুহা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নিজের ব্যাপারে ভীষণ চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়েন, তখন হযরত খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে লক্ষ্য করে বলেন,

أَبْشِرْ فَوَاللهِ لَا يُخْزِيْكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَقْرِيْ الضَّعِيْفَ، وَتَعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ.

–হে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনার জন্য শুভ সংবাদ। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কখনো লাঞ্ছিত করবেন না। কেননা আপনি তো আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেন। আপনি নিঃস্ব ও অসহায়দের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। অসহায়দের জন্য অর্থ উপার্জন করেন। মেহমানদারী করেন। আপনি সত্যের জন্য বিপদের সময় সাহায্য করেন।

উনবিংশতম পরিচ্ছেদ

تَوَاضُعِهِ ﷺ

হুযুর (ﷺ) এর বিনয় ও নম্রতা

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পূর্ণ বিনয় ও অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি সার্বিক পূর্ণতার উচ্চতম শিখরে উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও বিনয়কে নিজের জন্য পছন্দ করে নেন। তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র অহংকার ছিল না। তাঁর বিনয় ও নম্রতা অনুধাবনের জন্য এই হাদিসই যথেষ্ট।

আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে স্বাধীনতা প্রদান করেন যে, তিনি বাদশাহ নবী হবেন, না বান্দা নবী হবেন। যদি আপনি বাদশাহ হতে চান, তাহলে আপনাকে হযরত সোলাইমান (আলাইহিস্ সালাম) এর ন্যায় রাজত্ব দেওয়া হবে। তিনি বান্দা নবী হতে পছন্দ করেন। তাঁর মধ্যে আবদীয়াতের পূর্ণতা বিদ্যমান ছিল। এ সময় হযরত ইসরাফিল (আলাইহিস্ সালাম) হাযির হয়ে বললেন,

فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَاكَ بِمَا تَوَاضَعْتَ لَهُ أَنَّكَ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ.

–আল্লাহ তা'আলা আপনার এই বিনয়ের কারণে আপনাকে কিয়ামতের দিনে আদম সন্তানদের সর্দার বানিয়েছেন। সকলের আগে আপনি যমিন থেকে উত্থিত হবেন এবং সর্বপ্রথম আপনার শাফায়াত কবুল করা হবে।

হযরত আবু উমামাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে,

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلم مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا، فَقُمْنَا لَهُ، فَقَالَ: «لَا تَقُومُوا كَمَا يَقُومُ الْأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا» . وَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ، وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ

–একদা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লাঠিতে ভর করে আমাদের নিকট আগমন করেন। আমরা তাঁকে দেখে দাঁড়িয়ে যাই। তিনি আমাদের লক্ষ্য করে বললেন, আজমী লোকেরা কাউকে দেখে তার সম্মান প্রদর্শনার্থে যেভাবে দণ্ডায়মান হয়, তোমরা ওরকম দণ্ডায়মান হবে না। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বললেন, আমি আল্লাহ

তা'আলার বান্দাদের মত বসে পানাহার করি এবং অন্যান্য বান্দাদের মত উপবিষ্ট হই।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গাধার পিঠে আরোহণ করতেন এবং তাঁর পিছনে অন্য কাউকে বসাতেন। তিনি দুঃস্থ-অসহায় রোগীর সেবা শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করতে সংকোচ করতেন না। তিনি দরিদ্র-মিসকীনদের সাথে বসে আহার করতেন। যেকোনো গোলাম দাওয়াত করলে তিনি সে দাওয়াত গ্রহণ করতেন। তিনি তাঁর সাহাবীদের সাথে সহজভাবে বসতেন। তিনি মজলিসের যে স্থানে খালি জায়গা পেতেন, সে স্থানে বসে পড়তেন।

হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন,

لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ. إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ،

–তোমরা আমার প্রশংসা ও গুণকীর্তনে অতিরঞ্জিত করে সীমালংঘন করো না। যেমন নাসারা সম্প্রদায় হযরত ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) এর প্রশংসা করেছে। আমি আল্লাহ তা'আলারই বান্দা। তাই তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল বলো।[১]

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে,

أَنَّ امْرَأَةً كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ جَاءَتْهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، قَالَ اجْلِسِي يَا أُمَّ فُلَانٍ، فِي أَيِّ طُرُقِ الْمَدِينَةِ شِئْتِ أَجْلِسُ إِلَيْكِ حَتَّى أَقْضِيَ حَاجَتَكِ» قَالَ: فَجَلَسَتْ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا.

–একদা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট এক অপ্রকৃতিস্থ রমণী এসে বললো, আপনার নিকট আমার প্রয়োজন আছে। তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে অমুকের মাতা

---

১. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু কাওলিল্লাহি ওয়াযকুর ফীল কিতাব..., ১১:২৬২।
খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, প্রথম পরিচ্ছেদ, বাবুস্ সালাম, ৩:৬১।
গ) আবদুর রাযযাক : আল মুসনাদ, ৫:৪৪১।

বসো। তুমি মদিনা শরীফের যে-কোনো অলি-গলি বা যে কোনো স্থানে আমাকে বসতে বলবে, আমি তোমার সাথে সে স্থানে বসবো এবং তোমার প্রয়োজন পূরণ করব। হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, সে মহিলা বসলে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও তার সাথে বসে পড়েন এবং তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন।

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَبُ الْحِمَارَ، وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ.

وَكَانَ يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَى حِمَارٍ مَخْطُومٍ بِحَبْلٍ مِنْ لِيفٍ عَلَيْهِ إِكَافٌ، قَالَ:

وَكَانَ يُدْعَى إِلَى خُبْزِ الشَّعِيرِ وَالْإِهَالَةِ السَّنِخَةِ فَيُجِيبُ.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গাধার উপর আরোহণ করতেন। তিনি নির্দ্বিধায় গোলামদের দাওয়াত কবুল করতেন। বনু কুরাইযার লড়াইয়ের দিনে তিনি যে গাধার উপর আরোহণ করেন তার লাগাম ছিলো খেঁজুর পাতার রশির, আর তার পালান ছিলো খেঁজুর শাখার বাকলের। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে যবের রুটি বা বাসি তরকারী খাবার জন্য দাওয়াত দিলেও তিনি তা সানন্দে গ্রহণ করতেন।

তিনি একবার অনেক পুরাতন কাজওয়ার উপর আরোহণ করে হজ্ব পালন করেন। তার উপর বিছানো ছিল চার দিরহাম মূল্যের একটি পশমী কম্বল। তারপর তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করেন,

اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا لَا رِيَاءَ فِيهِ وَلَا سُمْعَةَ .

–হে আল্লাহ! আপনি আমার হজ্ব কবুল করুন। যাতে কোন রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা ও খ্যাতির মনোভাব নেই।[১]

আর এ ঘটনা তখন সংঘটিত হয়েছে যখন ইসলামের বিজয়ের সূচনা হয়েছে। তিনি সেই হজ্বে একশ' উট কুরবানী করেন।

আর তখন মক্কা নগরী বিজয় হয়। তিনি যখন মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর বিনয় ও কৃতজ্ঞতার ধরন এমন ছিলো যে,

---

১. ক) শামী : সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ, বাবু যিকরি খুরুজিহি মিন..., ৮:৪৫১।
খ) হালভী : সিরাতে হালভীয়্যাহ, বাবু হিজ্জাতিল বিদা'আ, ৩:৩৬২।

তিনি কাজওয়ার সর্বাগ্রের কাষ্ঠখণ্ডের সাথে স্বীয় মস্তক মুবারক এমনভাবে অবনমিত করে রাখেন, মনে হয় যে, তাঁর পবিত্র মাথা কাজওয়ার সাথে একত্রিত হয়ে একাকার হয়ে যাবে।

তাঁর বিনয়ের এমনই এক ধরন ছিলো যে, তিনি বলেছেন,

لَا تُفَضِّلُونِي عَلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى، وَلَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ، وَلَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ، وَلَوْ لَبِثْتُ مَا لَبِثَ يُوسُفُ فِي السِّجْنِ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ.

–তোমরা আমাকে ইউনুস ইবনে মাত্তার উপর মর্যাদা দিওনা। এমনিভাবে অন্যান্য আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) যথা– হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর উপর আমাকে প্রাধান্য দিওনা। আর আমি তো হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) থেকে বেশী সন্দেহ পোষণকারী। আর হযরত ইউসুফ (আলাইহিস্ সালাম) যতো দীর্ঘ সময় কারাগারে ছিলেন, আমিও যদি ততো দীর্ঘ সময় কারাগারে থাকতাম। পরে বাদশার পক্ষ থেকে মুক্তির আহবান পেতাম তাহলে তখনই আহবানকারীর ডাকে সাড়া দিতাম। অথচ হযরত ইউসুফ (আলাইহিস্ সালাম) দীর্ঘ দশ বছর কারাগারে অবস্থান করার পরও বাদশাহ যখন মুক্তির পয়গাম পাঠান, তিনি সঙ্গে সঙ্গেই তা প্রত্যাখান করেন।

একদা এক ব্যক্তি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে 'ইয়া খায়রুল বারিয়া' (يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ) বা "হে সর্বোত্তম সৃষ্টি" বলে সম্বোধন করে। তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ –তিনি তো হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম)। আল্লাহর ইচ্ছায় এই সমস্ত হাদিসসমূহ সামনে আলোচনা করা হবে।

হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা), হযরত হাসান ও হযরত আবু সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম থেকে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বিনয়ের গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। আর কোনো কোনো বর্ণনাকারী আরো বর্ণনা করেছেন যে,

–হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গৃহস্থলীর কাজে সাহায্য করতেন। নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ নিজে ধুয়ে পরিষ্কার করতেন।

নিজের হাতে বকরীর দুধ দোহন করতেন। নিজের কাপড় নিজে সেলাই করে নিতেন। জুতা মুবারক ছিঁড়ে গেলে তা নিজে ঠিক করতেন। তিনি নিজের কাজ নিজের হাতে করতেন। ঘরবাড়ি ঝাড়ু দিতেন। নিজের হাতে উটনী বেঁধে রাখতেন এবং নিজের হাতে উটনীর সামনে ঘাস দিতেন। দাস-দাসীদের সঙ্গে বসে পানাহার করতেন। তিনি আটার খামির তৈরীর কাজে খাদেমদের সহযোগিতা করতেন। নিজে বাজারে গিয়ে পন্যদ্রব্য ক্রয় করে বহন করে নিয়ে আসতেন।

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে,

إِنْ كَانَتِ الْأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا.

–মদিনা শরীফের যে-কোন বাদী এসে তাঁর হাত মুবারক ধরে টেনে নিয়ে যেতো। তাঁরা যেখানে তাঁকে টেনে নিয়ে যেতে চাইতো তিনি সেখানেই চলে যেতেন। তাঁদের প্রয়োজন পূরণ করে দিতেন।

وَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَأَصَابَتْهُ مِنْ هَيْبَتِهِ رِعْدَةٌ. فَقَالَ لَهُ: «هَوِّنْ عَلَيْكَ، فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ، إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ.

–একদা এক ব্যক্তি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ভয়ে কাঁপতে শুরু করে। তিনি বললেন, নিজকে সংবরণ করো, কেঁপো না। আমি কোন বাদশাহ নই। আমি কুরাইশ বংশের এক নারীর সন্তান। তিনি শুকনো গোশতের শুঁটকি ভক্ষণ করতেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

دَخَلْتُ السُّوقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاشْتَرَى سَرَاوِيلَ، وَقَالَ لِلْوَزَّانِ: زِنْ وَأَرْجِحْ. وَذَكَرَ الْقِصَّةَ. قَالَ: فَوَثَبَ إِلَى يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُهَا، فَجَذَبَ يَدَهُ، وَقَالَ: «هَذَا تَفْعَلُهُ الْأَعَاجِمُ بِمُلُوكِهَا، وَلَسْتُ بِمَلِكٍ، إِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِنْكُمْ».

ثُمَّ أَخَذَ السَّرَاوِيلَ فَذَهَبْتُ لِأَحْمِلَهُ فَقَالَ: «صَاحِبُ الشَّيْءِ أَحَقُّ بِشَيْئِهِ أَنْ يَحْمِلَهُ.

–একদা আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে বাজারে গমন করি। তিনি একখানা পায়জামা খরিদ করেন। ওজনকারীকে বললেন, একটু বেশী করে ওজন করো। হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) পুরো ঘটনা বর্ণনা করে বলেন। একথা শুনে দোকানের মালিক হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র হাতে চুম্বন করতে শুরু করে। তিনি হাত মুবারক টেনে সরিয়ে এনে বললেন, এরূপ করা আজমী অনারবীয়দের কাজ। তারা তাদের রাজা-বাদশাহদের সাথে এমনটি করে থাকে। আমি তো কোনো বাদশাহ নই। আমি তোমাদের মধ্যকার একজন মানুষ। এরপর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পায়জামাখানা উঠিয়ে নেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি আগে থেকেই পায়জামা খানা উঠিয়ে নেয়ার ইচ্ছা করি, তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, পণ্যের মালিক পণ্য বহনের অধিক হকদার।[১]

১. ইবনে শায়বা : আল মুসান্নাফ, ৫:২৪৫।

বিংশ পরিচ্ছেদ

اَلْعَدْلُ وَالْاَمَانَةُ وَالْعِفَّةُ وَصِدْقُ اللَّهْجَةِ

ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা, চারিত্রিক পবিত্রতা ও সত্য ভাষণে হুযুর (ﷺ) এর বিশেষত্ব

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক, আমানতদার, সর্বাধিক দয়াপরবশ এবং সত্যবাদী ছিলেন। তাঁর ঘোর শত্রুরাও তাঁর ঐ সমস্ত বিশেষত্বের স্বীকৃতি প্রদান করেছে। নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বে মক্কাবাসীরা তাঁকে 'আল-আমিন' বলে সম্বোধন করতো।

হযরত ইবনে ইসহাক বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে "আল আমিন" বলার কারণ হলো এই যে, তাঁর মধ্যে যাবতীয় সৎগুণাবলীর সমাবেশ ছিলো। আল্লাহ তা'আলার বাণী–

مُطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ﴿۲۱﴾

–সেখানে তাঁর আদেশ পালন করা হয়, যিনি আমানতদার।[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় অধিকাংশ মুফাসসিরগণ এ সত্যের দিকেই গিয়েছেন। 'আল-আমীন' দ্বারা উদ্দেশ্যে হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সম্মানিত সত্তা।

কা'বাগৃহ সংস্কারের সময় কুরাইশদের মধ্যে হাজরে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে মতানৈক্যের কারণে চরম সংকটের উদ্ভব হয়। যে-কোন গোত্রের লোক হাজরে আসওয়াদ স্থাপন করবে। তাই তারা স্থির করে আগামী দিন অতি প্রত্যূষে সর্বপ্রথম যে, কা'বা গৃহে প্রবেশ করবে আমরা সকলে তার মীমাংসা মেনে নেবো।

পরদিন সকালে সর্বপ্রথম হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কা'বা গৃহে প্রবেশ করেন। এ ঘটনা নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বে ঘটেছে। তখন সকলেই বলতে শুরু করে এতো মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। এতো "আল-আমীন"। এখন আমরা সকলে তাঁর মীমাংসা মেনে নেবো।

হযরত রবি' বিন খুসাইম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, জাহিলীয়াতের যুগে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবের লোকেরা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে তাদের মধ্যস্থতাকারী নির্ধারণ করতো।

---

১. আল কুরআন : সূরা তাকভীর, ৮১:২১।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

وَاللهِ اِنِّيْ لَاَمِيْنٌ فِي السَّمَاءِ، اَمِيْنٌ فِي الْاَرْضِ.

–আল্লাহ তা'আলার শপথ, নিশ্চয় আমি আকাশেও বিশ্বস্ত এবং যমীনেও বিশ্বস্ত।[১]

হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে,

اَنَّ اَبَا جَهْلٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّا لَا نُكَذِّبُكَ، وَلٰكِنْ نُكَذِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ.

–একদিন অভিশপ্ত আবু জাহেল হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে উদ্দেশ্য করে বললো, আমরা তো আপনাকে মিথ্যাবাদী বলছি না, আমরা আপনি যে দীন নিয়ে আসছেন সেই দীনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছি।[২]

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন মাজীদে এরশাদ করা হয়েছে–

فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ

–অতঃপর তারা তো আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে না।[৩]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তারা বলে আমরা তো আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করিনা। আর আপনি আমাদের নিকট মিথ্যাবাদী তাও মনে করি না।

কথিত আছে, বদরের যুদ্ধের দিনে আখনাস ইবনে শুরাইক ও আবু জাহেল উভয় একত্রে মিলিত হয়, তখন আখনাস আবু জাহেলকে উদ্দেশ্য করে বললো, হে আবুল হাকাম! (এটা ছিল আবু জাহেলের উপাধি) এখানে আমি ও তুমি ব্যতীত অন্য আর কেউ নেই যে, আমাদের কথা শুনতে পাবে। তুমি এখন আমাকে সত্য করে বলতো দেখি, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্যবাদী, না মিথ্যাবাদী? তখন আবু জাহেল বললো–

---

১. ক) রুইয়ানী : আল মুসনাদ, বাবু হাদিসী আবী রাফে', ১:৪৬২।
খ) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ১:৩৩১।
২. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ওয়া মিন সুরাতি আন'আম, ১০:৩২৮।
খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু ফাযায়িলি সায়্যিদিল মুরসালীন, ৩:২৬৮।
৩. আল কুরআন : সূরা আন'আম, ৬:৩৩।

وَاللهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَصَادِقٌ. وَمَا كَذَبَ مُحَمَّدٌ قَطُّ.

–আল্লাহর শপথ! মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্যবাদী। তিনি আজ পর্যন্ত কখনো একটি কথাও মিথ্যা বলেননি।

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস ও হযরত আবু সুফিয়ান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছে, (তখন আবু সুফিয়ান মুসলমান হয়নি) রোম সম্রাট আবু সুফিয়ানকে হুযুর(সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তোমরা তাঁকে ইসলামের আর্বিভাবের পূর্বে মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত করতে পারছ কি না? তখন আবু সুফিয়ান বললো, না।

নযর ইবনে হারেস একদা কুরাইশদেরকে উদ্দেশ্য করে বললো,

قَدْ كَانَ مُحَمَّدٌ فِيكُمْ غُلَامًا حَدَثًا، أَرْضَاكُمْ فِيكُمْ، وَأَصْدَقَكُمْ حَدِيثًا، وَأَعْظَمَكُمْ أَمَانَةً، حَتَّىٰ إِذَا رَأَيْتُمْ فِي صُدْغَيْهِ الشَّيْبَ، وَجَاءَكُمْ بِمَا جَاءَكُمْ بِهِ قُلْتُمْ: سَاحِرٌ!! لَا وَاللهِ مَا هُوَ بِسَاحِرٍ.

–মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তো বাল্যকাল থেকে তোমাদের মধ্যে লালিতপালিত হয়েছেন। তিনি তোমাদের সকলের নিকট পছন্দনীয় ও তোমরা তাঁকে ভালবেসে আসছো। তিনি তোমাদের সকলের নিকট সত্যবাদী। তিনি তোমাদের মাঝে সকলের চেয়ে আমানতদারীতে মহান। এ মুহূর্তে যখন কেশাগ্রে বার্ধক্যের ছাপ পরিস্ফুটিত হয়েছে, আর তিনি যখন তোমাদের নিকট দীন ইসলাম নিয়ে আগমন করলেন ঠিক তখনি তোমরা তাঁকে "জাদুকর" আখ্যায়িত করতে শুরু করেছো। আল্লাহর শপথ তিনি "জাদুকর" নন।

অপর এক বর্ণনায় আছে,

مَا لَمَسَتْ يده يد امْرَأَةٍ قَطُّ لَا يَمْلِكُ رِقَّهَا.

–তাঁর হাত কখনো কোন নারীর হাতকে স্পর্শ করেনি এবং তার কোন কৃতদাসের উপর হস্তক্ষেপও করেননি।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে রয়েছে,

أَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বাধিক সত্যভাষী ছিলেন।[১]

অপর এক সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

وَيْحَكَ فَمَنْ يَعْدِلُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ. خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ.

–তোমার জন্য আক্ষেপ! আমি যদি ইনসাফ না করি তাহলে আর কে ইনসাফ করবে?

হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেন,

مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে যখন দু'টি কাজের মধ্যে একটি কাজ করার স্বাধীনতা দেয়া হতো, তখন তিনি সহজসাধ্য কাজটি গ্রহণ করতেন। তবে কাজটি যেন গুনাহের না হতো। যদি কাজটি গুনাহের কারণ হতো তাহলে তিনি সে কাজ থেকে দৌড়ে পলায়ন করতেন।[২]

আবুল আব্বাস আল মুবরাদ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, পারস্য সম্রাট কিসরা তার নিজের জন্য দিবসসমূহকে বিভিন্ন কাজের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখে। বাতাস প্রবাহিত হওয়ার দিনকে ঘুমানোর জন্য নির্দিষ্ট করে রাখে। মেঘাচ্ছন্ন দিনকে শিকারের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখে। বৃষ্টি বাদলের দিনকে শরাব পান করে আমোদফূর্তি করার জন্য নির্দিষ্ট করে রাখে। আর মেঘমুক্ত রৌদ্রোজ্জ্বল দিনকে মানুষের প্রয়োজনাদি পূরণ করার নিমিত্তে রাখে।

ইবনে খালুবিয়া বলেন, পারস্য সম্রাট কিসরা তো রাজনৈতিক কাজে প্রজ্ঞাবান ছিলো। এ ধরণের লোকদের প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন মাজীদে এরশাদ করা হয়েছে–

يَعْلَمُونَ ظَٰهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْءَاخِرَةِ هُمْ غَٰفِلُونَ

–তারা জানে চোখের সামনের পার্থিব জীবনকে এবং তারা আখিরাত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত।[৩]

১. শামী : সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ, ১:৪২৮।
২. আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবুত্ তাজাভভুদে ফীল আমরি, ১২:৪০৫।
৩. আল কুরআন : সূরা রূম, ৩০:৭।

কিন্তু আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দিনকে তিনভাগে ভাগ করেন। দিনের এক অংশ আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের জন্য। এক অংশ নিজের পরিবারবর্গের জন্য। আর এক অংশ নিজের ও মানুষের প্রয়োজন মিটানোর জন্য নির্ধারণ করেছেন। তিনি বিশেষ লোকদের দ্বারা সাধারণ লোকদের সাহায্য-সহায়তা করাতেন আর বেশিরভাগ সময় বলতেন,

أَبْلِغُوا حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغِي، فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا آمَنَهُ اللهُ يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ.

–তোমরা ঐ সমস্ত লোকদের প্রয়োজনসমূহ আমার নিকট পৌছানোর চেষ্টা করবে, যারা কোনো বিশেষ অসুবিধার কারণে নিজের প্রয়োজন আমার নিকট পৌছাতে পারেনা। কেননা যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন আমার নিকট পৌছাতে অক্ষম, তোমরা যারা এরূপ অক্ষম ব্যক্তিদের প্রয়োজন আমার নিকট পৌছাবে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সকল প্রকার ভয়ভীতি থেকে মুক্ত রাখবেন।

হযরত হাসান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذُ أَحَدًا بِقَرْفِ أَحَدٍ، وَلَا يُصَدِّقُ أَحَدًا عَلَى أَحَدٍ.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন ব্যক্তিকে অন্যের অপরাধে অভিযুক্ত করতেন না। আর নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো কথা সত্যায়ন করতেন না।[১]

আবু জাফর তাবারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

مَا هَمَمْتُ بِشَيْءٍ مِمَّا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْمَلُونَ بِهِ غَيْرَ مَرَّتَيْنِ، كُلُّ ذَلِكَ يَحُولُ اللهُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَا أُرِيدُ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ مَا هَمَمْتُ بِسُوءٍ حَتَّى أَكْرَمَنِي اللهُ بِرِسَالَتِهِ. قُلْتُ لَيْلَةً لِغُلَامٍ كَانَ يَرْعَى مَعِي

১. আবু দাউদ : আল মারাসিল, বাবুল আদাব, ১:৩৪৮।

: لَوْ أَبْصَرْتَ لِي غَنَمِي حَتَّى أَدْخُلَ مَكَّةَ فَأَسْمُرَ بِهَا كَمَا يَسْمُرُ الشَّبَابُ، فَخَرَجْتُ لِذَلِكَ حَتَّى جِئْتُ أَوَّلَ دَارٍ مِنْ مَكَّةَ سَمِعْتُ عَزْفًا بِالدُّفُوفِ وَالْمَزَامِيرِ لِعُرْسِ بَعْضِهِمْ، فَجَلَسْتُ أَنْظُرُ فَضُرِبَ عَلَى أُذُنَيَّ فَنِمْتُ فَمَا أَيْقَظَنِي إِلَّا مَسُّ الشَّمْسِ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا. ثُمَّ عَرَانِي مَرَّةً أُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ لَمْ أَهُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ بِسُوءٍ.

–আমি আমার সারা জীবনে শুধু দু'বার জাহেলী যুগের কাজের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করি। কিন্তু দু'বারই আল্লাহ তা'আলা আমার ও আমার ইচ্ছার মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে যান। এরপর নবুওয়াত প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত আমি জীবনে আর কখনো এরূপ কাজের ইচ্ছা পোষণ করিনি। ঘটনা হলো এই যে, আমি ও আমার এক সাথী যে আমার সাথে মেষ চরাতো এক রাতে আমি তাকে বললাম, তুমি আমার ছাগলগুলো দেখে রেখো। আমি মক্কা নগরীতে গিয়ে অন্যান্য যুবকদের সাথে গল্পগুজব শুনে আসি। আমি এই উদ্দেশ্যে মক্কার সীমানার প্রথম বাড়িতে পৌছার পর শুনতে পাই যে, সেখানে দফ ও সেমার বাদ্য বাজছে। এ সব বাদ্য-বাজনা এক বাড়িতে বিয়ের উৎসবে চলছে। আমি তা শ্রবণ করার উদ্দেশ্যে সেখানে বসে পড়ি। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাকে সেখানেই ঘুম পাড়িয়ে দেন। আমি গভীর ঘুমে মগ্ন হয়ে পড়ি। আমি ঘুম থেকে জেগে দেখি সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ছে। ব্যাস! ঘুম থেকে উঠে আমি সোজা সেখান থেকে চলে আসি। আমার ইচ্ছা পূরণ হয়নি। এ ধরনের ঘটনা আমার জীবনে আরও একবার ঘটেছে। এরপর আমি আর কখনো এ ধরণের কাজের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিনি।[১]

১. ক) বাযযার : আল মুসনাদ, ২:২৪০।
খ) যুরকানী : শরহে মাওয়াহিবে লাদুনিয়্যাহ, ৯:১২।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

اَلْوَقَارُ وَالصَّمْتُ وَالتَّؤَدَةُ وَالْمُرُوْءَةُ وَحُسْنُ الْهَدِيِ

হুযুর (ﷺ) এর শান-শওকত, নীরবতা, মানবতা ও মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব

হযরত খারেজা বিন যায়েদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَرَ النَّاسِ فِي مَجْلِسِهِ، لَا يَكَادُ يُخْرِجُ شَيْئًا مِنْ أَطْرَافِهِ.

—হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কোনো মজলিসে উপস্থিত থাকতেন, তখন তিনিই হতেন মজলিসের সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁর কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শরীরের পরিসীমা হতে বের হয়ে পড়তো না।[১]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الْمَجْلِسِ احْتَبَى بِيَدَيْهِ ، وَكَذَلِكَ كَانَ أَكْثَرَ جُلُوْسِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَبِيًا.

—হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মজলিসে বসতেন তখন হাত দ্বারা দুই হাঁটু গুটিয়ে নিতেন আর অধিকাংশ সময় তিনি এরূপ 'ইহতিবা'-এর ভঙ্গিতে বসতেন।[২]

হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

أَنَّهُ تَرَبَّعَ، وَرُبَّمَا جَلَسَ الْقُرْفُصَاءَ، وَكَانَ كَثِيْرَ السُّكُوتِ، لَا يَتَكَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ. يُعْرِضُ عَمَّنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ جَمِيلٍ. وَكَانَ ضَحِكُهُ تَبَسُّمًا، وَكَلَامُهُ فَصْلًا، لَا فُضُوْلَ وَلَا تَقْصِيْرَ. وَكَانَ ضَحِكُ أَصْحَابِهِ عِنْدَهُ التَّبَسُّمُ تَوْقِيْرًا لَهُ وَاقْتِدَاءً بِهِ. مَجْلِسُهُ مَجْلِسُ حِلْمٍ وَحَيَاءٍ وَخَيْرٍ وَأَمَانَةٍ، لَا تُرْفَعُ فِيهِ

---

[১]. ক) আবু দাউদ : আল মারাসিল, বাবু আওয়ালিন্ নাস ফী মজলিসিহি, ২:৮৫।
খ) উয়ূনুল আসার, ২:৪২৭।

[২]. ক) বাগভী : শরহুস্ সুন্নাহ, বাবু কাইফিয়্যাতিন্ নওমি, ১২:৩২৪।
খ) মহিউস্ সুন্নাহ : আল আনোয়ার ফী শামায়িলিন নবিয়্যিল মুখতার, বাবু ফী সিফাতি জুলুসিহি, ১:৩৫৫।
গ) নক্বী উদ্দীন মুকরেজী : ইমতিনাউল আসমা, ২:২৫৯।

الْأَصْوَاتُ وَلَا تُؤْبَنُ فِيهِ الْحُرَمُ إِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَ جُلَسَاؤُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ.

—হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুবারক দু'হাত দিয়ে হাঁটুদ্বয়কে বেষ্টন করে চারজানু হয়ে বসতেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সবচেয়ে বেশী নীরবতা প্রিয় ছিলেন। তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো কথা বলতেন না। যদি কেউ কখনো অসুন্দর কথা বলত তখন তার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বদা মুচকি হাসতেন। তাঁর কথা ছিলো স্পষ্ট ও পৃথক। তিনি অতিরিক্ত কোনো কথা বলতেন না। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাসি কখনো সীমা অতিক্রম করতো না। তাঁর উপস্থিতিতে সাহাবায়ে কেরামের হাসিও তাঁর অনুসরণ অনুযায়ীই হতো। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মুবারক মজলিস ছিলো ধৈর্য, লজ্জাশীলতা, কল্যাণ ও আমানতের মজলিস। ঐ মজলিসে কখনো উচ্চ আওয়াজ উচ্চারিত হতো না। আর কোনো প্রকার মন্দ কথাও বলা হতো না। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কথা বলতেন, তখন সাহাবাগণ মস্তক এমনভাবে অবনত করে রাখতেন, মনে হতো যেন তাঁদের মাথার উপর পাখি বসে আছে যে, মাথা একটু নড়াচড়া করলে পাখিগুলো উড়ে যাবে।[১]

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চলাফেরা ধীরস্থির ও মর্যাদাসম্পন্ন ছিলো। তিনি ছিলেন ধীর প্রকৃতির। তিনি যখন হাঁটতেন তখন ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটতেন, যেনো তিনি উপর থেকে নিচের দিকে নামছেন।

অপর এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

إذا مَشَى مُجْتَمِعًا، يُعْرَفُ فِي مِشْيَتِهِ أَنَّهُ غَيْرُ غَرَضٍ وَلَا وَكِلٍ. أَيْ غَيْرِ ضَجِرٍ وَلَا كَسْلَانَ.

---

[১]. ক) শফিউর রহমান মুবারকপুরী : আর রাহীকুল মাখতুম, বাবু কামালিন্ নফস ওয়া মাকারিমিল আখলাক, ১:৪৭৯।
খ) শামী : সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ, প্রথম পরিচ্ছেদ, বাবু ফী সিফাতি কালামিহি, ৭:১৩০।

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন হাঁটতেন তখন তিনি সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিপুণতার সাথে চালাতেন। তাঁর চলার গতি ছিলো শক্তিতে ভরপুর যাতে কোনোরূপ শৈথিল্য, আলস্য বা স্থবিরতা ছিলো না।[১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

إِنَّ أَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

–সর্বোত্তম জীবনাদর্শ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জীবনাদর্শ।[২]

হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে,

كَانَ فِي كَلَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْتِيلٌ وَتَرْسِيلٌ.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সহজসাধ্যভাবে ভারসাম্যপূর্ণ স্বরে স্পষ্ট কথা বলতেন।[৩]

হযরত ইবনে হালাহ (রাদিয়া ল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

كَانَ سُكُوتُهُ عَلَى أَرْبَعٍ. عَلَى الْحِلْمِ، وَالْحَذَرِ، وَالتَّقْدِيرِ، وَالتَّفَكُّرِ.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চার কারণে নীরবতা পছন্দ করতেন। (১) সহিষ্ণুতা, (২) আল্লাহর ভয় (৩) তাকদীর (৪) তাফাক্কুর বা ধ্যানমগ্নতায়।[৪]

হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বর্ণনা করেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ أَحْصَاهُ.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমনভাবে কথা বলতেন যে,তাঁর পবিত্র মুখ থেকে নির্গত শব্দগুলোকে গণনাকারীর গণনা করা সম্ভব হতো।[৫]

---

১. আলী ইবনে নায়িফ সুহদী : মুসুয়াতুদ্ দিফায়ি আন রাসূলিল্লাহি, বাবুস্ সিরূরি ফী ইসমি মুহাম্মদ, ২:২৭৬।
২. ক) সুবুকী : মুশারিকুল আসার আলা সাহহাহিল আসার, বাবু ফসলিল ইখতিলাফি ওয়া আলওয়াহম, ২:৫৩৩।
খ) বাযযার : আল মুসনাদ, বাবু আহসানিল হুদা..., ৬:৬।
গ) খতীবে বাগদাদী : তাকয়িদুল ইলম, ১:৮৯।
৩. নকী উদ্দীন মুকরিযী : ইমতাউল আসমা, ২:২৬০।
৪. উয়ূনুল আসার, ২:৪১৬।
৫. ক) বায়হাকী : আল মাদখাল ইলা সুনানাল কুবরা, বাবু তাবয়ীনিল হাদীস ওয়া তারতিলিহী, ১:৩৫৪।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুগন্ধিময় পরিবেশ খুব ভালবাসতেন। অধিকাংশ সময় সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। তিনি এ মর্মে এরশাদ করছেন,

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ.

–তোমাদের দুনিয়ার দু'টি জিনিস আমার নিকট অতি প্রিয়, তন্মধ্যে একটি হলো নারী আর অপরটি হলো সুগন্ধি। আর নামাযের মধ্যে রয়েছে আমার চোখের শীতলতা।[১]

এ ছিলো তাঁর ব্যক্তিত্ব বা সংযত আচরণের অন্যতম কারণ। তিনি খাদ্য বা পানীয় বস্তুতে ফুঁক দিতে নিষেধ করতেন। সামনে যে খাবার রাখা হতো তাই খাওয়ার জন্য আদেশ করতেন। যথা মিসওয়াক করা, মুখ ও আঙুলের ফাঁক ও জোড়াসমূহ ভালোভাবে পরিষ্কার করার আদেশ করতেন। অর্থাৎ ফিতরাত পূর্ণ করার তাকিদ দিতেন।[২]

খ) হুমাইদী : আল মুসনাদ, বাবু আহাদিসি আয়শা, ১:২৮১।
১. ক) বায়হাকী : সুনানুল কুবরা, ৭:৭৮।
খ) মোল্লা আলী কারী : মিরকাতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু ফযলিল ফুক্বারায়ি, ১৫:১৭১।
গ) ইবনে রজব হাম্বলী : জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ৩১:২২।
২. এ পাঁচটি জিনিস হলো হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফিতরাতের অন্তর্ভূক্ত। ১. খতনা করা, ২. নাভীর নীচের লোম পরিষ্কার করা, ৩. গোফ খাটো করা, ৪. দাড়ি লম্বা করা, এবং ৫. নখ কাটা।

দ্বা-বিংশ পরিচ্ছেদ

اَلزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا

হুযুর (ﷺ) এর দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর স্বভাবে যুহ্দ বা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির বিবরণ সম্পর্কিত হাদিস পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আমার ধারণা হলো আমাদের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তিনি দুনিয়ার প্রতি লোভ লালসা থেকে সর্বাধিক মুক্ত ছিলেন। আর তিনি দুনিয়ার চাকচিক্য সর্বাধিক পরিত্যাগকারী ছিলেন।

অথচ দুনিয়ার যাবতীয় আরাম-আয়েশের সামগ্রী তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছিলো। একের পর এক যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন। কিন্তু দেখা যায় যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেন তখন তাঁর সম্পদ ছিলো একটি বর্ম, তাও আবার এক ইহুদীর নিকট বন্ধক ছিলো। দুনিয়া থেকে বিদায়ের পর তা বিক্রি করে তাঁর পরিবার পরিজনের খাদ্যের অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অধিকাংশ সময় দোয়া করতেন,

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا.

–হে আল্লাহ! আমার বংশধরদের জীবনধারণ যোগ্য জীবিকার ব্যবস্থা করো।[১]

হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেন,

مَا شَبِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعًا مِنْ خُبْزٍ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনো একাধারে তিন দিন পেট পূর্ণ করে গমের রুটি আহার করতে পারেন নি। আর এমন অবস্থায় তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।[২]

---

১. ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ফীল কিফাফি ওয়াল ক্বানায়াতি, ৫:২৭৭।
খ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফী মায়িশাতিন্ নবী, ৮:৩৬৪।
গ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু ক্বানা'আত, ১২:১৬৯।
২. ক) নকী উদ্দীন মুকরেযী : ইমতিনাউল আসমা'আ, ৭:২৬৭।
খ) ইয়াহইয়া হিরদী : বাহিযাতুল মাহাফিল ওয়া বাগিয়্যাতুল আমাসিল, ২:২৯১।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ، وَلَوْ شَاءَ لَأَعْطَاهُ اللهُ مَا لَا يَخْطُرُ بِبَالٍ.

–একাধারে কখনো দু'দিন যবের রুটি পাননি। অথচ তিনি যদি চাইতেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এতো বেশী পরিমাণ রিযিক দান করতেন, যা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না।[১]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

مَا شَبِعَ آلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ، حَتَّى لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পরিবারবর্গ একদিনও উদরপূর্ণ করে গমের রুটি আহার করতে পারেন নি। এমনি অবস্থায় তাঁর ওফাত হয়।

হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেন,

مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا، وَلَا دِرْهَمًا. وَلَا شَاةً، وَلَا بَعِيرًا.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) না রেখে গেছেন কোনো দীনার, দিরহাম, না কোনো উষ্ট্র, বকরী।[২]

হযরত আমর ইবনে হারেছ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণনা করেন,

مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا سَلَاحَهُ وَبَغْلَتَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্যে হাতিয়ার ঘোড়া ও তাঁর সাদকার ভূমি ছাড়া আর কিছুই রেখে যান নি।

---

১. ক) ইউসুফ বিন নাবহানী : ওয়াসায়িলুল উসূল ফী শামায়িলির রসূল, ১:১৫৪।
খ) আবুল ফাতেহ : উইয়ূনুল আসার, বাবু যিকরি জামিলি মা আখলাকিহি, ২:৪০৩।
২. ক) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ১১:৪৩৩।
খ) দারে কুতনী : আস্ সুনান, বাবুল ইহাবস, ১০:১৯০।

হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেন,

وَلَقَدْ مَاتَ وَمَا فِي بَيْتِي شَيْءٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَطْرَ شَعِيرٍ فِي رَفٍّ لِي.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেন, তখন তাঁর গৃহে খাবার যোগ্য অতি সামান্য পরিমাণ যব ব্যতীত আর কিছুই ছিলো না। তাও সেগুলো তাকের উপর রক্ষিত ছিলো।[১]

হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বর্ণনা করেছেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

إِنِّي عُرِضَ عَلَيَّ أَنْ يَجْعَلَ لِي بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا فَقُلْتُ: لَا يَا رَبِّ، أَجُوعُ يَوْمًا، وَأَشْبَعُ يَوْمًا. فَأَمَّا الْيَوْمُ الَّذِي أَجُوعُ فِيهِ، فَأَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ وَأَدْعُوكَ، وَأَمَّا الْيَوْمُ الَّذِي أَشْبَعُ فِيهِ فَأَحْمَدُكَ وَأُثْنِي عَلَيْكَ.

–আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাকে বলা হয়েছে যে, আমি যদি ইচ্ছা করি তাহলে মক্কার পাহাড়সমূহ আমার জন্য স্বর্ণে পরিণত করে দেয়া হবে। আমি তখন আবেদন করি, হে আমার রব! আমাকে এ পরিমাণ দান করুন যাতে আমি একদিন খেতে পারি, আর আরেকদিন অভুক্ত থাকতে পারি। সুতরাং যেদিন আমি অনাহারে থাকবো সেদিন যেন আপনার দরবারে কান্নাকাটি করে আপনার নিকট প্রার্থনা করতে পারি। আর যেদিন আহার করবো সেদিন আপনার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে আপনার প্রশংসা ও গুণগান করতে পারি।[২]

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে,

أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكَ: أَتُحِبُّ أَنْ أَجْعَلَ هَذِهِ الْجِبَالَ ذَهَبًا، وَتَكُونَ مَعَكَ حَيْثُمَا كُنْتَ. فَأَطْرَقَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «يَا جِبْرِيلُ. إِنَّ الدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ. وَمَالُ مَنْ لَا مَالَ

১. ক) আবুল ফাতেহ : উয়ূনুল আসার, বাবু যিকরি জামালিন মিন আখলাক্বিহি, ২:৪০৩।
খ) ইয়াহইয়া হিরযী : বাহিয়াতুল মাহাফিল ওয়া বাগিয়্যাতুল আমাসিল, ২:২৯১।
গ) শায়খ খুযুরী : নূরুল ইয়াক্বীন ফী সিরাতি সায়্যিদিল মুরসালীন, বাবু যুহদিহি ফীদ্ দুনিয়া, ১:২৬২।
২. ক) হালভী : সিরাতে হালভীয়া, বাবু ইয়াযুকুরু ফীহি সিফাতিহি, ৩:৪৮০।
খ) শায়খ খুযুরী : নূরুল ইয়াক্বীন ফী সিরাতি সায়্যিদিল মুরসালীন, বাবু যুহদিহি ফীদ্ দুনিয়া, ১:২৬২।

لَهُ، قَدْ يَجْمَعُهَا مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ» . فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: ثَبَّتَكَ اللهُ يَا مُحَمَّدُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ.

–একদা হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সালাম জানিয়ে বলেছেন, আপনি ইচ্ছে করলে পাহাড়সমূহ স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দেবেন। আর আপনি যে স্থানে যাবেন পাহাড়গুলো আপনার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে যাবে? একথা শুনে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ নীরবতা পালন করে বললেন, হে জিবরাঈল! নিশ্চয় দুনিয়া ঐ লোকের ঘর যার কোনো ঘর নেই। দুনিয়া ঐ লোকের সম্পদ যার কোনো সম্পদ নেই। আর দুনিয়ার ধন-সম্পদ ঐ নির্বোধ ব্যক্তিই জমা করতে পারে যার কোনো জ্ঞান নেই। হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) বললেন, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এ সুদৃঢ় বাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বর্ণনা করেন,

إن كنا آل محمد لنمكث شَهْرًا مَا نَسْتَوْقِدُ نَارًا إِنْ هُوَ إِلَّا التَّمْرُ وَالْمَاءُ.

–আমরা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পরিবারের অবস্থা এমন ছিলো যে, দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত আমাদের ঘরে খাদ্য পাকানোর জন্য চুল্লিতে আগুন জ্বলতো না। ঐ সময় আমাদের খেজুর ও পানি ছাড়া কোনো খাবার থাকতো না।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে,

تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَشْبَعْ هُوَ وَأَهْلُ بَيْتِهِ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ওফাত হয়েছে, অথচ তাঁর পরিবারবর্গের উদরপূর্তি করে যবের রুটি আহার করা ভাগ্যে জুটেনি।

হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা), হযরত আবু উমামা, হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) থেকে এ ধরণের বর্ণনা রয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِيتُ هُوَ وَأَهْلُهُ اللَّيَالِيَ الْمُتَابِعَةَ طَاوِيًا، لَا يَجِدُوْنَ عَشَاءً.

—হুযুর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও তাঁর পরিবারবর্গ একাধারে কয়েক রাত অনাহারে কাটাতেন, ঐ সময় তাঁদের ঘরে কোনো খাদ্য থাকতো না।

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

مَا أَكَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خِوَانٍ، وَلَا فِي سُكُرُّجَةٍ، وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ وَلَا رَأَى شَاةً سَمِيطًا قَطُّ.

—হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনো টেবিলে বা প্লেটে আহার করেননি এবং তাঁর জন্য পাতলা চাপাতি রুটিও তৈরি করা হতো না। আর তাঁর সামনে কখনো পুরো বকরীর গোশতও দেখা যায়নি।[১]

হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ) বর্ণনা করেন,

إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ أَدَمًا، حَشْوُهُ لِيفٌ.

—হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বিছানায় একটি কম্বল ছিলো। তা খেজুর গাছের ছালে ভর্তি ছিলো।

হযরত হাফসা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেন,

كَانَ فِرَاشُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ مِسْحًا نَثْنِيهِ ثَنْيَتَيْنِ، فَيَنَامُ عَلَيْهِ فَثَنَيْنَاهُ لَهُ لَيْلَةً بِأَرْبَعٍ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ «مَا فَرَشْتُمُوا لِي اللَّيْلَةَ» ؟ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «رُدُّوهُ بِحَالِهِ. فَإِنَّ وَطْأَتَهُ مَنَعَتْنِي اللَّيْلَةَ صَلَاتِي» . وَكَانَ يَنَامُ أَحْيَانًا عَلَى سَرِيرٍ مَرْمُوْلٍ بِشَرِيطٍ حَتَّى يُؤَثِّرَ فِي جَنْبِهِ.

—হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বিছানায় একটি কম্বল ছিলো। যা দু'ভাঁজ করে বিছানো হতো। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি

১. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ আলামি কানা ইয়াকুলু..., ৬;৪৩৮।
খ) শামী : সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ, বাবু ফী তাওয়াদ্বিয়িহি, ৭:৪০।

ওয়াসাল্লাম) তাতে আরাম করতেন। এক রাত্রে আমি তা চার ভাঁজ করে বিছিয়েছি, যাতে বিছানা একটু নরম হয়। পরদিন ভোরে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, রাতে তুমি আমার বিছানায় কি বিছিয়ে দিলে? আমি বললাম যা প্রতি রাতে বিছানো হয়, তাই বিছানো হয়েছে। তবে গত রাতে তা চার ভাঁজ করে ছিলাম। তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কখনো এরূপ করবেনা। পূর্বের অবস্থাই ভালো ছিলো। কেননা তোমার নরম বিছানা আমার রাতের নামাযে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনো চৌকির উপর শুয়ে আরাম করতেন। আবার কখনো খেজুরের বিছানায় শয়ন করতেন। তাঁর পবিত্র দেহ মুবারকে বিছানার দাগ লেগে যেতো।

হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বর্ণনা করেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনো পানাহার করে পরিতৃপ্ত হতেন না। অথচ এ বিষয় তিনি কারও নিকট অভিযোগও করতেন না। তাঁর নিকট উদরপূর্ত করে আহার করা থেকে অধিক পছন্দনীয় ছিলো উপবাস থাকা। অধিকাংশ সময় তিনি রাতভর অনাহারে থাকতেন। কিন্তু তাঁর অভুক্ত থাকার পর দিনের রোযা রাখায় কোনো প্রকার ব্যাঘাত হতো না। তিনি স্বাভাবিক নিয়মে রোযা পালন করে যেতেন। অথচ তিনি যদি চাইতেন তাহলে তাঁর রব তাঁকে পৃথিবীর যাবতীয় ধনভাণ্ডার ও সকল প্রকার ফলাফলাদি দান করতেন। কিন্তু তিনি দারিদ্রপূর্ণ জীবন-যাপন করাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনো ক্ষুধায় তাড়নায় পবিত্র পেটের উপর হাত বুলাতেন। তাঁর এ অবস্থা দেখে মুহব্বতের তাড়নায় আমার কান্না এসে যেতো। আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এ অবস্থা দেখে তাঁর পেট মুবারক আমার হাত দিয়ে মালিশ করে দিতাম। তাঁর ক্ষুধায় কাতর অবস্থা দেখে আমি বলতাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনার জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গ হোক। আপনার শরীরের শক্তি সঞ্চারের জন্য যে পরিমাণ পানাহার দরকার তা গ্রহণে ক্ষতির কি আছে। ততোটুকু যদি আপনি দুনিয়া থেকে গ্রহণ করতেন। আমার এ কথা শুনে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করতেন,

يَا عَائِشَةُ. مَالِيْ وَلِلدُّنْيَا، إِخْوَانِي مِنْ أُولِي الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ صَبَرُوا عَلَى مَا هُوَ أَشَدُّ مِنْ هَذَا، فَمَضَوْا عَلَى حَالِهِمْ، فَقَدِمُوا عَلَى رَبِّهِمْ، فَأَكْرَمَ مَآبَهُمْ وَأَجْزَلَ ثَوَابَهُمْ، فَأَجِدُنِي أَسْتَحْيِي إِنْ تَرَفَّهْتُ فِي مَعِيشَتِي

أَنْ يُقَصِّرَ بِي غَدًا دُونَهُمْ. وَمَا مِنْ شَيْءٍ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ اللُّحُوقِ بِإِخْوَانِي وَأَخِلَّائِي،

–হে আয়েশা! আমি দুনিয়া দিয়ে কি করবো। আমার ভ্রাতৃবর্গ যাঁরা উলুল আযম বা দৃঢ়চেতা পয়গাম্বর ছিলেন, তাঁরা তো এর চেয়ে বেশী দুঃখকষ্ট ও বিপদে ধৈর্যধারণ করেছেন। তাঁরা সে অবস্থায় থেকে নিজেদের অবস্থা অতিক্রম করে আপন আপন রবের নিকট পৌঁছে গেছেন। তাঁদের সে অবস্থায় আপন রবের দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে আল্লাহ তা'আলা অনেক অনেক মূল্য দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের অনেক সাওয়াব দান করেছেন। আমি যখন তাঁদের সেই অবস্থার কথা চিন্তা করে আমার নিজের দিকে তাকাই, তখন আমার নিজেকে ভীষণ লজ্জিত মনে হয়। চিন্তা করি যদি আমি এরূপ বিলাসবহুল জীবন-যাপনের কারণে কিয়ামতের দিন তাঁদের পিছনে পড়ে যাই। এটা আমার জন্য ভীষণ কষ্টের কারণ হবে। সুতরাং আমার নিকট আমার ভাইদের দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চাইতে অধিকতর প্রিয় আর কিছুই নেই।

হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বর্ণনা করেন, এ ঘটনার পর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একমাসের অধিক সময়ে এ দুনিয়াতে অবস্থান করেন নি।

ত্রয়োবিংশতম পরিচ্ছেদ

اَلْخَوْفُ مِنَ اللهِ وَالطَّاعَةُ لَهُ وَشِدَّةُ الْعِبَادَةِ

হুযুর (ﷺ) এর খোদাভীতি, আনুগত্য ও ইবাদতে কঠোরতা

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আল্লাহভীতি, আনুগত্য ও ইবাদত–এসব ছিলো আল্লাহ তা'আলার ইলম ও মারিফাত অনুযায়ী।

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন,

لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا.

–আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে তাহলে তোমরা কম হাসতে এবং বেশী কাঁদতে।[১]

তিরমিযী শরীফে হযরত আবু যর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে এটুকু বেশী বর্ণনা করা হয়েছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، أَطَّتِ السَّمَاوَاتُ، وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ. مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَربعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلّٰهِ.

–আমি সেসব দেখি যা তোমরা দেখতে পাও না। আমি যেসব শুনি তোমরা তা শুনতে পাওনা। আকাশে সরসর আওয়াজ হয়। আকাশে সরসর আওয়াজ হওয়া সত্য। কেননা আকাশে এমন চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গাও খালি নেই, যেখানে ফেরেশতাগণ কপাল রেখে আল্লাহ তা'আলাকে সিজদা করে না।[২]

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

---

১. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, আস্ সদকাতু ফীল কুসুফ, ৪:১৫৯।
খ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ফী কাওলিন নবী, ৮:২৮৮।
গ) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবু কাইফিয়্যাতি খুতবা ফীল কুসুফ, ৫:৪০৪।
ঘ) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবুল আমালি ফী সালাতিহিল কুসুফ, ২:৭৬।

২. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ফী কাওলিন্ নবী, ৮:২৮৮।
খ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবুল হুযনে ওয়াল বুকায়ি, ১২:২৩০।
গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু হাদীসে আবী যার, ৪৪:৫।

وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ. لَوَدِدْتُ أَنِّي شَجَرَةٌ تُعْضَدُ.

–আল্লাহর শপথ! আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে পার তাহলে তোমরা খুব কম হাসতে, বেশী কাঁদতে। আর তোমরা স্ত্রী থেকে স্বাদ উপভোগ করা পরিত্যাগ করতে। বাড়িঘর ত্যাগ করে বনজঙ্গল ও রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে। আর আল্লাহ তা'আলার নিকট আর্তনাদ করে ফরিয়াদ করতে। আফসোস করতে, যদি আমি বৃক্ষ হতাম, তাহলে আমাকে কেটে ফেলা হতো। (আমি সকল প্রকার দায়দায়িত্ব হতে মুক্তিলাভ করতাম)।[১]

হযরত মুগিরা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে,

صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমনভাবে নফল নামায আদায় করতেন যে, তাঁর পদযুগল ফুলে যেতো।[২]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

كَانَ يُصَلِّي حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَكَلَّفُ هَذَا، وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟! قَالَ: أَفَلَا أَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে ইবাদত করার কারণে মুবারক পদযুগল ফুলে যেতো। এ অবস্থা দেখে সাহাবায়ে কেরাম আরয করতেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি এতো কষ্ট স্বীকার করছেন কেনো? আল্লাহ তা'আলা তো আপনার পূর্বাপর যাবতীয় ত্রুটিবিচ্যুতি মার্জনা করে দিয়েছেন। হুযুর

---

[১]. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু কাওলিহিন্ নবী, ৪:১৩৪।
খ) হাকেম : আল মুসতাদ্ রাক আলাস্ সহীহাইন, ২:৫৫৪।
গ) বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, বাবুল খাওফি মিনাল্লাহি তা'আলা, ২:২২৬।

[২]. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জাআ ফীল ইজতিহাদ ফীস্ সালাত, ১:৫৩৪।
খ) নাসায়ী : আস্ সুনান, ১০:২৬১।
গ) ইবনে খুযাইমা : আস্ সহীহ, বাবুস্ তিহবাবিস্ সালাত ওয়া কাসরাতিহা ওয়া তাওলিল ক্বিয়াম, ২:২০০।

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি কী আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?[১]

অনুরূপ বর্ণনা হযরত আবু সালমা ও হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে।

হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বর্ণনা করেন,

كَانَ عَمَلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيمَةً. وَأَيُّكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ يُطِيقُ؟ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যাবতীয় আমল স্থায়ী ছিলো। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নেক আমল করতে যে ধরণের কষ্ট সহ্য করতেন তা সহ্য করার মতো আমাদের মধ্যে কি কেউ আছে? হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রোযা আরম্ভ করলে মনে হতো তিনি আর কখনো রোযা পরিত্যাগ করবেন না। আবার যখন রোযা ছেড়ে দিতেন, তখন মনে হতো তিনি আর কখনো রোযা রাখবেনই না।[২]

অনুরূপ বর্ণনা হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত উম্মে সালমা ও হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) থেকে বর্ণিত আছে। এসব বর্ণনাকারীর প্রত্যেকেই বর্ণনা করেছেন যে, যদি আমরা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে রাতে নামায পড়তে দেখার ইচ্ছা করতাম তাহলে দেখতাম তিনি শুধু সারা রাত নামাযই পড়ছেন। আর যদি আমরা তাঁকে রাতে আরাম করছেন দেখতে ইচ্ছে করতাম তাহলে আমরা তাঁকে রাতে আরাম করা অবস্থায় দেখতে পেতাম। অর্থাৎ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উভয় প্রকারের অভ্যাসে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি রাতে নামাযও আদায় করতেন, বিশ্রামও করতেন।

হযরত আউফ বিন মালেক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণনা করেন, এক রাতে আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে মিসওয়াক করে অযু করে নামাযে দাঁড়িয়ে যান। আমিও তাঁর সাথে নামাযে দাঁড়িয়ে যাই। তিনি নামাযের প্রথম রাকাতে সূরা বাকারা তিলাওয়াত

---

[১]. ক) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ১৫:৩৫৩।
খ) তায়ালুসী : আল মুসনাদ, বাবু আফালা আকুনা আবদান শাকুরা, ২:২৬৬।
গ) ওয়াকী : আয্ যুহদ, ১:৭৫।

[২]. ক) আবুল ফাতেহ : উয়ূনুল আসার, বাবু যিকরি জামালিন মিন আখলাক্বিহি, ২:৪২৮।
খ) শায়খ খুদুরী : নুরুল ইয়াকীন ফী সিরাতি সায়্যিদিল মুরসালীন, বাবু খাওফিহি মিন রব্বিহি, ১:২৬৩।

আরম্ভ করেন। যেখানে রহমতের আয়াত পাঠ করতেন সেখানে আল্লাহ তা'আলার নিকট রহমতের আবেদন করতেন। আর যখনই আযাব বা শাস্তি সংক্রান্ত আয়াত তিলাওয়াত করতেন তখনই আল্লাহ তা'আলার নিকট শাস্তি থেকে মুক্তি চাইতেন। অতঃপর যেমন দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকেন, অনুরূপ দীর্ঘ সময় রুকুতে অতিবাহিত করেন। আর রুকু অবস্থায় তিনি এ দোয়া পড়েন–

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ.

–মহান সত্তা যিনি অতি পবিত্র তাঁর কর্তৃত্ব, সম্মান, মহাত্ম্য, ক্ষমতা ও গৌরব অসীম, আর ক্ষমতায়ও তিনি শ্রেষ্ঠতর।

অতঃপর তিনি সিজদায়ও এ দোয়া করেন। তারপর তিনি দ্বিতীয় রাকাতে সূরা আল-ইমরান পাঠ করেন। এর পরবর্তী রাকাতে একটি করে সূরা পাঠ করেন।[১]

হযরত হোযাইফা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে,

سَجَدَ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، وَجَلَسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ نَحْوًا مِنْهُ، وَقَالَ: حَتَّى قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ وَالْمَائِدَةَ.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেমন দীর্ঘ সময় নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতেন, তেমনি দীর্ঘ সময় রুকুতে কাটাতেন। অনুরূপ সিজদায় পড়ে থাকতেন। অনুরূপ দীর্ঘ সময় দু'সিজদার মাঝে বসতেন। এরপর তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে সূরা বাকারা, আল-ইমরান, সূরা নিসা ও সূরা মায়েদাহ তিলাওয়াত করতেন।

হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বর্ণনা করেন,

قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ لَيْلَةً.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনো কখনো নামাযে দাঁড়িয়ে একই আয়াত পাঠ করতে করতে সারা রাত অতিবাহিত করে দিতেন।[২]

হযরত আবদুল্লাহ বিন শোখাইর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

---

[১]. ক) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু মা ইয়াকুলুর রজুলু ফী রুকুয়িহি, ১:২৩০।
খ) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবু নুয়িল আখির মিন যিকরি ফীর্ রুকুয়ি, ২:১৯১।
গ) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, বাবু আসেম ইবনে হুমাইদ..., ১৮:৬১।

[২]. ক) আবুল ফাতেহ : উইয়ূনুল আসার, বাবু যিকরি জামালিন মিন আখলাক্বিহি, ২:৪২৮।
খ) শামী : সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৮:২৯৬।

أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي، وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ.

–একবার আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে হাযির হয়ে দেখি তিনি নামায আদায় করছেন। তাঁর পবিত্র পেটের ভেতর থেকে ফুটন্ত ডেক হতে উত্থিত শব্দের ন্যায় আওয়াজ বের হচ্ছে।

হযরত ইবনে আবী হালা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاصِلَ الْأَحْزَانِ دَائِمَ الْفِكْرَةِ، لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বদা চিন্তা ও পর্যায়ক্রমিক মানসিক যাতনায় বিভোর থাকতেন। তিনি কখনো চিন্তা-ভাবনাহীন অবস্থায় থাকতেন না।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ.

–আমি দৈনিক একশ'বার ইস্তিগফার করি।[১]

অপর এক বর্ণনায় দৈনিক সত্তর বার ইস্তিগফার করার কথা এসেছে।

হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট তাঁর সুন্নাত বা তরিকা সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি আমাকে বললেন,

اَلْمَعْرِفَةُ رَأْسُ مَالِيْ، وَالْعَقْلُ أَصْلُ دِيْنِي، وَالْحُبُّ أَسَاسِي، وَالشَّوْقُ مَرْكَبِي، وَذِكْرُ اللهِ أَنِيسِي، وَالثِّقَةُ كَنْزِي، وَالْحُزْنُ رَفِيقِي، وَالْعِلْمُ سِلَاحِيْ، وَالصَّبْرُ رِدَائِيْ، وَالرِّضَاءُ غَنِيمَتِي، وَالْعَجْزُ فَخْرِي، وَالزُّهْدُ حِرْفَتِي، وَالْيَقِيْنُ

---

[১]. ক) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৫:৩৯৭।
খ) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, বাবুল আগারি মুযনী, ১:৩০১।

قُوَّتِي، وَالصِّدْقُ شَفِيعِي، وَالطَّاعَةُ حَسْبِي، وَالْجِهَادُ خُلُقِي، وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ.

–আমার ঐশ্বর্যের শিরোমণি হলো মারিফাত। আমার দীনের মূল আকল। আর আমার দীনের ভিত্তি মুহাব্বত। আমার আত্মিক আগ্রহ বা শওক তার বাহন। আল্লাহ তা'আলার যিকির আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভরশীলতা আমার ভাণ্ডার। মানসিক চিন্তা আমার সাথী। জ্ঞান আমার অস্ত্র। সবর আমার চাদর। সন্তুষ্টি আমার গণিমত। দরিদ্রতা আমার অলংকার। দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি আমার গৌরব। ইয়াকীন বা দৃঢ়তা আমার শক্তি। সত্যবাদিতা আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আনুগত্য আমার ভালবাসা। জিহাদ আমার সৌন্দর্য। আর নামায আমার চোখের শীতলতা ও প্রশান্তি।[১]

অপর বর্ণনায় এসেছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

وَثَمَرَةُ فُؤَادِي فِي ذِكْرِهِ، وَغَمِّي لِأَجْلِ أُمَّتِي وَشَوْقِي إِلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ.

–আমার অন্তরের ফল আল্লাহ তা'আলার যিকির। আর আমার চিন্তা উম্মাতের জন্য। আমার আন্তরিক আগ্রহ শুধু আল্লাহ তা'আলার দিকে।

১. শায়খ খুদুরী : নুরুল ইয়াকীন ফী সিরাতি সায়্যিদিল মুরসালীন, বাবু মু'জিযাতিহি, ১:২৬৪।

চতুর্বিংশতম পরিচ্ছেদ

صِفَاتُ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ

নবী ও রাসূলদের মর্যাদা ও গুণাবলী

আমাদের সবাইকে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করতে হবে। আর এরূপ নিশ্চিত বিশ্বাস রাখতে হবে যে, সমস্ত আম্বিয়া মুরসালীন (আলাইহিমুস্ সালাম) এর আকৃতি ও প্রকৃতিতে সুন্দর চরিত্র ও প্রশংসনীয় গুণাবলী যাবতীয় পূর্ণতা, মর্যাদা ও সার্বিক সৌন্দর্য বিদ্যমান ছিলো। এ কারণে তাঁরা সকলে সমগ্র মানবজাতি তথা প্রতিটি আদম সন্তানের উপর অগ্রগণ্য হিসেবে বিশেষত্ব লাভ করেন। মর্যাদা ও সম্মানের দিক দিয়ে তাঁরা ছিলেন সকলের উর্ধ্বে। আর মর্যাদায়ও তাঁরা ছিলেন সবার চাইতে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্য নবী রাসূলগণকে পরস্পরের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। এই মর্মে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন–

تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

–এঁরা রাসূল, আমি তাদের মধ্যে একজনকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠ করেছি।[১]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَٰهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٣٢﴾

–এবং নিশ্চয় আমি তাদেরকে জ্ঞাতসারে বেছে নিয়েছি ঐ জগতবাসীদের মধ্য থেকে।[২]

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ.

–প্রথম যেই দল বেহেশতে প্রবেশ করবে, তারা পূর্ণিমার রজনীর চাঁদের মতো উজ্জ্বল ও সুন্দর রূপ ধারণ করেই প্রবেশ করবে।[৩]

১. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:২৫৩।
২. আল কুরআন : সূরা দুখান, ৪৪:৩২।
৩. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু খলক্বি আদাম, ১১:১০৮।
খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু আওয়ালি যুমরাতি তাদখুলু ফীল জান্নাত, ১৩:৪৬৮।
গ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, প্রথম পরিচ্ছেদ, বাবু সিফাতিল জান্নাতি ওয়া আহলিহা, ৩:২২১।

অতঃপর হাদীসের শেষভাগে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ.

–তাদের আকৃতি ও শারীরিক গঠনের অবয়ব হবে তাদের পিতা আদম (আলাইহিস্ সালাম) এর মতো ষাট গজ লম্বা।

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

رَأَيْتُ مُوسَى، فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ ضَرْبٌ، رَجُلٌ، أَقْنَى، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ.

وَرَأَيْتُ عِيسَى، فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ رَبْعَةٌ، كَثِيرُ خِيلَانِ الْوَجْهِ، أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ.

–আমি হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর সাক্ষাৎ লাভ করি। আমি দেখেছি তাঁর নাক সরু এবং নাকের মাঝখান উঁচু ছিলো। তাঁকে দেখতে 'শানুয়া' গোত্রের লোক মনে হয়। আমি হযরত ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) কে দেখেছি। তিনি ছিলেন মাঝারি গড়নের লাল বর্ণ বিশিষ্ট। মনে হয় তিনি যেনো এই মাত্র গোসলখানা থেকে বের হয়ে আসছেন।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

مُبَطَّنٌ مِثْلَ السَّيْفِ.

–তাঁর পেট হালকা তরবারীর মতো ছিলো।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ بِهِ.

–হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) এর বংশধরদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে চাইতে বেশী তাঁর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।[১]

---

[১]. ক) বদরুদ্দীন আইনী : উমদাতুল কারী শরহে সহীহুল বুখারী, বাবু কাওলিল্লাহি তা'আলা হাল আতাকা হাদিসু..., ২৩:৩১১।
খ) হাশিয়ায়ে সিন্দী আলা সহীহ বুখারী, ১০:১৮৯।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে,

كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর আকৃতি প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন, তিনি শ্যাম বর্ণের বেশী লাবণ্যময়ী ছিলেন।[১]

হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

مَا بَعَثَ اللهُ تَعَالَى مِنْ بَعْدِ لُوطٍ نَبِيًّا إِلَّا فِي ذُرْوَةٍ مِنْ قَوْمِهِ، وَيُرْوَى فِي ثَرْوَةٍ، أَيْ كَثْرَةٍ وَمَنَعَةٍ.

–হযরত লূত (আলাইহিস্ সালাম) এর পর আল্লাহ তা'আলা যতো নবী পাঠিয়েছেন তাঁরা সকলেই ছিলেন উচ্চ বংশমর্যাদা সম্পন্ন। অপর বর্ণনায় রয়েছে, তারা প্রাচুর্য্যের অধিকারী ছিলেন।

ইমাম তিরমিযী এই হাদিস হযরত কাতাদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে, আর ইমাম দারে কুতনী এই হাদিস হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا حَسَنَ الْوَجْهِ، حَسَنَ الصَّوْتِ، وَكَانَ نَبِيُّكُمْ أَحْسَنَهُمْ صَوْتًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

–আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত নবীগণ সবচেয়ে বেশী সুন্দর ও রূপ লাবণ্যময় চেহারা ও সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। আর তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মনোমুগ্ধকর ও চিত্তাকর্ষক কণ্ঠস্বর হলো তোমাদের নবীর।[২]

হিরাক্লিয়াসের বর্ণনায় এসেছে,

وَسَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ، فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَنْسَابِ قَوْمِهَا.

---

[১]. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবুল জু'দি, ৭:১৬১।
খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবুয্ যিকরি মসিহ ইবনে মরিয়ম, ১:১৫৪।
গ) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু সিফাতি ঈসা ইবনে মরিয়ম, ৫:১৩৪৮।

[২]. ক) তিরমিযী : শামায়েলে মাহমূদিয়্যাহ, বাবু মা জা'আ ফি কিরআতি রসূল, ১:১৮৩।
খ) শামী : সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, বাবুত্ তানবিহান, ২:৭।
গ) হালভী : সিরাতে হালভিয়্যাহ, বাবু যিকরু ফীহি সিফাতিহি, ৩:৪৬৬।

–আমি তোমাদেরকে তাঁর বংশ মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তোমরা বলেছো তাঁর বংশ মর্যাদা অতি উচ্চ মর্যাদা ও আভিজাত্যসম্পন্ন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) উচ্চ বংশেরই হন।[১]

হযরত আইয়ুব (আলাইহিস্ সালাম) সম্পর্কে এরশাদ করা হয়েছে–

إِنَّا وَجَدْنَٰهُ صَابِرًا ۚ نِّعْمَ ٱلْعَبْدُ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ

–নিশ্চয় আমি তাঁকে ধৈর্যশীল পেয়েছি। কতই উত্তম বান্দা নিশ্চয় সে অতি প্রত্যাবর্তনকারী।[২]

হযরত ইয়াহয়া (আলাইহিস্ সালাম) সম্পর্কে এরশাদ করা হয়েছে–

يَٰيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَٰبَ بِقُوَّةٍ ۖ وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿١٢﴾ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَوٰةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿١٣﴾ وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٤﴾ وَسَلَٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾

–হে ইয়াহয়া, কিতাবটা দৃঢ়তার সাথে ধারণ করো এবং আমি তাকে শৈশবেই নবুয়ত প্রদান করেছি এবং আমার নিকট থেকে দয়া ও পবিত্রতা আর সে পরিপূর্ণ খোদাভীতি সম্পন্ন ছিলো। এবং আপন মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারকারী ছিলো। উদ্ধত ও অবাধ্য ছিলোনা। এবং শান্তি তারই উপর যেদিন জন্ম গ্রহণ করেছে, যে দিন মৃত্যুবরণ এবং যেদিন জীবিতাবস্থায় পূনরুত্থিত হবে।[৩]

---

১. সহীহ আল বুখারীর ১ম খণ্ডে 'ঈমান' পর্বে বর্ণিত আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট ইসলামের দাওয়াত পত্র প্রেরণ করেন। তখন হিরাক্লিয়াস বললো, যে স্থান থেকে এ সম্মানিত পত্রের আগমন হয়েছে, সে স্থানের কোন অধিবাসী এ দেশে আছে কি না খোঁজ করে দেখ? যদি এ শহরে পাও তাহলে তাদেরকে এখানে উপস্থিত করো। তখন আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে এক বাণিজ্য প্রতিনিধিদল তথায় অবস্থান করে। হিরাক্লিয়াসের দূত আবু সুফিয়ান ও তার সাথীদের রাজ দরবারে নিয়ে আসে। তথায় আবু সুফিয়ানকে পত্র প্রেরক সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্ন করা হয়। (আবু সুফিয়ান তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি)। উক্ত প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিলো– ঐ পত্র প্রেরকের বংশ মর্যাদা কেমন? উত্তরে আবু সুফিয়ান বললেন, তাঁর জন্ম অতি উচ্চ সম্ভ্রান্ত বংশে।

২. আল কুরআন : সূরা সোয়াদ, ৩৮:৪৪।

৩. আল কুরআন : সূরা মরিয়ম, ১৯:১২-১৫।

তাঁর সম্পর্কে আরো এরশাদ করা হয়েছে–

أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًۢا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ

–নিশ্চয় আল্লাহ আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহয়ার, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি কালেমার সত্যায়ন করবে এবং সর্দার ও সব সময়ের জন্য নারীদের থেকে বিরত থাকবে এবং নবী আল্লাহর খাস বান্দাদের মধ্য থেকে।[১]

তাঁর সম্পর্কে আরও এরশাদ করা হয়েছে–

إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰٓ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَٰهِيمَ وَءَالَ عِمْرَٰنَ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٣٣﴾

–নিঃসন্দেহে আল্লাহ মনোনীত করেছেন, আদম, নূহ, ইবরাহীমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরদের সমগ্র বিশ্বজগৎ থেকে।[২]

হযরত নূহ (আলাইহিস্ সালাম) সম্পর্কে এরশাদ করা হয়েছে–

إِنَّهُۥ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا

–নিশ্চয় সে বড় কৃতজ্ঞ বান্দা ছিলো।[৩]

হযরত ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) সম্পর্কে এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٤٦﴾

–নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন তাঁর নিকট থেকে একটা কালেমার, যার নাম হলো মসীহ ঈসা, মারিয়ামের পুত্র, মর্যাদাবান হবে

---

১. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:৩৯।

২. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:৩৩।

৩. আল কুরআন : সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:৩।

দুনিয়া ও আখিরাতে এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত। এবং মানুষের সাথে কথা বলবে দোলনায় থাকাবস্থায় ও পরিপক্ক বয়সে এবং খাস বান্দাদের অন্যতম হবে।[১]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে-

إِنِّى عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِىَ ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلَنِى نَبِيًّا ﴿٣٠﴾ وَجَعَلَنِى مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَٰنِى بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾

-আমি হই আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং অদৃশ্যের সংবাদদাতা নবী বানিয়েছেন। এবং তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, আমি যেখানেই অবস্থান করি না কেন এবং আমাকে নামায ও যাকাতের তাগিদ দিয়েছেন যতদিন আমি জীবিত থাকি।[২]

হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) সম্পর্কে এরশাদ করা হয়েছে-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْا۟ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوا۟ ۚ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًا ﴿٦٩﴾

-হে বিশ্বাসীগণ! তাদের মতো হইও না, যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাঁকে নির্দোষ প্রমাণিত করেছেন ঐ কথা থেকে যা তারা রটনা করেছে। এবং মূসা আল্লাহর নিকট মর্যাদাবান।[৩]

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) সম্পর্কে এরশাদ করেছেন,

كَانَ مُوسَى رَجُلًا حَيِيًّا سِتِّيرًا مَا يُرَى مِنْ جَسَدِهِ شَيْءٌ اسْتِحْيَاءً.

-হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) খুবই লাজুক প্রকৃতির ছিলেন। সব সময় শরীর আবৃত করে রাখতেন। লজ্জাশীলতার কারণে তাঁর দেহের কোন অংশ কখনো খোলা দেখা যেত না।

১. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:৪৫-৪৬।
২. আল কুরআন : সূরা মরিয়ম, ১৯:৩০-৩১।
৩. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৬৯।

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে-

فَوَهَبَ لِى رَبِّى حُكْمًا وَجَعَلَنِى مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ

-অতঃপর আমার রব আমাকে আদেশ দান করেছেন এবং আমাকে প্রেরিত রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[১]

আল্লাহ তা'আলা নবীগণের প্রশংসা করে বলেছেন-

إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾

-নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর প্রেরিত বিশ্বস্ত রাসূল হই।[২]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে-

إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ

-নিশ্চয় উত্তম মজুর সেই যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত হয়।[৩]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে-

فَٱصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ

-সুতরাং আপনি ধৈর্যধারণ করুন, যেমনিভাবে সাহসী রাসূলগণ ধৈর্য ধারণ করেছেন।[৪]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে-

وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَمِن ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٨٥﴾ وَإِسْمَٰعِيلَ

১. আল কুরআন : সূরা শু'আরা, ২৬:২১।
২. আল কুরআন : সূরা শু'আরা, ২৬:১০৭।
৩. আল কুরআন : সূরা ক্বাসাস, ২৮:২৬।
৪. আল কুরআন : সূরা আহকাফ, ৪৬:৩৫।

وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٦﴾ وَمِنْ ءَابَآئِهِمْ وَذُرِّيَّٰتِهِمْ وَإِخْوَٰنِهِمْ ۖ وَٱجْتَبَيْنَٰهُمْ وَهَدَيْنَٰهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٨٧﴾ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ۚ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا۟ بِهَا بِكَٰفِرِينَ ﴿٨٩﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْ ۗ

–এবং আমি তাঁকে ইসহাক ও ইয়াকুবকে দান করেছি, তাঁদের সবাইকে আমি সৎপথ দান করেছি এবং তাদের পূর্বে নূহকে সৎপথ প্রদর্শন করেছি আর তাদের সন্তানদের মধ্য থেকে দাউদ, সুলাইমান, আইয়ূব, ইয়ূসুফ, মূসা এবং যাকারিয়া, ইয়াহয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকেও, এঁরা সবাই আমার নৈকট্যের উপযোগী। এবং ইসমাঈল, ইয়াসা, ইউনুস এবং লূতকেও; এবং আমি প্রত্যেককে তাঁরই যুগের সবার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। এবং তাদের পিতৃপুরুষগণ, বংশধরগণ এবং ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্য থেকে কতেককেও; এবং আমি তাঁদেরকে মনোনীত করেছি ও সোজা পথ দেখিয়েছি। এটা আল্লাহর হিদায়ত যে আপন বান্দাদের মধ্যে যাকে চান প্রদান করে থাকেন এবং তারা যদি শিরক করতো তবে অবশ্যই কৃতকর্ম নিষ্ফল হতো। এরা হচ্ছে এসব লোক, যাদেরকে আমি কিতাব, ফয়সালা করার ক্ষমতা ও নবুয়ত প্রদান করেছি। অতঃপর যদি এসব লোক তা অস্বীকার করে, তবে আমি সেটার জন্য এমন একটা জনসমষ্টিকে নিয়োজিত রেখেছি, যারা অস্বীকারকারী নয়, এরা হচ্ছে এমন সব লোক, যাদেরকে আল্লাহ হিদায়ত করেছেন। সুতরাং তোমরা তাদেরই পথে চলো।[১]

১. আল কুরআন : সূরা আন'আম, ৬:৮৪-৯০।

এছাড়া আল্লাহ তা'আলা হযরত আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) এর চারিত্রিক সততা, হিদায়াত, রাজত্ব ও নবুওয়াতের মহত্ত্বের বৈশিষ্ট্যাবলী ও প্রশংসনীয় গুণাবলীর কথা উল্লেখ করে বর্ণনা করেছেন–

فَبَشَّرْنَٰهُ بِغُلَٰمٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾

–সুতরাং আমি তাঁকে সুসংবাদ শুনালাম এক বুদ্ধিসম্পন্ন সন্তানের।[১]
অপর আয়াতে রয়েছে, (عَلِيم) জ্ঞানী।[২]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١٧﴾ أَنْ أَدُّوٓا۟ إِلَىَّ عِبَادَ ٱللَّهِ ۖ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾

–এবং নিশ্চয় আমি তাদের পূর্বে ফিরাউনের সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি এবং তাদের নিকট একজন সম্মানিত রাসূল আগমন করেছেন; যে, 'আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার নিকট সোপর্দ করে দাও' নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল হই।[৩]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ

–আল্লাহ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে অবিলম্বে ধৈর্যশীল পাবেন।[৪]

হযরত ইসমাঈল (আলাইহিস্ সালাম) সম্পর্কে আরও এরশাদ করা হয়েছে–

إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿٥٤﴾

–নিশ্চয় সে প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী ছিলো এবং রাসূল ছিলো, অদৃশ্যের সংবাদসমূহ বর্ণনাকারী।[৫]

১. আল কুরআন : সূরা সাফ্ফাত, ৩৭:১০১।
২. আল কুরআন : সূরা যারিয়াত, ৫১:২৮।
৩. আল কুরআন : সূরা দুখান, ৪৪:১৭-১৮।
৪. আল কুরআন : সূরা সাফ্ফাত, ৩৭:১০২।
৫. আল কুরআন : সূরা মরিয়ম, ১৯:৫৪।

হযরত সোলাইমান (আলাইহিস্ সালাম) সম্পর্কে বলা হয়েছে–

نِعۡمَ ٱلۡعَبۡدُ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ

–কতই উত্তম বান্দা! নিশ্চয় সে অতিশয় প্রত্যাবর্তনকারী।[১]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

وَٱذۡكُرۡ عِبَٰدَنَآ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ أُوْلِي ٱلۡأَيۡدِي وَٱلۡأَبۡصَٰرِ ﴿٤٥﴾ إِنَّآ أَخۡلَصۡنَٰهُم بِخَالِصَةٖ ذِكۡرَى ٱلدَّارِ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّهُمۡ عِندَنَا لَمِنَ ٱلۡمُصۡطَفَيۡنَ ٱلۡأَخۡيَارِ ﴿٤٧﴾

–এবং স্মরণ করুন! আমার বান্দাগণ ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব, ক্ষমতা ও জ্ঞানসম্পন্নদেরকে। নিশ্চয় আমি তাঁদেরকে এক খাঁটিবাণী দ্বারা স্বতন্ত্র বিশেষত্ব দান করেছি, তা হচ্ছে ঐ জগতের স্মরণ। এবং নিশ্চয় তাঁরা আমার নিকট মনোনীত পছন্দনীয়।[২]

হযরত দাউদ (আলাইহিস্ সালাম) সম্পর্কে এরশাদ করা হয়েছে–

إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ

–নিশ্চয় সে অতি প্রত্যাবর্তনকারী।[৩]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

وَشَدَدۡنَا مُلۡكَهُۥ وَءَاتَيۡنَٰهُ ٱلۡحِكۡمَةَ وَفَصۡلَ ٱلۡخِطَابِ ﴿٢٠﴾

–এবং আমি তাঁর রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছি এবং তাকে প্রজ্ঞা ও মীমাংসাকারী বাগ্মিতা দিয়েছি।[৪]

আর হযরত ইউসুফ (আলাইহিস্ সালাম) সম্পর্কে এরশাদ করা হয়েছে–

ٱجۡعَلۡنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلۡأَرۡضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

[১]. আল কুরআন : সূরা সোয়াদ, ৩৮:৩০।
[২]. আল কুরআন : সূরা সোয়াদ, ৩৮:৪৫-৪৭।
[৩]. আল কুরআন : সূরা সোয়াদ, ৩৮:৩০।
[৪]. আল কুরআন : সূরা সোয়াদ, ৩৮:২০।

–আমাকে রাজ্যের ধন ভাণ্ডারসমূহের কর্তৃত্ব প্রদান করো। নিশ্চয় আমি সুরক্ষক, সুবিজ্ঞ হই।[১]

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের ব্যাপারে এরশাদ হয়েছে,

قَالَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرٗا

–তিনি বলেছিলেন, অচিরেই আল্লাহ ইচ্ছা করলে, আমাকে ধৈর্যশীল হিসেবে পাবে।[২]

হযরত শুআইব (আলাইহিস্ সালাম) সম্পর্কে এরশাদ করা হয়েছে–

سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ

–অনতিবিলম্বে আল্লাহ ইচ্ছা করলে, তুমি আমাকে সদাচারীদের মধ্যে পাবে।[৩]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أُخَالِفَكُمۡ إِلَىٰ مَآ أَنۡهَىٰكُمۡ عَنۡهُۚ إِنۡ أُرِيدُ إِلَّا ٱلۡإِصۡلَٰحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُۚ وَمَا تَوۡفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِۚ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَيۡهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾

–এবং আমি চাই না যে, যা আমি তোমাদেরকে নিষেধ করেছি নিজেই সেটার বিপরীত করতে থাকবো। আমি তা যথাসম্ভব সংশোধনই করতে চাই এবং আমার সামর্থ্য আল্লাহরই নিকট থেকে, আমি তাঁরই উপর নির্ভর করেছি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী হচ্ছি।[৪]

হযরত লুত (আলাইহিস্ সালাম) সম্পর্কে এরশাদ করা হয়েছে–

وَلُوطًا ءَاتَيۡنَٰهُ حُكۡمٗا وَعِلۡمٗا

–এবং আমি লুতকে ধর্মীয় প্রজ্ঞা ও জ্ঞান প্রদান করেছি।[৫]

[১]. আল কুরআন : সূরা ইউসুফ, ১২:৫৫।
[২]. আল কুরআন : সূরা কাহাফ, ১৮:৬৯।
[৩]. আল কুরআন : সূরা ক্বাসাস, ২৮:২৭।
[৪]. আল কুরআন : সূরা হুদ, ১১:৮৮।
[৫]. আল কুরআন : সূরা আম্বিয়া, ২১:৭৪।

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

إِنَّهُمْ كَانُوا۟ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا خَٰشِعِينَ ۝٩٠

–নিশ্চয় তারা সৎকর্মসমূহে ত্বরা করতো এবং আমাকে ডাকতো আশা ও ভীতির সাথে এবং আমার দরবারে বিনীতভাবে প্রার্থনা করতো।[১]

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত সুফিয়ান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, সৎকর্মের অর্থ সার্বক্ষণিক চিন্তাভাবনা বিনয় ও একাগ্রতা। অর্থাৎ তাঁরা আল্লাহ তা'আলার নিকট খুশু-খুজু প্রার্থনা করতো। অনেক আয়াতে হযরত আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) এর সততা ও প্রশংসনীয় গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে। যা তাঁদের পূর্ণতার প্রমাণ স্বরূপ।

আর হযরাত আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) এর বহুবিধ মর্যাদার বিবরণ বিভিন্ন হাদিসসমূহে বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে,

إِنَّمَا الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنُ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بن اسحق بْنِ إِبْرَاهِيمَ، نَبِيٌّ ابْنُ نَبِيٍّ ابْنُ نَبِيٍّ ابْنُ نَبِيٍّ.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিশ্চয় সম্মানিত পিতা ইউসুফ পিতা ইয়াকুব পিতা ইসহাক পিতা ইবরাহীম নবীর পুত্র, নবীর বংশধর।

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে,

وَكَذَٰلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ.

–হযরাত আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম)-এর চক্ষুসমূহ ঘুমাতো কিন্তু অন্তর ঘুমাতো না, জাগ্রত থাকতো।[২]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত সোলাইমান (আলাইহিস্ সালাম) কে বিরাট রাজত্ব প্রদান করা হয়েছে। তবুও তিনি তা'আলার ভয়ে এতো বেশী বিনয়ী ছিলেন যার কারণে তিনি কখনো আকাশের দিকে মাথা উঠিয়ে তাকাতেন না। তিনি

[১]. আল কুরআন : সূরা আম্বিয়া, ২১:৯০।
[২]. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু কানান নবী তানামু, ১:১৯১।
খ) ইবনে খুযাইমা : আত্ তাওহীদ, বাবু ইখবারি আবদিল্লাহ বিন মাসউদ, ২:৫২১।
গ) শামী : সুবুলুল হুদা ওয়ার্ রাশাদ, ১০:৪২৪।

লোকদেরকে উন্নত ধরনের খানা খেতে দিতেন কিন্তু নিজে যবের রুটি খেতেন। তাঁর উপর ওহী প্রেরণ করা হয়, হে ইবাদতকারীর সর্দার! হে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তদের পুরোধার পুত্র! তিনি স্বীয় সৈন্য বাহিনী নিয়ে হাওয়ার উপর সিংহাসনে আসন গ্রহণ করতেন।

অথচ অতি সাধারণ বৃদ্ধা তার চলার গতি থামিয়ে দেয়। কিন্তু তিনি তাতে কিছুই মনে করেনি। বরং বাতাস বন্ধ করে বৃদ্ধার প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞেস করে তা পূরণ করে সামনে অগ্রসর হন।

হযরত ইউসুফ (আলাইহিস্ সালাম) এর নিকট লোকেরা আরয করে, আপনি এতো বিশাল ধন-ভাণ্ডারের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অনাহারে থাকার কারণ কী? তখন তিনি বললেন, আমার ভয় হয় যদি আমি উদরপূর্তি করে আহার করি তাহলে জনসাধারণের কথা ভুলে যাবো।

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

خُفِّفَ عَلَى دَاوُدَ الْقُرْآنُ فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَابَّتِهِ فَتُسْرَجُ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ تُسْرَجَ، وَلَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.

–হযরত দাউদ (আলাইহিস্ সালাম)'র জন্য যাবুর কিতাবের তিলাওয়াত সহজ করে দেওয়া হয়েছে। এমন কি তিনি তাঁর বাহনের উপর হাওদা বাঁধার আদেশ দিতেন। তখন তার উপর গদি বাঁধা হতো। অথচ সাওয়ারী প্রাণীর উপর হাওদা বাঁধা শেষ হওয়ার পূর্বেই তিনি সম্পূর্ণ যাবুর কিতাব পূর্ণ তিলাওয়াত শেষ করতেন। আর তিনি নিজের হাতের উপার্জন ব্যতীত কিছুই আহার করতেন না।

এ কারণে পবিত্র কুরআন মাজীদে এরশাদ করা হয়েছে–

وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ۝١٠ أَنِ ٱعْمَلْ سَٰبِغَٰتٍ وَقَدِّرْ فِى ٱلسَّرْدِ

–এবং আমি তাঁর জন্য লৌহকে নরম করেছি। যাতে প্রশস্ত বর্ম তৈরি করো এবং তৈরি করায় পরিমাপ রক্ষা করো।[১]

[১]. আল কুরআন : সূরা সাবা, ৩৪:১০-১১।

হযরত দাউদ (আলাইহিস্ সালাম) আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করেন, হে রব! আমার হাতের উপার্জনে এ পরিমাণ জীবিকা প্রদান করুন, যাতে আমি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বিমুখ হয়ে যাই।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُوْدَ. وَأَحَبُّ الصِّيَامَ إِلَىٰ اللهِ صِيَامُ دَاوُوْدَ.

وكان يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا.

–নামায সমূহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয় হযরত দাউদ (আলাইহিস্ সালাম) এর নামায। আর রোযাসমূহের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় হলো হযরত দাউদ (আলাইহিস্ সালাম) এর রোযা। তিনি অর্ধেক রাত শয়ন করতেন। রাতের এক-ষষ্ঠাংশ ইবাদত করতেন। রাতের ছয়ভাগে দ্বিতীয়বার শয়ন করতেন। অনুরূপ তিনি একদিন রোযা রাখতেন আর একদিন ইফতার করতেন।

তিনি পশমের কম্বল ব্যবহার করতেন। বালির উপর শয়ন করতেন। যবের রুটি লবণ দিয়ে খেতেন যাতে তা সুস্বাদু না হয়। তিনি যখন পানি পান করতেন তখন তাঁর চোখের অশ্রু পানির সাথে মিশে যেতো। অনিচ্ছায় সামান্য অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর কেউ কখনো তাঁকে হাসতে দেখেনি। আর শরম ও লজ্জার কারণে কেউ তাঁকে আকাশের দিকে তাকাতে দেখেনি। তিনি সারা জীবন কান্নাকাটি করে অতিবাহিত করেছেন।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

بَكَى حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ مِنْ دُمُوعِهِ، وَحَتَّى اتَّخَذَتِ الدُّمُوعُ فِي خَدِهِ أُخْدُودًا.

–তাঁর চোখের পানি যেস্থানে পড়তো সেস্থানে সবুজ ঘাস গজিয়ে উঠতো। অশ্রু প্রবাহের কারণে তার গণ্ডদেশে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

كَانَ يَخْرُجُ مُتَنَكِّرًا يَتَعَرَّفُ سِيرَتَهُ، فَيَسْمَعُ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ فَيَزْدَادُ تَوَاضُعًا.

–তিনি বেশ পরিবর্তন করে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতেন, যাতে লোকজন তাঁর চরিত্র সম্পর্কে কি বলে তা শুনে নিজের চরিত্র সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারেন। সুতরাং তিনি যখন লোকদের মুখ তার প্রশংসা

শুনতেন তখন গৌরববোধ করার স্থলে আরও বেশী বিনয়ী ও নমনীয় হয়ে পড়তেন।

কথিত আছে যে, একদা কতিপয় লোক হযরত ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) এর নিকট আরয করে, আপনি নিজের জন্য একটি গাধা কেন রাখেন না? তখন তিনি বললেন, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট এ বিষয়ে মুক্তি চাই যে, তিনি আমাকে তাঁর দিক থেকে সরিয়ে গাধার প্রতি মনোযোগী করে দেবেন। তিনি মোটা পশমী কাপড় পরিধান করতেন । গাছের সবুজ পাতা খেয়ে জীবনধারণ করতেন। তার কোন ঘরবাড়ি ছিলো না। যেখানে ঘুম আসতো সেখানে ঘুমিয়ে পড়তেন। "মিসকীন" নাম তাঁর নিকট অধিক পছন্দনীয় ছিলো।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) মাদায়েনের কূপের নিকট পৌঁছার পর ভীষণ ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন। ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে রাস্তায় সবুজ ঘাস-পাতা যা কিছু খেয়েছেন সব কিছু বাহির থেকে তাঁর পেটের মধ্যে দেখা যায়। কেননা পথ চলার সময় তিনি ঘাস ও সবুজ পাতা ছাড়া আর কিছুই খেতে পাননি।

অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

لَقَدْ كَانَ الْأَنْبِيَاءُ قَبْلِي يُبْتَلَى أَحَدُهُمْ بِالْفَقْرِ وَالْقَمْلِ، وَكَانَ ذَلِكَ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الْعَطَاءِ إِلَيْكُمْ.

–আমার পূর্ববর্তী কোন আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) কে দারিদ্র ও ক্ষুধার যন্ত্রণা দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছে। অথচ সেটা তাদের নিকট এমনি পছন্দনীয় যা তোমাদের নিকট পুরস্কারের মতো পছন্দনীয়।

কথিত আছে যে, একদা হযরত ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) কোথাও যাচ্ছেন। রাস্তায় তাঁর সাথে এক শূকরের দেখা হয়। তিনি শূকরকে বললেন, "তুমি নিরাপদে চলে যাও।" লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি শূকরের মতো একটি নিকৃষ্ট প্রাণীর সাথে কথা বলছেন? তখন তিনি বললেন, মন্দ কথা বলায় অভ্যস্ত হওয়া থেকে আমি আমার জবানকে নিরাপদ রাখা পছন্দ করি।

হযরত মুজাহিদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত ইয়াহয়া (আলাইহিস্ সালাম) এর খাদ্য সবুজ পাতা ছাড়া আর কিছুই ছিলো না।

তিনি আল্লাহ তা'আলার ভয়ে বেশী কান্নাকাটি করার কারণে তার গন্ডদেশে অশ্রু ধারার দাগ পড়ে যায়। জনসাধারণের প্রতি যাতে আর্কষণ না হয় সে ভয়ে তিনি জীবজন্তুর সাথে বসে পানাহার করতেন।

ইমাম তাবারী হযরত ওয়াহাব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) কুড়েঁঘরে বসবাস করতেন। পাথরের পেয়ালাতে খাবার খেতেন। পানি পান করার সময় জীবজন্তুর মতো পাত্রে মুখ লাগিয়ে পান করতেন। যাতে আল্লাহ তা'আলার সামনে তাঁর বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাকে সরাসরি কথা বলার মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। হযরাত আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) এর এ ধরণের অবস্থা বিভিন্ন কিতাবে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। তাঁদের উচ্চ মর্যাদা, প্রশংসনীয় চারিত্রিক মাধুর্য, আকৃতি-প্রকৃতির সৌন্দর্যের বিবরণ অতি প্রসিদ্ধ ও বিদিত। এ কারণে আমি আলোচনা দীর্ঘায়িত করার পক্ষপাতি নই। তবে আমার আলোচনার বিপরীতে নির্বোধ ঐতিহাসিক ও ব্যাখ্যাকারদের বর্ণনাসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত না করাই বুদ্ধিমানের কাজ।[১]

[১]. ইসরাঈলী বর্ণনা হলো, ঐ সমস্ত বর্ণনা, যেগুলোকে সঠিক মনে করলে হযরত আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম উচ্চ মর্যাদার উপর কলংকের ছাপ পড়বে। এ কারণে গ্রন্থকার ঐ সমস্ত বর্ণনার প্রতি মনোযোগী হতে নিষেধ করেছেন। কেননা ঐ বর্ণনাসমূহ ভিত্তিহীন।

পঞ্চবিংশতম পরিচ্ছেদ

جَمْعُ الشَّمَائِلِ

হুযুর (ﷺ) এর অনুপম অবয়ব ও ব্যক্তিত্বের বর্ণনা

আমি আপনাদের সম্মুখে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সকল প্রকার চারিত্রিক সৌন্দর্য ও প্রশংসনীয় গুণাবলীর যাবতীয় পূর্ণাঙ্গ মর্যাদার বিবরণ তুলে ধরছি। তারপর যে সমস্ত বিষয় হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র সত্তার সাথে সম্পৃক্ত ছিলো তাও দেখিয়ে দিয়েছি। আমি এ সম্পর্কে শুধু ঐ বর্ণনাসমূহের উল্লেখ করেছি যেগুলোর মাধ্যমে পরিতুষ্টি লাভ করা যায়। নতুবা সে পবিত্র মহান সত্তার প্রশংসনীয় গুণাবলী ও যাবতীয় পূর্ণতা ও কামালিয়াতের মাকাম এতো অধিক বিস্তৃত যে, দলিল-প্রমাণ শেষ হয়ে যাবে, তবুও তাঁর কামালাত বা পূর্ণতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে শেষ করা যাবেনা।

তাঁর চারিত্রিক গুণাবলী অতলান্ত মহাসাগরের মতো। যার পানি কোনো দিনও শেষ হবার নয়। তা থেকে কত পানি বহন করে নেবে। তা কোন দিনও সম্ভব হবেনা।

আমি আমার আলোচনায় সহীহ বর্ণনাসমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ বিষয়ে অতি প্রসিদ্ধ বর্ণনাসমূহের উল্লেখ করেছি। আমি কূলহীন মহাসমুদ্র থেকে এক ফোঁটা বা এক বিন্দুর চেয়ে বেশী নিয়েছি বলে মনে হয়না।

আমি এখন আমার আলোচনা হযরত ইবনে আবী হালা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনার দ্বারা সমাপ্ত করার ইচ্ছা করি। কেননা এ বিষয়ে তাঁর বর্ণনা ব্যাপক বিস্তৃত ও নির্ভরযোগ্য।

তবে আমি উক্ত বর্ণনায় কতিপয় গোপনীয় ও সূক্ষ্ম রহস্যাবলীর প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করে আলোচনা সমাপ্ত করবো।

হযরত হিন্দা বিনতি আবী হালা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) থেকে উক্ত বর্ণনা বর্ণিত আছে। আর বিশেষ করে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র হুলিয়া মোবারকের বর্ণনায় তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

তিনি বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চেহারা মুবারক গোল ও পূর্ণিমার শশীর মতো ঝলমল করতো। তাঁর পবিত্র দেহ মুবারক অতি দীর্ঘও ছিলোনা আবার অতি খর্বকায়ও ছিলনা। আর তাঁর পবিত্র মাথা মুবারক বড়ো ছিলো। তাঁর পবিত্র কেশরাজি সোজাও ছিলো না আবার সম্পূর্ণ কোঁকড়ানোও

ছিলো না। বরং উভয়ের মাঝামাঝি ছিলো। তিনি যদি পবিত্র কেশরাজি দু'ভাগে ভাগ করতেন তাহলে সিঁথির মতো দেখা যেতো। নতুবা সিঁথি দেখা যেতো না। তাঁর মাথার পবিত্র কেশগুচ্ছ কানের মাঝখান পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিলো। তাঁর দেহ মুবারকের রং উজ্জ্বল ও দ্যুতিময় ছিলো। তিনি ছিলেন প্রশস্ত ললাটের অধিকারী। তাঁর ভ্রুযুগল সম্মিলিত ছিলো না এবং মধ্যবর্তী স্থানে হালকা কিছু পশম ছিলো। আর তাঁর ভ্রুযুগলের মধ্যবর্তী স্থানে এক রগ ছিলো, যা রাগান্বিত হলে ভেসে উঠতো। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মুবারক নাসিকা উন্নত নুরানী এবং উজ্জ্বল ছিলো যে, কোনো দর্শনকারী ভালোভাবে খেয়াল করে না দেখলে সাধারণত একই রকম দেখতে পেতো যে, তাঁর নাক মুবারক উন্নত কিন্তু মূলতঃ তা ছিলো না। বরং নূরের উজ্জ্বলতার কারণে এরকম উঁচু মনে হতো।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দাঁড়ি মুবারকের চুল নিবিড় ঘন ছিলো। তিনি প্রশস্ত মুখ গহ্বরের অধিকারী ছিলেন। তাঁর পবিত্র নয়নযুগল ছিলো সুবিস্তৃত কৃষ্ণবর্ণের এবং চোখের ভ্রু ছিলো দীর্ঘ। তাঁর দন্তরাজি ছিলো মুক্তোর ন্যায় উজ্জ্বল চকচকে ও প্রশস্ত। তাঁর পবিত্র সীনার উপর থেকে নাভীর মধ্যবর্তী স্থানে পশমের এক সরু ডোরা ছিলো। তাঁর গর্দান মুবারক চান্দির মত স্বচ্ছ উজ্জ্বল ও পুতুলের মতো সুন্দর ছিলো। তাঁর অঙ্গ সৌষ্ঠব ছিলো সামঞ্জস্যপূর্ণ মাংসাল, সুগঠিত এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত। তাঁর পেট ও বক্ষ উভয়ই সমান ছিলো।

তাঁর বক্ষ মুবারক প্রশস্ত ও দর্শনীয় ছিলো। তাঁর কাঁধদ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব ছিলো। তাঁর দেহ মুবারকের জোড়াসমূহ মোটা ছিলনা। যদি তাঁর দেহ মুবারকের কোন অংশ অনাচ্ছাদিত থাকতো তা উজ্জ্বল ও সে পবিত্র অঙ্গ থেকে এক ধরণের ঝলমলে উজ্জ্বল দ্যুতি বের হতো। তাঁর কণ্ঠনালী থেকে নাভী পর্যন্ত সরু পশমরাজির রেখা দৃশ্যমান হতো। তাঁর পবিত্র স্তনে কোনো পশম ছিল না।

এছাড়া তাঁর পবিত্র দেহের অন্যান্য স্থানে পশম ছিলো। যথা তাঁর বাহুদ্বয়, বাজুদ্বয়, গ্রীবাদেশ, সীনা মুবারকের উর্ধ্বাংশ ও টাখনু পর্যন্ত দু পেওলী পশম ছিলো।

তাঁর হাতের বাহুদ্বয় দীর্ঘ এবং হাতের তালু ও মাংসাল। তাঁর কদম মুবারক প্রলম্বিত ও মাংশালো ছিলো। তাঁর আঙ্গুলসমূহ লম্বা, সুগঠিত ও মাংসাল ছিলো। তাঁর মুবারক পায়ের গোছা দু'খানি সরু ও মসৃণ ছিলো। তাঁর পদযুগলের তালু উঁচু পরিচ্ছন্ন ও মসৃণ ছিলো। তাই পদযুগল থেকে দ্রুত পানি ঝরে যেতো।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাঁটার সময় পদযুগল একান্ত দৃঢ়তা, নিপুণতা ও দ্রুততার সাথে উঠাতেন। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে হাঁটতেন। তিনি

যখন হাঁটতেন তখন দ্রুততার সাথে বেশ ফাঁক রাখতেন। মনে হতো তিনি যেনো উঁচু স্থান থেকে নিচু স্থানের দিকে অবতরণ করছেন।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কারো প্রতি মুখ ফিরিয়ে কথা বলতেন তখন পরিপূর্ণভাবেই ঘাড় ঘুরিয়ে কথা বলতেন।

তিনি পথ চলার সময় স্বীয় দৃষ্টি আকাশের তুলনায় যমীনের দিকেই বেশী নিবদ্ধ রাখতেন। তিনি যদি কারও প্রতি তাকাতেন তখন চোখের এক পাশ দিয়ে তাকাতেন না।

তিনি যখন সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে হাঁটতেন তখন সাহাবীগণকে আগে রাখতেন এবং তিনি পেছনে পেছনে হাঁটতেন। যার সাথে সাক্ষাৎ হতো তাকে প্রথমে সালাম দিতেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি হিন্দা বিনতে আবী হালাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) কে বললাম, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কথা বলার ভঙ্গিমা কিরূপ ছিলো? তখন তিনি বললেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বদাই ধ্যানমগ্ন ও চিন্তামগ্ন থাকতেন। তাঁর বাক্যের প্রারম্ভ ও সমাপ্তি মুখগহ্বরের কোণ থেকে হতো। কেননা তিনি প্রখর মেধা শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর বাক্যের বৈশিষ্ট্য ছিলো "জামিউল কালাম"। তাঁর কথা ছিলো ভাবের গভীরতায় পরিপূর্ণ অথচ সংক্ষিপ্ত। তিনি পরিচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট কথা বলতেন। তাঁর বাক্যের মধ্যে কোনো কিছুর কমতিও থাকতো না আবার কথায় অতিরিক্ত কিছুও থাকতো না। তিনি কোমল স্বভাবের ও প্রফুল্ল মেজাজের অধিকারী ছিলেন। তিনি কর্কশভাষী ও বদমেজাজী ছিলেন না। তিনি হীন অর্থাৎ অতি কঠোরও ছিলেন না, আর সম্পূর্ণরূপে তুচ্ছও ছিলেন না। বরং তাঁর কঠোরতা ও কোমলতা উভয়টি সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলো। নিয়ামত তা যতো অল্পই হোক না কেন তিনি তার সম্মান করতেন। তিনি কোনো বস্তুর দোষ বর্ণনা করতেন না। তিনি কোনো খাবারের ত্রুটি বর্ণনা করতেন না। আবার তিনি কারও অতি বেশী প্রশংসাও করতেন না। তিনি রাগান্বিত হলে কেউ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকার সাহস পেতো না। কিন্তু এরূপ অবস্থা তখন হতো যখন কেউ কারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করতো। তিনি সর্বদা হক বা অধিকারের পক্ষে সহায়তা প্রদান করতেন। তিনি কখনো নিজের হকের ব্যাপারে কারও প্রতি রাগ করতেন না, বা প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না। তিনি কারও প্রতি ইশারা করলে সম্পূর্ণ হাত দ্বারা ইশারা করতেন।

তিনি কোন বিষয় বিস্ময় প্রকাশকালে হাত উপুড় করে ফেলতেন। কথাবার্তা বলার সময় স্বীয় হাতকে কথার সাথে মিলিয়ে নিতেন এবং ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে বাম হাতের তালুর উপর মৃদু আঘাত করতেন।

তিনি যখন কোনো ব্যাপারে রাগম্বিত হতেন, তখন চেহারা মুবারক সেদিক থেকে ফিরিয়ে নিতেন। আবার যখন কোনো ব্যাপারে আনন্দিত ও উৎফুল্ল হতেন তখন মুবারক নয়নযুগল অবনমিত করে নিতেন। তিনি অধিকাংশ সময় মুচকি হাসতেন। মুচকি হাসির কারণে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পরিস্কার স্বচ্ছ দন্তরাজি শুভ্র মুক্ত খণ্ডের মতো ঝলমল করতো।

হযরত ইমাম হোসাইন (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি আমার পিতা হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ঘরে প্রবেশ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তখন তিনি আমাকে বললেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পবিত্র গৃহাঙ্গনে প্রবেশে কোনো অনুমতির প্রয়োজন ছিলো না। সুতরাং তিনি যখন তাঁর পবিত্র গৃহাঙ্গনে প্রবেশ করতেন, তখন সময়কে তিন ভাগে ভাগ করতেন। এক ভাগ আল্লাহ তা'আলার জন্য। অর্থাৎ একভাগে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতেন। দ্বিতীয় অংশ পরিবার-পরিজনের জন্য রাখতেন। আর তৃতীয়ভাগ নিজের জন্য রাখতেন। অতঃপর ঐ অংশকেও দু'ভাগে ভাগ করতেন। এক ভাগ নিজের ও আর এক ভাগ অন্যান্য লোকদের জন্য রাখতেন। ঐ ভাগের প্রকৃতি ছিলো এমন ধরনের যে, ঐ সময় হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বিশেষ বিশেষ সাহাবীগণকে সময় দিতেন। তাঁদের মাধ্যমে অন্যদের সময় দিতেন। তাঁদের মাধ্যমে অন্যদের উপকৃত করতেন। মোটকথা তিনি কোনো বিষয় লোকদের কাছে গোপন রাখতেন না।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মহিমান্বিত স্বভাবের মধ্যে আরো এক বিশেষত্ব হলো যে, উম্মাতের জন্য নির্ধারণকৃত সময়ের মধ্যে তিনি মর্যাদাবান সাহাবীদের প্রাধান্য দিতেন। তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা অনুসারে দীনি কাজে তাঁদের দায়িত্ব প্রদান করতেন। মোটকথা, যে ব্যক্তি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মজলিসে বা দীনদারীতে যতো বেশী বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হতো তিনি ঐ পরিমাণে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দান এবং অনুগ্রহের উপযোগী হতো। অনুরূপভাবে তিনি উম্মাতের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লোকদের বেশী সময় দিতেন। সাধারণ লোকদের মধ্যে কারও প্রয়োজন কম আবার কারও প্রয়োজন বেশী হতো। আবার কেউ কেউ অনেক বেশী প্রয়োজন নিয়ে তাঁর নিকট হাযির হতো।

তিনি সাহাবীগণের প্রতি মনোনিবেশ করতেন। তাঁদের প্রয়োজন অনুয়ায়ী শিক্ষা দিতেন এবং সংশোধন করতেন। তাঁদের অবস্থা অনুযায়ী সংশোধন করার ব্যবস্থা নিতেন।

তিনি অধিকাংশে সময় সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, তোমরা যারা আমার মজলিসে উপস্থিত রয়েছো তাঁদের কর্তব্য হলো অনুপস্থিত লোকদের নিকট আমার এ বাণী পৌছে দেয়। যাঁরা আমার দরবারে উপস্থিত হয়ে নিজ নিজ প্রয়োজন আমার নিকট পৌছাতে পারে না। তাদের পক্ষ থেকে সে সমস্ত প্রয়োজনের কথা আমার নিকট পৌঁছে দেওয়া তোমাদের পবিত্র দায়িত্ব।

যে ব্যক্তি বাদশাহর নিকট তাঁর নিজের প্রয়োজনের কথা পৌঁছাতে পারে না। তখন অপর কেউ যদি অক্ষম ব্যক্তির পক্ষ থেকে তাঁর প্রয়োজনের কথা যেন পৌঁছিয়ে দেয়। তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সেই ব্যক্তিকে কদমের দৃঢ়তা দান করবেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মজলিসে এ সমস্ত বিষয় ব্যতীত অন্য আর কোনো বিষয় আলোচনা হতো না। তিনি অন্য কাউকে দুনিয়াবী কোনো বিষয়ে কথা বলার সুযোগ দিতেন না।

হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে লোকেরা প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী হয়ে আসতো। আর পরিতুষ্ট চিত্তে ফিরে যেতো। অর্থাৎ তাঁদের মন-মেজাজ ইলম ও হিকমতের আলোতে দ্যুতিময় হয়ে উঠতো।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাইরে তাশরীফ নিলে সাহাবীদের সাথে কি ধরনের ব্যবহার করতেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তিনি আমাকে বললেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় জিহ্বা মুবারক বন্ধ রাখতেন এবং হিফাযত করতেন। উম্মাতের জন্য যা উপকারী ও কল্যাণকর সেসব বিষয়ে তিনি কথা বলতেন, অন্যথায় মুখ বন্ধ রাখতেন। তিনি সাহাবীদের মনোরঞ্জন করতেন এবং নিজের সাহচর্য থেকে তারা যাতে দূরে সরে না যায় তা থেকে উম্মাতকে রক্ষা করতেন। তিনি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান করতেন এবং ঐ ধরনের লোকদের স্থানীয় জনসাধারণের জন্য বিচারক বা সরদার নিযুক্ত করতেন। তিনি দুষ্টপ্রকৃতির লোকদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতেন। তবে তাদের সাথে অসদাচরণ করতেন না।

তিনি স্বীয় সাহাবী বা সাথীদের কুশল জিজ্ঞেস করতেন। লোকদের নিকট থেকে তাদের পারস্পরিক হাল-অবস্থা জেনে নিতেন। তিনি ভাল-কাজের প্রশংসা

করতেন এবং মন্দকাজের নিন্দা করতেন। তিনি প্রত্যেক কাজে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতেন, যাতে মতবিরোধ দেখা না দেয়। তিনি কখনো এ ধারণায় গাফেল হতেন না যাতে তাঁকে দেখে কেউ যেনো অসর্তক বা আসক্ত না হয়। তিনি যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। তিনি কারো হক্ব বা অধিকার আদায়ের ব্যাপারে কোন প্রকার কার্পণ্য করতেন না। এসব ব্যাপারে আবার অতিরঞ্জিতও কিছু করতেন না। তাঁর দরবারে নৈকট্য প্রাপ্তগণ সকলেই ছিলেন সৎকর্মশীল। ঐ মহান দরবারে অধিকতর মর্যাদাবান এবং নৈকট্য লাভকারী তাঁরাই হতেন যাঁরা ছিলেন আপামর জনতার জন্য অধিকতর কল্যাণকামী। তারা দুর্বলদের জন্য শক্তি লাভের কারণ হতো।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি তাঁকে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারের নিয়ম কানুন ও আদব সম্মান কি রকম ছিলো। সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তখন তিনি বললেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উঠতে বসতে এমনকি সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার যিকিরে রত থাকতেন। তিনি নিজের জন্য কোনো জায়গা নির্ধারিত করে রাখতেন না। লোকদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করতেন তিনি যখন কোনো মজলিসে যোগদান করতেন। যেখানে জায়গা পেতেন সেখানেই বসে যেতেন। তিনি অন্যদেরকেও এরূপ করার শিক্ষা দান করতেন। তিনি স্বীয় অনুগ্রহ, আত্মিক মনোযোগ ও সুদৃষ্টি প্রদানের মাধ্যমে মজলিসে উপস্থিত সকলকে ধন্য করতেন। এর ফলে কেউ এরকম মনে করার অবকাশ পেতো না যে, অমুক ব্যক্তি হয়তো তুলনামূলকভাবে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট অধিকতর সম্মানিত, অধিকতর সাহচর্য প্রাপ্ত। যদি কেউ কোনো প্রয়োজনে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট বসতো বা দাঁড়াতো তিনি তাঁর জন্য অপেক্ষা করতেন। এদের প্রয়োজন পূর্ণ হবার পরও তাঁরা স্বেচ্ছায় চলে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁদের চলে যেতে বলতেন না।

তাঁর নিকট যদি কেউ কোন কিছু চাইতো তিনি তাকে তা প্রদান করতেন এবং মিষ্টি কথা বলে তাঁদের বিদায় দিতেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মহিমান্বিত স্বভাব ও মহানুভবতার কারণে তিনি ছিলেন সমগ্র মানুষের নিকট পিতৃতুল্য। অধিকারের দিক দিয়ে সকলেই তাঁর নিকট সমান ছিলো। তবে খোদাভীরুতা ও পরহেযগারীর দিক থেকে তিনি লোকদের মর্যাদা দান করতেন।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, অধিকারের দিক দিয়ে সকলেই তাঁর নিকট সমান ছিলো। তাঁর পবিত্র মজলিস ছিলো বিদ্যা, সহিষ্ণুতা, লজ্জাশীলতা, ধৈর্য ও বিশ্বস্ততার মজলিস। তাঁর মজলিসে উচ্চস্বরে কোনো আওয়াজ হতো না। অবৈধ

ও অশালীন বা নারীদের সম্পর্কে কোনো আলাপ-আলোচনা হতো না। তাঁর মহতী মজলিসে সর্বদা কল্যাণকর বিষয় আলোচিত হতো। কারো উপর কোনো প্রকার দোষ চাপানো হতো না।

সাহাবীগণ একে-অপরকে তাকওয়া-পরহেযগারীর কারণে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতেন। বড়রা ছোটদের প্রতি স্নেহশীল ছিলো। আবার ছোটরাও বড়দের সম্মান করতো। দরিদ্র-অভাবীদের প্রতি সকলে সহানুভূতি দেখাতো এবং তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দিতো।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাথী ও সহচরদের সাথে কি ধরনের সদাচরণ করতেন? তখন তিনি বললেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বদা স্বভাবসিদ্ধ হর্ষোৎফুল্ল থাকতেন। তাঁর স্বভাবে সর্বদা প্রাণবন্ততা, হাসিখুশি ও মিষ্টি ভাষা বিদ্যমান ছিলো। তিনি কখনো কটুকথা বলতেন না এবং কর্কশভাষী ছিলেন না। তিনি উচ্চস্বরে কথা বলতেন না। কারো দোষের কথা কখনো জবান মুবারক দিয়ে উচ্চারণ করতেন না। তিনি কোনো লোকের সামনে তাঁর প্রশংসা করা পছন্দ করতেন না। অশোভনীয় বিষয় থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন। কেউ কোনো দিন তাঁর নিকট থেকে নিরাশ হতো না।

তিনি স্বীয় পবিত্র সত্তাকে তিনটি বিষয় থেকে মুক্ত রাখতেন। (১) রিয়া বা লৌকিকতা (২) অধিক মাল সঞ্চয় করা। (৩) অতিরিক্ত কথাবার্তা বলা এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস জমা রাখা।

তিনি লোকদের সম্পর্কেও তিনটি বিষয় নির্ধারণ করে রেখেছেন। (১) তিনি কারো নিন্দাবাদ করতেন না। (২) কাউকে কোন প্রকার অপবাদ দিতেন না। (৩) তিনি কখনো কারও দোষত্রুটির বিষয় আলোচনা করতেন না। তিনি সর্বদা ঐ সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করতেন যাতে মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়। তিনি যখন কথা বলতেন তখন সাহাবীগণ একান্ত আদব ও শিষ্টাচারের কারণে মাথা এমনভাবে অবনত করে রাখতো, যেনো তাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে এবং মাথা উঁচু করলে পাখি উড়ে চলে যাবে। তিনি যখন আলোচনা সমাপ্ত করতেন। তখন সাহাবাগণ পরস্পরে কথা বলতেন। সাহাবীগণ কখনো তাঁর সামনে ঝগড়ায় লিপ্ত হতো না। যদি তাঁর সামনে একজন কথা বলা শুরু করতো উপস্থিত অন্য সকলে নীরবতা অবলম্বন করতো, যাতে বক্তা তাঁর বক্তব্য নির্বিঘ্নে সমাপ্ত করতে পারে। তাঁদের আলোচনার ধরন এমন ছিলো যে, মনে হতো এই প্রথম কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ তাঁরা একাগ্রচিত্তে একে অপরের কথা শুনতেন। কোনো বিষয়ে সাহাবীগণ

যখন হাসতো তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও হাসতেন। তাঁর সাহাবীগণ যে বিষয়ে খুশি হতো তিনিও সে বিষয়ে খুশি হতেন। তিনি যে কোন অপরিচিত ব্যক্তির কর্কশ বাক্য শুনে ধৈর্যধারণ করতেন। তিনি অধিকাংশ সময় বলতেন, যদি কোনো প্রয়োজনপ্রার্থী তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তাহলে তোমরা তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ করবে। যে ব্যক্তি তাঁর মহিমান্বিত গুণাবলী ও মর্যাদা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারতো বা তাঁর প্রশংসায় অতিরঞ্জিত করতো না, তিনি এ ধরনের লোকের প্রশংসা পছন্দ করতেন। তিনি কোনো লোকের কথার মাঝখানে কথা বলতেন না। যাতে সে নিজের বক্তব্য পুরিপূর্ণ করতে পারে বা মজলিস শেষ না হয়।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিরূপ নীরবতা অবলম্বন করতেন। তিনি বললেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চার কারণে নীরবতা পছন্দ করতেন (১) সহিষ্ণুতা, (২) আল্লাহ তা'আলার ভয়, (৩) তাকদীর, (৪) তাফাক্কুর বা ধ্যান মগ্ন হওয়া। তাকদীরের অর্থ হলো তিনি লোকদের উপকারের উদ্দেশ্যে তাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দান করতেন এবং লোকদের মাঝে সামঞ্জস্যতা রক্ষা করতেন। তিনি সর্বদা অনন্তকালীন আখিরাত ও ধ্বংসশীল দুনিয়া সম্পর্কে ধ্যানমগ্ন থাকতেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সহিষ্ণুতার বিশেষত্বের মাঝে ধৈর্য পুঞ্জীভূত ছিলো। তাই তিনি যতই রাগান্বিত হতেন তাঁর পবিত্র যবান মুবারক থেকে কর্কশ ভাষা বের হতো না। তিনি নিজের জন্য চার প্রকার ভয়-ভীতিকে পছন্দ করতেন। (১) উপকারী ও কল্যাণকর কথা বা কাজ করতেন। যাতে মানুষ তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করতে পারে। (২) মন্দকাজ থেকে বিরত থাকতেন, যাতে মানুষ সেটা পরিত্যাগ করে। (৩) উম্মাতের জন্য যা উপকারী ও কল্যাণকর সে সব বিষয়ে তিনি কথা বলতেন। অন্যথায় তিনি মুখবন্ধ রাখতেন। (৪) তিনি ঐ সকল কাজে গুরুত্বারোপ করতেন যেগুলোতে উম্মাতের ইহ ও পরকালীন কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর মহিমান্বিত গুণাবলীর বিবরণ পেশ করলাম।

اَلْبَابُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অধ্যায়

فِيمَا وَرَدَ مِنْهُ صَحِيحِ الْأَخْبَارِ وَمَشْهُورِهَا بِعَظِيمِ قَدْرِهِ عِنْدَ رَبِّهِ وَمَنْزِلَتِهِ وَمَا خَصَّهُ بِهِ فِيْ الدَّارَيْنِ مِنْهُ كَرَامَتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَا خِلَافَ أَنَّهُ أَكْرَمُ الْبَشَرِ ، وَسَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ ، وَأَفْضَلُ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ وَأَعْلَاهُمْ دَرَجَةً، وَأَقْرَبُهُمْ زُلْفَى.

وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ جِدًّا، وَقَدِ اقْتَصَرْنَا مِنْهَا عَلَى صَحِيحِهَا، وَمُنْتَشِرِهَا، وَحَصَرْنَا مَعَانِيَ مَا وَرَدَ مِنْهَا فِيْ اثْنَيْ عَشَرَ فَصْلًا.

মহান রবের নিকট হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান, পদমর্যাদা এবং ইহ ও পরলোকে তাঁর বিশেষ ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রসঙ্গে বর্ণিত বিশুদ্ধ ও সুপ্রসিদ্ধ হাদিসসমূহ বর্ণনায়।

এ ব্যাপারে কোন মতানৈক্য নেই যে, তিনি সর্বাধিক সম্মানিত মানব, আদম সন্তানের সরদার, আল্লাহ তা'আলার নিকট পদমর্যাদার দিক থেকে সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ, সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ও সর্বাধিক নৈকট্যধন্য।

এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা অনেক, এগুলো থেকে আমরা শুধুমাত্র সহীহ, মাশহুর ও খুব প্রাসঙ্গিক হাদিসসমূহ সংক্ষিপ্তাকারে বারটি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

مَكَانَتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হুযুর (ﷺ) এর পদমর্যাদা

মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মর্যাদা কিরূপ সমুন্নত, মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত ছিলো সে প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদিসগুলো এখন আলোচনা করবো। তাতে তাঁর সুউচ্চ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যাবে। আর একথাও জানা যাবে যে, উভয় জগতে তিনি কিরূপ সমুন্নত মর্যাদা লাভ করেছেন এবং কিরূপ মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত হবেন।

এ বিষয় সমস্ত উম্মাত ঐক্যমতে উপনিত হয়েছে যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সৃষ্টিজগতের মধ্যে সর্বোত্তম সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহিমান্বিত ও সমুন্নত মর্যাদাবান ও আদম সন্তানদের সর্দার। আর তিনি আল্লাহর নৈকট্য লাভের দিক থেকেও আদমসন্তানদের মধ্যে সর্বোত্তম ও মহিমান্বিত ও সমুন্নত।

আমি এ বিষয়কে বার পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি। প্রকাশ থাকে যে, এ বিষয় এতো অধিক সংখ্যক হাদিস ও আছার বর্ণিত হয়েছে যা গণনা করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কিন্তু আমি শুধু সহীহ ও মাশহুর হাদিসসমূহের প্রতি আলোকপাত করছি।

আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর মহিমান্বিত ও সমুন্নত মর্যাদার অধিকারী হওয়ার কারণ হলো তার স্মরণকে সমুন্নত করা। আদম সন্তানদের নেতৃত্ব দান করা। আর দুনিয়াতে সমুন্নত মর্যাদার অধিকারী হবার কারণ হলো তাঁর পবিত্র বরকতময় নাম।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَسَّمَ الْخُلْقَ قِسْمَيْنِ، فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِهِمْ قِسْمًا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: أَصْحَابُ الْيَمِيْنِ، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، فَأَنَا مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، وَأَنَا خَيْرُ أَصْحَابِ الْيَمِينِ.

ثُمَّ جَعَلَ الْقِسْمَيْنِ أَثْلَاثًا، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهَا ثُلُثًا، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، وَالسَّابِقُوْنَ السَّابِقُوْنَ، فَأَنَا مِنَ السَّابِقِينَ، وَأَنَا خَيْرُ السَّابِقِينَ، ثُمَّ جَعَلَ الْأَثْلَاثَ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِهَا قَبِيلَةً، وَذَلَكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: «وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ» الْآيَةَ.. فَأَنَا أَتْقَى وَلَدِ آدَمَ وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى اللهِ وَلَا فَخْرَ.. ثُمَّ جَعَلَ الْقَبَائِلَ بُيُوتًا فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِهَا بَيْتًا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا» الْآيَةَ..

–আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টিকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে আমাকে সর্বোত্তম শ্রেণীতে সৃষ্টি করেছেন। যথা আল্লাহর বাণী একদল 'আসহাবুল ইয়ামীন' (أَصْحَابُ الْيَمِيْنِ) ডানপন্থী ও আরেককদল 'আস্‌হাবুশ্ শিমাল' (أَصْحَابُ الشِّمَالِ) বামপন্থী। অতএব এর প্রকৃত অর্থ হলো– আমি আসহাবুল ইয়ামীন বা ডানপন্থীদের অন্তর্ভুক্ত। আর আমি আসহাবুল ইয়ামীনদের মধ্যে সর্বোত্তম। সেই উভয় মানবশ্রেণীকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। আর সেই তিন শ্রেণীর মধ্যে আমি সর্বোত্তম। যথা– আল্লাহর বাণী– 'আসহাবুল মায়মানা' (أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ) অর্থ– ডান পার্শ্বস্থ ভাগ্যবান দল। আর 'আসহাবুল মাশয়ামা' (أَصْحَابُ مَشْئَمَةِ) অর্থ- হতভাগ্য বাম পার্শ্বস্থ দল। আরেক দল 'সাবিকুন' অগ্রবর্তীদের দল। সমস্ত অগ্রবর্তীদের মধ্যে আমি সর্বোত্তম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঐ তিন দলকে গোত্রে বিভক্ত করেছেন। আর আমাকে সর্বোত্তম গোত্রের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। যথা আল্লাহ তা'আলার বাণী- এবং তোমাদেরকে শাখা-প্রশাখা ও গোত্রে গোত্রে বিভক্ত করেছি।[১]

সুতরাং সমস্ত আদম সন্তানদের মধ্যে আমি আল্লাহকে সর্বাধিক ভয়কারী। আর আল্লাহ তা'আলার নিকট আমিই সর্বাধিক সম্মানের অধিকারী। একথা আমি গৌরববোধ করে বলছি না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা গোত্রকে বিভিন্ন পরিবারে

---

১. আল কুরআন : সূরা হুজরাত, ৪৯:১৩।

বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে সর্বোত্তম পরিবারে আমাকে সৃষ্টি করেছেন। সে কারণে এরশাদ করা হয়েছে– আল্লাহ তো এটাই চান, হে নবীর পরিবারবর্গ যে, তোমাদের থেকে যাবতীয় অপবিত্রতা দুরীভুত করে দেবেন এবং তোমাদেরকে অতিশয় পূতঃপবিত্র করে দেবেন।[১]

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, একদা সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনার জন্য নবুওয়াত কখন হতে নির্ধারণ করা হয়েছে? তিনি বললেন,

وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ.

–সেই সময় থেকে যখন হযরত আদম (আলাইহিস্ সালাম) এর আত্মা মাটি ও দেহের মধ্যে ছিলো।[২] অর্থাৎ যখন হযরত আদম (আলাইহিস্ সালাম) এর দেহ তৈরী করা হয় তখন ও আমি নবী ছিলাম।

হযরত ওয়াসিলা বিন আসকা' (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করতে শুনেছি যে,

إِنَّ اللهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ بَنِي كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِيْ هَاشِمٍ.

–আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) এর বংশধর হতে হযরত ইসমাঈল (আলাইহিস্ সালাম) কে নির্বাচন করেন। আবার ইসমাঈলের বংশধর হতে কেনানার খান্দানকে নির্বাচন করেন। আবার কেনানার বংশধর হতে কুরাইশ বংশকে নির্বাচন করেন। আবার কুরাইশ বংশ হতে বনু হাশেম পরিবারকে নির্বাচন করেন। পরিশেষে বনু হাশেম পরিবার হতে আমাকেই মনোনীত করেন।[৩]

---

১. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৩৩।
ক) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, বাবু বাকিয়্যাতি আখবারা হাসান..., ৩:৫৬।
খ) হাকীম তিরমিযী : নাওয়াদিরুল উসূল ফী আহাদিসির রসূল, বাবু ফী ইক্বামি মিন গাশ্শিল আরব, ১:৩৩০।

২. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ফী ফযলিন নবী, ১২:৫৫।
খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু ফযলি সায়্যিদিল মুরসালীন, ৩:২৫১।
গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু হাদীসে বা'দি আসাহাবিন্ নবী, ৪৭:১৮৫।

৩. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ফী ফযলিন নবী, ৬:৫।

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

أَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي وَلَا فَخْرَ.

–সমস্ত আদম সন্তানদের মধ্যে আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ও মর্যাদাবান। এটা আমি গৌরব বোধ করে বলছিনা।[১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণনায় রয়েছে,

أَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَلَا فَخْرَ.

–আমি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত, আর এতে আমার কোন অহংকার নেই।[২]

হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) থেকে বর্ণিত আছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: قَلَّبْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَلَمْ أَرَ رَجُلًا أَفْضَلَ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَلَمْ أَرَ بَنِي أَبٍ أَفْضَلَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ.

–আমার নিকট হযরত জিবরাইল (আলাইহিস্ সালাম) এসে বললেন, আমি সারা পৃথিবীর পূর্ব গোলার্ধ ও পশ্চিম গোলার্ধ বিচরণ করেছি। কিন্তু মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে উৎকৃষ্ট কোন মানব দেখিনি। আর বনূ হাশেম গোত্রের চেয়ে উত্তম কোন মানবগোষ্ঠীও দেখিনি।[৩]

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِالْبُرَاقِ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: بِمُحَمَّدٍ تَفْعَلُ هَذَا!! فَمَا رَكِبَكَ أَحَدٌ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْهُ فَارْفَضَّ عَرَقًا.

খ) বাইহাকী : হাদায়িকুল আনোয়ার ওয়া মাতালিউল আসরার, বাবুন নসবিল আকবর লি নাবিয়্যিনা, ১:৮৮।
গ) ইয়াহয়িয়া আমেরী হরযী : বাহাযাতুল মাহাফিল ওয়া বাগিয়াতুল আমাসিল, ১:১১।

১. ক) জালাল উদ্দীন সুয়ূতী : দুররে মানসূর, ৭:৬৩৪।
খ) খতীবে বাগদাদী : আস্ সাবেক ওয়াল লাহেক ফী তাবাউদী মা বায়না ওয়াফা, বাবুল আলফি, ১:৭৩।

২. আবু আলী হাসান : তানবীহুল উতশান আলা মাওরিদিয্ যমআন, ১:১০৩।

৩. শরহে উসূলিল ই'তিকাদ আহলিস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'আত, বাবু ক্বলবি মাশরিক্বি আরযি, ৩:৪৭৭।

–মি'রাজ রজনীতে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনে বোরাক হাযির করা হয়। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন বোরাকের পাদানীতে কদম মুবারক রাখতে উদ্যত হন তখন বোরাক ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। তখন জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) বললেন, তুমি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছো? অথচ সরকারে দু'আলম (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ তো ইতিপূর্বে তোমার পিঠে আরোহণ করেনি। একথা শুনে বোরাক ঘর্মাসিক্ত হয়ে শান্ত হয়ে গেলো।[১]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ أَهْبَطَنِي فِي صُلْبِهِ إِلَى الْأَرْضِ، وَجَعَلَنِي فِي صُلْبِ نُوحٍ فِي السَّفِينَةِ، وَقَذَفَ بِي فِي النَّارِ فِي صُلْبِ إِبْرَاهِيمَ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَنْقُلُنِي فِي الْأَصْلَابِ الْكَرِيمَةِ إِلَى الْأَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ حَتَّى أَخْرَجَنِي بَيْنَ أَبَوَيَّ.. لَمْ يَلْتَقِيَا عَلَىٰ سَفَاحٍ قَطُّ.

–আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আলাইহিস্ সালাম) কে সৃষ্টি করলেন। তখন আমাকে তাঁর পিঠে রেখে যমীনে নামিয়ে নিলেন। হযরত নূহ (আলাইহিস্ সালাম) যখন নৌকায় আরোহন করলেন, আমি তখন তাঁর পৃষ্ঠে ছিলাম। আর হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয় তখনও আমি তাঁর পৃষ্ঠদেশে ছিলাম। অতঃপর আমাকে সম্মানিত পৃষ্ঠদেশ থেকে পবিত্র গর্ভাশয়ে স্থানান্তর করানো হয়। এভাবে আমাকে আমার পূণ্যত্মা মাতা-পিতার (পৃষ্ঠ ও জঠর) থেকে প্রকাশ করা হয়। তারা কখনো বিবাহ বহির্ভূতভাবে মিলিত হননি। (অর্থাৎ তাদের দ্বারা কখনো গর্হিত কাজ সম্পাদিত হয়নি।)

হযরত আব্বাস বিন আবদুল মোত্তালিব তার কবিতায় অনুরূপ বর্ণনার প্রতি ইংগিত করে উল্লেখ করেছেন।

مِنْ قَبْلِهَا طِبْتَ فِي الظِّلَالِ وَفِي مُسْتَوْدَعٍ حَيْثُ يُخْصَفُ الْوَرَقُ

[১]. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ওয়া মিন সুরাতি বনী ইসরাঈল, ১০:৪০৫।
খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ২৫:২৫৭।

–আগমনের পূর্বে তিনি (হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বেহেশতের বাগানের ছায়ায় হযরত আদম (আলাইহিস্ সালাম) এর পৃষ্ঠে অবস্থান করেন। তখন আদম বেহেশতের বৃক্ষ পত্রে আচ্ছাদিত হন। (অর্থাৎ আদমকে বেহেশত থেকে বের করে দেয়ার পর তিনি বৃক্ষ পাতা দ্বারা লজ্জাস্থান আবৃত করেন।

ثُمَّ هَبَطْتَ الْبِلَادَ لَا بَشَرٌ . أَنْتَ وَلَا مُضْغَةٌ وَلَا عَلَقٌ.

–অতঃপর আদমের পিঠে করে তিনি শহরে অবতরণ করেন। অথচ তখন তিনি মানবআকৃতিতে রূপান্তরিত হননি। না তিনি তখন গোশতের টুকরায় রূপান্তরিত হন, না জমাট রক্তবিন্দুতে রূপান্তরিত হন।

بَلْ نُطْفَةٌ تَرْكَبُ السَّفِينَ، وَقَدْ ... أَلْجَمَ نَسْرًا وَأَهْلَهُ الْغَرَقُ.

–বরং তিনি পবিত্র নুতফা হয়ে হযরত নূহ (আলাইহিস্ সালাম) এর নৌকায় আরোহন করেন। আর তিনি নসরকে লাগাম লাগিয়ে দেন, আর তার অনুসারীদের পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করা হয়।[১]

تُنْقَلُ مِنْ صَالِبٍ إِلَى رَحِمٍ ... إِذَا مَضَى عَالَمٌ بَدَا طَبَقٌ.

–এ আমি পবিত্র পৃষ্ঠ থেকে পবিত্র গর্ভাশয়ে স্থানান্তরিত হতে থাকি। এভাবে এক যুগ অতিবাহিত হতো, অপর যুগ আসতো।

حَتَّى احْتَوَى بَيْتُكَ الْمُهَيْمِنُ مِنْ ... خِنْدِفٍ عَلْيَاءَ تَحْتَهَا النُّطُقُ

–অতঃপর তাঁর বংশ মর্যাদায় ইলিয়াস বিন মুদারের সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। (খন্দফ মুদার বিন ইলিয়াসের স্ত্রীর নাম) এভাবে তাঁকে সমুন্নত স্তরে উন্নীত করা হয়। যার মুকাবিলায় পাহাড়ের উঁচু টিলা অনেক নীচু।[২]

وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ ... وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ

[১]. হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম এর পুত্রদের মধ্যে নসর, ওদ, সুয়াআ, ইয়াগুস ও ইয়াউকে প্রমুখ ছিলো। তাদের মৃত্যুর পর লোকেরা শোকাবিভূত হয়ে পড়ে। তখন শয়তান তাদেরকে মন্ত্র পাঠ করে বললো, তাদের প্রতি মূর্তি তৈরি করে ইবাদত করা আরম্ভ করো। সুতরাং তাদের সম্প্রদায়ের লোকজন ঐ সকল সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি তৈরী করে ইবাদত শুরু করে। হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম এর কাউম নসর প্রতিমার পূজারী ছিলো। প্রতিমা ও তার পূজারীদের হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম এর প্লাবনে ধ্বংস করা হয়। উক্ত কবিতায় সে বিষয়ের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

[২]. কেননা বংশের ধারাবাহিকতায় ইলিয়াস বিন মুদারের স্ত্রী খান্দাফের সাথে মিলিত হয়েছে। যিনি অতি উচু সম্মানী বংশের মহিলা ছিলেন। তাই তিনি বংশ মর্যাদায় এতো সমুন্নত ছিলেন, যার তুলনায় পাহাড়ের টিলা ছিলো মূল্যহীন।

–তাঁর আগমনের সাথে সাথে তাঁর জ্যোতিতে আসমান-যমীন সব আলোকিত হয়ে যায়।

فَنَحْنُ فِي ذَٰلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ ... وَسُبُلِ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ.

–সুতরাং আমরা সে নুর ও হিদায়াতের রাস্তায় এসে স্বীয় লক্ষ্যে পৌছে যাবো।

يَا بَرْدَنَا الْخَلِيْلُ يَا سَبَبًا ... لِعِصْمَةِ النَّارِ هِيَ تَحْتَرِقُ.

–হে ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) আপনার জন্য আগুনকে ঠাণ্ডা ও শীতল করে দেয়া হয়েছে। আপনার আগুনে না পোড়ার কারণ হলেন ঐ মহান সত্ত্বা।[১]

হযরত আবু যর, হযরত ইবনে উমর, হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত আবু হোরায়রা ও হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) প্রমুখ সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

أُعْطِيتُ خَمْسًا– وَفِي بَعْضِهَا سِتًّا، لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي،

نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِنَبِيٍّ قَبْلِي. وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ.

–আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে আর কাউকে দান করা হয়নি। অন্যান্য বর্ণনায় ছয়টি বিষয়ের কথা ও বলা হয়েছে। (১) আমাকে এক মাসের দূরত্ব থেকে সৃষ্টি হওয়া 'রো'ব' বা প্রতাপ সঞ্চারকারী ভীতির দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। (২) আমার জন্য ভূ-পৃষ্ঠকে মসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের উপাদান বানানো হয়েছে। কাজেই আমার উম্মাতের যে-কোন ব্যক্তির যেখানে নামাযের সময় হয়, সে সে স্থানেই নামায আদায় করে নেয়। (তার জন্য বিশেষ ইবাদতের স্থানের প্রয়োজন হবেনা। আর পানির পরিবর্তে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নিজেকে পবিত্র করতে সক্ষম হবে।) (৩) আমার উম্মাতের জন্য

---

[১]. ক) হাকেম : আল মুস্তাদ্রাক আলাস্ সহীহাইন, যিকরু ইসলামিল আব্বাস, ১২:৩৪৭।
খ) বায়হাকী : দালায়িলুন্ নবুয়াত, বাবু তালকিউন্ নাসি রাসুলিল্লাহি, ৫;৩৫৪।
গ) আবু নাঈম ইস্পাহানী : মা'রিফাতুস্ সাহাবা, ৭:২১৮।

গণীমতের মাল বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হালাল করা হয়েছে, যা ইতোপূর্বে কারো জন্য হালাল ছিলোনা। (৪) আমি প্রেরিত হয়েছি সমগ্র মানব জাতির জন্য।[১] (৫) আমাকে শাফায়াতের অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

এ শব্দের পরিবর্তে অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে,

«وَقِيلَ لِي سَلْ تُعْطَهُ»

–আমাকে বলা হবে, আপনি চান, আপনাকে প্রদান করা হবে।[২]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

وَعُرِضَ عَلَيَّ أُمَّتِي. فَلَمْ يَخْفَ عَلَيَّ التَّابِعُ مِنَ الْمَتْبُوعِ،

–আমাকে আমার সমস্ত উম্মাতদেরকে দেখানো হয়েছে। তারপর আমাকে বলা হয়েছে, উম্মাতের কারা কারা পথপ্রদর্শক হবে, আর কারা কারা আমার অনুসারী হবে।[৩]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ.

–আমি শ্রেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ উভয়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।[৪]

কারো কারো অভিমত হলো, الْأَسْوَدِ বা কালোর অর্থ হলো– আরববাসীরা, কেননা তারা গোধুম বর্ণের হয়। সুতরাং তারা কালোর মধ্যে গণ্য। আর الْأَحْمَرِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অনারববাসী।

---

[১]. অন্যান্য আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন। যথা– হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম বলেছেন, আমি শুধু বনী ইসরাইলদের হারানো মেষ খুঁজে বের করার জন্য এসেছি। অন্যান্য আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামেরও এই অবস্থা হয়েছে। কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য 'রাহমাতুললিল আলামীন' করে পাঠানো হয়েছে।

[২]. ক) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু হাদীসি আবী যর আল গিফারী, ৪৩:৩০৩।
খ) হাকেম : আল মুসতাদ্রাক আলাস্ সহীহাইন, বাবু তাফসীরে সুরাতুস্ সাবা, ৮:২৫০।
গ) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, বাবুল ক্বিত'আতি মিনাল মাফকৃত, ১৯:৩৮৬।
ঘ) দারেমী : আস্ সুনান, বাবুল গনিমাতে লা তাহিল্লু লি আহাদিন ক্বলানা, ৭:৪০৮।

[৩]. ক) বায্যার : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদে আবী হামযা, ১৭:১১।
খ) ইয়াহইয়া আমেরী হিরযী : বাহাযাতুল মাহাফিল ওয়া বাগিয়্যাতুল আমাসিল, ২:১৯৩।

[৪]. ক) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদে জাবের ইবনে আব্দিল্লাহ, ২৮:২৯৪।
খ) আবি শায়বা : আল মুসান্নাফ, ৭:৪১০।
গ) দারেমী : আস্ সুনান, বাবুল গনিমাতে লা তাহিল্লু লি আহাদিস ক্বলানা, ৭:৪০৮।
ঘ) ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, বাবু যিকরি বয়ান বি আন্না কাওলিহিস্ সালাম, ২৬:৪৫৬।

কারো কারো অভিমত হলো– কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ সবাই তাঁর উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত। আবার কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেছেন, الْأَحْمَرِ দ্বারা উদ্দেশ্য "মানুষ" আর الْأَسْوَدِ বা কালো দ্বারা উদ্দেশ্য হলো "জিন"।

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ، وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ جِيءَ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي.

–আমাকে 'রো'ব' বা ভীতির দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। আমাকে "জাওয়ামিউল কালিম" এর বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে। (অর্থাৎ আমাকে অল্প কথায় ব্যাপক অর্থ ব্যক্ত করার যোগ্যতা প্রদান করা হয়েছে)। এক রাতে আমি যখন নিদ্রাবস্থায় ছিলাম ঐ সময় আমার নিকট পৃথিবীর যাবতীয় ধন-ভাণ্ডারের চাবিগুচ্ছ আনা হয়, অতঃপর তা আমার হাতে রেখে দেওয়া হয়।[১]

অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে,

وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ.

–আমার দ্বারা নবীদের আগমনের ধারাকে সমাপ্ত করা হয়েছে।[২]

হযরত ওকবা বিন আমের (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ، وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا.

১. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ১৫:৭২।
২. ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, ৩:১০৯।
খ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফীল গনিমাতি, ৬:৪৬।
গ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু সায়্যিদি ফাদ্বায়িলিল মুরসালীন, পৃ. ২৪৯।
ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদে আবী হুরাইরা, ১৯:১২।
ঙ) বায়হাকী : সুনানুল কুবরা, ২:৪৩৩।

–আমি তোমাদের সবার পূর্বে চলে যাবো। আমি তোমাদের জন্য সাক্ষ্য দেবো। খোদার কসম! আমাকে হাউজে কাউসার দেখানো হয়েছে। আমাকে পৃথিবীর যাবতীয় ধন ভাণ্ডারের চাবিগুচ্ছ দেয়া হয়েছে। খোদার কসম! এই ব্যাপারে আমি শংকিত নয় যে, আমার পর তোমরা শিরক করবে, তবে এ ব্যাপারে আমার ভয় হয় যে, আমার পর তোমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে।[১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

أَنَا مُحَمَّدٌ، النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ؛ لَا نَبِيَّ بَعْدِي؛ أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَخَوَاتِمَهُ، وَعَلِمْتُ خَزَنَةَ النَّارِ، وَحَمَلَةَ الْعَرْشِ.

–আমি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নবী-ই উম্মী। আমার পর আর কোন নবীর আগমন হবে না। আমাকে 'জাওয়ামিউল কালিম' ও 'খাওয়াতিম' উপাধী দেওয়া হয়েছে। আমার নিকট জাহান্নামের দারোগা ও আরশ বহনকারী ফিরিশতাদের হাযির করা হয়েছে।[২]

হযরত ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ.

–আমাকে কিয়ামত পর্যন্তের নবী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।[৩]

হযরত ইবনে ওহাব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

قَالَ اللهُ تَعَالَى: سَلْ يَا مُحَمَّدُ.. فَقُلْتُ: مَا أَسْأَلُ يَا رَبِّ. اتَّخَذْتَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَكَلَّمْتَ مُوسَى تَكْلِيمًا، وَاصْطَفَيْتَ نُوحًا، وَأَعْطَيْتَ سُلَيْمَانَ مُلْكًا

১. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবুস্ সালাতি আলাশ্ শহীদি, ২:৯১।
খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ইসবাতি হাওদি নাবিয়্যিনা, ৪:১৭৯৫।
গ) ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, বাবু যিকরিল খবরিল মুদ্বাদ ফীয্ যাহিরে..., ৭:৪৭২।
২. ক) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদে আবদিল্লাহ ইবনে উমর, ১৩:৩৫৬।
খ) ইবনে রজব হাম্বল : জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম, আল মুকাদ্দামাহ, ২:২।
৩. ক) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মা যিকরি ফদ্বলি ফীল জিহাদি, ৫:৩১৩।
খ) বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, বাবুত্ তাওয়াক্কুলি বিল্লাহি আয্যা ওয়া জাল্লা..., ২:৪১৭।
গ) হালবী : সিরাতে হালবিয়্যাহ, বাবু বদয়িল আযানে ওয়া মাশরুয়্যাতিহি, ২:১৫৬।

لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ. فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: مَا أَعْطَيْتُكَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ.

أَعْطَيْتُكَ الْكَوْثَرَ، وَجَعَلْتُ اسْمَكَ مَعَ اسْمِي يُنَادَى بِهِ فِي جَوْفِ السَّمَاءِ، وَجَعَلْتُ الْأَرْضَ طَهُورًا لَكَ وَلِأُمَّتِكَ، وَغَفَرْتُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ،

فَأَنْتَ تَمْشِي فِي النَّاسِ مَغْفُورًا لَكَ، وَلَمْ أَصْنَعْ ذَلِكَ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ، وَجَعَلْتُ قُلُوبَ أُمَّتِكَ مَصَاحِفَهَا. وَخَبَّأْتُ لَكَ شَفَاعَتَكَ وَلَمْ أَخْبَأْهَا لِنَبِيٍّ غَيْرِكَ.

–আল্লাহ তা'আলা আমাকে বলেছেন, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি আমার নিকট প্রার্থনা করুন। আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমি কী প্রার্থনা করবো? আপনি হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) কে খলিল বানিয়েছেন। হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর সাথে কথা বলেছেন। হযরত নূহ (আলাইহিস্ সালাম) কে মনোনীত করেছেন। হযরত সোলাইমান (আলাইহিস্ সালাম) কে যেরূপ রাজত্ব দান করেছেন, সেরূপ রাজত্ব আর কাউকে দান করেননি। আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি আপনাকে যা প্রদান করেছি তা ঐগুলো থেকে অতি উত্তম। আমি আপনাকে হাউজে কাউসার দান করেছি। আপনার পবিত্র নামকে আমার নামের সাথে সংযুক্ত করেছি। আসমানের শূন্যমার্গে তা উচ্চারণ করা হয়। আমি যমীনকে আপনার এবং আপনার উম্মাতের জন্য পবিত্র করে দিয়েছি। আমি আপনার পূর্বাপর ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দিয়েছি। তাই আপনি যমীনে নিস্পাপ হিসেবে বিচরণ করবেন, যে মর্যাদা পূর্বে আর কাউকে দেয়া হয়নি। আমি আপনার উম্মাতের অন্তরসমূহকে "মাসহাফ" বানিয়ে দিয়েছি। অর্থাৎ তাদেরকে কুরআন মাজীদ কণ্ঠস্থ করার ক্ষমতা প্রদান করেছি। এর বিপরীতে দুনিয়াতে আজ পর্যন্ত যাবুর,ইঞ্জিল ও তাওরাতের কোন হাফেজ বিদ্যমান নেই। আমি আপনার জন্য শাফায়াতের মর্যাদাকে গোপনীয়ভাবে রেখে দিয়েছি। যা আপনার পূর্বে আর কোনো নবীর জন্য গোপন করে রাখা হয়নি।[১]

[১]. ইয়াহইয়া ইবনে আমের হিরদী : বাহাযাতুল মাহাফিল ওয়া বাগিয়্যাতুল আমাসিল, বাবু ওয়া মিনহু ইসতিসাসিহি, ২:১৯৩।

অপর এক বর্ণনায় হযরত হোযায়ফা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

بَشَّرَنِي يَعْنِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَعِي مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا، مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا، لَيْسَ عَلَيْهِمْ حِسَابٌ وَأَعْطَانِي، أَلَّا تَجُوعَ أُمَّتِي، وَلَا تُغْلَبَ، وَأَعْطَانِي، النَّصْرَ وَالْعِزَّةَ، وَالرُّعْبَ يَسْعَى بَيْنَ يَدَيْ أُمَّتِي شَهْرًا. وَطَيَّبَ لِي وَلِأُمَّتِي الْمُغَانِمَ. وَأَحَلَّ لَنَا كَثِيرًا مِمَّا شَدَّدَ عَلَى مَنْ قَبْلَنَا وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْنَا فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.

–আমার রব আমাকে সুসংবাদ প্রদান করেছেন, সর্বপ্রথম আমার উম্মাতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে জান্নাতের প্রবেশ করাবে। তাদের প্রতি হাজারের সাথে সত্তর হাজার অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাবে । আর বিশেষদান হিসেবে আমাকে বলা হয়েছে, আপনার উম্মাত দুর্ভিক্ষের কারণে ধ্বংস হবে না । আর আপনার উম্মত পরাজিত হবে না।[১] আর আমার উম্মাত যেদিকে যাবে সেদিকে এক মাসের দুরত্বের মধ্যে শত্রুরা ভীত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা আমার ও আমার উম্মাতের জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে হালাল করেছেন। এরূপ আরো অনেক জিনিস আমার জন্য হালাল করা হয়েছে। যা পূর্ববর্তী উম্মাতদের জন্য হালাল ছিলো না। আর দীনের বিষয় আমার প্রতি কঠোরতা আরোপ করা হয়নি।[২]

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

مَا مِنْ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا وَقَدْ أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ

[১]. অর্থাৎ পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত উম্মতদের মতো আমার উম্মতদেরকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষের দ্বারা ধ্বংস করা হবে না। আর পরাজিত করা হবে না। এর অর্থ হলো আমার উম্মত যতদিন দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততোদিন তাদের উপর অমুসলিমদের চাপিয়ে দেওয়া হবে না। আর যদি তারা দ্বীন পরিত্যাগ করে কুফরী গ্রহণ করে। তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের হিফাজতের দায়িত্ব নেবেন না। যথা কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে, "যতদিন তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো এবং আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলো ততো দিন আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।"

[২]. ক) আলাউদ্দীন হিন্দী : কানযুল উম্মাল, ১১:৪৪৮।
খ) ইবনে মনযুর : মুখতাসারে তারিখে দামেস্ক, বাবু যিকরি উরূজিহি ইলাস্ সামায়ি ওয়া ইজতিমায়িহি বিল আম্বিয়া, ১:১৬৩।

الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

–এমন কোন নবী অতিবাহিত হননি, যাকে অনুরূপ মু'জিযা দেওয়া হয়নি যার অনুপাতে লোকেরা ঈমান আনছে। কিন্তু আমাকে যা প্রদান করা হয়েছে তা হলো ওহী (আল-কুরআন), যা আল্লাহ তা'আলা আমার উপর অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং আমি আশা করি কিয়ামত দিবসে তাদের তুলনায় আমার অনুসারী সংখ্যা হবে সর্বাধিক।[১]

সত্যপন্থীদের মতে এ হাদীসের অর্থ হলো, তাঁর এ মু'জিযা কুরআন মাজীদ চিরস্থায়ী। এর বিপরীতে অন্যান্য আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) এর মু'জিযা ছিলো সমকালীন। তাদের ইহজগত ত্যাগের সাথে সাথে মু'জিযাসমূহের কার্যকারিতাও শেষ হয়ে যায়। জীবিতরাই তা প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু তার মুকাবিলায় কুরআন মাজীদ এমনি এক মু'জিযা যা সর্বযুগে তথা মহাপ্রলয় অবধি পৃথিবীতে আগত সকল মানুষ স্ব-স্ব যুগে তা প্রত্যক্ষ করতে থাকবে। শুধু যে তারা শুনতে পাবে তা নয়। এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এখানে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করছি। তবে মু'জিযা অধ্যায়ের শেষভাগে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

كُلُّ نَبِيٍّ أُعْطِيَ سَبْعَةَ نُجَبَاءَ، وُزَرَاءَ، رُفَقَاءَ، مِنْ أُمَّتِهِ، وَأُعْطِيَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ نَجِيبًا، مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَعَمَّارٌ.

–প্রত্যেক নবীকে তাঁর উম্মাত থেকে সাতজন অভিজাত বন্ধু দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তোমাদের নবীকে চৌদ্দজন বন্ধু দেওয়া হয়েছে। যাঁদের মধ্যে হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত ইবনে মাস'উদ, হযরত

[১]. ক) আল মুসনাদুল মুসতাখরাজ আলা সহীহ মুসলিম, ১:২১৬।
খ) ইবনে আসাকীর : আল মু'জাম, ১:৩৭।
গ) বাগভী : শরহুস্ সুন্নাহ, বাবু ফাযায়িলে সায়্যিদিল আওয়ালীন ওয়াল আখেরীন, ১:৮৫১।
ঘ) বায়হাকী : দালায়িলুন্ নবুয়্যাত, বাবু সালামানিল ফারেসী ইউবয়্যিসু হাকীকাহ, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ৬০।

আম্মার প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) রয়েছেন।[১]

অতঃপর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

إِنَّ اللهَ قَدْ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي. وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ،

–আল্লাহ তা'আলা হস্তি বাহিনীকে বাধা প্রদান করে মক্কাকে নিরাপদ করে দেন। কিন্তু মক্কার উপর তাঁর রাসূল ও মুমিনদের একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে দেন। আমার জন্য একদিনের কিছু অংশের জন্য মক্কাকে হালাল করে দেন। (অর্থাৎ যুদ্ধ করার জন্য) আমার পর আর কাউকে এ অধিকার দেয়া হবে না।[২]

হযরত ইরবাদ্ব ইবনে সারিয়া (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বর্ণনা করেছেন,

إِنِّي عَبْدُ اللهِ، وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، وَعِدَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةُ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ.

–আল্লাহ তা'আলা নিকট আমি তখনো বান্দা ও শেষ নবী রূপে ছিলাম যখন আদম ছিলেন মাটির খামিরায়। আমি হলাম আমার পিতা হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) এর দোয়া ও হযরত ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) এর ভবিষ্যৎবাণী।[৩]

[১]. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মানাক্বিবি আবী মুহাম্মদ হাসান ইবনে আলী, ৬:১৩০।
খ) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ৬:২১৫।
গ) সীয়াক : মুত্তায়াব্বাবুল আখবার বি আতয়্যিবাবিল আখবার, বাবু গযওয়াতিত্ তাবুক, ১:৩২৩।
[২]. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু কাইফা তা'রিফু লি কিত্তাতি আহলি মক্কা, ৮:২৯৩।
খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু তাহরীমে মক্কা ওয়া সাইদিহা, ৭:৮৬।
গ) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু তাহরীমে হেরমে মক্কা, ৫:৩৮৮।
ঘ) ইবনে কাসীর : তাফসীর-ই ইবনে কাসীর, ৮:৪৯০।
ঙ) সুয়ূতী : দুররে মনসুর, ১:২৩৬।
[৩]. ক) বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, বাবু হুব্বিন নবী, ২:৫১০।
খ) বায়হাকী : দালায়িলুন নবুয়াত, বাবু যিকরি মাওলিদিল মুস্তফা, ১:৮০।
গ) তকি উদ্দীন মুকরিজী : ইমতাউল আসমা'আ, বাবু ওয়া আম্মা আন্নাহু খাতিমুল আম্বিয়া, ৩:৩৩৫।
গ) আলী ইবনে নাফে' জুহ্দ : আল খোলাসা ফী শামায়িলে মাহমুদিয়্যাহ, ১:৫৬।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সমস্ত আসমানবাসী ও সমস্ত আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) এর উপর মর্যাদা প্রদান করেছেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, আসমানবাসীদের উপর কিরূপ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা আসমানবাসীদের সম্পর্কে এরশাদ করেছেন–

وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِۦ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ

–এবং তাদের মধ্যে যে-কেউ বলে, আমি আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য হই, তবে তাকে আমি জাহান্নামের শাস্তি দেবো।[১]

কিন্তু হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে এরশাদ করেছেন–

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۝١

–নিশ্চয় আমি আপনার জন্য সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।[২]

লোকেরা জিজ্ঞেস করলো? আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) এর উপর মর্যাদা কিভাবে প্রদান করা হয়েছে? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন–

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِۦ

–এবং আমি প্রত্যেক রাসূলকে তাঁর স্বজাতির ভাষা দিয়ে প্রেরণ করেছি।[৩]

আর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে এরশাদ করেছেন–

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ

–এবং হে রাসূল আমি আপনাকে এমন রিসালাত সহকারে প্রেরণ করেছি যা সমস্ত মানবজাতিকে পরিব্যাপ্ত করে নেয়।[৪]

হযরত খালিদ বিন মা'দান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরাম হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনার সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু বলুন? হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

১. আল কুরআন : সূরা আম্বিয়া, ২১:২৯।
২. আল কুরআন : সূরা ফাতাহ, ৪৮:১।
৩. আল কুরআন : সূরা ইবরাহীম, ১৪:৪।
৪. আল কুরআন : সূরা সাবা, ৩৪:২৮।

আমি হলাম আমার পিতা হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) এর দো'য়া। হযরত আবু যর, হযরত সাদ্দাদ বিন আউস ও হযরত আনাস বিন মালেক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) থেকে অনুরূপ বর্ণনা বর্ণিত আছে।

যেমন– হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) এর দো'য়া–

رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ

–হে আমাদের রব! এবং প্রেরণ করো তাদের মধ্যে একজন রাসূল তাদেরই মধ্য থেকে।[১]

وَبَشَّرَ بِي عِيسَى. وَرَأَتْ أُمِّي حِينَ حَمَلَتْ بِي أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهُ قُصُورُ بُصْرَى مِنْ أَرْضِ الشَّامِ. وَاسْتُرْضِعْتُ فِي بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، فَبَيْنَا أَنَا مَعَ أَخٍ لِي خَلْفَ بُيُوتِنَا نَرْعَى بُهْمًا لَنَا، إِذْ جَاءَنِي رَجُلَانِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ- وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ- بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مملوّة ثلجا، فَأَخَذَانِي فَشَقَّا بَطْنِي-

–আমার সম্পর্কে হযরত ইসা (আলাইহিস্ সালাম) ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। আর আমার মায়ের প্রত্যক্ষ স্বপ্ন, যা তিনি আমাকে প্রসবকালে দেখেন যে, তাঁর সম্মুখে একটি আলো উদ্ভাসিত হয়েছে। যার আলোতে তিনি সিরিয়া, বসরা শহরের রাজপ্রাসাদসমূহ পর্যন্ত দেখতে পান। আমাকে বনী সা'দ গোত্রে দুধ পান করানো হয়েছে। একদিন আমি আমার দুধ ভাইয়ের সাথে ঘরের পেছনে বকরী চরাচ্ছিলাম, তখন আমার নিকট সাদা পোশাক পরিহিত দু'জন লোক (অপর বর্ণনায় তিন জনের আসার কথা বলা হয়েছে।) স্বর্ণের তশতরী ভর্তি পানি নিয়ে আসলেন। তাঁরা আমাকে ধরে আমার পেট চিরে ফেললো।

অপর বর্ণনায় এসেছে,

مَنْ نَحْرِي إِلَى مَرَاقِّ بَطْنِي ثُمَّ اسْتَخْرَجَا مِنْهُ قَلْبِي، فَشَقَّاهُ، فَاسْتَخْرَجَا مِنْهُ عَلَقَةً سَوْدَاءَ فَطَرَحَاهَا، ثُمَّ غَسَلَا قَلْبِي وَبَطْنِي بِذَلِكَ الثَّلْجِ حَتَّى أَنْقَيَاهُ.

১. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২: ১২৯।

–তাঁরা আমার কণ্ঠনালী থেকে পেটের নরম অংশ পর্যন্ত কেটে ফেললো। তাঁরা আমার পেট ও ক্বালবকে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধৌত করে। তাতে আমার ক্বালব পূর্ণ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়।

অপর এক হাদিসে বর্ণিত আছে,

ثُمَّ تَنَاوَلَ أَحَدُهُمَا شَيْئًا، فَإِذَا بِخَاتَمٍ فِي يَدِهِ مِنْ نُورٍ، يَحَارُ النَّاظِرُ دُونَهُ، فَخَتَمَ بِهِ قَلْبِي فَامْتَلَأَ إِيمَانًا وَحِكْمَةً، ثُمَّ أَعَادَهُ مَكَانَهُ، وَأَمَرَّ الْآخَرُ يَدَهُ عَلَى مَفْرَقِ صَدْرِي فَالْتَأَمَ.

–তাঁদের মধ্যে একজন হাতে করে কি যেনো এনেছিলো। আমার মনে হয় তা দেখতে নুরানী আংটি হবে। যার উপর দৃষ্টি পড়া মাত্রই চোখ ঝলসিয়ে উঠে। ওই লোক আংটি দ্বারা আমার ক্বালবে মোহর মেরে দেয়। তারপর আমার ক্বালব হিকমত ও ঈমানে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। অতঃপর তাঁরা তা পুনরায় স্ব-স্ব স্থানে সংস্থাপন করে দেন। অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি আমার বক্ষের কাটা অংশে তাঁর হাত বুলিয়ে দেন তাতে আমার ক্বালবের কাটা অংশ জোড়া লেগে পূর্বের মতো স্বাভাবিক হয়ে যায়।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) বললেন,

قَلْبٌ وَكِيعٌ– أَيْ شَدِيْدٌ– فِيهِ عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ، وَأُذُنَانِ سَمِيعَتَانَ، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ، زِنْهُ بِعَشَرَةٍ مِنْ أُمَّتِهِ، فَوَزَنَنِي بِهِمْ فَرَجَحْتُهُمْ، ثُمَّ قَالَ: زِنْهُ بِمِئَةٍ مِنْ أُمَّتِهِ، فَوَزَنَنِي بِهِمْ فَوَزَنْتُهُمْ. ثُمَّ قَالَ: زِنْهُ بِأَلْفٍ مِنْ أُمَّتِهِ، فَوَزَنَنِي بِهِمْ فَوَزَنْتُهُمْ ثُمَّ قَالَ: دَعْهُ عَنْكَ، فَلَوْ وَزَنْتَهُ بِأُمَّتِهِ لَوَزَنَهَا

–এই ক্বালব বেশী ভারী, তাতে দেখার জন্য দু'টি চোখ ও শুনার জন্য দু'টি কান রয়েছে। অতঃপর তাঁদের একজন অপরজনকে বললো– তাকে উম্মতের দশজনের সাথে ওজন করা হোক। সুতরাং আমাকে দশ ব্যক্তির সহিত ওজন করা হলো। আমি ভারী হয়ে যাই। অতঃপর বললেন, আচ্ছা এবার তাঁকে দু'শ জনের সহিত ওজন করা হোক। সুতরাং আমাকে দু'শ জনের সঙ্গে ওজন করা হয়। এই বারও আমি তাঁদের উপর ভারী হয়ে যাই। অতঃপর বললেন, আচ্ছা এবার তাঁকে এক হাজার জনের তুলনায়

ওজন করা হোক। সুতরাং আমি এবারও ভারী হয়ে যায়। অতঃপর তারা বলল, ছেড়ে দাও। কেননা তাঁকে সকল উম্মতের সাথে ওজন করলেও তিনি ভারী হয়ে যাবেন।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

ثُمَّ ضَمُّونِي إِلَى صُدُورِهِمْ، وَقَبَّلُوا رَأْسِي، وَمَا بَيْنَ عَيْنَيَّ ثُمَّ قَالُوْا: يَا حَبِيْبَ اللهِ لم تُرَعْ، إِنَّكَ لَوْ تَدْرِي مَا يُرَادُ بِكَ مِنَ الْخَيْرِ لَقَرَّتْ عَيْنَاكَ. مَا أَكْرَمَكَ عَلَى اللهِ، إِنَّ اللهَ مَعَكَ وَمَلَائِكَتَهُ» . قَالَ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ. «فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ وَلَّيَا عَنِّي، فَكَأَنَّمَا أَرَى الْأَمْرَ مُعَايِنَةً.

–অতঃপর তাঁরা উভয়ে আমাকে তাঁদের সীনার সাথে লাগান এবং আমার কপালের মাঝখানে চুমো দেন। অতঃপর বললেন, হে আল্লাহর বন্ধু! ভয় পাবেন না। কেননা আপনি যদি জানতেন একাজে আপনার কি কল্যাণ ইচ্ছে করা হয়েছে তাহলে আপনার চক্ষু শীতল হয়ে যেতো। আর আপনি আল্লাহ তা'আলা নিকট কতইনা মর্যাদার অধিকারী। নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতারা আপনার সাথেই আছেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এ দু'জন ফিরিশতা আমার নিকট থেকে চলে যান। কিন্তু আমার মনে হয় আমি যেনো এখনও তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি।

আবু মুহাম্মদ মক্কী ও আবুল লাইস সমরকান্দি ও অন্যান্য ওলামাদের অভিমত হলো যে, হযরত আদম (আলাইহিস্ সালাম) বিচ্যুতির ঘটনার পর বললেন, হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উসীলায় আমার ত্রুটি মার্জনা করে দাও।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে। তিনি বললেন, আমার তাওবা কবুল করো। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে কীভাবে চিনতে পেরেছো? হযরত আদম (আলাইহিস্ সালাম) বললেন,

رَأَيْتُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ مِنَ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ محمد رَسُولُ اللهِ وَيُرْوَى مُحَمَّدٌ عَبْدِي وَرَسُولِي فَعَلِمْتُ أَنَّهُ أَكْرَمُ خَلْقِكَ عَلَيْكَ فَتَابَ اللهُ

عَلَيْهِ وَغَفَرَ لَهُ، وَهَذَا عِنْدَ قَائِلِهِ تَأْوِيلُ قَوْلِهِ تَعَالَى (فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ).

–আমি জান্নাতের প্রতিটি স্থানে– لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ লেখা দেখেছি। তখন আমি বুঝতে পারলাম, তাঁর থেকে দ্বিতীয় অপর কোন ব্যক্তি আপনার নিকট অধিক ইজ্জত ও সম্মানের অধিকারী হতে পারেনা। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর তাওবা কবুল করে তাঁকে ক্ষমা করে দেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ এরশাদ করেছেন– "অতঃপর আদম শিখে নিলেন তাঁর পালনকর্তার নিকট থেকে কিছুবাণী।"[১]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত আদম (আলাইহিস্ সালাম) বললেন,

لَمَّا خَلَقْتَنِي رَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى عَرْشِكَ فَإِذَا فِيهِ مَكْتُوبٌ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَعْظَمَ قَدْرًا عِنْدَكَ مِمَّنْ جَعَلْتَ اسْمَهُ مَعَ اسْمِكَ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ (وَعِزَّتِي وَجَلَالِي إِنَّهُ لَآخِرُ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ وَلَوْلَاهُ مَا خَلَقْتُكَ.

–আমাকে সৃষ্টি করার পর আমি আমার মাথা আপনার আরশের দিকে উঠালে দেখতে পেলাম তাতে লেখা রয়েছে– لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ তখন আমি বুঝতে পারলাম তাঁর থেকে বেশী সম্মানিত আপনার নিকট আর কেউ হতে পারেনা। আর এ কারণে আপনি তাঁর নামকে আপনার নামের সাথে মিলিত করেছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আলাইহিস্ সালাম) এর উপর ওহী প্রেরণ করলেন। আমি আমার ইজ্জত ও শ্রেষ্ঠত্বের শপথ করে বলছি, তিনি হলেন তোমার বংশধর ও শেষ নবী। আমি যদি তাঁকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা না করতাম তাহলে তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না।

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আদম (আলাইহিস্ সালাম) এর উপনাম ছিলো "আবু মুহাম্মদ"। আবার কেউ বলেন, তাঁর এক উপনাম ছিলো "আবুল বাশার"।

---

[১]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২: ৩৭।

হযরত সুরাইজ বিন ইউনুস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

إِنَّ للهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ عِبَادَتُهَا عَلَى كُلِّ دَارٍ فِيهَا أَحْمَدُ أَوْ مُحَمَّدٌ إِكْرَامًا مِنْهُمْ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

–আল্লাহ তা'আলার এরূপ অসংখ্য বিচরণকারী ফিরিশতা রয়েছে যাদের ইবাদত হলো ঐ সমস্ত ঘরের জিয়ারত করা যে সমস্ত ঘরে "মুহাম্মদ" বা "আহমদ" নামের লোক রয়েছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র নামের বরকতে এরূপ করা হয়।

হযরত আবু হামরা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ إِذَا عَلَى الْعَرْشِ مَكْتُوبٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ أَيَّدْتُهُ بِعَلِيٍّ

–মি'রাজের রাতে পরিভ্রমণের সময় আমি আরশের উপর লেখা দেখেছি لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ أَيَّدْتُهُ بِعَلِيٍّ আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, আলীর দ্বারা তাঁকে সাহায্য করা হবে।[১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا – ধন ভাণ্ডারের অর্থ স্বর্ণের ফলক এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, সেটার এক পাশে লেখা ছিলো,

لَوْحٌ مِنْ ذَهَبٍ مَكْتُوبٌ: عَجَبًا لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْقَدَرِ كَيْفَ يَنْصَبُ. عَجَبًا لِمَنْ أَيْقَنَ بِالنَّارِ كَيْفَ يَضْحَكُ، عَجَبًا لِمَنْ رَأَى الدُّنْيَا وَتَقَلُّبَهَا بِأَهْلِهَا كَيْفَ يَطْمَئِنُّ إِلَيْهَا. أَنَا اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا.. مُحَمَّدٌ عَبْدِي وَرَسُولِي.

---

[১]. দিয়ার বাকরী : তারিখুল খমীস ফী আহওয়ালি আনফাসিন্ নফীস, বাবু যিকরি কিস্সাতিল মি'রাজ, ১:৩১৩।

[এর দ্বারা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর বীরত্ব ও ইসলাম প্রচারে মরণপণ লড়াইয়ের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এ কারণে দেখা যায় তিনি কোনো যুদ্ধে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গ ত্যাগ করেননি। এর দ্বারা হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে তিনি উত্তম এ কথা বুঝানো হয়নি। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আংশিক মর্যাদা লাভ করেছেন, তা বুঝানো হয়েছে।]

–তার অবস্থা আশ্চর্যজনক। যে আল্লাহর ইচ্ছা ও অদৃষ্টের দৃঢ় বিশ্বাসী হয়। সে কোনো কোনো ঘটনায় চিন্তাযুক্ত হয় কিভাবে? তার অবস্থা আশ্চর্যজনক যার অন্তর জাহান্নামের উপর দৃঢ় বিশ্বাসী হয়, সে হাসে কিভাবে? তার অবস্থা আশ্চর্যজনক যার অন্তর পৃথিবী ধ্বংস ও পরিবর্তনশীল হবার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়, অতঃপর সে এটার প্রতি ধাবিত হয় কীভাবে? তাতে আরো লেখা রয়েছে– আমি আল্লাহ হই, আমি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই! আর হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার বান্দা ও রাসূল।[১]

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে আরো বর্ণিত আছে, জান্নাতের দরজায় এটা উৎকীর্ণ রয়েছে, لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ 'আমি আল্লাহ হই, আমি ব্যতিত কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল'- যে এটা বলবে, আমি তাকে শাস্তি দেবো না। বর্ণিত আছে, তিনি একটি প্রাচীন প্রস্তরখণ্ডে এটা উৎকীর্ণ অবস্থায় পেয়েছেন যে,

مُحَمَّدٌ تَقِيٌّ مُصْلِحٌ، وَسَيِّدٌ أَمِيْنٌ.

–মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খোদাভীরু, সংশোধক ও বিশ্বস্তদের সরদার।

সামনতরী বলেন, আমি খোরাসানের কোন এক এলাকায় নবজাতক এক শিশুর এক বাহুতে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ) ও অপর বাহুতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' (مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ) লেখা দেখতে পেয়েছি।

ঐতিহাসিকগণ বলেছেন– ভারতের এক লাল বর্ণের গোলাপ ফুলে সাদা দাগে لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ লেখা দেখেছেন।

হযরত জাফর বিন মুহাম্মদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন,

إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ إِلَّا لِيَقُمْ مَنِ اسْمُهُ.

–কিয়ামতের দিন একজন ঘোষক ঘোষণা দিয়ে বলবে, যার নাম "মুহাম্মদ" সে যেন দাঁড়িয়ে যায়। আর হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ

[১]. হযরত মূসা ও হযরত খিজির আলাইহিমাস্ সালাম এর ঘটনা বর্ণিত আছে। দুই অনাথ বালকের গৃহের দেয়াল ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। হযরত খিযির আলাইহিস্ সালাম তা পুনঃনির্মান করেন। কেননা উক্ত দেয়ালের নীচে ধন ভাণ্ডার গোপন করে রাখা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহ তা'আলা আনহু বলেন, সে ধন ভাণ্ডার মূলতঃ স্বর্ণের ফলক ছিলো। তাতে উপরোক্ত ভাষ্যসমূহ লেখা ছিলো।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র নামের বরকতে বেহেশতে প্রবেশ করে।

আবুল কাসেম তাঁর 'সামায়া' ও ইবনে ওহাব তাঁর 'জামিয়া' নামক গ্রন্থে হযরত মালেক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি মক্কাবাসীদের নিকট শুনেছি, যে ঘরে "মুহাম্মদ" নামে কোন লোক থাকবে অবশ্যই সে ঘর বরকত লাভ করবে। সে ঘরের অধিবাসীদের রিযিকেও বরকত প্রদান করা হবে। তার বরকতে প্রতিবেশীদের রিযিকেও বরকত প্রদান করা হবে।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

مَاضَرَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُوْنَ فِيْ بَيْتِهِ مُحَمَّدٌ وَمُحَمَّدَانِ وَثَلَاثَةٌ

–এক ঘরে এক বা একাধিক "মুহাম্মদ" নামের ব্যক্তি থাকলে তাতে ক্ষতির কোন কারণ থাকতে পারেনা।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (াদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

أَنَّ اللهَ تَعَالَى نَظَرَ إِلَى قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاخْتَارَ . نْهَا قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَبَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ.

–আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি দৃষ্টি দান করেন, মানুষের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ক্বালবকে নিজের জন্য পছন্দ করেন। আর তাঁকে স্বীয় রিসালাত সহকারে প্রেরণ করেন।

হযরত নাক্কাসা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো–

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا۟ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓا۟ أَزْوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦٓ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا

–এবং তোমাদের জন্য শোভা পায়না যে, আল্লাহ রাসূলকে কষ্ট দেবে, এবং এও না যে, তাঁর পরে কখনো তাঁর বিবিগণকে বিবাহ করবে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর নিকট বড় জগন্য কথা।[১]

[১]. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩: ৫৩।

এই আয়াত অবতীর্ণ হলে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাঁড়িয়ে খোতবা দান করে এরশাদ করলেন,

يَا مَعْشَرَ أَهْلِ الْإِيمَانِ إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَضَّلَنِي عَلَيْكُمْ تَفْضِيلًا وَفَضَّلَ نِسَائِي عَلَى نِسَائِكُمْ تَفْضِيلًا.

–হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিশ্চিতভাবে মনে রেখো আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আর তোমাদের স্ত্রীদের উপর আমার পূতঃপবিত্র স্ত্রীগণকে মর্যাদা দান করেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

كَرَامَةُ الْإِسْرَاءِ

হুযুর (ﷺ) এর মি'রাজের বিবরণ

বিশেষ থেকে বিশেষতর, উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর, পূর্ণ থেকে পূর্ণতর এবং বিস্ময়কর মু'জিযা হচ্ছে মি'রাজ। আল্লাহ তা'আলার সাথে অভিসার ও তাঁর দীদারের বর্ণনা করা। হযরত আম্বিয়া (আলাইহিস্ সালাম) এর ইমামতি করা। সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত গমন ও অদৃশ্যজগতের অন্যান্য বিস্ময়কর নির্দশনসমূহ অবলোকন ও পর্যবেক্ষণ করার বর্ণনা করা।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বিশেষত্বের এক দিক হলো মি'রাজ গমনের ঘটনা। এর মধ্যে তার সমুন্নত মর্যাদাকে গোপন করে রাখা হয়েছে। যার বিবরণ পবিত্র কুরআন মাজীদে বর্ণিত আছে। আর তা বহু সংখ্যক মুতাওয়াতির সহীহ হাদিস দ্বারা বিস্তারিতভাবে প্রমাণ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী–

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَٰرَكْنَا حَوْلَهُۥ لِنُرِيَهُۥ مِنْ ءَايَٰتِنَآ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١﴾

–পবিত্রতা ঐ মহান সত্তার যিনি তাঁর বান্দাকে রাতের একাংশে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পরিভ্রমণ করালেন। যে মসজিদের আকসার চতুস্পার্শ্বে আমি বরকত রেখেছি। এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য হলো, আমি আল্লাহ! আমার কুদরতের নির্দশন তাঁকে দেখাবো। নিশ্চয় যিনি প্রকৃত শ্রবণকারী এবং প্রত্যক্ষকারী।[১]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী–

وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿١﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿٢﴾ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾ عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ

[১]. আল কুরআন : সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭: ১।

ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ۝ وَهُوَ بِٱلْأُفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ ۝ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۝ فَأَوْحَىٰٓ إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَآ أَوْحَىٰ ۝ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰٓ ۝ أَفَتُمَـٰرُونَهُۥ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۝ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۝ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ۝ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰٓ ۝ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۝ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۝ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَـٰتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰٓ ۝

১। ঐ প্রিয় উজ্জ্বল নক্ষত্র মুহাম্মদের শপথ, যখন তিনি মি'রাজ থেকে অবতরণ করেন।
২। তোমাদের সাথী না পথভ্রষ্ট হয়েছেন না বিপথে চলেছেন।
৩। এবং তিনি কোন কথা নিজ প্রবৃত্তি থেকে বলেন না।
৪। তাতো নয়, কিন্তু ওহীই, যা তাঁর প্রতি (অবতীর্ণ) করা হয়।
৫। তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন প্রবল শক্তিসমূহের অধিকারী।
৬। শক্তিমান। অতঃপর ঐ জ্যোতি ইচ্ছা করলেন,
৭। আর তিনি উচ্চাকাশের সর্বোচ্চ দিগন্তে ছিলেন।
৮। অতঃপর ঐ জ্যোতি নিকটবর্তী হলো । অতঃপর খুব নেমে আসলো।
৯। অতঃপর ঐ জ্যোতি ও এ মাহবুবের মধ্যে দু'হাতের ব্যবধান রইলো; বরং তদপেক্ষাও কম।
১০। তখন ওহী করলেন আপন বান্দার প্রতি যা ওহী করার ছিলো।
১১। অন্তর মিথ্যা বলেনি যা দেখেছে।
১২। তবে কি তোমরা তাঁর সাথে তিনি যা দেখেছেন তাতে বিতর্ক করছো।
১৩। এবং তিনিতো ঐ জ্যোতি দু'বার দেখেছেন।
১৪। সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে।
১৫। সেটার নিকট রয়েছে "জান্নাতুল মা'ওয়া"।
১৬। যখন সিদরার উপর আচ্ছন্ন করছিলো যা আচ্ছন্ন করার ছিলো।
১৭। চক্ষু না কোন দিকে ফিরেছে, না সীমাতিক্রম করেছে।
১৮। নিশ্চয় তিনি আপন পালনকর্তার বহু বড় নিদর্শন দেখেছেন।[১]

[১]. আল কুরআন : সূরা আন নজম, ৫৩: ১-১৮।

মি'রাজ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। এর ঘটনা কুরআনের স্পষ্ট উদ্ধৃতি বা আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। এর নির্ভরযোগ্যতা, বিশুদ্ধতা, আশ্চর্যজনক বিস্তারিত বিবরণ ও হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খাস বিশেষত্বের বিষয়টি বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। যেগুলো হাদিস-ই মুতাওয়াতির এর পর্যায়ে পৌছে গেছে।

আমার খেয়াল হলো শুধু ঐ হাদিসসমূহ উপস্থাপন করা যা বিষয়বস্তুর সাথে পরিপূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট, আরো যে সমস্ত হাদিস উল্লেখ করা অত্যাবশ্যক এবং সেগুলোর প্রতি শুধু ইঙ্গিত করা।

হযরত আনাস বিন মালেক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণনা করেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ قَالَ فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبُطُ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَاءَنِي جبرئيل بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ جبرئيل: اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ فاستفتح جبرئيل فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ، قَالَ: جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ معك قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرَئِيلُ، فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرَئِيلُ: قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِابْنَيِ الْخَالَةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا فَرَحَّبَا بِي وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَذَكَرَ مِثْلَ الْأَوَّلِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ وَذَكَرَ مِثْلَهُ فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ قَالَ اللهُ تَعَالَى (وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا) ثُمَّ عُرِجَ بِنَا

إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا

إِلَى السَّمَاءِ.

السَّادِسَةُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا يعودون إِلَيْهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيلَةِ وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ، قَالَ فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشَى تَغَيَّرَتْ فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا فَأَوْحَى اللهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ يَا رَبِّ خَفِّفْ عَنْ أُمَّتِي فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقُلْتُ حَطَّ عَنِّي خَمْسًا قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تَعَالَى وَبَيْنَ مُوسَى حَتَّى قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ فَتِلْكَ خَمْسُونَ صَلَاةً وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً قَالَ فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى فَأَخْبَرْتُهُ.

فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ).

–আমার সম্মুখে বোরাক উপস্থিত করা হলো। তা শ্বেত বর্ণের জন্তু, গাধার চেয়ে বড় ও খচ্চর অপেক্ষা ছোট। তার দৃষ্টি যতদূর যেতো সেখানে পা

রাখতো। আমি ওটাতে আরোহণ করে বায়তুল মোকাদ্দাস এসে পৌছি। অন্যান্য নবীগণ যে স্থানে নিজেদের সাওয়ারী বাঁধতেন, আমিও আমার বাহনকে সেখানে বাঁধলাম। অতঃপর আমি বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদে প্রবেশ করে সেখানে দু'রাকাত নামায আদায় করি। তারপর মসজিদ হতে বেরিয়ে আসি। তখন হযরত জিবরাইল (আলাইহিস্ সালাম) আমার নিকট একটি শরাবের পাত্র ও একটি দুধের পাত্র নিয়ে আসেন। আমি দুধের পাত্র গ্রহণ করি। তখন হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) বললেন, আপনি ফিতরত বা স্বভাবধর্ম ইসলাম গ্রহণ করেছেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) আমাকে সঙ্গে নিয়ে উর্ধ্বলোকে যাত্রা করেন এবং নিকটতম আসমানে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম)! আবার জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে কে রয়েছেন? তিনি বললেন, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে কী ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর দরজা খুলে দেওয়া হয়। আমি ভেতরে পৌছলে হযরত আদম (আলাইহিস্ সালাম) এর সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তিনি আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানান এবং আমার জন্য নেক দো'য়া করেন।

অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) আমাকে নিয়ে উর্ধ্বে আরোহন করলেন এবং দ্বিতীয় আসমানে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল! আবার জিজ্ঞেস করা হয়, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হয়, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমাকে তাঁর নিকট পাঠানো হয়েছে। তারপর দরজা খুলে দেওয়া হয়। আমি ভেতরে প্রবেশ করে সেখানে হযরত ঈসা ও হযরত ইয়াহইয়া (আলাইহিস্ সালাম) কে দেখতে পাই। তারা উভয়জন খালাতো ভাই। তারা উভয় আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানান এবং আমার জন্য নেক দো'য়া করেন।

অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) আমাকে নিয়ে তৃতীয় আসমানে উঠলেন এবং দরজা খুলে দিতে বললেন। সেখানেও পূর্বের ন্যায় জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি উত্তর দেন । তারপর দরজা খুলে দেওয়া হয়। আমি অভ্যন্তরে প্রবেশ করি। তখন সেখানে হযরত ইউসুফ (আলাইহিস্ সালাম) কে দেখতে পেলাম। তিনি এমন ব্যক্তি যে, তাঁকে সমস্ত পৃথিবীর

অর্ধেক সৌন্দর্য দান করা হয়েছে। তিনিও আমাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে আমার জন্য নেক দো'য়া করেন।

অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) আমাকে নিয়ে চতুর্থ আসমানে উঠেন। সেখানেও পূর্বের মতো প্রশ্নোত্তর হয়। সেখানে আমার সাথে হযরত ইদ্রিস (আলাইহিস্ সালাম) এর সাক্ষাৎ হয়। তিনিও আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে আমার জন্য নেক দো'য়া করেন।

তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন–

وَرَفَعْنَٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾

–এবং আমি তাকে উচ্চ স্থানের উপর উঠিয়ে নিয়েছি।[১]

অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) আমাকে নিয়ে পঞ্চম আসমানের দিকে যাত্রা করেন। সেখানেও পূর্বের মতো প্রশ্নোত্তর হয়। সেখানে আমার সাথে হযরত হারুন (আলাইহিস্ সালাম) এর সাক্ষাত হয়। তিনিও আমাকে সাদর অভিনন্দন জানিয়ে আমার জন্য নেক দো'য়া করেন।

অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) আমাকে নিয়ে ষষ্ঠ আসমানে যাত্রা করেন। সেখানেও পূর্বের মতো প্রশ্নোত্তর হয়। সেখানে আমার সাথে হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর সাক্ষাত হয়। তিনিও আমাকে সাদর অভিনন্দন জানিয়ে আমার জন্য নেক দো'য়া করেন।

অতঃপর হযরত জিবরাইল (আলাইহিস্ সালাম) আমাকে নিয়ে সপ্তম আসমানে যাত্রা করেন। সেখানেও পূর্বের মতো প্রশ্নোত্তর হয়। আমি অভ্যন্তরে প্রবেশ করি। সেখানে হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) কে দেখতে পাই। তিনি বায়তুল মামুরের সাথে হেলান দিয়ে বসে আছেন। আমি দেখতে পাই প্রতিদিন সত্তর হাজার ফিরিশতা সে গৃহে প্রবেশ করে। যারা একবার বের হয়ে যান, তারা পুনরায় আর প্রবেশ করার সুযোগ পান না।

অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) আমাকে সিদরাতুল মুনতাহার দিকে নিয়ে যান। এর পাতাগুলো হাতির কানের মতো এবং এর ফলগুলো মটকার মতো। তারপর উক্ত বৃক্ষের উপর আল্লাহ তা'আলার তাজাল্লি পতিত হয়। এটার অবস্থা এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যে, আল্লাহর সৃষ্টি কোনো মাখলুক তার সৌন্দর্যের কোন প্রকার বর্ণনা দিতে সক্ষম হবেনা।

[১]. আল কুরআন : সূরা মারিয়ম, ১৯:৫৭।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমার উপর যা ওহী করার করলেন এবং আমার উম্মাতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেন। ফেরার সময় আমি হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর নিকট আসলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন। আপনার রব আপনার উম্মতের উপর কি ফরয করেছেন। আমি বলি দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তিনি আমাকে বললেন। আপনি আপনার রবের নিকট ফিরে যান এবং নামাযের সংখ্যা হ্রাস করার জন্য তাঁর নিকট আবেদন করুন। কেননা আপনার উম্মত দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে সক্ষম হবেনা। আমি বনী ইসরাঈলকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছি। তারাও সক্ষম হয়নি। তখন আমি রবের নিকট ফিরে গিয়ে বললাম, হে আমার পালনকর্তা! আমার উম্মতদের নামায হ্রাস করে দিন। তখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায হ্রাস করে দেন।

অতঃপর আমি হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর নিকট ফিরে এসে বললাম, আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিয়েছেন। তখন হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) বললেন, আপনার উম্মত তা-ও আদায় করতে সক্ষম হবেনা। কাজেই আপনি পুনরায় আপনার রবের নিকট ফিরে যান এবং আরো কমানোর জন্য আবেদন করুন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি এভাবে আমার রব ও হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর মাঝখানে আসা যাওয়া করতে থাকি। এবং বার বার নামাযের সংখ্যা কমিয়ে আনতে থাকি। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সর্বশেষ আমার রব বললেন, হে মুহাম্মদ! দৈনিক ফরয তো এই পাঁচ নামায এবং প্রত্যেক নামাযের সাওয়াব দশ দশ নামাযের সমান। আমার নীতি হলো যে ব্যক্তি কোন নেক কাজ করার সংকল্প করবে, কিন্তু তা সম্পাদন করেনি, তার জন্য একটি নেকী লেখা হবে আর যে ওই কাজ সম্পাদন করবে তার জন্য দশটি নেকী লেখা হবে। আর যেই ব্যক্তি কোন মন্দ-কাজ করার সংকল্প করবে তার জন্য কিছু লেখা হবে না, তবে যদি তা বাস্তবায়ন করে তার জন্য একটি গুনাহ লেখা হবে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, অতঃপর আমি অবতরণ করে যখন হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর নিকট পৌছি এবং তাঁকে পূর্ণ বিবরণ জানাই তখন তিনি আমাকে বললেন, আবারও আপনার রবের নিকট যান এবং আরো কিছু কমিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করুন।

তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমার রবের নিকট বারংবার যাওয়ার কারণে পুনরায় যেতে আমি লজ্জাবোধ করছি।[১]

আল্লাহ তা'আলা কাজী আয়ায (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কে সৌভাগ্য মন্ডিত করুন! তিনি বলেন, হযরত সাবিত (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্যতার সাথে হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে এই হাদিস বর্ণনা করেন। অন্যান্য বর্ণনাকারীগণও অনুরূপ নির্ভরযোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন। বিশেষ করে হযরত শোরাইক বিন আবু আস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)'র বর্ণনায় তিনি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বক্ষ মুবারক বিদীর্ণ করা ও যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করার কথা উল্লেখ করেন। অথচ সে ঘটনা তো বাল্যকালে ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়েছে। আর হযরত শোরাইক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নিজেই তাঁর বর্ণনায় ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে বক্ষ বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। তারপর মিরাজের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

আর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর মিরাজের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তাতে কারো কোন মতবিরোধ নেই। আর অধিকাংশের অভিমত হলো, মি'রাজ হিজরতের এক বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছে।

আর হযরত সালমা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা)'র বর্ণনায় উল্লেখ আছে, হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হযরত সাবিত (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) ঐ সময় আগমন করেছেন যখন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বালকদের সাথে খেলা করেন। আর তখন তিনি তাঁর দুধ মাতা হালিমা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা)'র নিকট ছিলেন। তারপর বক্ষ মোবারক বিদীর্ণ করা হয়। ঐ সমস্ত ঘটনাই সত্য। কিন্তু এ সমস্ত ঘটনার সাথে মিরাজের কোন সম্পর্ক নেই। অনুরূপ বর্ণনা অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ থেকেও বর্ণিত হয়েছে। হযরত সাবিত (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উভয় বর্ণনার নির্ভরযোগ্যতার কথা উল্লেখ করেছেন।

---

[১]. ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবুল ইসরায়ি বি রাসূলিল্লাহি, ১:১৪৫।
খ) হুমাইদি : আল জামউ বাইনাস্ সহীহান, বাবুল মুত্তাফাকুন আলাইহি মিন মুসনাদি আবী হামযা আনাস, ২:৪০৩।
গ) বায্যার : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আবী হামযা আনাস..., ২:৩২৫।
ঘ) তকী উদ্দীন মুকরিযী : ইমতাউল আসমা, ৮:২১৪।
ঙ) ইয়াহইয়া আমেরী হিরদী : বাহাযাতুল মাহাফিল ওয়া বাগিয়াতুল আমাসিল, বাবু মুতলুবি ফী বদয়িল ইসলাম..., ১:১৩২।

এখন কথা হলো মি'রাজ নিয়ে যে, মি'রাজ বায়তুল মুকাদ্দাসে হয়েছে। সেখান থেকে তিনি সিদরাতুল মুনতাহায় গমন করেন। মূলতঃ উভয় ঘটনা একই। প্রথমে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস পৌছেন এবং পরে সেখান থেকে সিদরাতুল মুনতাহায় গমন করেন। হযরত সাবিত (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর এ বর্ণনা সকল প্রকারের সন্দেহ নিরসন করে দিয়েছে।

হযরত আবু যর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ.

–আমার ঘরের ছাদ বিদীর্ণ হলে হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) অবতরণ করেন। অতঃপর আমার বক্ষ বিদীর্ণ করেন। তারপর ওটাকে যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করেন। অতঃপর জ্ঞান ও ঈমানে পরিপূর্ণ একটি স্বর্ণের তশতরী এনে তা বক্ষের মধ্যে ঢেলে দেন। তারপর তা বন্ধ করে দেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) আমার হাত ধরে আমাকে আকাশের দিকে নিয়ে যান। এভাবে তিনি পুরো ঘটনা বর্ণনা করেন।

অনুরূপ এক বর্ণনা হযরত কাতাদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হযরত আনাস বিন মালেক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। উক্ত বর্ণনায় শাব্দিক কিছু পরিবর্তন কম বেশী বর্ণনা করা হয়েছে এবং বিভিন্ন আসমানে আম্বিয়া (আলাইহিস্ সালাম) এর অবস্থান সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। তবে হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হযরত সাবিত (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, সুদৃঢ় ও উত্তম। মি'রাজ সম্পর্কিত বর্ণনা অতি বেশী বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে সুক্ষ্ম বিষয়কে ধীরে ধীরে আমরা উদ্দেশ্য অনুযায়ী উল্লেখ করবো।

যেমন– হযরত ইবনে শিহাব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় আছে, হযরত আদম ও হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) ব্যতীত সমস্ত আম্বিয়া (আলাইহিস্ সালাম) مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ অর্থ– নেককার ভাই ও

নেককার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ বলে স্বাগতম জানান। আর উল্লেখিত দু'জন নবী 'ইবনে সালেহ' (اِبْنِ صَالِحْ) নেককার পুত্র বলে সাদর সম্ভাষণ জানালেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে,

ثُمَّ عُرِجَ بِيْ حَتَّى ظَهَرْتُ بِمُسْتَوِىْ أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ،

–তারপর আমাকে এতো উর্ধ্বে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আমি তকদীর লিপিবদ্ধ করার কলমের আওয়াজ শুনতে পাই।[১]

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে,

ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى أَتَيْتُ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ قَالَ ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ.

–অতঃপর আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়। আমি সিদরাতুল মুনতাহায় পৌছি। সিদরা এমন এক রং দ্বারা আবৃত্ত করা হয়েছে, যার সম্পর্কে আমি কিছুই বলতে পারবোনা। তারপর আমাকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হয়।

হযরত মালেক ইবনে সা'আসা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

فَلَمَّا جَاوَزْتُهُ يَعْنِي مُوسَى بَكَى فَنُودِيَ مَا يُبْكِيكَ قَالَ رَبِّ هَذَا غُلَامٌ بَعَثْتَهُ بَعْدِي يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِهِ الْجَنَّةَ أَكْثَرُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي.

–যখন আমি হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর সাথে সাক্ষাত করে সামনে অগ্রসর হতে থাকি, তখন দেখি হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) কাঁদতেছেন। ঘোষণা করা হয়, তুমি কাঁদছো কেনো? ক্রন্দনরত অবস্থায় তিনি বললেন, হে আমার রব! আপনি এ নওজাওয়ানকে আমার পরে দুনিয়াতে পাঠালেন অথচ তাঁর উম্মাত আমার উম্মাতের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে বেহেশতে যাবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

১. ক) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, বাবু মা আসনাদা আবু হিব্বা, ১:১১৮।
খ) আবু আওয়ানা : আল মুসনাদ, বাবু বয়ানি গুসলি কুলবিন্ নবী, ১:১১৯।
গ) ফতেহ উদ্দীন : উইউনুল আসার, বাবু হাদীসিল মি'রাজ, ১:১৭০।

وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَمْتُهُمْ فَقَالَ قَائِلٌ يَا مُحَمَّدُ هَذَا مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَالْتَفَتُّ فَبَدَأَنِي بِالسَّلَامِ،

–আমি নিজেকে মিরাজের রাতে আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) এর জামাতে দেখেছি। তখন নামাযের ওয়াক্ত হলে আমি নামাযের ইমামতি করে নামায শেষ করলাম। তখন একজন ঘোষণাকারী বললেন, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! ইনি দোযখের দ্বাররক্ষী মালেক, তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁর প্রতি তাকালে তিনি আমাকে আগেই সালাম করেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে,

ثُمَّ سَارَ حَتَّى أَتَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَنَزَلَ فَرَبَطَ فَرَسَهُ إِلَى صَخْرَةٍ فَصَلَّى مَعَ الْمَلَائِكَةِ فَلَمَّا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ قَالُوا يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَذَا مَعَكَ قَالَ هَذَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ قَالُوا وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالُوا حَيَّاهُ اللهُ مِنْ أَخٍ وَخَلِيفَةٍ فَنِعْمَ الْأَخُ وَنِعْمَ الْخَلِيفَةُ ثُمَّ لَقُوا أَرْوَاحَ الْأَنْبِيَاءِ فَأَثْنَوا عَلَى رَبِّهِمْ وَذَكَرَ كَلَامَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَهُمْ إِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وعيسى وداود وسُلَيْمَان ثُمَّ ذَكَرَ كلام النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثْنَى عَلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ كُلُّكُمْ أَثْنَى عَلَى رَبِّهِ وَأَنَا أُثْنِي عَلَى رَبِّي الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَرْسَلَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَكَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَأَنْزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ وَجَعَلَ أُمَّتِي أُمَّةً وَسَطًا وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلُونَ وَهُمُ الْآخِرُونَ وَشَرَحَ لِي صَدْرِي وَوَضَعَ عَنِّي وِزْرِي وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا.

–অতঃপর যাত্রা করেন। এবং বায়তুল মুকাদ্দাস পৌছেন। সেখানে তিনি সাওয়ারী পাথরের সাথে বাঁধেন। আর ফিরিশতাদের সাথে নামায আদায় করেন। নামায শেষ করার পর লোকেরা জিজ্ঞেস করে হে জিবরাঈল!

আপনার সাথে ইনি কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল ও নবীদের সর্বশেষ। লোকেরা জিজ্ঞেস করে, আপনাকে কি তাঁকে ডেকে আনার জন্য পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ! তখন তাঁরা সকলে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনার হায়াত বৃদ্ধি করুন। তিনি আমাদের ভাই ও খলিফা, শুধু তাই নয় বরং তিনি উত্তম ভাই ও খলিফা। তারপর সমস্ত ফিরিশতা ও আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) এর রূহের সাথে সাক্ষাত করেন। বর্ণনাকারী সমস্ত আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) এর সাথে কথোপকথন এর বিষয় উল্লেখ করেন। বিশেষ করে হযরত ইবরাহীম, হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আলাইহিমুস্ সালাম)'র সাথে কথা বলার বিষয় উল্লেখ করেন। অতঃপর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর রবের হামদ ছানা করতে করতে বললেন, যখন আপনারা সকলে আল্লাহ রাব্বুল ইযযাতের গুণগান ও স্তুতি পেশ করেন তখন আমিও তাঁর হামদ ছানা পেশ করছি। সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি আমাকে সমগ্র জগতের জন্য রহমত স্বরূপ, সমস্ত মানুষের জন্য সুসংবাদ দানকারী এবং ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেন। তিনি আমার উপর সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার জন্য কুরআন অবতীর্ণ করেন। যার মধ্যে সবকিছুর সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। আমার উম্মতকে তিনি মধ্যম উম্মত বানিয়েছেন। মর্যাদার দিক দিয়ে তারাই প্রথম উম্মত আর আগমনের দিক দিয়ে সর্বশেষ। যিনি আমার বক্ষকে সম্প্রসারিত করেছেন এবং আমার দায়িত্বের বোঝা হালকা ও সহনীয় করেছেন। আমার নামের আলোচনা উন্নত করে দিয়েছেন। তিনি আমাকে নবুওয়াতের ধারার উদ্বোধনকারী এবং সমাপ্তকারী বানিয়েছেন।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এ রূপ প্রশংসাবাণী শুনার পর হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) অন্যান্য আম্বিয়া কেরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন। এর মাধ্যমেই প্রমাণ হয়েছে যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনাদের সকলের চেয়ে উত্তম। অতঃপর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমাকে প্রথম আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে প্রথম আসমান দ্বিতীয় আসমান সফরের সূচনা হয়। এর বিবরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত ইবনে মাস'উদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

وَانْتُهِيَ بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ إِلَيْهَا يَنْتَهِى ما يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا واليهخا يَنْتَهِي مَا يَهْبِطُ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا قَالَ تَعَالَى (إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى) قَالَ فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সিদরাতুল মুনতাহার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। আর তা ষষ্ঠ আসমানে অবস্থিত। এটি এমন এক স্থান, এ স্থানে ভূপৃষ্ঠ হতে যা উর্ধ্ব জগতে পাঠানো হয় তা এখানে এসে শেষ হয়ে যায়। সেই স্থান থেকে কোন মাধ্যম ব্যতীতই তা উপরে উঠিয়ে নেয়া হয়। এস্থান অতিক্রম করার ক্ষমতা ও অধিকার কারো নেই। এখান থেকে যাবতীয় আহকাম গ্রহণ করার জন্য ফিরিশতারা অপেক্ষমান থাকে। আর ফিরিশতাগণ নিম্নজগত থেকে উর্ধ্বজগতে যা কিছু নিয়ে যান এবং উর্ধ্বজগত থেকে হুকুম ও বিধান সংক্রান্ত যা কিছু নিম্নজগতে অবতরণ করে- এসবের সংযোগস্থল হলো সিদরাতুল মুনতাহা। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন মাজীদে এরশাদ করা হয়েছে–

إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴿١٦﴾

–যখন সিদরার উপর আচ্ছন্ন করা ছিলো যা আচ্ছন্ন করার ছিলো।[১]

এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এগুলি স্বর্ণের পতঙ্গ।

হযরত রাবী' বিন আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বলেন,

هَذِهِ السِّدْرَةُ الْمُنْتَهَى يَنْتَهِي إِلَيْهَا كُلّ أَحَدٍ مِنْ أُمَّتِكَ خَلا عَلَى سَبِيلِكَ وَهِيَ السِّدْرَةُ الْمُنْتَهَى يَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا أَنْهَارٌ مِنْ ماءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَهِيَ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا سَبْعِينَ عَامًا وَأَنَّ وَرَقَةً مِنْهَا مُظِلَّةٌ الْخَلْقِ فَغَشِيَهَا

[১]. আল কুরআন : সূরা নজম, ৫৩:১৬।

نُورٌ وَغَشِيَتْهَا الْمَلَائِكَةِ قَالَ فَهُوَ قَوْلِهِ (إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى) فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ سَلْ فَقَالَ إِنَّكَ اتَّخَذْتَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَأَعْطَيْتَهُ مُلْكًا عَظِيمًا وَكَلَّمْتَ مُوسَى تَكْلِيمًا وَأَعْطَيْتَ دَاوُد مُلْكًا عَظِيمًا وَأَلَنْتَ لَهُ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لَهُ الْجِبَالَ، وَأَعْطَيْتَ سُلَيْمَان مُلْكًا عَظِيمًا وَسَخَّرْتَ لَهُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ وَالشَّيَاطِينَ وَالرِّيَاحَ وَأَعْطَيْتَهُ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَّمْتَ عِيسَى التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَجَعَلْتَهُ يُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأَعَذْتَهُ وَأُمَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِمَا سَبِيلٌ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذْتُكَ خَلِيلًا وَحَبِيبًا فَهُوَ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ مُحَمَّدٌ حَبِيبُ الرَّحْمٰنِ وَأَرْسَلْتُكَ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ هُمُ الْأَوَّلُونَ وَهُمُ الْآخِرُونَ وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ لَا تَجُوزُ لَهُمْ خُطْبَةٌ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّكَ عَبْدِي وَرَسُولِي وَجَعَلْتُكَ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ خَلْقًا وَآخِرَهُمْ بَعْثًا وَأَعْطَيْتُكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَلَمْ أُعْطِهَا نَبِيًّا قَبْلَكَ وَأَعْطَيْتُكَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ عَرْشِي لَمْ أُعْطِهَا نَبِيًّا قَبْلَكَ وَجَعَلْتُكَ فَاتِحًا وَخَاتِمًا.

–এই হলো সিদরাতুল মুনতাহা। সেখানে আমার উম্মাতের প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির রূহ পৌঁছানো হয়। এই হলো সিদরাতুল মুনতাহা তার উৎস থেকে অপরিবর্তনীয় পানির নহর রয়েছে। এরূপ দুধের নহর রয়েছে যা কোন দিন নষ্ট হবার নয়। এমন শরাবের প্রস্রবণ রয়েছে যা পানকারীকে প্রশান্ত ও পুলকিত করে দেয়। স্বচ্ছ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মধুর প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়েছে। এটা এমন এক বৃক্ষ যার ছায়া সাওয়ারীর সত্তর বছর ভ্রমণ করার জন্য যথেষ্ট। জ্যোতির্ময় ফিরিশতারা সেটাকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন–

إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴿١٦﴾

–যখন সিদরার উপর আচ্ছন্ন করছিলো, যা আচ্ছন্ন করার ছিলো।[১]

[১]. আল কুরআন : সূরা নজম, ৫৩:১৬।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বললেন, আপনি প্রার্থনা করুন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে আল্লাহ! আপনি হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) কে খলিল নির্বাচিত করে তাঁকে বিরাট রাজত্ব দান করেছেন। আপনি হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর সাথে কথা বলেছেন। হযরত দাউদ (আলাইহিস্ সালাম) কে রাজত্ব দান করেছেন এবং তাঁর জন্য লোহা নরম করে দেন। পাহাড়কে তাঁর অনুগত করে দেন। হযরত সোলাইমান (আলাইহিস্ সালাম) কে বিরাট রাজত্ব দান করেন। মানব, দানব, জিন ও বায়ুকে তাঁর অধিনস্থ করে দেন। তাঁর মতো বিরাট রাজত্ব আর কাউকে দান করেননি।

আপনি হযরত ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) কে তাওরাত ও ইঞ্জিলের জ্ঞান দান করেছেন। তাঁকে হাতের স্পর্শ দ্বারা জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত লোককে সুস্থ করার ক্ষমতা দান করেছেন। আর আপনি তাঁকে ও তাঁর মাতাকে অভিশপ্ত শয়তানের নষ্টামী থেকে এমনভাবে নিরাপদ করেছেন, তাঁদের উপর শয়তান সকল প্রকার আক্রমণে ব্যর্থ হলো।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি আপনাকে খলিল বানিয়েছি, মাহবুবও বানিয়েছি। সুতরাং তাওরাতে লিখিত আছে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর হাবীব। আমি তাঁকে সমগ্র বিশ্ব মানবতার জন্য প্রেরণ করেছি। তাঁর উম্মাতকে প্রথম ও সর্বশেষ উম্মাত বানিয়েছি। আমি আরো হুকুম দিয়েছি আপনার উম্মাতের কোন কথাই শুনা হবেনা, যে যাবৎ তারা একথার সাক্ষ্য দেবে যে, আপনি আমার বান্দা ও প্রেরিত রাসূল। সৃষ্টিতত্ত্বের দিক থেকে আপনাকে প্রথম নবী আর প্রেরণের দিক থেকে শেষ নবী বানিয়েছি। আমি আপনাকে "সাবয়ি মাসানী" বা 'পুনরাবৃত্ত সপ্তক আয়াত' দান করেছি। যা আপনার পূর্বে আর কাউকে দান করা হয়নি। আমি আপনাকে সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ দান করেছি। এটা আমার আরশের ভাণ্ডারের অংশ বিশেষ। এটাও আমি আপনার পূর্বে আর কোন নবীকে দান করিনি। আমি আপনাকে নবুওয়াতের ধারার উদ্বোধনকারী এবং সমাপ্তকারী বানিয়েছি।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে তিনটি জিনিস দান করা হয়েছে। (১) পাঁচ ওয়াক্ত নামায (২) সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ (৩) এ সুসংবাদ আপনার উম্মতের সকল গুনাহ ক্ষমা করা হবে, যদি তারা শিরক না করে।

বর্ণনাকারী বলেন–

مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴿١١﴾

–অন্তর মিথ্যা বলেনি যা দেখেছে।[১]

এর অর্থ হলো– হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) কে আসলরূপে দেখেছেন। তাঁর ছয়শত ডানা আছে। হযরত শোরাইক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) কে সপ্তম আসমানে দেখেছেন। আর তিনি কালিম উল্লাহ হবার কারণে এরূপ মর্যাদাপ্রাপ্ত হন। অতঃপর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আরো উর্ধ্বে নিয়ে যাওয়া হয়। সে স্থানের উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অপর কারো জানা নেই। হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) বললেন, আমি বুঝতে পারলাম না যে, আমার থেকে উর্ধ্বে মানুষ কি করে গমন করতে পারে? হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বায়তুল মুকাদ্দাসে সমস্ত আম্বিয়া। (কেরামের নামাযের ইমামতি করেন।

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

بَيْنَا أَنَا قَاعِدٌ ذَاتَ يَوْمَ إِذْ دَخَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَوَكَزَ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَقُمْتُ إِلَى شَجَرَةٍ فِيهَا مِثْلُ وَكْرَيِ الطائر فَقَعَدَ فِي وَاحِدَةٍ وَقَعَدْتُ فِي الْأُخْرَى فَنِمْتُ حَتَّى سَدَّتِ الْخَافِقَيْنِ وَلَوْ شِئْتُ لَمِسْتُ السَّمَاءَ وَأَنَا أُقَلِّبُ طَرْفِي وَنَظَرْتُ جِبْرِيلَ كَأَنَّهُ حِلْسٌ لَاطِئٌ فَعَرَفْتُ فَضْلَ عِلْمِهِ بِاللهِ عَلَيَّ وَفُتِحَ لِي بَابُ السَّمَاءِ وَرَأَيْتُ النُّورَ الْأَعْظَمَ وَلَطَّ دُونِيَ الْحِجَابُ وَفَرَجَهُ الدُّرُّ وَالْيَاقُوتُ ثُمَّ أَوْحَى اللهُ إِلَيَّ مَا شَاءَ أَنْ يُوحِيَ.

–একদিন আমি বসে ছিলাম। হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) অকস্মাৎ আমার নিকট আগমন করে আমার কাঁধ ধরে নাড়া দেন। তখন আমি একটি গাছের দিকে গিয়ে দেখি তা পাখির বাসার মতো।[২] হযরত

১. আল কুরআন : সূরা নজম, ৫৩:১১।
২. এ ঘটনা বায়তুল মুকাদ্দাসে সংঘটিত হয়েছে।

জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) একটি গাছে উঠে বসেন। আমি অপর একটি গাছে বসি। আমি গাছটিতে বসা মাত্রই দেখলাম গাছটি এমন ভাবে বৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করে যে, এমনকি শেষ পর্যন্ত সে পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত এলাকা আবৃত করে ফেলে। তখন আমি যদি ইচ্ছে করতাম হাত দিয়ে আসমান স্পর্শ করতে পারতাম। তখন আমি চতুর্দিকে দেখি। তখন আমি হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) কে দেখি। তাঁকে দেখে মনে হলো যমীনে ঝুঁলানো একটি কাপড়ের মতো। তখন আমি তাঁর উপর আমাকে দেওয়া আল্লাহর মারিফাতের জ্ঞানের মর্যাদা জানতে পারলাম। এটা হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) এর উপরও মর্যাদাবান। তখন আমার জন্য আসমানের দ্বার উন্মুক্ত দেওয়া হয়। আমি আল্লাহ তা'আলার আযমতের নূর প্রত্যক্ষ করি। তখন আমার সামনে পর্দা আবৃত করে দেওয়া হয়। আর দরজাসমূহে মুক্তা ও ইয়াকুত ঝুলানো ছিলো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমার উপর যা ওহী করার তা ওহী করেন।[১]

হযরত বায্যার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, যখন আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আযান শিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা করেন, তখন হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) বোরাক নামক চতুস্পদ জন্তু নিয়ে আসেন। যখন তিনি সেটার উপর আরোহন করতে যান তখন সেটা লাফালাফি করতে আরম্ভ করল। তখন হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) বললেন, শান্ত হও। কেননা তোমার উপর অদ্যাবধি হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে উত্তম আর কেউ আরোহণ করেনি। তখন বোরাক শান্ত হয়ে যায়। তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বোরাকে আরোহণ করে পর্দার নিকট পৌছেন। যা আল্লাহ তা'আলার সাথে মিলিত ছিলো।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্দার নিকট পৌছালে একজন ফিরিশতা পর্দা থেকে বের হয়ে আসে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) কে জিজ্ঞেস করেন, তিনি কে? তখন তিনি বললেন, ঐ সত্ত্বার শপথ যিনি আপনাকে সত্য রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আমি সমস্ত মাখলুক থেকে আল্লাহ তা'আলার অতি নিকটবর্তী। কিন্তু আমার সৃষ্টির

১. ক) তাবরানী : মু'জামুল আওসাত, বাবু মিন ইসমিহী মুহাম্মদ, ৬:২১১।
খ) আবু নঈম ইস্পাহানী : হিলয়িয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবকাতুল আসফিয়া, ২:৩১৬।
গ) শামী : সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, বাবু ফী যিকরিহী, ৩:৭১।

পর থেকে আজ পর্যন্ত এই ফিরিশতাকে এই মুহূর্ত ব্যতীত আর কখনো দেখিনি। তখন সে ফিরিশতা বললো, اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ অতঃপর পর্দার পেছন থেকে আওয়াজ আসে আমার বান্দা সত্য কথা বলছে। আমি মহান। তারপর ফিরিশতা বললো– اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ তখন পর্দার পশ্চাৎ থেকে আওয়াজ আসে, আমার বান্দা সত্য বলছে। আমি আল্লাহ; আমি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই। এভাবে তিনি আযানের শব্দাবলী উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি حَيَّ عَلَي الصَّلٰوةِ — حَيَّ عَلَي الْفَلَاحِ এর জবাব উল্লেখ করেননি।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাত মুবারক ধরে তাঁকে সামনে এগিয়ে দেন। তিনি হযরত আদম ও হযরত নূহ (আলাইহিস্ সালাম) সহ সমস্ত আম্বিয়া কেরামের নামাযের ইমামতি করেন।

হযরত আবু জাফর মুহাম্মদ বিন আলী হোসাইন (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন–

أَكْمَلَ اللهُ تَعَالَى لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّرَفَ على أَهْلِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ.

–আল্লাহ তা'আলা এভাবে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মর্যাদাকে আসমান ও যমীনের অধিবাসীদের উপর পূর্ণাঙ্গ করে দেন।

হযরত কাজী আয়ায (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কে আল্লাহ তা'আলা সৌভাগ্যমণ্ডিত করুন। তিনি উক্ত হাদীসে যে পর্দার কথা উল্লেখ করেছেন, তা মাখলুকের জন্য খালেকের জন্য নয়। মূলতঃ স্রষ্টা পর্দাবৃত হওয়া থেকে পবিত্র। কেননা যা কোন নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত বস্তুকে আবৃত করে রাখে তাকে পর্দা বলা হয়। মূলতঃ কথা হলো, মাখলুকের দৃষ্টি ও জ্ঞানের উপর পর্দা আবৃত হওয়া। আর আল্লাহ তা'আলা যখন যাকে যেভাবে ইচ্ছে করেন পর্দা আবৃত করে দেন। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে এরশাদ করা হয়েছে–

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾

–হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় ঐ দিন তারা স্বীয় রবের সাক্ষাতে আড়ালাকৃত (বঞ্চিত) হবে।[১]

[১]. আল কুরআন : সূরা মুতাফ্ফিফীন, ৮৩:১৫।

এখন সে পর্দা সম্পর্কিত হাদীসে বলা হয়েছে যে,

وَإِذْ خَرَجَ مَلَكٌ مِنَ الْحِجَابِ يَجِبُ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ حِجَابٌ حُجِبَ بِهِ مَنْ وَرَاءَهُ مِنْ مَلَائِكَتِهِ عَنِ الاطِّلَاعِ عَلَى مَا دُونَهُ مِنْ سُلْطَانِهِ وَعَظَمَتِهِ وَعَجَائِبِ مَلَكُوتِهِ وَجَبَرُوتِهِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ الْحَدِيثِ قوله جِبْرِيلَ عَنِ الْمَلَكِ الَّذِي خَرَجَ مِنْ وَرَائِهِ إِنَّ هَذَا الْمَلَكَ مَا رَأَيْتُهُ مُنْذُ خُلِقْتُ قَبْلَ سَاعَتِي هَذِهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحِجَابَ لَمْ يَخْتَصَّ بِالذَّاتِ.

–একজন ফিরিশতা সে পর্দা থেকে প্রকাশিত হন। যদি পর্দাকে অনিবার্য মনে করা হয় যে, সেটা পর্দাই ছিলো। তাহলে এর প্রকৃত অর্থ হবে অন্য ফিরিশতা। এ ফিরিশতা আল্লাহ তা'আলার রাজত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, ফেরেশতা জগতের বিস্ময়তা ও মহান রবের প্রতাপ সম্পর্কে অভিহিত। হাদীসে বর্ণিত হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) এর কথায় এই প্রমাণ পাওয়া যায়। যে হাদিসে তিনি ঐ ফিরিশতা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। তিনি পর্দা থেকে বের হয়ে আসেন। আরো বললেন যে, আমি নিশ্চিত সৃষ্টির পর থেকে এ মুহূর্ত ব্যতীত তাঁকে আর কখনো দেখিনি। এর দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, এ পর্দা আল্লাহ তা'আলার জাত বা সত্তার সাথে সম্পর্কিত নয়।

আর হযরত কা'ব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর সিদরাতুল মুনতাহার ব্যাখ্যায় একথার সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন যে,

إِلَيْهَا يَنْتَهِي عِلْمُ الْمَلَائِكَةِ وَعِنْدَهَا يَجِدُونَ أَمْرَ اللهِ لَا يُجَاوِزُهَا عِلْمُهُمْ.

–ফিরিশতাদের জ্ঞান এই সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে যায়। তাঁরা এ স্থান অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হতে পারেন না। তাঁরা এখানে উর্ধ্বজগত থেকে আগত হুকুম ও বিধান প্রাপ্ত হন। তাদের জ্ঞানও এ স্থান অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হতে পারেনা।

এখন বাকী রইলো হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণী। তিনি যে বলেছেন, ঐ পর্দা আল্লাহ তা'আলার সাথে মিলিত। এখানে 'কা' সর্বনাম উহ্য মানতে হবে।

অর্থাৎ সে পর্দা আল্লাহ তা'আলার মহান আরশের সাথে মিলিত ছিলো। অথবা একথা বলেছেন, এ পর্দা হলো আল্লাহ তা'আলার কুদরতে কামেলার নির্দশন বা তাঁর মারিফাতের হাকীকত ছিলো। মারিফাতের হাকীকাত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন–

وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ

–এবং ঐ বস্তিকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন।[১]

অর্থাৎ গ্রামবাসীদের নিকট জিজ্ঞেস করুন। আর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণীপর্দার পশ্চাৎ থেকে ধ্বনি আসে আমার বান্দা সত্য বলছে। আমি মহান তাহলে একথা সুস্পষ্ট যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এস্থানে আল্লাহর কথা শুনেছেন। কিন্তু তিনি পর্দার পেছন দিক থেকে শুনেছেন।

যেমন– কুরআন মাজীদে এরশাদ করা হয়েছে–

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآئِ حِجَابٍ

–কোন মানুষের পক্ষে শোভা পায় না যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন, কিন্তু ওহী রূপে বা এভাবে যে, মানুষ পর্দার অন্তরালে থাকবে।[২]

অর্থাৎ তিনি আল্লাহকে দেখতে পাননি, কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর দৃষ্টিশক্তিকে আড়ালাবৃত করে দিয়েছেন। যদি একথা সত্য বলে ধরা হয় তাহলে একথা স্বীকার করতে হবে যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলাকে চর্ম চক্ষু দিয়ে দেখেছেন। অথবা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্য কোন স্থানে আল্লাহর দীদার লাভ করেছেন। তাহলে এটাও হতে পারে যে, এ স্থানের পূর্বে বা পরে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চক্ষু মোবারক হতে পর্দা সরিয়ে দেয়া হয়েছে। তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করেন। (আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত)

[১]. আল কুরআন : সূরা ইউসুফ, ১২:৮২।
[২]. আল কুরআন : সূরা শুরা, ৪২:৫১।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

حَقِيقَةُ الْإِسْرَاءِ

মি'রাজের হাকীকত

মি'রাজ জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে হয়েছে না স্বপ্নে আত্মিকভাবে সংঘটিত হয়েছে– এ বিষয় পূর্ববর্তী আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ বিষয় তিনটি অভিমত রয়েছে। একদল আলেমের অভিমত হলো, মি'রাজ আত্মিকভাবে হয়েছে এবং তিনি স্বপ্নে দেখেছেন। সকল আলেম এ বিষয়ে একমত যে, নবীদের স্বপ্ন সত্য হয় এবং তা এক প্রকার ওহী। হযরত মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এ অভিমত পোষণ করেন। হযরত হাসান বসরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এ অভিমত পোষণ করেন। আর হযরত হাসান বসরী এ অভিমত প্রকাশ করেছেন। অথচ তিনি যে মাশহুর হাদিস বর্ণনা করেন তা এ অভিমতের বিপরীত। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)ও এ অভিমত সমর্থক। মি'রাজ আত্মিকভাবে হয়েছে বলে যারা দাবী করেন তাদের প্রমাণ হলো, কুরআন মাজীদে বর্ণিত আয়াত–

وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِىٓ أَرَيْنَٰكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ

–এবং আমি করিনি ঐ দৃশ্যকে যা তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম, কিন্তু মানুষের পরীক্ষার জন্য।[১]

আর হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) থেকে বর্ণিত ঐ হাদিস যাতে তিনি বলেছেন,

مَا فَقَدْتُ جَسَدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দেহ মুবারক সে রাত্রিতে বিছানা থেকে হারিয়ে যায়নি। অর্থাৎ তাঁর দেহ মুবারক বিছানাতে বিদ্যমান ছিলো। আর সে অবস্থায় মি'রাজ হয়েছে।[২]

[১]. আল কুরআন : সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:৬০।
[২]. ক) তকি উদ্দীন মুকরিযী : ইমতাউল আসমা'আ, ওয়া আম্মার ইসরাউ বি রসূলিল্লাহ, ৮:২০২।
খ) আবুল হাসান দিয়ার বাকরী : তারিখুল খমীস ফী আহওয়ালি আনফাসিন্ নফীস, বাবু যিকরি কিস্সাতিল মি'রাজ, ১:৩০৮।
গ) সুয়ূতী : আল ইসরায় ওয়াল মি'রাজ, ১:৩৩।

আর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ঐ বর্ণনা যাতে তিনি বলেছেন, (بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ) তখন আমি শায়িত ছিলাম। অথবা হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু) এর ঐ বর্ণনা যাতে তিনি বলেছেন, আমি মসজিদে হারামে শায়িত ছিলাম। তারপর তিনি মিরাজের পুরো ঘটনা উল্লেখ করেছেন। সে বর্ণনার শেষে বলা হয়েছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

فَاسْتَيْقَظْتُ وَأَنَا بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

–আমি নিদ্রিত ছিলাম, আমাকে জাগ্রত করা হয়। তখন আমি মসজিদে হারামে ছিলাম।[১]

অধিকাংশ পূর্ববর্তী ওলামা ও সাধারণ মুসলমানদের অভিমত হলো- মি'রাজ স্বশরীরে জাগ্রত অবস্থায় হয়েছে। এ অভিমতই সঠিক। হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত জাবির, হযরত আনাস, হযরত হোযাইফা, হযরত ওমর, হযরত আবু হোরায়রা, হযরত মালেক বিন সাআসা, হযরত আবু হাব্বান দারী, হযরত ইবনে মাস'উদ, হযরত দ্বাহহাক, হযরত সাইদ বিন যোবায়ের, হযরত ইবনে যায়িদ, হযরত হাসান বসরী, হযরত ইবরাহীম, হযরত মুজাহিদ, হযরত মাসরূক, হযরত ইক্‌রামা ও হযরত ইবনে জুরাইজ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) প্রমুখ এর এ অভিমত। এটা হলো হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) এর বর্ণনার দলিল। আর এ অভিমতের সমর্থক হলো তাবারী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও বিরাট এক দল মুসলমান। অধিকাংশ মুতাআখখিরীন ওলামা ফিকহবিদ, ফকীহ, মুতাকাল্লামিন ও তাফসীরবিদগণও এ অভিমতের সমর্থক। অর্থাৎ মি'রাজ সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় হয়েছে।

একদল আলেমের অভিমত হলো, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মি'রাজ জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত হয়েছে। আর মসজিদে আকসা থেকে আসমান পর্যন্ত মি'রাজ রূহানী বা আত্মিকভাবে হয়েছে।

[১]. ক) তকি উদ্দীন মুকরিযী : ইমতাউল আসমা'আ, বাবু ওয়া আম্মা ইসরাউ বি রাসূলিল্লাহ, ৮:২০২।
খ) আবুল হাসান দিয়ার বাকরী : তারিখুল খমীস ফী আহওয়ালি আনফাসিন্ নফীস, বাবু যিকরি কিস্সাতিল মি'রাজ, ১:৩০৮।
গ) সুয়ূতী : আল ইসরার ওয়াল মি'রাজ, ১:৩৪।

তাদের দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী–

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا

–পবিত্র ও মহিমাময় সেই সত্ত্বা যিনি তাঁর বান্দাকে রাতের কিয়দাংশে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়েছেন।[১]

তারা বলেন, এ আয়াতে মিরাজের সফরের সমাপ্তি মসজিদে আকসা পর্যন্ত বলা হয়েছে। আর ঐ সফরে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতের নির্দশন প্রকাশ করেছেন। মিরাজের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রশংসাকে সমুন্নত করে জালালতে শান প্রকাশ করেছেন।

তাঁরা বলেন, যদি সশরীরে মসজিদে আকসার পরে মি'রাজ হতো তাহলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই এ আয়াতে তা উল্লেখ করতেন। এরূপ করার মাধ্যমে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পূর্ণাঙ্গ প্রশংসা করা হতো। তারপর উভয় শ্রেণীর মধ্যে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মসজিদে নামায আদায় করেছেন, না নামায আদায় করেননি, এ ব্যাপারে মতভেদ দেখা দিয়েছে। সুতরাং হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও অন্যান্য সাহাবীদের এ সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ সব বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বায়তুল মুকাদ্দাসে নামায আদায় করেন। কিন্তু হযরত হোযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তা অস্বীকার করে বলেন, আল্লাহর শপথ হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বোরাক থেকে অবতরণই করেননি। সেহেতু নামায আদায় করার প্রশ্নই আসেনা।

হযরত কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (তাঁকে আল্লাহ সৌভাগ্যমণ্ডিত করুন) তিনি বলেন, সত্য কথা হলো এই যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মি'রাজ সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় হয়েছে। আর মিরাজের সমস্ত বিবরণে একথাই বুঝা যায়। কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীসের মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয়েছে। তারপরও উসুল শাস্ত্রের বিধান হলো প্রকাশ্য বর্ণনাকে অস্বীকার করা যদি কষ্টকর না হয়, তাহলে তা পরিত্যাগ করা যাবেনা। এখন যদি একথা স্বীকার করা হয় যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মি'রাজ সশরীরে জাগ্রত অবস্থায়

[১]. আল কুরআন : সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:১।

হয়েছে তাহলে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা থাকেনা। কেননা যদি মি'রাজ স্বপ্নে আত্মিকভাবে হতো তাহলে আল্লাহ তা'আলা 'আবদুহু' (عَبْدُهُ) শব্দের পরিবর্তে বরং 'বিরূহি আবদুহু' (بِرُوْحِ عَبْدِهِ) তাঁর বান্দার রূহ নিয়েছেন বলতেন। আর আল্লাহর বাণী–

مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿١٧﴾

–চোখ না কোন দিকে ফিরেছে না সীমাতিক্রম করেছে।[১]

এর দ্বারা বুঝা যায়, মি'রাজ সশরীরে হয়েছে। কেননা মি'রাজ যদি স্বপ্নে আত্মিকভাবে হতো, না তাতে কোন প্রকার নির্দশন থাকতো, না তা কোন মু'জিযা হতো, আর না তাতে কাফিররা বিস্ময় প্রকাশ করতো, না তারা মিথ্যা বলতো, আর না দুর্বল বিশ্বাসীরা মুরতাদ বা অস্বীকার করতো এবং বঞ্চিত হতো, কেননা এরূপ স্বপ্ন কেউ অবিশ্বাস করেনা। তাদের অস্বীকৃতি প্রকাশ করার কারণ হলো- তারা জানতো যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মি'রাজ গমনের কথা বলেছেন। যথা– হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে, তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে নামায আদায় করেন। ঐ বর্ণনায় বলা হয়েছে, হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) বোরাক নিয়ে আসেন। তারপর মিরাজের পুরো ঘটনা সংঘটিত হয়। আসমানের দরজা খোলা হয়েছে। তারপর প্রশ্ন করা হয় আপনার সাথে কেউ আছেন কি? তারপর হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) জবাব দেন যে, আমার সাথে আছেন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আম্বিয়া কেরামের সাথে সাক্ষাত করে কথোপকথন করা, তাঁদের সাদর সম্ভাষণ জানানো, নামায ফরয হওয়া, হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর নিকট ফিরে আসা এবং ঐ সমস্ত বিবরণ যা অন্যান্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

فَأَخَذَ অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) আমার হাত ধরে আসমানের দিকে নিয়ে গেলেন। আর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এরূপ বলা যে,

ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ.

–তিনি আমাকে আরও উপরে উঠালেন। এতো উপরে উঠালেন যে, সেখানে আমি কলমের আওয়াজ শুনি।[১]

[১]. আল কুরআন : সূরা নজম, ৫৩:১৭।

অতঃপর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

وَأَنَّهُ وَصَلَ إِلَى سِدْرَةِ المنتهى وَأَنَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ورأى فيها ما ذِكَرَهُ.

–আমি সিদরাতুল মুনতাহায় পৌছি, আমি বেহেশতে প্রবেশ করি এবং অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করি। তার বিবরণ তিনি উল্লেখ করেন।[২]

এ কারণে হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেন,

هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ رَآهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا رُؤْيَا مَنَامٍ.

–তিনি যা দেখেছেন চর্ম চোখে দেখেছেন, তিনি স্বপ্নে দেখেন নি।[৩]

হযরত হাসান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ فِي الْحِجْرِ جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَهَمَزَنِي بِعَقِبِهِ فَقُمْتُ فَجَلَسْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا فَعُدْتُ لِمَضْجَعِي، ذَكَرَ ذَلِكَ ثَلَاثًا، فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ فَأَخَذَ بِعَضُدِي فَجَرَّنِي إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَإِذَا بِدَابَّةٍ وَذَكَرَ خَبَرَ الْبُرَاقِ.

–আমি 'হিজর' নামক স্থানে শায়িত ছিলাম। হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) আমার নিকট এসে আমার পৃষ্ঠ ধরে নাড়া দেন। আমি উঠে বসি, কিন্তু আমি কাউকে দেখতে পাইনি, তাই আমি আবার শুয়ে পড়ি। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন, তিনি এভাবে তিন বার আমাকে নাড়া দেন। তৃতীয় বার তিনি আমার বাহু ধরে কাবা গৃহের দরজার নিকটে নিয়ে আসেন। আমি দেখি সেখানে একটি চতুষ্পদ জন্তু দাঁড়িয়ে আছে। তিনি এভাবে বোরাকের পুরো বিবরণ উল্লেখ করেন।[৪]

[১]. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু কাইফা ফুরিযাতিস্ সালাতি ফীল ইসরায়ি, ১:৮৭।
খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবুল ইসরায়ি বি রসূলিল্লাহ, ১:১৪৮।
গ) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, বাবু মা আস্নাদা আবু হিব্বা, ২২:৩২৬।

[২]. তকি উদ্দীন মুকরিযী : ইমতাউল আসমা'আ, বাবু ওয়া আম্মা ইসরাউ বি রাসূলিল্লাহ, ৮:২০৩।

[৩]. তকি উদ্দীন মুকরিযী : ইমতাউল আসমা'আ, বাবু ওয়া আম্মা ইসরাউ বি রাসূলিল্লাহ, ৮:২০৩।

[৪]. ক) শামী : সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ, পঞ্চম অধ্যায়, বাবু কাইফিয়্যাতিল ইসরা বির রসূল, ১:৩৬৪।
খ) আবুল হাসান দিয়ার বাকরী : তারিখুল খামীস ফী আহওয়ালি আনফাসিন্ নফীস, বাবু যিকরি কিস্সাতিল মি'রাজ, ১:৩০৮।
গ) হালবী : সিরাতে হালবিয়্যাহ, বাবু যিকরিল ইসরা ওয়াল মি'রাজ, ১:৫১৮।

হযরত উম্মে হানী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেন, মিরাজের রাত্রিতে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার গৃহে তাশরীফ রাখেন। আমার গৃহে তিনি ইশার নামায আদায় করেন এবং আমার গৃহে শয়ন করেন। ফজরের নামাযের ওয়াক্তের অল্প কিছুক্ষন পূর্বে তিনি আমাকে জাগালেন। তারপর আমরা যখন তাঁর সাথে নামায আদায় করি। তখন তিনি আমাকে বললেন,

يَا أُمَّ هَانِئٍ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَكُمُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ كَمَا رَأَيْتِ بِهٰذَا الْوَادِي ثُمَّ جِئْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَصَلَّيْتُ فِيهِ ثُمَّ صَلَّيْتُ الْغَدَاةَ مَعَكُمُ الْآنَ كَمَا تَرَوْنَ.

–হে উম্মে হানী! আমি তোমাদের সাথে মক্কাতে ইশার নামায আদায় করেছি তাই তোমরা আমাকে নামায আদায় করতে দেখছো। কিন্তু আমি তারপর বায়তুল মুকাদ্দাসে চলে যাই এবং সেখানেও আমি নামায আদায় করি। আর সেখান থেকে ফিরে আসার পর আমি তোমাদের সাথে ফজরের নামায আদায় করি যা তোমরা দেখছো।[১]

এ বর্ণনার দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মি'রাজ সশরীরে হয়েছে।

হযরত সাদ্দাদ বিন আউস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট মি'রাজ সম্পর্কে আরয করি–

طَلَبْتُكَ يَا رَسُولَ اللهِ الْبَارِحَةَ فِي مَكَانِكَ فَلَمْ أَجِدْكَ فَأَجَابَهُ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَمَلَنِي إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

–হে আল্লাহর রাসূল! গত রাতে আমরা আপনাকে আপনার গৃহে তালাশ করি, কিন্তু সাক্ষাত পাইনি। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) এসে আমাকে বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে যান।[২]

---

১. ক) ইবনে হিশাম : আস্ সিরাত, বাবু হাদীসে উম্মি হানী..., ১:৪০২।
খ) আবু সাঈদ নিশাপুরী : শরফুল মুস্তফা, বাবু ফী মি'রাজিন্ নবী, ২:১৪৬।
গ) আবুল হাসান দিয়ার বাকরী : তারিখুল খমীস ফী আহওয়ালি আনফাসিন্ নফীস, বাবু যিকরি কিস্সাতিল মি'রাজ, ১:৩০৮।
গ) হালবী : সিরাতে হালবিয়্যাহ, বাবু যিকরিল ইসরা ওয়াল মি'রাজ, ১:৫১৬।

২. আবুল হাসান দিয়ার বাকরী : তারিখুল খমীস ফী আহওয়ালি আনফাসিন্ নফীস, বাবু যিকরি কিস্সাতিল মি'রাজ, ১:৩০৮।

হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

صَلَّيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلْتُ الصَّخْرَةَ فَإِذَا بِمَلَكٍ قَائِمٍ مَعَهُ آنِيَةٌ ثَلَاثٌ.

–মি'রাজের রাতে আমি মসজিদে আকসায় নামায আদায় করি। তারপর আমি সাখরা পাথরের নিচে প্রবেশ করে দেখি একজন ফিরিশতা তিনটি পাত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অতঃপর তিনি সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেন।[১]

উল্লেখিত বর্ণনাসমূহের দ্বারা সশরীরে মি'রাজ হবার কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। আর তা কোন প্রকার অবাস্তব ঘটনাও নয়। সুতরাং ঐ সমস্ত হাদীসের বাহ্যিক অর্থই ধর্তব্য হবে।

হযরত আবু যর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَشَرَحَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ إِلَى آخِرِ الْقِصَّةِ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي.

–যখন আমি মক্কায় ছিলাম, তখন আমার ঘরের ছাদ বিদীর্ণ করা হয় এবং জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) অবতরণ করেন। তিনি আমার বক্ষ বিদীর্ণ করেন এবং যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করেন।[২] এরপর পুরা ঘটনা বর্ণনা করেন এবং হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) আমার হাত ধরে উপরে উঠান।

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

أُتِيتُ فَانْطَلَقُوا بِي إِلَى زَمْزَمَ فَشُرِحَ عَنْ صَدْرِي.

---

১. ক) ইবনে কাসীর : মুসনাদে ফারুক, কিতাবুল হজ্ব, ১:৩৩১।
খ) জিয়া উদ্দীন মুকদেসী : ফাযায়েলে বায়তিল মুকাদ্দিস, বাবুল মাকানিল্লাযি সাল্লা ফীহিন্ নবী, ১:৮৬।
গ) জালাল উদ্দীন সুয়ূতী : বাবু হাদীসি উমর ইবনেল খত্তাব, ১:২৭২।

২. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু যিকরি ইদরীস, ৪:১৩৫।
খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবুল ইসরা বি রাসূলিল্লাহ, ১:১৪৮।
গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৩৫:৭০।

–আমার নিকট ফিরিশতা এসে আমাকে যমযম কূপের নিকটে নিয়ে যায়। অতঃপর আমার বক্ষ বিদীর্ণ করেন।[১]

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي الْحِجْرِ وَقُرَيْشٌ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَايَ فَسَأَلَتْنِي عَنْ أَشْيَاءَ لَمْ أُثْبِتْهَا فكُرِبْتُ كَرْبًا مَا كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ فَرَفَعَهُ اللهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ.

–আমি আমাকে 'হিজর' নামক স্থানে দেখতে পেলাম। কুরাইশরা আমাকে মি'রাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা শুরু করে। তারা এ বিষয় জিজ্ঞাসা করতে শুরু করে। আমি ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ি। ইতোপূর্বে আর কোন দিন এরূপ চিন্তিত হইনি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদখানা আমার সন্মুখে প্রকাশ করে দেন। ফলে আমি সেটার দিকে তাকিয়ে কুরাইশদের প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকি।[২]

এরূপ বর্ণনা হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকেও বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মি'রাজ সম্পর্কিত বর্ণনায় হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এ কথাও উল্লেখ করেছেন যে,

ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى خَدِيجَةَ وَمَا تَحَوَّلَتْ عَنْ جَانِبِهَا.

–অতঃপর আমি হযরত খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট ফিরে আসি এবং দেখি তিনি তখনও পার্শ্ব পরিবর্তন করেননি।[৩]

---

[১]. ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবুল ইসরা বি রাসূলিল্লাহ, ১:১৪৭।
খ) হুমাইদী : আল জামউ বাইনাস্ সহীহাইন, বাবুল মুত্তাফাকুন আলাইহি, ২:৪০৫।
গ) তকী উদ্দীন মুকরেজী : ইমতাউল ইসমা'আ, ৩:৩৫।

[২]. ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু যিকরিল ঈসা ইবনে মরিয়ম, ১:১৫৬।
খ) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবু কাওলিল্লাহি তা'আলা ওয়া নাদূ..., ১০:২৫১।
গ) আলী ইবনে নায়েব অহুদ : খাসায়েসুর রসূল, বাবুল ইসরা ওয়াল মি'রাজ, ১:৫৭।

[৩]. ক) আবুল ফেদা দামেস্কী : মুসনাদে ফারুক লি ইবনে কাসীর, কিতাবুল হজ্ব, ১:৩৩১।
খ) জালাল উদ্দীন সুয়ূতী : খাসায়েসুল কুবরা, হাদীসে উমর ইবনে খত্তাব, ১:২৭২।
গ) আবুল হাসান দিয়ার বাকরী : তারিখুল খমীস ফী আহওয়ালি আনফাসিন্ নফীস, বাবু যিকরি কিস্সাতিল মি'রাজ, ১:৩০৮।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

فِي إِبْطَالِ حُجَجِ مَنْ قَالَ إِنَّهَا نَوْمٌ

যারা মি'রাজ স্বপ্নে বা আত্মিকভাবে হয়েছে বলে দাবী করেন তাদের দলিলসমূহ নাকচ হওয়া প্রসঙ্গে

যারা বলেন মি'রাজ স্বপ্নে হয়েছে, তাদের দলিল হলো, আল্লাহর বাণী–

وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِىٓ أَرَيْنَـٰكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ

–এবং আমি করিনি ঐ দৃশ্যকে যা তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম কিন্তু মানুষের পরীক্ষার জন্য।[১]

তারা এ আয়াতকে দলিল হিসেবে উল্লেখ করে বলেন। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মি'রাজকে স্বপ্ন বলে উল্লেখ করেছেন। আমরা এর প্রত্যুত্তরে বলি আল্লাহ তা'আলার এ বাণী–

سُبْحَـٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا

–পবিত্রতা ঐ মহান সত্তার যিনি তাঁর বিশেষ বান্দাকে রাতের কিয়দাংশে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত পরিভ্রমণ করালেন।[২]

এর দ্বারা তাদের এ দলিলকে বাতিল করা হয়। কেননা নিদ্রিত অবস্থায় সংঘটিত ঘটনাকে ইসরা বা রাতের কিয়দাংশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে ব্যাখ্যা করা যাবে.,। আর প্রথমোক্ত আয়াতে বর্ণিত 'ফিতনা' (فِتْنَةً) বা পরীক্ষা দ্বারা একথার সমর্থন বিদ্যমান যে, চাক্ষুস দর্শন ছিলো। আর মি'রাজ ভ্রমণ সশরীরে হয়েছে। কেননা স্বপ্ন পরীক্ষার বস্তু হয়না। আর স্বপ্ন মিথ্যা বলেও কেউ অবিশ্বাস করেনা। কেননা অনেকে এ ধরণের স্বপ্ন দেখে যে, সে এক মুহূর্তের মধ্যে বহুদূর দুরান্ত পরিভ্রমণ করে আসছে এবং বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে পৌছেছে।

তাফসীরবিদগণ এ আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। কোনো কোনো তাফসীরবিদগণ বলেন, এ আয়াতে হুদাইবিয়ার ঘটনা সম্পর্কে লোকদের মনে যে

---

[১]. আল কুরআন : সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:৬০।
[২]. আল কুরআন : সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:১।

ধারণা জন্মেছে তা বুঝানো হয়েছে। মি'রাজ সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। আর একদল এছাড়াও অন্যান্য অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তার এ বাণী যাকে হাদীসে তিনি নিদ্রা বলে উল্লেখ করেছেন। অথবা এক হাদীসে এসেছে, بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ 'আমি নিদ্রা ও জাগরণ এ দুয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় ছিলাম।' অথবা তাঁর বাণী- ثُمَّ اسْتَيْقَظْتُ 'তারপর আমি জাগ্রত হই'। ঐ সমস্ত বর্ণনা দ্বারা মি'রাজ আত্মিক বা স্বপ্ন যোগে হয়েছে বলে প্রমাণিত হয় না। কেননা সম্ভবতঃ এরূপও তো হতে পারে যে, যখন ফিরিশতা আসেন তিনি তখন শায়িত ছিলেন। অথবা যাত্রার শুরুকালে তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলেন। কেননা হাদিসের কোথাও তিনি মি'রাজের পুরা ভ্রমণে শায়িত ছিলেন এরূপ বলেননি। এখন বাকী রইলো তাঁর ঐ বাণী- ثُمَّ اسْتَيْقَظْتُ وَأَنَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 'অতঃপর আমি জাগ্রত হই তখন আমি নিজেকে মসজিদে হারামে দেখতে পাই'। সম্ভবতঃ আমি জাগ্রত এর অর্থ তখন সকাল হলো। অথবা এরূপ হতে পারে মিরাজের সম্পূর্ণ ঘটনা সংগঠিত হওয়ার পর তিনি শুয়ে পড়েন। আর এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মি'রাজ সারারাত ব্যাপী ছিলো না। বরং রাতের কোন একাংশে সংঘটিত হয়েছে।

সম্ভবতঃ এরূপও হতে পারে যে, ثُمَّ اسْتَيْقَظْتُ وَأَنَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 'আমি জাগ্রত হয়ে দেখি আমি মসজিদে হারামে আছি'। তিনি একথা হয়তো এজন্যই বলেছেন যে, তাঁকে যখন আসমান-যমীনের মালাকুতের বিস্ময়কর ব্যাপারগুলো দেখানো হয়েছে, মালায়ে আ'লা বা উর্দ্ধজগতে আল্লাহ তা'আলার বড় বড় নিদর্শনাবলী এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের ভেদের বস্তু সমূহ অবলোকন করানো হয়েছে। তখন তাঁর হাল অত্যন্ত কঠিনতর হয়ে ছিলো। তিনি মসজিদে হারামে ফিরে না আসা পর্যন্ত এ দুনিয়ার প্রতি পূর্ণাঙ্গ মনোযোগী হতে পারেন নি এবং তিনি মানবীয় অবস্থা বা বাশারিয়াকের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করেন নি। ঐ অবস্থাকে বুঝানোর জন্য নিদ্রা শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় কারণ হলো এই যে, তাঁর জাগ্রত থাকা বা স্বপ্ন দেখাও মূলতঃ বাহ্যিক শব্দ অনুযায়ী ছিলো। এর প্রকৃত অর্থ হলো- তার মি'রাজ সশরীরে হয়েছে। আর তখন তাঁর ক্বলব মুবারকে চৈতন্য ছিলো। আর আম্বিয়া কেরামের স্বপ্নও সত্য হয়। তাঁদের চোখ নিদ্রাচ্ছন্ন হয়, কিন্তু অন্তর থাকে জাগ্রত।

আর কোনো কোনো যুক্তিবাদী বলেন, যেনো কোন প্রকার অনুভূত বস্তু দেখার কারণে তাঁর মনোযোগ আল্লাহ তা'আলা থেকে সরে না যায়, সে কারণে তাঁর চোখ অনিমলীন করে দেওয়া হয়েছে এবং নামায আদায় করার সময় আম্বিয়া কেরামের

বেলায় একথা প্রযোজ্য হবে না। এটা হতে পারে যে, মি'রাজ পরিভ্রমণে তাঁর বিভিন্ন হাল হয়েছে।

চতুর্থ কারণ এটাও হতে পারে যে, তিনি তাঁর বিশ্রাম নেয়াকে শায়িত ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনে হুমামের বর্ণনায় একথার সমর্থন পাওয়া যায়। যথা, بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ তখন আমি শোয়া ছিলাম। তাছাড়া অধিকাংশ বর্ণনায় مُضْطَجِعٌ "বিশ্রাম নিচ্ছিলাম" শব্দ এসেছে। হাদবার বর্ণনায় এসেছে, بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ فِي الْحَطِيمِ আমি তখন হাতীমের নিকটে প্রায় শায়িত অবস্থায় ছিলাম। এছাড়াও অধিকাংশ বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেছেন- فِي الْحِجْرِ مُضْطَجِعٌ আমি হাজারে আসওয়াদের নিকট শায়িত ছিলাম।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ -'আমি, নিদ্রা ও জাগরণ' এ দুয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় ছিলাম। এ অবস্থায় এটা স্বীকার করতে হবে যে, তিনি বিশ্রাম করা অবস্থাকে শায়িত ছিলেন শব্দের দ্বারা উল্লেখ করেছেন। সাধারণতঃ মানুষ বসার পর শয়ন করে।

কোনো কোনো বর্ণনাকারীগণ বলেন, শয়ন করা শব্দ অতিরিক্ত বলা হয়েছে। পেট কাটার কথা ও আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তী হওয়ার সমস্ত বিবরণ হযরত শোরাইক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে। আর হযরত শোরাইক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে হাদিসবিদগণের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে। কেননা অন্যান্য সহীহ বর্ণনায় এসেছে তাঁর বক্ষবিদীর্ণের ঘটনা বাল্যকালে নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বে সংঘটিত হয়েছে। আর উম্মতের সমস্ত আলেম এ বিষয় একমত যে, মিরাজের ঘটনা নবুওয়াত প্রকাশের পর সংঘটিত হয়েছে। এ সমস্ত বর্ণনা একত্রে সন্নিবেশ করলে হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর যে বর্ণনায় মি'রাজ স্বপ্ন বা আত্মিকভাবে হয়েছে বলা হয়েছে, সে বর্ণনা দুর্বল প্রমাণিত হয়। তবে একথা স্মরণীয় যে,বিভিন্ন সূত্রে হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে এ বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও তিনি অপর একজন সাহাবী থেকে এ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি একথাও বলেছেন যে, আমি নিজে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে একথা শুনিনি। অতঃপর আমি জাগ্রত হই এক বর্ণনায় তিনি একথা হযরত মালেক বিন সা'আসা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর

হযরত ইমাম মুসলিম (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর এক বর্ণনা এসেছে সম্ভবতঃ এ বর্ণনা হযরত মালেক বিন সাআসা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাতে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে যে, তিনি কখন এ বর্ণনা হযরত আবু যর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন?

এখন বাকী রইলো হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) এর অভিমত, مَا فَقَدْتُ جَسَدَهٗ "হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দেহ মুবারক আমরা থেকে হারিয়ে যায়নি" এর প্রত্যুত্তরে আমরা বলবো যে, হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) নিজেও প্রত্যক্ষ দর্শনের কথা বলেননি। কেননা তিনি তো তখনো হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাহচর্যে আসেন নি। তদুপরি তখন তাঁর এরূপ কথা স্মরণ রাখার বয়সও হয়নি। যদি মিরাজের সময়ের মত-পার্থক্যের বিষয় বিবেচনায় রাখা হয়, তাহলে দেখা যায় তখন তাঁর জন্মই হয়নি। যেমন- হাদিসবিদ জুহুরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর অভিমতে দেখা যায় এঘটনা ইসলামের প্রাথমিক যুগে সংগঠিত হয়েছিল। অথচ হিজরতের সময় হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) এর বয়স ছিলো আট বছর। আবার কেউ কেউ বলেন, হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে মি'রাজ হয়েছে। আবার কেউ এক বছর পূর্বে হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনা হলো পাঁচ বছর সংক্রান্ত বর্ণনা। এর দলীল অতি দীর্ঘ। আর তা উল্লেখ করা আমার মূল উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) নিজে মিরাজের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন নি। বরং তিনি অন্য কারো নিকট থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তাঁর বর্ণনাকে যিনি মিরাজের বর্ণনা নিজে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে শুনেছেন তাঁর বর্ণনার উপর প্রাধান্য দেওয়া যাবেনা। হযরত উম্মে হানী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) এর মি'রাজ সংক্রান্ত বর্ণনা হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) এর বর্ণনায় বিপরীত দলীল।

এছাড়া আরো অনেক বর্ণনা হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) এর বর্ণনার বিপরীত রয়েছে। সুতরাং যে সমস্ত বর্ণনায় মি'রাজ সশরীরে হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে সে সমস্ত বর্ণনার উপর হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) এর বর্ণনাকে প্রাধান্য দেওয়া যাবেনা। কেননা তাঁর বর্ণনা থেকে ঐ সমস্ত বর্ণনা অনেক বেশী শক্তিশালী। তবে একথাও লক্ষণীয় যে, হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেছেন, "হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দেহ মুবারক আমার থেকে হারিয়ে যায়নি"। একথা মূলত একটি ঐতিহাসিক

বক্তব্য কেননা হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) এর বাসর হয়েছে মদীনাতে আসার পর। আর মি'রাজ হয়েছে মক্কাতে থাকা অবস্থায় সে সমস্ত বর্ণনার দ্বারা হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) এর স্বপ্ন যোগে মি'রাজ হবার বর্ণনাকে দুর্বল প্রমাণ করা হয়। বরং তাঁর সহীহ বর্ণনায় একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সশরীরে মিরাজে গমন করেছেন। তা হলো এরূপ যে তিনি একথা অস্বীকার করেছেন যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মি'রাজ সফরে আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করেছেন। যদি তাঁর মতে মি'রাজ স্বপ্নে হতো তাহলে তিনি আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করা অস্বীকার করতেন না। আর যদি বলা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে এরশাদ করেছেন-

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ﴿١١﴾

-অন্তর মিথ্যা বলেনি যা দেখেছে।[১]

এর অর্থ হলো অন্তর দিয়ে দেখা। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, নিদ্রা যোগে এ ধরণের স্বপ্ন ও ওহী ছিলো। তা তো চোখে দেখার দৃশ্য না। এর প্রত্যুত্তরে আমরা এ আয়াত উল্লেখ করেছি।

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ﴿١٧﴾

-চক্ষু না কোন দিকে ফিরেছে, না সীমাতিক্রম করেছে।[২]

এখানে দর্শনকে চোখের সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। অন্তরের সাথে সম্পর্কিত করা হয়নি। আর একদল তাফসীরবিদ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى এ আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, অন্তর চোখে দেখার হাকীকতের বিপরীত কোন সন্দেহ প্রকাশ করেনি, বরং চোখের দেখাকে অন্তর স্বীকৃতি দিয়েছে। আর একদলের অভিমত হলো যে, চোখ যে হাকীকত অবলোকন করেছে অন্তর তা অস্বীকার করেনি।

১. আল কুরআন : সূরা নজম, ৫৩:১১।
২. আল কুরআন : সূরা নজম, ৫৩:১৭।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

وَأَمَّا رُؤْيَتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَبِّهُ جَلَّ وَعَزَّ

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করা

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলাকে চর্ম চোখে দেখেছেন কিনা এ বিষয় একদল সলফে-সালেহীন ও হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) না সূচক অভিমত পোষণ করেছেন।

যেমন- হযরত মাসরুক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন- আমি হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) কে জিজ্ঞেস করলাম,

يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ فَقَالَتْ لَقَدْ قَفَّ شَعْرِي مِمَّا قُلْتُ ثَلَاثٌ مَنْ حَدَّثَكَ بِهِنَّ فَقَدْ كَذَبَ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتْ (لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ).

-হে মু'মিন জননী! হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করেছেন কী? তখন হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বললেন, তোমার এ কথা শুনে আমার শরীরের পশম খাড়া হয়ে যায়। কেউ যদি বলে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন, তাহলে নিশ্চয়ই সে মিথ্যা বলছে। তারপর তিনি এ আয়াতে কারীমা তিলাওয়াত করেন-

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَرُ

-কোনো চক্ষু তাকে ধারণ করতে পারেনা।[১]

এরপর তিনি পুরো হাদিস বর্ণনা করেন। অপর একদল সাহাবী হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) এর এ বাণীর সমর্থক। হযরত ইবনে মাস'উদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সম্পর্কে একথা প্রসিদ্ধ।[২]

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে,

إِنَّمَا رَأَى جِبْرِيلَ.

১. আল কুরআন : সূরা আন'আম, ৬:১০৩।
২. তকী উদ্দীন মুকরেজী : ইমতাউল ইসমা'আ, বাবু ওয়া আম্মাল ইসরায়ি বি রাসূলিল্লাহ, ৮:২০৪।

-হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) কে দেখেছেন।[১]

তাছাড়াও তাঁর অভিমতের বিপরীত বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। যথা- মুহাদ্দিসীন, ফিক্হবিদ, কালাম শাস্ত্রবিদদের এক দলের মধ্যে এই মর্মে মতানৈক্য রয়েছে যে,দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার দীদার সম্ভব নয়। আর এরূপ হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন,

أَنَّهُ رَآهُ بِعَيْنِهِ.

-হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চক্ষুদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করেছেন।[২]

হযরত আতা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেছেন,

أَنَّهُ رَآهُ بِقَلْبِهِ.

-হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্তর চক্ষু দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন।[৩]

আবুল আ-লীয়া (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

رَآهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّتَيْنِ.

-হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্তর চক্ষু দ্বারা দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলাকে দু'বার দেখেছেন।[৪]

১. ক) ইবনে খুযাইমা : আত্ তাওহীদ, বাবু আখবারি আবদিল্লাহ ইবনে মাসউদ, ২:৫১৮।
খ) বায়হাকী : আল আসমাউ ওয়াস্ সিফাত, বাবু মা জা'আ ফী কাওলিল্লাহি আয্যা ওয়া জাল্লা, ২:৩৬৩।
গ) তকী উদ্দীন মুকরেজী : ইমতাউল ইসমা'আ, বাবু ওয়া আম্মাল ইসরায়ি বি রাসূলিল্লাহ, ৮:২০৪।
২. ক) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদে আবদিল্লাহ ইবনে আব্বাস, ৩:৪২৬।
খ) তকী উদ্দীন মুকরেজী : ইমতাউল ইসমা'আ, বাবু ওয়া আম্মাল ইসরায়ি বি রাসূলিল্লাহ, ৮:২০৪।
গ) শামী : সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৩:৪৬।
৩. ক) ইবনে খুযাইমা : আত্ তাওহীদ, বাবু আখবারি আবদিল্লাহ ইবনে মাসউদ, ২:৫১৮।
খ) আবু জা'ফর আব্বাসী : আল আরশ ওয়া ওয়ারা ফীহি, ১:৩৯৩।
গ) তকী উদ্দীন মুকরেজী : ইমতাউল ইসমা'আ, বাবু ওয়া আম্মাল ইসরায়ি বি রাসূলিল্লাহ, ৮:২০৪।
ঘ) শামী : সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, বাবুত্ তানবীহাত, ৩:৬৩।
৪. ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবুল মা'না কাওলিহি আয্যা ওয়া জাল্লা, ১:১৫৮।
খ) আবু আওয়ানাহ : আল মুসনাদ, কিতাবুল ঈমান, ১:১৩৩।
গ) তকী উদ্দীন মুকরেজী : ইমতাউল ইসমা'আ, বাবু ওয়া আম্মাল ইসরায়ি বি রাসূলিল্লাহ, ৮:২০৪।

হযরত ইবনে ইসহাক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, হযরত ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) একবার কোন একজনকে হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট একথা জানতে চেয়ে প্রেরণ করেন যে,

هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ فَقَالَ نَعَمْ.

—হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।[১]

তার চেয়ে অতি প্রসিদ্ধ কথা হলো যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার রবের দর্শন লাভ করেছেন। একথা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তিনি আরো বলেছেন,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى اخْتَصَّ مُوسَى بِالْكَلَامِ وَإِبْرَاهِيمَ بِالْخُلَّةِ وَمُحَمَّدًا بِالرُّؤْيَةِ وَحُجَّتُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى (مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى.

—আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) কে তাঁর সাথে কথা বলার বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। আর হযরত ইবরাহিম (আলাইহিস্ সালাম) কে খলিল বানিয়েছেন। আর হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভের বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। তার প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী—

مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۝ أَفَتُمَٰرُونَهُۥ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۝ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۝

—অন্তর মিথ্যা বলেনি যা দেখেছে। তবে কি তোমরা তাঁর সাথে তিনি যা দেখেছেন তাতে বিতর্ক করছো। এবং তিনি তো ঐ জ্যোতি দু'বার দেখেছেন।[২]

মাওয়ার্দী বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর দর্শন ও বাক্যালাপকে হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) ও হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মধ্যে দুভাগে

১. ক) আবুল কাসেম সুহায়লী : আর রওদাতুল আনফি, বাবু যিকরিল ইসরা ওয়াল মি'রাজ, ৩:২৭২।
খ) তকী উদ্দীন মুকরেজী : ইমতাউল ইসমা'আ, বাবু ওয়া আম্মাল ইসরায়ি বি রাসূলিল্লাহ, ৮:২০৪।
২. আল কুরআন : সূরা নজম, ৫৩:১১-১৩। তকী উদ্দীন মুকরেজী : ইমতাউল ইসমা'আ, বাবু ওয়া আম্মাল ইসরায়ি বি রাসূলিল্লাহ, ৮:২০৪।

বিভক্ত করেছেন। সুতরাং হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুবার আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন। আর হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) আল্লাহ তা'আলার সাথে দু'বার বাক্যালাপ করেছেন।

আবুল ফাতহ রাজী ও ফকীহ আবু লাইস সমরকন্দী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) হযরত আব্দুল্লাহ বিন হারেস ও হযরত কা'ব ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) সম্পর্কে বলেন, একবার হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত কা'ব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) সাক্ষাৎ হলে হযরত ইবনে আব্বাস বললেন, আমরা হাশেমের বংশধররা বলি যে, হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু'বার আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করেছেন। হযরত কা'ব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) একথা শ্রবণে এমন জোরে আল্লাহু আকবর বলে ধ্বনি দিলেন যে তাতে পাহাড় পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠে। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর দর্শন ও বাক্যালাপকে হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর মধ্যে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। সুতরাং হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) আল্লাহ তা'আলার সাথে বাক্যালাপ করেছেন। আর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলাকে হৃদয় দিয়ে অবলোকন করেছেন।

উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত শোরাইক হযরত আবু যর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করে বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করেছেন।

ফকীহ আবু লাইস সমরকন্দী হযরত মুহাম্মদ বিন কা'ব ও হযরত রবী বিন আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন— হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট আরয করা হয় যে, আপনি আপনার রবকে দেখেছেন কি? হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি আমার রবকে অন্তর চক্ষু দ্বারা দেখেছি।

হযরত মালেক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হযরত মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমি আমার রবকে দেখেছি। তারপর কতিপয় বিষয়ের বর্ণনা করে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে জিজ্ঞেস করেন, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! উর্ধ্বজগতের ফিরিশতারা কি বিষয় নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হচ্ছে? উক্ত বর্ণনায় প্রমাণ হয় যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন। আব্দুর রাজ্জাক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর বর্ণনায়

এসেছে, তিনি বলেন, হযরত হাসান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কসমের সাথে বলতেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর দর্শন লাভ করেছেন।

আবু আমর তা'লাফী হযরত ইকরামা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর একদল কালামশাস্ত্রবিদ ও হযরত ইবনে মাস'উদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর অভিমত হলো যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন।

ইবনে ইসহাক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, মারওয়ান হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে জিজ্ঞেস করেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহকে দেখেছেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

নাককাশা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) এর হাদীসের অনুরূপই ঘোষণা করছি। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় চোখেই আপন প্রভূকে দেখেছেন। তিনি দেখেছেন, ইমাম আহমদ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) একথা বলে যাচ্ছেন যতক্ষণ না নিঃশ্বাস শেষ হয়।

আবু ওমর বলেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলাকে হৃদয় দিয়ে দেখেছেন। আর দুনিয়ার জীবনে চর্ম চোখে দেখা নিয়ে পরবর্তী সময় তাঁর অভিমত দুর্বল হয়ে পড়ে।

হযরত সাঈদ বিন জুবাইর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি হ্যাঁ বা না কোনটাই বলবো না।

مَا كَذَبَ এ আয়াত এর তাফসীর নিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত ইকরামা, হযরত হাসান বসরী ও হযরত ইবনে মাস'উদ প্রমূখের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হযরত ইকরামা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্তর চক্ষু দিয়ে আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন।

আর হযরত হাসান বসরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও হযরত ইবনে মাস'উদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) কে দেখেছেন।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ বিন আহম্মদ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার পিতার অভিমত হলো– তিনি দেখেছেন।

আল্লাহর বাণী–

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝١

–আমি কি আপনার বক্ষ প্রশস্থ করিনি।[১]

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আতা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন,

شَرَحَ صَدْرَهُ لِلرُّؤْيَةِ وَشَرَحَ صَدْرَ مُوسَى لِلْكَلَامِ.

–এর অর্থ হলো হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বক্ষকে আল্লাহ তা'আলা দেখার জন্য প্রশস্থ করেছেন। আর হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর বক্ষকে বাক্যালাপ করার জন্য প্রশস্থ করেন।[২]

আবুল হাসান আলী আশ'আরী ও এক দল সাহাবায়ে কেরাম বলেন,

أَنَّهُ رَأَى اللهَ تَعَالَىٰ بِبَصَرِهِ وَعَيْنِي رَأْسِهِ وَقَالَ كُلُّ آيَةٍ أُوتِيَهَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَقَدْ أُوتِيَ مِثْلَهَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُصَّ مِنْ بَيْنِهِمْ بِتَفْضِيلِ الرُّؤْيَةِ.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলাকে স্বচক্ষে দেখেছেন। তারা আরো বলেন, অন্যান্য আম্বিয়া কেরামকে যত মু'জিযা দেওয়া হয়েছে, অনুরূপ মু'জিযা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেও দেয়া হয়েছে। কিন্তু সমস্ত আম্বিয়া কেরাম থেকে অগ্রবর্তী করে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে দীদারে এলাহীর মু'জিযা দেওয়া হয়েছে।

তথাপি আমাদের কোনো কোনো মাশায়েখ এ বিষয়ে মৌনতা অবলম্বন করেছেন। তাঁদের অভিমত হলো যে, এ বিষয় সর্ববাদী সম্মত স্পষ্ট দলীল নেই। উভয়ের দলীলগুলো পরস্পর বিরোধপূর্ণ। তারপরও এ বিষয় নিয়ে মতানৈক্য চলছে।

---

[১]. আল কুরআন : সূরা ইনশিরাহ, ৯৪:১।

[২]. তকী উদ্দীন মুক্বরেজী : ইমতাউল ইসমা'আ, বাবু ওয়া আম্মাল ইসরায়ি বি রাসূলিল্লাহ, ৮:২০৫।

কাযী আবুল ফযল আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (আল্লাহ তাঁকে সৌভাগ্যমন্ডিত করুক) বলেন, সত্য কথা হলো আকলের দিক থেকে এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করার কোনো অবকাশ নেই যে, দুনিয়াতে তিনি দীদার লাভ করেছেন। আর আকলের দিক থেকে বিপরীত কোনো প্রমাণও নেই যে, এরূপ হওয়া অসম্ভব। আর দুনিয়াতে দীদারে এলাহীর সম্ভাব্যতার দলিল হলো এই যে, হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর দীদার লাভের আকাংখা করা। কেননা এটা অসম্ভব যে, একজন নবীর পক্ষে কোনো বিষয় না জেনে অমুক জিনিসকে আল্লাহর বান্দাদের জন্য তা অসম্ভব করে দেয়া অথবা সম্ভব করে দেওয়া। সুতরাং মূসা (আলাইহিস্ সালাম) কে এমন আর সেটা সম্ভব হবে। তবে এটা সংগঠিত হওয়া এবং প্রত্যক্ষ করা ঐ সমস্ত অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ জানেন না। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– لَنْ تَرَانِي অর্থ- তুমি আমাকে কখনো দেখতে পারনা। অর্থাৎ তোমার মধ্যে আমাকে দেখার যোগ্যতা নেই একথা বলা হয়নি। আর আমাকে দেখার সহনশীলতাও তোমার মধ্যে নেই। তুমি আমাকে দেখে স্থির থাকতে পারবেনা। তারপরও আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে বাহ্যিকভাবে হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর তুলনায় তুর পাহাড়ের ক্ষমতা ও দৃঢ়তা অনেক বেশী ছিলো। এ সমস্ত বর্ণনায় একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করা অসম্ভব নয়। বরং সর্বাবস্থায় দীদার লাভ করা সম্ভব বলে প্রমাণিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ শরীয়তের এরূপ সুস্পষ্ট কোনো দলিল বিদ্যমান নেই যে, দীদার লাভ করা সম্ভব নয়। কেননা, যে সমস্ত জিনিস বিদ্যমান আছে তা দেখাও সম্ভব। সুতরাং জাতে এলাহী বিদ্যমান। এ কারণে তাঁর দীদারও সম্ভব।

আর আল্লাহ তা'আলার বাণী–

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ

–চক্ষুসমূহ তাঁকে আয়ত্ব করতে পারেনা।[১]

যারা এ আয়াত দ্বারা দীদারে এলাহী অসম্ভব বলে দলিল পেশ করে, তাদের এ দলিল সঠিক নয়। কেননা এ আয়াতের তাফসীরে অনেক মতানৈক্য রয়েছে। আর একথাও স্পষ্ট যে, যারা বলেন দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করা অসম্ভব, তাঁরা চূড়ান্তভাবে দীদার লাভ করাকে অসম্ভব বলেন না। বরং তারা বলেন, পরকালে দীদার লাভ করা সম্ভব হবে। কোনো কোনো আলেম এ আয়াত

[১]. আল কুরআন : সূরা আন'আম, ৬:১০৩।

দ্বারা দীদার লাভ করা সম্ভব বলে দলিল পেশ করেন। আর অপর এক দলের অভিমত হলো যে, এ আয়াত 'চক্ষুসমূহ তাঁকে আয়ত্ব করতে পারবেনা'। এটা কাফিরদের জন্য, মুমিনদের নয়।

অপর একদল বলেন– لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ এর অর্থ হলো, চোখ তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারবেনা। এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) এর অভিমত। অপর এক দলের অভিমত হলো– চক্ষুসমূহ তাঁকে আয়ত্ব করতে পারবেনা। এর অর্থ হলো চোখ দিয়ে তাঁকে দেখা সম্ভব নয়। বরং যে দেখার সে দেখতে পাবে। এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দ্বারা কি একথাই প্রমাণিত হয় যে, দীদারে এলাহী সর্বাবস্থায় সম্ভব। অনুরূপভাবে لَنْ تَرَانِي অর্থ- তুমি আমাকে কখনো দেখতে পারবেনা। আর تُبْتُ إِلَيْكَ অর্থ- আমি তোমারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করছি।[১]

এ আয়াতকে দলিল হিসেবে পেশ করা সঠিক হবেনা। যেহেতু এটা কোন সাধারণ বিষয় নয়। অবশেষে যিনি এ তাফসীর করেছেন যে, তুমি দুনিয়াতে আমাকে দেখতে পারবেনা। এটাও এক প্রকার তাফসীর। এর দ্বারা কিভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে,দীদারে এলাহী অসম্ভব। আর এটা তো হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

আর নিয়ম এই যে, যখন কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলে বিভিন্ন ধরনের কঠিন কঠিন সমস্যার উদ্ভব হয় এবং সে বিষয় নিশ্চিতভাবে কোনো কিছু বলাও সম্ভব হয় না আর আল্লাহ তা'আলার বাণী– تُبْتُ إِلَيْكَ অর্থ– আমি তোমারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করছি[২]- এ আয়াতেও কোন দলিল নেই। কেননা এ আয়াতের অর্থ হলো, আমি আমার প্রশ্ন থেকে ঐ সময়ের জন্য প্রত্যাবর্তন করলাম যতক্ষণ না তুমি আমাকে সে বিষয়ে ক্ষমতা দাও। لَنْ تَرَانِي এর তাফসীর প্রসঙ্গে আবু বকর হাযলী বলেন, কোন মানুষের পক্ষে দুনিয়াতে আমাকে দেখা সম্ভব নয়। কেননা যে কেউ দুনিয়াতে আমাকে দেখবে নিশ্চিত সে মারা যাবে।

আমি কোনো কোনো পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমদেরকে এ আয়াতের তাফসীর বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তারা বলেছেন, এ দুনিয়াতে আল্লাহর দীদার লাভ করা এ কারণেই সম্ভব নয় যে, দুনিয়ার অধিবাসীদের গঠনগত ক্ষমতা অতি দূর্বল। আর দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদে তাদের মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হতে থাকে। তাই তারা

[১]. আল কুরআন : সূরা আহকাফ, ৪৬:১৫।
[২]. আল কুরআন : সূরা আহকাফ, ৪৬:১৫।

তাদের থেকে উত্তম বস্তু দীদারে এলাহীর উত্তাপ সহ্য করবে কিভাবে? কিন্তু যখন তাদেরকে আখিরাতের জীবনে পুনরায় দ্বিতীয়বার সম্পূর্ণ নতুন রূপে গঠন করা হবে এবং তাদেরকে অনন্তকাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকার শক্তি প্রদান করা হবে। তখন তাঁদের দৃষ্টিশক্তিও পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। তাদের অন্তর জ্যোতিতে আলোকিত হয়ে যাবে। তখন তারা দীদার লাভ করার পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতার অধিকারী হবে। এ ধরণের তাফসীর আমি হযরত মালেক বিন আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর লেখায় দেখতে পেয়েছি। যার সারমর্ম হলো যে, দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ তা'আলার দীদার এ কারণে সম্ভব নয় যে, তাঁর জাত বা সত্ত্বা চিরস্থায়ী। আর মানুষ ধ্বংসশীল। তাহলে অধমের পক্ষে উত্তম এবং চিরস্থায়ীকে দেখা কী করে সম্ভব? তবে আখিরাতের জীবনে চিরস্থায়ী চোখ দেওয়া হবে। তখন চিরস্থায়ী চক্ষু চিরস্থায়ী সত্ত্বার জ্যোতির উজ্জ্বলতাকে অবলোকন করতে সক্ষম হবে। এটা অত্যন্ত সুক্ষ্ম রহস্যাবৃত কথা। এর দ্বারাও দীদারে এলাহী অসম্ভব বলে প্রমাণিত হয়না। বরং একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, অক্ষমতার কারণে দীদারে এলাহী কঠিন হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোন বান্দাকে যদি শক্তি দান করেন, তাহলে সে তাজাল্লীর ভার বহন করতে সক্ষম হবে। এ কারণে দীদার লাভ করা অসম্ভব, একথা বলা যাবেনা।

ইতোপূর্বে হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) ও হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দর্শন লাভের ক্ষমতা ও বাস্তব হাকীকতের ইদরাক বা অনুভূতি লাভ করা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা উভয় সম্মানিত নবীকে কি ধরণের দর্শন ও অনুভূতির ক্ষমতা দান করেছেন তাও উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

কাযী আবু বকর (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) আল্লাহর দর্শন প্রসঙ্গে لَنْ تَرَانِي ও لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ আয়াতদ্বয়ের তাফসীরের জবাবে উল্লেখ করেন যে, হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) যখন আল্লাহ তা'আলাকে দেখেন তখনই বেহুশ হয়ে পড়ে যান। আর তখনই পাহাড় দীদার লাভ করে। এ কারণে পাহাড় টুকরা টুকরা হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাকে "ইদরাক" বা "অনুভূতির" ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। (মহান আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত)

আর আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي

–বরং এ পাহাড়ের প্রতি দেখো। এটা যদি স্ব-স্থানে স্থির থাকে,তবে তুমি অনতিবিলম্বে আমাকে দেখে নেবে।[১]

অতঃপর এরশাদ করেছেন–

فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا

–অতঃপর যখন তাঁর রব পাহাড়ের উপর আপন নূর প্রজ্জলিত করলেন, তখন এটা পাহাড়কে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিলো, আর মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেল।[২]

তাজ্জালী বা জ্যোতির অর্থ হলো- তার উপর প্রতিফলিত হয়েছে, আর সে তা দেখেছে। এটা কথার কথা। হযরত জাফর বিন মুহাম্মদ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) কে প্রথমে পাহাড়ের প্রতি মনোযোগী করেন, তারপর তার প্রতি আপন নূর প্রজ্জলিত করেন। যদি এরূপ করা না হতো অর্থাৎ হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) আল্লাহ তা'আলার প্রতি মনযোগী হয়ে থাকতো, আর আল্লাহ তাঁর প্রতি আপন নূর প্রজ্জলিত করতেন তাহলে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) ওফাত হয়ে যেতো। সংজ্ঞা ফিরে পাওয়া তার ভাগ্যে জুটতো না। একথায় প্রমাণ হয় যে, হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করেছেন।

কোনো কোনো তাফসীরবিদগণ পাহাড় সম্পর্কে বলেছেন যে, পাহাড় আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করেছে। এর দ্বারা দলিল পেশ করে বলেন যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন। আর তাঁর দর্শন লাভে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। কেননা তিনি দেখেনি মর্মে তো স্পষ্ট কোন দলিল বিদ্যমান নেই। তবে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আল্লাহ তা'আলাকে দেখা জরুরী। আর একথাও বলা যে, তিনি তাঁর প্রভুকে স্ব-চক্ষে দেখেছেন। একথাও অকাট্য বা উদ্ধৃতি সম্পন্ন নয়। কিন্তু এ বিষয়ে শুধু সূরা আন-নাজমে উল্লেখযোগ্য দুটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আর সেই দু'আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেও মতানৈক্য রয়েছে। দেখা না দেখা উভয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। অপরদিকে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকেও এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্যতা কিংবা চূড়ান্ত কোন বর্ণনাও বর্ণিত হয়নি।

---

১. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭:১৪৩।
২. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭:১৪৩।

এখন বাকি রইলো হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণিত হাদিস। উক্ত হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর নিজস্ব অভিমত ও ধ্যান-ধারণার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর বর্ণনা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে সম্পর্কিত করেন নি।

হযরত আবু যর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসেরও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অবকাশ রয়েছে। কেননা তিনি বর্ণনা করেছেন, "আমি তো নূরই দেখেছি।" কোনো কোনো মাশায়েখগণ বর্ণনা করেছেন, আমি তাঁকে দেখেছি। তিনি নূরই নূর। হযরত আবু যর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাদীসে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তিনিতো এক বিরাট জ্যোতি। সুতরাং আমি তাকে কীভাবে দেখতে পারি? এ হাদিসসমূহের মধ্যে কোনো একটি হাদিসকেও হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দীদারে এলাহীর বিষয়ে দলীল হিসেবে পেশ করা যায় না। 'আমি নূর দেখেছি' যদি এই হাদিসকে সহীহ বলে ধরা হয়। তাহলে বুঝা যায় যে, তিনি আল্লাহ তা'আলাকে দেখেননি। বরং তিনি এক প্রকার নূর দেখেছেন। যা তাঁর দীদারে এলাহীর পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর তা আল্লাহ তা'আলার দীদারে পর্দা হবে। এটা তাঁর এ কথার মতো যে, তিনি তো নূর, আমি কিভাবে নুর দেখতে পাবো? কেননা জ্যোতির পর্দাতো চোখের দৃষ্টির প্রতি পর্দা হয়ে দাঁড়ায়। এই হাদিসও ঐ হাদীসের মতো, যে হাদীসে তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা হলেন জ্যোতির্ময় পর্দা সদৃশ। অথবা ঐ হাদীসের মতো যে হাদীসে তিনি বলেছেন, "আমি এই চোখ দ্বারা দেখিনি বরং আমি আমার রবকে অন্তরের চোখ দিয়ে দেখেছি।" তারপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন–

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۝٨

–অতঃপর ঐ জ্যোতি নিকটবর্তী হলো, অতঃপর খুব নেমে আসলো।[১]

আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান। তিনি যে-কোন চোখে ও অন্তরে অনুভব করার ক্ষমতা যেভাবে ইচ্ছা করেন, সেভাবে সৃষ্টি করেছেন। কারণ তিনি ব্যতিত আর কোন মাবুদ নেই। তারপর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্ব-চক্ষে আল্লাহ তা'আলাকে দর্শন করেছেন বলে সহীহ কোনো বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহলে সে দিকে প্রত্যাবর্তন করা ওয়াজিব হবে। কেননা এটা কোন অসম্ভব কাজ নয়। তাতে কোন প্রকার নিশ্চিত বাধাবিপত্তি নেই যে, এটাকে পরিত্যাগ করা যাবেনা। আল্লাহ তা'আলা সঠিক রাস্তায় চলার সামর্থ্য দান করুন।

[১]. আল কুরআন : সূরা নজম, ৫৩:৮।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

مُنَاجَاتُهُ لله تَعَالَىٰ وَكَلَامُهُ مَعَهُ

মি'রাজ রজনীতে হুযুর (ﷺ) এর আল্লাহ তা'আলার সাথে একান্ত বাক্যালাপ

মি'রাজের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার সাথে বাক্যালাপ করেছেন। আল্লাহর বাণী–

فَأَوْحَىٰٓ إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَآ أَوْحَىٰ ۝١٠

–তখন ওহী করলেন আপন বান্দার প্রতি, যা ওহী করার ছিল।[১]

এ সংক্রান্ত হাদিসসমূহ পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অধিকাংশ তাফসীরবিদগণের অভিমত হলো যে, আল্লাহ তা'আলা প্রথমে হযরত জিবরাইল (আলাইহিস্ সালাম) এর উপর ওহী করেন। তারপর তিনি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর ওহী করেন। তবে ঐ সমস্ত তাফসীরবিদগণের মধ্যে নগণ্য সংখ্যকের এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। সুতরাং হযরত ইমাম জাফর সাদিক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন– আল্লাহ তা'আলা কোনো মাধ্যম ছাড়াই ওহী করেছেন। ওয়াসেতীর অভিমতও তাই। অনুরূপভাবে কোনো কোনো কালামশাস্ত্রবিদগণের অভিমত হলো যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিরাজের রাতে আল্লাহ তা'আলা সাথে বাক্যালাপ করেছেন। আশ'আরীর অভিমতও তাই।

হযরত ইবনে মাস'উদ এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম)ও অনুরূপ অভিমতের সমর্থক। কিন্তু কেউ কেউ মতবিরোধ প্রকাশ করেছেন। আর হযরত নাককাশা হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে মি'রাজ সংক্রান্ত বর্ণনায় হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণী 'দানা ফাতাদাল্লা' (دَنَا فَتَدَلَّى) সম্পর্কে বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

فَارَقَنِي جِبْرِيلُ فَانْقَطَعَتِ الْأَصْوَاتُ عَنِّي فَسَمِعْتُ كَلَامَ رَبِّي وَهُوَ يَقُولُ:
لِيَهْدَأْ رَوْعُكَ يَا مُحَمَّدُ اُدْنُ اُدْنُ.

[১]. আল কুরআন : সূরা নজম, ৫৩:১০।

–যখন হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) আমাকে একাকী রেখে চলে যান। সকল প্রকার শব্দ আসার ধ্বনি বন্ধ হয়ে যায়। তখন আমি আমার প্রভূর বাণী শুনতে পাই যে, তিনি আমাকে বলছেন, তোমার ভয়-ভীতি তো দূর হয়ে যাবার কথা। হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আসুন! আমার নিকটে আসুন।[১] আর হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর মি'রাজ সংক্রান্ত বর্ণনায় এরূপ অনেক কথা বর্ণিত হয়েছে।

আর তারা আল্লাহ তা'আলার এ বাণীকে দলিল হিসেবে উল্লেখ করেন–

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِۦ مَا يَشَآءُ

–কোনো মানুষের পক্ষে শোভা পায়না যে, আল্লাহ তাঁর সাথে কথা বলবেন, কিন্তু ওহী রূপে, অথবা এভাবে যে, মানুষ আল্লাহর মহত্বের পর্দার অন্তরালে থাকবে, অথবা কোন ফিরিশতা প্রেরণ করবেন যে, সে তাঁরই নির্দেশে ওহী করবে যা তিনি চান।[২]

তারা বলেন, ওহী প্রেরণের এ সম্পর্ক তিনভাবে স্থাপিত হয়। আল্লাহ তা'আলা পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলেন অথবা তিনি ফিরিশতা প্রেরণ করেন। যেমন– হযরত আম্বিয়া কেরামের সাথে করা হয়েছে। আর আমাদের নবী হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে অসংখ্য বার করা হয়েছে। তারপর ওহীর মাধ্যমে কথাবলার সরাসরি কোন ধরণ অবশিষ্ট রাখা হয়নি। কেউ কেউ বলেন, এখানে ওহীর অর্থ হলো কোনো মাধ্যম ব্যতীত নবীর অন্তরে কোনো কথা ঢেলে দেয়া।

আর আবু বকর বাযযার (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, মি'রাজের ঘটনায় হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে উদ্ধৃত বর্ণনায় একথা স্পষ্টভাবে বিদ্যমান রয়েছে যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলা কথা শ্রবণ করেছেন। যেমন এক বর্ণনায় এসেছে,

فَقَالَ الْمَلَكُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ فَقِيلَ لِي مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ صَدَقَ عَبْدِي أَنَا أَكْبَرُ أَنَا أَكْبَرُ.

[১]. হুসাইন দিয়ার বাকরী : তারিখিল খমিস ফী আহওয়ালি আনফাসিন্ নফীস, বাবু যিকরি কিস্সাতিল মি'রাজ, ১:৩১২।

[২]. আল কুরআন : সূরা শুরা, ৪২:৫১।

–ফিরিশতা 'আল্লাহু আকবর' 'আল্লাহু আকবর' আমি মহান, আমি মহান বলেছেন। পর্দার অন্তরাল থেকে আমাকে বলা হয়, আমার বান্দা সত্য কথা বলছে। আমি মহান, আমি মহান।

অনুরূপভাবে তিনি আযানের বাক্যসমূহের পুনরাবৃত্তি করেন। এ উভয় হাদীসের জটিল মাসায়ালার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়টি পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে বাক্যালাপ করা অসম্ভব কোনো ব্যাপার নয়। আর বিবেকের দিক থেকেও এটা অসম্ভব কিছু নয়। আর না এ ব্যাপারে শরীয়তের দিক থেকে চূড়ান্ত পর্যায়ের কোন বিধি-বিধান রয়েছে। যার দ্বারা একথা প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ তা'আলার তাঁর সাথে কথা বলা অসম্ভব। যদি এ প্রসঙ্গে কোন সহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় তাহলে তার উপর নির্ভর করা হবে।

হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর সাথে আল্লাহ তা'আলার বাক্যালাপ করা প্রামাণ্য ও সত্য। সে সম্পর্কে কুরআন মাজীদে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। আর তাকে উৎসমূলের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে তার হাকীকত বুঝা যায় এবং তাঁকে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী করে আল্লাহ তা'আলার সাথে বাক্যালাপে ধন্য করার জন্য فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ 'সপ্তম আসমানে উপনীত করা হয়েছে'। যথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সকল পদমর্যাদার উপর মর্যাদা দান করে এমন স্থানে পৌঁছানো হয়েছে যেখানে তিনি শুধু "সারিফুল আক্লাম" বা "তাকদীর লিপিবদ্ধ করার কলমের" আওয়াজ শুনতে পান। সুতরাং ঐ ধরণের মহান ব্যক্তি সম্পর্কে এ কথা কিভাবে বলা যায় যে, তিনি আল্লাহর কথা শ্রবণ করেননি। তিনি তো মহান পাক জাত! তিনি যাকে যেভাবে ইচ্ছা করেন মর্যাদা দান করতে পারেন। আর একজনের উপর অপরজনকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করতে পারেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

الدُّنُوُّ وَالْقُرْبُ

আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের মর্যাদায় হুযুর (ﷺ) এর বিশেষত্ব

মিরাজের হাদিসে নৈকট্য লাভ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ﴿٨﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴿٩﴾

–অতঃপর ঐ জ্যোতি নিকটবর্তী হলো, অতঃপর খুব নিকটে আসল। অতঃপর জ্যোতি ও এ মাহবুবের মধ্যে দু'ধনুকের ব্যবধান রইলো বরং তদপেক্ষাও কম।[১]

সুতরাং অধিকাংশ তাফসীরবিদগণ 'নিকটবর্তী হওয়া' এবং 'সামনে অগ্রসর হওয়া' বিষয়কে হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) এর মধ্য হয়েছে মনে করেন। অথবা তাঁদের উভয়ের মধ্যে তা একজনের জন্য নির্ধারিত ছিলো। অথবা তা সিদরাতুল মুনতাহার সাথে নির্দিষ্ট ছিলো।

কিন্তু ইমাম রাজী ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

هُوَ مُحَمَّدٌ دَنَا فَتَدَلَّى مِنْ رَبِّهِ،

–তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যিনি নিকটবর্তী হন এবং তাঁর রবের দিকে অগ্রসর হন।

আবার কেউ 'দানা' دَنَا শব্দের অর্থ করেন নিকটবর্তী হন। আর 'কুরব' قُرْب শব্দের অর্থ করেছেন– অধিক নিকটবর্তী হন। আবার কেউ উভয়ের একই অর্থ করেছেন যে, নিকটবর্তী হয়েছেন। মাওয়ার্দী ও মক্কী হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যার নিকটবর্তী হন তিনি আল্লাহ, আর তাঁর প্রতি আল্লাহর আদেশ ও হুকুম অবতীর্ণ হয়।

নাককাশা হযরত হাসান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দা হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকটবর্তী হন। অতঃপর অধিক নিকটবর্তী হন। আর তাঁকে আপন কুদরতের নিদর্শনাবলী যা দেখানোর তা দেখান।

১. আল কুরআন : সূরা নজম, ৫৩:৮-৯।

হযরত হাসান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এখানে পূর্বাপর বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ মি'রাজ রজনীতে হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট রফরফ আসলে তিনি তাঁর উপর উঠে বসেন। তারপর তাঁকে উপরে উঠানো হয়। এমনকি তিনি আপন রবর নিকটবর্তী হন। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

فَارَقَنِي جِبْرِيلُ وَانْقَطَعَتْ عَنِّي الْأَصْوَاتُ وَسَمِعْتُ كَلَامَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ.

–তারপর জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) আমার নিকট থেকে বিদায় হয়ে চলে যান। সকল প্রকার আওয়াজ আসা বন্ধ হয়ে যায়। তখন আমি আমার মহান রবর কালাম শুনতে পাই।

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে সহীহ বর্ণনায় এসেছে,

عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَيْهِ بِمَا شَاءَ وَأَوْحَى إِلَيْهِ خَمْسِينَ صَلَاةً.

–হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) আমাকে সিদরাতুল মুনতাহায় নিয়ে যান। আমি আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাতের নিকটবর্তী হই। অতঃপর আরো অধিক নিকটবর্তী হই। তখন তিনি যা চাইলেন আমার উপর ওহী করেন। ঐ সময় পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের ব্যাপারে ওহী করেন।

তারপর তিনি মিরাজের হাদিস বর্ণনা করেন।

হযরত মুহাম্মদ বিন কা'ব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, তিনি হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন, যিনি আপন রবের এমন নিকটবর্তী হন যেমন ধনুকের দু'মাথার সমান হয়। হযরত জাফর বিন মুহাম্মদ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিকটবর্তী করেন এমনকি এতো অধিক নিকটবর্তী করেন যেমন ধনুকের দু'মাথা নিকটবর্তী হয়।

হযরত মুহাম্মদ বিন জাফর (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য সীমাহীন। তবে বান্দার নৈকট্য লাভের সীমারেখা আছে। তিনি আরো বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যের কোন রূপরেখা নেই। তোমরা দেখতে পাচ্ছোনা যে, হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) এর নৈকট্য লাভ করা সত্ত্বেও পর্দার অন্তরালে রয়েছেন। আর হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ক্বলব মুবারক মারিফাত ও ঈমানের দৌলতে পরিপূর্ণ ছিলো। তিনি তাকে

নৈকট্য লাভের মর্যাদা দান করেন তাই তিনি প্রশান্তি ও ধীরস্থিরতার সাথে ঐ মাকামে পৌঁছেন। সেখানে তিনি জাতে আল্লাহ তা'আলার একান্ত নৈকট্য লাভে ধন্য হন। আর তাঁর অন্তর থেকে সন্দেহ ও সংশয়ের কালিমা দূর হয়ে যায়।

কাযী আবুল ফযল আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (আল্লাহ তাঁকে সৌভাগ্যমণ্ডিত করুক) বলেন, স্মরণ রেখো এখানে আল্লাহ তা'আলার সাথে নৈকট্যের যে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে তা স্থান বা কালের সাথে সম্পর্কিত নয়। বরং হযরত জাফর বিন মুহাম্মদ সাদেক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন যে, এই নৈকট্য কোনো নির্ধারিত সীমারেখার সাথে নির্দিষ্ট নয় বরং হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নৈকট্য লাভের অর্থ হলো, তাঁর মহান মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ করা হয়। মারিফাতের নূর দ্বারা তাঁকে আলোকিত করা হয়। অদৃশ্যের রহস্যাবলী তাঁর জন্য উন্মোচিত করা হয়। তাঁকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি নেকী, উনস, মুহাব্বত প্রকাশ ও সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

এ নৈকট্য লাভের ব্যাখ্যা এভাবেও করা যায় যে, হাদীসে যেভাবে বলা হয়েছে,

يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا.

–আমার রব দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন।[১]

এরূপ ব্যাখ্যাও করা যায়।

ঐ সমস্ত ব্যাখ্যার এরূপ ব্যাখ্যাও হতে পারে যে, "এ অবতরণ দয়া ও অনুগ্রহের সৌন্দর্য ও অনুকম্পার অবতরণ, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার অবতরণ নয়"।

ওয়াসেতী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, যারা এরূপ ধারণা করে যে, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা অবতরণ করেন, অথবা নিকটবর্তী হন, তারা মূলতঃ ব্যবধানের দূরত্বকে বুঝেছেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার জন্য তো নৈকট্যের ব্যবধানের দূরত্ব সম্ভব নয়। বরং যে বস্তু আল্লাহ তা'আলার অধিক নিকটবর্তী হয়েছে, সে তার চেয়ে বেশী দূরে হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর হাকীকত বুঝতে সক্ষম হননি। কেননা আল্লাহ তা'আলার জন্য তো নিকট ও দূরের প্রশ্নই আসেনা। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী–

قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ

–ঐ জ্যোতি ও এ মাহবুবের মধ্যে দু'ধনুকের ব্যবধান রইলো বরং তদপেক্ষাও কম।[১]

---

[১]. ক) বায়হাকী : ফযায়িলুল আওকাত, বাবু ফী ফযলি লাইলাতিন্ নিসফি মিন শা'বান, ১:১৩২।

এর পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, যে সকল আলেম সর্বনামকে হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) এর সাথে সম্পর্কিত না করে আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কিত করেন তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নৈকট্যের চরম সীমা বুঝাতে চান। আর সে স্থান হলো মেহেরবাণীর বহিঃপ্রকাশ, মারিফাত, শারাফাত ও হাকীকতের সর্বোচ্চ স্থান। আর সেই নৈকট্যের এরূপ অর্থও হতে পারে যে, তাঁর কামনা-বাসনা পূর্ণ করে দেয়া। আর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর সমুন্নত মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ হওয়া। এর ব্যাখ্যা হাদীসে এভাবে করা হয়েছে,

مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.

–যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ আমার প্রতি অগ্রসর হয় আমি তার দিকে একগজ পরিমাণ অগ্রসর হই। আর যে ব্যক্তি পায়ে হেটে আমার দিকে অগ্রসর হয় আমি দৌড়ে তার দিকে অগ্রসর হই।[২]

এরূপ ব্যাখ্যাও হতে পারে। এখানে এক গজ নিকটবর্তী হওয়া এবং দৌড়ে নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ হলো, তার দোয়া কবুল হওয়া, তার উপর ইহসান করা, অতি তাড়াতাড়ি তার কামনা-বাসনা পূর্ণ করে দেয়া।

---

[১]. আল কুরআন : সূরা নজম, ৫৩:৯।

[২]. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ফী হুসনিয্ যন্নি বিল্লাহ, ৫:৪৭৩।

খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ফযলিয্ যিকরি ওয়াদ্ দোয়া, ৪:২০৬৮।

গ) ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, বাবু যিকরি নযরিল্লাহি বির্ রা'ফাতি, ৪:৪৮৬।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

فِي ذِكرِ تَفضِيلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي القِيَامَةِ بِخُصُوصِ الكَرَامَةِ

আখিরাতের মর্যাদায় হুযুর (ﷺ) এর বিশেষত্ব

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত আছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بُعِثُوا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا وَفَدُوا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَبِسُوا، لِوَاءُ الحَمْدِ بِيَدِي وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي وَلَا فَخْرَ.

–কিয়ামতের দিন আমিই সর্বপ্রথম কবর হতে বের হয়ে আসবো। যখন সকল মানুষ সমবেত হবে তখন আমি তাদের মুখপাত্র হবো। যখন তারা হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়বে তখন আমি তাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করবো। আল্লাহ তা'আলার প্রশংসার ঝাণ্ডা সেদিন আমার হাতেই থাকবে। আমার রবের নিকট আদমের সন্তানদের মধ্যে আমিই সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান ও সম্মানিত ব্যক্তি হবো। এতে আমার কোন গৌরব নেই।[১]

আর ইবনে জহরের যে বর্ণনা রবিয়ার সূত্রে হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তাতে এভাবে বলা হয়েছে,

أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بَعَثُوا وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنْصَتُوا وَأَنَا شَفِيعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَبلسُوا لِوَاءُ الكَرَمِ بِيَدِي وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي وَلَا فَخْرَ وَيَطُوفُ عَلَيَّ أَلْفُ خَادِمٍ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ.

–হাশরের মাঠে সর্বপ্রথম আমাকে উঠানো হবে। যখন লোকেরা আমার নিকট সমবেত হবে তখন আমিই তাদের প্রতিনিধিত্ব করবো। যখন তারা হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়বে তখন আমিই তাদের সুসংবাদ প্রদান করবো। সেদিন আল্লাহ তা'আলার প্রশংসার ঝাণ্ডা আমার হাতেই থাকবে। আমার

---

১. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ফী ফদ্বলিন্ নবী, ৬:৯।
খ) তকী উদ্দীন মুকরিযী : ইমতিয়াউল আসমা'আ, বাবু ওয়া আম্মা তুফরিদুহু বিস্ সিয়াদাত, ৩:২২৪।
গ) শামী : সুবুলুল হুদা ওয়ার রুশাদ, ১০:৩৮৬।

রবের নিকট আদমের সন্তানদের মধ্যে আমিই সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান ও সম্মানী ব্যক্তি হবো। এতে আমার কোন গৌরব নেই। সেদিন হাজার খানেক খাদেম আমার চতুষ্পার্শ্বে উজ্জ্বল মুক্তার মতো প্রদক্ষিণে থাকবে।[১]

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত আছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

وَأُكْسَى حُلَّةً مِنْ حُلَلِ الجَنَّةِ ثُمَّ أَقُومُ عَنْ يَمِينِ العَرْشِ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الخَلَائِقِ يَقُومُ ذَلِكَ المَقَامَ غَيْرِي.

–আমাকে জান্নাতের তৈরী পোশাক পরিধান করানো হবে। অতঃপর আমি আল্লাহ তা'আলার আরশের ডান পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়াবো। অথচ আমি ব্যতিত আল্লাহর সৃষ্টিজগতের অন্য কেউ উক্ত স্থানে দাঁড়াতে পারবেনা।[২]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَبِيَدِي لِوَاءُ الحَمْدِ وَلَا فَخْرَ وَمَا نَبِيٌّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْض وَلَا فَخْرَ.

–কিয়ামতের দিন আমিই হবো আদমের সন্তানদের সর্দার, এতেও আমার গৌরব নেই। আর আমার হাতেই থাকবে প্রশংসার ঝাণ্ডা (লিওয়ায়ে হামদ)। তাতেও আমার অহংকার নেই। সেদিন আদম (আলাইহিস্ সালাম) সহ সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম আমার পতাকার নিচে এসে সমবেত হবেন। আর সকলের আগে আমি কবর থেকে উত্থিত হবো। এতেও আমার কোনো গৌরব নেই।[৩]

---

১. ক) বাযযার : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদে আবী হামযা, ১৩:১৩১।
খ) আবু ইয়ালা : মু'জাম, বাবুল খোফা, ১:১৪৭।
গ) বায়হাকী : দালায়েলুল খায়রাত, বাবু কুদুমি দুমাম ইবনে সা'লাব, ৫:৪৮৪।
ঘ) তকী উদ্দীন মুকরেযী : ইমতাউল আসমা'আ, বাবু ওয়া আম্মা তাফরিদুহু বিস্ সিয়াদাত, ৩:২২৯।

২. ইয়াহইয়া আমের হিরযী : বাহাজাতুল মাহাফিল ওয়া বাগিয়্যাতুল আমাসিল, বাবু ওয়া মিনহা আল্লাহ সাল্লাল্লাহু, ২:১৯০।

৩. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ফী ফদ্বলিন নবী, ৫:৫৮৭।
খ) ইয়াহইয়া আমের হিরযী : বাহাযাতুল মাহাফিল ওয়া বাগিয়্যাতুল আমাসিল, ২:১৯০।
গ) আবু সাঈদ : শরফুল মুস্তফা, বাবু জামিউ ফী ফদ্বলিন নবী, ৪:২০০।

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

أنا سَيِّدُ ولدِ آدمَ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَأَوَّلُ من يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، أَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ من يُحَرِّكُ حَلَقَ الْجَنةِ فَيُفْتَحُ لِي فَأَدْخُلُهَا فَيَدْخُلُهَا مَعِي فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ وَلَا فَخْرَ.

–কিয়ামতের দিন আমিই আদমের সন্তানদের সর্দার হবো। আমিই সর্বপ্রথম কবর থেকে উত্থিত হবো। সকলের পূর্বে আমিই সুপারিশ করবো এবং সর্বপ্রথম আমার সুপারিশই গৃহিত হবে। এতে আমার কোন গৌরব নেই। সর্বপ্রথম আমিই জান্নাতের দরজায় কড়াঘাত করবো। আর আমার জন্যই সর্বপ্রথম জান্নাতের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে। আর আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবো। আর আমার সাথে গরীব মুসলমানেরা জান্নাতে প্রবেশ করবে। এতে আমার কোন গৌরব নেই। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের মধ্যে আমিই সম্মানিত হবো। তাতেও আমার কোনো গৌরব নেই।[১]

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنةِ وَأَنَا أَكْثَرُ النَّاسِ تَبَعًا، أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَدْرُونَ لِمَ ذَلِكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ.

–আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের সুপারিশ করবো এবং আমার সর্বাধিক অনুসারী থাকবে। কিয়ামতের দিনে আমিই সমস্ত মানুষের সর্দার হবো। তোমরা কি জানো কেন সেদিন আমিই সর্দার হবো? কারণ সেদিন আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে একত্রে সমবেত করবেন।[২]

তারপর তিনি শাফায়াতের সম্পূর্ণ হাদিসটি বর্ণনা করেন।

---

[১]. ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু তাফযিলি নাবিয়্যিনা, ৪:১৭৮২।
খ) বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, বাবু ফযলি ফী যুহদিন নবী, ৩:৭০।
গ) তকী উদ্দীন মুকরেযী : ইমতাউল আসমা'আ, বাবু যিকরিত্ তানবিয়্যাহ, ৩:১৯১।
[২]. নদর গসী : আল মুনতাখাব মিন মুসনাদে আবদ্ ইবনে হুমাইদ, ১:১৮২।

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

أَطْمَعُ أَنْ أَكُونَ أَعْظَمَ الْأَنْبِيَاءِ أَجْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

–আমি আশা করি কিয়ামতের দিনে সমস্ত আম্বিয়া কেরাম হতে আমিই সবচেয়ে বেশী প্রতিদান পাবো।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে,

أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَكُونَ إِبْرَاهِيمُ وعِيسَى فِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمَا فِي أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَيَقُوْلُ أَنْتَ دَعْوَتِي وَذُرِّيَّتِي فَاجْعَلْنِي مِنْ أُمَّتِكَ وَأَمَّا عِيسَى فَالأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ بَنُو عَلَّاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَإِنَّ عِيسَى أَخِي لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ.

–তোমাদের দলে হযরত ইবরাহীম ও হযরত ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) থাকা তোমরা কি পছন্দ করোনা? অতঃপর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন, এসমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম কিয়ামতের দিনে আমার উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত হবে। হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) তো বলেই বসেছেন, আপনি আমার দো'য়া ও আমার আওলাদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। সে কারণে আমাকে আপনার উম্মাতের দলভুক্ত করুন। আর হযরত ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) ও আমার উম্মাতের মধ্যে হবেন। হযরত আম্বিয়া (আলাইহিস্ সালাম) পরস্পরে বৈমাত্রিয় বা আল্লাতি ভাই শুধু তাদের মা পৃথক পৃথক। হযরত ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) আমার ভাই। কেননা তাঁর ও আমার মাঝে কোনো নবী নেই। তিনি আর আমি সবার চেয়ে বেশী নিকটবর্তী।

আর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এ ফরমান أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– আমি কিয়ামতের দিনে সমস্ত আদম সন্তানদের সর্দার হবো। 'দুনিয়া ও আখিরাতে সর্দার তো তিনিই' একথা বলে তিনি মূলতঃ এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, কিয়ামতের দিনে তিনিই সর্দার হবেন এবং শাফায়াত করবেন। এ সম্মান তিনি ব্যতীত আর কাউকে দেয়া হবেনা। কেননা সমস্ত মানুষ আশ্রয় লাভ করার জন্য তাঁর নিকট ছুটে আসবে। আর আশ্রয় লাভের জন্য তিনি ছাড়া আর কাউকে খুঁজে পাবেনা। যিনি মানুষের প্রয়োজন পূর্ণ করতে সক্ষম তাকে তো সর্দার বলা

হয়। সুতরাং সেদিন তিনি একাই সকল মানুষের প্রতিনিধিত্ব করবেন। এ ক্ষেত্রে কেউই তার প্রতিদ্বন্দ্বী হবেনা। আর না কেউ তা সমকক্ষতার দাবী করবে। যথা আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন ঘোষণা করবেন–

لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ

–আজকের দিনে রাজত্ব কার? আল্লাহরই, যিনি এক, পরাক্রমশালী।[১]

হাকীকতে দুনিয়া ও আখিরাতের রাজত্ব আল্লাহ তা'লার। কিন্তু দুনিয়াতে অনেক লোকই রাজত্ব দাবী করে। কিন্তু কিয়ামতের দিনে সকলের রাজত্বের দাবী বাতিল হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কিয়ামতের দিনে সকলে তাঁর শাফায়াতের আবেদন করবে। আর তিনিই কিয়ামতের দিনে সকলের সর্দার হবেন। সেই দিন কেউ সর্দারী ও নেতৃত্বে দাবী করার সাহস করবেনা।

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ فَيَقُولُ الْخَازِنُ من أنتَ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ بِكَ أُمِرْتُ أَنْ لَا أَفْتَحَ لأَحَدٍ قَبْلَكَ.

–কিয়ামতের দিন আমি জান্নাতের ফটকে এসে তা খুলে দিতে বলবো, তখন পাহারাদার বলবেন, আপনি কে? বলবো, আমি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তখন পাহারাদার বলবেন, আপনার সম্পর্কে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনার পূর্বে আমি যেনো অন্য কারো জন্য এই দ্বার উন্মুক্ত না করি।[২]

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ وَمَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ الْوَرِقِ وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ كِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا.

১. আল কুরআন : সূরা মু'মিন, ৪০:১৬।
২. ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ফী কাওলিন নবী, ১:১৮৮।
খ) ইবনে আসাকীর : আল মু'জাম, ২:৭৬৪।
গ) তকী উদ্দীন মুকরেযী : ইমতাউল আসমা'আ, ৩:২৩৩।
গ) সুয়ূতী : খাসায়েসুল কুবরা, বাবু দুয়ায়ে রদ্দুল বাসর লিল আ'মা, ২:৩৮৯।

–আমার হাউযের প্রশস্ততা এক মাসের দূরত্বের সমপরিমাণ হবে এবং এটার চতুর্দিক সমান হবে। আর এর পানি দুধের চেয়েও অধিক শুভ্র এবং এর ঘ্রাণ মৃগনাভী অপেক্ষাও অধিক সুগন্ধিময় হবে। আর এর পানপাত্রসমূহ আকাশের তারকার ন্যায় উজ্জ্বল ও সমপরিমাণ হবে। যে তা থেকে একবার পান করবে সে আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবেনা।[১]

হযরত আবু যর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা বর্ণিত আছে। তবে তাতে অতিরিক্ত বলা হয়েছে যে,

طُولُهُ مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى أَيْلَةَ يَشْخُبُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ.

–হাউযের দূরত্ব আয়লা ও আম্মানের মধ্যবর্তী ব্যবধান হতেও অধিক হবে। তাতে জান্নাত হতে উৎসারিত দুটি জলাধার প্রবাহিত থাকবে।

হযরত সাওবান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে,

أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ وَالآخَرُ من وَرِقٍ.

–এর একটি হবে স্বর্ণের অপরটি হবে রৌপ্যের।

হযরত হারেসা বিন ওহাব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে, যথা–

كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَصَنْعَاءَ.

–মদীনা ও সানায়ার রাস্তার সমপরিমাণ দূরত্বের ব্যবধান হবে।

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন,

أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ.

–হাউযের দুরত্বের ব্যবধায় হবে আইলা ও সানায়ার দূরত্বের সমপরিমাণ।

হযরত ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে,

كَمَا بَيْنَ الْكُوفَةِ وَالْحَجَرِ الأَسْوَدِ.

১. ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ইসবাতি হাওযি নাবিয়্যিনা, ৪:১৭৯৩।
খ) তাবরানী : মু'জামুল আওসাত, বাবু মিন ইসমিহী আম্মীন, ৫:১৪৩।
গ) আবু আওয়ানা : আল মুসনাদ, বাবুল আহাদিসিল মুসতাদ্রেকাহ, ১:৩১০।

–হাউযের দূরত্বের ব্যবধান হবে কুফার ও হাজরে আসওয়াদের দূরত্বের সমপরিমাণ।

হাউয সংক্রান্ত বর্ণনা নিম্নোক্ত সাহাবায়ে কেরাম হতে বর্ণিত হয়েছে, যথাক্রমে হযরত আনাস, হযরত জাবের বিন সামুরা, হযরত ইবনে ওমর, হযরত উকবা বিন আমের, হযরত হারেস বিন ওহাব খাজায়ী, হযরত মাসতুরা, হযরত আবু বারাজা আসলামী, হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান, হযরত আবু উমামাহ, হযরত যায়িদ ইবনে আরকাম, হযরত ইবনে মাস'উদ, হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়িদ, হযরত সাহল বিন সা'দ, হযরত সোয়াইদ বিন জাবালাহ, হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত ইবনে বারিদা, হযরত আবু সাঈদ খুদুরী, হযরত আব্দুল্লাহ বিন সানাবাহি, হযরত আবু হোরায়রা, হযরত বারা, হযরত জনুদুব, হযরত আয়েশা, হযরত আসমা, হযরত খাওয়ালা বিনতে কাইস রিদ্বওয়ানুল্লাহি তা'আলা আলাইহিম আজমাইন।

নবম পরিচ্ছেদ

فِيْ تَفْضِيْلِهِ بِالْمَحَبَّةِ وَالْخُلَّةِ

মুহাব্বাত ও খিল্লাতের মর্যাদায় হুযুর (ﷺ) এর বিশেষত্ব

মুহব্বত ও খিল্লাতের বিশেষ মর্যাদায় হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সম্পর্কে অনেক সহীহ বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে। আর বিশ্ব মুসলিমের মতে তিনি "হাবীবুল্লাহ" বিশেষ উপাধীতে ভূষিত হয়েছেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا غَيْرَ رَبِّيْ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ.

–যদি আমি আমার রব ব্যতীত আর কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম তাহলে আমি আবু বকরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম।[১]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে–

وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلُ اللهِ.

–আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সঙ্গী অর্থাৎ আমাকে খলিল রূপে গ্রহণ করেছেন।[২]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেন, একদা আমরা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কতিপয় সাহাবী এক স্থানে বসে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে ছিলাম। এই সময় হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেদিকে তাশরীফ এনে আমাদের নিকট পৌঁছে আমাদের আলোচনা শুনেন। একজন বললেন, কী বিস্ময়কর ব্যাপার আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) কে 'খলিল' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। আরেকজন বললেন, তাঁর চেয়ে বেশী বিস্ময়কর নয় কী? আল্লাহ তা'আলা সরাসরি হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর সাথে কথা বলেছেন। অপর একজন বললেন, হযরত

---

১. ক) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, বাবুল হাসান ইবনে ইয়ানীক, ১৩:১১৬।
খ) ইবনে কাসীর : আস্ সিরাতুন নববিয়্যাহ, বাবু যিকরিল আহাদিসিল ওয়ারিদা, ৪:৪৫৪।
গ) সুয়ূতী : খাসায়েসুল কুবরা, বাবু যিকরিল মুয়াজাতিল আম্বিয়া, ২:৩০৬।

২. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, ৬:৪৯।
খ) ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, বাবু যিকরি ইরাদাতিল মুস্তফা, ১৫:২৭০।
গ) তকী উদ্দীন মুকরেযী : ইমতাউল আসমা'আ, বাবু ওয়া আম্মা তাফরিদুহু বিস্ সায়্যিদাত, ৩:২৩২।

ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) ছিলেন 'কালিমাতুল্লাহ ও রুহুল্লাহ' এবং আরেকজন বললেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আলাইহিস্ সালাম) কে 'ছফিউল্লাহ' উপাধীতে ভূষিত করেছেন।

এই সময় হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের সম্মুখে তাশরীফ আনেন। আমরা সালাম করি। অতঃপর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

قَدْ سَمِعْتُ كَلَامَكُمْ وَعَجَبَكُمْ إِنَّ اللهَ تَعَالَى اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلًا وَهُوَ كَذَلِكَ وَمُوسَى نَجِيُّ اللهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَعِيسَى رُوحُ اللهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَمُوسَى نَجِيُّ اللهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَعِيسَى رُوحُ اللهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَآدَمُ اِصْطَفَاهُ اللهُ وَهُوَ كَذَلِكَ، أَلَا وَأَنَا حَبِيبُ اللهِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولا فخر وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٌ ولا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ من يُحَرِّكُ حَلَقَ الجنةِ فَيَفْتَحُ اللهُ لِيْ فَيَدْ خِلُنِيْهَا وَمَعِي فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَكْرَمُ الأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ وَلَا فَخْرَ.

–আমি তোমাদের আলোচনা ও বিস্ময় প্রকাশ করার কথা শুনেছি। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) কে খলিল বানিয়েছেন, তা সত্য। হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর সাথে আল্লাহ তা'আলা তাঁর গোপনীয় বিষয় কথা বলেছেন। তাও সত্য। হযরত ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) কে রূহুল্লাহ উপাধীতে ভূষিত করেছেন, তাও সত্য। আর হযরত আদম (আলাইহিস্ সালাম) আল্লাহ তা'আলার নিকট মনোনীত ও মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন, এটাও সম্পূর্ণ বাস্তব সত্য। তবে মনে রেখো! আমি হলাম আল্লাহর হাবীব, এতে আমার কোনো গৌরব নেই এবং কিয়ামতের দিন আমিই প্রশংসার ঝাণ্ডা উত্তোলক ও বহনকারী হবো, আদম ও অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম উক্ত পতাকার নিচেই অবস্থান করবেন। তাতে আমার কোনো গৌরব নেই। কিয়ামতের দিন আমিই হবো সর্বপ্রথম শাফায়াতকারী। আর সর্বপ্রথম আমার সুপারিশই কবুল করা হবে, তাতেও আমার কোনো গৌরব নেই। আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজার কড়া নাড়া দেবো। তখন আল্লাহ তা'আলা আমারই

জন্য তা খুলে দেবেন এবং আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর আমার সঙ্গে থাকবে গরীব ঈমানদারগণ, তাতেও আমার কোনো গৌরব নেই। পরিশেষে কথা হলো আমিই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের চেয়ে সম্মানিত। তাতেও আমার কোনো গৌরব নেই।

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলেছেন,

إِنِّي اتَّخَذْتُكَ خَلِيلًا فَهُوَ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ حَبِيبُ الرَّحْمٰنِ.

–আমি আপনাকে আমার খলিল (বন্ধু) মনোনীত করেছি। আর একথা তাওরাতে লিখিত আছে যে, আপনি 'দয়াময়ের হাবীব'।

কাযী আবুল ফযল আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (আল্লাহ তাকে সৌভাগ্যমণ্ডিত করুন) বলেন, "খিল্লাত" শব্দের ব্যাখ্যায় মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেন, খলিল ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি সবকিছু পরিত্যাগ করে এমনভাবে আল্লাহ তা'আলার সাথে মিলিত হন যে, তাতে তাঁর মুহাব্বত ও বন্ধুত্বের মধ্যে কোনো প্রকার অন্তরায় ও বাধা-বিপত্তি আসতে না পারে।

কেউ বলেছেন– "খাসুল খাস" বা বিশেষে বিশেষত্ব প্রাপ্তকে খলিল বলা হয়। একাধিক আলেমের অভিমতও তাই। আবার কেউ বলেন খিল্লাতের মূল উৎস হলো– অকৃত্রিমতা ও পবিত্রতা। হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) কে খলিল বলার কারণ হলো তাঁর বন্ধুত্ব ও বৈরিতা সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে নিবেদিত ছিলো।

আল্লাহ তা'আলার খিল্লাতও তাঁর জন্য এ ধরণেরই ছিলো। আল্লাহ তা'আলা সর্বাবস্থায় তাঁর প্রতি সহানুভূতি প্রর্দশন করেছেন। তাঁকে তাঁর পরবর্তীদের ইমাম বা সরদার মনোনীত করেছেন।

অপর এক অভিমত হলো যে, মূলতঃ খলিল বলা হয় এমন প্রয়োজন প্রার্থী ও মুখাপেক্ষীকে যে সবদিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। খলিল শব্দের উৎপত্তি "খিল্লাত" শব্দ থেকে, এর অর্থ হলো হাজত বা প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী হওয়া। হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) কে খলিল বলার কারণ হলো যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রতি আপাদমস্তক মুখাপেক্ষী ছিলেন। তিনি তাঁর যাবতীয় প্রয়োজন আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখেন। সকল প্রকার দুঃখ-কষ্টে আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভরশীল ছিলেন। তিনি তাঁর যে-কোন প্রকার

প্রয়োজন পূর্ণ হবার জন্য আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো মুখাপেক্ষী হননি। যে সময় নমরূদ চরকির সাহায্যে তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে তখন হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) এসে বললেন, আপনার কোন সাহায্যের প্রয়োজন আছে কী? তখন হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) বললেন, আমার আপনার সাহায্যের কোনো প্রয়োজন নেই।

আবু বকর ফুরাক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, খিল্লাত ও মুহাব্বত ঐ অকৃত্রিমতাকে বলা হয় যা একান্ত গোপনীয় প্রার্থনার মাধ্যমে বিশেষত্বের সূচনা করে।

কারো মতে, খিল্লতের অর্থ হলো মূলতঃ মুহাব্বত। যার অর্থ সাহায্য সহায়তা, মর্যাদাবৃদ্ধি করা, সুপারিশ গৃহীত হওয়া। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে এরশাদ করেছেন–

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَٰرَىٰ نَحْنُ أَبْنَٰٓؤُا۟ ٱللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥ ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ۖ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

–এবং ইহুদি ও খৃষ্টানগণ বলেছে, আমরা আল্লাহরই পুত্র এবং তারই প্রিয়। আপনি বলে দিন, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে কেন তোমাদের পাপ কাজের জন্য শাস্তি দেন? বরং তোমরা মানুষ। তাঁর সৃষ্টিকূল থেকে, যাকে চান ক্ষমা করেন এবং যাকে চান শাস্তি দেন। আর আল্লাহরই জন্য রাজত্ব আসমানসমূহের ও যমীনের এবং এ দু'টির মাঝখানের, আর প্রত্যাবর্তন করতে হবে তাঁরই দিকে।[১]

এর দ্বারা জানা গেলো যে, মাহবুবের জন্য জরুরী হলো বন্ধুকে পাপকাজের জন্য ধরপাকড় না করা।

আর নবুয়্যাতের চেয়েও খিল্লত অনেক শক্তিশালী। কেননা নবুয়্যাতের মধ্যে দুশমনির আভাস পাওয়া যায়। যথা কুরআন মাজীদে এরশাদ করা হয়েছে–

[১]. আল কুরআন : সূরা মায়েদা, ৫:১৮।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُوا۟ وَتَصْفَحُوا۟ وَتَغْفِرُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾

–হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয় তোমাদের কিছু সংখ্যক স্ত্রী ও সন্তান তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাদের থেকে সতর্ক থাকো! আর যদি ক্ষমা করো এবং (তাদের দোষ-ত্রুটি) উপক্ষো করো তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।[১]

বন্ধুত্বের সাথে দুশমনি হবে এটা ঠিক নয়। সুতরাং হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) ও হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে খিল্লতের বিশেষত্বের সাথে স্মরণ করার এক কারণ এটাও হতে পারে যে, তাঁরা উভয় পুরোপুরিভাবে আল্লাহ তা'আলার প্রতি নির্ভরশীল ছিলেন। তাঁরা উভয় আপাদমস্তক আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী ছিলেন। তাঁরা নিজেদের সব প্রয়োজন পূর্ণ করার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলার উপর ন্যস্ত করে দেন। তাঁদের যে-কোন প্রয়োজন পূর্ণ হবার বিষয় আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো উপর বিন্দুমাত্রও নির্ভরশীলতা ছিলোনা। তাঁরা সকল প্রকার উপায়-উপকরণ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে নেন। কেননা তাঁদের উভয়ের সাথে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ বিশেষত্ব ছিলো, এর ফলে তাঁদের উপর তাঁর গোপনীয় নিয়ামত অর্পিত হয়েছে। তাঁদের উভয়ের ক্বালব আল্লাহ তা'আলার গোপন রহস্যাবলী ও আল্লাহ তা'আলার মারিফাতের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বিষয়ের ভাণ্ডার ছিলো। ঐ সমস্ত বস্তু তাঁদের পবিত্র ক্বালবে পুঞ্জিভূত ছিলো। তাঁদের অন্তর আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বতে বিভোর ছিলো। গায়রুল্লাহর মুহাব্বত তথা আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বত থেকে তাদেরকে বিন্দুমাত্র বিরত করতে পারেনি। তাঁদের মাঝে আল্লাহ তা'আলার জাত বা সত্তাগত মুহাব্বত ছিলো।

এ কারণে কেউ কেউ বলেছেন– যার অন্তরে মাহবুব ব্যতীত অন্যের মুহাব্বতের কোন স্থান নেই তাঁকে খলিল বলা হয়। এ কারণে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا لٰكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ.

[১]. আল কুরআন : সূরা তাগাবুন, ৬৪:১৪।

–যদি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে খলিল রূপে গ্রহণ করতাম তাহলে আবু বকরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু রূপে গ্রহণ করতাম। তবে তিনি আমার দীনি ভাই ও সহচর। অন্তরঙ্গ বন্ধু নন।[১]

সত্যপন্থী আলেমদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে, কার মর্যাদা উর্ধ্বে- খিল্লাত, না মুহাব্বতের?

এ ব্যাপারে কারো কারো অভিমত হলো (উভয়) সমান মর্যাদার অধিকারী। খলিল ও মাহবুব একজন। আর যিনি হাবিব তিনি খলিলও হতে পারেন। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) কে খিল্লাতের মাকাম দ্বারা বিশেষিত করা হয়। আর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে মুহাব্বতের মাকাম প্রদানে বিশেষিত করা হয়। খিল্লাতের মর্যাদা উর্ধ্বে। তাদের দলিল হলো- হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণী– لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ 'যদি আমি কাউকে প্রকৃত বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম তাহলে আবু বকরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম।' হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবু বকরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেননি। হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনো কখনো মুহাব্বতকে হযরত ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) ও তাঁর পুত্রদ্বয় হযরত হাসান ও হোসাইন ও হযরত উসামা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) এর সাথে সম্পর্কিত করেছেন এবং বলতেন আমি তাদেরকে ভালবাসি।

আর কতিপয় বলেছেন, মুহাব্বতের মর্যাদা খিল্লাতের উর্ধ্বে। কেননা আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার হাবিব ছিলেন। মর্যাদার দিক থেকে হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) থেকে আমাদের নবী উত্তম ও শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

মুহাব্বতের মূলে হলো মাহবুবের মর্জি মোতাবেক তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করা। কিন্তু একথা তার সম্পর্কে বলা যায়, যার মনোযোগ মাহবুবের ইচ্ছানুযায়ী হবে এবং সে উপকৃত হবে। কিন্তু স্রষ্টা সকল প্রকার উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি বান্দাকে সৌভাগ্য ও পবিত্রতা দান করে। যার কারণে বান্দা তাঁর নৈকট্য লাভের যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। আল্লাহর রহমত তাঁর উপর এমনভাবে অবতীর্ণ করেন, যাতে তার অন্তর থেকে পর্দা দূর হয়ে যায়। এর ফলে বান্দার অন্তর আল্লাহর নূর অবলোকন করে। তাঁর অন্তরের আলো আল্লাহ তা'আলার

১. ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু মিন ফাদ্বায়িলি আবী বকর, ৪:১৮৫৪।
খ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু ফদ্বলি আবী বকর, ১:৩৬।
গ) বাযযার : আল মুসনাদ, বাবু ইবনে আবী হাযীল, ৫:৪১৯।

দীদার লাভে সক্ষম হয়। তারপর হাদীসে কুদসীতে যেরূপ হবার কথা রয়েছে সেরূপ হয়।

فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ.

–যখন আমি তাকে (বান্দাকে) ভালোবাসি তখন আমি তার শ্রবণশক্তি (জ্ঞান) হয়ে যাই, যা দ্বারা সে শুনে আর তার দৃষ্টিশক্তি (চোখ) হয়ে যাই, যা দ্বারা সে দেখে এবং আমি জিহ্বা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে বাক্যালাপ করে।[১]

এবং সম্পূর্ণরূপে অপরকে পরিত্যাগ করে আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তাঁর অন্তর পরিষ্কার হয় এবং তাঁর সমস্ত কাজ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য হয়। যথা হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে বলেছেন, إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ "তাঁর চরিত্র হলো কুরআন"।[২] তাঁর সন্তুষ্টিতে তিনি সন্তুষ্ট হন, তাঁর অসন্তুষ্টিতে তিনি অসন্তুষ্ট হন। খিল্লাতের এ অবস্থাকে কেউ কেউ খিল্লাতকে পঙক্তিতে কাব্যে প্রকাশ করেছেন–

قَدْ تَخَلَّلْتَ مُلْكُ الرُّوحِ مِنِّي ... فَبِذَا سُمِّيَ الْخَلِيلُ خَلِيلًا

فَإِذَا مَا نَطَقْتُ كُنْتَ حَدِيثِي ... وَإِذَا مَا سَكَتُّ كُنْتَ الْغَلِيلَا

–তুমি আমার রূহের মতো সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে মিশে আছো। এ কারণে খলিলকে খলিল বলা হয়। যখন আমি কথা বলি তখন তুমি আমার কথা হয়ে যাও। আর যখন আমি নীরব থাকি তখন তুমি আমার অন্তরে পিপাসার মতো হয়ে থাকো।

সুতরাং হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খিল্লাত ও মুহাব্বতের বিশেষত্ব লাভ করেছেন। যার প্রমাণ হাদীসে বিদ্যমান। সে সমস্ত হাদিস উম্মাতের নিকট সুবিদিত ও গৃহীত হয়েছে।

১. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবুত্ তাওয়াদ্বিয়ী, ৮:১০৫।
খ) বাযযার : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদে আবী হামযা, ১৫:২৭০।
গ) ইবনে আসাকীর : আল মু'জাম, ২:১১০৮।
২. আল কুরআন : সূরা কলাম, ৬৮:৪।

এই বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার বাণী-ই যথেষ্ট–

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾

–হে মাহবুব! আপনি বলে দিন; হে মানবকুল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাকো তাহলে আমার অনুগত হও। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসেন এবং তোমাদের পাপরাশি নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। আর আর আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু।[১]

তাফসীরবিদগণ বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন কাফিররা বলতে লাগলো, খৃষ্টানরা যেভাবে হযরত ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) কে মাবুদ বানিয়েছে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও চান আমরা যেন তাঁকে সেভাবে মাবুদ বানিয়ে নেই। আল্লাহ তা'আলা তাদের একথার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে এরশাদ করেছেন–

قُلْ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ۖ

–হে মাহবুব! আপনি বলে দিন, হুকুম মান্য করো আল্লাহ ও রাসূলের।[২]

এভাবে আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আনুগত্য করার নির্দেশ দান করে তাঁর মর্যাদাকে আরো বৃদ্ধি করে দেন। আরো নির্দেশ দেন যে, আমার আনুগত্যের সাথে তাঁর আনুগত্যকে একত্রিত করো। তারপর আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন–

فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَـٰفِرِينَ

–অতঃপর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ কাফিরদের পছন্দ করেন না।[৩]

ইমাম আবু বকর ফুরাক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কোনো কোনো কালামশাস্ত্রবিদ থেকে উল্লেখ করে বলেন, যারা খিল্লাত ও মুহাব্বতের মধ্যে পার্থক্য আরোপ করেন তাঁরা এ বাক্যের দ্বারা আকারে-ইঙ্গিতে মুহাব্বতের মাকামকে খিল্লাতের মাকামের উর্ধ্বে স্থান দেয়ার বিষয়ে অনেক বাড়াবাড়ি

১. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:৩১।
২. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:৩২।
৩. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:৩২।

করেছে। আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চেষ্টা করেছি যাতে পরবর্তীদের জন্য রাস্তা সুগম হয়।

তন্মধ্যে একটি কথা হলো এই যে, খলিল সাহায্যের মাধ্যমে পরিচিতি লাভ করে। যথা আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন–

وَكَذَٰلِكَ نُرِىٓ إِبْرَٰهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ

–এবং এভাবে আমি ইবরাহীমকে দেখাচ্ছি সমগ্র বাদশাহী আসমান সমূহের ও যমীনের।[১]

আর হাবিব সরাসরি নিজেই পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হন।

যেমন– এরশাদ করা হয়েছে–

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴿٩﴾

–অতঃপর ঐ জ্যোতিও এ মাহবুবের মধ্যে ধনুকের ব্যবধান রইলো, বরং তদপেক্ষাও কম।[২]

আর খলিল ঐ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন যার মাগফিরাতের আকাঙ্ক্ষা থাকবে।

যেমন এরশাদ করা হয়েছে–

وَٱلَّذِىٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِى خَطِيٓـَٔتِى يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿٨٢﴾

–এবং তিনিই যাঁর প্রতি আমার আশা আছে যে, আমার অপরাধসমূহ কিয়ামত দিবসে ক্ষমা করবেন।[৩]

আর হাবিবকে বলা হয়েছে তাঁর মাগফিরাত হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার কামনা। যেমন, এরশাদ করা হয়েছে–

لِّيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

১. আল কুরআন : সূরা আন'আম, ৬:৭৫।
[অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) কে আসমান ও যমীনের আশ্চর্য নির্দশনাবলী প্রত্যক্ষ করানো হয়। তাই তিনি সেগুলোর পরিচিতি লাভ করেন। এর দ্বারা জানা যায় যে, আসমান ও যমীনের বাদশাহী দেখানোর পর তিনি পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হন। এগুলো দেখানোর মাধ্যমে হয়েছে। মাধ্যম ব্যতীত তিনি তা লাভ করতে সক্ষম হননি। (নাসিমুর রিয়াজঃ ২:৩৪)]
২. আল কুরআন : সূরা নাজম, ৫৩:৯।
৩. আল কুরআন : সূরা শু'আরা, ২৬:৮২।

–যাতে আল্লাহ তা'আলা আপনার কারণে পাপ ক্ষমা করে দেন আপনার পূর্ববর্তীদের ও আপনার পরবর্তীদের।[১]

খলিল আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করেছেন–

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾

–এবং আমাকে লাঞ্ছিত করোনা যেদিন সবাই পুনরুত্থিত হবে।[২]

আর হাবিব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন–

يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِىَّ

–যে দিন আল্লাহ তা'আলা নবীকে লাঞ্ছিত করবেন না।[৩]

তাঁকে চাওয়ার আগেই সুসংবাদ জানানো হয়েছে।

খলিল বিপদের সময় আবেদন করেছেন 'হাসবী আল্লাহ' (حَسْبِيَ اللهُ) অর্থ– আল্লাহ তা'আলাই আমার জন্য যথেষ্ট।[৪]

আর হাবিবের উদ্দেশ্যে এরশাদ করা হয়েছে–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ

–হে নবী! আল্লাহ আপনার জন্য যথেষ্ট।[৫]

খলিল আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছেন। যথা এরশাদ করা হয়েছে–

وَٱجْعَل لِّى لِسَانَ صِدْقٍ فِى ٱلْءَاخِرِينَ ﴿٨٤﴾

–এবং আমার সত্য প্রসিদ্ধি প্রতিষ্ঠিত রাখো পরবর্তীদের মধ্যে।[৬]

আর হাবিবকে উদ্দেশ্য করে এরশাদ করা হয়েছে–

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾

–এবং আমি আপনার জন্যে আপনার স্মরণকে সমুন্নত করেছি।[১]

---

১. আল কুরআন : সূরা ফাতাহ, ৪৮:২।
২. আল কুরআন : সূরা শু'আরা, ২৬:৮৭।
৩. আল কুরআন : সূরা তাহরীম, ৬৬:৮।
৪. আল কুরআন : সূরা যুমার, ৩৯:৩৮।
৫. আল কুরআন : সূরা আনফাল, ৮:৬৪।
৬. আল কুরআন : সূরা শু'আরা, ২৬:৮৪।

বিনা প্রার্থনায় তাঁকে সম্মান প্রদান করা হয়েছে।

খলিল আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেছেন। যথা এরশাদ করা হয়েছে–

وَٱجْنُبْنِى وَبَنِىَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ

–এবং আমাকে ও আমার পুত্রদেরকে প্রতিমাসমূহের পূজা থেকে দূরে রাখুন।[২]

আর হাবিবের উদ্দেশ্যে এরশাদ করা হয়েছে–

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

–আল্লাহ তা'আলা তো এটাই চান, হে নবীর পরিবারবর্গ যে তোমাদের থেকে যাবতীয় অপবিত্রতা দূরীভূত করে দেবেন এবং তোমাদেরকে পরিপূর্ণ পবিত্র করবেন।[৩]

আমি কালামশাস্ত্রবিদদের মতানুযায়ী যা আলোচনা করলাম তাতে আশা করা যায় তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। তাঁরা যেনো হাবিবকে খলিলের উপর প্রাধান্য দান করেন।

পরিশেষে এরশাদ করা হয়েছে–

كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِۦ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

–প্রত্যেকে আপন প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে। সুতরাং তোমাদের পালনকর্তা ভালভাবে অবহিত আছেন, কে অধিক সরল পথে আছে।[৪]

---

১. আল কুরআন : সূরা ইনশিরাহ, ৯৪:৪।
২. আল কুরআন : সূরা ইবরাহীম, ১৪:৩৫।
৩. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৩৩।
৪. আল কুরআন : সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:৮৪।

দশম পরিচ্ছেদ

فِيْ تَفْضِيْلِهٖ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّفَاعَةِ وَالْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ

হুযুর (ﷺ) এর শাফায়াত ও মাকামে মাহমুদ-এর মর্যাদা প্রসঙ্গে

আল্লাহ তা'আলার বাণী–

عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

–একথা নিকটে যে, আপনাকে আপনার পালনকর্তা এমন স্থানে দণ্ডায়মান করবেন যেখানে সবাই আপনার প্রশংসা করবে।[১]

হযরত ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেন, কিয়ামতের দিন মানুষ প্রত্যেক নবীর পেছনে দলে দলে বিভক্ত হবে, এবং আরয করবে, হে নবী! আমাদের জন্য শাফায়াত করুন। হে অমুক! আমাদের জন্য শাফায়াত করুন। এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা এই আবেদন নিয়ে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট পৌছবে। এটা সেদিন হবে যেদিন আল্লাহ তা'আলা মাকামে মাহমুদে শাফায়াত করার জন্য হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে দণ্ডায়মান করাবেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন–

عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

–নিঃসন্দেহে আপনার রব আপনাকে অচিরেই মকামে মাহমূদে অধিষ্ঠিত করবেন, যেখানে সবাই আপনার গুণগানে মশগুল থাকবে।[২]

এ আয়াত সম্পর্কে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট আরয করি, তিনি বললেন, তা শাফায়াত।

হযরত কা'ব বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

يُحْشَرُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُوْنُ أَنَا وَأُمَّتِي عَلَى تَلٍّ وَيَكْسُوْنِي رَبِّي حُلَّةً خَضْرَاءَ ثُمَّ يُؤْذَنُ لِي فَأَقُوْلُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ أَقُوْلَ فَذٰلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُوْدُ.

১. আল কুরআন : সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:৭৯।
২. আল কুরআন : সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:৭৯।

–কিয়ামতের দিন লোকদের যখন উঠানো হবে, তখন আমি ও আমার উম্মত সম্মানিত স্থানে অবস্থান করবো। আমাকে আমার রব জান্নাতী সবুজ পোশাক পরিধান করাবেন। তারপর আমাকে শাফায়াত করার অনুমতি দেওয়া হবে। তারপর আল্লাহর অভিপ্রায় অনুযায়ী আমি আপনার কথা বলবো সেটাই হলো 'মাকামে মাহমুদ'।

হযরত ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) শাফায়াত সম্পর্কিত হাদিস বর্ণনা করে বলেন, অতঃপর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চলতে শুরু করবেন। এমনকি তিনি জান্নাতের কড়া হাতে ধরবেন। আর সেদিন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মাকামে মাহমুদে অধিষ্ঠিত করবেন। যার প্রতিশ্রুতি তাঁকে দেওয়া হয়েছে।[১]

হযরত ইবনে মাস'উদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মাকাম আরশের ডানপাশে স্থাপিত হবে। সেটা এমনি এক মাকাম সেস্থানে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যতীত আর কেউ দাঁড়াতে পারবেনা। তাঁর এই উচ্চ মর্যাদার কারণে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব লোক তাঁর উপর সৌন্দর্যমণ্ডিত ঈর্ষা করবে। এ বিষয়ে হযরত কা'ব ও হাসান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি এরশাদ করেন–

هُوَ الْمَقَامُ الَّذِي أَشْفَعُ لِأُمَّتِي فِيهِ.

–সেটা হলো ওই মাকাম যেখানে দাঁড়িয়ে আমি আমার উম্মাতের জন্য শাফায়াত করবো।[২]

হযরত ইবনে মাস'উদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

إِنِّي لَقَائِمٌ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ قِيلَ وَمَا هُوَ قَالَ ذٰلِكَ يَوْمَ يَنْزِلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى كُرْسِيِّهِ.

১. ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু আদনা আহলিল জান্নাত, ১:১৭৭।
খ) আবু জাফর তাহাভী : মুশকিলুল আসার, বাবু বয়ানি মুশকিলি জাওয়াবি রাসূলিল্লাহি, ৩:৫০।
গ) তকী উদ্দীন মুকরেযী : ইমতাউল আসমা'আ, বাবু হুরফিল ইয়া, ১৫:১৬৭।
২. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদে আবী হুরাইরা, ১৫:৪২৮।

–আমি মাকামে মাহমুদে অবস্থানকারী। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, সেটা কী? হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ঐদিন যেদিন আল্লাহ তা'আলা আপন কুরসীতে অবতরণ করবেন।[১]

হযরত আবু মূসা (আলাইহিস্ সালাম) বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

خُيِّرْتُ بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ لِأَنَّهَا أَعَمُّ أَتَرَوْنَهَا لِلْمُتَّقِينَ، وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْخَطَّائِينَ.

–আমাকে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে যেন আমার অর্ধেক উম্মাত বেহেশতে প্রবেশ করায় কিংবা শাফায়াত গ্রহণ করি। তখন আমি শাফায়াত গ্রহণ করি। কেননা তা খুব ব্যাপক। তোমরা কি শুধু শাফায়াতকে মুত্তাকিদের জন্য নির্দিষ্ট করছো? বরং সেটা হবে গুনাহগার পাপীদের জন্য।[২]

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট আরয করি যে, শাফায়াত সম্পর্কে আপনি আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে কি আদেশ পেয়েছেন? তিনি বললেন,

شَفَاعَتِي لِمَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصًا يُصَدِّقُ لِسَانَهُ قَلْبُهُ.

–আমি ঐ সমস্ত লোকদের জন্য শাফায়াত করবো যারা অকপট চিত্তে সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আর তাদের অন্তর এর স্বীকৃতি দেবে।[৩]

হযরত উম্মে হাবিবা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

أُرِيتُ مَا تَلْقَى أُمَّتِي مِن بَعْدِي وسَفْكَ بَعْضُهُمْ دِمَاءَ بَعْضٍ وَسَبَقَ لَهُمْ مِنَ اللهِ مَا سَبَقَ للأمم قَبْلَهُمْ فَسَأَلْتُ اللهَ أَنْ يُؤْتِيَنِي شَفَاعَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيهِمْ فَفَعَلَ،

[১]. কুরসীতে অবতরণ করার অর্থ হলো, তাজ্জালী প্রকাশ করা। যথা তুর পাহাড়ে আল্লাহ তা'আলা তাজ্জালী প্রকাশ করেছেন। (শরহে শিফা - মোল্লা আলী কারী- ৩৪৬ পৃঃ)

[২]. ক) ইবনে মুবারক : আয্ যুহদ ওয়ার্ রকায়েক, বাবু সিফাতিন নার, ২:১১৩।
খ) আবু সাঈদ নিশাপুরী : শরফুল মুস্তফা, বাবু জামিই ফী ফযায়িলিন্ নবী, ৪:২২১।

[৩]. ক) শিহাবুদ্দীন : আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যাহ বিল মানহিল মাহমুদিয়্যাহ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, ৩:৬৪৮।
খ) যুরকানী : শরহে মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যাহ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, বাবু ফী উমুরিল আখিরাহ, ১২:৩২৪।

–আমার পর আমার উম্মাতের যে অবস্থা হবে তা আমাকে দেখানো হয়েছে। তারা কিভাবে একেঅপরের রক্তপাত ঘটাবে। অতঃপর আমাকে তাদের তাকদির সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। তখন আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আবেদন করলাম, আমাকে তাদের শাফায়াতের অনুমতি দেওয়া হোক। তখন আমাকে শাফায়াতের অনুমতি দেয়া হয়।[১]

হযরত হোযাইফা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, হাশরের মাঠে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানুষকে সবুজ ময়দানে সমবেত করবেন। তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, তাঁর ঘোষণা সকলে শুনতে পাবে ও তাঁকে দেখতে পাবে। সমস্ত মানুষকে বস্ত্রহীন খালি পায়ে ও খতনাবিহীন অবস্থায় উপস্থিত করা হবে। সমস্ত মানুষের অবস্থা এরূপ হবে যেন সদ্য ভূমিষ্ট হয়েছে। অনুমতি ব্যতীত কারো কথা বলার ক্ষমতা হবেনা। অতঃপর হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! বলে আওয়াজ আসবে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলবেন,

لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ وَالْمُهْتَدِي مَنْ هَدَيْتَ وَعَبْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَلَكَ وَإِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ سُبْحَانَكَ رَبَّ الْبَيْتِ قَالَ فَذَلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ.

–"লাব্বাইকা" হে রব আমি হাযির। সকল নেকীর মালিক আপনি। অকল্যাণ আপনার পক্ষ থেকে নয়। যাকে আপনি হিদায়াত দান করেন সে হিদায়াত পায়। আপনার বান্দা আপনার সামনে হাযির। আপনি সবকিছুর মালিক সবকিছু আপনার নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। আপনার আশ্রয় ব্যতীত অন্য আর কোনো আশ্রয় নেই। আর নাজাত লাভের কোন উসিলাও নেই। আপনি বরকত প্রদানকারী। আপনি মহান। হে বায়তুল্লাহর রব! আপনি পবিত্র। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এটাই মাকামে মাহমুদ। যার কথা আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে উল্লেখ করেছেন।[২]

[১]. ক) শিহাবুদ্দীন : আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যাহ বিল মানহিল মাহমুদিয়্যাহ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, ৩:৬৪৮।
খ) শামী : সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ, ১০:৩২১।
গ) যুরকানী : শরহে মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যাহ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, বাবু ফী উমুরিল আখিরাহ, ১২:৩২৪।

[২]. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু সুরাতিল ইসরা, ৬:৩৮১।
খ) আবু দাউদ তায়ালুসী : আল মুসনাদ, ১:৩৩০।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেন,

إِذَا دَخَلَ أَهْلُ النَّارِ النَّارَ وَأَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيَبْقَى آخِرُ زُمْرَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ وَآخِرُ زُمْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَتَقُولُ زُمْرَةُ النَّارِ لِزُمْرَةِ الْجَنَّةِ مَا نَفَعَكُمْ إِيمَانُكُمْ فَيدعون ربهم وَيَضِجُّونَ فَيَسْمَعُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَيَسْأَلُونَ آدَمَ وَغَيْرَهُ بَعْدَهُ فِي الشَّفَاعَةِ لَهُمْ فَكُلٌّ يَعْتَذِرُ حَتَّى يَأْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشْفَعُ لَهُمْ فَذَلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ.

–যখন বেহেশতীরা বেহেশতে আর দোযখীরা দোযখে প্রবেশ করবে, তখন জান্নাতে প্রবেশকারী একদল ও জাহান্নামে প্রবেশকারী একদল অবশিষ্ট থাকবে। তখন জাহান্নামীরা জান্নাতীদের বলবে," তোমাদের ঈমান কি তোমাদের কোনো উপকারে আসেনি।" একথা শুনে তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট ফরিয়াদ করবে। তখন জান্নাতিরা হযরত আদম (আলাইহিস্ সালাম) ও অন্যান্য আম্বিয়া কেরামের নিকট তাদের জন্য শাফায়াত করার আবেদন করবে। তখন হযরত আম্বিয়া কেরাম অক্ষমতা প্রকাশ করবেন। অবশেষে তারা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট সমবেত হয়ে শাফায়াত করার আবেদন করবে। তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের জন্য সুপারিশ করবেন। এটাই হলো "মাকামে মাহমুদ"।

হযরত ইবনে মাস'উদ(রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও হযরত মুজাহিদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে অনুরূপ বর্ণনা বর্ণিত আছে।

হযরত আলী বিন হোসাইন (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকেও এ বিষয় বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইয়াযীদুল ফকীর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে জিজ্ঞেস করলেন। আপনি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে মাকামে মাহমুদ সম্পর্কে কিছু শুনেছেন কী? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

গ) বাযযার : আল মুসনাদ, বাবু আবু ইসহাক আন সিলাহ, ৭:৩২৯।

فَإِنَّهُ مَقَامُ مُحَمَّدٍ الْمَحْمُودُ الَّذِي يُخْرِجُ اللهُ بِهِ مَنْ يُخْرِجُ يَعْنِي مِنَ النَّارِ، وَذَكَرَ حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ فِي إِخْرَاجِ الْجَهَنَّمِيِّينَ.

–মাকামে মাহমুদ ঐ স্থান যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা দোযখীদেরকে দোযখ থেকে বের করবেন। তিনি এই স্থানে দোযখীদের দোযখ থেকে বের করার বিষয় শাফায়াতের হাদীসে বর্ণনা করেন।

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

فَهَذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي وُعِدَهُ.

–এটাই মাকামে মাহমুদ যেটা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ব্যতীতও অন্যান্য সাহাবী থেকে এ সংক্রান্ত বর্ণিত হয়েছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

يَجْمَعُ اللهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهْتَمُّونَ أَوْ قَالَ فَيُلْهَمُونَ فَيَقُولُونَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا.

–কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে সমবেত করবেন। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে। অথবা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন, তাদের প্রতি ইলহাম করা হবে। তখন তারা বলবে, আফসোস! যদি আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে সুপারিশ করার কেউ থাকতো।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে–

مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ.

–মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় একে-অপরের নিকট দৌড়াতে থাকবে।[১]

[১]. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু কালামির্ রব্বি আয্যা ওয়া জাল্লা, ৯:১৪৬।
খ) ইবনে আবী শায়বা : আল মুসান্নাফ, ৮:৬৭৯।
গ) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবু কাওলিহিল্লাহি তা'আলা ইন্নামাল মাসীহ ঈসা ইবনে মরিয়ম, ১০:৭৬।

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسُ من الغم مالا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ فَيَقُولُونَ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ، زَادَ بَعْضُهُمْ أَنْتَ آدَمُ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شيء اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قبله، مِثْلَهُ وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَنَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي.

–কিয়ামতের দিন সূর্য অতি নিকটে এসে যাবে। মানুষ ভীষণ বিপদ ও কষ্টের সম্মুখীন হবে। তখন তারা পরস্পর বলাবলি করবে আমাদের শাফায়াতের জন্য কাউকে খোঁজ করা হোক। তখন লোকেরা হযরত আদম (আলাইহিস্ সালাম) এর নিকট এসে বলবে, আপনি মানবজাতির পিতা। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে নিজ কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার দেহে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। আপনাকে জান্নাতে বসবাস করতে দিয়েছেন। ফিরিশতামণ্ডলীর দ্বারা আপনাকে সিজদা করানো হয়েছে এবং আপনাকে সমস্ত বস্তুর নাম শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আপনি আমাদের জন্য আপনার রবর নিকট সুপারিশ করুন। যাতে তিনি আমাদেরকে এ কষ্টদায়ক অবস্থা থেকে নাজাত দান করেন। তখন হযরত আদম (আলাইহিস্ সালাম) বলবেন, আজ আমার রব এতো বেশী ক্রোধান্বিত অবস্থায় আছেন যে, ইতোপূর্বে তিনি আর কখনো এরূপ রাগান্বিত হননি। এরপরেও আর এরূপ ক্রোধান্বিত হবেননা। তিনি আমাকে এক গাছের নিকট যেতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু আমি তাঁর সেই নিষেধ অমান্য করে নাফরমানী করেছি। সুতরাং আজ আমি নিজের চিন্তায় ব্যস্ত আছি। সুতরাং তোমরা অন্য কারো নিকট গমন করো।

اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَسَمَّاكَ اللهُ عَبْدًا شَكُورًا أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا بَلَغَنَا أَلَا تَشْفَعُ لَنَا

إِلَى رَبِّكَ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ نَفْسِي نَفْسِي.

–তখন লোকেরা হযরত নূহ (আলাইহিস্ সালাম) এর নিকট গমন করে আরয করবে, আপনি দুনিয়ার প্রথম রাসূল। আল্লাহ আপনাকে শোকরকারী বান্দা উপাধীতে ভূষিত করেছেন। আপনি কী দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিরূপ সংকটে নিপতিত হয়েছি? আপনি কী আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে সুপারিশ করবেন? তিনি জবাব দেবেন– আমার রব আজ এতো বেশী ক্রোধান্বিত হয়ে আছেন যে ইতিপূর্বে তিনি আর কখনো এরূপ ক্রোধান্বিত হননি। এরপর আর কোনোদিন এরূপ ক্রোধান্বিত হবেননা। আমি আমার চিন্তায় মগ্ন আছি।

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে,

وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ سُؤَالَهُ رَبَّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ.

–হযরত নূহ (আলাইহিস্ সালাম) তখন তাঁর ঐ অপরাধের কথা স্মরণ করবেন। অজ্ঞতাবশতঃ তিনি নিজের পুত্রকে পানিতে না ডুবানোর জন্য আপন রবের নিকট প্রার্থনা করেছেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে,

وَقَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي اذْهَبُوا إلى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ خَلِيلُ اللهِ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَيَذْكُرُ ثَلَاثَ كَلِمَاتٍ كَذَبَهُنَّ نَفْسِي نَفْسِي لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللهِ، وَفِي رِوَايَةٍ فَإِنَّهُ عَبْدٌ آتَاهُ اللهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا.

–তিনি বলবেন, আমি স্বীয় কাউমের জন্য বদদোয়া করেছি। সুতরাং আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আজ তোমাদের জন্য সুপারিশ করতে পারবো না। তোমরা অন্য কারো নিকট যাও। তোমরা ইবরাহীম

(আলাইহিস্ সালাম) এর নিকট যাও। কেননা তিনি আল্লাহর খলিল। সুতরাং লোকেরা হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) এর নিকট এসে বলবে, আপনি আল্লাহর নবী! সারা দুনিয়াবাসীদের নিকট আল্লাহর খলিল। আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট সুপারিশ করুন। আপনি দেখতেছেন না আমরা কীরূপ বিপদে আছি? হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম)ও অনুরূপভাবে বলবেন। আজ আমার রব এমন ক্রোধান্বিত অবস্থায় আছেন। না তিনি পূর্বে এরূপ ক্রুদ্ধ হয়েছেন। আর না এর পরে এরূপ ক্রুদ্ধ হবেন। তিনি স্বীয় তিন বিষয় স্মরণ করবেন, যেগুলো তাঁর দৃষ্টিতে ভুল হয়েছে। তিনি ঐ তিন ভুলের কথা স্মরণ করে শাফায়াত করতে অপারগতা প্রকাশ করবেন। তিনি বলবেন, আমি আমার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত আছি।[১]

قَالَ فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ وَقَتْلَهُ النَّفْسَ نَفْسِي نَفْسِي. وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى فَإِنَّهُ رُوحُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ عَبْدٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَأُوتَى فَأَقُولُ أَنَا لَهَا فَأَنْطَلِقُ.

–তিনি বলবেন, তোমরা হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর নিকট গমন করো। কেননা তিনি "কালিমুল্লাহ" বা আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে কথা বলেছেন। তিনি এমন এক বান্দা যাকে আল্লাহ তা'আলা তাওরাত কিতাব দান করেছেন। তাঁকে নৈকট্য দান করে রহস্যের অধিকারী বানিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন সকলে হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর নিকট গমন করবে। তিনি বলবেন আমি এ কাজের উপযুক্ত

১. তিন কথার অর্থ হলো তিন বার হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) স্বীয় ধারণার বিপরীত উক্তি করেছেন। (১) প্রথম হলো এই যে, একবার হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) এর সম্প্রদায় উৎসব উপলক্ষে প্রতিমার মেলায় যাত্রা করে। তারা হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) কেও তাদের সাথে মেলায় যেতে বলে। তিনি বললেন, আমার মন-মেজাজ ভাল নয়। হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) এর মন চাইনি একথা বলেন। কিন্তু তারা "সাকীম" শব্দকে অসুস্থতা বলে বুঝেছে। (২) দ্বিতীয়বার যখন হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) স্ত্রী সারাহকে সাথে নিয়ে মিশর থেকে ফেরত আসেন। রাস্তায় এক বাদশাহ ছিলো। সে লোকদের স্ত্রীকে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিতো। কিন্তু বোন হলে তাকে ছেড়ে দিতো। বাদশাহ জিজ্ঞেস করলে তিনি সারাহকে বোন বলেন। একথা তিনি দীনি বোন হিসেবে বলেছেন। (৩) তৃতীয় বার তিনি যখন মূর্তি ভেংগে ফেলেন। আর তাঁর কাউম তাঁকে জিজ্ঞেস করে। তিনি বললেন, তাদের বড় যে, সে ভেঙেছে। তারা বুঝেছে, বড় মূর্তি একাজ করেছে। হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) এর ধারণা করেন যে, আমি তার থেকে বড় মূর্তি।

নই। তিনি তাঁর হাতে যে প্রাণনাশের ঘটনা ঘটেছে সে কথা স্মরণ করে নাফসী নাফসী বলবেন। বরং তোমরা হযরত ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) এর নিকট যাও। তিনি "রূহুল্লাহ" ও "কালিমাতুল্লাহ"! সুতরাং লোকেরা হযরত ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) এর নিকট শাফায়াতের আবেদন করবে। তিনি বলবেন, আমি এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট যাও। আল্লাহ তা'আলা তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন। তখন লোকেরা আমার নিকট আসবে। তখন আমি বলবো, হ্যাঁ। আমি সুপারিশ করার উপযুক্ত। একথা বলে তিনি সুপারিশ করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হবেন।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

فَأَسْتَاذِنُ عَلَى رَبِّى فَيُؤْذَنُ لِي فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا وَفِي رِوَايَةٍ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَخِرُّ سَاجِدًا.

–আমি আমার রবের নিকট অনুমতি চাইবো, আমাকে তাঁর নিকট যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। আমি তখন তাঁকে দেখেই সিজদায় পতিত হবো। আবার বর্ণনায় রয়েছে, আমি আরশের নিচে এসে সিজদায় পড়বো।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

فَأَقُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا إِلَّا أَنَّهُ يُلْهِمُنِيهَا اللهُ.

–অতঃপর আমি আমার রবের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁর গুণগান ও প্রশংসা করবো। আর তা রবের প্রদত্ত সামার্থ ও প্রত্যাদেশের মাধ্যমেই সম্ভব হবে।[১]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

فَيَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي.

১. ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু আদনা আহলিল জান্নাতি মানযিলাতু ফীহা, ১:১৮২।
খ) তকী উদ্দীন মুকরেযী : ইমতাউল আসমা'আ, বাবু ওয়া আম্মা ইখতিসাসিহি, ৩:২৭৫।

–অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রশংসা ও উত্তম গুণগানের এমন এক দ্বার আমার জন্য উত্তম করে দেবেন, যা আমার পূর্বে আর কারো জন্য উন্মুক্ত করা হয়নি।

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে,

فَيَقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي يَا رَبِّ أُمَّتِي فَيَقُولُ أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ.

–তারপর বলা হবে, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনার শির উত্তোলন করুন, আপনি প্রার্থনা করুন আপনাকে প্রদান করা হবে, আপনি সুপারিশ করুন আপনার সুপারিশ কবুল করা হবে। আমি মাথা উঠিয়ে বলবো, হে আমার রব! আমার উম্মাত! আমার উম্মাত! তখন আল্লাহ তা'আলা অ মাকে হুকুম দেবেন। জান্নাতের ডান পাশের সমস্ত লোককে বিনা হিসেবে বেহেশতে প্রবেশ করান। অথচ জান্নাতের অন্যান্য দরজায় লোকজন উপস্থিত থাকবে। অর্থাৎ যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে বেহেশতে প্রবেশ করান।

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় বিভক্ত হবার কথা উল্লেখ নেই। বরং বলা হয়েছে,

ثُمَّ أَخِرُّ سَاجِدًا فَيُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ واشفع تشفع وسل تُعْطَهْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيُقَالُ انْطَلِقْ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ بُرَّةٍ أَوْ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَى رَبِّي فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ وَذَكَرَ مِثْلَ الْأَوَّلِ وَقَالَ فِيهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ قَالَ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَرْجِعُ، وَذَكَرَ مِثْلَ مَا تَقَدَّمَ وَقَالَ فِيهِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى ادنى أَدْنَى مِنْ مِثْقَالِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَأَفْعَلُ.

–অতঃপর আমি সিজদায় পতিত হবো। আর আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। সিজদা হতে মাথা উঠান। আপনি শাফায়াত করুন, আপনার সুপারিশ কবুল করা হবে। আপনি বলুন, আপনার কথা শুনা হবে। তখন আমি বলবো! হে আমার রব! আমার উম্মাত। আমার উম্মাত। তখন আমাকে বলা হবে, যান! যার অন্তরে গম বা যবের দানা পরিমাণ ঈমান আছে তাকেও জাহান্নাম হতে বের করে আনুন। আমি জাহান্নামে গিয়ে তাদেরকে বের করে আনবো। তারপর পূর্বের ন্যায় আমার রবর হামদ-সানা করতে থাকবো। তখন আমাকে বলা হবে ঐ সমস্ত লোকদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করুন যাদের অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান আছে। তখন আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবো। আমি এরূপ করবো আর ফিরে আসবো। এবার আমাকে আদেশ করা হবে, যাদের অন্তরে এক বিন্দু পরিমাণ ঈমান আছে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনুন। অতঃপর আমি তা করবো।

চর্তুথবার যখন আমি সিজদায় পতিত হবো, তখন আমাকে বলা হবে,

فَيُقَالُ لِي ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ واشفع تشفع وسل تُعْطَهْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ ائْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ إِلَيْكَ وَلَكِنْ وَعِزَّتِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي وَجِبْرِيَائِي لَأُخْرِجَنَّ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ،

–হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি মাথা উঠান! আপনি বলুন, আপনার কথা শুনা হবে। আপনি শাফায়াত করুন, কবুল করা হবে। আপনি প্রার্থনা করুন, আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করা হবে। তখন আমি আরয করবো, হে আমার প্রভু! যারা শুধু লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু বলেছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করার অনুমতি দিন। তখন বলা হবে, এটা আপনার কাজ নয়। আমার ইজ্জত ও মহত্ব এবং আমার শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্বের শপথ করে বলছি, যারা লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু বলেছে আমি নিজেই তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করবো।

হযরত কাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে, হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, আমি জানি না তৃতীয় ও চতুর্থবার এ আরয করেছেন–

فَأَقُولُ يَا رَبِّ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ،

–হে প্রভু! তখন শুধু কুরআন যাদেরকে আটকিয়ে রেখেছে। (অর্থাৎ যাদের জন্য কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী) চিরস্থায়ী জাহান্নাম বাস নির্ধারিত হয়েছে; তারা ব্যতীত আর কেউই জাহান্নামে থাকবেনা।[১]

হযরত আবু বকর, হযরত উকবা বিন আমের, হযরত আবু সাঈদ ও হযরত হোযাইফা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর এরূপ বর্ণনা রয়েছে,

فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيُؤْذَنُ لَهُ وَتَأْتِي الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُومَانِ جَنْبَتَيِ الصِّرَاطِ،

–অতঃপর লোকেরা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট আসবে আর তাঁকে সুপারিশ করার অনুমতি দেওয়া হবে। আমানত ও আত্মীয়তা এসে পুলসিরাতের উভয় পাশে দাঁড়িয়ে যাবে।[২]

আবু মালেক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি), হযরত হোযাইফা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে যে বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, সেই বর্ণনায় এসেছে,

فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيَشْفَعُ فَيُضْرَبُ الصراط فيمرون أَوَّلُهُمْ كَالْبَرْقِ ثُمَّ كالريح والطير شد الرِّجَالِ وَنَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ اللهم سلم سَلِّمْ حَتَّى يَجْتَازَ النَّاسَ.

–সমস্ত লোকজন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে উপস্থিত হবে আর তিনি তখন শাফায়াত করবেন। তখন পুলসিরাত স্থাপিত হবে। তখন উত্তম মর্যাদার অধিকারী লোকেরা বিদ্যুৎগতিতে পুলসিরাত অতিক্রম করে চলে যাবে। অতঃপর তার পরবর্তী স্তরের লোকেরা পাখির গতিতে বা দ্রুতগামী সাওয়ারীর গতিতে পুলসিরাত অতিক্রম করে চলে যাবে। আর তোমাদের নবী তখন পুলসিরাতের নিকট দাঁড়িয়ে দোয়া করতে থাকবেন যে, আল্লাহ এদের জাহান্নাম থেকে বাঁচাও! এদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। এভাবে সর্বশেষ লোক পুলসিরাত অতিক্রম করে চলে যাবে।

---

[১]. অর্থাৎ এমন লোক জাহান্নামে বাকি থাকবে, যাদের সম্পর্কে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে। এরা চিরস্থায়ী জাহান্নামী অর্থাৎ কাফির ও মুনাফিক।

[২]. ইবনে খুযাইমা : আত্ তাওহীদ, বাবু যিকরিল আখবারিল মুসরিহাত, ২:৭১৪।
কিয়ামতের মাঠে আমানাতদারী ও আত্মীয়দের সাথে উত্তম ব্যবহার আকৃতি ধারণ করে পুলসিরাতের ডান ও বাম পাশে এসে উপস্থিত হবে। আমানতদারী ও আত্মীয়দের সাথে উত্তম ব্যবহারকারী পুলসিরাত পার হওয়ার কাজে সাহায্য করবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ،

–কিয়ামতের দিন আমিই সর্বপ্রথম পুলসিরাত পার হবো।[১]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

يوضَعُ لِلْأَنْبِيَاءِ مَنَابِرُ يَجْلِسُونَ عَلَيْهَا وَيَبْقَى مِنْبَرِي لَا أَجْلِسُ عَلَيْهِ قَائِمًا بَيْنَ يَدَيْ رَبِّي مُنْتَصِبًا فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا تُرِيدُ أَنْ أَصْنَعَ بِأُمَّتِكَ فَأَقُولُ يَا رَبِّ عَجِّلْ حِسَابَهُمْ فَيُدْعَى بِهِمْ فَيُحَاسَبُونَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يدخل الجنة بِشَفَاعَتِي وَلَا أَزَالُ أَشْفَعُ حَتَّى أُعْطَى صِكَاكًا بِرِجَالٍ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ حَتَّى إِنَّ خَازِنَ النَّارِ لَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ مَا تَرَكْتَ لِغَضَبِ رَبِّكَ فِي أُمَّتِكَ مِنْ نِقْمَةٍ،

–কিয়ামতের দিন সব নবীদের জন্য মিম্বার স্থাপন করা হবে। তাঁরা স্ব-স্ব মিম্বারে উঠে বসবেন। কিন্তু আমার মিম্বারখানি খালি পড়ে থাকবে, আমি তাতে বসবোনা। আমি আমার রবের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবো। তখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, আপনি কি দেখতে চান, আমি আপনার উম্মাতের সাথে কী ধরণের আচরণ করবো? আমি আরয করবো, হে রব! আমার উম্মাতের হিসাব নিকাশ ত্বরান্বিত করুন। তখন আমার উম্মাতদের ডাকা হবে এবং তাদের হিসাব নিকাশ নেওয়া হবে। তাদের নিকট এমন কিছু লোক থাকবে যারা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে বেহেশতে যাবে। আর কিছু লোক এমন হবে যারা আমার শাফায়াতে বেহেশতে যাবে। কিন্তু আমার সুপারিশ চলতে থাকবে। এমনকি কতিপয় লোক এমন হবে যাদের জাহান্নামে প্রবেশ নির্ধারিত হয়ে গেছে এবং জাহান্নামে প্রবেশের পরওয়ানা জারি করা হয়েছে। জাহান্নামের দ্বার রক্ষী

---

[১]. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু সিরাতি জাসরি জাহান্নাম, ৮:১১৭।
খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদে আবী হুরাইরা, ২:২৭৫।
গ) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবু মাওযায়িস্ সুজুদ, ২:২২৯।

বলবেন, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ প্রতিফলিত করার জন্য আপনার কোন উম্মতই অবশিষ্ট রাখলেন না।

জিয়াদ নমিবীর সূত্রে হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْفَلِقُ الْأَرْضُ عَنْ جُمْجُمَتِهِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَمعِي لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوَّلَ مَنْ تُفْتَحُ لَهُ الْجَنَّةُ وَلَا فَخْرَ فَآتِي فَآخُذُ بِحَلَقَةِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ مَنْ هَذَا؟ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ، فَيُفْتَحُ لى فيستقبلى الْجَبَّارُ تَعَالَى فَأَخِرُّ ساجدا،

–কিয়ামতের দিন আমি সর্বপ্রথম কবর থেকে উঠবো, তাতে আমার কোনো গৌরব নেই। কিয়ামতের দিন আমি আদমের সন্তানদের সর্দার হবো। তাতে আমার কোনো গৌরব নেই। কিয়ামতের প্রশংসার ঝাণ্ডা আমার হাতে থাকবে। তাতেও আমার কোনো গৌরব নেই। তারপর আমি বেহেশতের দ্বারপ্রান্তে এসে কড়া নাড়বো। বলা হবে আপনি কে? আমি বলবো, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন আমার জন্য বেহেশতের দরজা খুলে দেওয়া হবে। আমি তখন আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করবো এবং সিজদায় পড়বো। এরপর তিনি প্রথম হাদিসের মতো শাফায়াতের হাদিস বর্ণনা করেন।[১]

হযরত উনাইস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

لَأَشْفَعَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَكْثَرَ مِمَّا فِي الْأَرْضِ مِنْ حَجَرٍ وَشَجَرٍ،

–যমীনের পাথর ও বৃক্ষ সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশী পরিমাণ লোকের জন্য আমি কিয়ামতের মাঠে সুপারিশ করবো।[২]

এসব হাদীসের দ্বারা বিভিন্ন শব্দে সর্বসম্মতিক্রমে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাকামে মাহমুদে এবং বিভিন্নস্থানে ও বিভিন্ন

[১]. ক) আবু বকর কালাবাযী হানাফী : বাহরুল ফাওয়ায়েক, বাবু হাদীসি আখার, ১:৩৪২।
খ) তকী উদ্দীন মুকরেযী : ইমতাউল আসমা'আ, বাবু ওয়া আম্মা তাফরিদুহু বিস্ সিয়াদাত, ৩:২২৭।
[২] হালবী : সিরাতে হালবিয়্যাহ, বাবু বয়ানি হিলাল মাবউস ওয়া উমুমী বা'সিহি, ১:৩৩৩।

অবস্থায় হাশরের মাঠে মানুষের জন্য সুপারিশ করবেন। যেদিন মানুষ বাকরুদ্ধ হয়ে যাবে এবং ঘর্মসিক্ত হয়ে হাবুডুবু খাবে এবং সূর্য মাথার অতি নিকটে এসে যাবে। এ বিপদসংকুল অবস্থায় দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকবে হবে। হিসাব নিকাশের পূর্বে এ অবস্থার সম্মুখীন হবে। তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানুষের কষ্ট লাগবের জন্য সুপারিশ করবেন। এরপর পুলসিরাত স্থাপন করা হবে এবং মানুষের হিসাব নিকাশ গ্রহণ করা আরম্ভ হয়ে যাবে। যথা হযরত আবু হোরায়রা ও হোযাইফা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় বলা হয়েছে। এই হাদিস সহীহ ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উম্মাতের মুত্তাকি লোকদের জন্য সুপারিশ করবেন। তাদের কোন প্রকার হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা হবেনা। যেমনটি প্রথোমোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ সমস্ত লোকদের ব্যাপারে সুপারিশ করবেন, যাদের জাহান্নামে প্রবেশ করা চূড়ান্ত হয়ে গেছে। সহীহ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী তারা জাহান্নামে যাবে। তারপর ঐ সমস্ত লোকদের ব্যাপারে সুপারিশ করবেন। যারা জীবনে শুধু একবার লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু পড়েছে। এ সম্মান হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যতীত আর কেউ লাভ করতে পারবে না।

সহীহ হাদিসে বর্ণিত আছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُو بها واختبأت دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

–প্রত্যেক নবীদের একটি দোয়া ছিলো। যা তাঁরা আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে চেয়ে নিয়েছেন। কিন্তু আমি আমার দোয়াকে কিয়ামতের দিনে আমার উম্মাতের শাফায়াতের জন্য জমা করে রেখেছি।

সত্যপন্থী আলেমগণ বলেন, এর অর্থ হলো, তাঁর ঐ দোয়া সম্পর্কে তাঁকে বলা হয়েছে, যা উম্মাতের জন্য কবুল করা হবে এবং মনের কামনা-বাসনা পূর্ণ করা হবে। নতুবা নবীদের অনেক অনেক দোয়াই কবুল করা হয়েছে। আর আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যত দোয়া করেছেন সবই কবুল করা হয়েছে। যার সংখ্যা অনেক বেশী। কথা হলো যে, অন্যান্য নবীদের অন্যান্য দোয়া আশা ও নিরাশায় দোদুল্যমান ছিলো। আর উল্লেখিত দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে যে, তিনি যে দোয়া করবেন তা কবুল করা হবে।

মুহাম্মদ বিন জিয়াদ ও আবু সালেহ হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করেছেন,

لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ فاستجيب لَهُ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُؤَخِّرَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ اليامة،

–প্রত্যেক নবীর এমন দোয়া ছিলো, যা তাঁদের উম্মাতের জন্য কবুল হয়েছে। কিন্তু আমি আশা করি যে, আমার সেই দোয়াটি আমার উম্মাতের সুপারিশের উদ্দেশ্যে কিয়ামতের দিনের জন্য জমা রেখেছি।

হযরত আবু সালেহ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর বর্ণনায় এসেছে,

لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ،

–প্রত্যেক নবীর একটি দোয়া কবুল হয়েছে। আর তাঁরা প্রত্যেকে দোয়ার ক্ষেত্রে ত্বরা করেছেন।

অনুরূপ বর্ণনা আবু যর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সূত্রে হযরত আবু হোরায়রা ও হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

উল্লেখিত দোয়াসমূহ যা উম্মাতের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেই দোয়াসমূহ কবুল হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। নতুবা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেন না যে,আমি আমার উম্মাতের জন্য অনেক ব্যাপারে দোয়া করেছি। তন্মধ্যে অনেক দোয়া কবুল হয়েছে এবং অনেক বিষয় আল্লাহর তা'আলার নিকট চেয়েছি। তন্মধ্যে আমাকে অনেক বিষয় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি উল্লেখিত দোয়া যা প্রয়োজনীয় মুহূর্তের জন্য রেখে দেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এর বিনিময়ে আরো উত্তম বিনিময় দান করুন। যা কোনো নবীকে তাঁর উম্মাতের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কাছিরান, কাছিরা।

একাদশ পরিচ্ছেদ

فِي تَفْضِيلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ بِالْوَسِيلَةِ وَالدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ وَالْكَوْثَرِ وَالْفَضِيلَةِ

জান্নাতের উসিলা ফযিলা ও কাউসারের মর্যাদায় হুযুর (ﷺ) এর বিশেষত্ব

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর বিন আস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الجنة لا تنبغي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ،

–তোমরা আজান শুনলে মুয়াজ্জিন যে বাক্যগুলো বলে সেগুলো বলবে। তারপর আমার প্রতি দুরূদ প্রেরণ করবে। যে আমার উপর দুরূদ প্রেরণ করে, তার প্রতি আল্লাহ তা'আলা দশটি রহমত বর্ষণ করেন। দুরূদ পাঠের পর তোমরা আমার জন্য উসীলা প্রার্থনা করবে। উসিলা বেহেশতের এমন এক স্থান যেখানে পৌছতে পারবে শুধু একজন, দ্বিতীয় আর কারো সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। আমি আশাবাদী আমিই সেই একক প্রবেশাধিকারী প্রাপ্ত হবো। সুতরাং যে আমার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট উসিলায় প্রার্থনা করবে। তাঁর জন্য আমার শাফায়াত স্বীকৃত হবে।[১]

অপর হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত,

الْوَسِيلَةُ أَعْلَى دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ،

–ওসীলা হলো জান্নাতের সর্বোচ্চ পদমর্যাদা।[২]

---

১. ক) মুসলিমঃ আস্ সহীহ, বাবুল কাওলি মিসলি কাওলিল মু'মিনিন, ১:২৮৮।
খ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ফী ফযলিন নবী, ৬:১৩।
গ) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবুস্ সালাতি আন্ নবী, ২:২৫২।

২. ক) কাযী আবু ইসহাক যাহযামী : ফযলুস্ সালাতি আলান নবী, বাবুস্ সালাতি আলা ফাইন্না সালাতি মিনকুম, ১:৪৮।
খ) তকী উদ্দীন মুকরেযী : ইমতাউল আসমা'আ, ১১:৮৯।

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ إِذْ عَرَضَ لِي نَهَرٌ حَافَّتَاهُ قِبَابُ اللُّؤْلُؤِ قُلْتُ لِجِبْرِيلَ مَا هَذَا قَالَ هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَهُ اللهُ قَالَ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى طِينَتِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِسْكًا،

–আমি জান্নাতে ভ্রমণ করি। হঠাৎ আমি এক নহরের নিকট পৌছি। যার উভয় পাশে মুক্তার গম্বুজ সাজানো হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করি হে জিবরাঈল, এটা কী? তিনি বললেন, এটা সেই কাউসার যা আপনার রব আপনাকে দান করেছেন। তারপর তিনি সেই মাটিতে হাত রাখেন। সেখান থেকে মেশকের মতো সুঘ্রাণ বের হয়।[১]

হযরত আয়েশা ও হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা বর্ণিত আছে। তাঁদের বর্ণনায় এসেছে,

وَمَجْرَاهُ عَلَى الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَبْيَضُ مِنَ الثَّلْجِ،

–হাউজে কাউসারের পানি মুক্তা ও ইয়াকুত থেকে প্রবাহিত হয়। এর পানি মধু অপেক্ষা অধিক মিষ্টি। আর বরফের চাইতে অধিক শুভ্র।

তাঁদের অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

فَإِذَا هُوَ يَجْرِي وَلَمْ يُشَقَّ شَقًّا عَلَيْهِ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي.

–হাউজে কাউসার ঐ নহরসমূহ যা প্রবাহিত হচ্ছে, কিন্তু তাকে বিচ্ছিন্ন করা যাচ্ছে না। তার উপর একটি হাউজ হবে। আমার উম্মাত এর নিকট আসবে।

অতঃপর তারা হাউজে কাউসার সম্পর্কিত হাদিস বর্ণনা করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকেও বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) এর অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন,

---

গ) আলী ইবনে নাফে' জহুল : খাসায়িসুর রসূল, বাবুল ওসীলাতি ওয়াল ফাদ্বিলাহ, ১:১১০।

[১]. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ওয়া মিন সুরাতি কাওসার, ৫:৩০৬।

খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদে আনাস ইবনে মালেক, ২০:৩৯৯।

গ) ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, বাবু যিকরিল বয়ান বিআন্না কাওলিহি, ১৪:৩৯১।

الْكَوْثَرُ الْخَيْرُ الَّذِي أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ،

–কাউসার হলো আল্লাহ তা'আলার অতি উত্তম কল্যাণ, যা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে প্রদান করা হয়েছে।

হযরত সাঈদ বিন যোবায়ের (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

والنهر الَّذِي فِي الْجَنَّةِ مِنَ الخير الَّذِي أعطاه الله،

–এটা জান্নাতের নহরসমূহের একটি নহর বা স্রোতস্বিনী। মূলতঃ এটা উত্তম দান, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তা দান করেছেন।

হযরত হোযাইফা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর রবের অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করে বলেন,

وَأَعْطَانِي الكَوْثَرَ نَهَرًا مِنَ الْجَنَّةِ يَسِيلُ فِي حَوْضِي،

–আমার রব আমাকে বেহেশতে কাউসার নামক এক প্রস্রবণ দান করেছেন। তা আমার হাউজের সাথে প্রবাহিত হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে,

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝

–এবং অচিরেই আপনার রব আপনাকে এ পরিমাণ দেবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।[১]

এর অর্থ হলো হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বেহেশতের মধ্যে হাজার মহল বা বালাখানা দেওয়া হবে। প্রতিটি মহল ও ততসংখ্যক হুর গিলমান দেওয়া হবে।

---

[১]. আল কুরআন : সূরা দোহা, ৯৩:৫।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

اَلْأَحَادِيْثُ الْوَارِدَةِ فِي النَّهِيِ عَنْ تَفْضِيْلِهِ

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফযীলত দানে নিষেধসূচক হাদিসসমূহ পর্যালোচনা

কুরআন হাদিস ও উম্মাতের ঐক্যমত্যে প্রমাণ হয়েছে যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আদমের সন্তানদের মধ্যে সর্বোত্তম ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী এবং হযরাত আম্বিয়া কেরাম থেকেও সর্বোচ্চ সম্মানিত। তাহলে যে সমস্ত হাদীসে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে অন্যান্য আম্বিয়া কেরামের উপর প্রাধান্য দিতে নিষেধ করেছেন সেইসব হাদীসের মর্মার্থ কী হবে? যথা হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى،

–কারো পক্ষে উচিত হবেনা যে আমাকে হযরত ইউনুস ইবনে মাত্তার উপর প্রাধান্য দেবে।[১]

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে এক বর্ণনায় এসেছে, এক ইহুদী বললো, সেই মহান সত্তার কসম! যিনি হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) কে সারা বিশ্বের উপর মনোনীত করেছেন। এই কথা শুনে আনসারী সাহাবী তখনই ইহুদির গালে এক চড় মেরে বললো, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তুমি এমন কথা বলছো। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একথা জানার পর বললেন,

لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ، وَفِي رِوَايَةٍ لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى، فَذَكَرَ الحديث

وفيه وَلَا أَقُولُ إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى،

–তোমরা নবীদের পরস্পরের মধ্যে একজনকে আরেকজনের উপর প্রাধান্য দিও না। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আমাকে হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর উপর প্রাধান্য দিওনা। আর আমি একথাও বলছি না যে, আমি ইউনুস ইবনে মাত্তার থেকে উত্তম।

---

[১]. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু কাওলিহি ওয়া ইউনুসাও ওয়া লূতাওঁ ফাদ্দালনা আলা, ৬:৫৭।
খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ফী যিকরি ইউনুস, ৪:১৮৪৬।
গ) বায়হাকী : দালায়িলুন নবুয়াত, বাবু কুদুমি যিমাম ইবনে সা'লাব, ৫:৪৯৫।

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

مَن قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ،

–যে ব্যক্তি বলবে আমি ইউনুস ইবনে মাত্তার থেকে উত্তম, সে মিথ্যা বলছে।[১]

হযরত ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে,

لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى،

–তোমাদের কেই যেন না বলে যে, আমি ইউনুস ইবনে মাত্তা থেকে উত্তম।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে অপর এক বর্ণনায় এসেছে, একদা এক ব্যক্তি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে আরয করে যে, يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ فَقَالَ ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ –সৃষ্টি জীবের মধ্যে আপনি সর্বোত্তম ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, সর্বোত্তম হলেন হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম)।

সম্মানিত আলেমদের দৃষ্টিতে হাদিসসমূহের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ

১। প্রথমে যে সময় হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে প্রাধান্য দিতে নিষেধ করেছেন তখন তিনি জানতে পারেন নি যে, তিনি সকল আদম সন্তানের সর্দার। কেননা প্রাধান্য দানকারীর জন্য জানা জরুরী। নচেৎ জ্ঞাত না হওয়া ছাড়া তিনি তাঁকে প্রাধান্য দেওয়াকে মিথ্যা বলছেন।

অনুরূপভাবে তাঁর বাণী–

لَا أَقُولُ إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْهُ لَا يَقْتَضِي تَفْضِيلَهُ هُوَ وَإِنَّمَا هُوَ فِي الظَّاهِرِ كَفٌّ عَنِ التَّفْضِيلِ،

–'আমি বলছিনা যে, তোমরা কেউ বলো যে, আমি ইউনুস (আলাইহিস্ সালাম) থেকে উত্তম'। একথার অর্থ এ নয় যে, তিনি তাঁকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বরং তিনি প্রাধান্য দিতে নিষেধ করেছেন।

---

[১]. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু কাওলিহি আনা ওয়া আওহাইনা ইলাইকা..., ৬:৫০।
খ) বাগভী : শরহুস্ সুন্নাহ, বাবু ফাযায়িলি সায়্যিদিল আউয়ালিন ওয়াল আখিরিন, ১৩:২০৬।
গ) যুরকানী : শরহে যুরকানী আলা মাওয়াহিবে লাদুনিয়া, ৮:২৮৯।

২। দ্বিতীয় কারণ হলো এই যে, তিনি বদন্যতা ও বিনয় প্রকাশার্থে অহংকার ও অহমিকাকে নিষেধ করেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে।

৩। তৃতীয় কারণ হলো যে, তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো যে, নবীদের পরস্পরের এরূপ প্রাধান্য দেবেনা। যা দ্বারা অন্যের সম্মানহানী হতে পারে। বা তাঁদের মধ্যে দোষত্রুটির চাপ পড়তে পারে। বিশেষ করে হযরত ইউনুস (আলাইহিস্ সালাম) এর ব্যাপারে। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে যা বলেছেন, তা সকলে অবগত। তবুও কোনো নির্বোধ লোকের মনে যেন তাঁর সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার উদ্রেক না হয়। তাঁর উচ্চ মর্যাদায় ঘাটতি দেখা না দেয়। কেননা কুরআন মাজীদে এরশাদ করা হয়েছে–

إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾

–যখন বোঝাই নৌযানের দিকে বের হয়ে পড়েছিলো।[১]

অতঃপর এরশাদ করা হয়েছে–

إِذ ذَّهَبَ مُغَـٰضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ

–যখন ক্রোধভরে চললো, তখন মনে করেছিলো যে, আমি তার উপর বিপদ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবো না।[২]

এ ধরণের আয়াত দ্বারা কোনো কোনো সময় অল্প জ্ঞানী লোকদের নবীদের কম মর্যাদার ধারণা হয়।

৪। চতুর্থ কারণ হলো যে, নবুওয়াত ও রিসালাত সম্পর্কে নবীদেরকে পরস্পরের প্রাধান্য দিতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা হযরাত আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) নবুওয়াত ও রিসালাতের মর্যাদায় সমপর্যায়ভুক্ত। নবুওয়াত ও রিসালাত একই বস্তু ,যার মধ্যে কোন প্রাধান্য নেই। তবে অবস্থাভেদে বিশেষ কারণে মু'জিযা ও মর্যাদা দানে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও দয়ায় একে অপরের উপর মর্যাদার অধিকারী। মূলতঃ নবুওয়াতের ব্যাপারে পরস্পরের উপর কোন মর্যাদা নেই। সুতরাং জানা গেলো যে, পরস্পরে বিশেষ কোন কারণে মর্যাদার অধিকারী। এ সূত্রে কোন রাসূল শুধু রাসূল, আবার কেউ ছিলেন, "উলুল আযম" বা অতি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন রাসূল। আবার কারো অবস্থা এরূপ যে, তিনি অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আবার কেউ কেউ এরূপ যে, বাল্যকালে তাঁদেরকে বিশেষ জ্ঞান দান

[১]. আল কুরআন : সূরা সাফ্‌ফাত, ৩৭:১৪০।
[২]. আল কুরআন : সূরা আম্বিয়া, ২১:৮৭।

করা হয়েছে। কাউকে যাবুর দেওয়া হয়েছে। কাউকে মু'জিযার অধিকারী করা হয়েছে। আবার কারো সাথে আল্লাহ তা'আলা কথা বলেছেন এবং তাঁর মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে বলা হয়েছে। যথা কুরআন মাজীদে এরশাদ করা হয়েছে–

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ عَلَىٰ بَعْضٍ

–এবং নিশ্চয় আমি নবীগণের মধ্যে একজনকে অন্যজনের উপর অধিকতর মর্যাদা দিয়েছি।[১]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

–এঁরা রাসূল! আমি তাঁদের মধ্যে এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠ করেছি।[২]

কোন কোন জ্ঞানীগণ বলেছেন যে, এ মর্যাদার অর্থ হলো তাঁদের দুনিয়াতে মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। আর তাও তিন অবস্থায় যথা– (১) এরূপ হতে পারে যে, তাঁদের নির্দশন ও মু'জিযা অতি উজ্জ্বল। (২) অথবা এরূপ হতে পারে যে, তাঁদের উম্মাত অতি পবিত্র ও সংখ্যায় অনেক বেশী। (৩) অথবা তাঁদের ব্যক্তি সত্তা অতি সম্মানিত মহৎ ও অতি স্পষ্ট। আর তাঁদের সত্তাগত মর্যাদা তাঁদের বিশেষ মু'জিযার কারণে হয়েছে। যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি কথা বলেছেন। কাউকে 'খলিল' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। কাউকে স্বীয় "দর্শন" দ্বারা ধন্য করেছেন। অথবা বিভিন্ন প্রকার দয়া, অনুগ্রহ ও বেলায়েত উপহার স্বরূপ প্রদান করেছেন এবং বিশেষ বিশেষত্ব প্রদান করেছেন।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

إِنَّ لِلنُّبُوَّةِ أَثْقَالًا وَإِنَّ يُونُسَ تَفَسَّخَ مِنْهَا تَفَسُّخَ الرُّبَعِ،

–নবুওয়াত এক বিরাট দায়িত্ব। হযরত ইউনুস (আলাইহিস্ সালাম) এ দায়িত্ব থেকে এভাবে মুক্ত হতে চেয়েছিলেন যে, উট যেভাবে স্বীয় বাচ্চা থেকে বসন্তকালে মুক্ত হতে চায়।

সুতরাং হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিপদ থেকে ঐ সমস্ত লোকদেরকে হেফাযত করেছেন যাদের ভ্রান্ত ধারণা বৃদ্ধি লাভ করেছে। অর্থাৎ– যারা হযরত ইউনুস (আলাইহিস্ সালাম) এর নবুওয়াত অবমাননা করেছে। অথবা তিনি

[১]. আল কুরআন : সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:৫৫।
[২]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:২৫৩।

আল্লাহ তা'আলার মনোনীত নবী হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য করেছে। অথবা তাঁর মর্যাদা ক্ষুন্ন করেছে। অথবা তাঁর মাসূম বা নিষ্পাপ হওয়ার ব্যাপারে দুর্বলতা প্রকাশ করেছে। তাঁর এরূপ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করার কারণ হলো যে, তিনি উম্মাতের প্রতি বিশেষ অনুকম্পা প্রদর্শন করেন।[১]

পঞ্চম কারণও অনুরূপ যে, 'আনা' সর্বনাম বাক্য উচ্চারণকারীর সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কখনো এরূপ ধারণা করতে পারবে না যে, সে যত বড় জ্ঞানী গুণী সম্মানের অধিকারী হোক না কেন। তার কারণ হলো যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউনুস (আলাইহিস্ সালাম) সম্পর্কে বলেছেন, তিনি তোমাদের থেকে উত্তম। কেননা নবুওয়াতের মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। আর একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, কুরআন মাজীদে বর্ণিত ভুলের কারণে তাঁর মর্যাদা বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন হয়নি। আল্লাহর ইচ্ছায় তৃতীয় পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এ পর্যন্ত আমি যা আলোচনা করেছি আশা করি তাতে পাঠকবৃন্দ তাদের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে অবগত হয়েছে। আর আমি যা আলোচনা করেছি তাতে মতবিরোধকারীদের মতভেদও খণ্ডন হয়েছে। আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট নেককাজের তৌফিক প্রার্থী আর তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। তিনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই।

(১) মূলতঃ তা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট অপছন্দনীয় ছিলো। তাঁর কোন উম্মাত যেন কোনো নবী সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ না করে। যা নবীর মর্যাদার পরিপন্থী। সুতরাং যখনই এ ধরণের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তখনই তিনি আম্বিয়া কেরামের মর্যাদা ও ফযিলত স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছেন। যাতে মানুষের মধ্যে নবীদের সর্ম্পকে ভ্রান্ত ধারণা দেখা না দেয়। মানবীয় স্বভাব সুলভভাবে হযরত আম্বিয়া কেরাম থেকে কমবেশী কিছু না কিছু ভুলত্রুটি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তাদের সেই ভুলত্রুটি গুনাহ বা নাফরমানি ছিলো না। বরং তাঁদের অবস্থা হলো এরূপ যে, যাঁদের মর্যাদা যতো বড় তাঁদের বিপদও ততো কঠিন। অর্থাৎ উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারা যদি অতি নগন্য ভুল ত্রুটি সম্পাদিত হয় এর জন্য তাঁদেরকে জবাবদিহি করতে হয়। এ কারণে বলা হয়েছে- حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ -নেককার লোকদের নেক কাজ যা আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাদের জন্য গুনাহের তুল্য হয়। যথা ধবধবে সাদা কাপড়ের উপর বিন্দু পরিমাণ দাগ বিরাট আকার ধারণ করে। কিন্তু ময়লা কাপড়ের উপর এর প্রতিফলন হয় না। সুতরাং ভুলত্রুটির কারণে নবীদের নবুওয়াত ও মর্যাদার কোন প্রকার পার্থক্য দেখা দেয়নি।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

فِيْ أَسْمَائِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَضَمَّنَتْهُ مِنْ فَضِيْلَتِهِ

পবিত্র নামসমূহের মর্যাদায় হুযুর (ﷺ) এর বিশেষত্ব

হযরত জুবাইর ইবনে মুতয়িম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

لِيْ خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِيْ الَّذِيْ يَمْحُو اللهُ بِيَ الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِيْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِيْ وَأَنَا الْعَاقِبُ،

–আমার পাঁচটি নাম রয়েছে। আমি 'মুহাম্মদ', 'আহমদ', ও 'মাহী'। আমার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কুফুরী বা অবিশ্বাসকে বিলুপ্ত করে দেবেন। আমিই 'হাশের', আমার অধীনেই সকল মানুষকে হাশরের ময়দানে সমবেত করা হবে। অর্থাৎ আমার পরে সকলে কবর থেকে উত্থিত হবে। আমি 'আকিব'। অর্থাৎ সর্বশেষ আগমনকারী।[১]

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজীদে তাঁকে 'মুহাম্মদ' ও 'আহমদ' নামে সম্বোধন করেছেন। আর আল্লাহ তা'আলা এ বিশেষ বিশেষত্বের নামে তাঁর প্রশংসা করেছেন। আর তাঁর আলোচনার ধারাবাহিকতায় মহান কৃতজ্ঞতাকে গোপনীয়ভাবে রেখে দেন। আর "আহমদ" নাম "আফআল" এর সমমানের যা অতিরিক্ত প্রশংসা প্রকাশ করে। আর "মুহাম্মদ" "মাফআল" এর সমমানের যে, তিনি অতিরিক্ত প্রশংসিত। সুতরাং হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন প্রশংসিতজনদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সমস্ত মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম প্রশংসাভাজন হয়েছেন। মূলতঃ তিনিই হবেন সর্বাধিক প্রশংসাকারী। এই দিক থেকে তিনি "আহমাদুল মাহমুদিন" বা সর্বাধিক প্রশংসাভাজন। আর এক দিকে "আহমাদু হামিদীন"।[২]

১. ক) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু আসামায়িন নবী, ৫:১৪৬১।
খ) আবু জাফর তাহাবী : শরহে মুশকিতুল আসার, বাবু বয়ানি মুশকিলি মা ওয়ারা, ৩:১৮১।
গ) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ২:১২২।

২. "আহমাদুল মাহমুদিন", তিনি এমন এক মহান সত্তা, পৃথিবীতে তাঁর চেয়ে বেশী আর কারো প্রশংসা করা হয়নি। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে- وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ অর্থ– আমি আপনার আলোচনাকে করেছি সমুন্নত। আসমানে, যমীনে, ফিরিশতাদের দোয়ায়, মুয়াজ্জিনের আযানে, নামাযে, দুরূদ সালামে, তিলওয়াতে, পঠন পাঠনে সর্বত্র তাঁরই গুণগান মহিমা প্রচার করা হচ্ছে। এমন কোন স্থান আছে কী? যেখানে তাঁর আলোচনা

কিয়ামতের দিন তিনিই হবেন প্রশংসার পতাকাধারী। সেদিন হবে প্রশংসার পরিপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ। আর সেই ময়দানে প্রকাশিত হবে তাঁর প্রশংসাকারী ও প্রশংসিত নামের মহিমা। আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁকে 'মাকামে মাহমুদ' নামক প্রশংসিত স্থানে উপবিষ্ট করাবেন- তিনি যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেখানে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলে তাঁর শাফায়াতের কারণে তাঁর মহিমা ও গুণকীর্তন করতে থাকবে। তিনিই সেদিন হাশর প্রান্তরে শাফায়াতের তোরণ উন্মুক্ত করবেন। যেমন- হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন, তা আর কাউকে দেয়া হয়নি। আল্লাহ তা'আলা নবীদের উপর অবতীর্ণ কিতাবসমূহে তাঁর উম্মাতকে "হাম্মাদুন" বা অত্যাধিক প্রশংসাকারী বলে সম্বোধন করেছেন। সুতরাং তাঁর উম্মাতের নাম যেহেতু "হাম্মাদুন" বা "অত্যাধিক প্রশংসাকারী" তাঁকে আহমদ বা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামে সম্বোধন করা হয়েছে। তাঁর এ দুটি নাম ছাড়াও আরো একপ্রকার বিস্ময়কর অদ্ভুত বিশেষত্ব হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে এ নামে পৃথিবীতে কাউকে ভূষিত করেননি। তাঁর পবিত্র "আহমদ" নাম পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থসমূহে উল্লেখিত হয়েছে। হযরাত আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) এ নামের সুসংবাদ দেন। সেহেতু আল্লাহ তা'আলার আপন মহিমায় মানুষ এ নাম রাখা থেকে বিরত থ .ক, তাই কারো সন্তানের এ নাম রাখেনি। আর তাঁর পূর্বে কেউ কাউকে এ নামে ডাকতেও পারেনি। যাতে কেউ এ নাম নিয়ে সন্দেহ সংশয়ের মধ্যে পতিত না হয়। অনুরূপভাবে আরবদেশেও কেউ কারো সন্তানের নাম "মুহাম্মদ" রাখেনি। কিন্তু তাঁর পৃথিবীতে আবির্ভাবের অল্প কিছুদিন পূর্বে যখন আরববাসীদের মধ্যে একথা প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, "মুহাম্মদ" নামে প্রতিশ্রুত সেই নবীর আগমনের সময় হয়েছে, তখন আরবের কিছু লোক তাদের সন্তানদের নাম "মুহাম্মদ" রাখতে শুরু করে। তারা আশা করে যে, তাদের "মুহাম্মদ" নামের সন্তানই যেন প্রতিশ্রুত শেষ নবী হয়, তারা যেই নবীর আগমনের প্রতীক্ষায় রয়েছে।

কোন স্থানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রিসালাত রেখেছেন তা তিনিই ভালভাবে জানেন। যাদের নাম "মুহাম্মদ" রাখা হয়েছে, তারা হলো- মুহাম্মদ বিন আহীহা বিন হাল্লাজ আউসী, মুহাম্মদ বিন মাসলামা আনসারী, মুহাম্মদ বিন বারা আল বিকরী, মুহাম্মদ বিন সুফিয়ান মুজাসি', মুহাম্মদ বিন হামরান আল জু'ফী, মুহাম্মদ বিন খাজায়ী আসলামী। আর সপ্তম কেউ ছিলো না। কথিত আছে সর্বপ্রথম যার

করা হয়না। আহমাদুল হামিদীন এর অর্থ হলো, সর্বাধিক প্রশংসাকারী তিনি আল্লাহ তা'আলার যে সর্বোত্তম প্রশংসা করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত আর কেউ সেরূপ প্রশংসা করতে পারবে না।

নাম "মুহাম্মদ" রাখা হয়েছে। সে হলো মুহাম্মদ বিন সুফিয়ান। ইয়ামানবাসী বলেন বরং সে হলো মুহাম্মদ বিন ইয়াজমুদ আযদী।

যাদের নাম "মুহাম্মদ" রাখা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নবুওয়াতের দাবী করা থেকে বিরত রাখেন। তাই তারা নিজেরাও নবুওয়াতের দাবী করেন নি। অথবা তাদের কেউ নিজেকে নবী বলেও দাবী করেনি। তাদের দ্বারাও এমন ঘটনা সংঘটিত হয়নি যে-কেউ তাদেরকে নবী বলে প্রকাশ করতে।

এমনকি শেষ পর্যন্ত এ দুটি বৈশিষ্ট্যই "মুহাম্মদ" ও "আহমদ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্যই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আর এ ব্যাপারে কেউ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীও হয়নি।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِيَ الْكُفْرَ،

–আমি 'মাহী', আমার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কুফুরীকে বিলুপ্ত করে দেন।[১]

উক্ত হাদিসসমূহের ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছে যে, তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সারা আরবজাহান তথা সারা বিশ্বের কুফুরীকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। তাঁর অনুসারীদের মাধ্যমে এ যমীনের যেখানে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে সে স্থানকে তাঁর উম্মাতের নিয়ন্ত্রণে দেয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। অথবা "মাহীর" অর্থ এটাও হতে পারে যে, তাঁর বিজয় প্রবলবেগ হবে। যথা আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন–

لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِۦ

–এজন্য যে, সেটাকে অন্য সমস্ত দীনের উপর বিজয়ী করবেন।[২]

"মাহীর" এরূপ অর্থও হতে পারে যে, তাঁর মহিমান্বিত সত্তার বরকতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুসারীদের গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেবেন। আর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

১. ক) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু আসামায়িন নবী, ৫:১৪৬১।
খ) দারেমী : আস্ সুনান, বাবু ফী আসমায়িন নবী, ৩:১৮২৬।
গ) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু মা জা'আ ফী আসমায়ির রসূল, ৪:১৮৫।
ঘ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ফী আসমায়িহি, ৪:১৮২৮।
২. আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:৩৩।

وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي،

–আমার নাম 'হাশর'। আমার অধীনেই সকল মানুষকে হাশরের প্রান্তরে একত্রিত করা হবে।[১]

এর মর্মার্থ এরূপও হতে পারে যে, না আমার সময়ে, না আমার পরে, অন্য আর কোনো নবীর আগমন ঘটবেনা। তিনি বলেছেন, আমি খাতামুন নাবীয়্যান বা শেষনবী। আর তাঁর এক নাম 'আকিব' তাঁকে আকিব বলার কারণ হলো তিনি সর্বশেষ আগমন করেছেন। বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে,

أنا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ،

–"আকিব" অর্থ সর্বশেষ আগমনকারী। যারপর আর কোন নবী আসবেন না।

কেউ কেউ বলেছেন, "আমার পদযুগলে লোকদের উঠানো হবে।" এর মর্মার্থ হলো, লোকদেরকে আমার সামনে উঠানো হবে। যথা আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন–

لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

–যাতে তোমরা মানবজাতির উপর সাক্ষী হও। আর এ রাসূল তোমাদের রক্ষক ও সাক্ষী।[২]

কেউ কেউ বলেছেন, "আমার কদমের উপর" এর মর্মার্থ হলো- আমি সর্বাগ্রে আসবো। যথা আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন–

أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ

–তাদের জন্য তাদের রবর নিকট সত্যের মর্যাদা রয়েছে।[৩]

কেউ কেউ বলেছেন, عَلَى قَدَمِي "আমার কদমের উপর" এর অর্থ হলো- লোকেরা হাশর প্রান্তরে আমার নিকট সমবেত হবে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, "আমার কদমের উপর" এর মর্মার্থ আমার "সুন্নাতের উপর" প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

---

১. ক) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু আসমায়িন নবী, ৫:১৪৬১।
খ) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু মা জা'আ ফী আসমায়ির রসূল, ৪:১৮৫।
গ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ফী আসমায়িহি, ৪:১৮২৮।
২. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:১৪৩।
৩. আল কুরআন : সূরা ইউনুস, ১০:২।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণী– لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ আমি মহিমান্বিত পাঁচটি নামের অধিকারী। এর মর্মার্থ কেউ এরূপ বলেছেন যে, এ মহিমান্বিত পাঁচ নাম পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহেও পূর্ববর্তী আলেমগণ তাঁর ঐ পাঁচ নামের সাথে পরিচিত ছিলো।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি তাঁর পবিত্র দশ নাম বলেছেন। তন্মধ্যে "ত্বোয়াহা" ও "ইয়াসীন" নামদ্বয়কে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। মক্কী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, কোনো কোনো ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, 'ত্বোয়াহা' يَا طَاهِرُ (ইয়া তাহিরো) –'হে পবিত্র' কিংবা يَا هَادِيُ (ইয়া হাদী) –'হে পথপ্রদর্শক'। আর 'ইয়াসীন' يَا سَيِّدُ (ইয়া সাইয়্যিদ) –'হে সরদার'। সুলামী আল্লামা ওয়াসেতী এবং জাফর বিন মুহাম্মদ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। তাছাড়াও অন্যান্যরা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর দশ নাম বলেছেন। তন্মধ্যে পাঁচ নামের কথা প্রথমোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। অন্য পাঁচ নাম হলো–

وَأَنَا رَسُولُ الرَّحْمَةِ وَرَسُولُ الرَّاحَةِ وَرَسُولُ الْمَلَاحِمِ وَأَنَا الْمُقَفِّي قَفَّيْتُ النَّبِيِّينَ وَأَنَا قَيِّمٌ،

–(১) রহমতের রাসূল (২) প্রশান্তির রাসূল (৩) যুদ্ধকালীন দৃঢ়তার রাসূল (৪) পশ্চাতে আগমনকারী রাসূল ও (৫) পূর্ণতম রাসূল। তাঁকে অনুরূপ পেয়েছি।

কিন্তু এ বর্ণনা কেউ নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করেন নি। তবে এর চাইতে উত্তম হলো 'কুছামুন' সংক্রান্ত বর্ণনা। যার অর্থ হলো 'বন্টনকারী'। আমি এ বর্ণনা হরবী থেকে উল্লেখ করেছি। সামগ্রিকভাবে এ ব্যাখ্যা সামঞ্জস্যশীল।

আসমানী কিতাবসমূহে অনুরূপ লিপিবদ্ধ রয়েছে। হযরত দাউদ (আলাইহিস্ সালাম) আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেন,

اللهم ابْعَثْ لَنَا مُحَمَّدًا مُقِيمَ السُّنَّةِ بَعْدَ الْفَتْرَةِ،

–হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে প্রেরণ করুন যিনি 'কাইয়্যিম-এ-সুন্নাত' হবেন। যিনি ওহী বন্ধ হয়ে যাবার সুন্নাত প্রতিষ্ঠা করবেন। 'কাইয়্যিমাতি সুন্নাত' অর্থ 'সুন্নাতের প্রতিষ্ঠাতা'।

নাককাশ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করে বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

لِي فِي الْقُرْآنِ سَبْعَةُ أَسْمَاءٍ: مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَيٰس وَطٰهَ وَالْمُدَّثِّرُ وَالْمُزَّمِّلُ وَعَبْدُ اللهِ

–কুরআন মাজীদে আমার মহিমান্বিত সাতটি নাম রয়েছে। মুহাম্মদ, আহমদ, ইয়াসীন, ত্বোয়াহা, মুদ্দাসসির, মুয্যাম্মিল, আবদুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।[১]

হযরত জোবায়ির ইবনে মুতয়িম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে,

هِيَ سِتٌّ: مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَخَاتِمٌ وَعَاقِبٌ وَحَاشِرٌ وَمَاحٍ،

–ছয় নামের উল্লেখ রয়েছে। মুহাম্মদ, আহমদ, খাতিম, আকিব, হাশির, মাহী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে তার এ নামসমূহ শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَالْمُقَفِّي وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ،

–আমি মুহাম্মদ আহমদ, মুকাফফি, হাশির, নবীউত তাওবা, নাবীউল মালহামা। অপর এক বর্ণনায় এসেছে নবীউর রাহমাত (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। বর্ণনা অনুযায়ী প্রতিটি নামই বিশুদ্ধ।

"মাকফি" শব্দের অর্থ শেষাগত। আর নবীউর রাহমাত, ওয়াত তাওবাতি, ওয়ার রাহমাত, ওয়াল মারহামাত নামের উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন–

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

–এবং আমি আপনাকে রহমত করেই প্রেরণ করেছি।[১]

১. ক) শিহাবুদ্দীন : আল মাওয়াহিবিল লাদুনিয়্যাহ বিল মানহিল মাহমুদিয়্যাহ, ১:৪৪৪।
খ) আবুল হাসান নুরুদ্দীন : জামীউল ওয়াসায়েল ফী শরহিশ শামায়েল, বাবু মা জা'আ ফী আসমায়ির রাসূল, ২:১৮১।
গ) যুরকানী : শরহে যুরকানী আলা মাওয়াহিবে লাদুনি, বাবু ফী যিকরি আসামায়িশ শরীফাহ, ৪:১৬৮।

بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

–তিনি মু'মিনদের প্রতি দয়ার্দ্র ও দয়ালু।[২]

যথা আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রশংসা বর্ণনা করে বলেছেন তিনি লোকদেরকে পবিত্র করেন। তিনি মানুষকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করেন। লোকদেরকে সঠিক পথে আহবান করেন। তিনি ঈমানদারদের উপর দয়া ও করুণা প্রদর্শনকারী। إِنَّهَا أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ– আল্লাহ তা'আলা তাঁর উম্মাতকে "উম্মাতে মারহুমা" নামে ভূষিত করেছেন। অর্থাৎ ঐ উম্মাত যাদের প্রতি দয়া করা হয়েছে। এ উম্মাত সম্পর্কে এরশাদ করা হয়েছে–

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

–এবং তারা পরস্পরের মধ্যে ধৈর্য্যধারণের উপদেশবাণী প্রদান করেছে এবং পরস্পরের মধ্যে সদয় হবার উপদেশাদি দিয়েছে।[৩]

অর্থাৎ তাঁরা একে অপরের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সারা বিশ্বের জন্য রহমত করে প্রেরণ করেছেন। তিনি উম্মাতের প্রতি দয়া প্রদর্শনকারী। তাদের মাগফিরাত কামনাকারী। তিনি তাঁর উম্মাতকে "উম্মাতে মারহুমা" নামে আখ্যায়িত করেছেন। রহমতের সাথে তাঁর গুণাবলী উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর উম্মাতকেও একাজের আদেশ দান করেছেন। যেন তারা একে অপরের প্রতি দয়া করে। দয়া ও অনুকম্পাকারীদের প্রশংসা করেছেন। সুতরাং হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ وَقَالَ الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ،

–আল্লাহ তা'আলা তাঁর দয়ালু বান্দাদের মুহাব্বত করেন। আরো এরশাদ করেছেন, দয়া প্রদর্শনকারীদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা দয়া করেন। তোমরা যমীনের অধিবাসীদের প্রতি দয়া করো, তাহলে আসমানের অধিবাসী তোমাদের প্রতি অনুকম্পা প্রর্দশন করবেন।[৪]

১. আল কুরআন : সূরা আম্বিয়া, ২১:১০৭।
২. আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:১২৮।
৩. আল কুরআন : সূরা বালাদ, ৯০:১৭।
৪. যুরকানী : শরহে যুরকানী আলা মাওয়াহিবে লাদুনি, বাবু ফী যিকরি আসামায়িশ শরীফাহ, ৪:২৯৪।

এখন বাকি রইলো 'নাবীউল মুলহিমা'। এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে তরবারীর সাহায্যে লড়াই করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

এ বর্ণনাও বিশুদ্ধ। হযরত হোযাইফা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন,

ونبى الرَّحْمَةِ وَنَبِيِّ التَّوْبَةِ وَنَبِيِّ الْمَلَاحِم،

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'নাবীউর রাহমাত', 'নাবীউত তাওবা' ও 'নাবীউল মালাহিম' নামে ভূষিত হয়েছেন।

হারবী হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এক হাদিস বর্ণনা করেছেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

أَتَانِي مَلَكٌ فَقَالَ لِي أَنْتَ قُثَمٌ،

–একবার ফিরিশতা এসে আমাকে বললো– আন্তা কুছামু-আপনি সমন্বয়ক। অর্থাৎ সমগ্র পূর্ণতার সমন্বয়ক।[১]

আরো বললেন 'কুছাম' শব্দের অর্থ হলো সামগ্রিক কল্যাণ সমবেতকারী। তিনি তাঁর আহলে বাইতের মধ্যেও এ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এছাড়াও পবিত্র কুরআন মাজীদে তাঁর অনেক উপাধীর উল্লেখ রয়েছে। যথা নূর, সিরাজুম মুনীরা, মুনজির, নাজির, মুবাশশির, বাশির, শাহিদ, শহীদ, আলহক্ব, আল মুবীন, খাতামুন নাবীয়্যিন, আর-রাউফ, আর-রাহিম, আল-আমীন, কাদামু-সিদকীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, নিয়ামাতুল্লাহ, আল উরয়াতুল উসকা, আসসিরাতুল মুসতাকিম, আন-নাজমুছ ছাক্বি, আল-কারীম, আল নাবীয়্যিল উম্মি, দা'য়ী ইলাল্লাহ।

তাঁর মহান গুণ বা শানদার নির্দশনাবলীর কারণে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহেও হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদীসে অনেক গুণবাচক নামের উল্লেখ রয়েছে। যথা মুস্তাফা, মুজতবা, আবুল কাসেম, হাবিব, রাসূলু রাব্বিল আলামীন, আশ্‌শাফী, আল মুশাফফিঈ, আল মুত্তাকি, আল মুসলিহ, আযযাহির, আল মুহাইমিন, আসসাদিক, আল মাসদুক, আল হাদী, সাইয়্যিদি উলদি আদম, সাইয়্যিদিল মুরসালীন, ইমামুল মুত্তাকীন, কায়িদুল গুররিল মুহাজ্জিলীন, হাবিবুল্লাহ, খলিলুর রাহমান, ছাহিবুল হাউযিল মাওরূদ, ওয়াশ শাফায়াত, ওয়াল মাকামিল মাহমুদ। সাহিবুল উসিলাহ, ওয়াল ফযীলাহ, ওয়াদ্দারাজাতার রাফী'আ, আর

[১]. ফাসী : মুসতা'য়াযাবুল আখবার বি আতয়্যিয়াবিল আখবার, বাবুন নসবিয যুকায়িত তাহ্রি, ১:৩৫।

রাকিবুল বোরাক ওয়ান নাকাহ, আন-নাজির, সাহিবুল হুজ্জাত, আস সুলতান, আল খাতিম, আল আল্লামাহ, আল বোরহান, সাহিবুল হারাওয়াত, সাহিবুন না'লাইন (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

অনেক কিতাবে তাঁর এ নামগুলো লিপিবদ্ধ রয়েছে। যথা- আল মুতাওয়াক্কিল, আল মুখতার, মুকিমুস সুন্নাহ, আল মুকাদ্দাস, রূহুল কুদ্দুস, রূহুল হক। আর ইঞ্জিল শরীফে তাঁর নাম "ফারাকলিত" বলা হয়েছে। তা রূহুল হকের সমার্থক। সা'লাবী বলেন, "ফারাকলিত" বলা হয় তাঁকে, যিনি হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে সক্ষম। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে তাঁর নাম "মাজু" লিপিবদ্ধ হয়েছে। "মাজু" অর্থ পবিত্র।

হযরত কা'বুল আহবার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এরূপ বলেছেন।

সা'লাবী বলেন, তাঁকে "খাতিম" বলা হয়, যিনি নবীদের আগমনের ধারা সমাপ্ত করে দেন। আর "হাতিম" বলা হয় তাঁকে, যিনি আম্বিয়া কেরামের মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্ব ও আখলাক বা চারিত্রিক দিক থেকে সর্বোত্তম। হিব্রু ভাষায় তাঁর নাম "মুশাফফাহ" অর্থাৎ মুহাম্মদ ও মানহামনা (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লিপিবদ্ধ হয়েছে। অর্থাৎ রূহুল কুদস বা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাওরাতে তাঁর নাম "আহীদ" (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লিখিত হয়েছে।

হযরত ইবনে সীরীন (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর অর্থ প্রসঙ্গে বলেন, "সাহিবুল কাদীব" অর্থ তরবারিধারী। ইঞ্জিল শরীফে এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, হযরত ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) বলেছেন "তার সাথে তরবারী থাকবে"। তিনি তা দিয়ে যুদ্ধ করবেন। তাঁর উম্মাতও তরবারীর সাহায্যে যুদ্ধ করবে।

কাযী আয়ায (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আমার মনে হয় "কাদ্বীব" নামে যে লাঠির কথা বলা হয়েছে সম্ভবতঃ তা সবর্দা তাঁর হাতে থাকতো। তারপর তা তাঁর খলিফাদের হাতে এসেছে। আভিধানিক অর্থে "হারাওয়াত" বলা হয় লাঠিকে। কাযী আয়ায বলেন, আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবগত। তবে আমার মনে হয়, উক্ত নামদ্বয়ে যে লাঠির কথা বলা হয়েছে, সেই লাঠির উল্লেখ রয়েছে। হাউজের হাদীসের বর্ণনায় এসেছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

أَذُودُ النَّاسَ عَنْهُ بِعَصَايَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ،

–আমি লাঠির দ্বারা ইয়ামীনবাসীকে প্রতিহত করবো; যাতে তারা হাউজে কাউসারে আসতে না পারে। প্রথমে যারা পান করার তারা করবে। তার পর অন্যরা পান করবে।[১]

"তাজ" অর্থ পাগড়িধারী। তিনি বলেছেন, পাগড়ি হলো আরববাসীদের মুকুট। কাযী আয়ায (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) আরো বলেছেন, তাঁর উপাধিসূচক ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত অনেক নাম পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সেখান থেকে উপরোক্ত নামগুলো উল্লেখ করা যথেষ্ট হবে মনে হয়।

আর তাঁর সুপ্রসিদ্ধ কুনিয়াত বা উপনাম হলো "আবুল কাসিম"। হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁর পুত্র হযরত ইবরাহীম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) এসে তাঁকে বললেন,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا إِبْرَاهِيمَ.

–হে ইবরাহীমের পিতা, আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।[২]

---

১. শিহাবুদ্দীন : আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যাহ, বাবু ফী যিকরি আসামায়িহিশ শরীফাহ, ১:৪৭২।
২. ক) হাকেম : আল মুসতাদ্‌রাক আলাস্ সহীহাইন, কিতাবুত্ তাওয়ারিখিল মুতাকদ্দিমীন, ২:৬০৪।
খ) তকী উদ্দীন মুকরেযী : ইমতাউল আসমা'আ, বাবু ফসলী ফী যিকরি কুনিয়াতি রাসূলিল্লাহ, ২:১৪৮।
গ) শিহাবুদ্দীন : আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যাহ, বাবু ফী যিকরি ইসমিহিশ শরীফাহ, ১:৪৪৯।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

فِي تَشْرِيفِ اللهِ تَعَالَى بِمَا سَمَّاهُ بِهِ مِنْ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَوَصَفَهُ بِهِ مِنْ صِفَاتِهِ الْعُلَى

আল্লাহর তা'আলার সুন্দরতম নাম ও গুণাবলী দ্বারা হুযুরকে সম্মানিত করা প্রসঙ্গে

আল্লাহ তা'আলা কাযী আবুল ফযল আয়ায (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে সামর্থ দান করুন। এ পরিচ্ছেদ পূর্ববর্তী অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। কেননা এ অধ্যায়ও তার সাথে একই সূত্রে গাঁথা এবং সেই স্রোতধারায় মিলিত হয়েছে। যারা এ বিষয় চিন্তাশীল আল্লাহ তা'আলা তাদের গভীরভাবে অনুধাবন করার তৌফিক দান করুক, যাতে তারা এর সারমর্ম উদ্ধার করতে সক্ষম হন। যাতে তারা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের উপর চিন্তা-ভাবনা করে। এ কারণে তা এ পরিচ্ছেদে একত্রে সন্নিবেশিত করেছি এবং এর সাথে আরো অনেক বিষয়কে সমবেত করেছি। তাহলে এখন অনুধাবন করা যাবে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরাত আম্বিয়া কেরামকে বিশেষ বিশেষত্বের সাথে মনোনীত করেছেন। আর তাঁদের বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করেছেন। যথা হযরত ইসমাঈল ও হযরত ইসহাক (আলাইহিস্ সালাম) এর নাম দিয়েছেন "আলীম ও হালিম", হযরত ইবরাহীম(আলাইহিস্ সালাম)কে "হালীম" বলেছেন। হযরত নূহ (আলাইহিস্ সালাম)কে "শাকূর" বলেছেন। হযরত ঈসা ও ইয়াহিয়া (আলাইহিস্ সালাম) কে 'জাববার' বলেছেন। হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) কে বলেছেন "কারীম ও কাবী"। হযরত ইউসুফ (আলাইহিস্ সালাম) কে বলেছেন "হাফীজ ও আলীম"। হযরত আইয়ুব (আলাইহিস্ সালাম)কে বলেছেন "ছাবির"। হযরত ইসমাঈল (আলাইহিস্ সালাম) এর আরেক নাম হলো "সাদিকুল ওয়াদ"। এই নামসমূহ পবিত্র কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সে স্থানে আম্বিয়া কেরামের এ সকল নামে উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী আম্বিয়া কেরামকে যে সমস্ত মর্যাদাপূর্ণ বিভিন্ন নামে ভূষিত করেছেন অনুরূপভাবে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেও সে সকল মর্যাদাপূর্ণ বিভিন্ন উপাধীতে ভূষিত করেছেন।

কাযী আয়ায (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করার পর এ নামসমূহ একত্রিত করেছি। আমার পূর্বে আর কেউ দুটি নামের অতিরিক্ত কোনো নাম উল্লেখ করেনি। আমার জানা মতে এমন কাউকে পাইনি যে, যিনি এ সম্পর্কে দু'টি পরিচ্ছেদ লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু আমি আমার এ পরিচ্ছেদে প্রায় ত্রিশটি নামের উল্লেখ করেছি। আল্লাহ তা'আলা আমাকে এ "আসমা-এ হুসনা" বা "সুন্দরতম নামগুচ্ছ" সম্পর্কে ইলহাম করেছেন এবং এর হাকীকত সম্পর্কে

অভিহিত করেছেন। অনুরূপভাবে ঐসব কাজের বহিঃপ্রকাশকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন। যা অদ্যাবধি আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়নি। আমি এর রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছি।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার সমুন্নত "আসমা-এ হুসনার" মধ্যে এক নাম হলো "হামীদ" (حَمِيدٌ)। যার অর্থ "মাহমুদ" বা "প্রশংসিত"। কেননা আল্লাহ তা'আলা নিজেই তাঁর প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর বান্দাগণও প্রশংসা প্রকাশ করেছে।

তিনি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নাম রেখেছেন 'মুহাম্মদ' (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও 'আহমদ' (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। মুহাম্মদ শব্দও "মাহমুদ" বা "প্রশংসিত" অর্থে এসেছে। আর "আহমদ" শব্দের অর্থ হলো- তিনি প্রশংসাকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম প্রশংসাকারী। আর যাদের প্রশংসা করা হয়েছে, তাদের মধ্যে তিনিই সর্বোচ্চ মনোনীত ও মহিমান্বিত। আর আরবী কবি হাসসান বিন ছাবিত (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর গুনকীর্তনের প্রতি ইঙ্গিত করে এরশাদ করেছেন-

وَشَقَّ لَهُ مِنَ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ ... فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ

-আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের নাম থেকে তাঁর হাবীবের নাম বের করেছেন। যার ফলে সে নামকে মর্যাদাপূর্ণ করেছেন। সুতরাং আরশের অধিপতি হলেন মাহমুদ, আর তিনি হলেন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

আল্লাহ তা'আলার "আসমা-এ হুসনার" আরেক নাম (رَؤُوفٌ) 'রাউফ' ও (رَحِيمٌ) 'রাহিম'। উভয় শব্দই প্রায় সমার্থক বোধক। আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে কুরআন মাজীদে এ মহিমান্বিত নামে সম্বোধন করেছেন। কুরআন মাজীদে এরশাদ করা হয়েছে-

بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

-মুসলমানদের উপর পূর্ণ দয়াদ্র ও দয়ালু।[১]

আল্লাহ তা'আলার "আসমা-এ হুসনার" মধ্যে আরেক নাম হলো- اَلْحَقُّ الْمُبِيْنُ "আল-হাক্কুল মুবিন"। হক শব্দের অর্থ হলো বিদ্যমান। যার আদেশ প্রমাণিত হয়েছে। আর "মুবিন" বলা হয় তাকে যার নির্দেশ উজ্জ্বল ও প্রকাশিত হয়েছে।

[১]. আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:১২৮।

প্রকাশ থাকে যে, তাঁর উপাস্য হওয়ার দলিল প্রমাণ প্রকাশিত হয়েছে। "বান ও আবান" সমঅর্থবোধক। এর আরেক অর্থ হলো যে, তিনি তাঁর বান্দাদের ইহ ও পরকালীন মুয়ামালাত প্রকাশ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেও এ মহিমান্বিত নামে ভূষিত করে কুরআন মাজীদে এরশাদ করা হয়েছে-

حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ

-এ পর্যন্ত যে তাদের নিকট সত্য ও সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল আগমন করেন।[১]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে-

وَقُلْ إِنِّيٓ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴿٨٩﴾

-এবং বলুন আমিই হই সুস্পষ্ট সর্তককারী।[২]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে-

قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ

-তোমাদের নিকট তোমাদের রবর নিকট থেকে হক (সত্য) এসেছে।[৩]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে-

فَقَدْ كَذَّبُوا۟ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ

-অতঃপর নিঃসন্দেহে তারা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে যখন তাদের নিকট এসেছে।[৪]

কেউ বলেছেন এখানে 'সত্য' অর্থ হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আবার কেউ বলেছেন, কুরআন মাজীদ। এখানে হকের অর্থ হলো, যা মিথ্যা বা বাতিলের বিপরীত। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সত্যবাদিতা সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর রিসালাত প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট।

[১]. আল কুরআন : সূরা যুখরুফ, ৪৩:২৯।
[২]. আল কুরআন : সূরা হিজর, ১৫:৮৯।
[৩]. আল কুরআন : সূরা ইউনুস, ১০:১০৮।
[৪]. আল কুরআন : সূরা আন'আম, ৬:৫।

আর "মুবীন" বলা হয় তাঁকে, যিনি রিসালাতের বিধান প্রকাশক। এর অর্থ হলো তাঁকে যা কিছু দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, তিনি সে সব কিছুই প্রকাশ করেছেন। যথা- কুরআন মাজীদে এরশাদ করা হয়েছে-

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

-যেন আপনি লোকদের নিকট বর্ণনা করেন যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে।[১]

আল্লাহ তা'আলার সুন্দরতম নামসমূহের আরেক নাম হলো- (نُوْرٌ) 'নূর'। এর এক অর্থ হলো- নূরের অধিকারী, নূরের স্রষ্টা, আসমান ও যমীনকে নূরের মাধ্যমে আলোকিতকারী। বিশ্ববাসীদের অন্তরসমূহ হিদায়াতের নূর দ্বারা প্রজ্জ্বলনকারী। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে এরশাদ করেছেন-

قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَٰبٌ مُّبِينٌ

- নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব।[২]

কেউ বলেছেন, এখানে 'নূর' অর্থ হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। অপর এক দলের অভিমত হলো, নূর অর্থ কুরআন মাজীদ।

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে-

وَسِرَاجًا مُّنِيرًا

-আর আলোকোজ্জ্বল সূর্যরূপে।[৩]

এর কারণ হলো, তিনি আল্লাহ তা'আলার আদেশকে প্রোজ্জ্বল করেছেন। তাঁর নবুওয়াত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ঐশী বাণীর মাধ্যমে আরিফগণের হৃদয় করেছেন আলোকিত। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে 'সিরাজাম মুনিরা' উপাধীতে ভূষিত করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার সুন্দরতম নামের আরেক নাম হলো (شَهِيْدٌ) "শাহীদ"। শাহীদ শব্দের অর্থ হলো- আলিম বা জ্ঞাত। কেউ বলেছেন এর অর্থ হলো- তিনি

[১]. আল কুরআন : সূরা নাহল, ১৬:৪৪।
[২]. আল কুরআন : সূরা মায়িদা, ৫:১৫।
[৩]. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৪৬।

কিয়ামতের মাঠে মানুষদের সাক্ষী হবেন। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নামও রেখেছেন, 'শাহীদ' ও 'শহীদ'। যেমন- কুরআন মাজীদে এরশাদ করা হয়েছে-

إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا

-নিশ্চয়ই আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি উপস্থিত প্রত্যক্ষকারী করে।[১]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে-

وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

-আর এ রাসূল তোমাদের রক্ষক ও সাক্ষী।[২]

আল্লাহ তা'আলার সুন্দরতম আরেক নাম হলো (اَلْكَرِيْمُ) "কারীম"। এর অর্থ হলো, অধিক কল্যাণকারী। কেউ বলেছেন, ইহসানকারী বা অধিক অনুগ্রহকারী। কেউ বলেছেন, ক্ষমাকারী। কেউ বলেছেন, সমুন্নত। হাদীসে আল্লাহ তা'আলার নাম اَلْأَكْرَمُ "আকরাম" লিপিবদ্ধ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেও "কারীম" নামে আখ্যায়িত করেছেন। যথা কুরআন মাজীদে এরশাদ করা হয়েছে-

إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝

-নিশ্চয় এটা সম্মানিত প্রেরিতের বাণী।[৩]

কেউ বলেছেন, এখানে 'রাসূলুন কারীম' অর্থ হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আর একদলের অভিমত হলো- হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম)। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

أَنَا أَكْرَمُ وُلْدِ آدَمَ،

-আমি আদম সন্তানদের মধ্যে অধিক সম্মানিত। আর "আকরাম ও মুকাররাম" এর গুণ শুধু তাঁরই মধ্যে বিদ্যমান ছিলো।

[১]. আল কুরআন : সূরা ফাতাহ, ৪৮:৮।
[২]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:১৪৩।
[৩]. আল কুরআন : সূরা তাকভীর, ৮১:১৯।

আল্লাহ তা'আলার সুন্দরতম আরেক নাম হলো- (اَلْعَظِيْمُ) "আজীম"। আজীম অর্থ, অতি মহান। যিনি এইগুণে ভূষিত হন তাঁর মর্যাদা সকলের উর্ধ্বে। তাঁর মুকাবিলায় অন্যরা হলো অতি তুচ্ছ ও হীন। আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে এরশাদ করেছেন–

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝

–এবং নিশ্চয়ই আপনার চরিত্র তো মহা মর্যাদারই।[১]

আর তাওরাত শরীফের প্রথম খণ্ডে হযরত ইসমাঈল (আলাইহিস্ সালাম) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, "অচিরেই আল্লাহ তা'আলা এক মহান সত্ত্বাকে এক মহান উম্মাতের জন্য সৃষ্টি করছেন। তাঁর সত্তা যেমন আজীম বা মহান, তাঁর গুণাবলীও তেমনি আজীম। গুণাবলী আজীম হলে সত্তাতো আজীম হবেই"। আল্লাহ তা'আলার সুন্দরতম নামসমূহের মধ্যে আরেক নাম হলো- (جَبَّارٌ) 'জাববার'। এর অর্থ হলো- সংশোধনকারী, অধিকতর কল্যাণকারী। কেউ বলেছেন- (مُتَكَبِّرٌ) মুতাকাব্বির বা গৌরবান্বিত। হযরত দাউদ (আলাইহিস্ সালাম) এর কিতাব যাবুর শরীফে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে "জাববার" নামে অভিহিত করা হয়েছে। হযরত দাউদ (আলাইহিস্ সালাম) বলেছেন, হে "জাববার" আপনি আপনার তরবারী অঙ্গে ধারণ করুন। কেননা আপনার রিসালাত শরীয়াত আপনার আত্ম-মর্যাদা ও শক্তির সঙ্গে সম্মিলিত। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নাম "জাববার" হওয়াই সঙ্গত। কেননা তিনি পথপ্রদর্শক ও শিক্ষার মাধ্যমে উম্মাতকে সংশোধন করেছেন। বল প্রয়োগের মাধ্যমে শত্রুদের করেছেন পরাভূত। সকল মানুষের চেয়ে তাঁর মর্যাদা মহান ও শ্রেষ্ঠ। তাঁর বিরোধিতাকারীদের জন্য ছিলেন প্রবল পরাক্রান্ত। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহান সত্তার জন্য অহংকারকে অসমীচিন করেছেন। কেননা এটা তাঁর অন্যান্য সাধারণ মর্যাদা ও অবস্থার জন্য শোভনীয় নয়। তাই কুরআন মাজীদে এরশাদ করা হয়েছে–

وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ ۖ فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ

–এবং আপনি তাদের উপর কিছুই জবরদস্তিকারী নন, সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে কুরআন দ্বারা উপদেশ দিন।[২]

[১]. আল কুরআন : সূরা ক্বালাম, ৬৮:৪।
[২]. আল কুরআন : সূরা ক্বাফ, ৫০:৪৫।

আল্লাহ তা'আলার সুন্দরতম নামসমূহের আরেক নাম হলো– (خَبِيْرٌ) "খাবীর"। "খাবীর" অর্থ– যিনি বস্তুসমূহের প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে অবগত। আবার কেউ কেউ বলেছেন, বস্তুসমূহের প্রকৃততত্ত্ব সম্পর্কে সংবাদদানকারী। পবিত্র কুরআন মাজীদে এরশাদ করা হয়েছে–

ٱلرَّحْمَٰنُ فَسْـَٔلْ بِهِۦ خَبِيرًا

–তিনি বড়ই দয়ালু। সুতরাং কোন অবগত জনকে তাঁর প্রশংসা জিজ্ঞাসা করো।[১]

কাযী বকর বিন আলা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন, নবী নয় এমন ব্যক্তিকে বলা হয়েছে সে যেনো অবগত জন "খাবীর" বা "জ্ঞানী" নবীকে জিজ্ঞেস করে। অপর এক দলের অভিমত হলো, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলেন প্রশ্নকারী। কেননা তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট আবেদনকারী। সুতরাং উভয় দিক থেকেই হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খাবীর।

এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মারিফাতের গোপন বিষয়ের মহান জ্ঞান দান করেছেন। তাই তিনি পূর্ণ জ্ঞান-প্রজ্ঞার অধিকারী। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করেছেন। আর তাঁকে সে সম্পর্কে উম্মাতকে অবহিত করার অনুমতিও দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার সুন্দরতম নামসমূহের মধ্যে আরেক নাম হলো– (فَاتِحٌ) "ফাতিহ"। এর অর্থ হলো- তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে আদেশ দানকারী। অথবা তিনি রিজিক ও রহমতের দ্বার উম্মোচনকারী। আর ঐ সমস্ত বিষয় যা বান্দাদের জন্য অবরুদ্ধ হয়ে আছে তা উম্মোচনকারী। অথবা আরেক অর্থ এরূপ হতে পারে যে, তিনি অন্তর্দৃষ্টি ও আধ্যাত্মিকভাবে রহস্যাবলী উম্মোচনকারী। আরেক অর্থ সাহায্যকারীও হয়। যথা কুরআন মাজীদে এরশাদ করা হয়েছে–

إِن تَسْتَفْتِحُوا۟ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ ۖ

–হে কাফিরগণ! যদি তোমরা মীমাংসা চাও, তবে এ মিমাংসা তোমাদের নিকট এসেছে।[২]

[১]. আল কুরআন : সূরা ফুরকান, ২৫:৫৯।
[২]. আল কুরআন : সূরা আনফাল, ৮:১৯।

কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফাতিহ, বিজিত ও সাহায্যের আধার। আর মিরাজের দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে (فَاتِحٌ) "ফাতিহ" নামে সম্বোধন করেছেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহ্ তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَجَعَلْتُكَ فَاتِحًا وَخَاتِمًا،

—হে রাসূল! আমি আপনাকে ফাতিহ ও খাতিম বানিয়েছি।[১]

আর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে বলেছেন,

وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا،

—আল্লাহ তা'আলা আমার আলোচনাকে সমুন্নত করেছেন। আর আমাকে করেছেন ফাতিহ ও খাতিম।[২]

এখানে "ফাতিহ" শব্দ "হাকিম" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এখানে এর অর্থ হলো, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উম্মাতের জন্য আল্লাহ তা'আলার দ্বার উন্মোচনকারী। তিনি ঈমান ও মারিফাত লাভের জন্য উম্মাতের অন্তর উন্মোচনকারী ও তাদের দিব্যদৃষ্টি দানকারী। অথবা আরেক অর্থ এরূপও হতে পারে যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মাতের সাহায্যকারী। অথবা উম্মাতের পথপ্রর্দশনের সূচনাকারী। এদিক থেকে তিনি সমস্ত আম্বিয়া কেরাম থেকে অগ্রগামী ও সকলের খাতিম বা সমাপ্তকারী। যেমন– হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

كُنْتُ أول الأنبياء في الخلق، وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ.

—সৃষ্টিগত দিক দিয়ে আমি সকল নবীদের প্রথম আর আবির্ভাবের দিক থেকে সকলের শেষ।[৩]

---

[১] ক) বাযযার : আল মুসনাদ, বাবু মুনসাদে আবী হামযা, ১৭:১১।
খ) বায়হাকী : দালায়িলুন নবুয়্যাত, ২:৪০৩।

[২] ক) বাযযার : আল মুসনাদ, বাবু মুনসাদে আবী হামযা, ১৭:৮।
খ) বায়হাকী : দালায়িলুন নবুয়্যাত, ২:৪০১।

[৩]. ইয়াহয়া ইবনে আমের হিরযী : বাহজাতুল মাহাফিল ওয়া বাগিয়াতুল আমাসিল, বাবু ওয়া আম্মা মা মাহাদিল্লাহি লাহু, ১:১৩।

আর হাদিসসমূহে আল্লাহ তা'আলার (شَكُوْرٌ) "শাকূর" নাম এসেছে। এর অর্থ অল্প আমলে অধিক বিনিময়কারী।

কেউ কেউ বলেছেন, আনুগত্য প্রকাশকারী ও প্রশংসাকারী। যেমন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী হযরত নূহ (আলাইহিস্ সালাম) এর প্রশংসায় এরশাদ করেছেন–

إِنَّهُۥ كَانَ عَبۡدًا شَكُورًا

—নিশ্চয় সে বড় কৃতজ্ঞ বান্দা ছিলো।[১]

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর একটি গুণ সম্পর্কে এরশাদ করেছেন–

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا،

—আমি কি শোকরকারী বা কৃতজ্ঞ বান্দা হবোনা?

অর্থাৎ তিনি আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের স্বীকৃতিদানকারী এবং তার তাৎপর্য যথার্থ মূল্যায়নকারী। তদুপরি তিনি প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী। আর তা বেশি বেশি পরিমাণ অর্জনকারী। যেমন, কুরআন মাজীদে এরশাদ করা হয়েছে–

لَئِن شَكَرۡتُمۡ لَأَزِيدَنَّكُمۡ

—যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি তোমাদেরকে আরো অধিক দেবো।[২]

আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের মধ্যে আরো রয়েছে- (عَلِيْمٌ) 'আলীম', (عَلَّامٌ) 'আল্লাম' ও (عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ) 'আল্লামুল গায়িবী ওয়াশ শাহাদাহ'। আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রশংসায় ইলম শব্দে প্রকাশ করেছেন। আর তাঁকে অধিকতর জ্ঞান দান করে প্রজ্ঞাবান হবার মর্যাদা দান করেছেন। যেমন, এরশাদ করা হয়েছে–

وَعَلَّمَكَ مَا لَمۡ تَكُن تَعۡلَمُۚ وَكَانَ فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكَ عَظِيمًا

খ) সাদেক ইবনে মুহাম্মদ ইব্রাহীম : খাসায়েসুল কুবরা, ১:৬৪।

[১]. আল কুরআন : সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:৩।

[২]. আল কুরআন : সূরা ইব্রাহীম, ১৪:৭।

–হে মাহবুব! যে বিষয় আপনার জানা ছিলো না আল্লাহ আপনাকে সেই বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন এবং আপনার উপর আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রয়েছে।[১]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করেছেন–

وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا۟ تَعْلَمُونَ

–এবং তিনি তোমাদেরকে কিতাব ও পরিপক্ক জ্ঞান শিক্ষা দেন, আর তোমাদের সেই শিক্ষাদান করেন, যার জ্ঞান তোমাদের ছিলোনা।[২]

আল্লাহ তা'আলার নামগুচ্ছের মধ্যে আরো রয়েছে (أَوَّلُ) 'আউয়াল' ও (آخِرُ) 'আখির'। এ দু'শব্দের অর্থ হলো তিনি সৃষ্টিজগত অপেক্ষা অগ্রগামী। আর সমস্ত সৃষ্টিজগত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও তিনি থাকবেন। প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ তা'আলার কোনো "আউয়াল" বা শুরু নেই। "আখির" বা শেষও নেই। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

كُنْتُ أول الأنبياء في الخلق، وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ.

–আমি সৃষ্টি হিসেবে সকল নবীদের প্রথম এবং আগমনের দিক থেকে সকলের শেষ।

তাঁর এ কথার ব্যাখ্যা কুরআন মাজীদে এভাবে এরশাদ করা হয়েছে–

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَـٰقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ

–হে মাহবুব! স্মরণ করুন, সেই সময়ের কথা যখন আমি নবীগণের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি এবং আপনার নিকট থেকে এবং নূহ।[৩]

আলোচ্য এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কথা প্রথমে উল্লেখ করেছেন। তাঁর একথার প্রতি ইঙ্গিত করে হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন,

[১]. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:১১৩।
[২]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:১৫১।
[৩]. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৭।

نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ،

–আমরা উম্মাতে মুহাম্মদী শেষ এবং অগ্রগামীও।

এ প্রসঙ্গে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

أَنَا أَوَّلُ من تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُ وَأَوَّلُ من يَدْخُلُ الجنة أول شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ،

–আমিই হাশরের দিন সর্বপ্রথম কবর থেকে উত্থিত হবো। সর্বপ্রথম আমিই জান্নাতে প্রবেশ করবো। সর্বপ্রথম আমারই শাফায়াত কবুল করা হবে।

তিনি "খাতামুন নবীয়্যিন" ও আখিরী রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। একথা প্রমাণিত সত্য।

আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের মধ্যে (قَوِيٌ) 'কভী' ও (ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ) 'যুলকুওয়্যাতিল মাতীন' দু' নামও রয়েছে। এর অর্থ "ক্ষমতাধর"। আর আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেও এ দু'নামে বিশেষিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন মাজীদে এরশাদ করা হয়েছে–

ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾

–যিনি শক্তিশালী আরশাধিপাতির নিকট সম্মানিত।[১]

কেউ বলেছেন, এখানে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ বলেছেন, হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) কে বুঝানো হয়েছে।

হাদীসে আল্লাহ তা'আলার এক নাম "আসসাদিক" (اَلصَّادِقُ) বলা হয়েছে। আর হাদীসে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেও اَلصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ "আসসাদিকুল মাসদূক" গুণবাচক নামে ভূষিত করা হয়েছে।

আর আল্লাহ তা'আলার সুন্দরতম নামসমূহের মধ্যে আরও দু'নাম হলো اَلْوَلِيُّ 'আল ওয়ালী' ও اَلْمَوْلَى 'আল মাওলা'। এর অর্থ হলো সাহায্যকারী। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে এরশাদ করেছেন–

[১]. আল কুরআন : সূরা তাকভীর, ৮১:২০।

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ

–নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হলেন তোমাদের অলি।[১]

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন–

أَنَا وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ،

–আমি মু'মিনদের অলি।

অপর আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

ٱلنَّبِىُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ

–এ নবী মুসলমানদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক মালিক।[২]

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন–

من كُنْتُ مَوْلَاهُ، فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ،

–আমি যার প্রিয়জন ও সাহায্যকারী, আলীও তাঁর প্রিয়জন ও সাহায্যকারী।

আল্লাহ তা'আলার সুন্দরতম নামের আরেক নাম হলো, عَفُوٌّ 'আফভু'। যার অর্থ ক্ষমাকারী। কুরআন মাজীদ ও তাওরাত শরীফে আল্লাহ তাঁর বিশেষত্বের কথা উল্লেখ করে তাঁকে ক্ষমা করার হুকুম দিয়েছেন। যেমন, এরশাদ করা হয়েছে–

خُذِ ٱلْعَفْوَ

–আপনি ক্ষমাপরায়ণতা গ্রহণ করুন।[৩]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱصْفَحْ

–সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন।[১]

---

১. আল কুরআন : সূরা মায়েদা, ৫:৫৫।

২. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৬।

[সহীহ বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে– হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন, আমি মুসলমানদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক মালিক। সুতরাং যদি কোনো মুসলমান ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যায় এবং সে ঋণ পরিশোধ করতে অসমর্থ হয়, তাহলে তার ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। যদি সে ধন-সম্পদ রেখে মারা যায় তাহলে তার পরিত্যক্ত সম্পদ হলো তার উত্তরাধিকারীদের। এর কারণ হলো তিনি প্রত্যেক মুমিনের মালিক। আর প্রত্যেক মুমিনের উপর তাঁর অধিকার রয়েছে।]

৩. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭:১৯৯।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) কে এর মর্মার্থ জিজ্ঞেস করলে, হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) বললেন, আপনি আপনার উপর নির্যাতনকারীদের ক্ষমা করে দিন। তাওরাত ও ইঞ্জিল শরীফে তাঁর গুণাবলীর কথা এভাবে বলা হয়েছে, তিনি কর্কশভাষী ও রূক্ষ স্বভাবের নন। তিনি ক্ষমাকারীও মার্জনাকারী হবেন।

আল্লাহ তা'আলার সুন্দরতম নামসমূহের মধ্যে আরও এক নাম হলো هَادِيُّ 'হাদী'। এর অর্থ তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাঞ্চাকারীকে সমর্থনদানকারী। আর এ সমর্থনের মাধ্যমে বান্দাকে পথপ্রদর্শক। নিদর্শন, দো'য়া বা আহবান অর্থেও এ শব্দ ব্যবহৃত হয়।

এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে এরশাদ করা হয়েছে-

وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَـٰمِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾

–এবং আল্লাহ শান্তির নিবাসের দিকে আহবান করেন এবং তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথের সন্ধান দান করেন।[২]

আর হিদায়াত বা সরল পথের সকল অর্থের মূল হলো, মনোযোগী হওয়া। কেউ কেউ বলেছেন, 'তাকদীম' অর্থাৎ আগে পৌছানো। "তোয়াহা" এর ব্যাখ্যায়ও "হাদী" বা পথের সন্ধানদানকারী বলা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে, হে 'পবিত্র'! হে 'হাদী'! বা হে পথের সন্ধানদানকারী! আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে 'হাদী' বা পথের সন্ধানদানকারী উপাধীতে ভূষিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে এরশাদ করা হয়েছে-

وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

–এবং নিশ্চয় আপনি অবশ্যই মানুষকে সরল পথ নির্দেশ করেন।[৩]

---

১. আল কুরআন : সূরা মায়িদা, ৫:১৩।

২. আল কুরআন : সূরা ইউনুস, ১০:২৫।

৩. আল কুরআন : সূরা শুরা, ৪২:৫২।

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ

–এবং তিনি আল্লাহর প্রতি তাঁর নিদের্শে আহবানকারী।[১]

সুতরাং হাদী শব্দের প্রথমে বর্ণিত অর্থ আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট।[২]

যেমন এরশাদ করা হয়েছে-

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ

–নিশ্চয় এটা নয় যে, আপনি যাকেই নিজ থেকে চান হিদায়াত করবেন, হ্যাঁ আল্লাহই হিদায়াত দান করেন যাকে চান।[৩]

আর دَلَالَةٌ (পথ প্রদর্শন) শব্দটি প্রয়োগের দিক থেকে আল্লাহ তা'আলা ছাড়াও অন্যের জন্য প্রযোজ্য হয়।

আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের মধ্যে (مُؤْمِنٌ) 'মুমিন ও (مُهَيْمِنٌ) মুহাইমিন'। এ দু'নামও রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, উভয় নামই সমার্থবোধক। আল্লাহ তা'আলার দিক থেকে মুমিন শব্দের অর্থ হলো তিনি বান্দাদের সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছেন সে অঙ্গীকার পূরণে ও সঠিক বক্তব্য সত্যায়নে সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন। এর এক অর্থ তিনি তাঁর সত্তার ব্যাপারে একক বক্তব্য দানকারী।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, "তিনি দুনিয়াতে তাঁর বান্দাদেরকে অত্যাচার থেকে আর আখিরাতে মুমিনদেরকে আযাব থেকে নিরাপত্তাদানকারী"। কেউ কেউ বলেছেন, "মুহাইমিন" মুমিন শব্দের তাসগীর বা ক্ষুদ্র আকৃতি 'হামযা' অক্ষরকে 'হা' দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। তাই মুহাইমিন বলা হয়েছে। মুমিনদের দো'য়ার মধ্যে আমীন বলাও আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের এক নাম। এর অর্থ "নিরাপত্তাদানকারী"।

কেউ কেউ বলেছেন, "মুহাইমিন" অর্থ বিশ্বাসভাজন, সাক্ষ্যদাতা ও রক্ষক। আর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নামও আমীন, মুহাইমিন ও মুমিন

[১]. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩:৪৬।
[২]. অর্থাৎ তৌফিক বা সামর্থ আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট। কেননা আল্লাহ তা'আলার তৌফিক বা সামর্থ ব্যতীত কেউ কাউকে সরল পথের সন্ধান দান করতে পারেনা। আর রাসূল আল্লাহর প্রদত্ত সামর্থে সৎ পথের দিশা দেন।
[৩]. আল কুরআন : সূরা ক্বাসাস, ২৮:৫৬।

ছিলো। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে "আমীন" উপাধীতে ভূষিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে এরশাদ করা হয়েছে-

مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾

–সেখানে তাঁর আদেশ পালন করা হয়। যিনি আমানতদার।[১]

আর তিনি নবুওয়াতপ্রকাশের পূর্বে এবং পরে "আমীন" উপাধীতে ভূষিত ছিলেন। আর হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) স্বরচিত কবিতায় তাকে "মুহাইমিন" উপাধীতে ভূষিত করেছেন।

ثُمَّ اغْتَدَى بَيْتُكَ الْمُهَيْمِنُ مِنْ ... خِنْدَفَ عَلْيَاءَ تَحْتَهَا النُّطُقُ

–তাঁর বংশ মর্যাদা এরূপ উচ্চ যে, তিনি খন্দফের বংশধর। তাঁর এ বংশ গৌরব তাঁকে এতো সমুন্নত মর্যাদায় পৌছে দিয়েছে যার মুকাবিলায় পাহাড়ের সুউচ্চ চূড়াও ম্লান হয়ে আছে।

কেউ কেউ বলেছেন, "মুহাইমিন" শব্দের অর্থ "বিশ্বাসভাজন"।

খাত্তাবী ও ইমাম আবুল কাসেম কুশাইরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে এরূপ বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে এরশাদ করা হয়েছে-

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ

–আল্লাহর উপর ঈমান আনেন এবং মুমিনদের কথায় বিশ্বাস করেন।[২]

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

أَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي

–আমি আমার সহচরদের নিরাপদ আশ্রয়।[৩]

আল্লাহ তা'আলার সুন্দরতম নামের আরেক নাম (قُدُّوسٌ) 'কুদ্দুস'। এর অর্থ হলো– সমস্ত ক্ষতি দোষত্রুটি ও অপবিত্রতার সাথে মিলিত হওয়া থেকে পবিত্র।

[১]. আল কুরআন : সূরা তাকভীর, ৮১:২১।
[২]. আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:৬১।
[৩]. ক) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু হাদীসে আবী মূসা, ৩২:২৬৫।
খ) ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, বাবু যিকরিল বয়ানি বি আন্নাল্লাহা তা'আলা, ১৬:২৩৫।

আর বায়তুল মুকাদ্দাসকে 'বায়তুল মুকাদ্দাস' বলার কারণ হলো তা গুনাহ থেকে পবিত্র স্থান। সেই দিক থেকে তাকে "ওয়াদিউল মুকাদ্দাস" বা পবিত্র স্থান এবং "রুহুল কুদুস" বা পবিত্র আত্মাও বলা হয়। পূববর্তী আম্বিয়া কেরামের উপর অবতীর্ণ কিতাবসমূহে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে 'আল মুকাদ্দাস' নামে ভূষিত করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে তিনি সকল প্রকার ত্রুটি ও ক্ষতি থেকে পবিত্র। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন মাজীদে এরশাদ করা হয়েছে–

لِّيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

–যাতে আল্লাহ আপনার কারণে পাপ ক্ষমা করে দেন, আপনার পূববর্তীদের এবং আপনার পরবর্তীদের।[১]

অর্থাৎ তিনি এমনি এক মহান সত্তা যার মাধ্যমে গোনাহসমূহ থেকে পবিত্রতা লাভ করা যায়। আর তাঁর অনুসরণের উসিলায় পবিত্রতা অর্জন করা যায়। সে কারণে পবিত্র কুরআন মাজীদে এরশাদ করা হয়েছে–

يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ

–তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর পথে নিয়ে আসেন।[২]

অথবা মুকাদ্দাস বলার অর্থ হলো, তিনি (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সকল প্রকার নিন্দনীয় অভ্যাস এবং অসুন্দর স্বভাব থেকে পবিত্র।

আল্লাহ তা'আলার সুন্দরতম নামের মধ্যে (عَزِيزٌ) 'আযীয'ও এক নাম। এর অর্থ এমন পরাক্রমশালী সত্তা, সে পর্যন্ত কেউ পৌছতে পারেনা। আর তিনি সবার উপর প্রতাপশালী। অথবা এমনি এক সত্তা যিনি অতুলনীয়। অথবা এমনি এক সত্তা যিনি অন্যকে ইজ্জতদানকারী। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে এরশাদ করা হয়েছে–

وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ

–আর সম্মান তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের।[৩]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর সুন্দরতম নামসমূহের মধ্যে সুসংবাদ ভীতিপ্রদর্শনকারীও রেখেছেন। যথা কুরআন মাজীদে এরশাদ করা হয়েছে–

[১]. আল কুরআন : সূরা ফাতাহ, ৪৮:২।
[২]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:২৫৭।
[৩]. আল কুরআন : সূরা মুনাফিকুন, ৬৩:৮।

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَٰنٍ

–তাদের রব তাদেরকে সুসংবাদ শুনাচ্ছেন স্বীয় দয়া ও আপন সন্তুষ্টির।[১]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ

–নিশ্চয় আল্লাহ আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহইয়ার, যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা কালেমার সত্যায়ন করবে।[২]

হযরত ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) এর সুসংবাদও শুনানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে 'বাশির ও নাযির' উপাধীতে ভূষিত করেছেন। অর্থাৎ তিনি আনুগত্য প্রকাশকারীদের জন্য সুসংবাদদানকারী। আর অবাধ্যদের জন্য ভীতিপ্রদর্শনকারী।

কোনো কোনো তাফসীরবেত্তা বলেছেন, "তোয়াহা ও ইয়াসিন" এ দু'নামও আল্লাহ তা'আলার নামের অন্তর্ভুক্ত। আর কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, এই দু'নাম হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নামের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সম্মানিত মু'জিযা দান করুক।

[১]. আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:২১।
[২]. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:৩৯।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

إِسْتِدْرَاكٌ فِيْ صِفَاتِ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوْقِ

স্রষ্টা ও সৃষ্টির গুণাবলী প্রসঙ্গে সন্দেহের অপনোদন

আল্লাহ তা'আলা কাযী আয়ায (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কে সৌভাগ্যমণ্ডিত করুন। তিনি বলেন, আমি এখন এমন একটি অতি সুক্ষ্ম বিষয়ের রহস্য উন্মোচন করার মাধ্যমে এ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করবো এবং এ বিষয়ের আলোচনা শেষ করবো যাতে দূর্বল চিত্ত ব্যক্তিদের মনে যেনো কোনো প্রকার সন্দেহের উদ্রেক না হয়। আলোচনায় তাদের সে দুর্বলতা দূর হয়ে যাবে যাতে তারা অযথা সন্দেহ পোষণ করা থেকে বিরত থাকতে পারে।

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহত্ব, উচ্চতার ক্ষেত্রেও পরাক্রমশীলতায়, সুন্দরতম নাম ও সমুন্নত মর্যাদার গুণে সকল প্রকার সাদৃশ্যে অতুলনীয়। তিনি কারো সাথে তুলনা করার যোগ্যও নহেন। তিনি অতুলনীয়। নিঃসন্দেহে বলা যায় শরীয়াতের দৃষ্টিতে স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কে তা বলা হয়েছে। তাদের উভয়ের মধ্যে প্রকৃত অর্থে কোনো প্রকার সাদৃশ্যতা হতেই পারেনা। অর্থাৎ তিনি চিরন্তন, চিরঞ্জীব, আদি, অন্তহীন। তাঁর গুণাবলী কখনো সৃষ্টিজীবের কোনো সত্তার সাথে সাদৃশ্য পূর্ণ হতে পারে না। অনুরূপভাবে তাঁর গুণাবলীও সৃষ্টিজীবের গুণাবলীর সাথে সাদৃশ্যহীন। কেননা সৃষ্টিজীবের জীবন যে-কোনো প্রকার গুণাবলী দোষত্রুটি মুক্ত নয়। তিনি সকল প্রকার ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এ প্রসঙ্গে এটাই যথেষ্ট।

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

–তার সমতুল্য কিছুই নেই।[১]

সত্যপন্থি আলেমগণ এ সম্পর্কে কত সুন্দর করে বলেছেন, একক সত্তাকে প্রমাণ করার নাম হলো– তাওহীদ। তিনি কোনো সত্তার, গুণাবলীর দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে আনুরূপ্য হীন। এসূক্ষ্ম রহস্যের ভেদ উন্মোচনকারী হলেন আল্লামা ওয়াসেতী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)। আমিও সেই কথাই স্পষ্ট করে বলতে চাই। আল্লামা ওয়াসেতী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এমন এক মহান অতুলনীয় সত্তা, নাম, গুণাবলী, কার্যাবলী, কোনো বিষয়েই কেউ তাঁর অংশীদার নয়। সমতুল্যও নয়। বাহ্যত তাঁর নাম ও গুণাবলীর সাথে যতোই

[১]. আল কুরআন : সূরা শুরা, ৪২:১১।

সাদৃশ্যতা ও আনুরূপ্য পরিলক্ষিত হোক না কেনো, আল্লাহ চিরন্তন ও অন্তহীন এবং তাঁর গুণাবলী নতুনত্বের কলঙ্কে কলংকিত নয়। অনুরূপ তাঁর গুণাবলীও কখনো ধ্বংস হবার নয়। কারণ সৃষ্টির গুণাবলী আনুষঙ্গিক বা প্রতিবিম্বজাত। এটাই হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা ও চূড়ান্ত বিশ্বাস।

ইমাম আবুল কাসেম কুশাইরি (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এ বিষয় আরো অধিক স্পষ্ট করে বলেছেন। এ বিশ্বাস বা আকিদা তাওহীদ বা একত্ববাদের মূল ভিত্তি। কারণ আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা নতুনত্বের কালিমা লিপ্ত সৃষ্টির সাদৃশ্য হতে পারে কিভাবে? তাঁর মহান সত্তা অমুখাপেক্ষী। তাঁর সত্তা,গুণাবলী, কার্যাবলী, সকল বিষয়ই তিনি অপরাশ্রয় থেকে পবিত্র। তাই ধ্বংসশীল সৃষ্টির সাথে তাঁর তুলনা হতে পারে কি করে? কেননা তিনি সৃষ্টির মুখাপেক্ষী নন। তাঁর কার্যাবলীর সাথে সৃষ্টির কার্যাবলী কী করে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে? কেননা তাঁর কোনো কাজ বিশেষ কোনো বস্তুর মুহাব্বতের কারণে হয়না। অথবা কোন ত্রুটিবিচ্যুতি বা বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও হয় না। যা সৃষ্টির কার্যাবলীর সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ সৃষ্টির কার্যাবলী কোনো না কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হয়।

আমাদের অপর এক সম্মানিত মাশায়েখ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে তোমরা যা ধারণা করো, আর যে সমস্ত বিষয় তোমাদের জ্ঞানে অনুভব করো, মনো রেখো সেগুলোও তোমাদের মতো ধ্বংসশীল।

হযরত ইমাম আবুল মাআলী জুওয়াইনী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন ধারণা পর্যন্ত পৌছে সন্তুষ্ট হয়ে বসে পড়ে, সে সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়। আর যে ব্যক্তি 'না' বা 'নফি' এর স্তরে অবরুদ্ধ হয়, সে 'মুয়াত্তিল' বা 'অকৃতকার্য' হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ সকল ধারণা থেকে মুক্ত এবং তার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝতে অক্ষম স্বীকৃতি প্রদান করে সেই হয় 'মুয়াহহিদ' বা প্রকৃত 'একত্ববাদী'।[১] এ বিষয় হযরত জুন্নুন মিসরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কতো চমৎকার বলেছেন। যেমন,

"তাওহীদের হাকীকত বা প্রকৃত তত্ত্ব এই যে, বান্দা আল্লাহ তা'আলার অসীম ক্ষমতাকে এ রকম জানবে যে, তিনি সর্বপ্রকার অবলম্বন ব্যতিরেকেই সবদিক থেকে সৃষ্টি অপেক্ষা সমুন্নত। আল্লাহ তা'আলা কোনো প্রকার যন্ত্র বা উপায়

[১]. সার কথা হলো যদি কেউ আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বাকে কোনো বস্তুর মতো ধারণা করে তাহলে সে সন্দেহে পতিত হবে। আর যদি কেউ শুধু 'নফি' না পর্যন্ত পৌছে থাকে আর 'হ' থেকে ইল্লা ব্যতীত এর দিকে অর্থাৎ 'নফি' না থেকে ইসবাত বা স্বীকৃতির প্রতি ধাবিত না হয় সে মুয়াত্তিল বা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ছে। তাওহীদ হলো গায়েরুল্লাহকে ত্যাগ করে আল্লাহ সর্ম্পকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভে ব্রতী হওয়া।

উপকরণ ব্যতিরেকেই সমগ্র সৃষ্টিকে পরিমাপ করতে সক্ষম। তাঁর কার্যাবলী প্রত্যেক বস্তুর সৃজনশীলতা । তাঁর কার্যাবলী দোষত্রুটি মুক্ত। মনো রেখো তোমরা তাঁর সম্পর্কে যা ধারণা করো তিনি তোমাদের ধারণার অনেক উর্ধ্বে। কারণ তোমাদের ধারণা তোমাদের মতোই। এটাই হলো প্রকৃত সত্য ও বিস্ময়কর কথা। সর্বশেষ কথা হলো—

لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ

—তাঁর সমতুল্য কিছুই নেই।[১]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে-

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ ۝٢٣

—তাঁকে প্রশ্ন করা যায় না, যা তিনি করেন এবং তাদের সবাইকে প্রশ্ন করা হবে।[২]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে—

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَىْءٍ إِذَآ أَرَدْنَٰهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ۝٤٠

—যা কিছু আমি ইচ্ছা করি সেটার উদ্দেশ্যে আমার নির্দেশ এটাই হয় যে, আমি বলি হয়ে যাও! ফলে,তৎক্ষনাৎ তা হয়ে যায়।[৩]

আল্লাহ আমাকে ও আমাদের সকলকে একত্ব ও পবিত্রতার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুক। পথভ্রষ্টতা অধর্ম, অপব্যাখ্যা ও অবিশ্বাস থেকে অনুগ্রহ করে আমাদের দূরে সরিয়ে রাখুক। নিরাপত্তা দান করুক।

[১]. আল কুরআন : সূরা শুরা, ৪২:১১।
[২]. আল কুরআন : সূরা আম্বিয়া, ২১:২৩।
[৩]. আল কুরআন : সূরা নাহল, ১৬:৪০।

اَلْبَابُ الرَّابِعُ

فِيْ مَا أَظْهَرَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ وَشَرَفِهِ بِهِ مِنَ الْخَصَائِصِ وَالْكَرَامَاتِ

চতুর্থ অধ্যায়

হুযুর (ﷺ) এর মু'জিযা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

اَلْمُقَدِّمَةُ

ভূমিকা

কাজী আবুল ফজল (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আমি এ পর্যন্ত যা উল্লেখ করেছি তা জ্ঞানীদের জন্য যথেষ্ট। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নবুওয়াত অস্বীকারকারীদের জন্য আমি এ কিতাব রচনা করিনি। আর না তাদের উদ্দেশ্যে লিখেছি যারা এর মু'জিযাসমূহ অস্বীকার করে। আমার এ কিতাব লেখার উদ্দেশ্য হলো শুধু দলিল প্রমাণ পেশ করা। যাতে তারা দলিল-প্রমাণ পেশ করে সেই পর্যন্ত পৌছাতে সক্ষম না হয়। আমার উদ্দেশ্য হলো হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মু'জিযাসমূহের শর্তাবলীতে চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করা। তারপর আমি ঐ সমস্ত লোকদের প্রত্যাখ্যান করবো, যারা শরীয়তের বিধান রহিত হওয়ায় বিশ্বাসী নয়। তারপরও আমার এ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য হলো উম্মাতের আশেকদের জন্য যারা তাঁর আহবানকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর নবুয়াতের সাক্ষ্য দেয়। যাতে তাদের মধ্যে মুহাব্বত বৃদ্ধি পায় এবং নেক কাজে বেশী উৎসাহী হয় এবং তাদের বিশ্বাস সমৃদ্ধিলাভ করে।

আমার উদ্দেশ্য হলো আমি এখন তাঁর বড় বড় মু'জিযা ও প্রসিদ্ধ নিদর্শনাবলী প্রমাণ করবো। যার ফলে মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাঁর মর্যাদা কতো শ্রেষ্ঠ তা প্রমাণিত হয়। এ সম্পর্কে আমি ঐ বর্ণনাসমূহ উল্লেখ করবো, যা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ও সূত্রানুযায়ী বিশুদ্ধ সহীহ। সে বর্ণনাসমূহের অধিকাংশ বর্ণনাই নিশ্চয়তার (ইয়াকীন) স্তরে উপনীত হয়েছে। যা তাঁদের নিকট পৌছেছে। আর হাদীসের খ্যাতনামা ইমামগণ তাদের গ্রন্থে সে সমস্ত মু'জিযার উল্লেখ করেছেন। আমি সে মু'জিযাসমূহের উল্লেখ করবো। যদি কোন ন্যায়-নিষ্ঠাবান লোক এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে যে, ইতিপূর্বে আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছি অর্থাৎ তাঁর উত্তম আচার-আচরণের নিদর্শন, চারিত্রিক উত্তম বৈশিষ্ট্য, উত্তম জ্ঞান, সহিষ্ণুতা ও বুদ্ধিমত্তা, তাঁর সকল প্রকার কামালাত বা পূর্ণাঙ্গতা, অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা, বাক্যের সততা ইত্যাদি গুণাবলী তাঁর নবুওয়াতের সততা ও দাওয়াতের সত্যতার মধ্যে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ পোষণ করা যাবে না। নিঃসন্দেহ বলা যায় যে, তাঁর ঐসমস্ত উত্তম গুণাবলী অসংখ্যা লোকের ঈমান আনার কারণ হয়েছে।

হাদিসবিদ ইমাম তিরমিযি ও ইবনে কানে (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

لَمَّا قدم رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ جِئْتُهُ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ فَلَمَّا اسْتَبَنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ،

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মদীনায় তাশরীফ আনেন তখন আমি সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাঁর দরবারে হাযির হয়ে আমি তাঁর পবিত্র চেহার মুবারকের প্রতি তাকাই। তখন আমি নিশ্চিত বুঝতে পারি যে এরূপ চেহারা কোন মিথ্যাবাদী লোকের হতে পারে না।

হযরত আবু রামছা তামিমী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বললেন,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي ابْنٌ لِي فَأُرِيتُهُ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ قُلْتُ هَذَا نَبِيُّ اللهِ،

–আমি আমার পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খেদমতে হাযির হই। আমি তাঁর চেহারা মুবারকে প্রতি তাকিয়ে বললাম, উনি আল্লাহর মহান নবী।

সহীহ-আল-মুসলিম ও অন্যান্য কিতাবে উল্লেখ আছে, একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে হযরত জিমাদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে হাযির হয়। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন,

أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ لَهُ أَعِدْ عَلَيَّ كَلِمَاتِكَ هَؤُلَاءِ فَلَقَدْ بلغان قاموسي الْبَحْرِ هَاتِ يَدَكَ أُبَايِعْكَ،

–সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার। আমরা তাঁর গুণগান করি ও তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে

কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ হিদায়াত দান করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। তিনি একক ও অংশীদারহীন। আর হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও প্রেরিত রাসূল। তখন হযরত জিমাদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি আরয করি, এ বাক্যসমূহ পুণরায় আমার সামনে পাঠ করুন। কেননা এ বাক্যসমূহ তো সমুদ্র পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। হে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার পবিত্র হাতখানা বাড়িয়ে দিন, আমি আপনার হাতে বায়'আত গ্রহণ করবো।[১]

হযরত জামে বিন শাদ্দাদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, তারেক নামক এক ব্যক্তি আমাকে বললো, আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে মদীনা মুনাওয়ারাতে দেখতে পাই। তিনি আমাকে বললেন,

هل معكم شئ تبيعونه قُلْنَا هَذَا الْبَعِيرُ قَالَ بِكَمْ قُلْنَا بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ بِخِطَامِهِ وَسَارَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقُلْنَا بِعْنَا مِنْ رَجُلٍ لَا نَدْرِي مَنْ هُوَ وَمَعَنَا ظَعِينَةٌ فَقَالَتْ أَنَا ضَامِنَةٌ لِثَمَنِ الْبَعِيرِ رَأَيْتُ وَجْهَ رَجُلٍ مِثْلَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا يَخِيسُ بِكُمْ فَأَصْبَحْنَا فَجَاءَ رَجُلٌ بِتَمْرٍ فَقَالَ أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُمْ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ هَذَا التَّمْرِ وَتَكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا فَفَعَلْنَا،

–তোমার নিকট কি বিক্রি করার মত কোনো জিনিস বা জন্তু আছে। আমি বললাম, হ্যাঁ। একটি উট আছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কত মূল্যে বিক্রি করবে? আমি বললাম এতো এতো পরিমাণ খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করবো। তারপর তিনি উটের রশি হাতে ধরে মদীনার দিকে চলে গেলেন। আমি নিজে নিজে চিন্তা করি। এক অপরিচিত লোকের হাতে উটটি বিনা মূল্যে বিক্রি করে দিলাম, যাকে আমি জানি না, চিনি না, আর লোকটি বা কে? আমার সাথে এক মুসাফির মহিলা ছিলো।

[১]. ক) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবুত্ তামহীদ, ১:৫।
খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু তাখফিফীস্ সালাত, ২:৫৯৩।
গ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু খুতবাতিন নিকাহ, ১:৬০৯।

সে আমাকে বললো, আমি তোমার উটের মূল্যের জিম্মাদার। আমি ঐ লোকটির চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল দেখেছি। তিনি তোমাকে কখনো ধোঁকা দেবেন না। তারপর সকালে দেখতে পাই যে, একব্যক্তি খেজুর নিয়ে এসে বলছে, আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দূত। সে আমাকে বললো, এ খেজুর খাও, আর এগুলো ওজন করে তোমার উটের দাম বুঝে নাও। অতঃপর আমি খেজুর ওজন করে উটের দাম বুঝে নিলাম।

ওমানের বাদশাহ জলন্দি বলেন, আমি যখন জানতে পারি যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন,

وَاللهِ لَقَدْ دَلَّنِي عَلَى هَذَا النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ أَنَّهُ لَا يَأْمُرُ بِخَيْرٍ إِلَّا كَانَ أَوَّلَ آخِذٍ بِهِ وَلَا ينهى عن شيء إِلَّا كَانَ أَوَّلَ تَارِكٍ لَهُ وَأَنَّهُ يَغْلِبُ فَلَا يَبْطَرُ وَيُغْلَبُ فَلَا يَضْجَرُ وَيَفِي بِالْعَهْدِ وَيُنْجِزُ الْمَوْعُودَ وَأَشْهَدُ أَنَّهُ نَبِيٌّ،

–আল্লাহর শপথ; আমি তখন থেকেই সেই উম্মী নবীর দলিল পেয়ে যাই। তিনি প্রথমে নেক কাজ করেন, পরে সে নেক কাজের প্রতি অন্যকে আহ্বান করেন। তিনি সকলকে অন্যায় কাজ থেকে বারণ করেন। আর কখনো তিনি বিজয়ী হবার পর আনন্দিত বা উৎফুল্ল হন না। আর কখনো পরাজিত হলেও বিমূর্ষ বা চিন্তাযুক্ত হতেন না। তিনি প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন এবং যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি প্রতিশ্রুতি পূরণ করার চেষ্টা করেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি মহান নবী। তারপর এ আয়াত পাঠ করে–

يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ

–এর নিকটবর্তী যে, সেটার তৈল প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে যদিও আগুন সেটাকে স্পর্শ না করে।[১]

মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী সম্পর্কে এরূপ উদাহরণ পেশ করেন। যদি বলেন তাঁর চেহারা মুবারকই তাঁর নবুওয়াতের দলিল, যদিও তিনি কুরআন পাঠ না করুক। যেমন, ইবনে রাওহা বলেছেন–

لَوْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ آيَاتٌ مُبَيِّنَةٌ ... لَكَانَ مَنْظَرُهُ يُنْبِيكَ بِالْخَبَرِ

[১]. আল কুরআন : সূরা নূর, ২৪:৩৫।

–যদি তাঁর মধ্যে উজ্জ্বল কোন আলামত নেই, তবুও তাঁর পবিত্র চেহারা মুবারকই তোমাদেরকে বলে দেবে তিনি নবী।

এখন আমি তাঁর নবুওয়াত, ওহী ও রিসালাতের বিষয় আলোচনা করা সমীচিন মনে করি। তারপর কুরআন যে মু'জিযা, তার প্রমাণ ও সাক্ষ্যসমূহের উল্লেখ করব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

بَيْنَ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ

হুযুর (ﷺ) এর নবুয়্যাত ও রিসালতের বর্ণনা

মহান আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান। তিনি ইচ্ছে করলে তাঁর বান্দাদের অন্তরে তাঁর মারিফাত, সত্তা বা জাত তাঁর গুণবাচক নাম ও সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট অনুভব করার জ্ঞান যে-কোন প্রকার উপায়-উপকরণ ছাড়াই বান্দার অন্তরে জাগরিত করে দিতে পারেন। যেমন, কোনো কোনো নবীগণ (আলাইহিমুস্ সালাম) সম্পর্কে তাঁর চিরন্তন রীতি-নীতির সম্পর্কে এরশাদ করা হয়েছে-

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا

–কোনো মানুষের পক্ষে শোভা পায়না যে, আল্লাহ্ তাঁর সাথে কথা বলবেন, কিন্তু ওহীরূপে।[১]

এ আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে যে, এটা এমন জ্ঞান যে-কোনো প্রকার উসিলা বা মাধ্যম ছাড়া কাউকে পৌছানো বা তার সাথে কথা বলা বৈধ। এ উসিলা মানুষ ব্যতীত অন্যদের সাথেও হয়েছে। যথা হযরাত আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) এর নিকট ফিরিশতাদের আগমন করা অথবা তাদের সমগোত্রীয় বস্তু হওয়া; যেমন, নবীদের উম্মাতদের সাথে হয়েছে। তাদের সংবাদ ও আকলী দলিল অনুসারে একাজে কোনো বাধা বিপত্তি নেই। যখন একথা বৈধ প্রমাণিত হয়েছে যে, এরূপ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তখন একথা বলাও সঠিক হবে যে, হযরাত আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) স্বীয় সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ মু'জিযা নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছেন। তাই তাঁদের আনীত সব কিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা অবশ্য কর্তব্য। কেননা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চ্যালেঞ্জ দেয়া এক মু'জিযা আল্লাহর বাণীকে সুদৃঢ় করে দিয়েছে। আমার বান্দা সত্যবাদী। সুতরাং তোমরা তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করো। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণী তাঁর সত্যতার দলিল। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। যদি তাঁর কোনো বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ইচ্ছে হয়, তাহলে ওলামাদের রচিত কিতাবসমূহ পাঠ করলে সে আশা পূর্ণ হবে। সুতরাং ঐ ব্যক্তির ভাষায় 'নবুওয়া' হলো যা "হামজা" এর সাথে উচ্চারণ করা হয়। তা "নাবা" শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হলো, সংবাদ। আবার

---

[১]. আল কুরআন : সূরা শুরা, ৪২:৫১।

কখনো এর ব্যাখ্যায় "হামজা" দেয়া হয় না। বরং "হামজা" কে "ওয়াও" দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া হয়। এরূপ পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হলো শব্দের সহজ উচ্চারণ করা। আর তখন এর অর্থ হবে "আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অদৃশ্য বিষয়ের খবর জানিয়েছেন। আর তাঁকে একথা সন্দেহতীতভাবে জানিয়েছেন যে আপনি নবী। এ সূত্রে "নবী" শব্দের অর্থ হলো- "মানবা" অর্থাৎ- তাঁকে যে সংবাদসমূহ দেয়া হয়েছে। ঐ অবস্থায় "ফায়িলুন" "মাফউলুন" এর অর্থে হবে। "হে মুখবির" অর্থাৎ হে 'সংবাদদাতা'। অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয়ের সংবাদ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে প্রেরণ করেছেন আপনি সে সমস্ত বিষয়ের সংবাদ দাতা। এ অবস্থায় "ফায়িলুন" "ফায়ায়িলুন" এ অর্থে ব্যবহৃত হবে। যে ব্যক্তি "নাবা" শব্দে "হামজা" অক্ষর দেয় না। তার মতে "নবী" শব্দ "নবুওয়াত" থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো উচ্চ যমীন। এর আসল অর্থ হলো তাঁর পালনকর্তার নিকট তাঁর মর্যাদা অনেক উর্ধে। সুতরাং উভয় গুণই তার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এখন বাকী রইলো "রাসূল" শব্দ। এর অর্থ- হলো "মুরসাল" প্রেরিত দূত। তা "ফাউলুন" অর্থ "মুফআলুন" এটা ভাষায় অনেক কম ব্যবহৃত হয়। আর তাঁকে রাসূল বানানো। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার এরূপ আদেশ দেয়া যে, আমি যাদের নিকট আপনাকে প্রেরণ করেছি, আপনি তাদের নিকট আমার আদেশ পৌছে দিন। যখন এক লোককে অপর লোকের পেছনে আসতে দেখে বলা হয় যে, جَاءَ النَّاسُ أَرْسَالًا –লোকজন একের পর এক আসছে।' যেহেতু রাসূলদের জন্য বার বার তাবলীগ করা অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ তাঁদের প্রত্যেক কাজে উম্মাতের অনুসরণ করা জরুরী।

এবিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেন "নবী" ও "রাসূল" শব্দের অর্থ একই। অথবা উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অথবা কেউ বলেন, উভয় শব্দ একার্থবোধক। আর উভয় শব্দের মূল হলো "আনবাউন" অর্থাৎ সংবাদদাতা। তাদের দলিল হলো আল্লাহর বাণী–

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ

–এবং আমি আপনার পূর্বে যত রাসূল কিংবা নবী প্রেরণ করেছি।[১]

[১]. আল কুরআন : সূরা হজ্জ, ২২:৫২।

সুতরাং এর দ্বারা "নবী" ও "রাসূল" উভয়ের প্রেরণ প্রমাণ হয়েছে। এর দ্বারা দলিল পেশ করা হয় যে, "নবী" ও "রাসূল" একই। এ কারণে উভয়ের জন্য "ইরসাল" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, তাঁদের উভয়ের মধ্যে একদিক দিয়ে পার্থক্য রয়েছে। এ উভয় শব্দই গায়েবের বিষয় অবগত হওয়া, সাধারণ মানুষ থেকে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়া। আর নবুওয়াতের শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় ভূষিত হবার দিক থেকে একই, কিন্তু লোকদেরকে ভয় দেখানো ও তাবলীগ করার দিক থেকে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পূর্বে আমি সে বিষয় দলিল-প্রমাণসহ উল্লেখ করেছি। তাদের ধারণা হলো যে, উভয় শব্দের উল্লেখ করাই একথার দলিল যে, তাঁরা উভয় এক নন।

যদি নবী ও রাসূল একই হন, তাহলে তাদের উভয়কে একই বাগ্মিতা পূর্ণ বাক্যে উল্লেখ করা হতো না। তাদের মতে উক্ত আয়াতের অর্থ হলো- আমি কোন রাসূলকে কোন জাতির নিকট পাঠাইনি; বা কোন নবীকে-যিনি মুরছাল বা রাসূল নহেন- কোন জাতির নিকট পাঠাইনি।

আবার কেউ কেউ বলেন, যিনি নতুন শরীয়ত নিয়ে এসেছেন তিনি রাসূল। আর যিনি নতুন শরীয়ত নিয়ে আসেননি তিনি নবী; রাসূল নহেন। যদিও তিনি আল্লাহর বাণী পৌঁছান এবং শাস্তির ভয় দেখান। তবে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অভিমতের উপর অধিকাংশ আলেমগণ ঐক্যমতে উপনীত হয়েছেন যে, প্রত্যেক রাসূল নবী। তবে প্রত্যেক নবী রাসূল নন। সর্বপ্রথম রাসূল হযরত আদম (আলাইহিস্ সালাম) আর সর্বশেষ রাসূল হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

হযরত আবু যর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

أَنَّ الْأَنْبِيَاء مِائَة أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفَ نَبِيٍّ، وَذَكَرَ أَنَّ رسل منهم ثلثمائة وَثَلَاثَةَ عَشَرَ أَوَّلُهُمْ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ،

–সম্মানিত নবীগণ(আলাইহিমুস্ সালাম) এর সংখ্যা একলাখ চব্বিশ হাজার। তাদের মধ্যে ৩১৩ জন হলেন রাসূল। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম রাসূল হযরত আদম (আলাইহিস্ সালাম) আর সর্বশেষ রাসূল হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

আমি আশা করি এখন আপনারা নবুওয়াত ও রিসালাত সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। সত্যপন্থিদের মতে, এ দু'টি শব্দ নবীদের সত্ত্বাগত নয়,

আর না তাঁদের সত্ত্বাগত গুণ। তবে কারামীয়া মতাবলম্বীরা এ অভিমতের বিরোধী।[১]

এখন দেখা যাক ওহী শব্দের অর্থ কী? তা আলোচনা করা হবে। ওহী শব্দের অর্থ হলো, তাড়াতাড়ি করা, দ্রুততর করা। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যে সমস্ত হুকুম হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট আসতো তিনি তা অতি তাড়াতাড়ি গ্রহণ করতেন। এ কারণে ওহীকে ওহী বলা হয়। সকল প্রকার এলহাম বা প্রত্যাদেশ কেও ওহী বলা হয়। কেননা তাও হযরাত আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) এর নিকট আসা ওহীর সাদৃশ্য হবার কারণে চিঠিকেও ওহী বলা হয়। লেখার সময় লেখক দ্রুত হাত নড়াচড়া করে। একারণে চোখের ভ্রূকে ওহী বলা হয় যে, তা অতি দ্রুত নড়াচড়া করে। এ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী-

فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا

–তারপর তাদেরকে ইঙ্গিতে বললো, সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্র ঘোষণা করতে থাকো।[২]

তার ইশারা দ্রুততর হয়। অর্থাৎ চোখ ও ঠোঁট দ্বারা ইশারা করো, তাতে তাদের কথা হলো "আল-ওয়াহা, আল-ওয়াহা" তাড়াতাড়ি করো, তাড়াতাড়ি করো। কেউ কেউ বলেন, ওহীকে এলহামও বলা হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী-

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ

–এবং আমি মূসার মাকে গোপন প্রেরণা দিয়েছি।[৩]

আল্লাহর বাণী-

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا

–কোনো মানুষের পক্ষে শোভা পায় না যে, আল্লাহর তার সাথে কথা বলবেন, কিন্তু ওহী রূপে।[৪]

---

[১]. উক্ত অভিমতের প্রবর্তক হলো মুহাম্মদ বিন কোরাস। তার অনুসারীদের আকীদা বা বিশ্বাস হলো যে, আল্লাহ তাআলা আরশে সমাসীন হয়ে আছেন। এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণে তাকে নিশাপুরে আট বছর কারাবরণ করতে হয়। তারপর তাকে বায়তুল মোকাদ্দাসে নির্বাসন দেয়া হয়। সেখানে ২৫৫ হিজরীতে তার মৃত্যু হয়।

[২]. আল কুরআন : সূরা মরিয়ম, ১৯:১১।

[৩]. আল কুরআন : সূরা ক্বাসাস, ২৮:৭।

[৪]. আল কুরআন : সূরা শুরা, ৪২:৫১।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

مَعْنَي الْمُعْجِزَاتِ

মু'জিযার অর্থ প্রসঙ্গে

স্মরণ রাখতে হবে যে, হযরাত আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) এর আনিত বস্তু সমূহকে মু'জিযা বলার কারণ হলো যে, মানুষ সেগুলোর মুকাবিলা করতে অক্ষম। মু'জিযা দু'প্রকার। এক. যদিও তাতে মানুষের ক্ষমতা ছিলো তবুও তারা এর মুকাবিলা করেছে। আর তাদের অক্ষম করে দেওয়া আল্লাহর কাজ। তাই এটাই হলো নবীদের সত্যতার সাক্ষী ও প্রমাণ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদেরকে মৃত্যু কামনা করতে অক্ষম করে দেন। তেমনিভাবে কুরআনের মতো কোন সূরা রচনা করা। কোনো কোনো আলেমগণ এ অভিমত প্রকাশ করেছেন।[১]

আর দ্বিতীয় প্রকারের মু'জিযা হলো এই যে, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে তা করতে অক্ষম। এরূপ কাজ করা তাদের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। যথা মৃতকে জীবিত করা, লাঠিকে সাপে রূপান্তরিত করা। পাথর খণ্ড থেকে উট বের করা। চাঁদকে দু'খণ্ড করা। এ ধরনের কাজ করা আল্লাহ ব্যতীত কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ সমস্ত কাজ আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে করেছেন। আর এতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো তার নবুয়াত অস্বীকারকারীদের চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে অক্ষম করা।

আরও স্মরণ রাখতে হবে যে, ঐ সমস্ত মু'জিযা যা তাঁর পবিত্র হাতে তাঁর সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে, তাও আবার দু'প্রকার। এক যাতে মানুষের ক্ষমতা ছিলো। আর এক প্রকার যাতে মানুষ ছিলো সম্পূর্ণ অক্ষম। মু'জিযার বিষয়ে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন সকলের চেয়ে অগ্রগামী। তাঁর মু'জিযা অসংখ্য অগণিত। পূর্ণ শক্তিশালী, উজ্জ্বল, সুস্পষ্ট এবং সুদূরপ্রসারী প্রভাবসম্পন্ন। তাঁর মু'জিযাসমূহ গণনা করা সত্যই কঠিন দুরূহ কাজ। তন্মধ্যে পবিত্র কুরআন মাজীদের কথাই ধরা যাক। এর মধ্যে মু'জিযার বৈশিষ্ট্য

---

[১]. ইহুদিদের ধারণা ছিলো যে, তারা আল্লাহর পরিবার ও আপনজন হবে। জান্নাত হবে তাদের আবাসন। পবিত্র কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা তাদের এ দাবিকে মিথ্যা উল্লেখ করেছেন। যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও এবং তোমরা নিশ্চিত যে, মৃত্যুর পর বেহেশতে যাবে, তাহলে মৃত্যু কামনা করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আপন কুদরতে তাদেরকে মৃত্যু কামনা করতে অক্ষম করে দেন। এটা হলো হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর স্পষ্ট উজ্জ্বল মু'জিযা।

এক দুই হাজার নয় বরং অসংখ্য মু'জিযার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কেননা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুধু মাত্র ছোট্ট একটি সূরা- "আল কাউসার" কে চ্যালেঞ্জ হিসেবে পেশ করেন। তাতেই তারা হতবাক হয়ে অক্ষম হয়ে পড়ে। জ্ঞানীদের মতে এটা ছিল সবচেয়ে ছোট সূরা। এ সূরার প্রতিটি আয়াত প্রতিটি শব্দ স্ব-স্ব স্থানে এক একটি উজ্জ্বল মু'জিযা। তারপর উক্ত সূরার মু'জিযাসমূহ যথাস্থানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। ইনশা আল্লাহ।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মু'জিযা ছিলো দু'প্রকার। এক যেগুলো সম্পর্কে আমরা চূড়ান্তভাবে অবগত হয়েছি এবং নবুয়াতের প্রমাণ স্বরূপ যা নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণিত হয়েছে। যেমন, কুরআন মাজীদ। এ সম্পর্কে কারো বিন্দুমাত্র সংশয় ও সন্দেহের অবকাশ নেই। আর না এ বিষয়ে কারো কোন মতভেদ ও মতবিরোধ রয়েছে।

তিনিই তা নিয়ে এসেছেন। আর তাঁর দ্বারা তা প্রকাশিত হয়েছে। আর তিনি এটাকে তাঁর নবুয়াতের প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। যদি কোন দুশমন তা অবিশ্বাস ও অস্বীকার করে তাহলে তার সে অস্বীকৃতি হলো এরূপ সে যেনো হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দুনিয়াতে আগমণকে অস্বীকার করা। আর সে সকল অবিশ্বাসী কুরআন মাজীদ মু'জিযা হওয়া অস্বীকার করে তাঁর নবুওয়াতের দলিল কুরআন অস্বীকার করে। অর্থাৎ সে কখনো কুরআনের মতো বাণী তৈরি করতে পারবে না, বরং বড় জোর সে এটাকে যাদু বা আল্লাহর বাণী নয়- একথা বলতে পারবে।

পবিত্র কুরআন মাজীদ স্বীয় বিষয়ে চূড়ান্ত মু'জিযা। এ মু'জিযার বিষয় সকলে অবগত। যথাস্থানে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। ইনশা আল্লাহ।

কোনো কোনো আলেমদের অভিমত হলো যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাত মুবারক এতে অসংখ্য নিদর্শন ও অস্বাভাবিক যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলো মু'জিযা বলে গণ্য। যদিও সেগুলোর মধ্যে কোনো কোনো মু'জিযা নিশ্চিত বা ইয়াকীনের স্তরে উপনীত হতে পারেনি, তবুও ঐ ধরনের অসংখ্য মু'জিযা মিলে নিশ্চিয়তার স্তরে পৌছে যাবে। সুতরাং তখন এ বিষয় আর কারো সন্দেহ ও সংশয় থাকার কথা নয়। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পবিত্র হাতে যে অসংখ্য অলৌকিক কাজ সম্পাদিত হয়েছে সে বিষয়ে বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী কারও মতভেদ বা দ্বিমত নেই। তবে মতবিরোধ ঐ বিষয়ে হয়েছে যে, তার বিরুদ্ধবাদীরা বলে তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হয়েছে, না হয়নি। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় এ বিষয় আমি প্রমাণ করেছি। সেগুলো আল্লাহ তা'আলার

পক্ষ থেকে হয়েছে। আর এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তাঁর বাণী ও আল্লাহর বাণীর মতো তুমি সত্য বলছো। এরূপ অনেক কিছু সরাসরি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন, বলা হয় যে হাতেমের দানশীলতা, আনতারার বীরত্ব, আর আহনাফের গাম্ভীর্য সরাসরি প্রমাণিত হয়েছে। কেননা আমাদের নিকট যতোগুলো বর্ণনা পৌছেছে সে বিষয় সকলে একমত যে, অমুকদাতা, অমুক বাহাদুর, অমুক ধৈর্যশীল ছিলো। যদি তাদের প্রত্যেক খবর সরাসরি জ্ঞানের বিষয় নয়। আর যদি সে বিষয় নিশ্চিত না হওয়া যায় তবুও এধরনের অনেক বর্ণনা একত্রে মিলিত হয়ে নিশ্চিত হবার কারণ হয়ে যায়।

(২) হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দ্বিতীয় প্রকার মু'জিযাসমূহ যা অতি নির্ভরযোগ্যতা ও নিশ্চয়তার স্তরে পৌছতে পারেনি। সেগুলোও দু'প্রকার।

(১) ঐ ধরনের মু'জিযাসমূহ যা ব্যাপক প্রসিদ্ধ ও প্রসার লাভ করেছে। আর সে বর্ণনাসমূহ বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। হাদিস বর্ণনাকারী ও ঐতিহাসিক সীরাত লেখকগণের মাঝে তা ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। যেমন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আঙ্গুল থেকে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হওয়া, খাবার বৃদ্ধি পাওয়া।

(২) ঐ সমস্ত বর্ণনা যা এক বা একাধিক বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। অথবা ঐ সমস্ত বর্ণনাকারীর সংখ্যা কম। অথবা অন্যান্য বর্ণনাকারীদের মতো অতি প্রসিদ্ধিও লাভ করতে পারেনি। তবুও ঐ ধরনের অনেক গুলো বর্ণনা একত্রিত করলে দেখা যায় যে, সবগুলো বর্ণনার একই অর্থ হয়। তখন তা মু'জিজা হবার যোগ্য হয়। যেমনটি এ বিষয়ে আমি পূর্বে আলোচনা করেছি।

কাযী আবু ফযল আয়ায (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আমি দৃঢ়তার সাথে সত্য কথা বলছি যে, ঐ সংক্রান্ত মু'জিজা সম্পর্কিত অধিকাংশ বর্ণনাই নির্ভরযোগ্য ও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন, চাঁদ দ্বি-খণ্ডিত হওয়া। তারপরও এসম্পর্কে কুরআনে সুস্পষ্ট সূরা বা আয়াত বিদ্যমান রয়েছে। আমাদেরকে কুরআনই এ বিষয়ের খবর দিয়েছে। আর কুরআনের আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ ছাড়া কোন দলিল খণ্ডনযোগ্য নয়। অনুরূপভাবে সকল প্রকার সন্দেহ ও সংশয়কে দূর করার জন্য চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার বিষয়ে সহীহ হাদিসসমূহে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আর দীনের রশি পরিত্যাগকারী কোন নির্বোধ ব্যক্তির পক্ষে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাসকে নড়বড়ে করে দেয়া সম্ভব হবে না। এরূপ বিদ'আতী ও নির্বোধের কথার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার কারণে দুর্বল বিশ্বাসীগণ অনর্থক সন্দেহে নিপতিত হবে।

বরং এ বিষয় আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে, সব লোকদের চোখ মুখে চুনকালি মেখে দেবো এবং তাদের মূর্খতা হাটে হাড়ি ভাঙ্গার মতো প্রকাশ করে দেবো।

অনুরূপ এমন ঘটনা যেমন আঙ্গুল থেকে পানি ফোয়ারা প্রবাহিত হওয়া, খাবার বৃদ্ধি পাওয়া, যা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ও এক জামাত সাহাবী অপর জামাত সাহাবী থেকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেন। আর ঐ সমস্ত মু'জিযা যা এক জামাত সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন। ঐ ধরনের মু'জিযা যা খন্দকের যুদ্ধের সময় এক বড় দলের সামনে প্রকাশিত হয়েছে। অনুরূপভাবে বুয়াত যুদ্ধে, হুদায়বিয়ার সন্ধি স্থাপনের সময়, তাবুক যুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়েছে। অনুরূপভাবে বিরাট মুসলিম বাহিনীর সামনে প্রকাশিত হয়েছে। কোন সাহাবী থেকে এর বিরোধিতা করার প্রমাণ বিদ্যমান নেই। যারা স্ব-চক্ষে দেখে বর্ণনা করেছেন। অন্যরা তাদের দেখা ও বর্ণনার বিষয়বস্তু অস্বীকার করেনি। সুতরাং তাদের মৌনতা অবলম্বন করা হলো যে বর্ণনাকারীর বর্ণনা স্বীকার করা। কেননা তারা এ বিষয় থেকে মুক্ত ছিলো যে, কেউ অলসতা বা অবহেলা করে মিথ্যা বা ভ্রান্ত বিষয় নীরবতা অবলম্বন করতো না। বরং তারা তাৎক্ষণিক প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠতো। ঐ সমস্ত বিষয় তাদের কোন ভয়-ভীতি ও লোভ-লালসা ছিলোনা যে, তারা হয় ভয়ে প্রতিবাদ করা থেকে বিরত থাকবে, আর না তাদের ব্যক্তিগত কোন স্বার্থের ভয় যে তারা প্রতিবাদ করলে স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটবে।

যদি ঐ সবকথা তাঁদের ধারনা অনুযায়ী যদি অগ্রহণযোগ্য বা অপ্রসিদ্ধ হতো, তাহলে অবশ্যই তারা অস্বীকার করতো। যেমন, কোনো কোনো সাহাবী কোনো কোনো বিষয়কে অস্বীকার করেছেন। সে সকল বর্ণনাসমূহ হাদিস ও সীরাত গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। কোনো কোনো সাহাবী কোনো কোনো সাহাবীর ভুল সংশোধন করে দেন এবং তাদের কথাবার্তা সন্দেহযুক্ত বলে উল্লেখ করেন, যা তাদের নিকট সন্দেহ যুক্ত বলে মনে হয়েছে। সুতরাং এধরনের সকল মু'জিযা ঐ সমস্ত মু'জিযার সাথে মিলিত হয়েছে। যা নির্ভরযোগ্য ও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। সে সম্পর্কে আমি আলোচনা করেছি। আর এটাও হতে পারে যে, এ সমস্ত খবর যার কোন স্থায়ীত্ব নেই। যার ভিত্তি মিথ্যার উপর সেগুলোর জন্য প্রয়োজন সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের আলাপ-আলোচনায় চিন্তা গবেষণায় শুধু সেগুলোর দুর্বলতাই ধরা পড়েছে। যার কারণে মানুষ তা বর্ণনা করা অপছন্দ করছে। এমনকি শেষ পর্যন্ত সেগুলোকে আলোচনা থেকে বাদ দিয়েছে। যেমনটি অধিকাংশ মিথ্যা ও বানোয়াট কিচ্ছা-কাহিনীর ব্যাপারে হয়েছে।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ঐ সমস্ত মু'জিযা যা খবরে ওয়াহেদের স্তরের অর্থাৎ যেগুলোর বর্ণনাকারী সংখ্যায় স্বল্প, সময়ের আবর্তনের পর প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে। আর বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের বিরোধিতা ও দুশমনদের অসংখ্য বৈরীতা, তাদের অনীহা ও প্রকৃত ঘটনাকে দুর্বল করার বাসনা ও অবিশ্বাসীদের সেই জ্যোতিকে নিভানোর শত চেষ্টা সত্ত্বেও সেগুলোর গ্রহণ যোগ্যতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করছে। যার ফলশ্রুতিতে দেখা যায় যে, ঐ বর্ণনাসমূহের বিরোধিতাকারীদের শুধু হতাশার মাত্রাই বৃদ্ধি পেয়েছে।

অনুরূপভাবে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর গায়েবী বিষয়ের খবর দেয়া ও অতীতের ঘটনাবলীর কথা স্মরণ করে দেয়াও নিশ্চিত মু'জিযা। আর এটা এমন এক হাকীকত যার উপর কোন পর্দা নেই। আমাদের ইমামদের মধ্যে কাজী আয়ায ও আবু বকর রাজী এ অভিমত প্রকাশ করেছেন। আর এ সম্পর্কে আমাদের অভিমত হলো যে, এ প্রসিদ্ধ ঘটনা যিনিই বর্ণনা করেছেন তা খবরে ওয়াহেদের অন্তর্ভুক্ত। এরূপ হবার কারণ হলো যে, খবরসমূহ ও হাদিস সম্পর্কে তার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। তাছাড়া তার হাদিসশাস্ত্র ত্যাগ করে বাহ্যিক জ্ঞান যুক্তি বিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়া। আর না এরূপ ব্যক্তি নকলী বিদ্যা যথা হাদিস, তাফসীর ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান রাখত। আর সে যদি হাদিস ও সীরাত গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করতো তাহলে সে ঐ প্রসিদ্ধ ঘটনাবলী আমি যেভাবে উল্লেখ করেছি তাতে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করতো না। একথা তো অজানা নয় যে, কোন বর্ণনাকারীর কোন বর্ণনা মুতওয়াতির বা ধারাবাহিক হবার বিষয় জ্ঞাত থাকা তা অপর বর্ণনাকারীর জানা নেই। কেননা অধিকাংশ মানুষ জানে যে, বাগদাদ এক শহরের নাম ও রাজধানী শহর। কিন্তু এ ধরনের অনেক মানুষ আছে যারা বাগদাদ শহরের নাম পর্যন্ত জানে না। সময়ের প্রশ্ন নেই।

অনুরূপভাবে ঐ সকল ফিক্হ বিশেজ্ঞগণ ও ইমাম মালিক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর দু'জন শিষ্য থেকে নিশ্চিতভাবে বর্ণিত আছে তারা বলেন, ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারী উভয়ের জন্য নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। রমযানের প্রথম রাতে রোযার নতুন নিয়্যত করা পুরো মাসের জন্য যথেষ্ট। প্রত্যেক রাতে রোযার জন্য নিয়্যত করার প্রয়োজন নেই। এর বিপরীতে ইমাম শাফি'ঈ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর অভিমত হলো যে, প্রত্যেক রাতে নতুন করে নিয়্যত করতে হবে। অনুরূপভাবে অন্যান্য ইমামদের অভিমত হলো যে, মাথার যে-কোন অংশ মোসহে করা যথেষ্ট। অনুরূপভাবে ঐ দু'জন ইমাম যথাক্রমে ইমাম মালিক ও শাফি'ঈ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা) হত্যার প্রতিশোধে

তরবারীর ব্যবহার জায়িয বলেছেন। আর অযুর জন্য নিয়্যত করা ওয়াজিব। বিবাহে অভিভাবকের সম্মতি শর্ত বলেছেন। ইমাম আবু হানিফা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এ দু'বিষয়ে তাদের বিপরীত অভিমত প্রকাশ করেছেন। তারা ছাড়াও এমন অনেক ইমাম রয়েছেন, যাদের নিকট ঐ সমস্ত ফিকহী বিষয় মতভেদ অপছন্দনীয়। তারা না ঐ অভিমতসমূহ বর্ণনা করেছেন, আর না তাদের মযহাবে ঐ সমস্ত বিষয়ের কোন পাত্তা রয়েছে। অন্যান্য মতবিরোধপূর্ণ মাসায়ালাতো দূরের কথা। তারা তো পৃথক রয়েছেন। তারা ওদের মতো যারা কিতাবাদী পাঠ করেনি। এ যাবৎ আমি সংক্ষিপ্তাকারে মু'জিযাসমূহের উল্লেখ করেছি। এখন আল্লাহর ইচ্ছায় বিস্তারিত আলোচনা করবো।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

فِيْ إِعْجَازِ الْقُرْآنِ

কুরআন মাজীদের অলৌকিকত্ব প্রসঙ্গে

পবিত্র কুরআন মাজীদে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার মু'জিযার সমাহার। আর ঐ সমস্ত মু'জিযা সম্পর্কে চারভাবে অবগতি লাভ করা যায়।

(১) প্রথমত ঃ কুরআন মাজীদ মু'জিযা হওয়ার উল্লেখযোগ্য দিক হলো যে, এর বিস্ময়কর রচনাশৈলী, গ্রন্থনা, পদ-বিন্যাস ও ছন্দ্যবদ্ধতা, বাক্যের স্পষ্টতা, চমৎকারিত্ব, ও সংক্ষিপ্ততা, এর বালাগত বা ভাষালংকার, যা আরববাসীদের স্বকীয়তার বিরোধী। যদিও তাদের মধ্যে সে প্রতিভা বিদ্যমান ছিলো। তারা ভাষা ও সাহিত্যের ময়দানে ছিল বীর সদৃশ। প্রজ্ঞা ও বাগ্মিতার অফুরন্ত ভাণ্ডার লাভ করে তারা। তারা ভাষায় যে পাণ্ডিত্য লাভ করেছে, তা অন্য কোনো জাতি লাভ করতে পারেনি। তারা যুক্তিতর্কে এমন যুক্তিপূর্ণ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বাক্য ব্যবহার করতো যার ফলে মানুষ হতবুদ্ধি হয়ে যেতো। আল্লাহ তা'আলা তাদের স্বভাব-ধর্মে জন্মগতভাবে ঐ মূল্যবান গুণ দান করেছেন। তাদের কথা বলার এমন শক্তি ছিলো যে, তারা অনুকূল পরিস্থিতিতে ও আশ্চার্যজনক বাক্য পেশ করতে সক্ষম হতো। যে-কোন প্রতিকূল পরিস্থিতিও দুর্যোগপূর্ণ সময়েও বাগ্মিতা ও অলংকারপূর্ণ ভাষণ দান করতে সক্ষম হতো। তারা যুদ্ধের সময় অনুকূল পরিস্থিতিতে শৌর্যবীর্য গাথা কাব্য রচনা করতো। এভাবে তারা স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করতো। তাদের প্রতিটি কথা ছিল যাদুমন্ত্রের মতো। তারা এরূপ প্রশংসামূলক এক ধরনের অতি আশ্চর্য্যজনক গীতি কাব্য রচনা করতো, যা মুক্তার মালার সৌন্দর্যকেও হার মানাতো। তারা কাব্যের জোরে বিবেককে হতবাক ও কঠিন কাজ সহজ করে নিতো। তারা প্রতিহিংসা দূর করে সম্প্রীতি স্থাপন করত।

আবার কোন কোন সময় তারা প্রতিহিংসা জাগ্রত করে মৃতকে জীবিত করে ফেলতো। আর কৃপনদের দানশীলে পরিণত করতো। তারা তাদের কথায় অপূর্ণাঙ্গকে পূর্ণাঙ্গ করে দিতো। তারা কথা বলার মাধ্যমে ভদ্র ও খ্যাতনামা ব্যক্তিদেরকে পরাভূত করতো। তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল গ্রাম্য অশিক্ষিত। কিন্তু এরপরও তাদের ভাষা ছিলো তেজোদীপ্ত। তাদের ভাষা ছিল প্রাঞ্জল, প্রাণবন্ত উন্নত মানের। তাদের স্বভাব ছিলো মুক্তোর মতো যা থেকে পানি বের করা সহজ ছিলো। অর্থাৎ তাদের মুখের ভাষা শুনার পর শ্রোতার তৃষ্ণা মিটে যেতো। আবার

তাদের মধ্যে অনেক শহরবাসীও ছিলো। তারা উন্নতমানের অলংকারপূর্ণ ভাষা স্বচ্ছ বাচনভঙ্গী ও ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, শান্তপ্রকৃতি ও বর্ণিতাহীন সংক্ষিপ্ত ভাষা ব্যবহার করতো। তাদের কথাবার্তা অনেক সৌন্দর্য্যমণ্ডিত ছিলো। তাদের বর্ণনা সমূহ ছিলো সামঞ্জস্যপূর্ণ। গ্রাম্য ও শহুরে উভয় শ্রেণীর লোকই ভাষা অলংকারের স্পষ্ট প্রমাণ রাখত। তারা উচ্চস্তরের শক্তির অধিকারী ও উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল। তাদের মুখ যে মনের কথা বলতো তাতে কোন প্রকার সন্দেহ ছিলো না। ভাষালংকারের যাবতীয় সূত্র তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিলো। তারা ভাষা অলংকরণের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছিলো পারদর্শী। তারা ভাষা অলংকারের সৌন্দর্য প্রকাশ করার যোগ্য ছিল। তারা ভাষা অলংকারের যে-কোন স্তরে প্রবেশের উপযুক্ত ছিলো। তারা ভাষা অলংকারের উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করার কারণে অতি উচ্চ মর্যাদায় আরোহন করে। তারা দুর্বোধ্য ও সহজ পদ্ধতির উভয় প্রকারের ভাষা ব্যবহার করতো। সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘ উভয় প্রকার ভাষা ব্যবহার করতে পারতো। তারা গদ্য ও পদ্য উভয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলো। তবুও এ ধরনের বাগ্মি ও অলংকারবিদদের সামনে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন কালাম পেশ করেন। তাঁর কালামের অলংকরণ ও বাগ্মিতার সামনে তারা শির অবনত করে নেয়। আর কালাম "কুরআন মাজীদ" আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। যার শুরুতে বা শেষে কোন প্রকার ক্রটি বিচ্যুতি অনুপ্রবেশের বিন্দুমাত্র অবকাশ ছিলোনা। এর আয়াতসমূহ "মুহকাম" বা সুস্পষ্ট আর বাক্যসমূহ বিস্তৃত ও ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক। এর ভাষা অলংকার জ্ঞানীদের বাকরুদ্ধ করে দিয়েছে। আর এর বাগ্মিতা বা "ফাসাহাত" সর্বপ্রকার বাগ্মি লোকদের উপর বিজয়ী হয়েছে। এর অলৌকিক বিস্ময় ও বাগ্মিতা উভয়টি প্রকাশিত হয়েছে। এর ব্যাপক অর্থদ্যোতকতা ও সংক্ষিপ্ততা উভয়কে সন্নিবেশিত করেছে। এর বাগ্মিতা কাব্যের বহুবিধ সৌন্দর্য্য, মাধুর্য ও উপকারিতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এর শব্দাবলি অতি সুশোভিত ও সুললিত ছিলো। অথচ আরববাসীরা ছিলো এ ব্যাপারে বীরপুরুষ। সম্বোধন করার ক্ষেত্রে তারা ছিলো ইস্পাতের মতো। কাব্য ও ছড়া রচনায় তারা দুর্লভ ও দুর্ভেদ্য শব্দাবলী ব্যবহার করায় বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলো। কিন্তু এ একই ভাষায় তারা এতো পারদর্শীতা ও নৈপূণ্যের অধিকারী ছিলো তবুও কুরআন মাজীদ তাদেরকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করছে। সুদীর্ঘ তেইশ বছর তাদের শীর্ষস্থানীয়দের শির অবনত করে রেখেছে। সুদীর্ঘ তেইশ বছরের মধ্যে একবারও তারা এর মুকাবিলা করে বিজয়ী হতে পারেনি।

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মাজীদে এরশাদ করা হয়েছে–

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا۟ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِۦ مُفْتَرَيَٰتٍ وَٱدْعُوا۟ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١٣﴾

–তারা কি এ কথা বলে,"তিনি তা নিজের মন থেকে রচনা করেছেন"? আপনি বলুন, "তোমরা এর অনুরূপ স্বরচিত দশটা সূরা উপস্থাপন করো এবং আল্লাহ ব্যতীত যাকে পাওয়া যায়, সবাইকে ডেকে নাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও"।[১]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا۟ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ وَلَن تَفْعَلُو

–এবং যদি তোমাদের কোন সন্দেহ হয় তাতে, যা আমি স্বীয় এ খাস বান্দার উপর নাযিল করেছি, তবে এর অনুরূপ একটা সূরা তো নিয়ে এসো, এবং আল্লাহ ব্যতীত নিজেদের সকল সহায়তাকারীকে আহবান করো; সাহায্যের জন্য। যদি তোমরা সত্যবাদী হও। অতঃপর যদি আনয়ন করতে না পারো আর আমি চ্যালেঞ্জ করছি যে, কখনো আনতে পারবেনা।[২]

অপর এক আয়াতে বর্ণিত আছে–

قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

–আপনি বলুন, যদি মানুষ ও জিন সবাই এ লক্ষ্যে সমবেত হয় যে, এ কুরআনের অনুরূপ আনয়ন করবে, তবে এর অনুরূপ আনয়ন করতে পারবেনা। যদিও তাদের পরস্পর পরস্পরের জন্য সাহায্যকারী হয়।[৩]

---

[১]. আল কুরআন : সূরা হুদ, ১১:১৩।
[২]. আল কুরআন : সূরা বাকরা, ২:২৩-২৪।
[৩]. আল কুরআন : সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:৮৮।

অপর এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে–

قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ

–আপনি বলুন, তোমরা এর অনুরূপ স্বরচিত দশটা সূরা নিয়ে এসো।[১]

মিথ্যা কথা বলা সহজ কিন্তু মিথ্যা বানোয়াট কথা গ্রহনযোগ্য করে তোলা অনেক বেশী কঠিন। আর শব্দ যখন সঠিক অর্থের নিকটবর্তী হয়, তখন তা আরো বেশী কঠিন হয়। এ কারণে বলা হয় যে, অমুক ব্যাক্তিকে যা বলা হবে সে তাই লিপিবদ্ধ করবে। আর অমুক ব্যক্তি যা চায় তাই লিপিবদ্ধ করে। প্রকাশ থাকে যে, প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তি থেকে উত্তম। তাদের উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন ও ভৎর্সনা করেছেন। তাদের স্বপ্নকে বাতিল বলে উড়িয়ে দেন। তাদের পতাকা অবনমিত করে দেন, তাদের নিয়ম শৃঙ্খলাকে ধুলায় মিশিয়ে দেন। তাদের প্রতিমাগুলোর অসহায়ত্ব ও অক্ষমতা তুলে ধরেন। তাদের ইজ্জত-সম্মানকে ভূলুণ্ঠিত করে। এসব কিছুর পরও তারা তাঁর সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে অপ্রস্তুত হয়। আর তারা মুকাবিলা করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে। তারা শোরগোল করে ও মিথ্যা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে নিজেরা নিজেদেরকে প্রতারিত করে। আর তারা বলে বেড়ায়–

إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾

–এটাতো নয়, কিন্তু মানুষের বাক্য।[২]

অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে–

فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴿٢٤﴾

–এটা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছু নয়।[৩]

আর তারা কুরআন মাজীদকে إِفْكٌ افْتَرَاهُ অর্থ– এতো নয়, কিন্তু এক মিথ্যা অপবাদ।[৪]

১. আল কুরআন : সূরা হুদ, ১১:১৩।
২. আল কুরআন : সূরা মুদ্দাস্সির, ৭৪:২৫।
৩. আল কুরআন : সূরা মুদ্দাস্সির, ৭৪:২৪।
৪. আল কুরআন : সূরা ফুরকান, ২৫:৪।

أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ –পূর্ববর্তী কিচ্ছা কাহিনী।[১] سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ 'এতো চিরাচরিত যাদু'। তারা এসব কথা বলে নিজেদের অন্তরকে মিথ্যা সান্ত্বনা দিতো। তাদের সম্পর্কে কুরআন মাজীদে এরশাদ করা হয়েছে–

قُلُوبُنَا غُلْفٌ

–আমাদের হৃদয়ের উপর পর্দা পড়েছে।[২]

অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে–

فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ

–আমাদের হৃদয় আবরণের মধ্যে ঐ বাণী থেকে, যার প্রতি আপনি আমাদেরকে আহবান করেছেন এবং আমাদের কানের মধ্যে রয়েছে বধিরতা এবং আমাদের ও আপনার মধ্যে অন্তরায় রয়েছে।[৩]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ

–এ কুরআন শ্রবণ করো না, এবং তাতে অনর্থক শোরগোল করো। হয়ত এভাবে তোমরা জয়ী হতে পারো।[৪]

তারা অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও বলতো–

لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا

– ইচ্ছা করলে আমরাও অনুরূপ বলে দিতাম।[৫]

পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন–

وَلَن تَفْعَلُوا

–আর আমি চ্যালেঞ্জ করছি যে, তোমরা কখনো পারবেনা।[৬]

১. আল কুরআন : সূরা আনফাল, ৮:৩১।
২. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:৮৮।
৩. আল কুরআন : সূরা হা-মীম-সাজদাহ (ফুস্সিলাত), ৪১:৫।
৪. আল কুরআন : সূরা হা-মীম-সাজদাহ (ফুস্সিলাত), ৪১:২৬।
৫. আল কুরআন : সূরা আনফাল, ৮:৩১।
৬. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:২৪।

এই কুরআনের মুকাবিলায় তোমরা কস্মিনকালে একটি সূরা আনয়ন করতে পারবেনা। আর না তারা এরূপ করতে পারছে। আর না তাদের এরূপ করার ক্ষমতা ছিলো। আর ঐ সমস্ত নির্বোধদের মধ্যে যদি কেউ কুরআনের মুকাবিলায় একটি সূরা পেশ করার চেষ্টা করতো তাহলে তাতে দোষ-ত্রুটি দেখা দিতো। যেমনটি প্রকাশ মিথ্যাবাদী মোসায়লামা করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের কেন বাগ্মিতা দান করেছে যে, তাদের থেকে তা ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন। আর জ্ঞানীদের নিকট একথা গোপন ছিলনা যে, কুরআন মাজীদের ভঙ্গী আরববাসীদের মতো ছিলনা। বরং তা ছিলো সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী। আর না কুরআন মাজীদের ভাষালংকার তাদের অনুরূপ ছিলো। বরং তারা কুরআন মাজীদের রচনাশৈলীর মুকাবিলায় বাধ্য হয়ে পিছনে পলায়ন করেছে। তারপর তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়। কতিপয় লোক হিদায়াত প্রাপ্ত হয়। আর কতিপয় লোক এর ফাসাহাত বা বাচন-ভঙ্গিতে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে মাথা নত করতে বাধ্য হয়। এ কারণে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এ আয়াত তিলাওয়াত শুনে–

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

–নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচার, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমালংঘন থেকে; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।[১]

ওলীদ ইবনে মুগীরা বলেছিলো– খোদার কসম নিশ্চয়ই এই কুরআন মিষ্টিমধুর ও শ্রুতি মাধুর্য, অপূর্ব সুর-মূর্ছনা ও দ্যোতনা-হিল্লোলে ভরপুর। এই কুরআনে এমন উজ্জ্বল্য ও সজীবতা রয়েছে যা অন্য কোন কিছুতে নেই। নিশ্চয়ই এর প্রারম্ভিক অংশ ফলদার, আর এর শেষাংশে সুশীতল ধারা প্রবাহমান। আর সেটা কোন মানুষের কথা নয়।

আর হযরত আবু উবাইদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক বেদুঈন ব্যক্তি কোনো একজন থেকে এ আয়াত শুনে–

فَٱصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾

–অতএব প্রকাশ্যভাবে বলে দিন যে কথার আপনাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং মুশরিকদের প্রতি কর্ণপাত করো না।[১]

[১]. আল কুরআন : সূরা নাহ্‌ল, ১৬:৯০।

তৎক্ষণাৎ বেদুঈন লোকটি সিজদায় পড়ে বলতে শুরু করে, আমি এ কালামের ফাসাহত বা বাচনভঙ্গিকে সিজদা করছি। অপর এক বেদুঈন এক ব্যক্তি থেকে এই আয়াত শোনার পর বললো–

فَلَمَّا ٱسْتَيْـَٔسُوا۟ مِنْهُ خَلَصُوا۟ نَجِيًّا ۖ

–অতঃপর যখন তার নিকট থেকে নিরাশ হলো তখন তারা নির্জনে গিয়ে কানাঘুষা করতে লাগলো।[২]

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি এই কালামের অনুরূপ কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা কোন সৃষ্টজীবের নেই।

বর্ণিত আছে যে,

أَنَّ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَوْمًا نَائِمًا فِي المَسْجِدِ فَإِذَا هُوَ بِقَائِم عَلَى رَأْسِهِ يَتَشَهَّدُ شَهَادَةَ الحَقِّ فاسْتخبَرَهُ فَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ من بَطَارِقَةِ الرُّوم مِمَّنْ يُحْسِنُ كَلَامَ العَرَبِ وَغَيْرِهَا وَأَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا من أَسْرَى المُسْلِمِينَ يَقْرَأُ آيَةً من كِتَابِكُمْ فَتَأَمَّلْتُهَا فَإِذَا قَدْ جُمِعَ فِيهَا مَا أَنْزَلَ اللهُ على عيسى ابن مَرْيَمَ من أَحْوَالِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ،

–হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) একদিন মসজিদে ঘুমিয়ে ছিলেন। অকস্মাৎ রোম সম্রাটের এক দূত এসে তাঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে সত্যের সাক্ষ্য দিতে শুরু করে। তার পরিচয় জিজ্ঞেস করা হলে সে বললো, আমি রোম সম্রাটের দূত। আরবী ভাষার উপর তার ভালো পাণ্ডিত্য ছিলো। সে বললো, আমি মুসলমান বন্দীদের মধ্যে এক বন্দীকে তোমাদের কুরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠ করতে শুনেছি। তখন আমি উক্ত আয়াতের ব্যাপারে খুব চিন্তা-ভাবনা করতে আরম্ভ করি। তারপর আমি দেখতে পাই যে, হযরত ঈসা ইবনে মারয়ামের উপর দুনিয়া এবং আখিরাত সংক্রান্ত যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তার সাথে এর হুবহু মিল রয়েছে। তদুপরি আশ্চর্যের ব্যাপার হলো যে, ঐ আয়াতে ঐ সমস্ত কথাই অতি সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে। সেই আয়াতখানা হলো এই–

[১]. আল কুরআন : সূরা হিজর, ১৫:৯৪।
[২]. আল কুরআন : সূরা ইউসুফ, ১২:৮০।

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخۡشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقۡهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ ﴿٥٢﴾

–এবং যারা নির্দেশ মান্য করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এবং আল্লাহকে ভয় করে আর সাবধানতা অবলম্বন করে এরাই সফলকাম।[১]

আসমায়ী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। তিনি জনৈক দাসীর কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, তুমি তো দেখছি বিস্ময়কর বাগ্মিতা পূর্ণ কথা বলছো। তখন দাসী বললো, আপনি কী আমাকে আল্লাহর বাণীর চেয়ে অধিক ফাসীহ বা বাগ্মি মনে করেন? স্মরণ করুন আল্লাহ তা'আলার ঐ আয়াত–

وَأَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ أَنۡ أَرۡضِعِيهِۖ فَإِذَا خِفۡتِ عَلَيۡهِ فَأَلۡقِيهِ فِي ٱلۡيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحۡزَنِيٓۖ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيۡكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ﴿٧﴾

–এবং আমি মূসার মাকে গোপনের প্রেরণা দিয়েছি যে, তাঁকে দুধ পান করাও। অতঃপর যখন তুমি তার সম্পর্কে আশংকা করো তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করো আর ভয় করো না এবং না দুঃখ করো। নিশ্চয় আমি তাকে তোমার নিকট ফিরিয়ে আনবো এবং তাকে রসূল করবো।[২]

এই ছোট্ট আয়াতখানায় দুটি আদেশ ও দুটি নিষেধ, দুটি বিজ্ঞপ্তি ও দুটি সুসংবাদ রয়েছে।[৩]

আর এ ধরণের মু'জিযা শুধুমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলার জাত বা সত্তার সাথে নির্দিষ্ট। তিনি ছাড়া অন্যের সাথে সম্পূর্ণ সর্ম্পকহীন। উভয় বাক্যের মধ্যে এটাই নিশ্চিত।

---

১. আল কুরআন : সূরা নূর, ২৪:৫২।
২. আল কুরআন : সূরা ক্বাসাস, ২৮:৭।
৩. আদেশ দু'টি হলো– (১) হযরত মুসা (আলাইহিস্ সালাম) কে দুধ পান করাও। (২) তাঁকে সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে ছেড়ে দাও। নিষেধ দু'টি হলো- (১) তার জীবনের জন্য ভীত হবেনা। (২) কোন প্রকার চিন্তিত হবেনা। আর বিজ্ঞপ্তি দু'টি হলো- (১) আমি সংবাদ পাঠিয়েছি, (২) তুমি শংকিত হয়েছো। আর সুসংবাদ দু'টি হলো– (১) আমি তাঁকে তোমার নিকট পুনরায় ফিরিয়ে দেবো। (২) আমি মুসা (আলাইহিস্ সালাম) কে রাসূলদের অর্ন্তভূক্ত করবো।

এই কুরআন মাজীদ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনয়ন করেছেন। তাই এটা তাঁর আনিত মু'জিযা। এ কারণে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ কুরআনের মুকাবিলার জন্য আরববাসীদের আহবান জানায়। আরববাসীরা এর অনুরূপ কুরআন আনয়ন করতে অক্ষম হয়েছে। জ্ঞানীলোক একথা ভালভাবে জানে যে, ফাসাহাতের দিক থেকেও পবিত্র কুরআন মাজীদ এক উজ্জ্বল মু'জিযা। যারা বাগ্মি তাদের জন্য এটুকু জানাই যথেষ্ট যে, যারা কুরআন অস্বীকারকারী তারাও এর সাথে প্রতিযোগিতা করতে অপারগ হয়েছে। অবশেষে তারাও একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, এর "বালাগাত" বা ভাষালংকারও এক চিরন্তন মু'জিযা। যদি কুরআন মাজীদের এ আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করা হয় যে,

وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ

–এবং খুনের বদলা নেয়ার মধ্যে তোমাদের জীবন রয়েছে।[১]

অপর এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে–

وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذۡ فَزِعُواْ فَلَا فَوۡتَ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانٖ قَرِيبٖ ﴿٥١﴾

–এবং কোন রকমে তুমি দেখবে যখন তারা ভয়-ভীতির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে। অতঃপর রক্ষা পেয়ে বের হতে পারবেনা এবং এক নিকটবর্তী স্থান থেকে ধৃত হবে।[২]

অপর এক আয়াতে বর্ণিত আছে–

ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥ عَدَٰوَةٞ كَأَنَّهُۥ وَلِيٌّ حَمِيمٞ ﴿٣٤﴾

–মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিহত করো। তখনই ঐ ব্যক্তি যে, তোমার মধ্যে ও তার মধ্যে শত্রুতা ছিলো, এমন হয়ে যাবে যেমন অন্তরঙ্গ বন্ধু।[৩]

---

১. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:১৭৯।
২. আল কুরআন : সূরা সাবা, ৩৪:৫১।
৩. আল কুরআন : সূরা হা-মীম-সাজদাহ (ফুস্সিলাত), ৪১:৩৪।

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

وَقِيلَ يَٰٓأَرۡضُ ٱبۡلَعِي مَآءَكِ وَيَٰسَمَآءُ أَقۡلِعِي وَغِيضَ ٱلۡمَآءُ وَقُضِيَ ٱلۡأَمۡرُ وَٱسۡتَوَتۡ عَلَى ٱلۡجُودِيِّۖ وَقِيلَ بُعۡدٗا لِّلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤٤﴾

–এবং নির্দেশ দেয়া হলো, হে যমীন তুমি তোমার পানি শোষণ করে নাও, হে আসমান থেমে যাও এবং পানি শুকিয়ে দেয়া হলো, আর কার্য সমাপ্ত হলো এবং নৌকা জূদী পর্বতের উপর নেমে গেলো। আর বলা হলো, দূর হোক! ইনসাফহীন লোকেরা।[1]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

فَكُلًّا أَخَذۡنَا بِذَنۢبِهِۦۖ فَمِنۡهُم مَّنۡ أَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِ حَاصِبٗا وَمِنۡهُم مَّنۡ أَخَذَتۡهُ ٱلصَّيۡحَةُ وَمِنۡهُم مَّنۡ خَسَفۡنَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ وَمِنۡهُم مَّنۡ أَغۡرَقۡنَاۚ

–অতঃপর তাদের প্রত্যেককে আমি তাদের পাপের জন্য পাকড়াও করেছি। সুতরাং তাদের মধ্যে কারো উপর পাথর বর্ষণ করেছি। এবং তাদের কাউকে ভয়ানক শব্দ-ধ্বনি পেয়ে বসলো এবং তাদের মধ্যে কাউকে ভূ-গর্ভে ধ্বসিয়ে ফেলেছি এবং তাদের মধ্যে কাউকে ডুবিয়ে মেরেছি।[2]

অনুরূপ অন্যান্য বিভিন্ন আয়াত নয় বরং কুরআন মাজীদের অধিকাংশ আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করুন, তাহলে আমি এ সম্পর্কে যা আলোচনা করেছি তা উপলব্ধি করতে পারবেন। অর্থাৎ কুরআন মাজীদের বাক্য সংক্ষিপ্ত কিন্তু ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক, এতে ভাবের বিশালতা, শব্দের চমৎকার গাঁথুনি বিন্যাস ইত্যাদির সমারোহ ঘটেছে। তাছাড়া দীর্ঘ ঘটনা এবং পূর্ববর্তী ইতিহাস বর্ণনা করার ফলে সমসাময়িক জ্ঞানীদের কথা বাতিল প্রমাণিত হয়েছে এবং তাদের কথার উজ্জ্বলতা বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু কুরআন এরূপ নয়। কুরআন মু'জিযা হবার এটাও এক দলিল। কুরআন মাজীদে কী চমৎকারভাবে শব্দের পারস্পরিক যোগসূত্রতা স্থাপিত হয়েছে এবং সেই ভাষ্যের মধ্যে রয়েছে কী অপূর্ব প্রাঞ্জলতা, তাতে তথ্য প্রমাণের

[1]. আল কুরআন : সূরা হূদ, ১১:৪৪।
[2]. আল কুরআন : সূরা 'আনকাবুত, ২৯:৪০।

প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, হযরত ইউসুফ (আলাইহিস্ সালাম) এর যে সুদীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে অনেক কথার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এরূপ পুনরাবৃত্তি হওয়া সত্ত্বেও ভাষ্যগত পার্থক্য রয়েছে। সাধারণভাবে মনে হয় যে, এক ভাষ্য অপর ভাষ্যকে তুলে দিয়েছে। কিন্তু এ ঘটনা এরূপ নয় তবুও তাতে রয়েছে সৌন্দর্যের সমারোহ। বিষয় পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে একঘোয়েমি ভাব পরিলক্ষিত হয়নি। আর ভাষ্যের পুনরাবৃত্তির কারণে একাগ্রতাও হ্রাস পায়নি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

إِعْجَازُ النَّظْمِ وَالْأُسْلُوبِ

কুরআন মাজীদের বিস্ময়কর রচনাশৈলী

পবিত্র কুরআন মাজীদ মু'জিযা হওয়ার আরো এক কারণ হলো যে, অভিনব নযম বা রচনাশৈলী ও বাক্যের ধরন এরূপ, যা পরস্পর বিচ্ছিন্নতার পরিপন্থী। এর প্রতিটি আয়াতের শেষে রয়েছে ওয়াক্ফ বা বিরাম চিহ্ন। সেখানে বাক্যের সমাপ্তি হয়েছে। এরূপ নযম বা গ্রন্থনা পূর্বে কোন কালামে বিদ্যমান ছিলো, না পরবর্তীতে পাওয়া গেছে। আর না এরূপ করার কোন মানুষের যোগ্যতা রয়েছে যে, তারা কুরআনের কোন অংশের মুকাবিলা করতে সক্ষম হবে। বরং এটা হলো ঐ স্থান যেখানে জ্ঞান হারিয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়তে হয়। আর এটা হলো এমনি এক কালাম যার প্রতিটি নযম বা শব্দ গাঁথুনি 'রজয' বা কাব্যধারা 'সাজা' বা সুর ও ছন্দ এর ধারে-পাশেও কেউ পৌছতে পারেনি।

ওলীদ বিন মুগিরা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট কুরআন মাজীদ শুনে বিগলিত হয়ে যায়। তার পাশে আবু জেহেল তা অস্বীকার করে, ওলীদ বললো! আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের চেয়ে কবিতা সম্পর্কে অনেক বেশী অভিজ্ঞ। কিন্তু আমি খোদার শপথ করে বলছি তিনি যা বলেন তা মানুষের রচিত কবিতার মতো নয়।

ওলীদের অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে। একবার হজ্জের সময় সব কুরাইশদের একত্রিত করা হয়। তখন ওলীদ ইবনে মুগিরা বললো, এ সময় আরবের সমস্ত মানুষ একত্রিত হয়েছে। এ মুহূর্তে আশা করবো যে, আমরা সকলে ঐক্যমত্যে উপনীত হবো। কেউ কাউকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করবো না এবং তাতে পারস্পরিক মতপার্থক্য দূর হয়ে যাবে। একথা শুনে উপস্থিত সকলেই বলে উঠে তাহলে আমরা সকলে একমত হয়ে ঘোষণা দেবো যে, ঐ লোকটি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজন গণক। একথা শুনে ওলীদ বললো, আল্লাহর কসম! তিনি কোন গণক নন। তাঁর কথার মধ্যে গণকদের মতো গুনগুন ধরণের কোনো শব্দও নেই। তখন উপস্থিত লোকেরা বললো, তাহলে কী আমরা তাঁকে উম্মাদ বলবো? ওলীদ বললো, আল্লাহর শপথ! তিনি পাগলও নন। কেননা তাঁর উপর কোনো জিনের কুদৃষ্টি পড়েনি, আর না তিনি শয়তানী কুমন্ত্রণায় লিপ্ত হয়েছেন। তখন লোকেরা বললো, তাহলে আমরা তাঁকে কবি বলবো। ওলীদ বললো, না,

তিনি কবিও নন। আমি কবিতা ও এর প্রকারভেদ সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞাত। কবিতার 'রজয' বা কাব্যের ছন্দ 'হজয' বা সংগীতের সুর দোষ ত্রুটি গুনাগুন, 'বসত' বা আদ্য ও 'কবয' বা প্রান্ত ইত্যাদি বিষয় ভালভাবেই জ্ঞাত। তিনি কবি হতেই পারেন না। তখন লোকেরা বললো, তাহলে আমরা তাঁকে যাদুকর বলবো। ওলীদ বললো, মুসীবত তো এখানে, আমি তাঁকে যাদুকরও বলবো না। কেননা তাঁর কাছে কোনো ঝাড়-ফুঁক, তাবীয-তুমার, তন্ত্রমন্ত্র কিছুই নেই। তখন তারা সবাই অক্ষম হয়ে বললো, তাহলে এখন তুমি নিজেই বলো আমরা তাঁকে কী বলবো। তখন ওলীদ বললো, তোমরা তাঁর সম্পর্কে যা কিছুই বলো না কেনো, আমি বলবো তিনি মিথ্যাচারী নন। আমি ভাল করে জানি তোমরা তাঁর সম্পর্কে যা কিছু বলছো সব মিথ্যা। তবে তাঁর সমস্ত কথার মধ্যে যাদু মিশে আছে। যে কারণে তাঁর কথা যাদুর মতো মানুষকে সন্তান থেকে , ভাইকে ভাই থেকে, স্বামীকে স্ত্রী থেকে, লোকদেরকে গোত্র থেকে পৃথক করে দেয়। তার একথা শুনে সকলে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে যায়। আর রাস্তায় বসে লোকদেরকে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে সাক্ষাত করা থেকে বিরত থাকার ভয় দেখায়। তখন আল্লাহ তা'আলা ওলীদ সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ করেন—

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا ﴿١٢﴾ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿١٣﴾ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿١٥﴾ كَلَّا ۖ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ﴿١٦﴾ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ﴿١٧﴾ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴿٢٤﴾

—তাকে আমার উপর ছেড়ে দাও যাকে আমি একাকী সৃষ্টি করেছি। এবং তাকে প্রশস্ত (প্রচুর) সম্পদ দিয়েছি। পুত্র সন্তান দিয়েছি, যারা সম্মুখে উপস্থিত থাকে। এবং আমি তার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছি। অতঃপর সে এ কামনা করছে যেনো আমি আরো অধিক প্রদান করি। না, কখনো তা হবে না। সে তো আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি বৈরীভাব পোষণ করে। অনতিবিলম্বে আমি তাকে আগুনের পর্বত 'সা'উদ'-এর

উপর আরোহণ করাবো। নিশ্চয় সে চিন্তা-ভাবনা করেছে এবং অন্তরে কিছু কথা স্থির করেছে। অতঃপর তার উপর অভিসম্পাত হোক! কীভাবে স্থির করলো? অতঃপর তার উপর অভিসম্পাত হোক। কিভাবে স্থির করলো? অতঃপর দৃষ্টি উঠিয়ে দেখলো, অতঃপর ভ্রু-কুঞ্চিত করলো ও চেহারা পরিবর্তন করলো। তারপর পৃষ্ঠ ফিরিয়ে নিলো ও অহংকার করলো, তারপর বললো, এ-তো ঐ যাদু, যা পূর্ববর্তীদের নিকট শিক্ষা করেছে।[১]

উতবা বিন রবিয়া হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কুরআন পাঠ শুনার পর তার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গিয়ে বললো, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমরা ভাল করে জানো যে, এমন কোন বিদ্যা আমার অজানা নেই। তবে খোদার কসম! আজ আমি এমন এক কালাম শুনেছি যা ইতিপূর্বে আর কখনো শুনিনি। এ বাণী কোন কাব্য নয়, যাদুও নয়, গণকের কথাও নয়। অনুরূপ বর্ণনা নজর বিন হারেস থেকেও বর্ণিত আছে।

হযরত আবু যর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত হাদীসে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

والله مَا سَمِعْتُ بِأَشْعَرَ من أَخِي أُنَيْسٍ لَقَدْ نَاقَضَ اثْنَي عَشَرَ. شَاعِرًا فِي الجَاهِلِيَّةِ أنا أحدهم وأنه انطَلَقَ إِلَى مَكَّةَ وَجَاءَ إِلَى أَبِي ذَرّ بِخَبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ فما يَقُولُ النَّاسُ قَالَ يَقُولُون شَاعِرٌ كَاهِنٌ سَاحِرٌ لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ فما هُوَ بِقَوْلِهِمْ وَلَقَدْ وَضَعْتُهُ عَلَى أَقْرَاءِ الشّعْر فلم يَلْتَئِمْ وَمَا يَلْتَئِمُ عَلَى لِسَانِ أَحَدٍ بَعْدِي أَنَّهُ شِعْرٌ وَأَنَّهُ لَصَادِقٌ وَأَنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ،

–আল্লাহর কসম; আমি আমার ভাই উনাইসের চেয়ে বড় কবি অন্য কাউকে দেখিনি বা তার চেয়ে বড় কোন কবি আছে বলেও শুনিনি। জাহেলী যুগের বারজন কবিকে সে পরাজিত করেছে। আর সে বারজনের মধ্যে আমিও ছিলাম। সে একদিন মক্কায় গিয়ে ফিরে এসে আমার নিকট হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কথা বলে। আমি তাকে

[১]. আল কুরআন : সূরা মুদ্দাস্‌সির, ৭৪:১১-২৪।

জিজ্ঞেস করি, সাধারণ লোকজন তাঁর সম্পর্কে কী বলে? সে বললো, কোনো কোনো মানুষ তাঁকে কবি বলে আবার কেউ গণক বলে। তবে আমি গণকদের কথাও শুনেছি। গণকরা যে রকম বলে তাঁকে সেরকমও মনে হয়নি। আমি তাঁর কালামকে কবিতার সাথে মিলিয়ে দেখেছি, তাঁর কালাম সে রকমও নয়। আমার কথার পর আর কেউ তাঁকে কবি বলে উল্লেখও করতে পারবেনা। তবে সত্য বলতে কি, তিনি সত্যবাদী, আর ঐ লোকগুলোই মিথ্যাবাদী। মোটকথা এ সম্পর্কে অনেক সহীহ বর্ণনা রয়েছে।

কুরআন মাজীদ মু'জিযা হওয়ার দু'টি দিক যথা (১) এর অলৌকিক বিস্ময়তা ও ভাষালংকার। (২) এর আশ্চর্যজনক ও অভূতপূর্ব বাচনভঙ্গি। এই উভয় বৈশিষ্ট্যই মূলতঃ মু'জিযা। আর আরববাসীরা এ উভয় বৈশিষ্ট্যেরই মুকাবিলা করতে অক্ষম হয়েছে। কেননা এ উভয় প্রকার বৈশিষ্ট্যই তাদের ক্ষমতা বহির্ভূত ছিলো। কুরআনের ফাসাহত বা বাগ্মিতারও উদ্ভাবনী পন্থা ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্নতর ও ব্যতিক্রমধর্মী। অধিকাংশ সত্যপন্থীদের ধারণা এটাই।

আর একদল আলেমের অভিমত হলো যে, কুরআন মাজীদ স্বীয় ভাষা অলংকরণে ও উদ্ভাবনী পন্থায় সর্বদিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ মু'জিযা। এ সম্পর্কে তারা যে সমস্ত দলিল-প্রমাণের অবতারণা করেছে তা শুনতে কান অপ্রস্তুত। আর অন্তর বিতৃষ্ণা হয়ে আছে। আমি যা সত্য তা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আর এসব বিষয় জানা জরুরী যে, যারা অলংকার শাস্ত্রে পারদর্শী সে বিষয়ে তাদের আন্তরিকতাও বেশী হয়। সে কারণে তাদের স্বভাবে এর প্রতিভা ও ভাষার তেজোদীপ্ততা পরিলক্ষিত হয়। আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য স্পষ্ট যে, আহলে সুন্নাতের অনুসারী আলেমগণ কুরআন মাজীদের অলৌকিক বিস্ময়তার বিষয়ে মতভেদ প্রকাশ করেছেন। তাদের অধিকাংশের অভিমত হলো যে, কুরআন মাজীদের অলৌকিক বিস্ময়তার কারণ হলো শব্দের পারস্পরিক যোগসূত্রতা, ভাষার অপূর্ব প্রাঞ্জলতা, ভাবের গভীরতা ও বিস্ময়কর নযম বা সূক্ষ্ম লালিত্য ও বাক্যের ধরণ যা পরস্পর বিচ্ছিন্নতার পরিপন্থী। কেননা কোন মানুষের পক্ষে এ ধরণের বিস্ময়কর কালাম পেশ করা সম্ভব নয়। যদি একথা বলা হয় তা ভুল হবেনা। এধরণের কালাম পেশ করা মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। যেভাবে মানুষের পক্ষে মৃতকে জীবিত করা সম্ভব নয়। লাঠির স্বরূপ পরিবর্তন করে দেয়া। পাথর দানার তাসবীহ পাঠ করানো যেরূপ অসম্ভব মানুষের পক্ষে এরূপ কালাম পেশ করাও সাধ্যতীত।

শাইখ আবুল হাসান (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, এটা এমন এক জিনিস যা মানুষ ইচ্ছে করলে অর্জন করতে পারে। অথবা আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন এ ক্ষমতা মানুষকে দান করতে পারেন। কিন্তু তার পূর্বে কখনো এরূপ ক্ষমতার অধিকারী কেউ হয়নি, আর আগামী দিনেও কেউ অনুরূপ ক্ষমতার অধিকারী হবে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অপরাগ করে দেন, ফলে তারা অক্ষম হয়ে যায়। আবুল হাসান ও তার অনুসারীদের অভিমত এটাই।

যদিও এটা মানুষের ক্ষমতাভুক্ত হোক বা না হোক উভয় অবস্থাতেই আরববাসীদের অক্ষম হওয়া প্রমাণিত হয়েছে। বরং আমি একথা বলবো যে, তাদের এ বিষয়ে দলিল পেশ করতে যদিও তারা অক্ষম ছিল তবুও তাদেরকে চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে যে এর মুকাবিলায় কালাম পেশ করো। এটা অধিক অক্ষমতা অতি উত্তমপন্থা ছিলো তাদেরকে পরাভূত ও সর্তক করার। আর এর মুকাবিলায় তাদের দলিল পেশ করা ছিলো অসম্ভব। কোন মানুষের পক্ষে এরূপ বস্তু আনয়ন করা মানুষের ক্ষমতা বর্হিভূত। এটাই হলো তার সর্বোত্তম নিদর্শন। মোটকথা তারা এ সম্পর্কে কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করতে পারেনি। তাই তারা কুরআনের মুকাবিলা করার সাহস পায়নি। তারা দেশান্তরিত হতে বা মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়েছে। অপমানিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার বিষ গলদঃকরণ করেছে; অথচ আরববাসীদের ঘৃণাবোধ ছিল অতি প্রখর। অত্যাচার নির্যাতন ভোগ করা অপমান হওয়া ছিলো তাদের স্বভাব বিরোধী। কিন্তু তারা এ অপমান ও লাঞ্ছনাকে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে গ্রহণ করেনি বরং তারা অপারগ হয়ে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। কেননা কুরআন মাজীদের সাথে মুকাবিলা করা যদিও তাদের ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত হতো তাহলে অবশ্যই তারা প্রচেষ্টা চালাতো। আর এতে তারা সফলতাও লাভ করতো। আর তাদের চির শত্রু হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মুখ বন্ধ করে তাঁকে চিরদিনের জন্য নিরব করে দিতো। আরববাসীরা বাগ্মিতার দিক দিয়ে অসাধারণ লোক ছিলো। তার উপর তাদের পূর্ণাঙ্গ দখল ছিলো। ভাষাজ্ঞানে তারা ছিলো অগ্রগামী। তাদের মধ্যে এমন কঠোর ব্যক্তিও ছিলো যে, তারা কুরআন মাজীদের উপর কলঙ্ক লেপন করতে ও তার আলোকে নিভিয়ে দিতে সমস্ত ধন-দৌলত ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করতো না। তবুও তারা চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ে। তারা তাদের ধন-দৌলত থেকে এর পিছনে কিছুই ব্যয় করেনি। দীর্ঘ সময় বিরুদ্ধবাদীদের সংখ্যাধিক্য আর তাদের যৌথ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তারা সাহস হারিয়ে অসহায়ের মতো হয়েছে। তারা এ ক্ষেত্রে কিছুই করতে পারেনি। কেননা এরূপ করতে তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বারণ করা হয়েছে। যার কারণে তারা মুখে তালা লাগিয়ে নিশ্চুপ হয়ে বসে পড়ে। সুতরাং এটা হলো কুরআন মাজীদের দ্বিতীয় প্রকারের অলৌকিকত্ব।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

الْأَخْبَارُ عَنِ الْمُغَيَّبَاتِ

অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান

কুরআন মাজীদ মু'জিযা হওয়ার আরেকটা দিক হলো গায়েবী সংবাদ প্রদান করা। কুরআন মাজীদ বিশ্ববাসীকে এমন বিষয়ের সংবাদ প্রদান করেছে, যা তখনও ঘটেনি। কুরআন মাজীদে যে সমস্ত গায়েবী বিষয়ের খবর দেয়া হয়েছে তা কুরআন মাজীদের বর্ণনা অনুযায়ী সংঘটিত হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলার এ বাণী–

لَتَدۡخُلُنَّ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ

–নিশ্চয় তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে যদি আল্লাহ চান নিরাপদে।[১]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

وَهُم مِّنۢ بَعۡدِ غَلَبِهِمۡ سَيَغۡلِبُونَ

–এবং নিজেদের পরাজয়ের পর অচিরেই বিজয়ী হবে।[২]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُشۡرِكُونَ

– সেটাকে অন্য সমস্ত দীনের উপর বিজয়ী করবেন, যদিও মুশরিকরা অপছন্দ করে।[৩]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمۡ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرۡتَضَىٰ لَهُمۡ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعۡدِ خَوۡفِهِمۡ أَمۡنٗا [৪]

---

১. আল কুরআন : সূরা ফাতাহ, ৪৮:২৭।
২. আল কুরআন : সূরা রূম, ৩০:৩।
৩. আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:৩৩।

يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْـًٔا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٥٥﴾

—আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাদেরকে যারা তোমাদের মধ্যে ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে যে, অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খিলাফত প্রদান করবেন। যেমনি তাদের পূর্ববর্তীদের দিয়েছেন। আর অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করে দেবেন তাদের ঐ দ্বীনকে যা তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং অবশ্যই তাদের পূর্ববর্তী ভয়-ভীতিকে নিরাপত্তায় বদলে দেবেন। আমার ইবাদত করবে, আমার শরীক কাউকেও দাঁড় করাবে না। এবং যারা এর পরে অকৃতজ্ঞ হবে, তবে সেসব লোকই নির্দেশ অমান্যকারী।[১]

অপর এক আয়াতে বর্ণিত আছে—

إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابًۢا ﴿٣﴾

—যখন আল্লাহ সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং আপনি লোকদের দেখবেন যে, আল্লাহর দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ করছে। অতএব, আপনি প্রতিপালকের প্রশংসাকারী অবস্থায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত তাওবা কবূলকারী।[২]

এ গায়েবী বিষয়সমূহ আল্লাহ তা'আলা যেভাবে খবর দিয়েছেন ঠিক সেভাবে সংঘটিত হয়েছে। কয়েক বছর পর রোমবাসী পারস্যবাসীদের উপর বিজয়ী হয়েছে। পবিত্র কুরআন মাজীদের বর্ণনা অনুযায়ী মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইহজগত ত্যাগের পূর্বে সারা আরব উপ-দ্বীপে ইসলাম বিজয়ী হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের দুনিয়ার রাজত্ব প্রদান করেন। তার দ্বীন দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মুসলমান পৃথিবীর পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত রাজত্ব বিস্তার করে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

১. আল কুরআন : সূরা নূর, ২৪:৫৫ ।
২. আল কুরআন : সূরা নসর, ১১০:১-৩ ।

ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন, আমার জন্য যমীনকে সংকীর্ণ করে আমাকে পূর্বদিগন্ত থেকে পশ্চিমদিগন্ত দেখানো হয়েছে। অচিরেই আমার উম্মাত তথায় রাজ্য বিস্তার করবে। বাস্তবে হয়েছেও তাই।

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴿٩﴾

—নিশ্চয় আমি অবতীর্ণ করেছি এই কুরআন এবং নিশ্চয় আমি নিজেই সেটার সংরক্ষক।[১]

দেখা যায় যে, অসংখ্য দুশমন ও বাতিলপন্থীরা একত্রিত হয়ে নানা রকম উপায় অবলম্বন করে, ষড়যন্ত্র করে, শক্তি নষ্ট করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে, কুরআনের জ্যোতিকে নিভিয়ে দেয়ার জন্য। কিন্তু তারা সফল হয়নি। বিশেষ করে কারামেতা সম্প্রদায় সুদীর্ঘ পাঁচশ বছর যাবত বিভিন্নভাবে এ কুরআনের পরিবর্তন করার অনেক কুটকৌশল অবলম্বন করে। কিন্তু তারা বিন্দুমাত্রও কুরআনের নূরকে ম্লান করতে পারেনি। কুরআন মাজীদের একটি শব্দেও বিকৃতি আনতে পারেনি। একটি অক্ষর সম্পর্কেও মুসলমানদের অন্তঃকরণে বিন্দুমাত্র সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারেনি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। ওই গায়েবী বিষয়সমূহের মধ্যে এটাও আল্লাহ তা'আলার বাণী—

سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ ﴿٤٥﴾

—এখন তাড়া করা হচ্ছে এদলকে এবং তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে।[২]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে—

قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾

—কাজেই তাদের সাথে যুদ্ধ করো। আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন তোমাদের হাতে এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। আর তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য দেবেন এবং ঈমানদারদের মনকে প্রশান্ত করবেন।[৩]

১. আল কুরআন : সূরা হিজর, ১৫:৯ ।
২. আল কুরআন : সূরা ক্বামার, ৫৪:৪৫ ।
৩. আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:১৪ ।

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে—

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدٗا ﴿٢٨﴾

—তিনিই হন যিনি আপন রাসূলকে সঠিক পথনির্দেশনা ও সত্যদীন সহকারে প্রেরণ করেছেন, যাতে সেটাকে সমস্ত দীনের উপর বিজয়ী করেন এবং আল্লাহ হন যথেষ্ট সাক্ষী।[১]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে—

لَن يَضُرُّوكُمۡ إِلَّآ أَذٗىۖ وَإِن يُقَٰتِلُوكُمۡ يُوَلُّوكُمُ ٱلۡأَدۡبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿١١١﴾

—তারা তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করবেনা, কিন্তু এ কষ্ট দেয়া এবং যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তবে তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, অতঃপর তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।[২]

আল্লাহ তা'আলার এরশাদ অনুযায়ী এসমস্ত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। যা উক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা কপট বিশ্বাসী ও ইহুদীদের অন্তরের গোপন ভেদ ও তাদের মিথ্যার ঝুড়ি ও মিথ্যা কসমকে প্রকাশ করে দেন। এ প্রসঙ্গে এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে—

وَيَقُولُونَ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ لَوۡلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُۚ

—আর তাদের মনে মনে বলে, আমাদেরকে আল্লাহ কেন শাস্তি প্রদান করেন না। আমাদের একথা বলার উপর।[৩]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে—

يُخۡفُونَ فِيٓ أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبۡدُونَ لَكَۖ يَقُولُونَ لَوۡ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلۡأَمۡرِ شَيۡءٞ مَّا قُتِلۡنَا هَٰهُنَاۗ قُل لَّوۡ كُنتُمۡ فِي بُيُوتِكُمۡ لَبَرَزَ

১. আল কুরআন : সূরা ফাতাহ, ৪৮:২৮।
২. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:১১১।
৩. আল কুরআন : সূরা মুজাদালাহ, ৫৮:৮।

ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقَتۡلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمۡۖ وَلِيَبۡتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمۡ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمۡۚ وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ

—এবং তারা নিজেদের অন্তরে গোপন রাখে। যা তোমাদের নিকট প্রকাশ করে না। আর বলে, যদি আমাদের নিকট কোন ইখতিয়ার থাকতো তবে আমরা এখানে নিহত হতাম না। আপনি বলে দিন, যদি তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান করতে, তবুও যাদের নিহত হওয়া লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে তারা স্বীয় নিহত হওয়ার স্থান পর্যন্ত বের হয়ে আসতো। এবং এ জন্য যে, আল্লাহ তোমাদের অন্তরের কথা পরীক্ষা করবেন এবং যা কিছু তোমাদের অন্তরসমূহে রয়েছে তা প্রকাশ করে দেবেন এবং আল্লাহ অন্তরের কথা জানেন।[১]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে—

وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْۛ سَمَّٰعُونَ لِلۡكَذِبِ سَمَّٰعُونَ لِقَوۡمٍ ءَاخَرِينَ لَمۡ يَأۡتُوكَۖ يُحَرِّفُونَ ٱلۡكَلِمَ مِنۢ بَعۡدِ مَوَاضِعِهِۦۖ يَقُولُونَ إِنۡ أُوتِيتُمۡ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمۡ تُؤۡتَوۡهُ فَٱحۡذَرُواْۚ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتۡنَتَهُۥ فَلَن تَمۡلِكَ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ شَيۡـًٔاۚ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمۡۚ لَهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا خِزۡيٞۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٞ

—এবং কিছু সংখ্যক ইহুদী মিথ্যা খুব শুনে। যারা আপনার নিকট হাযির হয়নি, আল্লাহর বাণীগুলোকে সেগুলোর ঠিকানাসমূহে স্থির হবার পর পরিবর্তন করে দেয়। তারা বলে, এ নির্দেশ পেলে তা মান্য করে এবং যদি না পাও তবে বর্ণনা করো৷ আর যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করতে চান,

১. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:১৫৪।

তবে কখনো তুমি আল্লাহর নিকট তার জন্য কিছুই করতে পারবে না। এরা হচ্ছে সেসব লোক, যাদের অন্তরকে আল্লাহ বিশুদ্ধ করতে চাননি। তাদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্ছনা আর তাদের জন্য আখিরাতে রয়েছে মহা শাস্তি।[১]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَٰعِنَا لَيًّۢا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى ٱلدِّينِ

–কিছু সংখ্যক ইহুদী কথাগুলোকে সেগুলোর স্থান থেকে পরিবর্তিত করে এবং বলে, আমরা শুনেছি ও অমান্য করেছি এবং শুনুন আপনাকে না শুনানো হোক এবং রা'ইনা বলে জিহ্বাসমূহ ঘুরিয়ে দেয় সত্য থেকে মিথ্যার দিকে এবং দীনের প্রতি বিদ্রুপ করার জন্য।[২]

আর আল্লাহ তা'আলা যা নির্ধারণ করে রেখেছেন। তার উপর মুসলমান দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলো। বদর যুদ্ধের দিনে তা প্রকাশ করেন।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে এরশাদ করা হয়েছে–

وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآئِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ

–এবং স্মরণ করুন। যখন আল্লাহ আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, সেই দু'দলের মধ্যে একটা তোমাদের জন্য এবং তোমরা এটা চাচ্ছিলে যে, তোমরা সেটাই লাভ করবে যার মধ্যে কন্টকের সংকট নেই।[৩]

অপর এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে–

إِنَّا كَفَيْنَٰكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ۝

–নিশ্চয় সেই বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে আমি আপনার জন্য যথেষ্ট।[৪]

---

১. আল কুরআন : সূরা মায়িদা, ৫:৪১।
২. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:৪৬।
৩. আল কুরআন : সূরা আনফাল, ৮:৭।
৪. আল কুরআন : সূরা হিজর, ১৫:৯৫।

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কেরামকে সুসংবাদ দেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপ থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন। মক্কায় কতিপয় কাফির হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বিদ্রুপ করতো, তাঁর উপর বিভিন্ন ধরণের অত্যাচার নির্যাতন চালাতো। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে দেন।

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ

–আর মহান আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করবেন মানুষের ক্ষতি থেকে।[১]

আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর প্রতিফলন হয়েছে। অনেক লোকই হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ক্ষতি করার বা তাঁকে শহীদ করার ইচ্ছা পোষণ করে কিন্তু কেউ সফল হয়নি এ সংক্রান্ত বর্ণনাসমূহ সহীহ ও প্রসিদ্ধ।

---

১. আল কুরআন : সূরা মায়িদা, ৫:৬৭।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

أَخْبَارِهِ عَنِ الْقُرُونِ السَّالِفَةِ وَالْأُمَمِ الْبَائِدَةِ

অতীত যুগসমূহ ও পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ঘটনা বর্ণনা

কুরআন মাজীদ মু'জিযা হওয়ার চতুর্থ কারণ হলো, এই কুরআন মাজীদ অতীত জাতিসমূহের ধ্বংসের বিবরণ ও তাদের শরীয়ত সম্পর্কে এমন এমন বিষয় বর্ণনা করেছে যা আহলে কিতাবদের প্রজ্ঞাবান আলেম- যারা আজীবন বিদ্যা শিক্ষার কাজে ব্যয় করেছে, তারা ব্যতীত আর কেউ অবগত ছিলনা। কিন্তু হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ সমস্ত ঘটনা এমনভাবে বর্ণনা করতেন, তাঁর বর্ণনা শুনার পর আহলে কিতাবদের প্রবীণ আলেমগণ কাহিনীর সত্যতার স্বীকৃতি দিতো এবং বলতো, তিনি বাস্তব সত্য কথা বলেছেন। এমনকি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা বর্ণনা করতেন তা তারা জানতোও না। অথচ তারা জানতো যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজন উম্মী নবী। তিনি পৃথিবীর কারো নিকট লেখাপড়া করেননি। ধারাবাহিকভাবে কোন বিদ্যালয়ে যাননি। না জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের সাথে তাঁর সংশ্লিষ্টতা ছিলো। তিনি সারাজীবন তাদের চোখের সামনে ছিলেন। কোনো দিনও তাদের চোখের আড়াল হননি। আহলে কিতাবের আলেমগণ তাঁকে ভালভাবে জানতো ও চিনতো। অধিকাংশ আহলে কিতাবী আলেমগণ অতীত জাতিসমূহের বিষয় তাঁর নিকট জানতে চাইতো। তাঁর উপর যেভাবে কুরআন অবতীর্ণ হতো তিনি সেভাবে তাদেরকে শুনাতেন। যেমন, পূর্ববর্তী নবীগণ (আলাইহিমুস্ সালাম) এর কাহিনী এবং তাদের সম্প্রদায় তাদের সাথে কি ধরণের আচরণ করেছে। হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) ও হযরত খিযির (আলাইহিস্ সালাম) এর ঘটনা, হযরত ইউসুফ (আলাইহিস্ সালাম) ও তাঁর ভাইদের ইতিবৃত্ত। আসহাবে কাহাফের ঘটনা, হযরত যুলকারইন (আলাইহিস্ সালাম) এর ঘটনা, হযরত লুকমান (আলাইহিস্ সালাম) ও তাঁর পুত্রের ঘটনা এবং এ ধরণের আরো অনেক বিষয়ের খবর, পূর্ববর্তী সৃষ্টির ইতিহাস, তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর, হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) ও হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) এর সহীফাসমূহের বিস্তারিত বিবরণ বলে দিচ্ছেন অবলীলায়। আর ঐ সমস্ত বিষয় জানা আলেমগণ তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করতো। তাদের ঐ সমস্ত ঘটনা মিথ্যা বা অস্বীকার করার সাহস ছিলোনা। বরং হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট এইসব বর্ণনা শুনার কারণে তাদের বিশ্বাস সুদৃঢ় হতো। এ কারণে তাদের মধ্যে অনেকে পূর্ববর্তী জ্ঞানের আলোকে হুযুর (সাল্লাল্লাহ

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর ঈমান আনার সৌভাগ্য লাভ করে। কিন্তু এরপরও অনেক দুর্ভাগা বদনসীব নিজেদের পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত থেকে যায়। এরূপ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সাথে ইহুদী ও খৃষ্টানদের ভীষণ শত্রুতা ছিলো। তারা সর্বদা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার চিন্তায় মগ্ন ছিলো। তিনি তাদের কিতাব থেকে দলিল পেশ করে। তাদেরকে সর্তক করতেন এবং তাদের কিতাবে বর্ণিত বিষয়ে তাদেরকে স্মরণ করে দিতেন। ইহুদী ও খৃষ্টানরা তাদের নবীদের সম্পর্কে প্রশ্ন করে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে অপদস্ত করার অপচেষ্টা চালাতো। তাদের জ্ঞানের পরিধি ও তাদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো। অথচ হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অবলীলায় তাদের শরীয়াতের গোপন রহস্যাবলী ও তাদের কিতাবে বর্ণিত আহকাম ইত্যাদি বলে দিতেন। যথা- রূহ এর বর্ণনা। যুলকারনাইনের বর্ণনা, আসহাবে কাহফের বিবরণ, হযরত ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) এর সাথে সম্পর্কিত সব প্রশ্নের জবাব। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো এরূপ প্রশ্ন করে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে উদ্বিগ্ন করা।

অতঃপর তাঁর তাওরাতে বর্ণিত "রজম" বা প্রস্তারাঘাতে হত্যা সম্পর্কিত বিবরণ বলা এবং এ সমস্ত বিষয় যা বনী ইসরাইল তাদের নিজেদের জন্য হারাম করে দেয়। আর ঐ সমস্ত জীবজন্তু যা তাদের জন্য নিশ্চিতভাবে হারাম করা হয়। অথবা ঐ জিনিস যা তাদের জন্য পূর্বে হালাল ছিলো। কিন্তু পরবর্তী সময় তাদের ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতার কারণে তাদের জন্য হারাম করা হয়। তাওরাত ও ইঞ্জীলে বর্ণিত বিবরণ হতে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উদাহরণ পেশ করা। তাছাড়া ঐ সমস্ত বিষয় যার সম্পর্কে কুরআন মাজীদে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। সে সমস্ত বিষয় তাদের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া। আর তাদেরকে তাঁর উপর ওহীর মাধ্যমে যা অবতীর্ণ হয়েছে সে সমস্ত বিষয় অভিহিত করা। এ সব কিছু বলার পরও কোন একজন লোক এ সম্পর্কে বলতে পারেনি যে, তারা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কথা অস্বীকার করছে ও মিথ্যা বলতে পারছে। বরং তাদের অধিকাংশ লোকেই স্পষ্টভাবে তাঁর নবুওয়াতের সত্যতার সাক্ষ্য দিয়ে তাঁর বর্ণনাকে অকাট্য সত্য বলে স্বীকার করেছে। আর নিজেদের প্রতিহিংসা ও শত্রুতার অঙ্গীকার করেছে। যথা নজরান অধিবাসী ইবনে সুরীয়া ও আখতাবের পুত্রদ্বয়।[১]

---

[১]. সামনে নাজরানের খৃষ্টানদের ঘটনা বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে। আবদুল্লাহ ইবনে সুরীয়া মদীনাবাসী ইহুদীদের খ্যাতনামা আলেম ছিলো। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনে ইহুদীরা ব্যভিচারের মামলা পেশ করে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ব্যভিচারের শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যার

তারা এ ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে দাবী করতো যে, আমাদের নিকট যা কিছু আছে তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত। আর তিনি যা কিছু বলেন, তাঁর দাবী প্রমাণ করার জন্য আহবান করেন।

এসম্পর্কে এরশাদ করা হয়েছে–

قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَىٰةِ فَاتْلُوهَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ۝ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ الظَّٰلِمُونَ ۝

–আপনি বলুন! তাওরাত এনে পাঠ করো যদি সত্যবাদী হও। সুতরাং এরপর যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রটনা করে তবে তারাই যালিম।[১]

অনুরূপ হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের নিন্দাবাদ প্রকাশ করে তাদেরকে ভয় দেখান এবং তিরস্কার করেন। আর এমন এক জিনিস পেশ করার জন্য আহবান জানালেন, যা পেশ করা কোন মানুষের পক্ষে কোনভাবে সম্ভব ছিলো না। তবে তাদের মধ্যে অনেকের অবস্থা এরূপ হয়েছে যে, তারা নিজেদের অস্বীকৃতির অঙ্গীকার করতে শুরু করে। আর এ ধরণের নির্লজ্জ কিছু লোক ছিলো, যারা অপমানিত ও লজ্জিত হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের কিতাবে লিখিত আয়াতসমূহ হাত দিয়ে গোপন করে রাখতো। এর দ্বারাও হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সত্যতার সাক্ষ্য প্রমাণিত হয়েছে।

যেমন, ইতোপূর্বে ইবনে সুরীয়ার কথা আলোচনা করা হয়েছে। তবে এ ধরণের কোনো ঘটনা কোনো ব্যক্তি থেকে বিদ্যমান পাওয়া যায়নি যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কথার বিপরীত কোনো কথা তাদের রচিত গ্রন্থে দেখাতে পারবে।

বিধান তাওরাতে লিখিত আছে। ঐ সময় আবদুল্লাহ ইবনে সুরীয়া তাওরাত নিয়ে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনে হাযির হয়ে ঐ আয়াতের উপর আঙ্গুল চাপা দিয়ে রাখে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার আঙ্গুল সরিয়ে দিয়ে বললেন, এই সেই রজম বা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার আয়াত। তার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। আবার কেউ বলেছেন কাফির অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে। হুই বিন আখতাব হলো হযরত সুফিয়া (রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহা) এর পিতা। হুই বিন আখতাবের দুই পুত্র ছিলো। তারা তাদের চাচা আবু ইয়াসীরকে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তখন সে বললো, ইসলাম সত্য দ্বীন। তারা জিজ্ঞেস করলো, চাচা আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন না কেন। তখন সে বললো, আমি প্রতিহিংসার কারণে ইসলাম গ্রহণ করতে পারিনা।

[১]. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:৯৩-৯৪।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করা হয়েছে–

يَٰٓأَهْلَ الْكِتَٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَٰبِ وَيَعْفُوا۟ عَن كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَآءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَٰبٌ مُّبِينٌ ۝

–হে কিতাবীরা! নিশ্চয় তোমাদের নিকট আমার এমন রাসূল আগমন করেছেন, যিনি তোমাদের নিকট প্রকাশ করেছেন সে সব বস্তু থেকে এমন অনেক কিছু, যেগুলো তোমরা কিতাবের মধ্যে গোপন করে ফেলেছিলে এবং অনেক কিছু ক্ষমা করে থাকেন। নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা 'নূর' এসেছে এবং স্পষ্ট কিতাব।[১]

---

[১]. আল কুরআন : সূরা মায়িদা, ৫:১৫।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

اَلتَّحَدِّيُّ وَالتَّعْجِيْزُ فِيْ قَضَايَا وَاِعْلَامِهِمْ اَنَّهُمْ لَا يَفْعَلُوْنَهَا

ইহুদীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া ও তাদের অক্ষমতা প্রসঙ্গে

কুরআন মাজীদ মু'জিযা হওয়ার উল্লেখিত চারটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংশয় বা সন্দেহ নেই। এসব স্পষ্ট কারণে কুরআন মু'জিযা বলে প্রমাণিত হয়েছে। ঐ সমস্ত আয়াতসমূহের সমারোহ ঘটেছে যা কোন কোন সময় কোন কোন জাতিকে অক্ষম করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। তাদেরকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা কখনো এরূপ করতে পারবেনা। আর পরবর্তী সময় দেখা গেছে কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তারা তা করতে সক্ষমও হয়নি এবং করতেও পারেনি। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদের সম্পর্কে এরশাদ করছেন–

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْءَاخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا۟ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ۝ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ

–হে রাসূল! আপনি তাদেরকে বলে দিন, যদি পরকালীন নিবাস আল্লাহর নিকট শুধু তোমাদের জন্যই নির্দিষ্ট হয়, না অন্য কারো জন্য, তবে তো ভালো, মৃত্যু কামনা করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। এবং অবশ্যই কখনো তারা এর কামনা করবে না সেই অপকর্মগুলোর কারণে, যেগুলো তারা পূর্বে করেছে।[১]

আবু ইসহাক যুজায বলেন- উক্ত আয়াত হলো হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রিসালাতের সুস্পষ্ট দলিল। কেননা আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতে মৃত্যুকামনার সাথে এ কথাও বলেছেন যে, তারা এরূপ করবেনা। যদি করে তাহলে কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী একজনও মৃত্যু কামনা করার জন্য প্রস্তুত হবেনা।

---

১. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:৯৪-৯৫।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

والذي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَقُولُهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَّا غُصَّ بِرِيقِهِ يَعْنِي يَمُوتُ مَكَانَهُ فَصَرَفَهُمُ اللهُ عَنْ تَمَنِّيهِ وَجَزَّعَهُمْ لِيُظْهِرَ صِدْقَ رَسُولِهِ وَصِحَّةَ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ إِذْ لَمْ يَتَمَنَّهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَكَانُوا عَلَى تَكْذِيبِهِ أَحْرَصَ لَوْ قَدَرُوا وَلَكِنِ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ فَظَهَرَتْ بذلك معجزته وَبَانَتْ حُجَّتُهُ،

–ওই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ। তাদের মধ্যে যদি একজনও একথা বলতো, তাহলে তাৎক্ষনিকভাবে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তো। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মৃত্যু কামনা করা থেকে বিরত রেখে তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাঁর সত্যতা ও তাঁর প্রতি অবতীর্ণ বাণীর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। অথচ তারা কেউই মৃত্যু কামনা করেনি। তবুও তারা মনেপ্রাণে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে মিথ্যাবাদী বলতো। সুতরাং এরূপ করার পর যদি তাদের বিন্দুমাত্র ক্ষমতা থাকতো তখনো তারা মিথ্যা বলার অজুহাতে মৃত্যু কামনা করতো। কিন্তু সত্য কথা হলো আল্লাহ তা'আলা যা চান তাই হয়। সুতরাং এ ঘটনায় হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মু'জিযা প্রকাশিত হয়েছে এবং তাঁর দলিল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হযরত আবু মুহাম্মদ উসায়লী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, এটা হলো এক আশ্চর্য ব্যাপার, যেদিন আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আদেশ করেছেন, সেদিন থেকে এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্য কাউকে পাওয়া যায়নি। আজও যদি তারা পরীক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসে তাহলে সে আদেশ এখনও বিদ্যমান আছে। মুবাহিলার নির্দেশ তাই। অনুরূপভাবে নজরানের পাদ্রীদের প্রতিনিধিদল হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে হাযির হয়। কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তখন আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর মুবাহিলার আয়াত অবতীর্ণ করেন।[১]

---

১. অর্থাৎ যদি আজও ইহুদীদের বলা হয়, যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও এবং প্রকৃতার্থে যদি তোমরা খোদার প্রিয় হও এবং আখিরাতের নিয়ামত তোমাদের জন্য নির্ধারিত হয়ে থাকে ,তাহলে আসো, মৃত্যু কামনা করো। তারা কক্ষনো এর জন্য রাজী হবেনা। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক কথা হলো এই যে, পৃথিবীর জাতি সমূহের মধ্যে ইহুদীরা জীবনকে বেশী পছন্দ করে আর মৃত্যুকে বেশী ভয় করে।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন–

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا۟ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَـٰذِبِينَ ﴿٦١﴾

–অতঃপর হে মাহবুব! যে ব্যক্তি আপনার সাথে ঈসা সম্পর্কে বিতর্ক করে এরপর যে, আপনার নিকট জ্ঞান (ওহী) এসেছে, তবে তাদেরকে বলে দিন, এসো আমরা ডেকে নিই আমাদের পুত্রদেরকে ও তোমাদের পুত্রদেরকে এবং আমরা আমাদের নারীদেরকে ও তোমরা তোমাদের নারীদেরকে; আর আমরা আমাদের নিজদেরকে ও তোমরা তোমাদের নিজদেরকে, অতঃপর 'মুবাহালাহ' (পরস্পর অভিসম্পাত) করি। তারপর মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লা'নত দিই।[১]

সেহেতু হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে মুবাহিলা করতে নজরানের পাদ্রীরা রাজী হয়নি। মুবাহিলা করার নিয়ম হলো– দু'দলে বিভক্ত হয়ে আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, যদি আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে আমাদের উপর খোদার অভিসম্পাত (লা'নত) হোক। আর যদি আমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হই তাহলে তাদের উপর খোদার অভিশাপ বর্ষিত হোক। কিন্তু তারা জিজিয়া কর প্রদান করতে রাজী হয়। তাদের নেতা ছিলো আকেব। সে তাদেরকে বললো, তোমরা জানো যে, তিনি সত্য নবী। যারা কোন নবীর সাথে মুবাহিলা করতো, তাদের ছোট বড় কোন লোকই অবশিষ্ট থাকতো না। শুধু তাই নয় বরং তাদের পুরো বংশই ধ্বংস হয়ে পড়তো।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا۟ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ وَلَن تَفْعَلُوا۟

[১]. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:৬১।

–এবং যদি তোমাদের কোন সন্দেহ হয় তাতে, যা আমি আমার এ খাস বান্দার উপর অবতীর্ণ করেছি, তবে এর অনুরূপ একটা সূরা তো নিয়ে এসো। এবং আল্লাহ ব্যতীত নিজেদের সকল সাহায্যকারীদের আহবান করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। অতঃপর যদি আনয়ন করতে না পারো আর আমি চ্যালেঞ্জ করছি যে, কখনো আনতে পারবেনা।[১]

আলোচ্য এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জানিয়ে দেন যে, তোমরা কস্মিন কালেও তা করতে পারবেনা। এ আয়াতে খবরও দেয়া হয়েছে। আবার এ আয়াতে অক্ষম হবার ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। যেমনটি পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

[১]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২: ২৩-২৪।

নবম পরিচ্ছেদ

رَوْعَتُهُ فِي السَّمْعِ وَهَيْبَتُهُ فِي الْقُلُوْبِ

কুরআন মাজীদের শ্রুতি মধুরতা ও হৃদয়গ্রাহীতা

কুরআন মাজীদ মু'জিযা হওয়ার আরেক দিক হলো এই যে, কুরআন মাজীদ শ্রবণ কালে শ্রবণকারীর অন্তর ও মন উভয়ই ভীতসন্ত্রস্ত হয় এবং অন্তরে ভাবের উদয় হয়। এরূপ ভীতির সঞ্চার হওয়ার কারণ হলো আল্লাহর কালামের পরাক্রমশীলতা এবং জালালীয়াতের শান তাদের উপর প্রবল হওয়া। আর মিথ্যাবাদী কাফিরদের জন্য এ কালাম শ্রবণ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই কুরআন মাজীদ শ্রবণ করা থেকে দূরে থাকা তাদের জন্য স্বস্তিজনক। কুরআনের আবৃত্তি শোনা তারা সহ্যই করতে পারেনা। বরং কুরআনের প্রতি তাদের ঘৃণাবোধ বেড়ে যায়। একথাও আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন– وَيَوَدُّوْنَ انْقِطَاعَهُ لِكَرَاهَتِهِمْ لَهُ –কুরআন মাজীদ অপছন্দ হওয়ার কারণে এটা শ্রবণ করা তাদের নিকট কষ্টকর।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন–

إِنَّ الْقُرْآنَ صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ عَلَى مَن كَرِهَهُ وَهُوَ الْحَكَمُ وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَلَا تَزَالُ رَوْعَتُهُ بِهِ وَهَيْبَتُهُ إِيَّاهُ مَعَ تِلَاوَتِهِ تُولِيهِ انْجِذَابًا وَتَكْسِبُهُ هَشَاشَةً لِّمَيْلِ قَلْبِهِ إِلَيْهِ وَتَصْدِيقِهِ بِهِ

– যে কুরআন শুনা অপছন্দ করে তার জন্য কুরআন শোনা কষ্টকর। আর এটা অতি উত্তম ফয়সালাকারী যে, মুমিনদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার হয় এবং কুরআনের প্রতি আগ্রহ আরো বেড়ে যায়। তখন মুমিনদের অন্তর জগতে প্রশান্তি ও প্রশস্ততার ধারা প্রবাহিত হয়। তাদের অন্তরে এক ধরণের আকৃষ্টতার উদ্রেক হয়। তাদের বিশ্বাস ও আন্তরিক মুহাব্বতের কারণে এই অবস্থা হয়।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন–

تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ

–সেটার কারণে ভয়ে লোম খাড়া হয়ে যায় তাদের শরীরের উপর। যারা আপন রবকে ভয় করে। অতঃপর তাদের চামড়া ও হৃদয় নম্র হয়ে পড়ে আল্লাহর স্মরণের প্রতি আগ্রহে।[১]

আল্লাহ তা'আলা আরো এরশাদ করেছেন–

لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

–যদি আমি এই কুরআন কোন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তাহলে অবশ্যই তোমরা সেটাকে দেখতে অবনত টুকরো টুকরো অবস্থায়, আল্লাহর ভয়ে আর আমি এসব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্য, যাতে তারা চিন্তা করে।[২]

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, ভীতির সঞ্চার হওয়া কুরআন মাজীদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। কুরআন শ্রবণকারী জ্ঞান ও বুদ্ধির অধিকারী হোক বা না হোক এর অর্থ বা ব্যাখ্যা উপলব্ধি করুক কিংবা না করুক শ্রবণকারীর মধ্যে ভীতির সঞ্চার ও প্রতিক্রিয়া হবেই।

জনৈক খৃষ্টানের এক ঘটনা আছে। একদিন খৃষ্টান কোন এক কুরআন তিলাওয়াতকারীর নিকট দিয়ে গমন করছিলো। কুরআন পাঠের শব্দ তার কানে আসা মাত্রই সে দাঁড়িয়ে কাঁদতে শুরু করে। লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কাঁদছো কেনো? তুমি তো এর অর্থ বুঝোনা। সে বললো, আমি এর মাধুর্য ও বাচনভঙ্গিতে অভিভূত হয়ে কাঁদছি। কুরআনের এই ভীতি মানুষের অন্তরে ইসলাম গ্রহণ করার পরে হয়। কিছু লোকের অবস্থা এমন হয় তারা কুফরীর কারণে কুরআনের উপর বিশ্বাস স্থাপন থেকে বিরত থাকে।

এ প্রসঙ্গে হযরত জুবায়ির ইবনে মুতইম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি একদা শুনতে পাই যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু

---

১. আল কুরআন : সূরা যুমার, ৩৯:২৩।
২. আল কুরআন : সূরা হাশর, ৫৯:২১।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাগরিবের নামাযে সূরা-তূর তিলাওয়াত করছেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴿٣٧﴾

–তারা কি কোন মূল থেকে সৃষ্ট নয়, না তারা স্রষ্টা? নাকি আসমান ও যমীনকে তারাই সৃষ্টি করেছে? বরং তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস নেই। আপনার পালনকর্তার ভাণ্ডার কি তাদের নিকট রয়েছে। না তারা নিয়ন্তা?[১]

তখন আমার মনে হয়, আমার প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। অপর এক বর্ণনায় আছে। তিনি বলেন, এরকম প্রতিক্রিয়া আমার মধ্যে এই প্রথম কুরআন শ্রবণে হয়েছে। এর ফলে ইসলাম আমার অন্তরে স্থান লাভ করে। উকবা বিন রবিয়া সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে তার কাউমের মতভেদ সম্পর্কিত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সূরা হামিম আস সিজদার নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ

–সর্তক করছি এক বজ্রাহত সম্পর্কে যেমন বজ্রপাত আদ ও সামুদের উপর এসোছিলো।[২]

তাৎক্ষনিকভাবে তিনি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র হাতের উপর তার হাত রেখে বললেন। আপনাকে আত্মীয়তার কসম দিয়ে বলছি অনেক হয়েছে। আর নয়।

অপর এক বর্ণনায় আছে– হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করছেন আর উকবা দু'হাত পিঠের পিছনের দিকে হেলান দিয়ে বসে বসে মনোযোগ সহকারে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর তিলাওয়াত

১. আল কুরআন : সূরা তূর, ৫২:৩৫-৩৭।
২. আল কুরআন : সূরা হা-মীম-সাজদাহ, ৪১:১৩।

শুনছেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিলাওয়াত করতে করতে সিজদায় আয়াত পর্যন্ত পৌছেন তখন উকবা সিজদায় পতিত হন। উকবা উঠে দাঁড়িয়ে মনে মনে চিন্তা করে স্বগোত্রীয় লোকদের নিকট ফিরে গিয়ে তাদেরকে কি বলবো। এসব কথা চিন্তা করে সে স্বগোত্রীয় লোকদের নিকট পৌছেনি। লোকজন দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে উকবার নিকট আসে। উকবা তার স্বগোত্রীয় লোকদের নিকট তার অপরাগতার কথা স্বীকার করে বলে, খোদার কসম! আজ আমি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট এমন কালাম শুনেছি, যা ইতোপূর্বে আমার কান কোনদিন শ্রবণ করেনি। আমি চিন্তা করে স্থির করতে পারছিনা যে, এ কালামের ব্যাপারে কি বলবো। তাদের মতো অনেক লোকই কুরআন মাজীদের মুকাবিলা করার চেষ্টা করছে। তাদের প্রসঙ্গে বর্ণিত কুরআন মাজীদের আয়াত তাদের উপর ভীতির সঞ্চার করে। তাই তারা কুরআনের মুকাবিলা করার চিন্তা ভাবনা পরিত্যাগ করেছে।

বর্ণিত আছে, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ইবনে মুকাফ্ফা কুরআন মাজীদের মুকাবিলার ইচ্ছা করেছিলো এবং সে কুরআনের মুকাবিলায় আয়াত তৈরী করা শুরু করেছিলো। একদা সে এক বাচ্চার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলো। আর বাচ্চাটি এ আয়াত তিলাওয়াত করছিলো–

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ

–এবং নির্দেশ দেয়া হলো, হে যমীন! তুমি তোমার পানি গ্রাস করে নাও।[১]

সে তাৎক্ষনিকভাবে ঘরে ফিরে এসে তার লিখিত পাণ্ডুলিপিগুলো নষ্ট করে বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এই কালামের মুকাবিলা করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আর এটা কোনো মানুষের কালামও নয়। অথচ সে তার যুগের একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও বাগ্মি ব্যক্তি ছিলো।

অনুরূপভাবে ইয়াহইয়া বিন হাকাম গাযালা নিঃসন্দেহে সে সময়ে স্পেনের একজন অতুলনীয় সাহিত্যিক ছিলো। তার সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, সেও একবার এরূপ করার ইচ্ছে করে। তাই সে সূরা এখলাস পাঠ করে এর অনুরূপ বাক্য প্রস্তুত করার ঘোষণা দেয়। সে স্বীয় ধারণা অনুযায়ী কিছু আয়াত তৈরী করে বললো,

فَاعْتَرَتْنِي مِنْهُ خَشْيَةٌ ورقة حَمَلَتْنِي عَلَى التَّوْبَةِ وَالْإِنَابَةِ.

–তখন আমার মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়। অবশেষে আমি ভীত হয়ে তাওবা করি এবং এ কাজ পরিত্যাগ করি।

১. আল কুরআন : সূরা হূদ, ১১:৪৪।

দশম পরিচ্ছেদ

بَقَاؤُهُ عَلَى الزَّمَنِ

কুরআন মাজীদ চিরস্থায়ী মু'জিযা

কুরআন মাজীদ মু'জিযা হওয়ার কারণসমূহের মধ্যে এটাও এক কারণ যে, এর আয়াতসমূহ চিরস্থায়ী। এর আয়াতসমূহ কিয়ামত বা মহাপ্রলয় পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং এর সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ ﴿٩﴾

– নিশ্চয় আমিই এ কুরআন নাযিল করেছি, আর আমিই এর সংরক্ষক।[১]

সমস্ত আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) এর মু'জিযাসমূহ তাঁদের যুগ শেষ হবার সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়। এখন শুধু অবশিষ্ট রয়েছে তাদের কিচ্ছা-কাহিনী। কিন্তু কুরআন মাজীদ অদ্যাবধি চিরপ্রোজ্জ্বল ভাস্কর ও প্রকাশ্য। তা অবতীর্ণ হয়েছে আজ থেকে পাঁচশ'ত্রিশ বছর পূর্বে (অর্থাৎ এ কিতাব লেখার সময়) কিন্তু বর্তমানে ১৪৩২ বছর অতিবাহিত হবার পরও এর প্রভাব প্রতিপত্তি যুগেই খ্যাতনামা ভাষাবিদ, বাগ্মিতাও অলংকারশাস্ত্রে মহা পণ্ডিত, তেজোদীপ্ত বক্তা, সীমাতিক্রমকারী দীনের অনেক দুশমন এর বিরোধিতা করার প্রস্তুতি নিয়েছে। তারা এখনো আছে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই আজ পর্যন্ত কুরআনের মুকাবিলা করতে পেরেছি কী? তাদের মধ্যে কেউ কুরআনকে খণ্ডন করার মতো কোন রচনা উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়নি। তাদের কেউ আজ পর্যন্ত কুরআন মাজীদের দোষত্রুটি স্থির করতে পারেনি। তারা অনেক ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে সরগরম করেছে। তাদের প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, যারা এ ধরণের ধৃষ্টতা দেখিয়েছে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অবশেষে হাত গুটিয়ে ময়দান ছেড়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছে।

১. আল কুরআন : সূরা হিজর, ১৫:৯।

একাদশ পরিচ্ছেদ

وُجُوهٌ أُخْرَى لِلْإِعْجَازِ

কুরআনের অন্যান্য মু'জিযা বার বার পাঠেও এক ঘেঁয়েমীর উদ্রেক হয়না

উম্মাতের সমস্ত ওলামা কুরআন মাজীদের বহুবিধ 'এজাজ' বা অলৌকিক বিস্ময়তার মধ্যে এটাও এক অলৌকিক বিস্ময়তা স্থির করেছে যে, এর পাঠক বার বার পাঠ করার পরও একঘেঁয়েমি অনুভব করে না। বরং বার বার পাঠ করার পরেও পাঠকের মনে আনন্দ, মুহাব্বত, সজীবতা এবং উত্তরোত্তর স্বাদ অনুভব করে। অথচ অন্য যে-কোন কালাম যতই উন্নত মানের হোক না কেনো তা একাধিকবার পাঠ করার পর মনের মধ্যে এক ঘেয়েমি ও বিতৃষ্ণার ভাব পরিলক্ষিত হয়। পুনরাবৃত্তি করার কারণে স্বভাব বিদঘুটে হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের এ কালামে মাজীদ সর্ম্পূণ এর বিপরীত। নির্জনে এর তিলাওয়াতে আস্বাদ বেশী অনুভূত হয়। প্রতিকূল পরিস্থিতি ও পরিবেশেও এর তিলাওয়াতে মনে প্রশান্তি অনুভূত হয়। কিন্তু অন্যান্য কালাম এর বিপরীত। সেগুলো যতোই কাব্য সুষমামণ্ডিত ও সুন্দর হোক না কেনো তা বারংবার পাঠে বিস্বাদ ও তিক্ত হয়ে যায়।

এ কারণে কুরআন মাজীদের প্রশংসা করে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

لَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلَا تَنْقَضِي عِبَرُهُ وَلَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ، هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ لَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ حِينَ سَمِعَتْهُ أَنْ قَالُوا (إِنَّا سَمِعْنَا قرآنا عجبا يهدى إلى الرشد).

–বার বার তিলাওয়াত করার পরও এটা পুরানো হয়না। এর উপদেশ উদাহরণও সর্তকবাণীসমূহ নিঃশেষ হয়না। আর না এর অলৌকিকতা লোপ পায়। এর বাণীসমূহ মীমাংসিত ও নির্ধারিত। এটা কোনো খেল তামাশা নয়। কখনো জ্ঞানীগণ এর দ্বারা আত্মতৃপ্তি লাভ করেনা। বরং বার বার এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনায় লিপ্ত হয়। প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে বিপথগামী হয়না। আর না এর দ্বারা মনে কোনো সংশয় ও সন্দেহের উদ্রেক হয়। এ কালাম শোনার পর জিনেরা বললো–

إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ۝ يَهْدِىٓ إِلَى ٱلرُّشْدِ

–অতঃপর বললো আমরা এক আশ্চর্যজনক কুরআন শুনেছি, যা মঙ্গলের পথ বাতলিয়ে দেয়।[১]

কুরআন মাজীদের আরো এক সৌন্দর্য হলো এই যে, তাতে সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান সন্নিবেশ করা হয়েছে। যার ব্যবহার আরববাসীদের মধ্যে ছিলনা। এমন কি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নবুওয়াতের পূর্বে ঐ সমস্ত ইলম ও মারিফাত সম্পর্কে অবগত ছিলনা। আর না ঐ বিষয়ের সাথে তাঁর সার্বক্ষণিক সংশ্লিষ্টতা ছিলো। পৃথিবীর অতীতের উম্মাতের আলেম সমাজের মধ্যে কেউই এ বিষয়ে কিছু রচনা করে যায়নি। আর না তাদের কোন কিতাবে এ জাতীয় ইলম ও মারিফাত লিপিবদ্ধ ছিলো। কিন্তু কুরআন মাজীদে শরীয়াতের ইলমের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বিশ্বাসগত প্রমাণ ও সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু কুরআন মাজীদে পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট জাতিসমূহের স্পষ্ট দলিলসমূহের উজ্জ্বল প্রমাণসমূহ সহজ ও সংক্ষিপ্ত ভাষায় বাতিল করে দিয়েছে। অনেক অনেক খ্যাতনামা জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত ও যুগবরেণ্য ব্যক্তি কুরআনের দলিলের আলোকে দলিল প্রমাণ উপস্থাপনের প্রচেষ্টা করেছে। কিন্তু পরিশেষে তারা অক্ষম হয়েছে।

কুরআনের এ দলিলের উপর বিন্দুমাত্র আলোকপাত করলে তা সহজে অনুমেয় হয়। পবিত্র কুরআন মাজীদে এরশাদ করা হয়েছে-

أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّٰقُ ٱلْعَلِيمُ ۝

–এবং যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেন, তিনি কি সেগুলোর মতো আরো সৃষ্টি করতে পারেননা?[২]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করেছেন–

قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ

–হে রাসূল! আপনি বলুন, সেগুলোই তিনিই জীবিত করবেন, যিনি প্রথম বারেই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।[৩]

১. আল কুরআন : সূরা জ্বীন, ৭২:১-২।
২. আল কুরআন : সূরা ইয়াসীন, ৩৬:৮১।
৩. আল কুরআন : সূরা ইয়াসীন, ৩৬:৭৯।

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ

–যদি আসমান ও যমীনের মধ্যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন খোদা থাকতো, তবে অবশ্যই সেগুলো ধ্বংস হয়ে যেতো।[১]

উপরোক্ত দলিলসমূহের শক্তি ও অনবদ্যতা সত্যই লক্ষণীয়। এছাড়া সীরাত, অতীত জাতিসমূহের ইতিহাস, উপদেশবাণী, প্রজ্ঞাবানী, পরকাল সম্পর্কিত সংবাদ, আদব-শিষ্টাচার, আখলাক ইত্যাদি বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করা হয়েছে–

مَّا فَرَّطْنَا فِى ٱلْكِتَٰبِ مِن شَىْءٍ ۚ

–আমি কুরআনের মধ্যে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করতে ত্রুটি করিনি।[২]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ

–আমি আপনার উপর সর্ববিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কুরআন নাযিল করেছি।[৩]

অপর এক আয়াতে বর্ণিত আছে–

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِى هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ

–এবং নিশ্চয় আমি এই কুরআনে মধ্যে মানুষের জন্য সকল উদাহরণ বর্ণনা করেছি।[৪]

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

أن اللهَ أنْزَلَ هَذَا الْقُرْآنَ آمِرًا وَزَاجِرًا وَسُنَّةً خَالِيَةً وَمَثَلًا مضروبة فِيهِ نَبَؤُكُمْ وَخَبَرُ ما كَانَ قَبْلَكُمْ وَنَبَأُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ لَا يُخْلِقُهُ طُولُ الرَّدِّ

১. আল কুরআন : সূরা আম্বিয়া, ২১:২২।
২. আল কুরআন : সূরা আন'আম, ৬:৩৮।
৩. আল কুরআন : সূরা নাহল, ১৬:৮৯।
৪. আল কুরআন : সূরা রূম, ৩০:৫৮।

وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الْحَقُّ لَيْسَ بِالْهَزْلِ من قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ خَاصَمَ بِهِ فَلَجَ وَمَنْ قَسَمَ بِهِ أَقْسَطَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ وَمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم وَمَنْ طَلَبَ الْهُدَى من غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللهُ وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِهِ قَصَمَهُ اللهُ، هُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَالنُّورُ الْمُبِينُ وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَحَبْلُ اللهِ الْمَتِينُ وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ، عِصْمَةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ وَنَجَاةٌ لِمَن اتَّبَعَهُ، لَا يَعْوَجُّ فَيُقَوَّمَ وَلَا يَزِيغُ فَيُسْتَعْتَبَ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ،

–নিঃসন্দেহের আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদকে নির্দেশদাতা বানিয়েছেন। মস্তকঅবনতকারী, সঠিক পথের সন্ধান প্রদানকারী, অনুস্মরণীয় ও অনুকরণীয় উদাহরণ প্রদানকারী বানিয়েছেন। এই কালামে তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের এবং তোমাদের পরবর্তীদের খবর দেয়া হয়েছে। এই কালাম তোমাদের মধ্যে মিমাংসাকারী। দীর্ঘদিন আবৃত্তি করার পরও এই কালাম পুরাতন হয়না এবং এর উজ্জ্বলতাও হ্রাস পায়না। এ কালাম সত্য, হাসি-তামাসা করার বস্তু নয়। এ কালামের নির্দেশ অনুযায়ী আদেশ প্রদানকারী সত্যবাদী। এ কালামের নির্দেশ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনাকারী আদিল বা বিশ্বস্ত। এর আদেশ অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনকারী সফলকাম হবে। এর নির্দেশ অনুযায়ী ভাগ বন্টনকারী ইনসাফকারী। এর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করলে তাকে প্রতিদান দেয়া হবে। যে এটাকে আঁকড়িয়ে থাকবে সে সঠিক পথের সন্ধান লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদ ত্যাগ করে অন্য বস্তুর মধ্যে পথ নির্দেশনা খুঁজবে সে পথভ্রষ্ট হবে। যে কুরআন বাদ দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে তাকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। এ কিতাব হিকমতে পরিপূর্ণ উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। সঠিক পথ আল্লাহ তা'আলার সুদৃঢ় রশি। উপকার লাভের প্রতিষেধক। যে ব্যক্তি এর উপর আঁকড়ে থাকবে সে নিরাপত্তা পাবে। আর যে এটাকে আঁকড়ে ধরবে সে নাজাত পাবে। কেননা এ কিতাব কাউকে বক্রপথে যেতে দেয়না বরং যদি কেউ বক্রপথের অনুসারী হয়ে যায় তাকে সঠিকপথে পরিচালিত করে। যে আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে সে বক্রপথের অনুসারী হতে পারেনা। আর

এর মু'জিযাসমূহ নিঃশেষ হবার নয়। বার বার আবৃত্তি করার পর এ কিতাব বিস্বাদময় হয়না।[১]

এ ধরণের বর্ণনা হযরত ইবনে মাস'উদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। কিন্তু তাঁর বর্ণনা অতিরিক্ত বলা হয়েছে,

وَلَا يَخْتَلِفُ وَلَا يَتَشَانُّ، فِيهِ نَبَأُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ،

–এ কালামে কোনো প্রকার মতবিরোধ ও সন্দেহ নেই। তাতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে জানিয়েছেন যে,

إِنِّي مُنَزِّلٌ عَلَيْكَ تَوْرَاةً حَدِيثَةً تَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عميا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا فِيهَا يَنَابِيعُ الْعِلْمِ وَفَهْمُ الْحِكْمَةِ وَرَبِيعُ القلوب،

–আমি আপনার উপর নতুন তাওরাত অবতীর্ণ করবো। তা অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি ও বধিরদের শ্রবণশক্তিকে সজীব করে দেবো। আর অন্তরের পর্দা সমূহ সরিয়ে দেবে তাতে ইলমের উৎস, জ্ঞানের গভীরতা ও অন্তরে নবজাগরণের সমারোহ ঘটাবে।[২]

হযরত কা'ব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

عليكم بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ فَهْمُ الْعُقُولِ وَنُورُ الْحِكْمَةِ،

–তোমরা কুরআন মাজীদকে আঁকড়ে ধরো, কেননা তা অন্তরের জ্ঞান হিকমতের আলোকবর্তিকা।

এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে এরশাদ করা হয়েছে–

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾

১. ক) ইবনে আবী শায়বা : আল মুসান্নাফ, ৭:১৬৫।
খ) হাকেম : আল মুসতাদ্‌রাক আলাস্ সহীহাইন, বাবু ইখবারি ফী ফাদ্বায়িলিল কুরআন, ৫:১০৪, হাদিস নং : ১৯৯৮।
গ) বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, ৪:৪৯৮, হাদিস নং : ১৯৩০।
ঘ) দারেমী : আস্ সুনান, বাবু ফাদ্বায়িলি মিন কয়িল কুরআন, ১০:১৯১, হাদিস নং : ৩৩৭৮।
২. দারেমী : আস্ সুনান, বাবু ফদ্বলি মান ক্বারাআল কুরআন, ১০:২০৫, হাদিস নং : ৩৩৯০।

–নিশ্চয় এ কুরআন উল্লেখ করেছে বনি ইসরাঈলদের নিকট, ঐ সব কথার অধিকাংশগুলো সম্বন্ধে তারা মতভেদ করে।[১]

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾

–এই কুরআন মানুষের জন্য সুস্পষ্ট বর্ণনা ও হিদায়াত।[২]

এ কিতাবের শব্দসমূহ সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও ব্যাপক অর্থবোধক পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবের মোকাবিলায় তাতে দ্বিগুণ শব্দ ও চতুর্গুণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সমারোহ ঘটেছে। এর মু'জিযাসমূহের মধ্যে এটাও এক মু'জিযা যে ঐ একই কিতাবে দলিলসমূহ বিদ্যমান রয়েছে। আর তা এরূপ যে, এর বাণীসমূহ প্রমাণ হয়েছে তাও বিদ্যমান রয়েছে। আর তা এরূপ যে, এর বাণীসমূহ নযম বা পদ্যের ধারায় উপস্থাপন করা সত্ত্বে ও এর সৌন্দর্য্য অলৌকিক বৈশিষ্ট্য ভাষা অলংকরণ ও ভাষা অলংকরণের আওতায় আদেশ, নিষেধ, বিজ্ঞপ্তি, প্রতিশ্রুতি, সর্তক সংকেতের উল্লেখ করা হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে একই সূরা তিলাওয়াতকারী একই বাক্যে ও একই সূরার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সৌন্দর্য্যাবলী বিদ্যমান পায়, এর ফলে অতিরিক্ত দলিল অনুসন্ধান করার কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যায়। আর একই কালামে দাবী করা হয় যে, তা বাগ্মিতাময় ও অলংকরণ পূর্ণ। আর এ ধরণের সুন্দর পদ্যের ধারা ও অলৌকিক বিস্ময় ও ভাষা অলংকরণ একেঅপরের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত।

কুরআন মাজীদের আরো এক বিস্ময়তার প্রমাণ হলো যে, এরূপ পদ্যের ধারা ও উদ্ভাবনী পন্থায় ইতোপূর্বে প্রচলন হয়নি। তাকে গদ্যও বলা যায়না। কেননা গদ্য কণ্ঠস্থ করা কঠিন। অথচ কুরআন মাজীদ অতি তাড়াতাড়ি কণ্ঠস্থ হয়ে যায়। সুতরাং তা পদ্য না হওয়া সত্ত্বেও তাতে পদ্যের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যথা পদ্যের মধ্যে চিত্তাকর্ষণ ক্ষমতা অনেক বেশী, তাই এটা মানুষের জন্য সহজসাধ্য। শ্রবণ শক্তি অতি সহজে সজাগ হয় ও মনমেজাজে প্রশান্তি অনুভূত হয়। মানুষ এর প্রতি সহজে আকৃষ্ট হয়। মানুষের মধ্যে অনুধাবনের উদ্রেক হয়। এটা পদ্যের ধারা না হওয়া সত্ত্বে এসকল বৈশিষ্ট্য এতে বিদ্যমান পাওয়া যায়।

---

১. আল কুরআন : সূরা নমল, ২৭:৭৬।
২. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:১৩৮।

কুরআন মাজীদে মু'জিযা হওয়ার আরেক দলিল হলো-মআল্লাহ তা'আলা এটাকে শিক্ষার্থীদের জন্য সহজসাধ্য করেছেন। যদি কেউ তা মুখস্থ করতে চায় সে অতি সহজে মুখস্থ করতে সক্ষম হয়।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন–

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿١٧﴾

–নিশ্চয় আমি স্মৃতি বদ্ধ করার জন্য কুরআনকে সহজ বানিয়ে দিয়েছি।[১]

পূর্ববর্তী উম্মাতদের অবস্থা ছিলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের কিতাবসমূহ তারা মুখস্থ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এখন আপনারই বলুন, এতো দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হবার পর কি করে আশা করা যায় যে, তা কেউ মুখস্থ করতে সক্ষম হবে। অথচ কুরআন মাজীদের অবস্থা হলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত। অতি অল্প বয়স্ক একটি বাচ্চা অল্প দিনের মধ্যে তা মুখস্থ করতে সক্ষম হয়।

কুরআন মাজীদের অলৌকিক বিস্ময়ের আরেক দিকের প্রমাণ হলো এই যে, এর এক যুজ বা অংশ অপর যুজ বা অংশের সাথে সাদৃশ্য পূর্ণ। আলোচ্য বিষয়ে ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও পারস্পরিক সামঞ্জস্যতা বিদ্যমান পাওয়া যায়। এ কারণে দেখা যায় যে, অত্যন্ত নিপুণতা ও সৌন্দর্যের মাধ্যমে এক ঘটনা থেকে অন্য ঘটনার দিকে আলোচনা নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবুও একই সূরার মধ্যে আদেশ নিষেধ, বিজ্ঞপ্তি, কৈফিয়ত তলব, প্রতিশ্রুতি, সতর্ক সংকেত, নবুওয়াত সাব্যস্ত করণের প্রমাণ, তাওহীদের বিবরণ, ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রতি উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা, ভয় প্রদর্শন ইত্যাদি বিষয়ের মতো অন্যান্য বিষয়ও দোষ-ত্রুটি ছাড়া নিখুঁতভাবে সমবেত করা হয়েছে। যদি কুরআন মাজীদ মু'জিযাই না হয়; তাহলে এরূপ হলো কি করে?

বাগ্মীতা ও অলংকরণ পূর্ণ কালামের মধ্যে এ জাতীয় বিষয়ের বর্ণনা একত্রিত করতে গেলে দেখা যায় তাতে দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। ভাষার ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। বাক্যের মধ্যে শব্দের ধারাবাহিকতা বিলুপ্ত হয় ভাষ্যের মধ্যে দোদুল্যমানতা সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু কুরআন মাজীদ এসব জড়তা ও দুর্বলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

আমরা সূরা-সোয়াদ-এর প্রাথমিক আয়াতসমূহ নিয়ে যদি চিন্তা-গবেষণা করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, তাতে কিভাবে কাফিরদের খবরা-খবর তাদের মতবিরোধের জন্য সর্তক করে তাদের মস্তক অবনত করে দেয়া হয়েছে। অতীত

---

১. আল কুরআন : সূরা ক্বামার, ৫৪:১৭।

জাতিসমূহের নাফরমানী করার কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। তারপরও কাফিরদের হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করা, তাঁর আনিত বিষয়সমূহের উপর বিস্ময় প্রকাশ করা এবং তাদের বিস্ময় প্রকাশের প্রতি উত্তর প্রদান করা হয়েছে। তারপর তাদের কুফরের উপর সমবেত হওয়া, তাদের কথায় কিভাবে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপরপ্রতি হিংসা-বিদ্বেষ প্রতিফলিত হয়েছে তার বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

তারপর আল্লাহ তা'আলা কীভাবে তাদেরকে অক্ষম ও অপদস্ত করেছেন এবং তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে কি ধরণের অপমান ও লাঞ্ছিত করার ধমকি দিয়েছেন। আর কীভাবে পূর্ববর্তী লোকজন হযরত আম্বিয়া কেরামকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করেছে আর আল্লাহ তা'আলা কীভাবে তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। এখনও যদি সে ধরণের আচরণ করা হয় তাহলে কি করা হবে তার বিবরণ পেশ করেছেন। অতঃপর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাফিরদের অত্যাচার নির্যাতনের কিভাবে সবর ইখতিয়ার করেছেন এবং তাঁকে পূর্ববর্তী আম্বিয়া কেরামের আলোচনা দ্বারা কীভাবে সান্ত্বনা প্রদান করেছেন ইত্যাদি বিবরণ পেশ করা হয়।

অতঃপর হযরত দাউদ (আলাইহিস্ সালাম) ও অন্যান্য আম্বিয়া কেরামের ইতিহাস বর্ণনা করেন। এর যাবতীয় বৈশিষ্ট্য পূর্ণাঙ্গ অলৌকিক বিস্ময়তা উচ্চাঙ্গ পদ্যের ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে অধিকাংশ স্থানে একাধিক বিষয়কে অতি সংক্ষিপ্ত বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এরূপ অনেক অনেক বিষয় কুরআন মাজীদ মু'জিযা হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করেছে। এগুলো ছাড়াও কুরআন মাজীদের অলৌকিক বিস্ময়তা সম্পর্কে ওলামাগণ অনেক কারণ উল্লেখ করেছেন। যেগুলো এখানে আলোচনা করা মনোপুত নয় বলে আমি উল্লেখ করিনি। কেননা সেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে "বালাগাত" বা ভাষা অলংকরণের সাথে সম্পর্কিত। আর আমি এটাই চাই না যে, কুরআন মাজীদের বিস্ময়তাকে প্রমাণ করার জন্য শুধু ভাষা অলংকরণে সম্পর্কে আলোচনা করা হোক। এ ধরণের অনেক কারণ আলেমগণ উল্লেখ করেছেন। যা কুরআন মাজীদের বৈশিষ্ট্য ও ফাযায়েলের সাথে সম্পর্কিত সেগুলো কিন্তু কুরআন মাজীদের বিস্ময়তার সাথে সম্পর্কিত নয়। আর এর হাকীকত হলো এই যে, কুরআন মাজীদের অলৌকিক বিস্ময়তার কতিপয় কারণ পূর্বে উল্লেখ করেছি। সেগুলোর উপর নির্ভরশীল হলে চলবে। এছাড়াও আরো বহুবিধ কারণ রয়েছে। যা কোন দিন শেষ হবার নয়। আল্লাহ তা'আলা তৌফিক দানকারী।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

فِيْ إِنْشِقَاقِ الْقَمَرِ وَحَبْسِ الشَّمْسِ

হুযুর (ﷺ) কর্তৃক মু'জিযা চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত করা ও অস্তমিত সূর্য ফিরিয়ে আনা

আল্লাহ তা'আলার বাণী–

اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۝ وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۝

–নিকটে এসেছে কিয়ামত এবং দ্বি-খণ্ডিত হয়েছে চন্দ্র। এবং যদি কোন নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আর বলে, এ তো যাদু যা চলে আসছে।[১]

মহান আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে চাঁদ দ্বি-খণ্ডিত হওয়ার কথা অতীত ক্রিয়া জ্ঞাপক শব্দে উল্লেখ করে এ কথা বলেছেন যে, কাফিররা আল্লাহর নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে। সমস্ত তাফসীরবিদ ও আহলে সুন্নাতের অনুসারী আলেমগণ উক্ত ঘটনা সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে ঐক্যমতে উপনীত হয়েছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণনায় বর্ণিত আছে,

اِنْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةٌ فَوْقَ الْجَبَلِ وَفِرْقَةٌ دُوْنَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْهَدُوْا،

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যমানায় চাঁদ দ্বি-খণ্ডিত হয়ে একখণ্ড পাহাড়ের উপর পতিত হয়। আর অপর খণ্ড তাঁর নিচে পতিত হয়। অতঃপর হুযুর বলেন, তোমরা সাক্ষী থাকো।[২]

আর হযরত মুজাহিদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণনায় বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ،

–ঐ সময় আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র সাথে ছিলাম।[১]

---

১. আল কুরআন : সূরা ক্বামার ৫৪:১-২।

২. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু ওয়া ইনশাক্বাল কামারু, ১৫:১১৫, হাদিস নং : ৪৪৮৬।
খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু ফাযায়িলি সায়্যিদিল মুরসালীন, পৃ. ২৭৩, হাদিস নং : ৫৮৫৫।

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় বর্ণিত আছে। ঐ ঘটনা মীনাতে সংগটিত হয়েছে। এ বর্ণনা হযরত ইবনে মাস'উদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও হযরত আসওয়াদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

حَتّٰى رَأَيْتُ الْجَبَلَ بَيْنَ فُرْجَتَيِ الْقَمَرِ وَرَوَاهُ عَنْهُ مَسْرُوقٌ أَنَّهُ كَانَ بِمَكَّةَ وَزَادَ فَقَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ سَحَرَكُمُ ابن أَبِي كَبْشَةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِنَّ مُحَمَّدًا إِنْ كَانَ سَحَرَ الْقَمَرَ فَإِنَّهُ لَا يَبْلُغُ من سِحْرِهِ أَنْ يَسْحَرَ الْأَرْضَ كُلَّهَا فَاسْأَلُوا من يَأْتِيكُمْ من بَلَدٍ آخَرَ هَلْ رَأَوْا هٰذَا فَأَتَوْا فَسَأَلُوهُمْ فَأَخْبَرُوهُم أَنَّهُمْ رَأَوْا مِثْلَ ذٰلِكَ،

–আমি চাঁদ দু'খণ্ড হয়ে পাহাড়ের উপর পতিত হতে দেখেছি। আর হযরত মাসরূক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণিত বর্ণনায় ঐ ঘটনা মক্কায় সংগটিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। উক্ত বর্ণনায় অতিরিক্ত বলা হয়েছে যে, কুরাইশ কাফিররা তাঁকে বলেছিল যে, ইবনে আবু কাবশা (অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাকে যাদু করেছে। তাদের মধ্যে একলোক বলল, যদি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চন্দ্রের উপর যাদু করে থাকেন তাহলে তাঁর যাদুর প্রভাব চন্দ্রের উপর ঐ পর্যন্ত প্রতিফলিত হবেনা, যে পর্যন্ত সারা যমীনের উপর যাদুর প্রভাব প্রতিফলিত না হয়। সুতরাং বাহির থেকে আগত লোকদের এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হোক যে তারা চাঁদ দ্বি-খণ্ডিত হতে দেখেছে কিনা। তখন মক্কাবাসীরা তাদের জিজ্ঞাসা করলে, তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত হতে দেখেছি।

আল্লামা সমরকান্দি (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হযরত দ্বাহাক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে অনুরূপ বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন। আবু জেহেল বলল, এটা যাদু। সুতরাং দূরবর্তী স্থানের লোকদের জিজ্ঞেস করা হোক যে, তারা চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত হতে দেখেছে কিনা? আপামর জনসাধারণ বলল, আমরা চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত হতে দেখেছি। তখন কাফিররা বলল, এটা হলো সেই পুরোনো যাদু। উক্ত বর্ণনায়

[১]. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু ওয়া ইনশাক্কাল কামার, ১২:২৪৯, হাদিস নং : ৩৫৮০।
খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আবদিল্লাহ ইবনে মাস'উদ, ৯:১৬৫, হাদিস নং : ৪১৩০।

হযরত ইবনে মাস'উদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হযরত আলকামা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেন। আর ঐ চারজন বর্ণনাকারী সকলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ব্যতীত আরো অনেক সাহাবী এ ধরণের বর্ণনা উল্লেখ করেন। তাঁরা হলেন হযরত আনাস, হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত ইবনে উমর, হযরত হোজাইফা, হযরত আলী, হযরত জোবায়ির বিন মোতইম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) প্রমুখ সাহাবী।

হযরত হোজাইফা আরহাবী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনা হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বলেন,

انْشَقَّ الْقَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

–চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত হবার সময় আমরা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে ছিলাম।[১]

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে,

سَأَلَ أَهْلُ مَكَّةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ مَرَّتَيْنِ حَتّٰى رَأَوْا حِرَاءَ بَيْنَهُمَا،

–মক্কাবাসীরা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট মু'জিযা দাবী করে যে, আমাদের মু'জিযা দেখান। তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দ্বিতীয়বার চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত করে দেখান। তখন লোকেরা হেরা পর্বতের দু'পাশে চাঁদের দু'টুকরো দেখতে পায়।[২]

হযরত কাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উক্ত বর্ণনা হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেন। আর এ বর্ণনা হযরত মুয়াম্মার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হযরত কাতাদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করে বলেন,

[১]. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু ইনশাক্কিল ক্বামার, ১২:২৪৯, হাদিস নং : ৩৫৮০।
খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আবদিল্লাহ ইবনে মাসউদ, ৯:১৬৫, হাদিস নং : ৪১৩০।

[২]. ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ইনশাক্কিল ক্বামার, ১৩:৩৯৯, হাদিস নং : ৫০১৩।
খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আনাস ইবনে মালেক, ২৬:২২৫, হাদিস নং : ১২৬৭৮।

أَرَاهُمُ الْقَمَرَ مَرَّتَيْنِ انْشِقَاقَهُ فَنَزَلَتْ (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ القمر)،

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দ্বিতীয়বার চাঁদ দু'টুকরো করে দেখান। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ۝

–নিকটে এসেছে মহাপ্রলয় এবং দ্বি-খণ্ডিত হয়েছে চন্দ্র।[১]

উক্ত বর্ণনা হযরত জোবায়ির ইবনে মুতয়িম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে তাঁর দুই পুত্র ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে উবাইদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণনা করেছেন।

আর ঐ বর্ণনা হযরত মুজাহিদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হযরত ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু আবদুর রহমান আসমায়ী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও হযরত মুসলিম বিন আবু ইমরান আবদি (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হযরত হোজাইফা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে ঐ সম্পর্কিত বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। উক্ত বর্ণনাসমূহ বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়াও পবিত্র কুরআন মাজীদের আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত হওয়ার মু'জিযা সংঘটিত হয়েছে। বিরুদ্ধবাদীদের এ অভিমত গ্রহণযোগ্য নয় যে, যদি চাঁদ দ্বি-খণ্ডিত হতো, তাহলে পৃথিবীর মানুষের নিকট তা গোপন থাকতো না। কেননা এটা এমন এক জিনিস যা প্রকাশিত হলে সকলে দেখতে পেতো। আর তাছাড়া এটা কোন ভ্রান্ত অভিমতও নয়। কেননা পৃথিবীর অধিবাসীদের পূর্বে ঘোষণা দেয়া হয়নি যে, এরূপ ঘটনা সংগঠিত হবে। আর না তারা চাঁদের দিকে তাকিয়ে বসেছিল এবং চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত হয়েছে। তারা তাই দেখতে পায়নি। তবুও আমাদের নিকট ঐ ধরণের কোন বর্ণনা দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবেনা। কেননা সারা পৃথিবীতে চাঁদ একত্রে এক সময়ে দেখা যায়না। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এক দেশে চাঁদ, এক সময় উদিত হয়। অন্যদেশে পূর্বে উদিত হয়, অন্য দেশে তারও অনেক পরে উদিত হয়।

আবার কখনো এমন অবস্থা হয় যে, পৃথিবীর কোন স্থানে চাঁদ দেখা যায় আবার কোন স্থানে অদৃশ্য থাকে। আবার এমনও হতে পারে যে, ঐসময় তাদের দৃষ্টি পথে কোন অন্তরায় থাকতে পারে, যথা পাহাড়-পর্বত বা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকা। একারণে আমরা দেখতে পাইনা যে, কখন কোন দেশে চন্দ্রগ্রহণ হয়। তখন

[১]. আল কুরআন : সূরা ক্বামার, ৫৪:১।

একদেশে তা দৃশ্যমান হয়, অপর দেশে দৃশ্যমান হয়না।[১] আবার কোন দেশে আংশিক গ্রহণ দৃষ্টিগোচর হয়। অন্য দেশে পূর্ণ গ্রহণ দৃষ্টিগোচর হয়। আবার কোন দেশে গ্রহণের অবস্থা এরূপ যে, সে দেশের জ্যোতিবিদ্যার পণ্ডিত ব্যক্তিগণ হিসাব করে শুধু গ্রহণের কথা বলতে পারে। সত্যপন্থীদের নিকট দেখতে পাওয়া না পাওয়া আল্লাহর কুদরতের ব্যাপার।

আর একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, চাঁদ দ্বি-খণ্ডিত হওয়ার ঘটনা রাতে সংঘটিত হয়েছে। রাতে সাধারণত মানুষ ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে ঘুমিয়ে থাকে। ঐ সময় শুধু গ্রহবিদ ছাড়া আর কেউ আকাশের খবর রাখে না। অথবা অনেক কম লোকই তা জানতে পারে। অধিকাংশ লোকজন খবর দেয়ার পর জানে। অনেক অভিজ্ঞ লোক এধরণের অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করে খবর দেয়। যেমন আকাশে আলো প্রকাশিত হওয়া বা বড় ধরণের উল্কাপাত ঘটা, কিন্তু ঐ সমস্ত বিষয় জ্ঞানী লোক ব্যতীত অন্য কেউ জানে না।

ডুবন্ত সূর্য ফিরিয়ে আনা

ইমাম তাহাবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর রচিত "মুশকিলুল হাদিস" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এ বর্ণনা দু'ভাবে উল্লেখ করেছেন।

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوحَى إِلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ عَلِيٍّ فَلَمْ يُصَلِّ الْعَصْرَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَّيْتَ يَا عَلِيُّ قَالَ لَا فَقَالَ اللهُمَّ إِنَّهُ كَانَ فِي طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ فَارْدُدْ عَلَيْهِ الشَّمْسَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَرَأَيْتُهَا غربت ثم رأيتها طلعت بَعْدَ مَا غَرَبَتْ وَوَقَفَتْ عَلَى الْجِبَالِ وَالْأَرْضِ وَذَلِكَ بِالصَّهْبَاءِ فِي خَيْبَرَ،

–একদা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর ওহী অবতীর্ণ হতে শুরু হয়। ঐসময় তিনি হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর উরুর উপর মাথা রেখে বিশ্রাম করছিলেন। তাই হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আসরের নামায আদায় করতে পারেননি। সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত

[১]. উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ভারত উপমহাদেশে যখন রাত, আমেরিকাতে তখন দিন। কাজেই তখন আমেরিকাতে চাঁদ দেখা যায়না।

আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে জিজ্ঞেস করেন। হে আলী! তুমি কী আসরের নামায পড়েছো? হযরত আলী বললেন, না। তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দোয়া করেন, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আলী তোমার ইবাদত ও তোমার রাসূলের আনুগত্যে থাকার কারণে তাঁর নামায কাযা হয়ে গেছে। তুমি পুনরায় সূর্যকে উদিত করে দাও।[১]

হযরত আসমা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেন, আমি সূর্যকে ডুবে যেতে দেখেছি। তারপর আবার আকাশে সূর্য উদিত হতে দেখেছি। সূর্যের রশ্মি তখন পাহাড়ের চূড়া ও যমীনে পতিত হয়েছে। উক্ত ঘটনা খায়বার যুদ্ধে সাহবা দূর্গ বিজয়ের সময় সংঘটিত হয়েছে।

ইমাম তাহাবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, উক্ত বর্ণনাদ্বয় প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আর উভয় বর্ণনার বর্ণনাকারীও নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বস্ত হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে।

হযরত ইউনুস বিন বুকাইর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হযরত ইবনে ইসহাক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে বর্ণিত করে বলেন,

لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرَ قَوْمَهُ بِالرُّفْقَةِ وَالْعَلَامَةِ التي فِي العِيرِ قالوا متى تجيء قَالَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ أشرفت قُرَيْشٌ يَنْظُرُونَ وَقَدْ وَلَّى النَّهَارُ وَلَمْ تجيء فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزِيدَ لَهُ فِي النَّهَارِ سَاعَةً وفحبست عَلَيْهِ الشَّمْسُ.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মি'রাজ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর কুরাইশরা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট মক্কা অভিমুখী কাফেলা ও তাদের উটের নিদর্শন শুনতে চেয়ে বলল যে, উক্ত কাফেলা কখন মক্কাতে আগমন করবে?[২] হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, বুধবার দিন তারা মক্কা এসে পৌছাবে। বুধবার দিন মক্কাবাসীরা কাফেলা আসার অপেক্ষা করতে থাকে। এমন কী সূর্য

[১]. ক) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, বাবু ফাতিমা বিনতে হুসাইন, ২৪:১৪৭।
খ) তাহাবী : মুশকিলুল আছার, বাবু সাল্লাইতা ইয়া আলী, ৩:৬৪, হাদিস নং : ৮৯৮।

([২]) হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিরাজ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় মক্কা অভিমুখী এক কাফেলা দেখতে পান। তারা বুধবার দিন মক্কায় পৌছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের উটের নিদর্শনও বলেন।

ডুবে যাচ্ছে। কাফেলা মক্কায় না পৌছলে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কথা ভুল হবে। আর কাফিররা তাঁকে উপহাস করার সুযোগ পাবে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দোয়া করেন যেন দিন এক ঘন্টা বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। তখন সূর্য স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।[১]

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণী অনুযায়ী নির্দিষ্ট নিদর্শন সহ কাফেলা ঐ দিনই মক্কা আগমন করে।

[১]. বায়হাকী : দালায়িলুন্ নবুয়্যাত, বাবু লাম্মা উসরিয়া বি রাসূলিল্লাহ, ২:২৭৫, হাদিস নং : ৬৮০।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

فِيْ نَبْعِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَتَكْثِيْرِ بِبَرَكَتِهِ

হুযুর ﷺ-এর পবিত্র আঙ্গুল থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত ও তাতে বরকত হওয়া

উক্ত বর্ণনা অনেক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র আঙ্গুল থেকে পানি প্রবাহিত হওয়ার বিবরণ সাহাবীদের বড় একদল থেকে বর্ণিত হয়েছে। যথা– হযরত আনাস, হযরত জাবির, হযরত ইবনে মাস'উদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) প্রমুখ এর বর্ণনায় রয়েছে।

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتْ صَلاةُ الْعَصْرِ. فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الإِنَاءِ يَدَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ أن يتوضؤا مِنْهُ قَالَ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فتوضأ الناس حتى توضؤا مِنْ عِنْدَ آخِرِهِمْ،

–একদা আসরের ওয়াক্তে আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে হাযির হই। সাহাবীগণ চতুর্দিকে পানি অনুসন্ধান করছেন, কিন্তু কোথাও পানি পাওয়া যাচ্ছেনা । হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্য একপাত্রে কিছু পানি আনা হয়। তিনি তাঁর হাত মুবারক পানির পাত্রের মধ্যে রেখে সাহাবাগণকে বললেন, পাত্র থেকে অজু করো। বর্ণনাকারী বলেন, আমি লক্ষ্য করে দেখি যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আঙ্গুলির মাঝখান থেকে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হচ্ছে। সাহাবীগণ ঐ পানিতে অজু সম্পন্ন করে। এমন কি সর্বশেষ ব্যক্তিও অজু সম্পাদন করে।[১]

---

১. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবুত্ তামাসিল ওযুয়ী, ১:২৯৪, হাদিস নং : ১৬৪।
খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ফী মু'জিযাতিন্ নবী, ১১:৩৮৬, হাদিস নং : ৪২২৫।
গ) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু জা'মিউল ওযু, ১:৮২, হাদিস নং : ৫৭।

হযরত কাতাদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এ হাদিস হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেন। অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে,

بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ يَغْمُرُ أَصَابِعَهُ أَوْ لَا يَكَادُ يَغْمُرُ،

–লোকেরা এধরণের এক পাত্র হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনে পেশ করে তাতে যে পরিমাণ পানি ছিল হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র আঙ্গুলিসমূহ উক্ত পানিতে ডুবেনি।[১]

হযরত কাতাদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে জিজ্ঞেস করা হয় যে,

قَالَ كَمْ كُنْتُمْ قَالَ زَهَاءُ ثَلَاثَمِائَةٍ،

–তখন আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি বললেন, আমরা তিনশ' লোক ছিলাম।[২]

অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে, وهم بالزوراء 'লোকজন ঐসময় "জাওরায়া" বাজারের নিকটে ছিল'। আর হোমাইদীর বর্ণনায় বর্ণিত আছে, আমি জিজ্ঞেস করি, আপনারা সংখ্যায় কতজন ছিলেন? তারা বললেন, আমরা ৮০ জন ছিলাম। অপর এক বর্ণনায় সত্তর জনের কথা বর্ণিত আছে।

হযরত ইবনে মাস'উদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হযরত আলকামা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত বর্ণনা সহীহ প্রমাণিত হয়েছে। উক্ত বর্ণনায় বর্ণিত আছে,

بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطْلُبُوا من مَعَهُ فَضْلُ مَاءٍ فَأُتِيَ بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِي إِنَاءٍ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِيهِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ من بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

---

১. আযুরী : আশ্ শারীয়াহ, বাবু যিকরি দালায়িলিন্ নবুয়্যাত, ৪:১৫৭২, হাদিস নং : ১০৫৮।
২. ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, হাদিস নং : ২২৭৯।
খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আনাস ইবনে মালেক, ২৮:১১৫, হাদিস নং: ১৩৫৬৭।
গ) ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, বাবু যিকরি খাইরু ইউয়াহ্হাযু আ'লিমান মিনান্ নাস, ২৭:১২৭, হাদিস নং : ৬৬৫৬।
(ঘ) ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, বাবু যিকরি খবরু ইউয়াহ্হাযু, ২৭:১২৭।

–একদা আমরা রাসূলে পাকের সাথে ছিলাম আর আমাদের সাথে পানি ছিল না। তখন তিনি বললেন, যার কাছে উদ্বৃত্ত কিছু আছে তা সন্ধান করে আমার সামনে নিয়ে আস। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনে পানি আনা হয়। তিনি তা এক পাত্রে ঢেলে পবিত্র হাত সে পাত্রে রাখেন। তখন তাঁর আঙ্গুলের মধ্যখান থেকে পানির স্রোতধারা প্রবাহিত হতে শুরু করে।[১]

হযরত সালেম বিন জায়িদ হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন,

عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ رِكْوَةٌ فَتَوَضَّأَ فَجَهِشَ النَّاسُ نَحْوَهُ فَقَالَ مَا لَكُمْ قَالُوا لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأُ وَلَا نَشْرَبُ إِلَّا مَا بَيْنَ يَدَيْكَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الرِّكْوَةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَثُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأْنَا قُلْتُ كَمْ كُنْتُمْ قَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً،

–হুদাইবিয়ার দিন লোকেরা সবাই তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনে এক মশক ছিল। তিনি ঐ মশকের পানি দিয়ে অজু করেন। আমরা সাহাবীগণ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট হাযির হয়ে আরজ করি। হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনার পাত্রের পানি ছাড়া আমাদের নিকট অজু করার বা পান করার মতো পানি নেই। একথা শুনে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মশকের ভিতর তাঁর পবিত্র হাত ঢুকিয়ে দেন। আর সাথে সাথে তাঁর পবিত্র আঙ্গুলি থেকে ঝর্ণার মতো পানি প্রবাহিত হতে শুরু করে। উক্ত হাদীসে বর্ণিত আছে। হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে জিজ্ঞেস করা হয় আপনারা সংখ্যায় কতজন ছিলেন। তিনি বললেন, আমরা সংখ্যায় একলাখ হলেও আমাদের জন্য সেই পানি যথেষ্ট হত। তবে আমাদের সংখ্যা ছিলো দেড় হাজার।[২]

---

[১]. ক) ইবনে আবী শায়বা : আল মুসান্নাফ, ৭:৪২৮।
খ) দারেমী : আস্ সুনান, বাবু মা আকরামান্ নবী মিন তাফজীর, ১:৩৪, হাদিস নং : ২৯।
গ) তাহাবী : মুশকিলুল আছার, বাবু হাইয়ুন্ আলাত্ তুহরী, ৭:৪১২, হাদিস নং : ২৮৬৫।
[২]. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু আলামাতিন্ নবুয়্যাতি ফীল ইসলাম, ১১:৪১২, হাদিস নং : ৩৩১১।

এ ধরণের বর্ণনা হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করে বলেন, এ ঘটনা হুদাইবিয়ার দিনে সংঘটিত হয়েছে।

সহীহ মুসলিম শরীফে বুওয়াত যুদ্ধ অধ্যায়ে হযরত ওবাদাহ বিন সামিত (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত আছে। তিনি হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেন,

قَالَ لِي رسول الله صلى الله عليه وسلم يَا جَابِرُ نَادِ الْوَضُوءَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ إِلَّا قَطْرَةً فِي عَزْلَاءِ شَجْبٍ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَمَزَهُ وَتَكَلَّمَ بشيء لَا أَدْرِي مَا هُوَ وَقَالَ نَادِ بِجَفْنَةِ الرَّكْبِ فَأَتَيْتُ فوضعتها بَيْنَ يَدَيْهِ وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَسَطَ يَدَهُ فِي الْجَفْنَةِ وَفَرَّقَ أَصَابِعَهُ وَصَبَّ جَابِرٌ عَلَيْهِ وَقَالَ بِسْمِ اللهِ قَالَ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَفُورُ من بَيْنِ أَصَابِعِهِ ثم فارت الْجَفْنَةُ وَاسْتَدَارَتْ حَتَّى امْتَلَأَتْ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالاسْتِقَاءِ فَاسْتَقَوا حَتَّى رَوُوا فَقُلْتُ هَلْ بَقِيَ أَحَدٌ لَهُ حَاجَةٌ فَرَفَعَ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ مِنَ الْجَفْنَةِ وَهِيَ مَلْأَى،

– হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে ডাক দিয়ে বললেন, হে জাবির! চিৎকার করে বলে দাও লোকজন এসে যেন পানি নিয়ে যায়। অতঃপর তিনি দীর্ঘ হাদিস বর্ণনা করে বলেন, ঘটনা এরূপ যে, এক আনসার সাহাবীর মশকে কিছু পানি ছিল। মশকটি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনে আনা হয়। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মশকের ভিতর পবিত্র হাত ডুবান আর যা ইচ্ছা তা পাঠ করেন। আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি। তারপর তিনি বললেন, মশক নিয়ে এসো। আমি মশক এনে তাঁর সামনে রাখি। বর্ণনাকারী বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পবিত্র হাত মশকের মধ্যে রেখে

খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু ফাযায়িলি সায়্যিদিল মুরসালীন, পৃ. ২৭৯, হাদিস নং : ৫৮৮২।
গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, মুসনাদি জাবির ইবনে আবদিল্লাহ, ২৯:৪৬, হাদিস নং : ১৩৯৯৭।
ঘ) বায়হাকী : দালায়িলুন্ নবুয়্যাত, ৪:১৭০, হাদিস নং : ১৪৫০।
ঙ) ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, বাবু যিকরিল বায়ানি বি আন্নাল মা'আ, ২৭:১১৭, হাদিস নং : ৬৬৫১।

আঙ্গুলিসমূহ ছড়িয়ে দেন। হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, মশকের নিংড়ানো পানি আমি তাঁর পবিত্র হাতের উপর ঢাললাম। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "বিসমিল্লাহ"। হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি লক্ষ্য করে দেখি যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র আঙ্গুলি ফাঁক দিয়ে পানি প্রবাহিত হচেছ। মশকের মধ্যে পানি উথলে উঠছে। পানি মশকের মধ্যে ফুলতে শুরু করে, যার ফলে মশক পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সকলে তৃপ্তি সহকারে পানি পান করে। তখন আমাদের মধ্যে আর কারও পানির প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকেনি। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পাত্র থেকে তাঁর হাত মুবারক বের করেন দেখা যায় যে, পাত্র তখনো পানিতে ভরপুর।[১]

শা'বী থেকে এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে,

أُتِيَ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَسْفَارِهِ بِإِدَاوَةِ مَاءٍ وَقِيلَ مَا مَعَنَا يَا رَسُولَ الله مَاءٌ غَيْرَهَا فَسَكَبَهَا فِي رَكْوَةٍ وَوَضَعَ إِصْبَعَهُ وَسَطَهَا وَغَمَسَهَا فِي الْمَاءِ وَجَعَلَ النَّاسُ يَجِيئُونَ ويتوضؤن ثُمَّ يَقُومُونَ،

–একদা কোন এক স্থানে আসরের সময় হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনে পানির এক পেয়ালা পেশ করে আরজ করা হয়, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের নিকট এই পানি ব্যতীত আর পানি নেই। তিনি সে পানি একটি মশকে ঢেলে তাতে পবিত্র হাত ডুবান। পবিত্র হাত থেকে পানি বের হতে শুরু করে। লোকজন আসছে আর একের পর এক অজু করে চলে যাচ্ছে।

ইমাম তিরমিযী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, এ বিষয়ে হযরত ইমরান বিন হোসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও এক বর্ণনা বর্ণিত আছে। এর দ্বারা ঐ কথাই প্রমাণ হয় যে, এতো অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারীর বর্ণনা মিথ্যা হলে তা সাথে সাথে উড়িয়ে দেয়া হতো। যেহেতু সাহাবীগণ ঐ বিষয় বর্ণনা করেছেন। আর ঐ ধরণের মু'জিযাসমূহ ব্যাপক বিরাট মজলিসে ঐ ধরণের ঘটনা সংগটিত হয়েছে। কাজেই এ বর্ণনাসমূহকে মিথ্যা বলা যাবেনা। এরূপ তাঁরা কেউই ঐ ঘটনাসমূহ মিথ্যা বলেননি। তখন এর অর্থ হল তাঁরা সকলে সত্য বলে স্বীকার করেছেন।

---

[১]. ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু হাদিসী জাবিরিত্ তবীল, ১৪:২৯৫, হাদিস নং : ৫৩২৮।
খ) বায়হাকী : দালায়িলুন্ নবুয়্যাত, বাবু ইনকিয়াদুশ শাজার, ৬:১৩৩, হাদিস নং : ২২৫৬।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

تَفْجِيرُ الْمَاءِ بِبَرَكَتِهِ

হুযুর (ﷺ) এর দোয়ার বরকতে যমীন থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া

উপরোক্ত মু'জিযাসমূহের মতো অল্প পানিকে বেশী পানিতে রূপান্তরিত করে দেয়ার মতো মু'জিযা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে প্রকাশ পেয়েছে। তন্মধ্যে তাঁর দোয়ার বরকতে যমীন ভেদ করে পানির ফোয়ারা সৃষ্টি হওয়া। আর কিছু কিছু ঘটনায় তাঁর পবিত্র হাতের স্পর্শের বরকতে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইমাম মালিক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) 'মোয়াত্তা' গ্রন্থে হযরত মু'আয বিন জাবাল (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাবুক যুদ্ধের ঘটনা বিষয়ক হাদীসে বলেন,

وَأَنَّهُمْ وَرَدُوا الْعَيْنَ وَهِيَ تَبِضُّ بشيء من مَاءٍ مِثْلِ الشراك فغرفوا مِنَ الْعَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ حَتَّى اجْتَمَعَ فِي شيء ثُمَّ غَسَلَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَأَعَادَهُ فِيهَا فَجَرَتْ بِمَاءٍ كَثِيرٍ فَاسْتَقَى النَّاسُ،

–সাহাবীগণ এক কূপের নিকট উপস্থিত হয়; তখন কূপে অল্প পানি ছিল। সাহাবীগণ অঞ্জলি ভরে কিছু পানি জমা করেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সে পানি দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল ও হাত ধৌত করে ব্যবহৃত পানি পুনরায় কূপে ঢেলে দেন। সাথে সাথে কূপ পানিতে ভরপুর হয়ে যায়। তখন লোকেরা সবাই ওই পানি পানি করে।

ইবনে ইসহাক তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। হযরত মু'আয (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণনা করেন,

فَانْخَرَقَ مِنَ الْمَاءِ مَالَهُ حِسٌّ كَحِسِّ الصَّوَاعِقِ،

–অতঃপর বৃষ্টি পড়ার শব্দের মতো কূপের পানি তর্জন-গর্জন করে প্রবাহিত হতে থাকে।

অতঃপর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

يُوشِكُ يَا مُعَاذُ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ أَنْ تَرَى مَا هَا هُنَا قَدْ ملئ جِنَانًا،

–হে মু'আয! তোমরা যদি দীর্ঘায়ু লাভ কর তবে দেখতে পাবে, এ স্থান থেকে একদিন বড় বড় অট্টালিকা ও উদ্যানে সুশোভিত হয়ে উঠবে।[১]

হুদাইবিয়ার যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা হযরত বারা ও হযরত সালমা বিন আকওয়া (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত বর্ণনায় বলা হয়েছে যে,

وَهُمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً وَبِئْرُهَا لَا تَرْوِي خَمْسِينَ شَاةً فَنَزَحْنَاهَا فَلَمْ نَتْرُكْ فِيهَا قَطْرَةً فَقَعَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَبَاهَا، وأتى بدلو امنا فَبَصَقَ فَدَعَا.

–তাঁরা সংখ্যায় চৌদ্দশ' ছিলেন। তখন সে কূপের অবস্থা এরূপ ছিল যে, পঞ্চাশটি বকরীকেও তা থেকে পানি পান করানো যেতো না। আমরা সাহাবীগণ কূপের সমস্ত পানি তুলে ফেলি। এক ফোঁটা পানিও অবশিষ্ট ছিলনা। এমতাবস্থায় হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কূপের এক পাশে উপবিষ্ট হন। এক বালতি পানি তাঁর সামনে রাখা হয়। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বালতির পানিতে পবিত্র মুখের লালা ঢেলে দিয়ে বরকতের জন্য দোয়া করেন।

হযরত সালমা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

فَإِمَّا دَعَا وَإِمَّا بَصَقَ فِيهَا فَجَاشَتْ فَأَرْوَوْا أَنْفُسَهُمْ وَرِكَابَهُمْ.

–আমার সঠিক মনে নেই, তিনি বরকতের জন্য দোয়া করেছেন, না থুথু ঢেলে দেন যে, তাতে পানি উথলে উঠতে শুরু করে। সাহাবীগণ পানি পান করে পরিতৃপ্ত হয় এবং বাহনের জন্তুগুলোকেও পানি পান করায়।[২]

উক্ত দু'টি বর্ণনা ছাড়াও এসম্পর্কে ইবনে শিহাবের সূত্রে বর্ণিত বর্ণনায় উল্লেখ আছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তূনীর থেকে তীর বের করে কূপের ভিতর নিক্ষেপ করেন। (অথচ কূপে এক ফোঁটা পানি ছিলনা) সঙ্গে সঙ্গে পানি উপরে উঠতে শুরু করে। সাহাবীগণ সকলেই সে পানি তৃপ্তি সহকারে পান করে এবং উটগুলোকেও পান করায়। আর তাদেরকে দ্বিতীয়বার পানি পান করার জন্য সে স্থানে বসানো হয়নি।

---

১. ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু মু'জিযাতুন্ নবী, ১১:৩৯০, হাদিস নং : ৪২২৯।
খ) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবুল জময়ি বাইনাস্ সালাতাইনি, ১:৪৩৩, হাদিস নং : ২৯৮।
গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু হাদিসী মুয়াজ ইবনে জামাল, ৪৫:৪৯, হাদিস নং : ২১০৫৬।
২. মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু গযওয়াতি যি করদিন, ৯:৩০৪, হাদিস নং : ৩৩:৭২।

হযরত আবু কাতাদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে,

أَنَّ النَّاسَ شَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَطَشَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَدَعَا بِالْمِيضَاةِ فَجَعَلَهَا فِي ضِبْنِهِ ثُمَّ الْتَقَمَ فَمَهَا فَاللهُ أَعْلَمُ نَفَثَ فِيهَا أَمْ لَا فَشَرِبَ النَّاسُ حتى رووا وملوا كُلَّ إِنَاءٍ مَعَهُمْ فَخُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّهَا كَمَا أَخَذَهَا مِنِّي وَكَانُوا اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ رَجُلًا.

–একদা কোন এক সফরে সাহাবীগণ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট আবেদন করেন যে, আমাদের তৃষ্ণা পেয়েছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পাত্র চান। তাঁর সামনে পাত্র পেশ করা হয়, পাত্রের মুখ তিনি বোগলের মাঝে রাখেন। অতঃপর পাত্রের মুখে তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল রাখেন। তাতে তিনি ফুঁক দিয়েছেন, কিনা তা আল্লাহ তা'আলা জানেন। তারপর লোকেরা তা থেকে পানি পান করতে আরম্ভ করে। এভাবে সকলেই তৃপ্তির সাথে পানি পান করে এবং লোকজন তাদের পাত্রসমূহ পানিতে ভর্তি করে ফেলে। তবে একথা আমার স্মরণে নেই যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পাত্রটি যখন আমাকে ফেরত দেন তখন তাতে যে পরিমাণ পানি ছিলো, এখনো তাতে সে পরিমাণ পানি রয়েছে কিনা, তখন আমরা সংখ্যায় বাহাত্তরজন ছিলাম। এ বিষয়টি হযরত ইমরান বিন হোসাইন (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকেও বর্ণিত হয়েছে।[১]

আল্লামা তাবারী হযরত আবু কাতাদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনার বিপরীত বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। যা "সিহাহ সিত্তাহ"র গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে। মূতার যুদ্ধের সময় হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর প্রেরিত বাহিনীর সেনাপতি ও সাহাবীদের শাহাদাতের খবর জানতে পারেন। তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদল সাহাবীকে সাথে নিয়ে তাদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তারপর দীর্ঘ এক হাদীসে অনেক মু'জিযার কথা উল্লেখ করেন। উক্ত বর্ণনায় বর্ণিত আছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবীদের বললেন,

أَنَّهُمْ يَفْقِدُونَ الْمَاءَ فِي غَدٍ، وَذَكَرَ حَدِيثَ الْمِيضَاةِ قَالَ وَالْقَوْمُ زُهَاءُ ثَلَثِمِائَة.

---

১. ক) আবদুর রায্যাক : আল মুসান্নাফ, ১১:২৭৯।
খ) বায়হাকী : দালায়িলুন্ নবুয়্যাত, ৪:৩৭৯, হাদিস নং : ১৬২৯।

–তোমরা আগামী দিন পর্যন্ত পানি পাবেনা। অতঃপর তিনি পাত্র সম্পর্কিত বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন, আমরা তখন প্রায় তিনশ'জন ছিলাম।

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু কাতাদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে,

احفظ عَلَيَّ ميضأتك فإله سَيَكُونُ لَهَا نبأ،

–তিনি পানির পাত্র নিজের জন্য সংরক্ষিত করে রাখেন। কেননা এর সাথে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা জড়িত আছে।[১]

অতঃপর উপরোক্ত বর্ণনাসমূহ উল্লেখ করেন। হযরত ইমরান বিন হোসাইন (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, এক সফরে আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে ছিলাম। লোকেরা পানির অভাবে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ে। তিনি দু'জন সাহাবীকে ডেকে এনে বললেন, তোমরা পানির সন্ধানে সামনে অগ্রসর হতে থাকে। অমুক স্থানে তোমরা এক মহিলার দেখা পাবে। তার সাথে একটি উট ও দু'মশক পানি আছে। সাহাবীদ্বয় তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী নির্দশনসহ উক্ত মহিলার দেখা পায়। তাঁরা উক্ত মহিলাকে পানির মশকসহ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট নিয়ে আসে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার পানির মশক থেকে কিছু পানি থালায় ঢালেন। তারপর তার উপর আল্লাহর যাহা ইচ্ছা তা পড়েন এবং বরতনের পানি মহিলার মশক দু'টির মুখে ঢেলে দেন এবং মশক দু'টির মুখ খুলে দেন। আর লোকদের বললেন, তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ পাত্র ভর্তি করে নিয়ে যাও। কোন পাত্র যেন পানি ছাড়া অবশিষ্ট না থাকে।

বর্ণাকারী হযরত ইমরান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, এতো বেশী পরিমাণ পানি মশক থেকে বের করার পরও দেখা গেল মশক দু'টি পানিতে পরিপূর্ণ রয়েছে। অতঃপর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উক্ত মহিলার জন্য আহারের ব্যবস্থা করার আদেশ দেন। সেহেতু মহিলার জন্য খাবারের আয়োজন করা হয়। এমনকি খাবার একত্রিত করে তার চাদরে বেধেঁ দেয়া হয়। অতঃপর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহিলাকে বললেন,

اذهبي فَإِنَّا لَمْ نَأْخُذْ من مَائِكِ شَيْئًا وَلَكِن الله سقانا،

[১]. বায়হাকী : দালায়িলুন নবুয়্যাত, ৪:৩৮৭, হাদিস নং : ১৬২৮।

–তুমি চলে যাও। আমি তোমার পানি একটুও গ্রহণ করিনি। আল্লাহ তা'আলা তাঁর আপন কুদরতে আমাদের পান করিয়েছেন। (এটা হলো দীর্ঘ হাদিস)।[১]

হযরত সালমা ইবনে আকওয়াহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করেন,

هَلْ من وُضُوءٍ فَجَاءَ رَجُلٌ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا نُطْفَةٌ فَأَفْرَغَهَا فِي قَدَحٍ فَتَوَضَّأْنَا كُلُّنَا نُدَغْفِقُهُ دَغْفَقَةً أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً،

–তোমাদের নিকট পানি আছে কি? এক ব্যক্তি এক পাত্রে কিছু পানি আনে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই পানি এক পেয়ালায় ঢালেন। আমরা সকলে স্বাচ্ছন্দে সে পানি ব্যবহার করে অজু করি। তখন আমরা চৌদ্দশজন ছিলাম।[২]

হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে,

فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ وَذَكَرَ مَا أَصَابَهُمْ مِنَ الْعَطَشِ حَتَّى إِنَّ الرَّجلَ لَيَنْحَرُ بَعِيرَهُ فَيَعْصِرُ فَرْثَهُ فَيَشْرَبُهُ فَرَغِبَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّعَاءِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَرْجِعْهُمَا حَتَّى قَالَتِ السَّمَاءُ فَانْسَكَبَتْ فملؤا مَا مَعَهُمْ من آنِيَةٍ وَلَمْ تُجَاوِزِ الْعَسْكَرَ،

–তিনি দুর্ভিক্ষের যুদ্ধের উল্লেখ করে বলেন, সে সময় মানুষ এতো তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছে যে, লোকেরা নিজেদের উট জবেহ করে সেগুলোর নাড়িভূড়ি নিংড়িয়ে পান করা শুরু করে। তখন হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করার জন্য আবেদন জানান। তিনি দোয়া করার জন্য হাত উঠান। দোয়া শেষে হাত নামানোর আগেই মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয়। লোকদের নিকট যত পাত্র ছিল সকলের

[১]. ক) বায়হাকী : সুনানুল কুবরা, ১:৩২।
খ) আবদুর রাযযাক : আল মুসান্নাফ, ১১:২৭৮।

[২]. ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবুল ইসতিহ্বাবি খুলতিল আযওয়াদ, ৯:১৪৫, হাদিস নং : ৩২৫৯।
খ) বায়হাকী : দালায়িলুন্ নবুয়্যাত, বাবু হাল মিন ওযুয়িন, ৪:১৭৩, হাদিস নং : ১৪৫৩।
গ) আবু আওয়ানা : আল মুসতাখরাজ, বাবু বয়ানিল খবরিদ্ দাল, ১৩:৬৪, হাদিস নং : ৫২৩৯।

পাত্রই পানিতে ভরপুর হয়ে যায়। তবে লক্ষণীয় মু'জিযা হল যে, বৃষ্টি সেনা ছাউনীর বাইরে কোথাও বর্ষিত হয়নি। বৃষ্টি পড়ার পরিধি ছিল সেনা ছাউনী পর্যন্ত।[১]

হযরত আমর বিন শোয়াইব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। একদা এক সফরে আবু তালিব হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পেছনে বাহনের উপর বসা ছিল। যুল মাযায স্থানে পৌছার পর আবু তালিব বলল,

عَطِشْتُ وَلَيْسَ عِنْدِي مَاءٌ فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَرَبَ بِقَدَمِهِ الْأَرْضَ فَخَرَجَ الْمَاءُ فَقَالَ اشْرَبْ،

–আমার তৃষ্ণা পেয়েছে। আমার নিকট পানি নেই। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাহন থেকে নীচে নেমে পবিত্র কদম দিয়ে মাটিতে আঘাত করেন। যমীন থেকে পানি প্রবাহিত হতে শুরু হয়। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, চাচাজান পানি পান করুন। এবিষয় অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে ঐ বর্ণনাসমূহ ও ইস্তিসকাহ'র ঘটনা রয়েছে। তাঁর দোয়ার বরকতে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে।

[১]. ক) বায়হাকী : সুনানুল কুবরা, ৯:৩৫৩।
খ) হাকেম : মুসতাদ্‌রাক আলাস্ সহীহাইন, বাবু ওয়া আম্মা হাদিস আয়শা, ২:৬৪, হাদিস নং : ৫২৩।
গ) ইবনে খুযাইমা : কিতাবুস্ সহীহ, বাবু জিমা'য়ি যিকরিল আবওয়াবিল মা, ১:১৮৭, হাদিস নং : ১০১।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

تَكْثِيرُ الطَّعَامِ بِبَرَكَتِهِ وَدُعَائِهِ

হুযুর (ﷺ) এর দোয়ায় খাবার বৃদ্ধি পাওয়া

হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে,

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَطْعِمُهُ فَأَطْعَمَهُ شَطْرَ وَسْقِ شَعِيرٍ فَمَا زَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ وَامْرَأَتُهُ وَضَيْفُهُ حَتَّى كَالَهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ وَلَقَامَ بِكُمْ،

–এক ব্যক্তি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট খাদ্যের আবেদন করে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে ষাট "সা" যব দান করেন। ঐ লোক খাদ্য নিয়ে গিয়ে তার স্ত্রী পুত্র ও মেহমান সহ খেয়ে যেতে থাকে। অবশেষে একদিন খাবার ওজন করে দেখার পর সহসাই সে খাদ্য ফুরিয়ে যায়। এরপর সে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে তার অবস্থার কথা আরজ করে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যদি তুমি ওজন না করতে তাহলে এখাবার কখনো শেষ হতোনা।[১]

এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ হাদিস হযরত আবু তালহা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত বর্ণনায় বলা হয়েছে,

وَإِطْعَامُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِينَ أَوْ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنْ أَقْرَاصٍ مِنْ شَعِيرٍ جَاءَ بِهَا أَنَسٌ تَحْتَ يَدِهِ أَيْ إِبْطِهِ فَأَمَرَ بِهَا فَفُتَّتْ وَقَالَ فِيهَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ،

–হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কয়েক টুকরো রুটি দিয়ে সত্তর বা আশি জন লোককে পূর্ণ তৃপ্তির সাথে আহার করান। হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সে রুটির টুকরোগুলোকে বগলে ভরে নিয়ে

([১]) ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ফী মু'জিযাতিন্ নবী, ১১:৩৮৯, হাদিস নং : ৪২২৮।
খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু ফাযায়িলি সায়্যিদিল মুরসালীন, পৃ. ২৯২, হাদিস নং : ৫৯৪১।
গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি জাবির ইবনে আবদিল্লিল, ২৯:২৬৩, হাদিস নং : ১৪২১৪।
[এক ওসক সমান ষাট সা। এক সা সমান আমাদের দেশীয় ওজনে ৪ কেজি পরিমান।

আসেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আদেশে রুটিগুলোকে টুকরো টুকরো করা হয়। তারপর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার যা ইচ্ছা তা পড়েন।

এ প্রসঙ্গে হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত বর্ণনা, যা খন্দকের যুদ্ধের সময় এক সা যবের রুটি ও একটি বকরীর বাচ্চা দ্বারা এক হাজার লোককে তৃপ্তির সাথে আহার করানো হয়। হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

فَأُقْسِمُ بِاللهِ لَأَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ وَإِنَّ عَجِينَتَنَا لَيُخْبَزُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَقَ فِي الْعَجِينِ وَالْبُرْمَةِ وَبَارَكَ،

–আল্লাহর শপথ! তারা সকলে তৃপ্তির সাথে খাবার গ্রহণ করার পরও আমি দেখতে পাই যে, আমার পাতিলে গোশত উথলে উঠছে। আমার আটা দ্বারা রুটি বানানো হয়। অবস্থা শুধু এই হয়েছে যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার পাতিলে ও আটায় তার পবিত্র মুখের থু থু ঢেলে দিয়ে তা বরকতময় করে দেন। আর বরকত লাভের জন্য আল্লাহর তা'আলার নিকট দোয়া করেন।

হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে হযরত সাঈদ বিন মায়না ও আইমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণনা করেন, এক আনসার ও তার স্ত্রী সম্পর্কে এরূপ এক বর্ণনা হযরত সাবেত (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত সাবেত (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাদের স্বামী-স্ত্রী একজনের নামও উল্লেখ করেননি।

وجئ بِمِثْلِ الْكَفِّ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْسُطُهَا فِي الْإِنَاءِ وَيَقُولُ مَا شَاءَ اللهُ فَأَكَلَ مِنْهُ مَنْ فِي الْبَيْتِ وَالْحُجْرَةِ وَالدَّارِ وَكَانَ ذَلِكَ قَدِ امْتَلَأَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذَلِكَ وَبَقِيَ بَعْدَ مَا شَبِعُوا مِثْلُ مَا كَانَ فِي الْإِنَاءِ،

–হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক মুষ্টি আটা নিয়ে বরতনে রাখেন। আর আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন তিনি তা পড়েন। তারপর

উপস্থিত সকলকে সে খাবার খেতে দেন। গৃহবাসী সবাইকে খেতে দেন। তারপর পার্শ্ববর্তী লোকদের খেতে দেন। অথচ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে যারা আসেন তাতে একঘর ভর্তি হয়ে যায়। লক্ষণীয় মু'জিযা হলো এই যে, সকলে খাওয়ার পরও সে বরতনে পূর্বের মতো খাবার অবশিষ্ট থেকে যায়।

হযরত আবু আইয়ূব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে,

أَنَّهُ صَنَعَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ وَلِأَبِي بَكْرٍ من الطعام زُهَاءَ مَا يَكْفِيهِمَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْعُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَشْرَافِ الْأَنْصَارِ فَدَعَاهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوا ثُمَّ قَالَ ادْعُ سِتِّينَ فَكَانَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ ادْعُ سَبْعِينَ فَأَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَمَا خَرَجَ مِنْهُمْ أَحَدٌ حَتَّى أَسْلَمَ وَبَايَعَ قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَأَكَلَ من طَعَامِي مِائَةٌ وَثَمَانُونَ رَجُلًا،

–একদা তিনি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) দু'জনের যথেষ্ট হয় সে পরিমাণ খাবার তৈরী করেন। তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বললেন, আনসারদের সম্মানিত ত্রিশজন ডেকে আনো। তিনি তাদের ডেকে আনেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের খাবার খেতে দেন। কিন্তু তারপরেও খাবার অবশিষ্ট থাকে। তিনি বললেন, আমাকে ষাটজন ডেকে আনার আদেশ করেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের খেতে দেন। তারা খাবার খেয়ে চলে যায়। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সত্তরজন ডেকে আনো। তিনি ডেকে আনেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের খাবার খেতে দেন। তারাও খেয়ে চলে যায়। এভাবে যতজন খাবার খেতে আসে তারা সকলে ইসলাম গ্রহণ করে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র হাতে হাত রেখে বাইয়াত গ্রহণ করে। হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমার সে দিনের খাবার একশ'আশি জন লোক খেয়েছে।

হযরত সামুরা বিন জুন্দুব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

أُتِيَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَصْعَةٍ فيها لَحم فتَعَاقَبُوهَا من غُدْوةٍ حَتَّى اللَّيْلِ يَقُومُ قَوْمٌ وَيَقْعُدُ آخَرُونَ،

–হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনে এক পেয়ালা গোশত পেশ করা হয়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একদল লোক আসছে; অপর দল চলে যাচ্ছে। এভাবে সকলে এক পেয়ালা গোশত থেকে তৃপ্তির সাথে আহার করে।[১]

অনুরূপ এক বর্ণনা হযরত আবদুর রহমান বিন আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

كُنَّا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ عُجِنَ صَاعٌ من طَعَامٍ وَصُنِعَتْ شَاةٌ فَشُوِيَ سَوَادُ بَطْنِهَا قَالَ وَأَيْمُ اللهِ مَا مِنَ الثَّلَاثِينَ وَمِائَةٍ إِلَّا وَقَدْ حَزَّ لَهُ حَزَّةً من سَوَادِ بَطْنِهَا ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ فَأَكَلْنَا أَجْمَعُونَ وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبَعِيرِ،

–একদা আমরা একশ'ত্রিশজন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সঙ্গে ছিলাম। প্রায় সাড়ে চার সের আটার খামির বানানো হয়। আর একটি বকরীর গোশত রান্না করা হয়। তারপর বকরীর কলিজা-গোর্দা ইত্যাদি ভুনা করা হয়। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর শপথ! একশ'ত্রিশ জনের মধ্যে এমন একজনও ছিলনা যে, যাকে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গোশতের টুকরা প্রদান করেননি। গোশতের তরকারী দু'টি বড় বরতনে রাখা হয়। সকলেই অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে খাওয়ার পর অবশিষ্ট গোশত নিজের বরতনে ভরে উটের পিঠে তুলে দেন।[২]

এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুর রহমান বিন আবু উমারাহ আনসারী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ হযরত সালমা ইবনে আকওয়া ও হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন,

---

[১]. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ফী আয়াতি ইসবাতিন্ নবুয়্যাত, ১২:৭৫, হাদিস নং : ৩৫৫৮।
খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু ফযায়িলি সায়্যিদিল মুরসালীন, ৩:২৮৯, হাদিস নং :৫৯২৮।

[২]. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু মিন আকলি যাত্তা সানিয়া', ১৬:৪৮০, হাদিস নং : ৪৯৬৩।
খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ইকরামিয যয়িফ ওয়া ফযলি ইসারিহি, ১০:৩৮২, হাদিস নং : ৩৮৩২।

فَذَكَرُوا مَخْمَصَةً أَصَابَتِ النَّاسَ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَدَعَا بِبَقِيَّةِ الْأَزْوَادِ فَجَاءَ الرَّجُلُ بِالْحَثْيَةِ مِنَ الطَّعَامِ وَفَوْقَ ذَلِكَ وَأَعْلَاهُمُ الَّذِي أَتَى بِالصَّاعِ مِنَ التَّمْرِ فَجَمَعَهُ عَلَى نِطْعٍ،

–একদা এক যুদ্ধে আমরা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সঙ্গে ছিলাম। মানুষ ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়ে। তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লোকদের নির্দেশ দিলেন, তোমাদের যার নিকট যা খাদ্য আছে, সবাই একত্রিত করে নিয়ে এসো। তখন কেউ আনলো এক মুষ্টি, কেউ এর চেয়ে একটু বেশী। আর এক ব্যক্তি সকলের চেয়ে বেশী এক 'সা' অর্থাৎ পোনে চার সের খেজুর আনলো। তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সে খাদ্য সম্ভার চামড়ার দস্তরখানায় একত্র করে বরকতের জন্য দোয়া করেন।[১]

হযরত সালমা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেন,

فَحَزَرْتُهُ كَرَبْضَةِ الْعَنْزِ ثُمَّ دَعَا النَّاسَ بِأَوْعِيَتِهِمْ فَمَا بَقِيَ فِي الْجَيْشِ وِعَاء إلا ملؤوه وَبَقِيَ مِنْهُ قَدْرُ مَا جُعِلَ وَأَكْثَرُ وَلَوْ وَرَدَهُ أَهْلُ الْأَرْضِ لَكَفَاهُمْ،

–আমি লক্ষ্য করে দেখি, আমার মনে হয় খাদ্যের পরিমাণ একসারি উটের সমান হবে। তারপর নির্দেশ দিলেন সকলেই যেন নিজ নিজ পাত্র ভরে নিয়ে নেয়। সেনাদলের এমন একটি পাত্রও অবশিষ্ট থাকেনি যা খাদ্যে পরিপূর্ণ করা হয়নি। এরপরেও দেখা যায়,যে পরিমাণ খাদ্য জমা করা হয় সেই পরিমাণ খাদ্য অবশিষ্ট থেকে যায়। বরং তার চেয়ে অনেক বেশী খাদ্য অবশিষ্ট রয়েছে মনে হয়। তখন পৃথিবীর সব মানুষকে যদি ওই খাবার দেয়া হতো, তাহলে জমাকৃত খাবার সবার জন্য যথেষ্ট হতো।

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

أَمَرَنِي النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ ادعوا لَهُ أَهْلَ الصُّفَّةِ فَتَتَبَّعْتُهُمْ حَتَّى جَمَعْتُهُمْ فَوُضِعَتْ بَيْنَ أَيْدِينَا صَحْفَةٌ فَأَكَلْنَا مَا شِئْنَا وَفَرَغْنَا وَهِيَ مِثْلُهَا حِينَ وُضِعَتْ إلا أنا فِيهَا أَثَرَ الْأَصَابِعِ،

---

[১]. ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, বাবু ফযলিল ঈমান, ১:৪৩৪, হাদিস নং : ২২১।

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে আহলে সুফফাদের ডেকে আনতে বললেন।[১] আমি তাদেরকে ডেকে নিয়ে আসি। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনে এক পেয়ালা খাবার ছিলো। আমরা সকলেই তৃপ্তি সহকারে ভক্ষণ করি। খাওয়া শেষে দেখা গেল পেয়ালা পূর্বের মতো পরিপূর্ণ রয়েছে তবে খাবারের মধ্যে এতটুকু পরিবর্তন দেখা গেছে যে, তাতে শুধু আঙ্গুলের দাগ পরিদৃষ্ট হয়।[২]

হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে,

جَمَعَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي عَبد الْمُطَّلِبْ وَكَانُوا أَرْبَعِينَ مِنْهُمْ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ الْجَذَعَةَ وَيَشْرَبُونَ الْفَرْقَ فَصَنَعَ لَهُمْ مُدًّا من طَعَامٍ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَبَقِيَ كَمَا هُوَ ثُمَّ دَعَا بعص فَشَرِبُوا حَتَّى رُوُوا وَبَقِيَ كَأَنَّهُ لَمْ يُشْرَبْ مِنْهُ،

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা আবদুল মোত্তালিবের বংশধরদের মধ্যে চল্লিশজনকে সমবেত করেন। তাদের মধ্যে এমন কয়েকজন ছিল যারা একেক জন একেকটি রান্না করা বকরী ঝোল সহ খেতে পারতো এবং একেক জন আট সের পানি পান করতে পারত। কিন্তু হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাত্র এক সের আটার রুটি তৈরী করান। তারপর তারা সকলে তৃপ্তিসহকারে আহার করে। খাওয়া শেষে এক পেয়ালা দুধ দেওয়া হয়। সকলে মিলে সে এক পেয়ালা দুধ পান করার পর দেখা যায় দুধ পূর্বের মতো রয়ে গেছে। মনে হয় যেন কেউ এ পেয়ালা থেকে দুধ পান করেনি।[৩]

---

১. মদীনার মসজিদে একটি ছোট বারান্দা ছিলো। তাতে অসহায় মুহাজিরগণ বসবাস করতেন। তারা রাতদিন সেখানে অবস্থান করে কুরআন হাদীস শিক্ষা করতো। আর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আদেশের অনুসরণ ও অনুকরণ করতেন। তাঁরা ছিলেন সংসার ত্যাগী। যাকাত, সাদকা দ্বারা তাঁদের ভরণপোষণ করা হতো। কখনো কখনো তাঁদের এমন অবস্থা হতো একাধারে কয়েক দিন অনাহারে কাটাতে হতো। তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আহলে বাইতগণও অনাহারে থাকতেন। তাঁদের আসহাবে সুফফা বলা হয়। তাঁদের মাধ্যমে দীনের জ্ঞানের প্রসার হয়েছে। কুরআন ও হাদীসের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার হয়েছে। সত্য কথা বলতে হয় যে, উক্ত বারান্দাই ছিলো ইসলামী জগতের সর্বপ্রথম 'বিশ্ববিদ্যালয়'।

২. ক) ইবনে আবী শায়বা : আল মুসান্নাফ, ৭:৪২৬।
খ) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, বাবু ক্বিতয়াতি মিনাল মাফকূদ, ১৯:২৩৭।

৩. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু ওয়া মিন মুসনাদি আলী, ৩:৩০৬, হাদিস নং : ১৩০০।

وَقَالَ أَنَسٌ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ابْتَنَى بِزَيْنَب أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُو لَهُ قَوْمًا سَمَّاهُمْ وَكُلَّ من لَقِيتَ حَتَّى امْتَلأَ الْبَيْتُ وَالْحُجْرَةُ وَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ تَوْرًا فِيهِ قَدْرُ مُدٍّ من تَمْرٍ جُعِلَ حَيْسًا فَوَضَعَهُ قُدَّامَهُ وَغَمَسَ ثَلَاثَ أَصَابِعِهِ وَجَعَلَ الْقَوْمُ يَتَغَدَّوْنَ وَيَخْرُجُونَ وَبَقِيَ التَّوْرُ نَحْوًا مِمَّا كَانَ وَكَانَ الْقَوْمُ أَحَدًا أَو اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ،

–হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন হযরত জয়নব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) কে বিবাহ করেন। তিনি আমাকে বললেন, অমুক অমুক কে ডেকে নিয়ে এসো। তিনি আরও বললেন, রাস্তায় যাকে পাবে তাকে সাথে নিয়ে এসো। এমনকি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাড়ীর আঙ্গিনা লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লোকজনের সামনে খাদ্যের খাঞ্চা রাখেন। যা সম্ভবত এক সের খেজুরের খাঞ্চা ছিল। তিনি খাদ্যের খাঞ্চা সামনে রেখে তাঁর তিনটি আঙ্গুল তাতে রাখেন। লোকদের অবস্থা এরূপ হয়েছে যে, তাঁরা একদল এসে খেয়ে চলে যায়। এভাবে প্রায় একাত্তর বা বাহাত্তর জন লোক খেয়েছে।

এ সম্পর্কিত অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে। তিনশ'জন লোক খাবার খেয়ে তৃপ্তি লাভ করে। এরপর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আনাস! এখন থালা উঠিয়ে নাও। হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি থালা উঠিয়ে নিলাম। কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি যে, খাঞ্চা ভর্তি থালা আনার সময় খাবার বেশী ছিল না, এখন নিয়ে যাবার সময় বেশী।

হযরত ইমাম জাফর সাদিক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর পিতা থেকে আর তিনি হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন,

أَنَّ فَاطِمَةَ طَبَخَتْ قِدْرًا لِغَدَائِهِمَا وَوَجَّهَتْ عَلِيًّا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَغَدَّى مَعَهُمَا فَأَمَرَهَا فَغَرَفَتْ مِنْهَا لِجَمِيعِ نِسَائِهِ صَحْفَةً صَحْفَةً ثُمَّ

لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولعَلِيٍّ ثُمَّ لَهَا ثُمَّ رَفَعَتِ الْقِدْرَ وَإِنَّهَا لَتَفِيضُ قَالَتْ فَأَكَلْنَا مِنْهَا مَا شَاءَ اللهُ،

–হযরত ফাতেমা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) একদিন গোশত রান্না করেন এবং হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে নিয়ে আসার জন্য পাঠান। যাতে তিনি তাঁদের উভয়কে আহার করাতে পারেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত ফাতেমা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা)'র বাড়ীতে এসে বললেন, গোশতের পাতিল থেকে উম্মুল মু'মিনীনদের প্রত্যেকের ঘরে এক পেয়ালা করে গোশত পাঠানো হোক। অতঃপর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) এর জন্য পাতিল থেকে গোশত উঠানোর পরও দেখা যায় যে, গোশতের পাতিল পূর্বের মতো ভর্তি হয়ে আছে। ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, অতঃপর মহান আল্লাহ যা চান, আমরা সেখান থেকে আহার করলাম।

একবার হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে আহমাছ গোত্রবাসীদের চারশ'উট বোঝাই করে দেয়ার আদেশ করেন। হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আরজ করেন,

يَا رَسُولَ اللهِ مَا هِيَ إِلَّا أَصْوُعٌ قَالَ اذْهَبْ فَذَهَبَ فَزَوَّدَهُمْ مِنْهُ وَكَانَ قَدْرَ الْفَصِيلِ الرَّابِضِ مِنَ التَّمْرِ وَبَقِيَ بِحَالِهِ،

–হে আল্লাহর রাসূল! খেজুর তো মাত্র কয়েক সা' হবে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি যাও উট বোঝাই করে দাও। তিনি গিয়ে উট বোঝাই করেন। সেই খেজুরের পরিমাণ ছিল বাচ্চা উটের পিঠের সমান। পরে দেখা যায় যে, যেখান থেকে উট বোঝাই করেন সেখানে খেজুরের পরিমাণ একটুকুও কমেনি।

ওয়াকিন আহযাবী বলেন, খেজুর দেয়ার পরও পূর্বের মতো অবশিষ্ট থেকে যায়।

হারীর ও নোমান বিন মাকরূনের বর্ণনাদ্বয়ে ঐ কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু নোমান বলেন, উটসমূহ বোঝাই করা হয়েছে।

এ সম্পর্কে হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে তাঁর পিতার ঋণ পরিশোধ করা সংক্রান্ত বর্ণনা, যা তাঁর পিতার মৃত্যুর পর সংঘটিত হয়েছে,

وَقَدْ كَانَ بَذَلَ لِغُرَمَاءِ أَبِيهِ أَصْلَ مَالِهِ فَلَمْ يَقْبَلُوهُ وَلَمْ يَكُنْ فِي ثَمَرِهَا سَنَتَيْنِ كَفَافُ دَيْنِهِمْ فجاء النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ أمره بجدها وَجَعْلِهَا بيادر فِي أَصُولِهَا فَمَشَى فِيهَا وَدَعَا فَأَوْفَى مِنْهُ جَابِرٌ غُرَمَاءَ أَبِيهِ وَفَضَلَ مِثْلُ مَا كَانُوا يَجُدُّونَ كُلَّ سَنَةٍ،

–তিনি তাঁর পিতার পাওনাদারদের আসল মাল পরিশোধ করতে চাইলে তারা অস্বীকার করে। তাঁর বাগানে উৎপাদিত দু'বছরের খেজুরের দ্বারাও ঋণ পরিশোধ করার অবকাশ ছিলনা। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যাও খেজুর গাছ থেকে কেটে একত্রে স্তুপ করে জমা কর। আর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই সেখানে যাত্রা করেন এবং খেজুরের স্তুপের নিকট বসে বরকতের জন্য দোয়া করেন। হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধ করে দেন। তারপরও দেখা যায় প্রতি বছর যে পরিমাণ খেজুর কাটে সে পরিমাণ খেজুর অবশিষ্ট থেকে যায়। হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, ঋণদাতা ইহুদী ছিল সে এ অবস্থা দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়।

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

أَصَابَ النَّاس مَخْمَصَةٌ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ من شئ قلت نعم شئ مِنَ التَّمْرِ فِي الْمِزْوَدِ قَالَ فَأْتِنِي بِهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ. فَأَخْرَجَ قَبْضَةً فَبَسَطَهَا وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ ادْعُ عَشَرَةً فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ عَشَرَةً كَذَلِكَ حَتَّى أَطْعَمَ الْجَيْشَ كُلَّهُمْ وَشَبِعُوا قَالَ خُذْ مَا جِئْتَ بِهِ وَأَدْخِل يَدَكَ وَاقْبِضْ مِنْهُ وَلَا تَكُبَّهُ فَقَبَضْتُ عَلَى أَكْثَرَ مِمَّا جِئْتُ بِهِ فَأَكَلْتُ مِنْهُ وَأَطْعَمْتُ حَيَاةَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ إِلَى أَنْ قُتِلَ عُثْمَانُ فَانْتُهِبَ مِنِّي فَذَهَبَ،

–একদা এক সফরে লোকেরা ভীষণ ক্ষুধায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, হে আবু হোরায়রা! তোমার নিকট কিছু কি আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। থলের ভেতরে কয়েকটি খেজুর রয়েছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমার নিকট নিয়ে এসো। অতঃপর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় হাত থলের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে একমুষ্ঠি খেজুর বের করে এনে বরকতের জন্য দোয়া করেন। অতঃপর বললেন, দশজন করে ডেকে নিয়ে এসো। তারা এসে পেটপুরে খেয়ে চলে যায়। এভাবে সমস্ত সৈন্যবাহিনী উদরপূর্ত করে খায়। অতঃপর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন, যাও যা এনেছিলে তা নিয়ে যাও এবং যত্ন সহকারে রেখে দাও। প্রয়োজন হলে থলের ভেতর হাত দিয়ে বের করে আনবে। তবে থলে ঝাড়বেনা। যাওয়ার সময় দেখি যা এনেছি তার চেয়ে বেশী নিয়ে যাচ্ছি। এরপর উক্ত থলি থেকে আমি নিজে খেয়েছি, অন্যদেরকেও খেতে দিয়েছি। এভাবে আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যুগ থেকে হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর যুগেও এরূপ করেছি। পরবর্তী সময় হযরত ওসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) শহীদ হবার পর কে আমার থলেটি লুট করে নিয়ে যায়। তখন এ বরকত হাতছাড়া হয়ে যায়।

অন্য এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে, হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

فَقَدْ حَمَلْتُ من ذَلِكَ التَّمر كَذَا وَكَذَا من وَسْقٍ فِي سَبِيلِ اللهِ،

–আমি উক্ত থলে থেকে যত খেজুর বের করে আল্লাহর রাস্তায় বন্টন করি তার পরিমাণ আমার যতদূর মনে পড়ে এক ওসক এবং ষাট 'সা' হবে। এক 'সা' সমান সাড়ে চার সের।[১]

এ ধরণের বর্ণনা তাবুক যুদ্ধ সংক্রান্ত অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত থলেতে দশটির বেশী খেজুর ছিল, তা দিয়ে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেক

[১]. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মানাক্বিবি আবী হুরাইরা, ১২:৩২৭, হাদিস নং : ৩৭৭৪।
খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু ফাযায়িলি সায়্যিদিল মুরসালীন, ৩:২৯০, হাদিস নং : ৫৯৩৩।
গ) বায়হাকী : দালায়িলুন্ নবুয়্যাত, বাবু আবওয়াবি দাওয়াতি নাবিয়্যিনা, ৬:২৬৮, হাদিস নং : ২৩৫৪।

মুজাহিদকে দশটি খেজুর দেন। অনুরূপ এক বর্ণনায় হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

حِينَ أَصَابَهُ الْجُوعِ فَاسْتَتْبَعَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَحٍ قَدْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْعُو أَهْل الصُّفَّةِ قَالَ فَقُلْتُ مَا هَذَا اللَّبَنُ فِيهِمْ كُنْتُ أَحَقَّ أنْ أُصِيبَ مِنْهُ شَرْبَةً أَتقَوَّى بِهَا فَدَعَوْتُهُمْ وَذَكَرَ أَمْرَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ أنْ يَسْقِيهُمْ فَجَعَلْتُ أُعْطِي الرَّجُلَ فَيَشْرَبَ حَتَّى يَرْوى ثُمَّ يَأْخُذُهُ الآخَرُ حَتَّى رَوِيَ جَمِيعُهُمْ قَالَ فَأَخَذَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدَحَ وَقَالَ بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ اقْعُدْ فَاشْرَبْ فَشَرِبْتُ ثُمَّ قَالَ اشْرَبْ وَمَا زَالَ يَقُولُهَا وَأَشْرَبُ حَتَّى قُلْتُ لَا وَالذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَحَمِدَ اللهَ وَسَمَّى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ،

–একবার আমি ক্ষুধার তাড়নায় ব্যস্ত হয়ে উঠি। আমার এ অবস্থা দেখে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এসো আমার পেছনে পেছনে এসো। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট হাদিয়ার এক পেয়ালা দুধ ছিল। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বললেন, আহলে সুফফাদের ডেকে নিয়ে এসো। হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি মনে মনে চিন্তা করি, এ সামান্য এক পেয়ালা দুধ দিয়ে কি হবে। আমি নিজে সকলের চেয়ে পান করার বেশী অধিকারী। যদি সুযোগ পাই তাহলে আমি বেশী পান করবো। আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আদেশে তাদের ডেকে এনে বললাম, আমি আপনাদেরকে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আদেশে ডেকে এনেছি এবং তাঁর নির্দেশ মোতাবেক পান করাচ্ছি। একেক করে তাঁদেরকে পান করাতে শুরু করি। তারা তৃপ্তি সহকারে পান করেন। অতঃপর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পেয়ালা হাতে নিয়ে বললেন, আমি আর তুমি বাকি আছি। দুধ পান কর। আমি ইচ্ছা মত পান করি। তারপরেও হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আরো পান করো। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

বলছেন, আর আমি পান করতে থাকি। অবশেষে আমি তৃপ্তি লাভ করে বললাম, ঐ খোদার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আমার আর পান করার অবকাশ নেই। অতঃপর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুধের পেয়ালা হাতে নিয়ে "আল হামদুলিল্লাহ" ও "বিসমিল্লাহ" পড়ে অবশিষ্ট দুধ পান করেন।[১]

হযরত খালিদ বিন আবদুল উজ্জা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাদীসে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

أَنَّهُ أَجْزَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً وَكَانَ عِيَالُ خَالِدٍ كثيرا يَذْبَحُ الشَّاةَ فَلَا تُبِدُّ عِيَالَهُ عَظْمًا وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ من هَذِهِ الشَّاةِ وَجَعَلَ فَضْلَتَهَا فِي دَلْوِ خَالِدٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فَنَثَرَ ذَلِكَ لِعِيَالِهِ فَأَكَلُوا وَأَفْضَلُوا،

–আমি একদিন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্য একটি বকরী জবেহ করি। খালিদের পরিবারের লোকসংখ্যা অনেক বেশী ছিল। বকরীর এক টুকরো হাড়ও তাদের ভাগে দেয়া যেতনা। কিন্তু ঐদিন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই বকরীর গোশত খান। অবশিষ্ট গোশত খালিদের পাতিলে ঢেলে দেন। তারপর বরকতের জন্য দোয়া করেন। অতঃপর খালিদ সে গোশত তার গৃহবাসী সকলের মধ্যে বন্টন করেন। সকলে তৃপ্তি সহকারে আহার করে। তারপরেও কিছু গোশত থেকে যায়। এ বর্ণনা দাইলামী বর্ণনা করেন।

হযরত আজরা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাদীসে বর্ণিত আছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত ফাতেমা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট বিবাহদান সম্পর্কিত হাদীসে রয়েছে–

أن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا بِقَصْعَةٍ من أَرْبَعَةِ أَمْدَادٍ أَوْ خمسة ويذبح جوزرا لوليتها قَالَ فَأَتَيْتُهُ بِذَلِكَ فَطَعَنَ فِي رَأْسِهَا ثُمَّ أَدْخَلَ النَّاسِ

[১]. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, ৯:১৭, হাদিস নং : ২৪০১।
খ) হাকেম : মুসতাদ্‌রাক আলাস্ সহীহাইন, বাবুল হক্কি আহলিস্ সুফ্ফা, ১০:৭৩, হাদিস নং : ৪২৫৮।

رُفْقَةً رُفْقَةً يَأْكُلُونَ مِنْهَا حَتَّى فرغُوا وَبَقِيَتْ مِنْهَا فَضْلَةٌ فَبَرَّكَ فِيهَا وَأَمَرَ بِحَمْلِهَا إِلَى أَزْوَاجِهِ وَقَالَ كُلْنَ وَأَطْعِمْنَ من غَشِيَكُنَّ

–রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলাল (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে নির্দেশ দিলেন যে, চার বা পাঁচ সের আটার রুটি তৈরী কর। আর একটি উট জবাই করে ওলিমার আয়োজন কর। হযরত বেলাল (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি সেই খাবার নিয়ে আসার পর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পবিত্র হাত বরতনের পাশে লাগালেন। অতঃপর লোকদের ভেতরে আসার নির্দেশ দেন। তখন একদল লোক আসছে আর খাবার খেয়ে চলে যাচ্ছে। এভাবে উপস্থিত সকলে খাবার খায়। আর যা অবশিষ্ট থাকে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা উম্মুল মুমিনদের জন্য পাঠিয়ে বললেন, তোমাদের সাথে যে মহিলারা আছে তাদেরকেও খেতে দেবে এবং তোমরা নিজেরাও খাবে।

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে,

تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَنَعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرٍ فَذَهَبْتُ بِهِ إِلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَعْهُ وَادْعُ لِي فُلَانًا وَفُلَانًا وَمَنْ لَقِيتَ فَدَعَوْتُهُمْ وَلَمْ أَدَعْ أَحَدًا لَقِيتُهُ إِلَّا دَعَوْتُهُ وَذَكَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا زُهَاءَ ثلثمائة حتى ملؤوا الصُّفَّةَ وَالْحُجْرَةَ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَلَّقُوا عَشْرَةً عَشْرَةً وَوَضَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى الطَّعَامِ فَدَعَا فِيهِ وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُول فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا كُلُّهُمْ فَقَالَ لِي ارْفَعْ فَمَا أَدْرِي حِينَ وُضِعَتْ كَانَتْ أَكْثَرَ أَم حِينَ رُفِعَتْ،

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন হযরত মায়মুনা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)কে বিবাহ করেন, তখন আমার মা উম্মে সুলাইম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মালিদা তৈরী করে বরতনে ঢেলে

দিয়ে বললেন, এগুলো হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে নিয়ে যাও। আমি তা নিয়ে এসে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সম্মুখে পেশ করি। তিনি বললেন, রেখে দাও। অমুক অমুককে ডেকে আনো, বরং রাস্তায় যাদের পাবে তাদের সঙ্গে নিয়ে আসবে। হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, সম্ভবত তিনশ'জন লোক সমবেত হয়। বারান্দা লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। তারপর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, দশজন করে খাবার খেতে বসে যাও। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বরতনের উপর পবিত্র হাত রেখে কিছু পাঠ করলেন। সকলে তৃপ্তি সহকারে পেট পুরে খায়। এরপর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আনাস! এখন থালা উঠিয়ে নাও। হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি বরতন উঠালাম। কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি যে, বরতন আনার সময় খাবার বেশী ছিল, না নিয়ে যাবার সময় খাবার বেশী ছিল।[১]

এ সম্পর্কিত তিনটি পারিচ্ছেদে বর্ণিত হাদিসসমূহ সহীহ। আর এ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হাদীসের অর্থের উপর দশজন সাহাবী ঐক্যমতে উপনীত হয়েছেন। আর তাদের থেকে দ্বি-গুণ তিন গুণ তাবেয়ী ঐ হাদিসসমূহ বর্ণনা করেছেন। তাদের পরবর্তী সময় ঐ বর্ণনাসমূহের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা গণনা করে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। তারপরেও ঐ বর্ণনাসমূহ সেই সময় থেকে বড় বড় মজলিসসমূহে বর্ণনা করা হয়। যদি ঐ বর্ণনাসমূহ মিথ্যা হতো, তাহলে শ্রোতাবৃন্দ নীরবতা অবলম্বন করতেন, একথা বলার কোন অবকাশ নেই। তারা উক্ত বর্ণনা সমূহ অস্বীকার করেননি। সুতরাং প্রমাণিত হয়েছে ঐ বর্ণনা সমূহ সত্য।

[১]. ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু জাওয়াযি জয়নাব বিনতে জাহাশ, ৭:২৭৪, হাদিস নং : ২৫৭২।
খ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ওয়া মিন সুরাতিল আহযাব, ১১:৭, হাদিস নং : ৩১৪২।
গ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু ফাযায়িলি সায়্যিদিল মুরসালীন, ৩:২৮৫, হাদিস নং : ৫৯১৩।

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ

فِيْ كَلَامِ الشَّجَرِ وَشَهَادَتِهَا لَهُ بِالنُّبُوَّةِ وَإِجَابَتِهَا دَعْوَتِهِ

বৃক্ষরাজি কর্তৃক হুযুর (ﷺ)'র নবুওয়াতের সাক্ষ্য দেওয়া ও তাঁর আহবানে সাড়া দেয়া

হযরত ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَدَنَا مِنْهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا أَعْرَابِيُّ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ إِلَى أَهْلِي قَالَ هَلْ لَكَ إِلَى خَيْرٍ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ تَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى مَا تَقُولُ قَالَ هَذِهِ الشَّجَرَةُ السَّمُرَةُ وَهِيَ بِشَاطِئِ الْوَادِي فَأَقْبَلَتْ تَخُدُّ الْأَرْضَ حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاسْتَشْهَدَهَا ثَلَاثًا فَشَهِدَتْ أَنَّهُ كَمَا قَالَ ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَكَانِهَا،

–একদা আমরা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে সফরে ছিলাম। এক বেদুঈন আমাদের সামনে আসে। সে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনে আসলে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোথায় যাচ্ছো? সে বললো, আমি বাড়ী যাচ্ছি। তিনি বললেন, তুমি কি কোন কল্যাণ কামনা করো? সে বললো, সেটা আবার কী? তিনি বললেন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। আর মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল- এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করা। সে বলল, আপনি যা বলছেন তার সত্যতার কোন সাক্ষী আছে কী? তিনি বললেন, মাঠের কোণে দাঁড়ানো এই বাবলা বৃক্ষ আমার সাক্ষী। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওই প্রান্তে দাঁড়ানো বৃক্ষকে ডাক দেন। বৃক্ষটি তৎক্ষণাৎ মাটি চিরে দু'ভাগ করে দৌড়ে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনে উপস্থিত হয়। তারপর তিনি বৃক্ষের নিকট থেকে তিনবার সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। গাছটি পুনরায় যথাস্থানে ফিরে চলে যায়।[১]

[১]. ক) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ১১:৬২।

হযরত বুরায়দা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। এক বেদুঈন একদিন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট মু'জিযা দেখতে চায়,

سَالَ أَعْرَابِيّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةً فَقَالَ لَهُ قُلْ لِتِلْكَ الشَّجَرَةِ رَسُول اللهِ صَلَّى الله عليه وسلم يدعوك قال فمالت الشَّجَرَةُ عَنْ يَمِينِهَا وَشِمَالِهَا وَبَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفَهَا فَتَقَطَّعَتْ عُرُوقُهَا ثُمَّ جَاءَتْ تَخُدُّ الْأَرْض تَجُرُّ عُرُوقَهَا مُغْبَرَّةً حَتَّى وَقَفَتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُول اللهِ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ مُرْهَا فَلْتَرْجِعْ إِلَى مَنْبَتِهَا فَرَجَعَتْ فَدَلَّتْ عُرُوقَهَا فَاسْتَوَتْ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ ائْذَنْ لِي أَسْجُدْ لَكَ قَالَ لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا قَالَ فَأْذن لِي أَنْ أُقَبِّلَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ فَأَذِنَ لَهُ،

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জনৈক বেদুঈনকে বললেন, তুমি গিয়ে ঐ গাছকে বল যে, আল্লাহর রাসূল তোমাকে ডাকছে। বেদুঈন গাছের নিকট গিয়ে একথা বলার পর গাছ সামনে পেছনে একটু নড়াচড়া করে মাটি থেকে শিকড় বের করে মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করে, "আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ"। এ অবস্থা দেখে বেদুঈন বললো, এখন গাছকে তার স্ব-স্থানে ফিরে যেতে বলুন। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ দেন। আর অমনি গাছটি নিজের জায়গায় ফিরে চলে যায়। তার ছোট-বড় সব শিকড় মাটির ভিতর প্রবেশ করালে যমীনের অবস্থা পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক হয়ে যায়। বেদুঈন আরয করে, আমাকে অনুমতি দিন তাহলে আমি আপনাকে সিজদা করব। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি যদি আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম তাহলে স্ত্রীলোকদের তাদের স্বামীকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম। অতঃপর বেদুঈন বলল, তাহলে আমাকে আপনার হাত ও কদম মুবারক চুম্বন করার অনুমতি দিন। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চুম্বন করার অনুমতি দান করেন।

ঘ) ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, বাবু যিকরি শাহাদাতুশ শাজার, ২৭:৪২, হাদিস নং : ৬৬১৩।

হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে এক দীর্ঘ হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا يَسْتَتِرُ بِهِ فَإِذَا بِشَجَرَتَيْنِ بِشَاطِئِ الْوَادِي فَانطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى إِحْدَاهُمَا فَأَخَذَ بِغُصْنٍ من أَغْصَانِهَا فَقَالَ انْقَادِي عَلَيَّ بِإِذْنِ اللهِ فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَخْشُوشِ الَّذِي يُصَانِعُ قَائِدَهُ،

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার প্রকৃতির ডাকে যান। কোথায়ও পর্দা করার কিছুই ছিলনা। তিনি শুধু মাঠের মধ্যে দু'টি বৃক্ষ দেখেন। তিনি এক বৃক্ষের ডাল ধরে বললেন, আল্লাহর হুকুমে আমার আনুগত্য কর। ডাল হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনে অনুগত হয় যেন উটের নাকে রশি লাগালে সে যেমন তার রবর অনুগত হয়। বর্ণনাকারী বলেন, অপর গাছের সাথেও অনুরূপ করেন। এমন কি দু'টি গাছ অর্ধেক পথ চলে আসে। তখন তিনি বললেন, তোমরা উভয় আল্লাহর হুকুমে মিলিত হয়ে যাও। উভয় গাছ একত্রে মিলিত হয়ে গেল।[১]

অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বললেন,

يَا جَابِرُ قُلْ لِهَذِهِ الشَّجَرَةِ يَقُولُ لَكَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَقِي بِصَاحِبَتِكِ حَتَّى أَجْلِسَ خَلْفَكُمَا فَزَحَفَتْ حَتَّى لَحِقَتْ بِصَاحِبَتِهَا فَجَلَسَ خلفها فَخَرَجْتُ أَحضِرُ وَجَلَسْتُ أُحَدِّثُ نَفْسِي- فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلًا والشَّجَرَتَانِ قَدِ افْتَرَقَتَا فَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى سَاقٍ فَوَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقْفَةً فَقَالَ بِرَأْسِهِ هَكَذَا يَمِينًا وَشِمَالًا،

১. ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু হাদিসী জাবিরিত্ তবীল, ১৪:২৯৫, হাদিস নং : ৫৩২৮।
খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু ফাযায়িলি সায়্যিদিল মুরসালীন, পৃ. ২৮০, হাদিস নং : ৫৮৮৫।
গ) বায়হাকী : সুনানুল কুবরা, ১:৯৪।

–হে জাবির, ওইগাছকে বলো যে, আল্লাহর রাসূল বলেছেন, তোমরা একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে যাও। যাতে তিনি তোমাদের আড়ালে বসতে পারেন। আমি তাই বললাম। গাছ একটু সামনে এসে আরেক গাছের সাথে মিলিত হয়ে যায়। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার অন্তরালে বসেন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে অন্য এক স্থানে বসেন। আর আমি তখন মনে মনে চিন্তা করি আমি একি দেখছি। এমতাবস্থায় হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার সামনে আসেন। আর গাছ দু'টি পৃথক হয়ে নিজ নিজ জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়। আর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাঁড়িয়ে মাথা দিয়ে ডান দিকে ও বাম দিকে ইশারা করেন।[১]

এরূপ বর্ণনা হযরত উসামা বিন যায়িদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ هَلْ يَغْنِي مَكَانًا لِحَاجَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ الْوَادِيَ ما فيه مواضع بِالنَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَرَى من نَخْلٍ أَوْ حِجَارَةٍ قُلْتُ أَرَى نَخَلَاتٍ مُتَقَارِبَاتٍ قَالَ انْطَلِقْ وَقُلْ لَهُنَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُنَّ أَنْ تَأْتِينَ لِمَخْرَجِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلْ لِلْحِجَارَةِ مِثْلَ ذَلِكَ فَقُلْتُ ذَلِكَ لهن فو الذى بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّخَلَاتِ يَتَقَارَبْنَ حَتَّى اجْتَمَعْنَ وَالْحِجَارَةَ يَتَعَاقَدْنَ حَتَّى صِرْنَ رُكَامًا خَلْفَهُنَّ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ لِي قُلْ لَهُنَّ يفترقن فو الذى نَفْسِي بِيَدِهِ لَرَأَيْتُهُنَّ وَالْحِجَارَةَ يَفْتَرِقْنَ حَتَّى عُدْنَ إِلَى مواضعتهن،

–এক যুদ্ধে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন, তুমি আল্লাহর রাসূলের প্রকৃতির প্রয়োজন পূরণের জন্য কোনো উপযুক্ত স্থান, বৃক্ষ বা পাথর দেখতে পেয়েছো কি? আমি আরয করি, খেজুর গাছ

---

[১]. ক) মুসলিম : আস সহীহ, বাবু হাদিসী জাবিরিন্ তত্তীল, ১৪:২৯৫, হাদিস নং : ৫৩২৮।
খ) বায়হাকী : দালায়িলুন নবুয়্যাত, বাবু ইনকিয়াদুশ শাজার, ৬:১৩৩, হাদিস নং : ২২৫৬।

দেখছি। তিনি বললেন, গাছগুলোকে বলো, তারা যেন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রকৃতির প্রয়োজন পূরণের জন্য চলে আসে। একথা আমি বৃক্ষ ও পাথরকে বলি। আমি নিদের্শ পালন করি। কসম ঐ মহান সত্তার যিনি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সত্য নবী করে প্রেরণ করেছেন, আমি দেখতে পাই যে, খেজুর গাছগুলো একটি অপরটির নিকট এসে পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে যায়। অনুরূপ পাথরসমূহকে দেখি একটি অপরটির উপর উঠে প্রাচীরের মতো হয়ে যায়। এরপর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রয়োজন মুক্ত হয়ে আমাকে ইশারা করে বললেন, ওদেরকে একে অপর থেকে পৃথক হয়ে চলে যেতে বলে দাও। শপথ ঐ মহান সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি দেখি তারা প্রত্যেকে পৃথক হয়ে স্ব স্ব স্থানে ফিরে চলে যায়।

হযরত ইয়ালাহ বিন সাবারাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ وَذَكَرَ نَحْوًا من هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ وَذَكَرَ فأمر وَدِيَّتَيْنِ فَانْضَمَّتَا وَفِي رِوَايَةٍ أَشَاءَتَيْنِ وَعَنْ غَيْلَانَ بن سَلَمَةَ الثَّقَفِيِّ مِثْلُهُ فِي شَجَرَتَيْنِ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ فِي غَزَاةِ حُنَيْنٍ،

–আমি কোন এক সফরে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সঙ্গে ছিলাম। তারপর তিনি উপরে উল্লেখিত হাদিস দু'টির অনুরূপ এক হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছোট ছোট খেজুর গাছকে হুকুম দিলেন, তারা যেন একত্রে মিলিত হয়ে যায়। অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বড় দু'টি খেজুর গাছকে হুকুম করেন।

হযরত গায়লান বিন সালমা সাকাফী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে গাছ সম্পর্কে এরূপ এক বর্ণনা বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে মাস'উদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে এ ধরণের ঘটনা হুনাইনের যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছে বলে বর্ণনা করেন।

হযরত ইয়া'লা বিন মুররাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যিনি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অনেক মু'জিযা দেখেছেন। তিনিও এরূপ অনেক

মু'জিযার উল্লেখ করেছেন। তিনি এক বিরাট কাটাযুক্ত গাছের কথা উল্লেখ করে বলেন, গাছটি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পাশে এসে তাঁর চার দিকে কয়েক বার প্রদক্ষিণ করে পরে তার নিজের স্থানে চলে যায়। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

إِنَّهَا اسْتَأْذَنَتْ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَيَّ،

–এ গাছ আমাকে সালাম করার জন্য আল্লাহর তা'আলার নিকট অনুমতি চেয়েছে। তাই সে আমাকে সালাম করতে এসেছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক গাছ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট এসে বলল যে, আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত শুনার জন্য এসেছি। হযরত মুজাহিদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে হযরত ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় উল্লেখ আছে, জ্বীনরা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট এসে বলল,

من يَشْهَدُ لَكَ قَالَ هَذِهِ الشَّجَرَةُ تَعَالَيْ يَا شَجَرَةُ فَجَاءَتْ تَجُرُّ عُرُوقَهَا لَهَا قَعَاقِعُ،

–আপনার নবুওয়াতের সাক্ষ্যদানকারী কে? তিনি বললেন, এ গাছ আমার নবুওয়াতের সাক্ষ্যদানকারী। একথা বলার পর তিনি গাছকে তাঁর নিকটে আসতে বললেন। তখন গাছ শিকড়সহ নবুওয়াতের সাক্ষ্য দিতে চলে আসে।

কাযী আবুল ফযল আয়ায (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, মূলতঃ এ ঘটনায় হযরত ইবনে উমর, হযরত বুরায়দা, হযরত জাবির, হযরত ইবনে মাস'উদ, হযরত ইয়া'লা বিন মুররাহ, হযরত উসামা বিন জায়িদ, হযরত আনাস বিন জায়িদ, হযরত আলী বিন আবু তালিব, হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) প্রমুখ খ্যাতনামা সাহাবীগণ ছাড়াও অন্যান্য সাহাবীগণ ঐক্যমতে উপনীত হয়েছেন। আর তাঁদের চেয়ে দ্বিগুণ সংখ্যক তাবেয়ীন ঐ সংক্রান্ত বিষয় বর্ণনা করেন। সুতরাং ঐ হাদিসসমূহ যে পর্যায়ের হোক না কেনো, ঐগুলো প্রচারের দিক থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী।

ইবনে ফুওরাক বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তায়েফের যুদ্ধের সময় একবার সারারাত সফর করেন। পরে তিনি যখন নিদ্রা যান, তখন একটি

কুলগাছ তাঁর সামনে এসে দু'ভাগ হয়ে যায়। এমনকি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সে গাছের দু'ভাগের মধ্য দিয়ে সামনে চলে যায়। অদ্যাবধি উক্ত গাছ দু'ভাগে বিভক্ত হওয়া বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত স্থান জনসাধারণের নিকট সম্মান ও মর্যাদা পূর্ণ হয়ে আছে।

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে এক হাদীসে বর্ণিত আছে,

أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَآهُ حَزِينًا أَتُحِبُّ أَنْ أُرِيكَ آيَةً قَالَ نَعَمْ فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَجَرَةٍ من وَرَاءِ الْوَادِي فَقَالَ ادْعُ تِلْكَ الشَّجَرَةَ فَجَاءَتْ تَمْشِي حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ مُرْهَا فَلْتَرْجِعْ فَعَادَتْ إِلَى مَكَانِهَا،

–একদা হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে চিন্তাযুক্ত দেখে বললেন, আপনি কি চান যে, আমি আপনাকে এক মু'জিযা দেখাবো? হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ! অতঃপর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক গাছের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) বললেন, হুযুর! আপনি ঐ গাছকে ডাক দিন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গাছকে আহবান করলেন আর গাছটি তৎক্ষনাৎ দৌড়ে এসে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনে দাঁড়িয়ে যায়। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) বললেন, এবার গাছকে স্ব-স্থানে ফিরে যেতে বলুন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ পেয়ে গাছ পুনরায় তার নিজের স্থানে ফিরে যায়।[১]

হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

اَللَّهُمَّ أَرِنِي آيَةً لَا أُبَالِي مِنْ كَذَّبَنِي بَعْدَهَا فَدَعَا شَجَرَةً مِثْلَهُ وَذَكَرَ،

–হে আল্লাহ! আমার সত্যবাদীতার নিদর্শন আমাকে দেখান। এরপর যাতে আর কেউ আমাকে মিথ্যাবাদী বলতে না পারে। তারপর তিনি একটি বৃক্ষকে আহবান করেন, তারপর ঐ বর্ণনার উল্লেখ করেন।

[১]. ক) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবুস্ সবরি আলাল বালা, ১২:৩৫, হাদিস নং : ৪০১৮।
খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু ফাযায়িলি সায়্যিদিল মুরসালীন, ৩:২৮৮, হাদিস নং : ৫৯২৫।
গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আনাস ইবনে মালেক, ২৪:২১৫, হাদিস : ১১৬৬৯।

মূলতঃ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চিন্তাযুক্ত হবার কারণ হলো তাঁর সম্প্রদায় কর্তৃক তাঁকে মিথ্যাবাদী বলা। তিনি মু'জিযা দেখানোর জন্য তা বলেননি। বরং মিথ্যাবাদী কাফিরদের উদ্দেশ্যে বলেছেন।

ইবনে ইসহাক বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রোকানাকেও অনুরূপ মু'জিযা দেখান। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার এক গাছকে ডাকেন। গাছটি তাৎক্ষনিকভাবে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায়। তারপর তিনি গাছকে তার স্ব-স্থানে ফিরে যেতে বললেন, তখন গাছটি তার স্থানে প্রত্যাবর্তন করে।[১]

হযরত হাসান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর গোত্রবাসীদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার নিকট আরয করেন যে, তারা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট মু'জিযা চান। যাতে তিনি নির্ভীক হতে পারেন। তখন তাঁর নিকট ওহী অবতীর্ণ হয় যে, আপনি অমুক গাছের নিকট যান এবং তার ডাল ধরে ডাক দিন। তাহলে দেখবেন সে আপনার নিকট চলে আসছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাই করেন। গাছ তাৎক্ষনিক মাটি চিরে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

---

১. রোকানা মক্কার প্রসিদ্ধ পহলোয়ান ছিল। সে ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে একবার মাঠে বকরী চরাচ্ছিল। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার নিকট দিয়ে যাচ্ছেন। সে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলল, শুনতে পাচ্ছি যে, আপনি আমাদের প্রতিমাগুলোকে গালি দিচ্ছেন। তাই এখন আপনি আপনার খোদার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করুন। আমিও আমাদের প্রতিমা লাত ও ওজ্জার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। আসুন আমরা উভয় কুস্তিতে লিপ্ত হই। আজ পর্যন্ত কুস্তিতে কেউ আমাকে পরাজিত করতে পারেনি। যদি আপনি আজ আমাকে পরাজিত করে মাটিতে ফেলতে পারেন, তাহলে আমি আপনাকে দশটি বকরী পুরস্কার দেবো। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে মাটিতে ফেলে দেন। সে লজ্জিত হয়ে বললো, ঠিক আছে আসুন দ্বিতীয়বার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হই। এবার যদি আপনি আমাকে পরাজিত করে বিজয়ী হন। তাহলে আমি আপনাকে বিশটি বকরী পুরস্কার দেবো। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে দ্বিতীয়বারও পরাভূত করে মাটিতে ফেলে দেন। এবার সে বললো, আচ্ছা ঠিক আছে। তৃতীয়বার যদি আপনি আমাকে মাটিতে ফেলতে পারেন, তাহলে আমি পরাজয় স্বীকার করে নেবো এবং আপনাকে ত্রিশটি বকরী পুরস্কার দেবো। তৃতীয়বারও হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে পরাভূত করে মাটিতে ফেলে দেন। তখন সে বললো, এবার আপনি বকরীগুলো নিয়ে যান। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি তোমার নিকট বকরী চাইনা। আমি তোমাকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। যার ফলে তুমি জাহান্নামের শাস্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। রোকানা বলল, আপনি কী আমাকে কোন মু'জিযা দেখাতে পারবেন? তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি বাবুল গাছকে নিকটে আসতে বলেন। গাছটি তাৎক্ষনিক এসে উপস্থিত হয়। রোকানা বললো, আপনি আমাকে অনেক আশ্চর্যজনক মু'জিযা দেখালেন। এখন আপনি গাছকে ফিরে চলে যেতে বলুন। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গাছকে চলে যেতে হুকুম দিলেন। তখন সে বললো, আমি চাইনা যে মক্কার নারীরা আমাকে তিরস্কার করুক যে, আমি ভীত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছি। অবশেষে সে মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়। হযরত মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর খিলাফতকালে ৪২ হিজরীতে ইহজগত ত্যাগ করে। (নাসীমুর রিয়াজ, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা : ৫৬)।

এর সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায়। যতক্ষণ আল্লাহ চাইলেন তিনি ততক্ষণ গাছকে সামনে দাঁড় করে রাখেন। অতঃপর গাছকে বললেন,

ارْجِعْ كَمَا جِئْتَ فَرَجَعَ فَقَالَ يَا رَبِّ عَلِمْتُ أَنْ لَا مَخَافَةَ عَلَيَّ،

–চলে যাও। তখন গাছ তাঁর স্ব-স্থানে চলে যায়। তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে আল্লাহ! এখন আমি শঙ্কা মুক্ত হয়েছি।

এরূপ বর্ণনা হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

أَرِنِي آيَةً لَا أُبَالِي من كَذَّبَنِي بَعْدَهَا.

–আমাকে এরূপ কোন মু'জিযা দান করুন, সে মু'জিযা দেখার পর যাতে কোন মিথ্যাবাদীকে ভয় করতে না হয়। অতঃপর অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা। থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

قَالَ لِأَعْرَابِي أَرَأَيْتَ إِنْ دَعَوْتُ هَذَا الْعِذْقَ من هَذِهِ النَّخْلَةِ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ قَالَ نَعَمْ فَدَعَاهُ فَجَعَلَ يَنْقُزُ حتى أَتَاهُ فَقَالَ ارْجِعْ فَعَادَ إِلَى مَكَانِهِ،

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক বেদুঈনকে বললেন, আমি যদি এ গাছের ডালকে আসতে বলি তাহলে সে চলে আসবে। তাহলে আমি আল্লাহর রাসূল বলে তুমি সাক্ষ্য দেবে? তখন সে বললো, হ্যাঁ, তাই হবে। তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গাছকে ডাক দিলে গাছ দৌড়ে তাঁর নিকট চলে আসে। এরপর তিনি ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। গাছ ফিরে যায়। ইমাম তিরমিযী উক্ত বর্ণনা সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

فِي قِصَّةِ حَنِينِ الْجِذْعِ لَه صلي الله عليه وسلم

হুযুর (ﷺ) এর বিরহে উস্তুনে হান্নানার ক্রন্দন করা

উল্লেখিত বর্ণনা উস্তুনে হান্নানার রোদনের ঘটনাকে বেশী শক্তিশালী করে দিয়েছে। ঐ বর্ণনাসমূহ মূলতঃ মাশহুর, মারূফ ও মুতাওয়াতির পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। উক্ত বর্ণনা সহীহ গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং দশজনের অধিক সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। যথা– হযরত উবাই বিন কাব, হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ, হযরত আনাস বিন মালেক, হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, হযরত সাহল বিন সা'দ, হযরত আবু সাঈদ খুদরী, হযরত বুরায়দা, হযরত উম্মে সালমাহ ও হযরত মোতালেব বিন আবু দারওয়া (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। তারা সকলে ঐ সংক্রান্ত বর্ণনার উল্লেখ করেছেন।

ইমাম তিরমিযী হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনা সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।

হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

كَانَ الْمَسْجِدُ مَسْقُوفًا عَلَى جُذُوعِ نَخْلٍ فَكَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ يَقُومُ إِلَى جِذْعٍ مِنْهَا فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ سَمِعْنَا لِذَلِكَ الْجِذْعِ صَوْتًا كَصَوْتِ الْعِشَارِ.

–মসজিদে নববীর ছাদ খেজুর কাঠ দ্বারা নির্মাণ করা হয়। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খোতবা দানের সময় তার উপর হেলান দিলেন। পরবর্তী সময় মিম্বর নির্মিত হওয়ার পর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে খোতবা দিতেন। তখন আমরা উক্ত খেজুরের কাণ্ড থেকে বাচ্চা প্রসবকারিণী উটনীর কান্নার মতো কান্না শুনতে পাই।[১]

[১]. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু আলামাতিন্ নবুয়্যাত, ১১:৪২১, হাদিস নং : ৩৩২০।
খ) বায়হাকী : সুনানুল কুবরা, ৩:১৯৫।

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে,

حَتَّى ارْتَجَّ الْمَسْجِدُ بِخُوَارِهِ،

–তার কান্নার আওয়াজে মসজিদ প্রকম্পিত হয়ে যায়।

হযরত সুহায়েল (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে,

وَكَثُرَ بُكَاءُ النَّاسِ لَمَّا رَأَوْا بِهِ.

–কাষ্ঠ খণ্ডের বিলাপ দেখে উপস্থিত সকলে বিলাপ করতে শুরু করে।

হযরত মোতালেব বিন আবু দারওয়া (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় এসেছে,

حَتَّى تَصَدَّعَ وَانْشَقَّ حَتَّى جَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَسَكَتَ،

–হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র বিরহ-বিচ্ছেদে কাষ্ঠখণ্ড ফেটে পড়ে। পরে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর পবিত্র হাত বুলিয়ে দিলে সে কান্না বন্ধ করে দেয়।

অপর এক বর্ণনায় বাড়িয়ে বলা হয়েছে যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন বললেন,

إِنَّ هَذَا بَكَى لَمَّا فَقَدَ مِنَ الذِّكْرِ،

–এ কাঠের খুঁটি আল্লাহর যিকর করা থেকে দুরে সরে পড়ার কারণে ক্রন্দন করছে।[১]

অপর বর্ণনায় এসেছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ أَلْتَزِمْهُ لَمْ يَزَلْ هَكَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ تَحَزُّنًا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُفِنَ تَحْتَ الْمِنْبَرِ،

[১]. ক) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি জাবের ইবনে আবদিল্লাহ, ২৮:২৩৯, হাদিস নং : ১৩৬৯০।
খ) ইবনে আবী শায়বা : আল মুসান্নাফ, ৭:৪৩৩।
গ) ইবনে খুযাইম : আস্ সহীহ, বাবু জিমায়ি আবওয়াবিল আযান, ৬:৪২১, হাদিস নং : ১৬৮০।

–ঐ মহান সত্তার কসম! আমি তার গায়ে হাত বুলিয়ে না দিলে আমার বিরহ ব্যথায় সে কিয়ামত অবধি এভাবে কাঁদতে থাকতো। এরপর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নির্দেশে ওই কাষ্ঠখণ্ড মিম্বরের নীচে দাফন করে দেয়া হয়। একথা হযরত মোত্তালেব, হযরত সাহল বিন সা'দ ও হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) প্রমুখ সাহাবীর বর্ণনায় এসেছে।

হযরত ইসহাক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এরূপ এক বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। হযরত সোহেল (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর অপর বর্ণনায় এসেছে,

فَدُفِنَتْ تَحْتَ منبَرِهِ أو جُعِلَتْ فِي السَّقْفِ.

–কাঠেরখণ্ড মিম্বরের নীচে দাফন করা হয়েছে অথবা মসজিদের ছাদে লাগানো হয়েছে।[১]

হযরত উবাই (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনা এসেছে,

فَكَانَ إِذَا صَلَّى النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى إِلَيْهِ فَلَمَّا هُدِمَ الْمَسْجِدُ أَخَذَهُ أُبَيّ فكَانَ عِنْدَهُ إِلَى أَنْ أَكَلَتْهُ الْأَرْضُ وَعَادَ رُفَاتًا.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সে কাষ্ঠখণ্ডের পাশে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন। কিন্তু পরে যখন মসজিদ পুনঃনির্মাণের জন্য ভেঙ্গে ফেলা হয় তখন ঐ কাঠখণ্ড হযরত উবাই (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নিয়ে যান। কাঠখণ্ড যমীন ভক্ষণ না করা বা জরাজীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তার নিকট রক্ষিত থাকে।

ইমাম ইস্পাহানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ إِلَى نَفْسِهِ فَجَاءَهُ يَخْرِقُ الْأَرْض فَالْتَزَمَهُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَعَادَ إِلَى مَكَانِه.

–কাঠখণ্ডের কান্না শোনার পর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে নিজের দিকে আহবান করেন। আর অমনি সে মাটি চিরে দৌড়ে তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হয়। অতঃপর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, এবার ফিরে যাও। তখন সে ফিরে গিয়ে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে যায়।

---

[১]. বায়হাকী : দালায়িলুন্ নবুয়্যাত, বাবু আলা তাজমাউনা মিন হুনাইন, ২:৪৪৮, হাদিস নং : ৮২৭।

হযরত বুরায়দা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় আছে যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খেজুর গাছের কাণ্ডকে বললেন,

إِنْ شِئْتَ أَرُدُّكَ إِلَى الْحَائِطِ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ تَنْبُتُ لَكَ عُرُوقُكَ وَيَكْمُلُ خلقك وَيُجَدَّدُ لَكَ خُوصٌ وَثَمَرَةٌ وَإِنْ شِئْتَ أَغْرِسكَ فِي الْجَنَّةِ فَيَأْكُلُ أَوْلِيَاءُ اللهِ من ثَمَرِكَ، ثُمَّ أَصْغَى لَهُ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُ مَا يَقُولُ فَقَالَ: بَلْ تَغرِسُنِي فِي الْجَنَّةِ فَيَأْكُلُ مِنِّي أَوْلِيَاءُ اللهِ وَأَكُونُ فِي مَكَانٍ لَا أَبْلَى فِيهِ فَسَمِعَهُ من يَلِيهِ فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلْتُ ثُمَّ قَالَ اخْتَارَ دَارَ الْبَقَاءِ عَلَى دَارِ الْفَنَاءِ،

–তুমি বলো, কোনটি চাও? যদি তুমি ইচ্ছে কর তাহলে আমি তোমাকে সেই বাগানে পুনরায় লাগিয়ে দেব, যে বাগানে তুমি ছিলে, তোমার ডাল-পালা সজীব ও সতেজ করে দেয়া হবে এবং তোমাকে পুনরায় ফুলে-ফলে সুশোভিত করে দেয়া হবে। আর যদি তুমি চাও তাহলে তোমাকে জান্নাতের বাগানে লাগিয়ে দেয়া হবে। সেখানে আল্লাহর প্রিয় বান্দারা তোমার ফল ভক্ষণ করবে। একথা বলার পর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার জবাব শুনার জন্য কান লাগান। তারপর বললেন, সে বলছে, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমাকে জান্নাতে লাগিয়ে দেয়া হোক। সেখানে আমার থেকে আল্লাহর প্রিয় বান্দারা তোমার ফল ভক্ষণ করবে। সেখানে আমি কখনো বৃদ্ধ হবোনা। আর আল্লাহর প্রিয় বান্দারা আমার ফল ভক্ষণ করতে পারবে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট উপবিষ্ট লোকেরা তার কথা শুনতে পায়। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বাড়িয়ে বললেন, সে পরকালকে ইহকালের উপর প্রাধান্য দিয়েছে।

হযরত হাসান বসরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এই হাদিস বর্ণনা করার সময় কেঁদে কেঁদে বলতেন,

يَا عِبَادَ اللهِ الْخَشَبَةُ تَحِنُّ إِلَى رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَوْقًا إِلَيْهِ لِمَكَانِهِ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ أَنْ تَشْتَاقُوا إِلَى لِقَائِهِ،

–হে আল্লাহর বান্দারা! এক খণ্ড কাঠ যদি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মুহাব্বতে এরূপ রোদন করতে পারে, তবে তোমরা তো তার চেয়ে বেশী হকদার যে, তোমরা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দীদারের আশায় উন্মুখ হয়ে থাকবে।

এ হাদিস হযরত হাফস বিন ওবাইদুল্লাহ ও হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ওবাইদুল্লাহ বিন হাফস, হযরত আয়মান, হযরত আবু নাথরা, হযরত ইবনে মোসায়্যিব, হযরত সাঈদ বিন আবু কোরব ও হযরত আবু সালেহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) প্রমুখ বর্ণনাকারীগণ বর্ণনা করেছেন।

অপর এক সূত্রে বলা হয়েছে যে, এ হাদিস হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে হযরত হাসান বিন সাবেত, ইসহাক ইবনে আবু তালহা, হযরত নাফি, হযরত ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। অপর এক সূত্রে হযরত আবু হীরা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কথা বলা হয়েছে। হযরত আবু নাথরা, হযরত আবুল ওয়াদাক, হযরত আবু সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর হযরত আম্মার বিন আবু আম্মার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর হযরত আবু হাযেম, হযরত আব্বাস বিন সাহল, হযরত সাহল বিন সা'আদ থেকে কাছির বিন জায়িদ, হযরত আবদুল মোত্তালিব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর হযরত আবদুল্লাহ বিন বুরায়দা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর পিতা বুরায়দা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং হযরত তোফায়েল বিন উবাই (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন।

কাযী আবুল ফযল আয়াষ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু (আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সৌভাগ্যমণ্ডিত করুন) তিনি বলেন, তোমরা দেখতে পাচ্ছো যে, এ হাদিস বিশিষ্ট সাহাবীগণ বর্ণনা করেছেন। আর তাঁদের মধ্যে অন্যান্য বর্ণনাকারী সাহাবীগণের যাদের বর্ণনা করেছেন, আর তাঁদের মধ্যে অন্যান্য বর্ণনাকারী সাহাবীগণের যাদের নাম আমি উল্লেখ করেছি, তারাও বর্ণনা করেছেন। এছাড়া তাদের তুলনায় দ্বিগুণ ত্রিগুণ তাবেয়ী বর্ণনা করেছেন। যারা হাদীসে, অভিজ্ঞ তাদের নিকট এসকল বিবরণ সঠিক ও গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা সঠিক রাস্তায় পরিচালনাকারী।

অষ্টদশ পরিচ্ছেদ

فِي سَائِرِ الْجَمَادَاتِ

হুযুর (ﷺ) এর প্রতি জড় পদার্থের আনুগত্য প্রকাশ করা

হযরত ইবনে মাস'উদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে,

كُنَّا نَأْكُلُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّعَامَ وَنَحْنُ نَسْمَعُ تَسْبِيحَهُ،

–একদা আমরা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সঙ্গে খাবার খাচ্ছিলাম। খাবার থেকে তাসবীহ পাঠের আওয়াজ বের হয়। আমরা তা শুনতে পাই।

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفًّا مِنْ حَصًى فَسَبَّحْنَ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَمِعْتُ التَّسْبِيحَ ثُمَّ صَبَّهُنَّ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَسَبَّحْنَ ثُمَّ فِي أَيْدِينَا فَمَا سَبَّحْنَ،

–একদা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর হাতের মুঠোয় কিছু পাথর দানা নেন। আর সাথে সাথে ঐগুলো তাঁর হাতের ভেতর থেকে তাসবীহ পাঠ আরম্ভ করে। তাসবীহ পাঠের শব্দ আমরা শুনতে পাই। তিনি পাথরগুলো আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাতে তুলে দেন। তখনও তাসবীহ পাঠ করতে থাকে। তারপর যখন আমি সেগুলো হাতে নিলাম, তখন তাসবীহ পাঠ বন্ধ হয়ে যায়।

এধরনের বর্ণনা হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, হযরত উমর ও হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাতে যাওয়ার পরও পাথরগুলো তাসবীহ পাঠ করতে থাকে।

হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

كُنَّا بِمَكَّةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ إِلَى بَعْضِ نَوَاحِيهَا فما استقبله شَجَرَةٌ وَلَا جَبَلٌ إِلَّا قَالَ لَهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ،

–আমরা মক্কাতে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে সফরে বের হলাম। তখন রাস্তার গাছপালা, পাহাড় তাঁকে সালাম করে বলতে থাকে "আস-সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ"।

হযরত জাবির বিন সামুরা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

إِنِّي لَأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ، قِيلَ إِنَّهُ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ،

–আমি নিঃসন্দেহে ঐ পাথরগুলো চিনি যারা নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বে মক্কা মুকাররামায় আমাকে সালাম জানাতো।[১] অপর এক বর্ণনায় আছে, কেউ কেউ বলেন, সে পাথর হাজরে আসওয়াদ।

হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) থেকে বর্ণিত আছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

لَمَّا اسْتَقْبَلَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالرِّسَالَةِ جَعَلْتُ لَا أَمُرُّ بِحَجَرٍ وَلَا شَجَرٍ إِلَّا قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ.

–হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) যখন আমার নিকট রিসালাতের বার্তা নিয়ে আসেন, তখন থেকে আমার অবস্থা এমন হয়েছে যে, আমি গাছপালা বা পাথরের নিকট দিয়ে গমন করলে তারা আমাকে সালাম করে বলতো, "আস-সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ"।[২]

হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُّ بِحَجَرٍ وَلَا شَجَرٍ إِلَّا سَجَدَ لَهُ.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে সমস্ত গাছপালা ও পাথরের নিকট দিয়ে চলতেন সেগুলো হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সিজদা করতো।[৩]

---

[১]. মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ফদ্বলিন নবী,
[২]. ফাকেহী : আখবারে মক্কা, বাবু লাম্মা ইসতাক্বালানি লি জিবরাঈল, ৬:২০৮, হাদিস নং : ২৩৫৬।
[৩]. ফাকেহী : আখবারে মক্কা, বাবু ইযা আরাদা আই ইয়াখরুজা লি হাজাতিহি, ৭:৪৬৩, হাদিস নং : ২৮৪১।

হযরত আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে,

إذا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلى بَنِيهِ بِمُلَاءَةٍ وَدَعَا لهم بالسَّتْرِ مِنَ النَّارِ كَسَتْرِهِ إِيَّاهُمْ بملَاءَتِهِ فأمنت أسكفة الباب وَحوائط الْبَيْتِ آمِينَ آمِينَ.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন হযরত আব্বাস ও তাঁর সন্তানদের চাদরাবৃত করে দো'আ করেন, হে আল্লাহ! এদেরকে দোযখের আগুন থেকে এভাবে হিফাযত করুন, যেমন আমি তাদেরকে আমার চাদর দিয়ে আবৃত করেছি, তখন ঘরের দেয়াল ও খুঁটি আমীন আমীন বলতে শুরু করে।[১]

হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ বাকের (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে,

مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ بِطَبَقٍ فِيهِ رُمَّانٌ وَعِنَبٌ فَأَكَلَ مِنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَّحَ.

–একবার হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অসুস্থ হন। হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) এক পাত্র আঙ্গুর ও আনার নিয়ে আসেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন ফলগুলো মুখে দেন, তখন সেগুলো তাসবীহ পাঠ করতে শুরু করে।

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে,

صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وعثمانُ أُحُدًا فَرَجَفَ بِهِمْ فَقَالَ اثْبُتْ أُحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ،

–একদা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আবুবকর, হযরত উমর, হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) কে সঙ্গে নিয়ে ওহুদ পাহাড়ে উঠেন। তখন উহুদ পাহাড় কাঁপতে শুরু করে। তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে উহুদ পাহাড়! স্থির হও। এ মুহূর্তে তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক, আর দু'জন শহীদ রয়েছেন।

---

[১]. তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ১৪:১৬৪।

এ সংক্রান্ত বর্ণনা হেরা পর্বত সম্পর্কে হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, ঐ ঘটনায় হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম), হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত জোবায়ির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) সঙ্গে ছিলেন। হেরা পর্বত কেঁপে উঠে, তিনি বললেন, তোমার উপর নবী, সিদ্দিক এবং কতিপয় শহীদ রয়েছেন।

হেরা পর্বত সম্পর্কে হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, একদা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দশজন সাহাবীদের সাথে নিয়ে হেরা পর্বতে আরোহণ, সে দশজনের মধ্যে আমিও ছিলাম। তিনি হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ ও হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নাম উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, আমি দু'জনের নাম ভুলে যাই।

হযরত সাঈদ বিন যায়িদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকেও অনুরূপ হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি দশজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেন। কিন্তু দশজনের নামের মধ্যে নিজের নাম বাড়িয়ে উল্লেখ করেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, কুরাইশরা যখন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে হত্যার জন্য খোঁজাখুজিঁ করে, তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাশীর পাহাড়ে অবস্থান করেন। তখন বাশীর পাহাড় হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট আবেদন করে যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি অনুগ্রহ করে আমার উপর থেকে অবতরণ করুন। আমার ভয় হয় যদি শত্রুরা আপনাকে আমার উপর শহীদ করে ফেলে তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমার উপর আযাব নাযিল করবেন। তখন হেরা পর্বত আবেদন করে। ইয়া রাসূলল্লাহ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি আমার উপর তাশরীফ নিয়ে আসুন। আমি আপনাকে আবৃত করে রাখবো। যাতে শত্রুরা আপনাকে দেখতেও না পায়।

হযরত ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বর্ণনা করেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَلَى المِنْبَرِ (وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قدره) ثُمَّ قَالَ يُمَجِّدُ الجَبَّارُ نَفْسَهُ يَقُولُ أَنَا الجَبَّارُ أَنَا الجَبَّارُ أَنَا الْكَبِيرُ المُتَعَالِ فَرَجَفَ المِنْبَرُ حَتَّى قُلْنَا لَيَخِرَّنَّ عَنْهُ،

—একদিন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিম্বরের উপর বসে এ আয়াত পাঠ করেন— وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ — এবং ইহুদীরা আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত মর্যাদা জানেনি যেমন জানা উচিত ছিলো।[১] তারপর বললেন, "জাব্বার ও কাহহার", আল্লাহ তা'আলা আপন শান সম্পর্কে বলেন, আমি পরাক্রমশালী, আমি শ্রেষ্ঠ, অতি উন্নত। তখন মিম্বর এমনভাবে কাঁপতে শুরু করে যে, আমরা আশঙ্খা করি, না জানি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পড়ে যান।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে,

كَانَ حَوْلَ البيت ستون وثلثمائة ضم مُثْبَتَةَ الأَرْجُلِ بِالرَّصَاصِ فِي الحجارة فأما دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَسْجِدَ عَامَ الْفَتْحِ جَعَلَ يُشِيرُ بِقَضِيبٍ فِي يَدِهِ إِلَيْهَا وَلَا يَمَسُّهَا وَيَقُولُ (جَاءَ الْحَقُّ وزهق الباطل) الآيَةَ فَمَا أَشَارَ إِلَى وَجْهِ صَنَمٍ إِلَّا وَقَعَ لِقَفَاهُ ولا لقفاه إلى وَقَعَ لِوَجْهِه حَتَّى مَا بَقِيَ مِنْهَا صَنَمٌ،

—পবিত্র কা'বা গৃহে তিনশ'ষাট প্রতিমা ছিল। সেগুলো শীসা দিয়ে পাথরের উপর বসানো ছিলো। মক্কা বিজয়ের দিন যখন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মসজিদে হারামে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর হাতে লাঠি ছিলো, তিনি সেই লাঠি দিয়ে প্রতিমাগুলির প্রতি ইশারা করে বললেন— جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ অর্থ— সত্য সমাগত আর মিথ্যা তিরোহিত হয়েছে।[২] হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে প্রতিমার প্রতি ইশারা করতেন অমনি তা পেছনের দিকে পড়ে যেতো। আর যেটির পেছনের দিকে ইশারা করতেন সেটি সামনের দিকে পড়ে যেতো। এভাবে প্রতিটি প্রতিমা ভেঙ্গে ফেলেন। একটি প্রতিমাও অবশিষ্ট রাখেননি।

হযরত ইবনে মাস'উদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় একথাগুলো বর্ণিত আছে, কিন্তু তাঁর বর্ণনায় প্রতিমাগুলির প্রতি তীর নিক্ষেপের কথা উল্লেখ

১. আল কুরআন : সূরা আন'আম, ৬:৯২।
২. আল কুরআন : সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:৮১।

করে বলেন যে, সত্য সমাগত হয়েছে এখন মিথ্যা পরাভূত হবে। তা দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হবেনা। এ বিষয় সংসারত্যাগী খৃষ্টান পাদ্রীর সাথে সংগটিত ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে। এই ঘটনা তাঁর বাল্যকালে সংঘটিত হয়েছে। তিনি যখন চাচার বানিজ্য কাফেলার সাথে গমন করেন, তখন রাস্তায় ঐ পাদ্রীর সাথে সাক্ষাত হয়েছে। সে নির্জনে একাকী জীবনযাপন করতো। কারও সাথে দেখা সাক্ষাত করতোনা। কিন্তু হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে দেখে সে গীর্জা থেকে বের হয়ে এসে তাঁর হাত চুম্বন করে বললো, এই বালক বিশ্বজাহানের সরদার হবেন। তাঁকে বিশ্বের শান্তির দূত হিসেবে নবুওয়াত প্রদান করা হবে। প্রবীণ কুরাইশগণ বলল, একথা আপনি কী করে জানেন? সে বলল,

إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا خَرَّ سَاجِدًا لَهُ وَلَا يَسْجُدُ إِلَّا لِنَبِيٍّ ... ثُمَّ قَالَ وَأَقْبَلَ صَلَّى اقله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعليه غَمَامَةٌ تُظِلُّهُ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْقَوْمِ وَجَدَهُمْ سَبَقُوهُ إِلَى فِيءِ الشَّجَرَةِ فَلَمَّا جَلَسَ مال الفيء إِلَيْهِ.

—এমন কোন গাছপালা ও পাথর অবশিষ্ট দেখেনি যা তাঁর সামনে সিজদাবনত হয়নি। গাছপালা ও পাথর নবী ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করেনা। সে ঐ সমস্ত ঘটনা উল্লেখ করে বলে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন এখানে আগমন করেন, তখন আমি মেঘমালাকে তাঁর মাথায় উপর ছায়া দান করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি যখন তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট আসেন, তখন গাছ তার ছায়া তাঁর প্রতি বাড়িয়ে দেয়। আর তিনি যখন বসে পড়েন, তখন ছায়া তাঁর প্রতি ঝুঁকে পড়েছে।[১]

১. যখন তাঁর বয়স নয় বছর তখন ঐ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তখন আবু তালিব বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া যাত্রা করেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন একাকীত্ব ও নিঃস্বতার কারণে তার সাথে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাই আবু তালিব তাকে সাথে নিয়ে যায়।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

فِي الْآيَاتِ فِي ضُرُوْبِ الْحَيْوَانَاتِ

হুযুর (ﷺ) এর বিভিন্ন প্রাণীর সাথে সম্পৃক্ত মু'জিযাসমূহ

হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বর্ণনা করেন,

كَانَ عِنْدَنَا دَاجِنٌ فَإِذَا كَانَ عِنْدَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَّ وَثَبَتَ مَكَانَهُ فلم يجئ وَلَمْ يَذْهَبْ وَإِذَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ وَذَهَبَ،

—আমার এক বকরী ছিল। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যতক্ষণ আমার নিকটে তাশরীফ রাখতেন, বকরীটি ততক্ষণ নীরব থাকতো, লাফালাফি করতোনা। আর যখন বাইরে চলে যেতেন তখন সে পেরেশান হয়ে এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি শুরু করতো।

হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي مَحْفَلٍ من أَصْحَابِهِ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ قَدْ صَادَ ضَبًّا فَقَالَ من هَذَا قَالُوا نَبِيُّ اللهِ فَقَالَ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى لَا آمَنْتُ بِكَ أَوْ يُؤْمِن بِكَ هَذَا الضَّبُّ وَطَرَحَهُ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ياضب، فَأَجَابَهُ بِلِسَانٍ مُبِين يَسْمَعُهُ الْقَوْمُ جَمِيعًا لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا زَيْنَ من وَافَى الْقِيَامَةَ، قَالَ من تَعْبُدُ؟ قَالَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ وَفِي الْأَرْضِ سُلْطَانُهُ وَفِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ وَفِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ وَفِي النَّارِ عِقَابُه: قَالَ فَمَنْ أَنَا؟ قَالَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ وَقَدْ أَفْلَحَ من صَدَّقَكَ وَخَابَ من كَذَّبَكَ. فَأَسْلَمَ الْأَعْرَابِيُّ،

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদিন সাহাবায়ে কেরামের মজলিসে বসা ছিলেন। হঠাৎ এক বেদুঈন এক গুইসাপ শিকার করে নিয়ে এসে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সাহাবাগণ বললেন, তিনি আল্লাহর রাসূল! তখন বেদুঈন বলল, লাত-মানাত-উযযার কসম! এ গুইসাপ আপনার নবুওয়াতের সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যন্ত আমি ঈমান আনবোনা। একথা বলে সে গুইসাপ হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনে ছেড়ে দেয়। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে গুইসাপ! গুইসাপ অতি নরম স্বরে বলল, আমি আপনার খেদমতে হাযির। একথা উপস্থিত সবাই শুনে। ওহে কিয়ামতের প্রতি ধাবমান মানুষের মাথার মুকুট। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবার গুইসাপকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কার ইবাদত কর? গুইসাপ বলল, আমি ঐ আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করি যার আসন আকাশে এবং যার রাজত্ব যমীনে, আর যার প্রভাব-প্রতিপত্তি সমুদ্রে। জান্নাতে যার রহমত ও জাহান্নামে রয়েছে যার আযাব।[১]

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করেন, আমি কে? গুইসাপ জবাব দেয়, আপনি আল্লাহ রাসূল এবং শেষ নবী। নিঃসন্দেহে সেই ব্যক্তি কৃতকার্য, যে আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। আর সেই ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে যে আপনাকে অবিশ্বাস করবে। একথা শুনে বেদুঈন ইসলাম গ্রহণ করে।

এ বিষয়ে নেকড়ে বাঘের সেই প্রসিদ্ধ হাদিস যা হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। একদা এক নেকড়ে বাঘ এক বকরীর উপর চড়াও হয়ে বকরী ধরে বনের ভেতর নিয়ে যায়। কিন্তু রাখালেরা বকরীকে বাঘের থাবা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। শিকার হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার পর বাঘ একটু সরে গিয়ে তার লেজের উপর বসে রাখালদের বললো, তোমাদের কী আল্লাহ তা'আলার ভয় নেই? তোমরা আমার অধিকার ছিনিয়ে নিলে যা আল্লাহ তা'আলা আমাকে দিয়েছেন। একথা শুনে রাখালরা বললো, কী আশ্চর্যের বিষয়, নেকড়ে বাঘ মানুষের মতো কথা বলছে? একথা শুনে নেকড়ে বাঘ বললো,

أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَعَجَبَ من ذَلِكَ؟ رَسُولُ اللهِ بَيْنَ الحَرَّتَيْنِ يُحَدِّثُ النَّاسَ بِأَنْبَاء مَا قَدْ سَبَقَ،

১. বায়হাকী : দালায়িলুন্ নবুয়্যাত, বাবু মা জা'আ ফী শাহাদাতিদ্ দ্বব, ৬:১৬৮, হাদিস নং : ২২৮৫।

–আমার কথা বলার চেয়ে বিস্ময়কর কথা কি আমি তোমাদেরকে বলবোনা? তাহলো যে, আল্লাহ তা'আলার একজন সম্মানিত রাসূল দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে আবির্ভূত হয়েছেন এবং তিনি মানুষদের অতীতের (ঘটনা ও ইতিহাসের) সংবাদ দিচ্ছেন।[১]

নেকড়ে বাঘের মুখে একথা শুনার পর রাখালরা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে হাযির হয়ে সমস্ত ঘটনা বলে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সকল লোকদের সমবেত করার ঘোষণা দেন। সকল লোক একত্রিত হলে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এদেরকে সে ঘটনা বর্ণনা করো। এরপর বললেন, সে সত্য কথা বলছে।

নেকড়ে বাঘ সম্পর্কিত এ হাদিস হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাদিস একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাতে উল্লেখ আছে, নেকড়ে বাঘ রাখালদের বললো,

أَنْتَ أَعْجَبُ وَاقِفًا عَلَى غَنَمِكَ وَتَرَكْتَ نَبِيًّا لَمْ يَبْعَثِ اللهُ نَبِيًّا قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهُ عِنْدَهُ قَدْرًا قَدْ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ وَأَشْرَفَ أَهْلُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ يَنْظُرُونَ قِتَالَهُمْ وَمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ إِلَّا هذا الشَّعْبُ فَتَصِيرُ فِي جُنُودِ اللهِ،

–আমার অবস্থার চেয়ে তোমাদের অবস্থা আরও বিস্ময়কর। তোমরা আপন বকরীর পাল নিয়ে মত্ত হয়ে আছো। অথচ তোমরা এমন নবী ছেড়ে দিয়েছ, যাঁর চেয়ে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী অন্য কোন নবী মহান আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে প্রেরণ করেননি। তাঁর জন্য জান্নাতের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। আর জান্নাতের হুর ও ফিরিশতাগণ তাঁর অনুসারীদের আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করতে দেখছে। তোমাদের এবং তাঁর মধ্যে শুধু পাহাড়ের টিলার ব্যবধান। তোমরা নবীর খেদমতে হাযির হও এবং নিজেদের আল্লাহর বাহিনীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নাও।

একথা শুনে রাখালরা বলল, তাহলে আমাদের বকরীর পালগুলোকে পাহারা দেবে কে? নেকড়ে বাঘ বললো, তোমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমিই বকরীগুলোকে

১. ক) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আবী সাঈদ, ২৩:৪৫৮, হাদিস নং : ১১৪১৩।
খ) বায়হাকী : দালায়িলুন নবুয়্যাত, বাবু মা ফী কালামিয্ যি'বি, ৬:১৭৪, হাদিস নং :
গ) ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, বাবু যিকরি শাহাদাতিয্ যি'বি, ২৭:২০, হাদিস নং : ৬৬০২।

পাহারা দেবো। তখন রাখালরা বকরীর পাল নেকড়ে বাঘের দায়িত্বে রেখে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তারা মহান দরবারে সমস্ত ঘটনা বলে ইসলাম গ্রহণ করে। তারা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে যুদ্ধরত অবস্থায় পেয়েছে। অতঃপর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাখালদের বললেন,

عُدْ إِلَى غَنَمِكَ تَجِدْهَا بِوَفْرِهَا فَوَجَدَهَا كَذَٰلِكَ وَذَبَحَ لِلذِّئْبِ شَاةً مِنْهَا،

–তোমরা চলে যেতে চাও? তোমাদের বকরীগুলো পুরোপুরি পাবে। রাখালরা ফিরে এসে পুরো বকরী পায়। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা বলেছেন, বাস্তবে তাই হয়েছে। পরে তারা নেকড়ে বাঘকে একটি বকরী খেতে দেয়।

হযরত আহবান বিন আউস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে এ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, এঘটনা তাঁর সাথে সংগটিত হয়েছে। তিনি এ ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, নেকড়ে বাঘের সাথে তার কথোপকথন হয়েছে। হযরত সালমাহ বিন আমর বিন আকওয়াহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, এ ঘটনা তাঁর সাথে সংগটিত হয়েছে। আর এ ঘটনায় প্রভাবিত হয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত ইবনে ওহাব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এ ধরণের ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, এটা হযরত আবু সুফিয়ান বিন হারব ও মারওয়ান বিন উমাইয়ার সাথে সংগটিত হয়েছে। একদিন এক নেকড়ে বাঘ এক হরিণকে আক্রমণ করে। হরিণ হেরেমের সীমার ভেতর চলে এলে নেকড়ে বাঘ ফিরে চলে যায়। এ অবস্থা দেখে তারা উভয় বিস্মিত হয়।

এ অবস্থা দেখে নেকড়ে বাঘ বলল, এর চেয়ে অধিকতর বিস্ময়ের ব্যাপার হল যে, হযরত মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনা মুনাওয়ারায় বসে বসে তোমাদের জান্নাতের দিকে আহবান করেছেন। আর তোমরা মানুষদের জাহান্নামের দিকে ডাকছো। একথা শুনে আবু সুফিয়ান বলল, লাত-মানত-উযযার কসম! যদি এ ঘটনা মক্কাবাসীদের নিকট বলা হয় তাহলে অবশ্যই তারা মক্কার বাড়ীঘর ত্যাগ করে মদীনায় হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে চলে আসবে। আবু জাহেল ও তার সাথীদের সম্পর্কেও এ ধরণের ঘটনা বর্ণিত আছে।

হযরত আব্বাস বিন মিরদাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সম্পর্কে এ ধরণের এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে। তিনি যখন যিমার দেবতাকে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) এর প্রশংসামূলক কবিতা পাঠ করতে দেখে বিস্মিত হয়, ঘটনাচক্রে তখন সে দেখে এক বাঘ সেখানে এসে বলল,

يَا عَبَّاسُ أَتَعْجَبُ من كَلَامَ ضِمَارِ وَلَا تَعْجَبُ من نَفْسِكَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو إِلَى الْإِسْلَام وَأَنْتَ جَالِس،

–হে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আপনি যিমারের কথা বলায় বিস্মিত হয়েছেন। অথচ আপনি নিজের ব্যাপারে বিস্মিত হচ্ছেন না যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনাদের ইসলামের প্রতি আহবান জানাচ্ছেন আর আপনারা হাতের উপর হাত রেখে পিছনে বসে আছেন।

এ ঘটনা হযরত আব্বাস বিন মিরদাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়।

হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এক ব্যক্তিকে বর্ণনা করে বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন খায়বারের যুদ্ধে অবস্থান করেন তখন এক ব্যক্তি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। সে খায়বারবাসীদের বকরী চরাতো। ইসলাম গ্রহণ করার পর সে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে আরয করে, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি যে বকরীর পাল চরাতাম সেগুলোর কী হবে? হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন,

أَحْصِبْ وُجُوهَهَا فَإِنَّ اللهَ سَيُؤَدِّي عَنْكَ أَمَانَتَكَ وَيَرُدُّهَا إِلَى أَهْلِهَا،

–তুমি বকরীর পালে ধুলি নিক্ষেপ করো। আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তোমাকে দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে দেবেন আর বকরীর পাল মালিকের নিকট পৌঁছে দেবেন। লোকটি তাই করে। বকরীর পাল মালিকের ঘরে পৌঁছে যায়।

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

دَخَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِط أَنْصَارِي وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَفِي الْحَائِطِ غَنَمٌ فَسَجَدَتْ لَهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ نَحْنُ أَحَقُّ بِالسُّجُودِ لَكَ مِنْهَا.

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) এবং জনৈক আনসারীকে সঙ্গে নিয়ে জনৈক আনসারীর বাগানে প্রবেশ করেন। বাগানে কয়েকটি বকরী ছিলো। বকরীগুলো হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সিজদা করে। তখন হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমরা তো বকরী থেকে সিজদা করার বেশী অধিকারী।

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِطًا فَجَاءَ بَعِيرٌ فَسَجَدَ لَهُ،

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক বাগানে প্রবেশ করেন। তখন একটি উট এসে তাঁকে সিজদা করে।[১]

অনুরূপ এক বর্ণনা এক উট সম্পর্কে হযরত সা'লাবা বিন মালেক, হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ, হযরত ইয়া'লা বিন মুররাহ ও হযরত আবদুল্লাহ বিন জাফর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) থেকে বর্ণিত হয়েছে। কোন ব্যক্তিই বাগানে প্রবেশ করতে পারত না যার উপর উটটি হামলা না করে। কিন্তু হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাগানে প্রবেশ করে উটকে ডাকলে উট এসে মাথা নত করে তাঁর সামনে বসে পড়ে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার নাকের রশি খুলে দিয়ে বললেন,

مَا بَيْنَ السَّمَاءِ والأرض شيء إِلَّا يَعْلَمُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا عَاصِيَ الجن والإنس،

–আসমান-যমীনের মধ্যে অবাধ্য জ্বীন ও মানুষ ব্যতীত অন্য কারো এটা অজানা নয় যে, আমি আল্লাহর রাসূল।[২]

এরূপ এক হাদিস হযরত আবদুল্লাহ বিন আবু আওফা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে।

---

[১]. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু হাদিসী সায়্যিদাতি আয়শা, ৪৯:৪৮৭, হাদিস নং : ২৩৩৩১।

[২]. ক) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি জাবির ইবনে আবদিল্লাহ, ২৮:৩৬৩, হাদিস নং : ১৩৮১৪।
খ) ইবনে আবী শায়বা : আল মুসান্নাফ, ৭:৪২৮।
গ) দারেমী : আস্ সুনান, বাবু মা আকরামাল্লাহ বিহি, ১:২১, হাদিস নং : ১৮।

উট সম্পর্কে অনুরূপ এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লোকদের উটটির অবস্থা জিজ্ঞেস করেন, লোকেরা বলল, আমরা উটকে ধরতে চেয়েছি।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُمْ عَنْ شَأْنِهِ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ أَرَادُوا ذَبْحَهُ،

–হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অবস্থা জিজ্ঞেস করলে, উটটি তাঁকে বললো যে, তারা তাকে জবেহ করার ইচ্ছে করেছে।

অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ إنه شكى كَثْرَةَ الْعَمَلِ وَقِلَّةَ الْعَلَفِ من صِغَرِهِ فَقَالُوا نَعَمْ،

–তিনি মালিককে বলেন, তারা অভিযোগ করছে যে, তুমি তাকে বাল্যকাল থেকে বেশি কাজ করাও আর খাবার দাও কম। সে এ কথা স্বীকার করে বলল, হ্যাঁ, সে সত্যই বলেছে।

আদ্বাবা উটনীর ঘটনায় বর্ণিত আছে। সে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে কথা বলে তার সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে। বনের ঘাসপাতা তার প্রতি এগিয়ে আসত। হিংস্র প্রাণীরা তার নিকট থেকে দূরে অবস্থান করত, আর চিৎকার করে বলত, তুমি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্য নির্ধারিত। আর সে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ইহজগত ত্যাগের পর শোকাবিভূত হয়ে পানাহার ত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করে।[১] একথা ইস্পারাইনীও বর্ণনা করেন।

---

[১]. আদ্বাবা উটনীর পুরো ঘটনা হলো যে, একদিন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘর থেকে বের হয়ে দেখতে পান যে, তাঁর আঙ্গিনায় একটি উষ্ট্রী বসে আছে। উষ্ট্রী হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সালাম জানিয়ে প্রশংসা করে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার সালামের জবাব দেন। উটনী বললো, আমার মালিক জনৈক কুরাইশ। তার নাম আগছাব। আমি তার অত্যাচারের অতিষ্ট হয়ে জঙ্গলের উদ্দেশ্যে পলায়ন করি। রাতে হিংস্রপ্রাণী এসে একে অপরকে বললো, এটাকে আক্রমণ করোনা। এটা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাওয়ারী। দিনে ঐ অবস্থা হয়েছে যে, প্রতিটি গাছ আমাকে ডেকে ডেকে বললো, তুমি আমার ডাল পাতা ভক্ষণ করো। কেননা, তুমি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাহন। একথা শুনে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বাহন বানিয়ে নেন এবং ইহজগত ত্যাগ করা পর্যন্ত উটনী হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাহন ছিলো।

হযরত ইবনে ওহাব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের দিন যে সমস্ত কবুতর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মাথার উপর ছায়া দান করে, তিনি তাদের জন্য বরকতের দোয়া করেন।

হযরত আনাস, হযরত জায়িদ বিন আরকাম ও হযরত মুগীরা বিন শো'বা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

أَمَرَ اللهُ لَيْلَةَ الغَارِ شَجَرَةً فنبتت تُجَاه النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَتَرَتْهُ وَأَمَرَ حَمَامَتَيْنِ فَوَقَفَتَا بِفَمِ الْغَارِ،

–হিজরতের রাতে গুহায় অবস্থানের সময় আল্লাহ তা'আলা একটি গাছকে সামনে অগ্রসর হয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আচ্ছাদিত করে ফেলার নির্দেশ দেন। দু'টি কবুতরের বাসা বেঁধে বসে পড়ার ও মাকড়শাকে জাল বুনার নির্দেশ দেন। তখন তারা গুহার মুখে অবস্থান করেন।[১]

অনুসন্ধানকারী কুরাইশদল গুহার মুখে এসে ঐ অবস্থা দেখে বলল, যদি এ গুহায় কোন মানুষ প্রবেশ করতো, তাহলে গুহার মুখের ভিতর কবুতর বসে থাকতে পারতোনা। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গুহার ভেতর থেকে তাদের কথা শুনেন। অতঃপর তারা ব্যর্থ হয়ে সেখান থেকে ফিরে যায়।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ফারাত (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। ঈদুল আযহার দিন পাঁচ, ছয়, আট উট হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে কুরবানীর জন্য পেশ করা হয়। তখন অবস্থা এরূপ হতো যে, উটগুলো একে অপরকে সরিয়ে দিয়ে প্রথম হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র হাতে জবেহ হওয়ার জন্য সামনে এগিয়ে আসে।

হযরত উম্মে সালমা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَحْرَاءَ فَنَادَتْهُ ظَبْيَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ مَا حَاجَتُك قَالَتْ صَادَنِي هَذَا الْأَعْرَابِيُّ وَلِي خِشْفَانِ فِي ذَلِكَ الجبل فَأَطْلِقْنِي

[১]. ক) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ১৫:৩৭৯।
খ) বায়হাকী : দালায়িলুন্ নবুয়্যাত, বাবু আন্নান নবীয়্যা লাইলাতিল গার, ২:৩৪৩, হাদিস নং : ৭৩৫।

حَتَّى أَذْهَبَ فَأرْضِعَهُمَا وَأَرْجِعَ قَالَ: أوَ تَفْعَلِينَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ فَأَطْلَقَهَا فَذَهَبَتْ وَرَجَعتْ فَأَوْثَقَهَا فَانْتَبَه الْأَعْرَابِيُّ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَكَ حَاجَةٌ؟ قَالَ تُطْلِقُ هَذِهِ الظَّبْية، فَأطْلَقَهَا فَخَرَجَتْ تَعْدُو فِي الصَّحْرَاءِ وَتَقُولُ أَشْهَدُ انْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ،

–একদা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মরুভূমি অতিক্রম করেন। অকস্মাৎ এক হরিণী তাকে ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! বলে ডাক দেয়। তিনি আওয়াজ শুনতে পান। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমার কী প্রয়োজন? হরিণী বলল, আমাকে এই লোক শিকার করে বেঁধে রেখেছে, ঐ পাহাড়ে আমার দু'টি বাচ্চা রয়েছে। আপনি আমাকে ছেড়ে দিলে আমি তাদেরকে দুধ পান করিয়ে পুনরায় ফিরে আসবো।

তিনি বললেন, আসলে তুমি কি আবার ফিরে আসবে? হরিণী বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই আমি ফিরে আসবো। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে মুক্ত করে দেন। সে চলে যায়। তাৎক্ষনিকভাবে আবার ফিরে আসে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে পূর্বের মত বেঁধে রাখেন। এমতাবস্থায় শিকারী ঘুম থেকে জেগে উঠে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনার কী কোন প্রয়োজন আছে? হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি চাই তুমি এ হরিণীকে ছেড়ে দেবে। শিকারী হরিণী ছেড়ে দিলে সে মনের আনন্দে নৃত্য সহকারে দৌড়ে পাহাড়ের দিকে চলে যায়। যাওয়ার সময় হরিণী সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর আপনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

এ বিষয়ে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আযাদকৃত ক্রীতদাস হযরত সফিনা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সিংহের সামনে আটক হওয়ার বর্ণনা খুবই প্রসিদ্ধ। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন তাঁকে হযরত মায়াজ বিন শারজিলেনের নিকট পত্রসহ ইয়ামানে পাঠান। রাস্তায় তিনি এক সিংহের কবলে পড়ে বললেন, আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এক নগণ্য গোলাম। আমার সাথে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রেরিত পত্র রয়েছে। একথা শুনার পর সিংহ কিছুক্ষণ ভনভন শব্দ করে রাস্তা থেকে সরে দাঁড়ায়। তিনি ইয়ামান থেকে ফেরত এসে ঐ ঘটনা বর্ণনা করেন।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তাঁর জাহাজ ঝড়ের কবলে পতিত হয়ে ডুবে গেলে তিনি এক দ্বীপে পৌছেন। দ্বীপে উঠার পর এক সিংহের কবলে পতিত হয়। তিনি বলেন, আমি সিংহকে লক্ষ্য করে বললাম, আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এক নগণ্য গোলাম মাত্র। তখন সে আমাকে রাস্তায় পৌছে দেয়।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার আবদে কায়েস গোত্রের এক বকরীর কান ধরে চাপ দিয়ে তাকে ছেড়ে দেয়। তখন থেকে তার কানে এক নিশানা পড়ে যায়। সেই নিশানা অদ্যাবধি সে বকরীর বংশদেরদের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে।

হযরত ইবরাহীম বিন হাম্মাদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে এক সূত্রে বর্ণিত আছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খাইবার বিজয়ের দিনে এক গাধার সাথে কথা বলেন, তিনি গাধাকে জিজ্ঞেস করেন। তোমার নাম কি? গাধা বলল, আমার নাম "ইয়াজিদ বিন শিহাব"। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এখন থেকে তোমার নাম হবে "ইয়াগফুর"। তারপর থেকে তার অবস্থা এরূপ হয়েছে যে, সে সর্বদা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে হাযির থাকতো। তিনি যখন কাউকে ডেকে আনার জন্য পাঠাতেন সে তখন সে ঐ লোকের বাড়ির দরজায় উপস্থিত হয়ে দরজায় মাথা ঢুকতে শুরু করতো। বাড়ীর মালিক এলে সে ইশারায় বুঝিয়ে দিত হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে খোঁজ করেছেন। এভাবে সে উক্ত ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে আসত। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইহজগত ত্যাগের পরে ওই গাধা তাঁর বিরহ বেদনা সহ্য করতে না পেরে কুপে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে।

এ বিষয়ে সে উটের বর্ণনা উল্লেখযোগ্য, যে উট হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট সাক্ষ্য দিয়ে ছিলো যে, এ মালিক আমাকে লালন-পালন করেনি, বরং সে আমাকে তার মালিকানায় রেখে দিয়েছে।[১]

এ বিষয় এক বকরীর ঘটনায় বর্ণিত আছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক সৈন্য বাহিনীর সাথে ছিলেন। সেনাদল ছিলো তৃষ্ণার্ত। তারা এমন স্থানে

---

[১]. হযরত যায়িদ বিন সাবিত (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, কোন এক যুদ্ধে আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সঙ্গে ছিলাম। আমি দেখতে পাই জনৈক বেদুইন এক উটের রশি ধরে আছে। আর উট হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সালাম করে। তিনি তার সালামের জবাব দেন। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি এসে বললো, এ ব্যক্তি আমার উট চুরি করে নিয়ে এসেছে। একথা শুনার পর উট চিৎকার করে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট প্রতিবাদ করে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার প্রতিবাদ শুনে দাবীদারকে বললেন, এ উট সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তুমি মিথ্যাবাদী। (নাসীমুর রিয়াজ: ৩:৮৭।)

অবস্থান করেন যেখানে পানির কোন ব্যবস্থা ছিলনা। সৈন্য বাহিনীকে সে দুধ পান করায়। তারা তৃপ্তি সহকারে দুধ পান করে।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত রাফি (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বললেন,

أَمْلِكْهَا وَمَا أَرَاكَ فَرَبَطَهَا فَوَجَدَهَا قَد انطَلَقَتْ،

–তুমি এর মালিক হয়ে যাও। কিন্তু আমি তোমাকে এর মালিক দেখতে চাইনা। তিনি বকরী বেঁধে ফেলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখতে পান যে, বকরী বাঁধন ছিড়ে চলে গেছে।

একথা শুনে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

إِنَّ الَّذِي جَاءَ بِهَا هُوَ الَّذِي ذَهَبَ بِهَا،

–যিনি তাকে এনে দিয়েছেন। তিনি তাকে নিয়ে গেছেন।[১]

এ বর্ণনা হযরত ইবনে কানে'(রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ বর্ণনা করেছেন।

এক সফরে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামাযে দাঁড়িয়ে এক ঘোড়াকে বললেন,

لَا تَبْرَحْ بَارَكَ اللّٰهُ فِيكَ حَتَّى نَفْرُغَ من صَلَاتِنَا،

–আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বরকত দান করবেন, আমার নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে। তিনি ঘোড়া সামনে রেখে নামায আদায় করেন। তার নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঘোড়া সে স্থানে দাঁড়িয়ে থাকে।

আল্লামা ওয়াকেদী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এরূপ কতিপয় বর্ণনা উল্লেখ করেছেন যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পত্রবাহক দূতগণকে বিভিন্ন রাজা বাদশাহদের নিকট পাঠান। এভাবে একদিনে ছয়জন পত্র বাহক বিভিন্ন দেশে যাত্রা করে। তাদের অবস্থা এরূপ হয়েছে যে, দূতকে যে দেশে পাঠান, সে দূত সেই দেশের ভাষায় রাজা-বাদশাহদের সঙ্গে কথোপকথন করেন। এ বিষয়ে বহু হাদিস বর্ণিত আছে। কিন্তু আমি শুধু ঐ সমস্ত হাদিস বর্ণনা করছি, যে হাদিসগুলি প্রসিদ্ধ ও হাদিসবেত্তাগণ তাঁদের গ্রন্থসমূহে উল্লেখ করেছেন।

---

[১]. আবু নঈম ইস্পাহানী : মা'রিফাতুস্ সাহাবা, বাবু নাফে' ইবনে হারেস, ১৮:৩৯৯, হাদিস নং : ৫৮১৪।

বিংশ পরিচ্ছেদ

فِي إحياء الموتى وكلامهم وكلام الصبيان والمراضع وشهادتهم لهٗ بالنبوة ﷺ

হুযুর (ﷺ) কর্তৃক মৃতকে জীবিত করা, দুগ্ধপোষ্য শিশুদের তাঁর নবুয়তের সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

أَنَّ يَهُودِيَّةً أَهْدَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ شَاةً مَصْلِيَّةً سَمَّتْهَا فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا وَأَكَلَ الْقَوْمُ فَقَالَ ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ فَإِنَّهَا أَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ وَقَالَ للهيودية مَا حَمَلَكِ عَلَى مَا صَنَعْتِ؟ قَالَتْ: إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لم يضرك الَّذِي صَنَعْتُ وَإِنْ كُنْتَ مَلِكًا أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْكَ قَالَ فَأَمَرَ بِهَا فَقُتِلَتْ.

–খাইবার যুদ্ধে এক ইহুদী মহিলা হুযুর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর খেদমতে ভাজা বকরীর মাংস হাদিয়া পেশ করে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই বকরীর গোশত খান এবং তাঁর সঙ্গীগণও খায়। কিন্তু যখন তিনি গোশতের টুকরো হাতে তুলে নেন, তখন গোশতের টুকরো তাঁকে বলল, আমার মধ্যে বিষ মিশানো আছে। এরপরই হযরত বিশর বিন বারা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ওফাত হয়ে যায়। তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সে ইহুদী মহিলাকে জিজ্ঞেস করেন, এ কাজে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে কে? ইহুদী মহিলা বলল, আমি জানি আপনি যদি নবী হন তাহলে এটা আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা। আর যদি আপনি সত্য নবী না হয়ে বাদশাহ হন তাহলে আপনার হাত থেকে পরিত্রাণ পাব। হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হুকুমে সে মহিলাকে হত্যা করা হয়।[১]

[১]. ক) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু ফী মান সাকা রজুলান, ১২:৯৯, হাদিস নং : ৩৯১২।
খ) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ২:১৯।
গ) দারেমী : আস্ সুনান, বাবু মা আকরামাল্লাহু বিহি নবী, ১:৭৮, হাদিস নং : ৬৮।

এ হাদিস হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় এসেছে, সে মহিলা বললো, আমি আপনাকে হত্যা করার জন্য এরূপ করেছি। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطك عَلَى ذَلِكَ، فقالوا: تقتلها قَالَ (لَا).

–আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তা করার সুযোগ দেবেন না। লোকেরা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট তাকে হত্যা করার অনুমতি প্রার্থনা করেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, না। এরূপ বর্ণনা হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে হযরত ইবনে ওহাব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ব্যতীত অন্যান্য বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই মহিলাকে শাস্তি দেননি।

হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন,

أَخْبَرَتْنِي بِهِ هَذِهِ الذِّرَاعُ قَالَ وَلَمْ يُعَاقِبْهَا،

–বিষ মিশ্রিত গোশতের টুকরো আমাকে বলল যে, সে বিষ মিশ্রিত। হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওই মহিলাকে কোন শাস্তি দেননি।

হযরত হাসান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

أَنَّ فَخِذَهَا تُكَلِّمُنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ،

–সে বকরীর রান আমাকে বলল যে, সে বিষ মিশ্রিত।

হযরত আবু সালমা বিন আবদুর রহমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। সে বলল, إِنِّي مَسْمُومَةٌ 'আমি বিষ মিশ্রিত'। হযরত ইবনে ইসহাক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি আরও বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে ক্ষমা করে দেন।

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর থেকে অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন, আমি সর্বদা আমার কণ্ঠনালীতে সে বিষের প্রতিক্রিয়া ক্রিয়া অনুভব করি।

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় বর্ণিত আছে। ইহজগত ত্যাগের সময় হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

مَا زَالَتْ أكلة خيبر تعادني فالآن أوانُ قَطَعَتْ أَبْهَرِي،

–খায়বারের বিষ মিশ্রিত সেই গোশতের টুকরা বার বার আমাকে প্রতিক্রিয়া করেছে। যেহেতু এখন আমার দুনিয়ার হায়াত শেষ হওয়ার সময় এসে গেছে।

হযরত ইবনে ইসহাক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, বিশ্ব মুসলিম সবাই জানে যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নবুওয়্যাতের মহা মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।

হযরত ইবনে ইসহাক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, হাদিসবিদগণ সকলে ঐক্যমতে উপনীত হয়েছেন যে, বিষ মিশ্রণকারী মহিলাকে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হত্যা করেছেন। কিন্তু বর্ণনাকারীদের যে মতবিরোধ হযরত আবু হোরায়রা, হযরত আনাস, হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) এর বর্ণনায় এসেছে। তা আমি উল্লেখ করেছি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় বর্ণিত আছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই ঘাতক মহিলাকে হযরত বিশর বিন বারা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সন্তানদের হাতে সমর্পণ করেন, তারা তাকে হত্যা করে ফেলে।

যাদুকরী ব্যক্তির হত্যা সম্পর্কে অনুরূপ মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। আল্লামা ওয়াকেদি (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, তাকে ক্ষমা করার বিষয়টি আমাদের মতে অধিক স্পষ্ট। তিনি আরো বলেন যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে হত্যা করে ফেলেন।

এ হাদিস বায্যার হযরত আবু সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাদের বর্ণনায় একথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু তাদের বর্ণনার শেষভাগে এ কথা উল্লেখ রয়েছে যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাত বাড়িয়ে বললেন, كُلُوا بِسْمِ اللهِ আল্লাহর নাম নিয়ে খাওয়া আরম্ভ করো। তখন আমরা আল্লাহর নাম নিয়ে খাওয়া শুরু করি। আল্লাহ তা'আলার নামের বরকতে সে খাবার আমাদের কোন ক্ষতি করেনি।

কাযী আবুল ফযল আয়ায (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, গোশতের বিষ মিশ্রিত হাদিস সহীহ হাদিস বর্ণনাকারীগণ বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া এটা প্রসিদ্ধ

হাদিস তাই অন্যান্য হাদিসবিদগণও বর্ণনা করেছেন। তবে এ বিষয়ে কোন আলেমগণ দ্বিমত পোষণ করেছেন।

আবার কারো কারো অভিমত হলো যে,কথা বলার শক্তি আল্লাহ তা'আলা সে মৃত বকরীর গোশত, পাথর বা গাছপালার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। আর আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে আকৃতি প্রকৃতি পরিবর্তন না করেও তা থেকে আওয়াজ বের করতে পারেন। শায়খ আবুল হাসান ও কাজী আবু বকরের অভিমতও এরূপ।

আবার কেউ কেউ মনে করেন, প্রথমে ঐ সমস্ত বস্তুর মধ্যে হায়াত সৃষ্টি হয়। তারপর এদের মধ্যে বাকশক্তি প্রদান করা হয়। অনুরূপ এক বর্ণনা শায়েখ আবুল হাসান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে। এ বর্ণনায় সন্দেহ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা অধিক জ্ঞাত।

একারণে আমাদের অভিমত হলো যে, শব্দ ও বাক্য উচ্চারিত হওয়ার জন্য হায়াত শর্ত নয়। কেননা হায়াত না থাকার কারণে বাক্য ও আওয়াজ বের হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু যখন শব্দ ও বাক্যকে ব্যক্তিগত বলা হয়, তখন তার হায়াত থাকা আবশ্যক। কেননা ব্যক্তিগত কথা শুধু জীবন্ত অস্তিত্ব থেকে প্রকাশিত হতে পারে। এটা জুব্বাঈর অভিমত বিরোধী। কালামশাস্ত্রের আলেমগণ ঐ অভিমতের বিরোধিতা করে বলেন যে, ব্যক্তিগত কথা বলা শব্দ ও বাক্য উচ্চারণ করার অস্তিত্ব হায়াতের ব্যতিক্রম; যার উপাদান যে পরিমাণে হবে তা থেকে সে পরিমাণ শব্দ ও বাক্য প্রকাশিত হওয়া সম্ভব হবে। তারা পাথর উট ও বকরীর রানের কথা বলা সম্পর্কে বলেন, প্রথমে আল্লাহ তাদের মধ্যে জীবন সঞ্চার করেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের মুখে ও জবানে কথা বলার এমন শক্তি পয়দা করে দেন। যাকে আল্লাহ তা'আলা বাকশক্তিসম্পন্ন করেন সে কথা বলতে পারে। কিন্তু কথা হল যে, যদি তাই হয় যা জুব্বাঈ ও তার অনুসারীরা বলেছে তা নকল ও বর্ণনা করার পদক্ষেপ নেওয়া। যেমন– পাথর দানার তাসবীহ পাঠ করা, কাঠখণ্ডের রোদনের বর্ণনায় অতিরিক্ত বলা হয়েছে। কিন্তু কোন ঐতিহাসিক হাদিসবিশারদ এ সম্পর্কে কিছুই বলেননি। সুতরাং জুব্বাঈর অভিমত বাতিল গণ্য হয়েছে। আর এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন আছে বলেও মনে হয়না। আল্লাহ তা'আলা সামর্থদাতা।

হযরত ওয়াকী' (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হযরত ফাহাদ বিন আতীয়া (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করে বলেন,

أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وَسَلَّمَ أُتِيَ بِصَبِيٍّ قَدْ شَبَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ قَطُّ فَقَالَ من أنَا فَقَالَ رَسُولُ الله،

–একদা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট এরূপ এক শিশু আনা হয়, যদিও তার বয়স হয়েছে, কিন্তু সে কথা বলতে পারেনা। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিশুকে জিজ্ঞেস করেন, আমি কে? শিশুটি তৎক্ষনাৎ বলে উঠলো, আপনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।[১]

হযরত মুয়ার্‌রিজ ইবনে মুয়ীকীব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

رَأَيْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبًا جِيءَ بِصَبِيٍّ يَوْمَ وُلِدَ.

–একদিন আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট এক বিস্ময়কর ঘটনা দেখতে পাই। তাঁর নিকট এমন এক শিশু আনা হয় যে, ঐদিন ভূমিষ্ট হয়েছে। তারপর তিনি উপরোক্ত বর্ণনায় উল্লেখ করেন।

এ হাদিস বর্ণনাকারী হযরত সাসুনা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। তিনি বলেন, অতঃপর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, صَدَقْتَ بَارَكَ اللهُ فِيكَ –তুমি সত্য সাক্ষ্য দিচ্ছো। আল্লাহ তোমার মধ্যে বরকত দান করুক।[২] শিশুটি কথা শেষ করতে না করতে যুবক হয়ে যায়। আমরা তার নাম রাখি "মুবারক আল ইয়ামামা"। এ ঘটনা বিদায় হজ্বের সময় মক্কাতে সংঘটিত হয়েছে।

হযরত হাসান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদিন এক ব্যক্তি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনে উপস্থিত হয়ে আরয করে, আমি আমার এক কন্যাকে মরুভূমিতে ছেড়ে দিয়েছি। তার কি অবস্থা হয়েছে আমি তা জানিনা। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে সাথে নিয়ে মরুভূমিতে উপস্থিত হয়ে মেয়ের নাম ধরে ডাক দেন,

يَا فُلَانَةُ أَجِيبِي بِإِذْنِ اللهِ فَخَرَجَتْ وَهِيَ تَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ فَقَالَ لَهَا إِنَّ أَبَوَيْكِ قَدْ أَسْلَمَا فَإِنْ أَحْبَبْتِ أَنْ أَرُدَّكِ عَلَيْهِمَا قَالَتْ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِمَا وَجَدْتُ اللهَ خَيْرًا لِي مِنْهُمَا،

১. বায়হাকী : দালায়িলুন নবুয়্যাত, বাবু মা জা'আ ফী শাহাদাতির রযী, ৬:২০১, হাদিস নং : ২৩১০।
২. নবজাতক শিশুকে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করেন, আমি কে? শিশুটি বললো, আপনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিশুকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি সত্য সাক্ষ্য দিচ্ছো। আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুক।

–হে অমুক মেয়ে! তুমি আল্লাহর হুকুমে আমার ডাকে সাড়া দাও। মেয়ে "লাব্বাইক" 'আমি হাযির' বলে কবর থেকে বের হয়ে আসে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, তোমার মাতা পিতা মুসলমান হয়েছে। এখন তুমি কি চাও আমি তোমাকে দুনিয়াতে ফেরত নিয়ে আসি? মেয়ে জবাব দেয়, আমার তাদের কোন প্রয়োজন নেই। আমি আমার পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলাকে পেয়েছি। তিনি আমার মাতা-পিতা থেকে আমার জন্য অধিক উত্তম।

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। এক আনসারী যুবকের মৃত্যু হয়। তার অন্ধ মাতা তখন জীবিত ছিল। আমরা তাকে কাফন পরিয়ে তার বৃদ্ধা অন্ধমাতাকে সান্ত্বনা দিতে থাকি। মহিলা বললো, আমার ছেলে কী মারা গেছে? আমরা বললাম, হ্যাঁ। মহিলা বললো,

اللهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي هَاجَرْتُ إِلَيْكَ وَإِلَى رَسُولِكَ رَجَاءَ أَنْ تُعِينَنِي عَلَى كُلِّ شِدَّةٍ فَلَا تَحْمِلَنَّ عَلَيَّ هَذِهِ الْمُصِيبَةَ فَمَا بَرِحْنَا أَنْ كَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ فَطَعِمَ وَطَعِمْنَا،

–হে আমার আল্লাহ! তোমার তো ভালভাবেই জানা আছে, আমি তোমার ও তোমার নবীর উপর এই আশা করে হিযরত করি যে, তুমি আমাকে সকল প্রকার বিপদে সাহায্য করবে। বিপদাপদে তুমি আমার প্রার্থনা কবুল করবে। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে কঠিন বিপদে ফেলোনা। বর্ণনাকারী বলেন, অল্পক্ষণ পরে দেখতে পাই সে মৃত লোক তার মুখ থেকে কাফন সরিয়ে বসে আমাদের সঙ্গে আহার করছে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওবায়িদুল্লাহ আনসারী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত সাবিত বিন কায়েস বিন শাম্মাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে যারা দাফন করেন, আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম। তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁকে যখন কবরে নামানো হয়, তখন তাকে স্পষ্ট বলতে শুনেছি,

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، عُمَرُ الشَّهِيدُ، عُثْمَانُ الْبَرُّ الرَّحِيمُ،

–মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) শহীদ। হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নেক কাজের অগ্রগামী ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী।

এ কথা শুনার পর আমরা তাঁকে ভালভাবে দেখি। দেখি যে, তিনি মৃতই।

হযরত নোমান বিন বশীর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে,

أَنَّ زَيْدَ بن خَارِجَةَ خَرَّ مَيْتًا فِي بَعْضِ أَزِقَّةِ الْمَدِينَةِ فَرُفِعَ وَسُجِّيَ إِذْ سمعوه بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ وَالنِّسَاءُ يَصْرُخْنَ حَوْلَهُ يَقُولُ أَنْصِتُوا أَنْصِتُوا فَحَسَرَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ النبي الْأُمِّيُّ وَخَاتِمُ النَّبِيِّينَ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ صَدَقَ، وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ وعمر وَعُثْمَانَ ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ثُمَّ عَادَ مَيْتًا كَمَا كَانَ،

–হযরত যায়িদ বিন খারেজা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মদীনার এক গলিতে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ রাস্তার উপর পড়ে মারা যান। তাঁকে রাস্তা থেকে উঠিয়ে ঘরে নিয়ে কাপড় আবৃত করা হয়। মাগরিব ও এশার নামাযের সময় যখন নারীরা তাঁর পাশে বসে বিলাপ করে, তখন হঠাৎ করে এক আওয়াজ শুনা যায়– তোমরা চুপ হও, তোমরা চুপ হও।

মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল! উম্মী নবী, শেষ নবী। তারপর আর কোন নবী আসবেনা। একথা পূর্ববর্তী কিতাবে আছে। একথা সত্য। এই রাসূল সত্য কথা বলেছেন। তারপর সে হযরত আবুবকর ও হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) এর নাম উল্লেখ করে। তারপর বললো, "আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)"। হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার প্রতি সালাম, আল্লাহর রহমত এবং বরকত বর্ষিত হোক। এরপর তিনি পূর্বের মতো মৃত হয়ে যান।

একবিংশ অধ্যায়

فِي إِبْرَاءِ الْمَرْضَى وَذَوِي الْعَاهَاتِ

হুযুর (ﷺ) কর্তৃক অসুস্থ ও রুগ্ন ব্যক্তিদের সুস্থ করা

হযরত ইবনে শিহাব ও হযরত আসেম বিন আমর বিন কাতাদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) ও একদল সাহাবীর ওহুদ যুদ্ধের দীর্ঘ বিবরণ এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। ইবনে ইসহাক বলেন, আমার উস্তাদ হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُنَاوِلُنِي السَّهْمَ لا نَصْلَ لَهُ فَيَقُولُ ارْمِ بِهِ وَقَدْ رَمَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ عَنْ قَوْسِهِ حَتَّى انْدَقَّتْ وَأُصِيبَ يَوْمَئِذٍ عَيْنُ قَتَادَةَ يَعْنِي ابْنَ النُّعْمَانِ حَتَّى وَقَعَتْ على وجنته فَرَدَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ أَحْسَنَ عَيْنَيْهِ،

–ওহুদ যুদ্ধের দিন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে লৌহের পালকবিহীন তীর দিয়ে বললেন, যাও নিক্ষেপ করো। আমি তার নির্দেশ অনুযায়ী লৌহ পালকবিহীন তীর নিক্ষেপ করে দেখি তা তীরের মতো কাজ করছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে দেখি তিনি তাঁর তীরদান থেকে তীর নিক্ষেপ করেছেন অবশেষে তা ভেঙ্গে যায়। ঐ দিন হযরত কাতাদা বিন নোমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর চোখে তীরবিদ্ধ হয়ে চোখ বেরিয়ে মুখমণ্ডলের উপর ঝুলতে দেখি। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চোখ স্বস্থানে বসিয়ে দেয়া মাত্রই তা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। উক্ত চোখের অবস্থা এরূপ হয়েছে যে, অপর চোখের তুলনায় ঐ চোখের দৃষ্টিশক্তি অনেক প্রখর হয়।[১]

হযরত কাতাদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর এ ঘটনা আসেম বিন উমর ও ইয়াজিদ বিন আয়ায (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণনা করেছেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হযরত কাতাদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে ঐ ঘটনা বর্ণনা করেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর পবিত্র মুখের লালা জি-কারাদের যুদ্ধে তাঁর জখমের স্থানে লাগিয়ে দেন। অতঃপর

---

১. বায়হাকী : দালায়িলুন নবুয়্যাত, বাবু আন্নানার রাসূল রমা ইয়াওমা, ৩:২৭৬, হাদিস নং : ১১১০।

তার আঘাতের দাগও অবশিষ্ট থাকেনি এমনকি উক্ত স্থানে কোন ক্ষতও দেখা যায়নি।

হাদিস বিশারদ ইমাম নাসায়ী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) হযরত উসমান বিন হুনাইফ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, এক অন্ধ ব্যক্তি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমার অন্ধত্ব দূর হওয়ার জন্য আপনি মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করুন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন, অযু করে দু'রাকাত নামায পড়ার পর এ দোয়া পাঠ কর-

اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بنبى مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّكَ أَنْ يَكْشِفَ عَنْ بَصَرِي اللهمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ،

–হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে তোমার রহমতের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উসিলা দিয়ে আবেদন করতেছি। হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমি আপনার উসিলা দিয়ে আপনার পালনকর্তার দিকে একাগ্র হয়েছি। তাই আপনি আমার চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিন। হে আল্লাহ! আমার জন্য হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শাফায়াত কবুল করুন।

বর্ণনাকারী বলেন, ঐ দোয়া পাঠ করার পর অন্ধ ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে। আল্লাহ তা'আলা তার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দেন।

এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে,

أَنَّ ابن مُلَاعِبِ الْأَسِنَّةِ أَصَابَهُ اسْتِسْقَاء فَبَعَثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيَدِهِ حَثْوَةً مِنَ الْأَرْضِ فَتَفَلَ عَلَيْهَا ثُمَّ أَعْطَاها رَسُولَهُ فَأَخَذَهَا مُتَعَجِّبًا يَرَى أَنْ قَدْ هُزِئَ بِهِ فَأَتَاهُ بِهَا وهو على الشفا فَشَرِبَهَا فَشَفَاهُ اللهُ،

–ইবনে মুলায়েব নামক নিমোনিয়া আক্রান্ত এক বালকের রোগ মুক্তির জন্য দোয়া করার উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তিকে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে পাঠায়। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক মুষ্ঠি মাটি তুলে নিয়ে তাতে থুথু নিক্ষেপ করে আগন্তুক ব্যক্তির হাতে দেন। এ অবস্থা দেখে আগন্তুক ব্যক্তি আশ্চর্য হয়ে মনে মনে ধারণা করে

যে, সম্ভবতঃ আমার সাথে তামাশা করা হচ্ছে। সে যখন মাটি নিয়ে পৌছে তখন বালকের অবস্থা ভীষন শোচনীয় ছিল। সে উক্ত মাটি পানিতে মিশিয়ে ছেলেকে পান করায়। আল্লাহ তা'আলা তাকে সুস্থ করে দেন।

উকাইলী হাবিব বিন ফুদাইক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)'র সূত্রে বর্ণনা করেন যে,

أَنَّ أَبَاهُ ابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ فَكَانَ لَا يُبْصِرُ. بِهِمَا شَيْئًا فَنَفَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنَيْهِ فَأَبْصَرَ فَرَأَيْتُهُ يُدْخِلُ الْخَيْطَ فِي الْإِبْرَةِ وَهُوَ ابن ثَمَانِينَ،

–তাঁর পিতার চক্ষু সাদা হয়ে যায়, ফলে তিনি দৃষ্টিশক্তিহীন হয়ে পড়েন। তিনি কিছুই দেখতেন না। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর চোখে ফুঁ দিলে তিনি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেয়ে দেখতে শুরু করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আশি বছর বয়সেও সুইয়ের ছিদ্রে সুতা প্রবেশ করাতে দেখেছি।

ওহুদের যুদ্ধে হযরত কুলসুম বিন হোসাইনের ঘাড়ে তীর বিদ্ধ হলে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর ক্ষতস্থানে শুধু পবিত্র মুখের লালা লাগিয়ে দেন। তাতে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায় এবং সে সুস্থ হয়ে যায়।

খাইবার যুদ্ধে হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর চোখ উঠার কারণে তীব্র ব্যথা শুরু হয়। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পবিত্র মুখের লালা লাগিয়ে দেন তাতে তাঁর চোখ সুস্থ হয়ে যায়।

খাইবার যুদ্ধে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত সালমা ইবনে আকওয়া (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর আহত বাহুতে ফুঁক দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ সুস্থ হয়ে যান।

হযরত যায়িদ বিন মায়াজ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর পায়ের গোড়ালীতে কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করার সময় তরবারীর আঘাত লাগে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ক্ষতস্থানে মুখের লালা লাগিয়ে দেয়া মাত্রই ক্ষতস্থান সুস্থ হয়ে যায়।[১]

---

[১]. হযরত যায়িদ বিন মায়াজ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আহত হয়েছে একথা ঠিক নয়। বরং হযরত হারিস বিন আউস বিন নোমান আহত হন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মুখের লালার বরকতে আল্লাহ তাআলা তাঁকে সুস্থ করে দেন। (নাসীমুর রিয়াজ, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা : ১০৯)।

খন্দকের যুদ্ধে হযরত আলী বিন হাকাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর পায়ের হাড় ভেঙ্গে যাবার পর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফুঁক দিলে তিনি তাৎক্ষনিকভাবে সুস্থ হয়ে যান। তাকে ঘোড়া থেকেও নিচে নামতে হয়নি।

وَاشتكى عَلِيٌّ بن أَبِي طَالِبٍ فَجَعَلَ يَدْعُو فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهمَّ اشْفِهِ أَوْ عَافِهِ ثُمَّ ضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ فَمَا اشْتَكَى ذَلِكَ الوجع بعد،

–একবার হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) অসুস্থ হলে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর জন্য দোয়া করেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে সুস্থ করে দেন। অথবা তিনি বললেন, "সুস্থ করে দিন"। এরপর তিনি হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে পদাঘাত করেন। এরপর তিনি আর কোন দিন অসুস্থ হননি।

বদরের যুদ্ধে আবু জাহল হযরত মুয়াব্বাজ বিন আফরা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাত কেটে ফেললে তিনি কাটা হাত নিয়ে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাটা হাত যথাস্থানে জোড়া দিয়ে পবিত্র মুখের লালা লাগিয়ে দিলে হাত সুস্থ হয়ে যায়।

এক বর্ণনায় ইবনে ওয়াহাব উল্লেখ করে বলেন,

أَنَّ خُبَيْبَ بن يَسَافَ أصيبَ يَوْمَ بَدْر مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِضَرْبَةٍ عَلَى عَاتِقِهِ حَتَّى مال شِقُّهُ فَرَدَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَفَثَ عَلَيْهِ حَتَّى صَحَّ،

–বদর যুদ্ধে হযরত হোবায়িব বিন ইয়াসাফ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বাহু আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ঝুলতে শুরু করে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা যথাস্থানে রেখে ফুঁক দেন। তাতে তিনি সুস্থ হয়ে যান।

أَتَتْهُ امْرَأَةٌ من خَثْعَمٍ مَعَهَا صَبِي بِهِ بَلَاء لَا يَتَكَلَّم فَأُتِيَ بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ فَاهُ وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ أَعْطَاهَا إِيَّاهُ وَأَمَرَهَا بِسَقْيِهِ وَمَسِّهِ بِهِ فَبَرَأَ الْغُلَامُ وَعَقَلَ عَقْلًا يَفْضُلُ عُقُولَ النَّاسِ.

–এক দিন খাসআম গোত্রের এক মহিলা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে এক অসুস্থ শিশু বাচ্চা নিয়ে উপস্থিত হয়। সে কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার কারণে বাকশক্তিহীন হয়ে পড়ে। ফলে সে কথা বলতে পারতোনা। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুলি করে সে পানি তার মুখে ছিটিয়ে দেন। সে বাচ্চা তাৎক্ষনিকভাবে সুস্থ হয়ে কথা বলতে শুরু করে। পরবর্তীকালে ভীষণ জ্ঞানী হয়। তাঁর মত জ্ঞানী আর কেউ হয়নি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে,

جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِابْنٍ لَهَا بِهِ جُنُونٌ فَمَسَحَ صَدْرَهُ فَثَعَّ ثَعَّةً فَخَرَجَ من جَوْفِهِ مِثْلُ الْجَرْوِ الْأَسْوَدِ فَسعى،

–একদিন এক মহিলা এক পাগল শিশুকে নিয়ে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে উপস্থিত হয়। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার বুকে হাত রাখেন। তাতে শিশুটি হাঁচি দিলে তার পেট থেকে কাল কুকুরের বাচ্চার মতো এক খণ্ড বের হয়ে পালিয়ে যায়।[১]

وَانكَفَأَتِ الْقِدْرُ عَلَى ذِرَاعِ مُحَمَّدِ بن حَاطِب وَهُوَ طِفْلٌ فَمَسَحَ عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُ وَتَفَلَ فِيهِ فَبَرَأَ لِحِينِهِ،

–হযরত মুহাম্মদ বিন হাতিব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বাল্য বয়সে তার বাহুর হাড় ভেঙ্গে যায়। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভাঙ্গা স্থান হাত দিয়ে মুঁছে দেন এবং মুখের লালা লাগিয়ে দেন। তার বাহু সুস্থ হয়ে যায়।

হযরত শুরাহবিল জু'ফী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাত শক্তিহীন হয়ে যায়। তিনি না তরবারী হাতে ধরতে পারতেন, না ঘোড়ার লাগাম ধরতে পারতেন। তিনি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট আরয করলে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর হাত ধরে জোরে টানতে শুরু করেন, এভাবে তার হাতের ব্যথা দূর হয়ে সুস্থ হয়ে যায়।

---

১. ক) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু ফাযায়িলি সায়্যিদিল মুরসালীন, পৃ. ২৮৮, হাদিস নং : ৫৯২৩।
খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বিয়াইয়াতু মুসনাদি আবদিল্লাহ ইবনে আব্বাস, ৫:৩২৪, হাদিস নং : ২২৯২।
গ) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ১০:২০৪।

একদিন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আহার করছেন। এমতাবস্থায় এক কৃতদাসী খাবার চায়। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সামনে রাখা খাবার উঠিয়ে তাকে দিতে চান। কৃতদাসী বললো, আমি এ খাবার চাইনি। আমি আপনার মুখের চিবানো খাবার চেয়েছি। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুখে চিবানো খাবার তাকে দেন। কেননা তাঁর অভ্যাস ছিল দানপ্রার্থীকে বিমুখ না করা। সে যেমাত্র উক্ত খাবার মুখে দেয় সে মুহূর্ত থেকে সে অত্যন্ত লজ্জাশীলা হয়ে যায়। তার মতো লজ্জাশীলা মহিলা মদীনাতে আর কেউ ছিল না। (অথচ এর পূর্বে সে ছিলো ভীষণ নির্লজ্জ)।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

فِيْ إِجَابَةِ دُعَائِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হুযুর (ﷺ) এর দোয়া কবুল হওয়া

এ আলোচনা অতি দীর্ঘ। তিনি ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ যে-কোন বিষয় দোয়া করেছেন সব দোয়াই আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবুল হয়েছে। উক্ত বর্ণনাসমূহ মুতাওয়াতির বা অবিচ্ছেদ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। অসংখ্য বর্ণনাকারী ঐ সমস্ত বর্ণনা সম্পর্কে অভিহিত হয়েছে।

হযরত হোজাইফা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে এক হাদীসে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا لِرَجُلٍ أَدْرَكَتِ الدَّعْوَةُ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ،

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যার জন্য দোয়া করেছেন সে দোয়ার প্রতিক্রিয়া শুধু তার জন্য নয় বরং তার বংশধর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করত।[১]

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

قَالَتْ أُمِّي يَا رَسُوْلَ اللهِ خَادِمُكَ أَنَسٌ ادْعُ اللهَ لَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا آتَيْتَهُ،

–আমার মা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট আবেদন করেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আনাস আপনার খাদেম তার জন্য দোয়া করুন। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ বলে দোয়া করেন, হে আল্লাহ! তার ধনসম্পদ ও বংশধারায় বরকত দান করুন। আর তাকে যা কিছু দান করেছেন। তাতে বরকত দিন।

হযরত আকরামা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণনা করেছেন,

---

[১]. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু হাদিসী হুযাইফা ইবনে ইয়ামান, ৪৭:২৫৯, হাদিস নং: ২২১৯০।

فَوَ اللهِ إِنَّ مَالِي لَكَثِيرٌ وإن ولدى وَوَلَدَ وَلَدِي لَيَعَادُّونَ الْيَوْمَ عَلَى نَحْوِ الْمِائَةِ،

–আল্লাহর শপথ! আজ আমার অগাধ ধন সম্পদ আছে। বর্তমানে আর আমার সন্তানের অবস্থা এমন হয়েছে যে, আমার পুত্র ও নাতীর সংখ্যা সব মিলে একশ'র নিকটবর্তী হয়েছে।

অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

فَمَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَصَابَ مِنْ رَخَاءِ الْعَيْشِ مَا أَصَبْتُ وَلَقَدْ دَفَنْتُ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ مِائَةً مِنْ وَلَدِي لَا أَقُولُ سِقْطًا وَلَا وَلَدَ وَلَدٍ،

–আমার চেয়ে বেশী সুখ-স্বাচ্ছন্দে কেউ আছে বলে আমার মনে হয় না। আমি আমার নিজ হাতে একশ' সন্তানের লাশ দাফন করেছি। আর গর্ভপাত হওয়া সন্তানের হিসাব আমার জানা নেই। তারা আমার নাতি ছিল না। বরং তারা সবাই ছিল আমার ঔরসজাত সন্তান।[১]

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর জন্য বরকতের দোয়া করেন। হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

فَلَوْ رَفَعْتُ حَجَرًا لَرَجَوْتُ أَنْ أُصِيبَ تَحْتَهُ ذَهَبًا وَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَاتَ فَحُفِرَ الذَّهَبُ من تَرِكَتِهِ بالفؤس حَتَّى مَجَلَتْ فِيهِ الْأَيْدِي وَأَخَذَتْ كُلُّ زَوْجَةٍ ثَمَانِينَ أَلْفًا وَكُنَّ أَرْبَعًا،

–আমার মনে হয় আমি পাথর ধরলেও তা স্বর্ণ হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা আমাকে বিপুল পরিমান ধন-সম্পদ দান করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর জমাকৃত স্বর্ণ কোদাল দিয়ে আঘাত করে খণ্ড করা হয়েছে। তাতে আঘাতকারীর হাতে ক্ষত হয়ে যায়। তাঁর চার স্ত্রীর প্রত্যেকে ৮০ হাজার দিরহাম পেয়েছে।

কেউ ১ লাখ দিরহামের কথাও উল্লেখ করেছেন। আবার কোন বর্ণনায় দেখা যায় প্রত্যেকে স্ত্রীকে ৮০ হাজার দিরহাম দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কেননা মৃত্যু শয্যায় থাকা অবস্থায় যাদেরকে তালাক দেন। এছাড়া তাঁর সারা জীবনের দান সাদকার কথা সকলের নিকট জানা আছে। তিনি তার মৃত্যুর পর ৫০ হাজার

[১]. তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ১৮:৩০১।

দিরহাম সাদকা করার জন্য ওসিয়ত করেন। তাঁর সাদকার নমুনা ছিল এমন যে, তিনি দৈনিক ৩০ জন ক্রীতদাসকে আজাদ করতেন। একদিন তিনি ৭০ উট বোঝাইসহ সাদকা করেন।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ক্ষমতা লাভের জন্য দোয়া করেন। যার কারণে পরবর্তী সময় তিনি রাজত্বের অধিকারী হন।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর জন্য এই বলে দোয়া করেন,

أَنْ يُجِيبَ اللهُ دَعْوَتَهُ فَمَا دَعَا عَلَى أَحَدٍ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ،

–হে আল্লাহ! তাকে 'মুস্তাজাবুত দাওয়াত' বা দোয়া কবুলকৃত বানিয়ে দিন। পরবর্তী সময় তিনি যার জন্য দোয়া করতেন তা কবুল হত।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও আবু জাহলের ইসলাম গ্রহণের জন্য দোয়া করেন। তাঁর দোয়া হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর জন্য কবুল হয়। হযরত ইবনে মাস'উদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন;

مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ،

–হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইসলাম গ্রহণ করার পর আমরা সকলে তাঁকে সম্মান করতাম।

একবার কোন এক যুদ্ধে লোকজন পানির অভাবে পিপাসায় অতিষ্ঠ হয়ে যায়। হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট দোয়া করার আবেদন করেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দোয়া করতেই বৃষ্টি পড়তে শুরু করে। তিনি লোকজনকে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিতৃপ্ত করেন। এরপর বৃষ্টি পড়া বন্ধ হয়ে যায়।[১]

একবার অনাবৃষ্টি দেখা দিলে তিনি বৃষ্টির জন্য দোয়া করেন। প্রচুর বৃষ্টি হয় তাতে পথঘাট ডুবে একাকার হয়ে যায়। লোকজন অতিবৃষ্টির অভিযোগ করে, তিনি দোয়া করেন আকাশ মেঘ মুক্ত হয়ে পরিস্কার হয়ে যায়।

[১]. কাফিররা হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)কে ভীষণ ভয় করতো। তাই তারা হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ইসলাম গ্রহণ করার পর মুসলমানদের উপর পূর্বের মতো অত্যাচার করতে সাহস করেনি।

একবার তিনি হযরত আবু কাতাদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর জন্য দোয়া করেন,

أَفْلَحَ وَجْهُكَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِي شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ فَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِيْنَ سَنَةً وَكَأَنَّهُ ابن خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً،

–হে আল্লাহ! তার মুখমণ্ডলকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দাও। তার মাথার চুল বরকতময় করে দাও। তাঁর অবস্থা এরূপ হয়েছে যে, ৭০ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। কিন্তু তাকে দেখলে মনে হতো যেন পনের বছরের যুবক।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার হযরত নাবেগা জা'দী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে উদ্দেশ্য করে দোয়া করেন,

لَا يَفْضُضِ اللهُ فَاكَ فَمَا سَقَطَتْ لَهُ سِنٌّ،

–আল্লাহ তা'আলা তোমার দাঁত নষ্ট করবেন না। দেখা যায় যে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হযরত নাবেগা জাদী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর একটি দাঁতও নষ্ট হয়নি।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি সকলের চেয়ে সুন্দর দাঁতের অধিকারী ছিলেন। তাঁর দাঁত পড়ে গেলে নতুন দাঁত গজাতো। তিনি একশ' বিশ বছর জীবিত ছিলেন। কেউ কেউ তার চেয়ে বেশীও বলেছেন।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর জন্য দোয়া করেন,

اللهم فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ فَسُمِّيَ بَعْدُ الْحَبْرَ. وَتَرْجُمَانَ الْقُرْآنِ،

–হে আল্লাহ! আপনি তাকে দীনের সঠিক জ্ঞান প্রজ্ঞা কুরআন ব্যাখ্যার ইলম দান করুন। তাঁর দোয়ার ফলে তিনি খ্যাতনামা আলেম ও "তরজুমানুল কুরআন" উপাধি লাভ করে উম্মাতের মাঝে খ্যাত হন।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আবদুল্লাহ বিন জাফর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ব্যবসায়িক উন্নতি ও বরকতের জন্য দোয়া করেন। এরপর থেকে তিনি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে যা ক্রয় করতেন তাতেই তিনি লাভবান হতেন। অনুরূপভাবে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত মিকদাদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সম্পদে বরকতের জন্য দোয়া করেন। তাঁর নিকট সবসময়ই অধিক পরিমাণ ধন-দৌলত থাকত।

অনুরূপ তিনি হযরত ওরওয়াহ বিন আবু জাআদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর জন্য দোয়া করেন। তিনি বলেন,

فَمَا أَرْجِعُ حَتَّى أَرْبَحَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا،

–আমি কানাসার বাজার থেকে ফিরে আসার পর দেখতাম চল্লিশ হাজার দিরহাম লাভ করেছি।[১]

ইমাম বোখারী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বোখারী শরীফে বর্ণনা করেছেন,

فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ رَبِحَ فِيهِ،

–তাঁর অবস্থা এমন হয়েছে যে, তিনি মাটি খরিদ করলেও তাতে লাভবান হতেন।[২]

হযরত (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুরূপ দোয়া হযরত গারকাদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর জন্য করেন। একবার তাঁর একটি উটনী পালিয়ে যায়। তিনি তাঁর জন্য দোয়া করেন। তখন প্রবল বাতাস তাকে তাড়িত করে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে হাজির করে দেয়।

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর মায়ের জন্য দোয়া করেন, যাতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হন।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর জন্য দোয়া করেন। যাতে তিনি শীত ও গরমের তীব্রতা থেকে সুরক্ষিত থাকেন। পরবর্তী সময় তাঁর অবস্থা এমন হয়েছে যে, তিনি গরমের দিনে শীতের কাপড়, শীতের দিনে গরমের কাপড় পরিধান করতেন। শীত বা গরম তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারতো না।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত ফাতেমা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) এর জন্য দোয়া করেন। তিনি যেনো কখনো অনাহারে না থাকেন। পরবর্তী জীবনে তিনি কোনোদিন অভুক্ত থাকেননি।

---

১. ক) বায়হাকী : সুনানুল কুবরা, ৬:১১২।
খ) দারে কুতনী : আস্ সুনান, ৭:১০৮, হাদিস নং : ২৮৬১।

২. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু সাওয়ালিল মুশরিকীন, ১১:৪৭৩, হাদিস নং : ৩৩৭০।
খ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবুল আমীন ইয়াতাজারুরু ফীহি, ৭:২৩৫, হাদিস নং : ২৩৯৩।
গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৩৯:৩৫১, হাদিস নং : ১৮৫৪৯।

হযরত তোফায়েল বিন আমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মু'জিযা প্রদর্শনের আবেদন করেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দোয়া করেন,

اَللّٰهُمَّ نَوِّرْ لَهُ فَسْطَعَ لَهُ نُوْرٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَقَالَ يَا رَبِّ أَخَافُ أَنْ يَقُوْلُوا مُثْلَةٌ فَتَحَوَّلَ إِلَى طَرَفِ سَوْطِهِ فَكَانَ يضئ فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ فَسُمِّي ذَا النُّوْرِ،

–হে আল্লাহ! আপনি তোফায়েলকে নূর দান করুন। এরপর তাঁর উভয় চোখের মধ্যবর্তী স্থানে নূর ঝলমল করতে থাকে। তিনি আবেদন করেন। আমার ভয় হয় যদি লোকজন এটাকে শ্বেত রোগ মনে করে। তারপর নূরের স্থান পরিবর্তন করে তা তাঁর হাতের লাঠির মধ্যে এনে দেন। অন্ধকার রাতে পথ চলার সময় তাঁর লাঠি থেকে নূর বিচ্ছুরিত হতো। এ জন্য তিনি "যুন্নূর" নামে খ্যাতি লাভ করেন।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুদার গোত্রের বিপক্ষে দোয়া করেন। ফলে তারা দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়। পরে কুরাইশ লোকজন তাঁর নিকট রহমতের জন্য দোয়া করার আরজ করে। তিনি দোয়া করেন, তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়।

পারস্যে সম্রাট কিসরা যখন মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রেরিত পত্র ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার বিপক্ষে দোয়া করেন। আল্লাহ তা'আলা তার রাজত্বকে ধ্বংস করে দেন। এখন তার নাম উচ্চারণ করার মত কেউ নেই। পৃথিবীর মানচিত্র থেকে পারস্য সাম্রাজ্যকে চিরদিনের জন্য মুছে দেয়া হয়েছে। অথচ পূর্বে সে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিল।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার নামায আদায় করেছেন। তখন এক দুষ্ট ছেলে তাঁর নামাযে বাধার সৃষ্টি করে। তিনি তার বিপক্ষে দোয়া করে যে, আল্লাহ তার পা দু'টি শক্তিহীন করে দাও। পরবর্তীতে তার অবস্থা ঠিক তাই হয়েছে। ছেলেটি চলাফেরা করতে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে যায়।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদিন এক ব্যক্তিকে বাম হাতে খেতে দেখে তাকে বললেন, ডান হাতে খাবার খাও। লোকটি দুষ্টামী করে বললো, আমি ডান হাতে খাবার খেতে অক্ষম। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন,

فَقَالَ: لَا اسْتَطَعْتَ فَلَمْ يَرْفَعْهَا إِلَى فِيْهِ،

–তুমি আর কোন দিন ডান হাতে খেতে পারবেও না। পরবর্তীতে তাই হয়েছে যে, সে তার ডান হাত মুখের নিকট পর্যন্ত উঠাতে পারতো না।

আবু লাহাবের পুত্র হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে বেআদবী করার কারণে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার বিপক্ষে দোয়া করেন,

اللهمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا من كِلَابِكَ فَأَكَلَهُ الْأَسَدُ،

–হে আল্লাহ! তোমার সৃষ্ট কুকুরসমূহ থেকে কোন এক কুকুরকে তার উপর জয়যুক্ত করে দাও। সুতরাং তাকে বাঘে খেয়ে ফেলে।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার এক মহিলা সম্পর্কে বলেছেন, أَكَلَكِ الْأَسَدُ "তোমাকে বাঘে খাবে"। পরবর্তী সময় ঠিকই তাকে বাঘে খেয়ে ফেলে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, হাদিসটি অতি প্রসিদ্ধ,

حِيْنَ وَضَعُوْا السَّلَا عَلَى رَقَبَتِهِ وَهُوَ سَاجِدٌ مَعَ الْفَرْثِ وَالدَّمِ وَسَمَّاهُمْ وَقَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ،

–একদিন কাবাগৃহে নামায পড়া অবস্থায় কতিপয় কুরাইশ সর্দার হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর গর্দানের উপর মরা উটের রক্ত মাখা নাড়িভূঁড়ি চাপিয়ে দেয়। তিনি নুইয়ে পড়েন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের সকলের নাম উল্লেখ করে তাদের বিপক্ষে দোয়া করেন। হযরত ইবনে মাস'উদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি স্বচক্ষে দেখেছি তারা সকলে বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছে।[১]

হাকাম ইবনে আবুল আস নামক এক পাপিষ্ঠ তাঁর মজলিসে বসে অহংকার ও ঘৃণা প্রকাশার্থে চোখ বন্ধ করে ইশারা করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার বিপক্ষে দোয়া করেন; তাই যেন হয়। বাস্তবে হয়েছে তাই। সে বিকৃত চেহারা ও চোখ মোড়ানো অবস্থায় জাহান্নামে পৌছে যায়।

---

[১]. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু তরহি জাইবুল মুশরিকীন, ১০:৪৫৬, হাদিস নং : ২৯৪৮।
খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু মা লাকিয়ান্ নবী, ৯:২৭৫, হাদিস নং : ৩৫৫০।
গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, মুসনাদি আবদিল্লাহ ইবনে মাসউদ, ৮:৭২, হাদিস নং : ৩৫৩৭।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুহাল্লিম বিন জাসামার বিপক্ষে দোয়া করেন, সাত দিন পর তার মৃত্যু হয়।[১] দাফন করার পর দেখা যায় তার লাশ মাটি গ্রহণ না করে উপরে তুলে দেয়। একে একে কয়েকবার তাকে দাফন করা হয়। প্রত্যেক বারই মাটি তার লাশ বের করে দেয়। অবশেষে তারা নিরূপায় হয়ে তার লাশ জঙ্গলে ফেলে দেয়। যাতে কোন জীবজন্তু খেয়ে ফেলে। কিন্তু জীবজন্তুকে তার লাশ খেতে না দেখে লোকজন তার লাশের উপর পাথর নিক্ষেপ করে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

এক ব্যক্তি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট তার ঘোড়া বিক্রয় করে পরে অস্বীকার করে। হযরত খোজাইমা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ঘোড়া ক্রয় করার বিষয়ে সাক্ষী হন। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে ঘোড়া ফেরত দেন। আর এ বলে দোয়া করেন,

اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ كَاذِبًا فَلَا تُبَارِكْ لَهُ فِيهَا فَأَصْبَحَتْ شَاصِيَةً بِرِجْلِهَا،

–হে আল্লাহ! যদি এ লোক মিথ্যাবাদী হয় তাহলে এ ঘোড়াতে বরকত দিও না। কিছুক্ষন পর ঘোড়া পা উপুড় করে মরে যায়।

এ জাতীয় ঘটনার বর্ণনা এতো অধিক যা গগনা করা সম্ভব নয়।

([১]) হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ক্ষুদ্র এক বাহিনীর সাথে মুহাল্লিম বিন জাসামাকে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে হযরত আমের ইবনুল আসবাত (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথে ঐ বাহিনীর সাক্ষাৎ হয়। তিনি বাহিনীর লোকদের স্বাগতম জানান। মুহাল্লিম বিন জাসামা আক্রমণ করে হযরত আমের (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)কে শহীদ করে তার ধন-সম্পদ সব ছিনিয়ে নিয়ে যায়। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ কথা জানার পর মুহাল্লিমার জন্য বদদোয়া করেন। তিনিবার বললেন, হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করবেন না। (নাসীমুর রিয়াজ, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা : ১৩০)।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

فِيْ كِرَامَتِهِ وَبَرَكَاتِهِ وَانْقِلَابِ الْأَعْيَانِ لَهُ فِيمَا لَمَسَهُ أَوْ بَاشَرَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হুযুর (ﷺ) এর পবিত্র হাতের পরশে বিভিন্ন বস্তুতে বরকত ও পরিবর্তন

হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত আছে, একবার মদীনাবাসীরা বিকট শব্দ শুনে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আবু তালহা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ঘোড়ার উপর আরোহণ করে মদীনার বাইরে গমন করেন। তাঁর সে ঘোড়া অত্যন্ত দুর্বল ও অলস প্রকৃতির ছিল। তিনি ফিরে আসার পর বললেন, হে আবু তালহা!

وَجَدْنَا فَرَسَكَ بَحْرًا فَكَانَ بَعْدَلَا يُجَارِىْ وَنَخَسَ جَمَلَ جَابِرٍ وَكَانَ قَدْ أَعْيَا فَنَشَطَ حَتّٰى كَانَ مَا يَمْلِكُ زِمَامَهُ،

–তোমার ঘোড়াকে আমি অতি তেজস্বী ও দ্রুতগামী পেয়েছি। পরবর্তী সময় কোন ঘোড়া এর সমকক্ষ হতে পারেনি। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর উটের পায়ে লাঠি লাগিয়ে দেন। উটটি খুব দুর্বল ও অলস হয়ে পড়ে। একেবারে চলতে পারত না। কিন্তু পরবর্তীতে তার এরূপ অবস্থা হয়েছে যে, লাগাম ধরে তাকে টেনে রাখা যেতো না।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুরূপ হযরত জাইল আশজায়ী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর উটের দেহে লাঠি লাগিয়ে দোয়া করেন। তার পর থেকে এতো বেশী দ্রুতগতি সম্পন্ন হয় যে, লাগাম ধরে তার মাথা নীচু করা যেতো না। তার বাচ্চা পরবর্তী সময় ১২ হাজার টাকায় বিক্রয় হয়।

একবার হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাআদ বিন ওবাদার দুর্বল প্রকৃতির গাধার উপর আরোহণ করলে গাধাটি দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়ে যায়। এরপর কোন গাধা তার মুকাবিলা করতে পারতোনা।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কয়েকগুচ্ছ পবিত্র চুল হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর টুপিতে রাখাছিল। এর বরকতে তিনি যত যুদ্ধে যোগদান করেন সব যুদ্ধে বিজয়ী হন।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে,

أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ وَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا،

–হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) একদা এক ইয়ামানী জুব্বা বের করে বললেন, এই জুব্বা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরিধান করেছেন। আমরা রুগ্ন ব্যক্তিদের তা ধৌত করে পান করাতাম। তারা ব্যধিমুক্ত হয়ে যেত।[১]

কাজী আবু আলী তার ওস্তাদ কাসেম বিন মামুন (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে বর্ণনা করেন,

كَانَتْ عِنْدَنَا قِصَّةٌ مِّنْ قِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا نَجْعَلُ فِيهَا الْمَاءَ لِلْمَرْضَى فَيَسْتَشْفُونَ بِهَا،

–আমাদের নিকট হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর একটি পেয়ালা ছিল। আমরা উক্ত পেয়ালাতে পানি নিয়ে ব্যাধিগ্রস্থ লোকদেরকে পান করালে তারা ব্যাধিমুক্ত হয়ে যেতো।

জাহজা গাফফারী হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাত থেকে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাতের লাঠি নিয়ে হাঁটুতে ভর দিয়ে ভাঙার চেষ্টা করে। লোকজন তাকে তা ভাঙ্গতে কঠোরভাবে নিষেধ করে। তার হাঁটুতে রোগের সৃষ্টি হয়ে দুটি পা নষ্ট হয়ে যায়। এর এক বছরের মধ্যে সে মারা যায়।

একবার হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর অযুর অবশিষ্ট পানি কোবার কূপে ঢেলে দেন। এরপর কূপটি আর কোন দিন পানিশূন্য হয়নি।

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কূপে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুখের লালা ঢেলে দেন তখন থেকে মদিনায় তার কূপের পানির চেয়ে মিষ্টি আর কোন কূপের পানি ছিল না।

---

[১]. ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু তাহরিমি ইসতি'মালি ইনায়িয্ যিহাব, ১০:৪১১, হাদিস নং : ৩৮৫৫।
খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল লিবাস, পৃ. ৪৮২, হাদিস নং : ৪৩২৫।
গ) বায়হাকী : সুনানুল কুবরা, ২:৪২৩।

কোন এক সফরে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক কূপের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এ কূপের নাম কী?

فَقِيلَ لَهُ اسْمُهُ بَيْسَانُ وماءه مِلْحٌ فَقَالَ بَلْ هُوَ نُعْمَانُ وَمَاءَهُ طَيِّبٌ فَطَابَ،

–তাঁকে বলা হলো কূপের নাম 'বাইসান' এ কূপের পানি লবণাক্ত। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন না, এ কূপের নাম হলো 'নোমান'। এ কূপের পানি উত্তম, পরবর্তীতে বাস্তবে কূপের পানি অতি উত্তম ও সুস্বাদু হয়ে যায়।

একবার যমযমের এক বালতি পানি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনে আনা হয়। তিনি তাতে পবিত্র মুখের লালা মিশিয়ে দেন। তা মেশক আম্বরের চেয়ে অধিক সৌরভ ছড়াতে শুরু করে।

হযরত ইমাম হাসান ও হোসাইন (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) একবার পিপাসায় কাতর হয়ে কাঁদছেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর পবিত্র জিহ্বা তাঁদেরকে চুষতে দেন। মুহূর্তের মধ্যে তাঁদের কান্না থেমে যায়।

হযরত উম্মে মালেক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) এর নিকট একটি পাত্র ছিল। তিনি ঐ পাত্রে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্য হাদিয়া পাঠাতেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন,

أَنَّ لَا تَعْصَرَهَا ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَيْهَا فَإِذَا هِيَ مَمْلُوءَةٌ سَمْنًا فَيَأْتِيهَا بَنُوهَا يَسْأَلُونَهَا الْأُدْمَ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ فَتَعْمَدُ إِلَيْهَا فَتَجِدُ فِيهَا سَمْنًا فَكَانَتْ تُقِيمُ أُدْمَهَا حَتَّى عَصَرَتْهَا،

–এ পাত্রকে কখনো নিংড়াবে না। একথা বলে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে সে পাত্র দিয়ে দেয়। দেখা যায় তা ঘিরে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। এরপর থেকে তাঁর বাচ্চাদের তরকারীর প্রয়োজন হলে। তিনি উক্ত পাত্র হাতে নিয়ে দেখতে পেতেন তা ঘিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। অথচ তখন তার কাছে কিছুই থাকতো না। সবসময় পাত্র ঘিতে পরিপূর্ণ থাকতো। একবার কেউ পাত্র নিংড়িয়ে ঘি বের করার পর তা ঘি শূন্য হয়ে যায়।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মুখে তাঁর পবিত্র মুখের লালা লাগিয়ে দিলে সারা রাত শিশুদের আহারের প্রয়োজন হতো না।

তাঁর পবিত্র হাতেও অনুরূপ বরকত ছিল। যা কিছুতে পবিত্র হাত লাগাতেন তা বরকতময় হয়ে যেতো।

হযরত সালমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে যখন তাঁর মনিব মুকাতিব বানিয়ে ক্রয় করে।[১] তখন শর্তারোপ করে যে, যেদিন তুমি চল্লিশ আওকিয়া স্বর্ণ ও তিনশ খেজুরের চারা রোপন করে তা থেকে ফল ফলিয়ে দেবে। সেদিন তোমাকে মুক্তি দেয়া হবে। একথা শুনে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উঠে দাঁড়ান এবং নিজের হাতে খেজুর গাছের চারা রোপন করেন। শুধুমাত্র অন্য কেউ একটি চারা রোপন করে। সম্ভবতঃ হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) অথবা হযরত সালমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নিজ হাতে রোপন করেন। মাত্র একটি গাছ ব্যতীত সব গাছেই ফল ধরে। যে গাছ অন্য কেউ লাগিয়েছে শুধু সে গাছেই ফল হয়নি। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সে গাছটি স্বহস্তে জমিন থেকে উঠিয়ে পুনরায় রোপন করেন। আর সে বছরই তাতে ফল ধরে।

বাজ্জার কিতাবে লিখিত আছে,

فَأَطْعَمَ النَّخْلُ من عَامِهِ إِلَّا الْوَاحِدَةَ نَقَلَعهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَرَسَهَا فاطمعت من عَامِهَا، وَأَعْطَاهُ مِثْلَ بَيْضَةِ الدَّجَاجَةِ من ذَهَبٍ بَعْدَ أن أدراها عَلَى لِسَانِهِ فَوَزَنَ مِنْهَا لِمَوَالِيهِ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً وَبَقِيَ عِنْدَهُ مِثْلُ مَا أَعْطَاهُمْ،

–ঐ বছর সব কটি গাছে ফল ধরে। কিন্তু এক গাছে ফল ধরেনি যে গাছ হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ হাতে রোপন করেন নি। তারপর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গাছটি উঠিয়ে স্বহস্তে রোপন করেন ঐ বছর সব গাছে ফলে ধরে। অতঃপর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুরগির ডিমের মতো এক টুকরা স্বর্ণ হাতে নিয়ে মুখে চুম্বন করেন তা হযরত সালমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাতে দিয়ে বললেন, যাও এটা ওজন করে তোমার মনিবকে চল্লিশ আওকিয়া স্বর্ণ দিয়ে দাও। চল্লিশ আওকিয়া স্বর্ণ দেয়ার পরও তার নিকট আরও চল্লিশ আওকিয়া স্বর্ণ অবশিষ্ট থেকে যায়। এভাবে তিনি দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভ করেন।

১. মোকাত্তের হলো ঐ কৃতদাস। মনিব যখন তাকে বলে যে, তুমি এ পরিমাণ টাকা বা স্বর্ণ প্রদান করলে বা অমুক কাজ শেষ করতে তোমাকে মুক্তি দেয়া হবে।

হযরত হানাশ বিন আকীল (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণনা করেন,

سَقَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْبَةً مِن سَوِيقٍ شَرِبَ أَوَّلَهَا وَشَرِبْتُ آخِرَهَا فَمَا بَرِحْتُ أَجِدُ شِبَعَهَا إِذَا جُعْتُ وَرِيَّهَا إِذَا عَطِشْتُ وَبَرْدَهَا إِذَا ظَمِئْتُ،

–একদিন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে ছাতুর শরবত পান করান। এর পর থেকে যখন আমার ক্ষুধা বা পিপাসা হতো তখন আমি সে ছাতুর কথা স্মরণ করতাম। তখনই আমার ক্ষুধা দূর হয়ে যেতো আর আমি নিজের মধ্যে সে ছাতুর শীতলতা অনুভব করতাম।

হযরত কাতাদা বিন নোমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে অন্ধকার বৃষ্টির রাতে এশার নামাযের পর বাড়ি যাবার জন্য হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি খেজুরের ডাল হাতে দিয়ে বললেন,

انْطَلِقْ به فإنه سيضيء لَكَ من بَيْنِ يَدَيْكَ عَشْرًا وَمِنْ خَلْفِكَ عَشْرًا فَإِذَا دَخَلْتَ بَيْتَكَ فَسَتَرَى سَوَادًا فَاضْرِبْهُ حَتَّى يَخْرُجَ فَإِنَّهُ الشَّيْطَانُ، فَانْطَلَقَ فَأَضَاءَ لَهُ الْعُرْجُونَ حَتَّى دَخَلَ بَيْتَهُ وَوَجَدَ السَّوَادَ فَضَرَبَهُ حَتَّى خَرَجَ،

–এটা হাতে নিয়ে বাড়ি যাও। এটা তোমার সামনে পেছনে দশ দশ গজ আলোকিত করে দেবে। তুমি বাড়ি পৌঁছে ঘর অন্ধকার দেখবে। তুমি এ ডাল দিয়ে অন্ধকার তাড়িয়ে দেবে তাহলে অন্ধকার দূর হয়ে যাবে। সেতো শয়তান। যখন তিনি ডাল হাতে নিয়ে পথ চলতে শুরু করেন তখন ডাল থেকে আলো ঝলমল করতে শুরু করে। তিনি ঘরে প্রবেশ করে দেখেন সত্যিই ঘর ঘুটঘুটে অন্ধকার। তখন তিনি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নির্দেশ মোতাবেক ডাল দিয়ে অন্ধকারে আঘাত করেন। তাতে অন্ধকার দূর হয়ে যায়।

বদর যুদ্ধে হযরত ওককাশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর তরবারী ভেঙ্গে যায়। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে মোটা খেজুরের ডাল দিয়ে বললেন,

اضْرِبْ بِهِ حِيْنَ انْكَسَرَ سَيْفُهُ يَوْمَ بَدْرٍ فَعَادَ فِي يده سيفا صار ما طَوِيلَ الْقَامَةِ أَبْيَضَ شَدِيدَ الْمَتْنِ فَقَاتَلَ بِهِ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ عِنْدَهُ يَشْهَدُ بِهِ الْمَوَاقِفَ إِلَى أَنِ اسْتُشْهِدَ فِي قِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ،

–যাও এর দ্বারা যুদ্ধ কর। সেই ডালখানাই তরবারী হয়ে যায়। তা সাদা তীক্ষ্ণ ধারালো হয়। এরপর সব যুদ্ধেই তিনি সে তরবারী হাতে নিয়ে বীরদর্পে যুদ্ধ করতেন। আর কাফিরদের দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিতেন। অবশেষে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীদের যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

অনুরূপ হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওহুদের যুদ্ধের দিনে হযরত আবদুল্লাহ বিন জাহাশ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কেও খেজুরের ডাল দিয়ে বলেন, যাও যুদ্ধ কর; তাঁর হাতে তা তরবারী হয়ে যায়।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মু'জিযার বরকতে ঐ বকরী সমূহের দুধ বৃদ্ধি লাভ করেছে, যেগুলো পূর্বে বাচ্চা প্রসব করেনি এবং দুধ দোহন করার উপযুক্ত হয়নি। যেমন– হযরত উম্মে মা'বাদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) এর বকরী।[১] হযরত মুয়াবিয়া বিন হালিমা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর পালের বকরী ও তাঁর দূর্বল উটনী।[২] হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বকরী। হযরত হালিমা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর পালের বকরী ও তাঁর দূর্বল উটনী।[৩] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর

---

১. মদিনাতে হিজরতের সময় হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত উম্মে মা'বাদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) এর বাড়ির নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করেন। তখন তিনিও হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ক্ষুধার্ত ছিলেন। হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উম্মে মা'বাদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) এর নিকট বকরীর দুধ দোহন করার অনুমতি চান। তিনি বলেন, বকরীর বয়স অনেক বেশী হয়েছে, তাই এর দুধ শুকিয়ে গেছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার সম্মতি পাবার পর যখন বকরীর দুধের স্তনে পবিত্র হাত লাগান তখন বকরীর দুধ বৃদ্ধি পায়। ওই বকরীর দুধ পান করে তাঁরা সকলে তৃপ্তি লাভ করেন।

২. একবার হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুয়াবিয়া বিন সাওর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর পুত্র হযরত বাশার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে সঙ্গে নিয়ে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে উপস্থিত হন। তাঁর ইচ্ছা ছিলো যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর পুত্র বাশারের মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার পুত্র বাশারের মাথায় হাত বুলিয়ে দেবেন। তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যায়। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে সাতটি বকরী দান করেন। দূর্ভিক্ষের সময়ও সেগুলো মোটা তাজা থাকে। তাঁর দোয়ার বরকতে বকরীর সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

৩. হযরত হালিমা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) দুধপান করানোর উদ্দেশ্যে যখন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সাথে নিয়ে যাত্রা করেন। তখন সে অঞ্চলে ভীষণ দূর্ভিক্ষ চলছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি

বকরীর ঘটনা। সেটা গর্ভধারণ করেনি তবুও দুধ দোহন করা সম্ভব হয়েছে। হযরত মিকদাদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বকরীরও সেই একই অবস্থা হয়।[১]

এ সংক্রান্ত আরো এক বর্ণনায় আছে যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক দিন কতিপয় সাহাবীদের জন্য সফরের সামগ্রী হিসেবে পানি ভর্তি এক মশক মুখবন্ধ করে তাদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের জন্য দোয়া করেন। অনেক দূর অগ্রসর হওয়ার পর তারা মশকের মুখ খুলে দেখেন মশক দুধ ও মাখনে পরিপূর্ণ হয়ে আছে।

হযরত হাম্মাদ বিন সালমা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত ওমাইর বিন সা'দ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর মাথায় হাত রেখে বরকতের জন্য দোয়া করেন। আশি বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু মৃত্যুর সময়ও তার মাথার চুল সাদা হয়নি। এরূপ অনেক ঘটনা অনেক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। যাঁদের সম্পর্কে এরূপ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তাঁরা হলেন, হযরত সায়িব বিন ইয়াজীদ ও হযরত মাদলুক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।

হযরত উতবা বিন ফারকাদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর দেহ থেকে তীব্র খোশবু বের হত। মহিলারা অতিরিক্ত সুগন্ধি ব্যবহার করা সত্ত্বেও তাঁর খোশবু তাদের সকলের সুগন্ধিকে ম্লান করে দিত। এরূপ হবার কারণ হল যে, একবার তিনি রোগাক্রান্ত হন। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার পেটে ও পিঠে হাত বুলিয়ে দেন। সেদিন থেকে তাঁর শরীর হতে সুগন্ধি বের হতে শুরু করে।

ওয়াসাল্লাম) এর বরকতে তাঁর বকরীসমূহের দুধ কমেনি বরং হযরত হালিমা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর গোত্রবাসী সকলে তাঁর বকরীর দুধ পান করে তৃপ্তি লাভ করতো। অনুরূপ তাঁর দুর্বল উটনী দ্রুতগতি সম্পন্ন হয়ে যায়।

১. হযরত মিকদাদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমরা দুই বন্ধু হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে নিয়োজিত ছিলাম। আমাদের তিন জনের বকরী ছিলো; সে বকরীগুলো দোহন করে আমরা দুই বন্ধু দুধ পান করতাম। আর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্য তাঁর ভাগের দুধ রেখে দিতাম। একরাতে দুধ দোহন করে আমরা দুই বন্ধু সব দুধ খেয়ে ফেলি। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাতে বাড়ি এসে পাত্রে দুধ না দেখে দোয়া করেন, হে আল্লাহ! যে আমাকে খেতে দেয় তুমি তাকে খেতে দিও। যে আমাকে পান করায় তুমি তাকে পান করাও। একথা শুনে আমি ছুরি হাত নিয়ে তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে সবচেয়ে তাজা বকরী জবাই করে গোশত হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে খেতে দেবো। কিন্তু আমি বকরীর নিকট গিয়ে দেখি যে, বকরীগুলোর স্তন দুধে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। তখন আমি পুনরায় দ্বিতীয়বার দুধ দোহন করে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে দুধ পান করাই।

হযরত আয়েয বিন আমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হুনাইনের যুদ্ধে আঘাত পান। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর মুখমণ্ডল ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে তাঁর জন্য দোয়া করেন। এরপর তাঁর চেহারা সাদা ঘোড়ার কপালের মতো ঝলমল করতে থাকে।

হযরত কায়েস বিন যায়িদ জুযামী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ছিলেন। তাঁর মাথায় হাত রেখে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দোয়া করেন। একশ'বছর বয়সে যখন তাঁর মাথার সমস্ত চুল সাদা হয় তখনও ঐ স্থানে চুল সম্পূর্ণ কালো ছিল যেস্থান হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র হাতের পরশ লেগেছে। সে কারণে তার নাম হয়েছে "আগর" অর্থাৎ অধিক উজ্জ্বল।

এ ঘটনার অনুরূপ ঘটনা হযরত আমর বিন সা'লাবা জুহানী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হয়েছে। একবার একজনের চেহারাতে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র হাতের স্পর্শ লাগে, তাতেই সারা জীবন তার চেহারা উজ্জ্বল থাকে।

হযরত কাতাদাহ বিন মিলহান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর চেহারায় একবার হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পবিত্র হাত বুলিয়ে দেন। তারপর থেকে তাঁর চেহারার এমন অবস্থা হয়েছে যে, মানুষ তাঁর চেহারায় আয়নার মতো চেহারা দেখতে পারতো।

হযরত হানযালা বিন হাযীম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর মাথায় একবার হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাত রেখে বরকতের জন্য দোয়া করেন। তারপর তাঁর এমন অবস্থা হয়েছে যে, কোন মানুষের চেহারা অথবা কারও বকরীর স্তন ফুলে গেলে তিনি সেই ফুলা স্থানে তাঁর মাথা স্পর্শ করালে সঙ্গে সঙ্গে ফুলা দূর হয়ে যেতো।

হযরত জয়নব বিনতে উম্মে সালমা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) এর চেহারার উপর হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদিন পানির ছিটা দেন। তারপর এমন অবস্থা হয়েছে যে, তাঁর চেহারার লাবণ্য এতই বৃদ্ধি পায় যে তিনি এক অপূর্ব সুন্দরী হয়ে যান।

এক শিশুর মাথায় টাক ছিল। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। তখন ওই বাচ্চার সম্পূর্ণ মাথা চুলে পরিপূর্ণ হয়ে সে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যায়।

এ ধরনের ঘটনার বিবরণ হযরত মিলহাব বিন কুবালা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাদীসে বর্ণিত আছে।

অনেক শিশু বাচ্চা, রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, উন্মাদ পাগলের মাথায় হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাত বুলিয়ে দেন। আর তারা সকলেই সুস্থ হয়ে যায়।

এক ব্যক্তি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করে, আমি হাঁড়নিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছি। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বললেন, এই কূপের পানি তোমার অণ্ডকোষে ছিটিয়ে দাও। লোকটি তাই করে তাতে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। পূর্বে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ কুপে কুলির পানি ফেলেন।

হযরত তাউস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে যে,

لَمْ يُؤْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَحَدٍ بِهِ مَسٌّ فَصَكَّ فِي صَدْرِهِ إِلَّا ذَهَبَ الْمَسُّ الْجُنُونُ،

–কোন পাগল বা উন্মাদ লোককে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে উপস্থিত করা হতো। তিনি তাদের বুকে হাত বুলিয়ে দিলে তাদের পাগলামী দূর হয়ে যেতো।

একবার এক কূপ থেকে এক বালতি পানি উঠিয়ে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পবিত্র মুখের লালা মিশিয়ে সে পানি কূপে ফেলে দেওয়ার পর তা মেশক আম্বরের মতো সুগন্ধ হয়ে যায়।

হুনায়েনের যুদ্ধে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক মুষ্ঠি বালু নিয়ে কাফিরদের দিকে নিক্ষেপ করে দোয়া করেন, شَاهَتِ الْوُجُوْهُ 'তাদের চোখে মুখে নিক্ষিপ্ত হোক।' এতে এরূপ অবস্থা হয়েছে যে, ঐ এক মুষ্ঠি বালি হাজার হাজার লোকের চোখে মুখে পড়ে সূচের মত বিদ্ধ হতে শুরু করে। তারা সকলেই চোখ মুখ মুছতে শুরু করে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট তাঁর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার অভিযোগ করেন। তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

فَأَمَرَهُ بِبَسْطِ ثَوْبِهِ وَغَرَفَ بِيَدِهِ فِيهِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِضَمِّهِ فَفَعَلَ فَمَا نَسِيَ شَيْئًا بَعْدُ،

–তোমার চাদরখানা বিছাও। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চাদরের উপর অঞ্জলী ভরে কি যেন তাতে রাখেন। তারপর বললেন, চাদরটি তোমার বুকে জড়িয়ে নাও। তিনি তাই করেন, এরপর থেকে তিনি কোনকিছু ভুলেননি।

স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা সম্পর্কে অনেক হাদিস বর্ণিত আছে। হযরত জারীর বিন আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট ঘোড়ার পিঠে বসতে না পাবার অভিযোগ করেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বুকের উপর হাত রেখে দোয়া করেন। এরপর তিনি আরবের মধ্যে বিখ্যাত অশ্বারোহী হয়ে যান।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আবদুর রহমান বিন জায়িদ বিন খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর মাথায় বাল্যকালে হাত বুলিয়ে দেন। তিনি অসুন্দর ছিলেন। কিন্তু হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র হাতের বরকতে তিনি অন্যান্য লোকের তুলনায় অধিক লম্বা ও সুন্দর হয়ে যান।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

مَا اَطْلَعَ عَلَيْهِ مِنَ الْغُيُوْبِ

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর গায়েবী সংবাদ দান

এ বিষয়ে অসংখ্য হাদিস বর্ণিত হয়েছে। যার পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। মহাসমুদ্রের মতো। যার গভীরতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। ঐ মহাসমুদ্রের পানি কোন দিন শেষ হওয়ার নয়। আর এ মু'জিযাসমূহ ঐ মু'জিযাসমূহের মতো যা অকাট্য দলীল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। আর ঐ সংবাদসমূহ ধারাবাহিক ভাবে বর্ণিত হয়েছে। কেননা এ বর্ণনাসমূহ ঐ বর্ণনাকারীদের বর্ণনার মতো সকলের ঐকমত্যে উপনীত হয়েছে। মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে সব গায়েবী বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন তন্মধ্য-

হযরত হোযাইফা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا فَمَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا حَدَّثَهُ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابِي هَؤُلَاءِ وَإِنَّهُ لَيَكُونُ منه الشيء فَأَعْرِفُهُ فَأَذْكُرُهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُل إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا رَآهُ عَرَفَهُ،

–একদা মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সংগঠিতব্য সব বিষয় বর্ণনা শুরু করেন। তিনি এর কিছুই বাদ দেননি। যাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে তারা সব কিছু স্মরণ রেখেছে। আর অনেকে তা ভুলে গেছে। নিশ্চয় আমার বন্ধুগণ সে বিষয় অবগত আছে। অবশ্য যখন কোন ঘটনা সম্মুখে আসে যার কথা আমি ভুলে গেছি তখন মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সে ভাষণ আমার স্মরণে আসে। যথা কোন ব্যক্তি অনেক দিন অনুপস্থিত থাকার পর সম্মুখে উপস্থিত হলে তাকে দেখা মাত্রই চেনা যায় যে, এই তো সেই অমুক ব্যক্তি।[১]

---

[১]. ক) মুসলিম : আস সহীহ, বাবু ইখবারিন্‌ নবী, ১৪:৭২, হাদিস নং : ৫১৪৭।
খ) আবু দাউদ : আস্‌ সুনান, বাবু যিকরিল ফিতন ওয়া দালায়িলিহা, ১১:৩১৪, হাদিস নং : ৩৭৯২।
গ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ফিতন, পৃ. ১৬৭, হাদিস নং : ৫৩৭৯।

অতঃপর হযরত হোযাইফা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন;

مَا أَدْرِي أَنَسِيَ أَصْحَابِي أَمْ تَنَاسَوْهُ وَاللهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَائِدِ فِتْنَةٍ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ الدُّنْيَا يَبْلُغُ مَنْ مَعَهُ ثَلَاثَمِائَةٍ فَصَاعِدًا إِلَّا قَدْ سَمَّاهُ لَنَا بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَقَبِيلَتِهِ،

–আল্লাহর শপথ! আমি জানিনা যে, আমার বন্ধুগণ কী প্রকৃতই ভুলে গেছেন? না কী না ভুলেও ভুলার ভান করেন? আল্লাহর শপথ করে বলছি। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন কোন বিষয় বাদ রাখেন নি; যা কিয়ামত পর্যন্ত প্রকাশ পাবে এবং তার সাথে উক্ত ফিতনা সৃষ্টিকারীদের সংখ্যা তিনশ বা ততোধিক পর্যন্ত পৌঁছবে। বরং তিনি আমাদের নিকট ঐ ব্যক্তির নাম, তার পিতার নাম, তার বংশ পরিচয়ও বর্ণনা করেছেন।[১]

হযরত আবু যর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

لَقَدْ تَرَكَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُحَرِّكُ طَائِرٌ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلَّا ذَكَّرَنَا مِنْهُ عِلْمًا،

–মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নিকট আকাশে বিহঙ্গের পাখা নাড়ার সংবাদও বাদ রাখেন নি। তিনি ছোট বড় সব বিষয়ে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন।[২]

সহীহ হাদিস বর্ণনাকারী ইমামগণ ঐ সমস্ত বিষয়ও উল্লেখ করেছেন। মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নিকট যা বর্ণনা করেছেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যেমন– তিনি শত্রুদের উপর বিজয়ী হওয়ার সংবাদ দেন। মক্কা, বাইতুল মুকাদ্দাস, ইয়ামান, সিরিয়া ও ইরাক বিজয় করার সংবাদ দেন। শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। হীরা থেকে মক্কা নগরী পর্যন্ত একজন নারী একাকী ভ্রমণ করবে, সে ভ্রমণে আল্লাহর ভয় ব্যতীত তার আর কোন ভয় থাকবে না।

---

[১]. ক) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু যিকরিল ফিতন ওয়া দালায়িলিহা, ১১:৩১৭, হাদিস নং : ৩৭০৫।
খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ফিতন, পৃ. ১৭০, হাদিস নং : ৫৩৯৩।

[২]. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু হাদিসী আবী যর, ৪৩:৩৬৫, হাদিস নং : ২০৩৯৯।

তিনি আরও বর্ণনা করেছেন, মদীনাতে যুদ্ধ হবে। খায়বার হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাতে পদাবনত হবে।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর উম্মাতকে সারা দুনিয়াতে বিজয়ী করবেন। দুনিয়াতে বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ তাদের হস্তগত হবে। মুসলমানগণ রোম ও পারস্য সম্রাটের ধনাগার বন্টন করে নেবে। তাদের মধ্যে ফিৎনা ও প্রবৃত্তির দাসত্ব নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেবে। তারা পূর্ববর্তী লোকদের রীতিনীতির অনুসারী হবে। আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। তাদের মধ্যে শুধুমাত্র একদল নাজাত পাবে।

আগামীদিনের মুসলমানগণ ধন-সম্পদের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। তাদের বিছানাসমূহ উন্নত ধরনের হবে। তাদের মধ্যে একদল লোক সকালের পরিহিত পোশাক বিকেলে পরিবর্তন করে ফেলবে। আহারের সময় এক বরতন তাদের সামনে রাখা হবে। অন্য বরতন তাদের সামনে থেকে উঠিয়ে নেয়া হবে।

তাদের বাসগৃহে কাবাগৃহের গিলাফের মতো উন্নত ধরনের পর্দা ঝুলানো হবে।

মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বর্ণনা করেছেন,

وَأَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ،

–তোমরা ঐ দিনের তুলনায় আজকের দিনে অনেক ভালো অবস্থায় আছো।

তিনি আরও বর্ণনা করেছেন, তখন তারা অহংকারে নিমজ্জিত হবে। রোম ও পারস্যের নারীগণ তাদের সেবক হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা সৃষ্টি করে দেবেন। তাদের মন্দলোকেরা ভাললোকদের উপর বিজয়ী হবে (মুসলমানদের উপর বিজয়ী হবে)। তুর্কী কাফির ও খাজরা কাফির ও রোমীয় কাফিরদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হবে। রোম সাম্রাজ্য ও পারস্য সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের অস্তিত্ব চিরদিনের জন্য পৃথিবী থেকে বিলীন হয়ে যাবে। কোন কায়সার ও কিসরা অবশিষ্ট থাকবে না।

তিনি আরও বর্ণনা করছেন, রোমীয়রা শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে।

তিনি আরও বর্ণনা করেছেন, নেককার লোক মৃত্যুবরণ করবে। মিথ্যার প্রচার ও প্রসার ঘটবে। ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে) উঠে যাবে। ফিতনা ও যুদ্ধ বিগ্রহ দেখা দেবে।

তিনি আরও বর্ণনা করেছেন,

وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ،

–আরববাসীদের জন্য আমার আক্ষেপ হয় যে, মন্দ তাদের নিকটবর্তী হয়েছে।

তিনি আরও বর্ণনা করেছেন,

وَأَنَّهُ زُوِيَتْ لَهُ الْأَرْضُ فَأُرِيَ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا،

–আল্লাহ তা'আলা আমার সামনে গোটা পৃথিবী এমনভাবে সংকুচিত করে দিয়েছেন যাতে আমি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তসমূহ স্বচক্ষে অবলোকন করি।

অর্থাৎ ঐ পর্যন্ত আপনার উম্মাতের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং পূর্বপ্রান্ত ভারত উপমহাদেশসহ সমগ্র পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমে তিনজা পর্যন্ত তাঁর উম্মাতের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যারপর আর জনবসতি নেই। এটা ঐ স্থান যেখানে ইতিপূর্বে আর কারও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। উত্তর ও দক্ষিণ এ ধরণের বিস্তৃত নয়।

তিনি আরও বর্ণনা করেছেন,

لَا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ،

–পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীগণ সর্বদা সত্যের উপর থাকবে। এ অবস্থায় অবশেষে একদিন মহাপ্রলয় সংগটিত হবে।[১]

ইবনে মাদানী বলেন, 'গরব' বা পশ্চিম বলতে আরববাসীকে বুঝানো হয়েছে। কেননা 'গরব' শব্দের অর্থ হল– বড় বালতি। আর বড় বালতি আরবরা পানি উঠানোর কাজে ব্যবহার করে।

অপর একদল আলেমদের অভিমতে– এর অর্থ হল পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী। আর হাদীসে পশ্চিম বা মাগরিব বলে তাদের কথা বলা হয়েছে।

অপর এক বর্ণনায় হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বর্ণনা করেছেন,

১. ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু কাওলিন নবী লা নাযালা তুয়িফান, ১০:৪৩, হাদিস নং : ৩৫৫১।
খ) আবু ইয়ালা : আল মুসনাদ, বাবু লা ইযালু আহলিল গুরবি, ২:২৫৯, হাদিস নং : ৭৫২।
গ) আবু নঈম ইস্পাহানী : মা'রিফাতুস্ সাহাবা, ১৮:৯০, হাদিস নং : ৫৬৩৬।

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَأَيْنَ هُمْ؟ قَالَ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ.

–আমার উম্মাদের একদল সর্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তারা শত্রুর উপর বিজয়ী হবে। এমতাবস্থায় কিয়ামত এসে যাবে। তারা ঐ অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে। সাহাবীগণ আরজ করেন, আপনার সে উম্মাত কোন স্থানে? তিনি বললেন, বায়তুল মুকাদ্দাসে।[১]

তিনি উমাইয়াদের ও হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর রাষ্ট্র পরিচালনার খবর দিয়েছেন। তিনি তাকে ওসীয়ত করেছেন।

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একথাও বর্ণনা করেছেন যে, উমাইয়া বংশধরগণ ইসলামী রাষ্ট্রের কোষাগারকে (বায়তুল মালকে) নিজেদের সম্পদ মনে করে যথেচ্ছা অপব্যয় করবে।

তিনি আরও বর্ণনা করেছেন, হযরত আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বংশধরগণ কালো পতাকা নিয়ে বের হবে এবং তাদের সাম্রাজ্য উমাইয়াদের সাম্রাজ্যের দ্বিগুণ হবে।

তিনি ইমাম মাহদী (আলাইহিস্ সালাম) আবির্ভাব হওয়া। তাঁর আহলে বাইত বংশধরদের শাহাদাত, হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর শাহাদাত লাভের সংবাদ দিয়ে বলেছেন, ঐ ব্যক্তি অতি দুর্ভাগা হবে যে তাঁর মাথা থেকে দাড়ি পর্যন্ত তাঁর রক্তে রঞ্জিত করবে। হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) জান্নাত ও জাহান্নাম বন্টনকারী হবেন। তিনি তাঁর বন্ধুদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং শত্রুদের জাহান্নামে ঠেলে দেবেন। সুতরাং তার দুশমন হলো খারেজী, নাসিবী, রাফিজী; তারা সকলে হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে এজন্য কাফির বলত যে (নাউযুবিল্লাহ) তিনি খিলাফতের দাবি পরিত্যাগ করলেন কেন?

তিনি পূর্বে বর্ণনা করেছেন যে,

يُقْتَلُ عُثْمَانُ وَهُوَ يَقْرَأُ الْمُصْحَفَ وَأَنَّ اللهَ عَسَى أَنْ يُلْبِسَهُ قَمِيصًا وَأَنَّهُمْ يُرِيدُونَ خَلْعَهُ وَأَنَّهُ سَيَقْطُرُ دَمُهُ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى (فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ)،

১. ক) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু হাদিসী আবী উমামা, ৪৫:৩৮১, হাদিস নং : ২১২৮৬।
খ) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ৭:১৫৭।

–হযরত ওসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতরত অবস্থায় শাহাদাত বরণ করবে। অনতিবিলম্বে আল্লাহ তা'আলা তাকে একটি জামা পরিধান করাবেন। (খিলাফতের অধিকারী করবেন) লোকেরা তা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে। আর তাঁর রক্ত পবিত্র কুরআন মাজীদের আয়াত فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ এ আয়াতের উপর পতিত হবে।

হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) জীবিত থাকা পর্যন্ত ফিতনা প্রকাশ পাবে না। তিনি হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও হযরত জোবায়ির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর মধ্যে সংঘঠিত যুদ্ধের খবর দিয়েছেন।

তিনি তাঁর সম্মানিত স্ত্রীকে দেখে হোবাবের কুকুরদের ঘেউ ঘেউ করার খবর দিয়েছেন। তাঁর চতুর্দিকে অসংখ্য লোক নিহত হওয়ার সংবাদ দিয়েছেন। কিন্তু সে নাজাত পেয়ে যাবে। যখন হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) উষ্ট্রের যুদ্ধে যোগদানের জন্য যাত্রা করেন তখন বসরাতে তাঁকে দেখে অসংখ্য কুকুর ঘেউ ঘেউ করেছে।

তিনি একদা হযরত আম্মার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে আম্মার! একদিন বিদ্রোহী দল তোমাকে হত্যা করবে। সেহেতু হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর দলের লোকজন তাঁকে হত্যা করে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সম্পর্কে বলেছেন,

وَيْلٌ لِلنَّاسِ مِنْكَ وَوَيْلٌ لَكَ مِنَ النَّاسِ،

–তোমার দ্বারা লোকজন কষ্ট পাবে, তুমিও তাদের দ্বারা কষ্ট ভোগ করবে।

তিনি কুজমান সম্পর্কে বলেছেন,

اَنَّهُ من أَهْلِ النَّارِ،

–সে জাহান্নামী হবে।

অথচ সে জীবনবাজি রেখে ধৈর্যের সাথে মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করে। অবশেষে সে আত্মহত্যা করে। এভাবে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

একদল সাহাবী যথা– হযরত আবু হোরায়রা, হযরত সামুরা ইবনে জুনদব, হযরত হোযাইফা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) প্রমুখ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন,

آخِرُكُمْ مَوْتًا فِي النَّارِ فَكَانَ بَعْضُهُمْ يَسْأَلُ عَنْ بَعْضٍ فَكَانَ سَمُرَةُ آخِرَهُمْ مَوْتًا هَرِمَ وخرف فاصطفى بِالنَّارِ فَاحْتَرَقَ فِيهَا،

–তোমাদের মধ্যে সর্বশেষে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি আগুনে পুড়ে মারা যাবে। তাঁরা তিনজন সাহাবী একে অপরকে একথা সর্বদা জিজ্ঞেস করতেন। সুতরাং তাঁদের মধ্যে সবার শেষে হযরত সামুরা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর মৃত্যু হয়। তিনি অতিবৃদ্ধ হওয়ার কারণে তাঁর স্মৃতিশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যায়। ফলে একদিন তিনি আগুন দিয়ে সেকা দেয়া অবস্থায় পুড়ে মৃত্যুবরণ করেন।

হযরত হানযালা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে ফিরিশতাদের গোসল দিতে দেখে বললেন,

سَلُوا زَوْجَتَهُ عنه فابى رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ تُغَسِّلُهُ فَسَأَلُوهَا فَقَالَتْ إِنَّهُ خَرَجَ جُنُبًا وَأَعْجَلَهُ الْحَالُ عَنِ الْغُسْلِ،

–তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করো, শহীদ হবার পর তাঁকে ফিরিশতারা গোসল দিচ্ছে কেন? আমি তাকে ফিরিশতাদের গোসল দিতে দেখেছি।

সাহাবীগণ তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হযরত হানযালা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) অপবিত্র অবস্থায় জিহাদে যোগদান করেন। তাড়াতাড়ি জিহাদে যোগদান করার কারণে তিনি ফরয গোসল করার সুযোগ পাননি।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

وَوَجَدْنَا رَأْسَهُ يَقْطُرُ مَاءً.

–আমরা তাঁর মাথা থেকে পানির ফোঁটা পড়তে দেখেছি।[১]

---

[১]. হযরত হানযালা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যে দিন বিবাহ করেন সেদিন মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওহুদের যুদ্ধে যোগদানের ঘোষণা দেন। হযরত হানযালা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নব বিবাহিতা স্ত্রী জামিলা বিনতে আবি মাতলুলের সাথের বাসর রাত যাপন করেন। প্রত্যুষে মুজাহিদ বাহিনী উহুদ যুদ্ধে যাত্রা করে। তাই হযরত হানযালা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ফরয গোসল না করে মুজাহিদ বাহিনীর সাথে যাত্রা করেন। যাতে তিনি মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে যোগদানে বঞ্চিত না হন। আর ঐ অবস্থায় তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তাই মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

তিনি আরও বর্ণনা করেছেন,

اَلْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشٍ وَلَنْ يَزَالَ هَذَا الأَمرِ فِي قُرَيْشٍ مَا أَقَامُوا الدِّينَ،

–খিলাফত কুরাইশদের হাতে থাকবে। যতদিন কুরাইশরা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত রাখবে, ততদিন খিলাফত তাদের হাতে থাকবে। বাস্তবে হয়েছেও তাই।

তিনি আরও বর্ণনা করেছেন,

يَكُون فِي ثَقِيفٍ كَذَّابٌ وَمُبِيرٌ فَرَأَوْهُمَا الْحَجَّاجُ وَالْمُخْتَارُ،

–বনী সাকীফদের মধ্যে মিথ্যাবাদী ও অত্যাচারীর আবির্ভাব হবে। তাদের মধ্যে লোকজন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সাকাফী ও মুখতার সাকাফীকে দেখেছে।

তিনি আরও বর্ণনা করেছেন,

وَأَن مُسَيْلِمَةَ يَعْقِرُهُ اللهُ،

–আল্লাহ তা'আলা মিথ্যাবাদী মুসায়লামাকে নিহত করবেন এবং হয়েছেও তাই।

তিনি আরও বর্ণনা করেছেন,

وَأَنَّ فَاطِمَةَ أَوَّلُ أَهْلِهِ لُحُوقًا بِهِ،

–তাঁর আহলে বায়তের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত ফাতেমা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর সাথে মিলিত হবেন।

সুতরাং তাঁর ইনতিকালের ছয়মাস পর হযরত ফাতেমা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইনতিকাল করেন।

অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে, একশ দিন পর হযরত ফাতেমা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ইনতিকাল হয়েছে।

তিনি মুরতাদ অর্থাৎ ধর্মত্যাগীদের ফিতনার ব্যাপারে ভয় দেখিয়েছেন। তাঁর ইনতিকালের পর আরবের বহু গোত্র ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়। তারা যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি জানায়।

ওয়াসাল্লাম) তাকে ফিরিশতাদের গোসল করাতে দেখেন। তিনি বললেন, তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করো। পরে জানা যায় যে তিনি ফরয গোসল না করে জিহাদে যোগদান করেছিলেন।

তিনি আরও বর্ণনা করেছেন, তাঁর পর খিলাফত ত্রিশ বছর থাকবে। তারপর রাজতন্ত্রের হবে। সেহেতু হযরত হাসান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর খিলাফতের ছয় মাস সময় যোগ করলে ত্রিশ পূর্ণ হয়।

তিনি আরও বর্ণনা করেছেন,

إِنَّ هَذَا لأَمْرُ بَدَأَ نُبُوَّةً وَرَحْمَةً ثُمَّ يَكُونُ رَحْمَةً وَخِلَافَةً ثُمَّ يَكُونُ مُلْكًا عَضُوضًا ثُمَّ يَكُونُ عُتُوًّا وَجَبَرُوتًا وَفَسَادًا فِي الأُمَّةِ،

–এ কাজ নবুওয়াত ও রহমতের সাথে শুরু হয়েছে। তারপরও রহমত ও খিলাফত বিদ্যমান থাকবে। কিন্তু তারপর রাজ্যে অত্যাচার নির্যাতন দেখা দেবে। তার পরে উম্মাতের মধ্যে ফিতনা ফাসাদের আবির্ভাব ঘটবে।

তিনি হযরত ওয়াইস করনী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কথাও বর্ণনা করেছেন।[১]

---

[১]. করণ এক গোত্রের নাম। হযরত ওয়াইস কারণী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উক্ত গোত্রের অধিবাসী। তিনি আকৃত্রিম আশেকে রাসূল ছিলেন। তিনি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যুগ পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর বৃদ্ধা মায়ের সেবা যত্ন করার আর কেউ ছিলনা। তাই মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে দরবারে নববীতে আসতে নিষেধ করেন। এ কারণে তিনি মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে সাক্ষাত করতে পারেননি। কিন্তু মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ইনতিকালের পূর্বে হযরত উমর ও হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট তাঁর নিদর্শন উল্লেখ করেছেন। তাঁর পিঠে এক সিকি পরিমাণ শ্বেতের সাদা দাগ থাকবে। যদি তোমরা তাঁর সাক্ষাত লাভ করার সুযোগ পাও, তাহলে তাঁর দ্বারা তোমাদের মাগফিরাতের দোয়া করাবে। কেননা তিনি এমন এক উচ্চস্তরের লোক। যদি তিনি কোন বিষয়ে আল্লাহ তা'আলাকে কসম দেন তা হলে মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য তার কসম পুরো করা জরুরী হয়ে যায়।

হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইহজগত ত্যাগের বছর হজ্বের সময় করণবাসী লোকদের জিজ্ঞেস করেন যে, ওয়াইস নামক ব্যক্তি এ বছর হজ্ব পালনের জন্য এসেছে কি? করণবাসী লোকজন বললেন, হ্যাঁ এসেছে। তবে তিনি আরাফাতের মাঠে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আমাদের জীবজন্তু চরাচ্ছেন। একথা শুনে হযরত উমর ও হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে দিয়ে নিজেদের মাগফিরাতের দোয়া করান।

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত ওয়াইস করণী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, কিয়ামতের মাঠে বেহেশতিদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করার নির্দেশ দেয়া হবে। আর ওয়াইস কারণীকে বলা হবে তুমি অপেক্ষা করো এবং রবীয়া ও মোদার গোত্রের গুনাহগার লোকদের জন্য শাফায়াত করো। তাঁর শাফায়াতে ঐ গোত্রের লোকজন বেহেশতে প্রবেশ করবে।

বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, ৩৭ হিজরীতে সিফফিনের যুদ্ধে হযরত ওয়াইস কারণী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর পক্ষে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন। তিনি অতি উচ্চ স্তরের তাবি'ঈ ছিলেন। (নাসীমুর রিয়াজ,খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৭৩)।

তিনি আরও বর্ণনা করেছেন,

ثَلَاثُونَ دَجَّالًا كَذَّابًا أَحَدُهُم الدَّجَّالُ الْكَذَّابُ كُلُّهُمْ يَكْذِبُ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ،

–আমার উম্মাতের মধ্যে ৩০ জন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। (মিথ্যাবাদী ভণ্ড নবুওয়াতের দাবিদারের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যেমন– আমাদের যুগে মির্জা গোলাম মুহাম্মদ কাদিয়ানীর আবির্ভাব হয়েছে। সে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবি করে লক্ষ লক্ষ মুসলমানদের পথভ্রষ্ট করেছে)।[১]

তিনি আরও বর্ণনা করেছেন,

يُوشِكُ أَنْ يَكْثُرَ فِيكُمُ الْعَجَمُ يَأْكُلُونَ فَيْئَكُمْ وَيَضْرِبُونَ رِقَابَكُمْ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَسُوقَ النَّاسَ بِعَصَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ،

–অনতিবিলম্বে তোমাদের মধ্যে অনারব লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। তারা তোমাদের ধনসম্পদ ও গনীমতের মাল ভক্ষণ করবে এবং তোমাদের হত্যা করবে।[২]

তিনি আরও বর্ণনা করেছেন, ঐ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যে যাবত না কাহতান গোত্রের একজন লোক লাঠি দিয়ে তোমাদেরকে হাঁকিয়ে না নেবে।[৩]

তিনি আরও বর্ণনা করেছেন,

خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الذى يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ قَوْمٌ يشهون وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ،

[১]. বায়হাকী : মা'রিফাতিস্ সুনান ওয়াল আসার, বাবা কাইফা ইউসাল্লি ফীল খুসূফ, ৫:৪৪১, হাদিস : ২০৩১।

[২]. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু যিকরিল কহতান, ১১:৩৪১, হাদিস নং : ৩২৫৬।
খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু লা তাকুমুস্ সা'আতু, ১৪:১১৯, হাদিস নং : ৫১৮২।
গ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ফিতন, ৩:১৭৫, হাদিস নং : ৫৪১৫।
আরববাসীদের শেষ সময়ের প্রতি ইঙ্গিত করেন। যখন ইরানী ও তুর্কীরা প্রবল আকার ধারণ করে। তাতারীগণ আরববাসীদের অসংখ্য লোক হত্যা করে পৃথিবী থেকে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। তাদের ধন সম্পদ লুন্ঠন করে নারী ও শিশুদের বন্দী করে নিয়ে যায়।

[৩]. কাহতান ইয়ামানের সবচেয়ে প্রাচীন ও শক্তিশালী গোত্র। লাঠি দিয়ে তাড়ানোর অর্থ হল পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

–যুগ হিসেবে সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ। এরপর তাদের পরবর্তী যুগ, এরপর তাদের পরবর্তী যুগ। এরপর এমন এক সময় আসবে তারা সাক্ষ্য দেবে। অথচ তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। তারা আমানতের খিয়ানত করবে। আমানতদারী বা বিশ্বস্ততা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তারা জনগণের উপর অত্যাচার নিপীড়ন করবে। কারও প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেনা। তাদের দৈহিক আকৃতি অনেক মোটা হবে। তারা বিলাসবহুল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হবে।[১]

তিনি আরও বর্ণনা করেছেন,

لَا يَأْتِي زَمَانٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ، هَلَاكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ أُغَيْلِمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ.

–আমার পরবর্তী যুগ অত্যন্ত মন্দ হবে। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন, আমার উম্মাতের ধ্বংস এক কুরাইশ নবযুবকের হাতে হবে।[২]

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এ হাদীসের বর্ণনাকারী। তিনি বলেন,

لَوْ شِئْتُ سَمَّيْتُهُمْ لَكُمْ بَنُو فُلَانٍ وَبَنُو فلان،

–আমি ইচ্ছে করলে তাদের নাম ও তাদের পিতার নাম তোমাদেরকে বলে দিতে পারি।

তিনি কদরিয়া ও রাফিজীদের আত্মপ্রকাশের সংবাদ দিয়েছেন। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন, আমার উম্মাতের পূর্ববর্তী লোকজন পরবর্তী লোকদেরকে গালি দেবে।

তিনি আরও বর্ণনা করেছেন,

وَقِلَّةِ الْأَنْصَارِ حَتَّى يَكُونُوا كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ فَلَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ يَتَبَدَّدُ حَتَّى لَمْ يَبْقَ لَهُمْ جَمَاعَةٌ، وَأَنَّهُمْ سَيَلْقَوْنَ بَعْدَهُ أَثَرَةً،

[১]. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু লা ইয়াশহাদু আলাশ্ শাহাদাত, ৭:১৩২, হাদিস নং : ২৪৫৭।
খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ফযলিস্ সাহাবা, ১৩:২৬০, হাদিস নং : ৪৬০৩।
গ) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবুল ওয়াফা বিন্ নযর, ১২:১৩২, হাদিস নং : ৩৭৪৯।

[২]. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু লা ইয়াতিয্ যামানু, ৩১:৪৫৭, হাদিস নং : ৬৫৪১।
খ) তিরমিযী : আস্ সুনান, ৮:১৩৫, হাদিস নং : ২১৩২।
ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আনাস ইবনে মালেক, ২৪:৪৪৩, হাদিস : ১১৮৯৭।

–আনসারদের সংখ্যা অনেক কমে যাবে। যেমনটি খাদ্যের মধ্যে লবণের পরিমাণের মতো হবে। তাদের ব্যাপারে সর্বদা মতবিরোধ দেখা দেবে। এমনকি একদিন তাদের আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। আর আমার পর আনসারগণ এভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

তিনি খারেজীদের অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন। তিনি খারেজীদের নিদর্শন বর্ণনা করেছেন,

وَالْمُخَدَّجِ الَّذِي فِيهِمْ وَأَنَّ سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقَ وَتَرَى رِعَاةَ الْغَنَمِ رُؤُسَ النَّاسِ وَالْعُرَاةِ الْحُفَاءِ يَتَبَارُونَ فِي الْبُنْيَانِ وَأَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا،

–তাদের মধ্যে দুশ্চরিত্র লোকের[১] আবির্ভাব হবে। তারা মাথামুণ্ডনকারী হবে। প্রকৃতপক্ষে তাদের অবস্থাও হয়েছে তাই। বকরীর রাখাল (নিম্নস্তরের লোকজন) সমাজের নেতা হবে। সমাজের নিচুস্তরের লোকজন সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করবে। বাঁদীর গর্ভে রবর জন্ম হবে। (অর্থাৎ সমাজে মায়ের স্থান দাসী বাঁদীর মতো হবে।)

তিনি আরও বর্ণনা করেছেন,

وَأَنَّ قُرَيْشًا وَالْأَحْزَابَ لَا يَغْزُونَهُ أَبَدًا وَأَنَّهُ هُوَ يَغْزُوهُمْ، وَأَخْبَرَ بِالْمُوتَانِ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَ فَتْحِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ،

–কুরাইশ কাফিররা এখন আমার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে না। বরং আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব। সুতরাং তিনি মক্কা নগরী আক্রমণ করে তা বিজয় করেন। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ের পর প্লেগ মহামারীর খবর দিয়েছেন।

সুতরাং হযরত ওসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর খিলাফতকালে প্লেগ মহামারী দেখা দেয়। তাতে সত্তর হাজার লোক মারা যায়। তিনি বসরাবাসীদের সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছেন যে, সেখানে ভূমিকম্প হবে। আকাশ থেকে

[১]. সেই দুশ্চরিত্র ব্যক্তির নাম হলো জুলখোয়াইসারা। হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর খিলাফতকালে সে খারেজি দলের নেতা হয়। তার সাথে হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধশেষে হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, তাদের নেতার লাশ খোজ করো। লাশ খোজে বের করার পর হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তার জামা ছিড়ে ফেলার নির্দেশ দেন। জামা ছিড়ে ফেলার পর দেখা যায় যে, তার একবাহু স্ত্রীলোকের স্তনের মতো। এ অবস্থা দেখে তিনি সিজদায় পতিত হয়ে বললেন, আল্লাহর শোকর! আমার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

পাথর বৃষ্টি বর্ষিত হবে। বিভিন্ন স্থানে ভূমিধ্বস হবে। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তা হয়েছে।

বসরার অধিবাসীদের সম্পর্কে বলেছেন,

أَنَّهُمْ يَغْزُونَ فِي الْبَحْرِ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ،

–তারা সমুদ্রের মধ্যে এমনভাবে লড়াই করবে যেমন বাদশাহ সিংহাসনে বসে আছেন। (অর্থাৎ মুসলমানগণ সমুদ্রের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করবে।)

তিনি আরও বর্ণনা করেছেন,

وَأَنَّ الدِّينَ لَوْ كَانَ مَنُوطًا بِالثُّرَيَّا لنا له رِجَالٌ من أَبْنَاءِ فَارِسَ وَهَاجَت رِيحٌ فِي غَزَاتِهِ فَقَالَ هَاجَتْ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ وَجَدُوا ذَلِكَ،

–ঈমান যদি সুরাইয়া নক্ষত্রেও উঠে যায় তবুও পারস্যবাসী লোকজন সেখান থেকে তা নিয়ে আসবে।[১] তিনি একবার এক জিহাদে যাত্রা করেন। তখন ভীষণ ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হয়। তখন তিনি এরশাদ করেন, এ হাওয়া এক মুনাফিকের মৃত্যুর কারণে প্রবাহিত হচ্ছে। সুতরাং মুসলমানগণ মদীনাতে পৌঁছে এক মুনাফিকের মৃতদেহ দেখতে পায়। (সে ইহুদী ছিল। মুসলমান হিসেবে সে মুসলমানদের দলে যোগদান করত।)

একদিন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবীদের মাঝে উপস্থিত হয়ে বললেন,

ضِرْسُ أَحَدِكُمْ فِي النَّارِ أَعْظَمُ من أُحُدٍ،

–তোমাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তির দাড়ি দোযখে ওহুদ পাহাড়ের সমান হবে।

[১]. হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। যখন সূরা জুমা অবতীর্ণ হয় তখন অন্যান্য সাহাবীদের সাথে হযরত সালমান ফারসী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)ও উপস্থিত ছিলেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন হযরত সালমান ফারসী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর প্রতি ইংগিত করে বললেন, তাঁর সম্প্রদায়ের লোক ঈমান সম্পর্কিত বিষয় সুরাইয়া নক্ষত্রের নিকট থেকে নিয়ে আসবে। সুতরাং তা ঐতিহাসিকভাবে বাস্তবে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। পারস্যে অধিকাংশ সম্মানিত হাদীস বিশারদ ও সূফীবাদী জ্ঞানী-গুণীদের আবির্ভাব হয়েছে এবং তারা ইসলামের খিদমতে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হলেন, ইমামে আ'যম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

فَذَهَبَ الْقَوْمُ يَعْنِي مَاتُوا وَبَقِيتُ أَنَا وَرَجُلٌ فَقُتِلَ مُرْتَدًا يَوْمَ الْيَمَامَةِ، وَأَعْلَمَ بِالَّذِي غَلَّ خَرَزًا من خَرَزِ يَهُودَ فَوُجِدَتْ فِي رَحْلِهِ،

–আমি এ ব্যাপারে ভীষণ চিন্তিত ছিলাম যে, তাদের মধ্যে প্রায় সকলে ইহজগত ত্যাগ করেন। আমি ও অপর এক ব্যক্তি ব্যতীত আর কেউ জীবিত নেই। অবশেষে সে দ্বিতীয় ব্যক্তি ইয়ামামার যুদ্ধে ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বর্ণনা করেছেন যে, অমুক ব্যক্তি ইহুদীদের পেয়ালা চুরি করেছে। মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্যে ঐ পেয়ালা পাওয়া যায়।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ ব্যক্তিরও সংবাদ দিয়েছেন যে,

وَبِالَّذِي غَلَّ الشَّمْلَةَ وَحَيْثُ هِيَ،

–সে দুম্বা চুরি করেছে একই সাথে তার বাসস্থানের কথাও বলেন।

একবার তাঁর এক উট হারিয়ে যায়। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হারানো উট সম্পর্কে এমন পর্যন্ত বলেছেন যে,

وَنَاقَتُهُ حِينَ ضَلَّتْ وَكَيْفَ تَعَلَّقَتْ بِالشَّجَرَةِ بِخِطَامِهَا،

–তার লাগামের রশি অমুক স্থানে এক গাছের সাথে এভাবে জড়িয়ে আছে।

হযরত হাতিব বিন আবু বালতা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে গোপনীয়ভাবে কুরাইশদের নিকট পত্র লেখেন। (তিনি পত্রে উল্লেখ করেছেন যে, মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কা আক্রমণ করতে পারেন।) তিনি মক্কাবাসীদের নিকট পত্র লিখেছেন। মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সে বিষয়েও খবর দিয়েছেন।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উমাইর ও সাফওয়ানের বিষয়েও খবর দিয়েছেন। তারা উভয় গোপনে পরামর্শ করেছে এ শর্তে যে, সে মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে শহীদ করে ফেলবে। উমাইর তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে মদীনাতে পৌঁছে মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর

খেদমতে উপস্থিত হয়। তখন মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের উভয়ের গোপন পরামর্শের কথা বলে দেয়ার পর উমাইর মুসলমান হয়ে যায়।[১]

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ মালের খবরও দিয়েছেন, যা তাঁর চাচা হযরত আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বদর যুদ্ধে যোগদানের পূর্বে স্বীয় স্ত্রী উম্মুল ফজলের নিকট রেখে যান। যখন মুক্তিপণ নিয়ে আলোচনা হয়। তখন হযরত আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন,আমার নিকট কোন ধনসম্পদ নেই। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ সম্পদের কথা বলেন, যা তিনি উম্মুল ফযলের নিকট রেখে যান। হযরত আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) একথা শুনে বলেন, ঐ মালের কথা আমি ও আমার স্ত্রী ব্যতীত আর কেউ অবগত নয়। এরপর হযরত আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইসলাম গ্রহণ করেন।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ বিষয়ে খবর দেন যে, অচিরেই উমাইয়া ইবনে খলফ নিহত হবে। আর সে মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রদত্ত সংবাদ অনুযায়ী নিহত হয়।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উতবা ইবনে আবু লাহাব সম্পর্কে বলেছেন যে,

أَنَّهُ يَأْكُلُهُ كَلْبٌ من كِلَابِ الله،

–আল্লাহর কোন এক কুকুর তাকে ভক্ষণ করবে। কোন এক সফরে তাকে বাঘে খেয়ে ফেলে।

---

[১]. উক্ত ঘটনার বিবরণ বায়হাকী, তাবরানী ও ইবনে ইসহাক বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। বদরের যুদ্ধে সাফওয়ানের পিতা উমাইয়া নিহত হয়। একদিন সাফওয়ান ও উমাইর 'হাজার' নামক স্থানে বসে বদরের যুদ্ধে নিহতদের কথা স্মরণ করে। তখন উমাইর বললো, যদি আমি ঋণ ও পরিবার পরিজনের দায়িত্ব মুক্ত হতাম, তাহলে আমি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে হত্যা করে বদরের যুদ্ধে নিহতদের প্রতিশোধ গ্রহণ করতাম। একথা শুনে সাফওয়ান উত্তেজিত হয়ে বললো, উমাইর আমি তোমার ঋণ ও পরিবার পরিজনের জিম্মাদার হবো। যাও তুমি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে হত্যা করে ফেলো। উমাইর স্বীয় তরবারী বিষাক্ত করে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে হত্যার উদ্দেশ্যে মদীনাতে পৌঁছে মসজিদে নববীর দরজায় গিয়ে বসে। হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে খবর দেন। তিনি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি উদ্দেশ্যে এসেছো? প্রত্যুত্তরে সে বলল, যুদ্ধবন্দীদের খোঁজ খবর জানার উদ্দেশ্যে এসেছি। তখন মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার সাথে 'হাজার' নামক স্থানে সাফওয়ানের গোপন ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করে দেন। উমাইর এ কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে তাৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করে। মক্কা বিজয়ের পর সাফওয়ান পলায়ন করে। কিন্তু পরে যখন সে জানতে পারে যে, মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। তখন সে মক্কা এসে ইসলাম গ্রহণ করে।

তিনি পূর্ব থেকেই স্থানসমূহ নির্দিষ্ট করে দেন যে, বদরের যুদ্ধে অমুক কুরাইশ এ স্থানে নিহত হবে। তিনি যা বর্ণনা করেছেন বাস্তবে তাই হয়েছে।

তিনি হযরত ইমাম হাসান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সম্পর্কে বলেছেন,

إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَسَيُصْلِحُ اللهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ،

–আমার এ পুত্র সর্দার হবে। মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বারা অতি শীঘ্র দু'দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করাবেন।[১]

হযরত সা'দ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সম্পর্কে বলেছেন,

لَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيَسْتَضِرَّ بِكَ آخَرُونَ،

–আশা করা যায় তুমি দীর্ঘদিন জীবিত থাকবে। আর তোমার দ্বারা একদল মুসলমান উপকৃত হবে এবং একদল কাফির ক্ষতিগ্রস্থ হবে।[২]

তিনি মূতার যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারীদের বিষয় সেদিনই বর্ণনা করেছেন যেদিন তাঁরা শাহাদাতবরণ করেন। অথচ তাঁর ও যুদ্ধক্ষেত্রের ব্যবধান ছিলো এক মাসের দূরত্বের সমান। অনুরূপ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেদিন আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাসীর মৃত্যু হয়েছে, সেদিনই সাহাবীদের তার মৃত্যুর সংবাদ দেন। অনুরূপভাবে কায়সারের দূত ফিরোজকে বললেন, আজ কায়সারের মৃত্যু হয়েছে। ফিরোজ ঐ সংবাদের সত্যতা যাচাই করার পর যখন সংবাদ সত্য প্রমাণিত হয় তখন মুসলমান হয়ে যায়।

তিনি হযরত আবু যর গিফারী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর মদিনা ত্যাগের সংবাদ দিয়েছেন। যখন তিনি একাকী মসজিদে শুয়ে ছিলেন। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْهُ قَالَ أَسْكُنُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ قَالَ فَإِذَا أُخْرِجْتَ مِنْهُ،

[১]. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মানাকিবিল হাসান ওয়াল হুসাইন, ১২:২৪৩, হাদিস নং : ৩৭০৬।
খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৪১:৪০৩, হাদিস নং : ১৯৫৫০।
হযরত হাসান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হযরত মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথে সন্ধি স্থাপন করার কারণে দীর্ঘ যুদ্ধের অবসান হয়।

[২]. হযরত সা'দ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মক্কাতে ভীষণ অসুস্থ হন। এমনকি তিনি জীবনের আশা ত্যাগ করে সমস্ত ধন সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় সাদকা করার ইচ্ছা করেন। ঐ সময় মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে দেখার উদ্দেশ্যে আগমন করে বলেন, এরূপ হবে। বাস্তবে তাই হয়েছে। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেন এবং ইরানের অধিকাংশ এলাকা তার হাতে বিজয় হয়। এভাবে মুসলমান উপকৃত হয়েছে। আর কাফিররা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

–তখন তোমার কী অবস্থা হবে? যখন তোমাকে এ স্থান থেকে বের করে দেয়া হবে। তিনি বললেন,আমি মসজিদে হারামে গিয়ে অবস্থান করবো। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমাকে সেখান থেকেও বের হয়ে যেতে হবে। তুমি একাকী থাকবে আর একাকী তোমার মৃত্যু হবে।

মোল্লা আলী কারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একথাও বলেছেন, তুমি একাকী কিয়ামতের মাঠে উপস্থিত হবে।[১]

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও ইরশাদ করেছেন,

أَنَّ أَسْرَعَ أَزْوَاجِهِ بِهِ لُحُوقًا أَطْوَلُهُنَّ يَدًا فَكَانَتْ زَيْنَبُ لِطُولِ يَدِهَا بِالصَّدَقَةِ،

–আমার স্ত্রীদের মধ্যে সর্বপ্রথম দীর্ঘ হাতের অধিকারিনী আমার সাথে মিলিত হবেন। হযরত যয়নাব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) অতিরিক্ত দান খায়রাত করার কারণে তাঁর উপাধী ছিলো দীর্ঘ হাতের অধিকারিনী।

উম্মুহাতুল মু'মিনীনদের মধ্যে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ইনতিকালের পর সর্বপ্রথম তিনি ইহজগত ত্যাগ করেন।

[১]. হযরত ওসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর খিলাফতকালে হযরত আবু যর গিফারী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সিরিয়ায় চলে যান। সেখানে তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর অভিমতের বিরোধিতা শুরু করেন। তিনি ধনসম্পদ জমা রাখার ঘোর বিরোধী ছিলেন। সেহেতু তিনি দোকানে প্রবেশ করে মালামাল বাইরে নিক্ষেপ করে ফেলে দিয়ে জনগণকে তা নিয়ে যেতে বলতেন। হযরত ওসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাকে রাবাজা নামক স্থানে পাঠিয়ে দেন। সেখানে হযরত আবু যর গিফারী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইহজগত ত্যাগ করেন। ইহজগত ত্যাগের সময় তাঁর স্ত্রী হযরত মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট অভিযোগ করলে; তিনি তাঁকে মদীনাতে নিয়ে আসেন এবং পরবর্তী সময় তাকে মদীনার অনতিদূরে আনা হয়। এখন কী অবস্থা হবে? কাফন কোন স্থান থেকে সংগ্রহ করা হবে। জানাযার নামায কে পড়াবে? দাফন করবে কে? হযরত আবু যর গিফারী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, তোমার চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই। আমার দাফন কাফনের ব্যবস্থা এমনিতে হয়ে যাবে। সে অনুযায়ী গোসলের পর তার মৃত দেহ তাবুর সামনে রেখে দেয়া হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তখন একদল লোক নিয়ে সে স্থান দিয়ে যাচ্ছেন। তারা হযরত আবু যর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর স্ত্রীর কান্নার শব্দ শুনে যাত্রা বিরতি করেন। তিনি তাঁর এক সাথীর চাদর দিয়ে কাফনের ব্যবস্থা করে জানাযার নামায পড়ে দাফনের ব্যবস্থা করেন। বারাজা নামক স্থানটি অদ্যাবদি অনাবাদী পড়ে আছে। সেখানে হযরত আবু যর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সমাধি ব্যতীত অন্য কারো কবর নেই। তাই তিনি কিয়ামতের দিন উক্ত স্থান থেকে একাকী উঠবেন।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় দৌহিত্র ইমাম হোসাইন (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কারবালায় 'তফ' নামক স্থানে শাহাদাত বরণ করার পূর্ব সংবাদ দান করেন। তিনি স্বীয় হাত থেকে মাটি বের করে বললেন,

فِيهَا مَضْجَعُهُ

–এ মাটি ঐ স্থানের যে স্থানে তাকে দাফন করা হবে।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত সূহান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সম্পর্কে বলেছেন,

يَسْبِقُهُ عُضْوٌ مِنْهُ إِلَى الْجَنَّةِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ فِي الْجِهَادِ،

–তার দেহের এক অংশ তার পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবে। সেহেতু যুদ্ধে তাঁর এক হাত প্রথমে কাটা যায়।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হেরা পর্বতকে কাঁপতে দেখে বললেন,

اثْبُتْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ،

–স্থির হও। কেননা এ মুহূর্তে তোমার উপর একজন নবী, একজন ছিদ্দিক ও শহীদগণ অবস্থান করছে। সে সময় তাঁর সাথে হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত ওসমান, হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত জোবায়ের, হযরত সাদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) প্রমুখ সাহাবীগণ উপস্থিত ছিলেন।[১]

সুতরাং প্রথমে উল্লেখিত সকলে শহীদ হন। আর হযরত সা'দ (রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু) বর্শার আঘাতে আহত হন।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত সুরাকা বিন জুশাম (রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু) সম্পর্কে বলেছেন,

كَيْفَ بِكَ إِذَا لَبِسْتَ سُوَارَيْ كِسْرَى فَلَمَّا أُتِيَ بِهِمَا عُمَرُ أَلْبَسَهُمَا إِيَّاهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي سَلَبَهُمَا كِسْرَى وَأَلْبَسَهُمَا سُرَاقَةَ،

–তখন তোমার কি অবস্থা হবে যখন তোমার হাতে পারস্য সম্রাট কিসরার কংকন পরানো হবে। পরবর্তী সময় ইরান জয় করার পর

[১]. ক) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবু ফাযায়িলি আবী বকর, ৭:৩০৬।
খ) তায়ালসী : আল মুসনাদ, বাবু মা রুবিয়া আনহু কাতাদাহ, ৩:৪৮৪, হাদিস নং : ২০৯৭।

গণীমতের মালের সাথে কিসরার কঙ্কন মদীনাতে পাঠানো হয়। তখন হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হযরত সুরাকা (রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু) এর হাতে কিসরার কঙ্কন পরিয়ে দিয়ে বলেন, মহান আল্লাহরই প্রশংসা করছি, যিনি কিসরার কঙ্কন ছিনিয়ে নিয়ে সুরাকার হাতে পরিধান করিয়েছেন।[১]

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একথাও বলেছেন যে,

تُبْنَى مَدِينَةٌ بَيْنَ دِجْلَةَ وَدُجَيْلٍ وَقُطْرُبُّلَ وَالصَّرَاةِ تُجْبَى إِلَيْهَا خَزَائِنُ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِهَا يَعْنِي بَغْدَادَ،

–দজলা, ফোরাত ও কুতরুবুল এর মধ্যবর্তী স্থানে শহর নির্মিত হবে। সে শহর অভিমুখে পৃথিবীর ধন সম্পদ আনা হবে। বাগদাদ নগরী সম্পর্কে এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এস্থানে ভূমি ধ্বসের কথাও বলেছেন। (কিয়ামতের পূর্বে তা সংঘটিত হবে।)

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একথাও বলেছেন,

سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْوَلِيدُ هُوَ شَرٌّ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ مِن فِرْعَوْنَ لِقَوْمِهِ،

–অতিশীঘ্র এ উম্মাতের মধ্যে এক ব্যক্তির জন্ম হবে, তার নাম হবে ওয়ালিদ। সে এ জাতির জন্য ফিরাউন থেকেও নিকৃষ্ট প্রমাণিত হবে।[২]

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একথাও বলেছেন,

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ،

–ওই পর্যন্ত কিয়ামত হবে না যে পর্যন্ত দু'দল লোক যুদ্ধে লিপ্ত না হবে। তাদের উভয়ের দাবী হবে একই।

[১]. পুরুষদের মধ্যে দুনিয়াতে স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম। কিন্তু মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত সুরাকা (রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, সে স্বর্ণের কংকন পরিধান করবে। এ কারণে তাঁর হাতে স্বর্ণের কংকন পরিয়ে দেয়া হয়। এতে একথা স্পষ্ট প্রমানিত হয়েছে যে, মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হালাল ও হারামের মালিক।
[২]. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু আউয়ালু মুসনাদি উমর ইবনুল খত্তাব, ১:১০৮, হাদিস নং : ১০৪।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে হযরত সোহায়েল বিন আমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সম্পর্কে বলেছেন,

عَسى أَنْ يَقُومَ مَقَامًا يَسُرُّكَ يَا عُمَرُ،

–হে উমর! অতিশীঘ্র সে এমন এক স্থানে দাঁড়াবে যা দেখে তোমার অন্তর হর্ষোৎফুল্ল হয়ে যাবে।[১]

যথা– হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইহজগত ত্যাগের খবর মক্কায় পৌছার পর হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যেরূপ ভাষণ দান করেন তিনিও ঠিক অনুরূপ ভাষণ দান করেন। তিনি তার ভাষণের মাধ্যমে মক্কাবাসীদের মধ্যে দৃঢ়তা ও আস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন।

অনুরূপ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন হযরত খালিদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে আকিদারের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার জন্য প্রেরণ করেন,[২] তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّكَ تَجِدُهُ يَصِيدُ الْبَقَرَ،

–তুমি তাকে গাভী শিকার করা অবস্থায় দেখতে পাবে।

উপরোল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ তাঁর দুনিয়াতে অবস্থানকালে ও তাঁর দুনিয়া ত্যাগের পর বাস্তবায়িত হয়েছে। যাদের সম্পর্কে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গোপনীয় বিষয় সম্পর্কেও অভিহিত করেছেন, তাদের সম্পর্কে তা ঘটেছে।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুনাফিকদের অন্তরের গোপনীয় বিষয়, তাদের কুফুরীর কথাও সাহাবীদের নিকট বর্ণনা করেছেন। মুমিনদের সম্পর্কেও তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

---

১. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু কাওলিন নবী লা তাকুমু, ২১:২৫৮, হাদিস নং ; ৬৪২৩।
খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ফিতন, পৃ. ১৭৪, হাদিস নং : ৫৪১০।
গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আবু সাঈদ খুদরী, ২৪:১৫, হাদিস নং : ১১৪৭০।

২. আকিদার মক্কা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী দুমাতুল জুন্দালের খৃষ্টান শাসক ছিল। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বন্দি করার জন্য হযরত খালিদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নেতৃত্বে ৪২০ জনের এক বাহিনী প্রেরণ করে বললেন, তোমরা তাকে নীল গাভী শিকার করা অবস্থায় পাবে। হযরত খালিদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ঐ অবস্থায় তাকে বন্দি করে নিয়ে আসে। সে ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু পরবর্তী সময় ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়। হযরত খালিদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) দ্বিতীয় বার তার দূর্গ আক্রমন করে মুশরিক অবস্থায় তাকে হত্যা করে ফেলেন।

সাহাবীদের অবস্থা ছিলো এরূপ যে, যখন তাদের মধ্যে কেউ অপরের গোপনীয় ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতো তখন অপর সাথী বলতো চুপ করুন। কেননা আল্লাহর কসম! যদি কোন সংবাদদাতা নাও থাকে তবুও জঙ্গলের পাথরসমূহ তাদের খবর বলে দেবে।

লাবীদ বিন আসেম যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে যাদু করে, তখন তিনি সে যাদুর কথা বর্ণনা করে বলেন;

وَكَوْنُهُ فِي مُشْطٍ ومشاقة فِي جُفِّ طَلْع نحلة ذكر وَأَنَّهُ أُلْقِيَ فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ

فَكَانَ كَمَا قَالَ ووجد عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ،

–যে চিরুনীর দাঁতে কয়েকটি চুলও খেজুরের বীজের খোসা মুড়িয়ে দিয়ে এগুলোর দ্বারা যাদু করা হয়েছে। আর সে যাদু কৃত বস্তুসমূহ 'যাকওয়ান' কূপে ফেলে দিয়েছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা বলেছেন বাস্তবে তা সে অবস্থায় পাওয়া যায়।

তিনি কুরাইশদের এ খবর দিয়েছেন যে, তোমাদের সে বিশেষ প্রতিশ্রুতি পত্র পোকায় নষ্ট করে দিয়েছে। যার কারণে তোমরা হাশেমী গোত্রের লোকদের উপর অত্যাচার করছো। যার কারণে তোমরা তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক পর্যন্ত ছিন্ন করে ফেলেছ।[১]

---

১. কুরাইশরা যখন দেখলো যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন অবস্থাতেই ইসলাম প্রচারে বিরত হচ্ছেন না, তখন তারা হাশেমী গোত্রের নিকট দাবী করে যে, তোমরা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আমাদের হাতে সোপর্দ করে দাও। তাহলে আমরা তাকে হত্যা করে ফেলব। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চাচা তাদের এ প্রস্তাব অস্বীকার করেন। তখন তারা মক্কার সকল গোত্রের লোকদের সমবেত করে প্রতিজ্ঞাপত্র লিপিবদ্ধ করে। যাতে হাশেমী গোত্রের লোকদের সামাজিকভাবে বয়কট করা হয়। তাদের সাথে সকল প্রকার আদান-প্রদান, বিবাহ-শাদী, আলাপ-আলোচনা সব বন্ধ করে দেয়া হয়। তখন আবু তালেব হাশেমী বংশধরদের সাথে নিয়ে শি'আবে আবু তালেবে চলে আসেন। কথিত আছে, উক্ত চুক্তি পত্র মুনসুর বিন আকরামা লিপিবদ্ধ করে। মুসলমান ও বনি হাশেমের বংশধরগণ তিন বছর অতিকষ্টে জীবনযাপন করে। ক্ষুধার তাড়নায় তারা গাছের পাতা, এমনকি শুকনা চামড়া পানিতে ভিজিয়ে চুষে চুষে ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টা করে। অসহায় শিশুরা ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছটফট করে মাটিতে গড়াগড়ি দিতো। এভাবে দীর্ঘ তিন বছর অতিবাহিত হবার পর একদিন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবু তালিবকে বললেন, উক্ত প্রতিশ্রুতিপত্র ওই পোকায় কুক্ষিগত করে কেটে নষ্ট করে দিয়েছে। শুধু আল্লাহ শব্দ লিখিত স্থান অবশিষ্ট আছে। এছাড়া সমস্ত চুক্তিপত্র চালুনীর ন্যায় ছিদ্র হয়ে আছে। আবু তালিব কুরাইশদের এ সংবাদ অভিহিত করার পর প্রথমে তারা হাসি তামাশা করে। কিন্তু চুক্তি পত্র খোলার পর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা বলেছেন, তা বাস্তবে দেখতে পায়। তখন লজ্জায় তাদের মাথা নত হয়ে পড়ে। তখন চুক্তিপত্র বাতিল বলে গণ্য হয়।

মিরাজের ঘটনায় যখন কাফিররা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে মিথ্যাবাদী বলে উল্লেখ করে, তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বায়তুল মুকাদ্দাসের কথা এভাবে বর্ণনা করেন, যেন কেউ নকশা দেখে বর্ণনা করছেন। হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাস্তায় অতিক্রমকারী বণিক দলের কথাও বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাতে ফিরে এসেছেন। তিনি একথাও বর্ণনা করেছেন যে, অমুক বণিক দল অমুক সময় মক্কায় এসে পৌছবে। বাস্তবে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বর্ণনা সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য বিষয়সমূহও বর্ণনা করেছেন। যা এখন পর্যন্ত সংঘটিত হয়নি। তন্মধ্যে এমন অনেক বিষয় আছে যার সূচনা দেখা দিয়েছে। যথা,

عِمْرَانُ بيت المدس خَرَابُ يَثْرِبَ وَخَرَابُ يَثْرِب خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ،

–বায়তুল মুকাদ্দাস জনবহুল নগরীতে পরিণত হওয়া। ইয়াসরিব জন শূন্য হবার পর ইয়াসরিবে যুদ্ধ হওয়া। কনসন্টান্টিনোপাল বিজয় হওয়া ইত্যাদি।[১] হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিয়ামতের নিদর্শনাবলী, নেককার ও বদকারদের অবস্থা, জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ ও কিয়ামতের ময়দানের চিত্র বর্ণনা করেছেন। যদি শুধু এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় তাহলে এক বিরাট গ্রন্থ হয়ে যাবে। যাতে অনেক বিষয় উল্লেখ করা যাবে। কিন্তু যা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সে সমস্ত বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দেয়াই যথেষ্ট মনে করছি, যা অধিকাংশ হাদিসবিদগণ বর্ণনা করেছেন।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, উক্ত চুক্তিপত্রে আল্লাহর নাম ব্যতীত আর কিছুই বিদ্যমান নেই। কাফিররা তা খুলে দেখার পর ঠিক ঐ অবস্থায় পেয়েছে, যা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন।

১. ক) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু হাদিসী মুয়াজ ইবনে জাবাল, ৪৫:৮, হাদিস নং : ২১০১৫। খ) আবু শায়বা : আল মুসান্নাফ, ৮:৬০৭।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

فِي عصمة اللهِ تَعَالَى لَهُ مِنَ النَّاسِ وكفايته من آذاه

মানুষের অনিষ্টতা থেকে হুযুর (ﷺ) এর খোদায়ী নিরাপত্তা প্রসঙ্গে

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী হল–

وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِۗ

–আর আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করবেন মানুষের ক্ষতি থেকে।[১]

অপর এক আয়াতে বর্ণিত আছে–

وَٱصۡبِرۡ لِحُكۡمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعۡيُنِنَاۖ

–এবং হে মাহবুব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি আপন রবের আদেশের উপর স্থির থাকুন। নিশ্চয় আপনি আমার রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছেন।[২]

অপর এক আয়াতে বর্ণিত আছে–

أَلَيۡسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبۡدَهُۥۖ

–আল্লাহ কি আপন বান্দার জন্য যথেষ্ট নন।[৩]

কোন কোন আলেম এ আয়াতের অর্থ উল্লেখ করে বলেন, মহান আল্লাহ তা'আলা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হিফাজতের বিষয়টি সকল কাফির-মুশরিকদের মুকাবিলায় যথেষ্ট ছিলেন। আবার কেউ কেউ অন্য অর্থ উল্লেখ করেছেন।

অপর এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

إِنَّا كَفَيۡنَٰكَ ٱلۡمُسۡتَهۡزِءِينَ ۝٩٥

–নিশ্চয়ই সেই বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে আমি আপনার জন্য যথেষ্ট।[৪]

---

১. আল কুরআন : সূরা মায়িদা, ৫:৬৭।
২. আল কুরআন : সূরা তূর, ৫২:৪৮।
৩. আল কুরআন : সূরা যুমার, ৩৯:৩৬।
৪. আল কুরআন : সূরা হিজর, ১৫:৯৫।

অপর এক আয়াতে বর্ণিত আছে–

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَـٰكِرِينَ ﴿٣٠﴾

–হে মাহবুব, স্মরণ করুন! যখন কাফিররা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলো যে, আপনাকে বন্দী করে রাখবে কিংবা শহীদ করবে অথবা নির্বাসিত করবে এবং তারা নিজেদের মতো ষড়যন্ত্র করছে। আর আল্লাহ নিজের গোপন কৌশল করছিলেন এবং আল্লাহর গোপন কৌশল সর্বাপেক্ষা উত্তম।[১]

হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) থেকে বর্ণিত আছে,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْرَسُ حَتَّى نَزَلَتْ هَـٰذِهِ الْآيَةُ (وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) فَأَخْرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنَ الْقُبَّةِ فَقَالَ لَهُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ انْصَرِفُوا فَقَدْ عَصَمَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ،

–প্রথমে সফর ইত্যাদিতে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হতো। যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়– وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ 'আর আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করবেন মানুষের ক্ষতি থেকে'। তখন মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাবু থেকে মাথা মোবারক বের করে সাহাবাদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন, হে লোক সকল! তোমরা এখন চলে যাও! কেননা মহান আল্লাহ তা'আলা আমার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাঁর নিজের জিম্মায় নিয়েছেন।[২]

বর্ণিত আছে যে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا اخْتَارَ لَهُ أَصْحَابُهُ شَجَرَةً يقيل تحتها فأتاه أعرابي فاخترط سَيْفَهُ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ فَقَالَ: اللهُ

১. আল কুরআন : সূরা আনফাল, ৮:৩০।
২. আল কুরআন : সূরা মায়িদা, ৫:৬৭।

عَزَّ وَجَلَّ، فَرُعِدَتْ يَدُ الْأَعْرَابِيِّ وَسَقَطَ سَيْفُهُ وَضَرَبَ بِرَأْسِهِ الشَّجَرَةَ حَتَّى سَالَ دِمَاغُهُ فَنَزَلَتِ الْآيَةُ،

–হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সফরে যখন কোন স্থানে যাত্রা বিরতি করতেন, তখন সাহাবীগণ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্য একটি বৃক্ষ নির্ধারণ করতেন। যার ছায়ার নিচে তিনি দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করতে পারেন। এক সময়ের ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার গাছের ছায়ার বিশ্রাম নেন। ইত্যবসরে জনৈক বেদুঈন এসে তাঁর তরবারী হাতে নিয়ে বলল, বলুন! "আপনাকে এখন কে রক্ষা করবে"? হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্ভয়ে বললেন, আল্লাহ আমাকে রক্ষা করবেন। একথা বলার পর বেদুঈনের হাত কাঁপতে শুরু করে। এমনকি তার হাত থেকে তরবারী মাটিতে পড়ে যায়। আর তখন সে স্বীয় মাথা গাছের সাথে মারতে শুরু করে। ফলে তার মাথা থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে শুরু করে। এরপর উপরে বর্ণিত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

এ ঘটনা সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে। তবে গাছে মাথা মারার কথা উল্লেখ করা হয়নি। এ ঘটনা গুরাস বিন হারেসের সাথে সংঘটিত হয়েছে। উক্ত ঘটনায় এ কথাও বর্ণিত আছে যে,

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَفَا عَنْهُ فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ وَقَالَ جئتكم من عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ

–হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে ক্ষমা করে দেন। অতঃপর সে তার গোত্রের লোকদের নিকটে ফিরে গিয়ে বলল, আমি সর্বোৎকৃষ্ট মহৎ ব্যক্তির নিকট থেকে ফিরে এসেছি।

এর সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা বদরের যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছে। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন সাহাবীদের নিকট থেকে পৃথক হয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূর্ণ করতে যান, এমতাবস্থায় জনৈক মুনাফিক তাঁর পেছনে লেগে যায়। অনুরূপ ঘটনা এখানে সংঘটিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বর্ণনায় বর্ণিত আছে, গাতফানের যুদ্ধে জি-আমর নামক স্থানে জনৈক ব্যক্তির সাথে এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তার নাম দু'সূর বিন হারেস।

উক্ত ঘটনায় ইসলাম গ্রহণ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পরে সে তার গোত্রবাসীর নিকট ফিরে যায়। গোত্রবাসীরা তাকে প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করে। সে গোত্রের নেতা ও বাহাদুর ছিল। তখন তার গোত্রের লোকজন তাকে বলল, "তুমি প্রথমে তো অনেক বড় বড় কথা বলছিলে, কিন্তু যখন তোমার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করা হয় তখন তুমি কিছুই করতে পারোনি।" প্রত্যুত্তরে সে বলল, আমি সাদা পোশাক পরিহিত দীর্ঘকায় এক ব্যক্তিতে দেখতে পাই। সে আমার বক্ষের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে। ঐ অবস্থা দেখে আমি ভীত হয়ে যমীনে বসে পড়ি। আর আমার তরবারী আমার হাত থেকে পড়ে যায়। তখন আমি বুঝতে পারি যে, ইনি একজন ফিরিশতা, তাই ইসলাম গ্রহণ করি। কোন কোন ব্যক্তির অভিমত হল যে, ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓاْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۝

–হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ করো যখন একটা সম্প্রদায় চেয়েছিলো যে, তোমাদের বিরুদ্ধে হস্ত সম্প্রসারণ করবে। তখন তিনি তাদের হাত তোমাদের উপর থেকে রুখে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহকে ভয় করো, মুসলমানদেরকে আল্লাহরই উপর ভরসা করা চাই।[১]

আল্লামা খাত্তাবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, গুরাস বিন হারেস মুহারিবী হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে হত্যা করার সংকল্প করে। মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ধারণা ছিলো না যে, সে তরবারী হাতে নিয়ে একেবারে তাঁর নিকটে পৌছে যাবে। এ অবস্থা দেখে মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

اللهمَّ اكْفِنِيهِ بِمَا شِئْتَ فَانْكَبَّ مِنْ وَجْهِهِ مِنْ زلخة زُلِخَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَنَدَرَ سَيْفُهُ مِنْ يَدِهِ،

–হে আল্লাহ! তুমি যেভাবে ইচ্ছে করো সেভাবে আমাকে রক্ষা করো। তাৎক্ষণিকভাবে গুরাসের উভয় কাঁধে তীব্র ব্যথা শুরু হয়। ব্যথার

[১]. আল কুরআন : সূরা মায়িদা, ৫:১১।

তীব্রতার কারণে গুরাস জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যায় এবং তার তরবারী হস্তচ্যুত হয়ে যায়।

পিঠের ব্যথাকে 'জুলখা' বলা হয়।

এ ঘটনার কথা বিভিন্ন বর্ণনায় বর্ণিত আছে। এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে, নিম্নোক্ত আয়াত এ ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓاْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۝

–হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ করো যখন একটা সম্প্রদায় চেয়েছিলো যে, তোমাদের বিরুদ্ধে হস্ত সম্প্রসারণ করবে। তখন তিনি তাদের হাত তোমাদের উপর থেকে রুখে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহকে ভয় করো, মুসলমানদেরকে আল্লাহরই উপর নির্ভর করা চাই।[১]

এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে,

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخَافُ قُرَيْشًا فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ اسْتَلْقَى ثُمَّ قَالَ مَنْ شَاءَ فَلْيَخْذُلْنِي،

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্য কুরাইশদের পক্ষ থেকে ভয় ছিলো। পরে এ আয়াত অবতীর্ণ হবার পর মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিশ্চিন্ত ও প্রশান্ত হয়ে বললেন, "তোমাদের যাদের ইচ্ছে আমার নিরাপত্তা দানের কাজ ত্যাগ করতে পার"।

হযরত 'আবদ বিন হুমাইদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে,

كَانَتْ حَمَّالَةُ الحَطَبِ تَضَعُ العِضَاه وَهِيَ جَمْرٌ عَلَى طَرِيق رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأَنَّمَا يَطَؤُهَا كَثِيبًا أَهْيَلَ،

[১]. আল কুরআন : সূরা মায়িদা, ৫:১১।

–কাষ্ঠ বহনকারিনী আবু লাহাবের স্ত্রী কাঁটাযুক্ত গাছের ডাল নিয়ে এসে মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চলার পথে বিছিয়ে দিতো। তিনি সে পথ দিয়ে মরুঝড়ে চলাচলকারী লোকের মতো চলে যেতেন।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন– تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ –'আবু লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হোক এবং সে ধ্বংস হয়ে গেছে'। - অবতীর্ণ হবার পর জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তার নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন। তখন সে মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট আসে। মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে সাথে নিয়ে কাবা গৃহের পাশে অবস্থান করেন। আবু লাহাব হাতে করে পাথর নিয়ে যায়। কিন্তু যখন সে তাঁদের উভয়ের মুখোমুখি হয় তখন সে হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পায়নি। আল্লাহ তা'আলা তার দৃষ্টি থেকে মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আড়াল করে দেন। তখন সে হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে উদ্দেশ্য করে বললো, হে আবু বকর! তোমার বন্ধু কোথায়? আমি তাঁকে দেখতে পাই না। আমি জানতে পেরেছি যে, সে আমার নিন্দা করছে। আল্লাহর কসম! আমি যদি এখন তাঁকে দেখতে পেতাম তাহলে তাঁর মুখে এ পাথর নিক্ষেপ করতাম।

হাকাম বিন আবুল আস থেকে বর্ণিত আছে, "সে বলে আমরা পরস্পরে মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে হত্যার দৃঢ়সংকল্প করি। ঐ উদ্দেশ্যে যখন আমি তার পেছনে হাঁটতে ছিলাম তখন আমি ভীতিকর শব্দ শুনতে পাই। আমার ধারণা হয় যে, তিহামা থেকে এ শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কেউ জীবিত থাকবে না। ঐ অবস্থায় আমি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাই। তিনি নামায শেষ করে যখন বাড়ি ফিরে যান তখন আমি জ্ঞান ফিরে পাই।

অতঃপর দ্বিতীয় রাতে আমরা আবার ঐ সংকল্প করি এবং অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাবা গৃহে গমন করি। আমি তাঁকে দেখতে পাই। তাঁকে দেখা মাত্রই আমার ও তাঁর মধ্যে সাফা ও মারওয়া পাহাড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। তাই আমি তাঁর নিকট পৌছতে পারিনি।

হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

تواعدت أنا وأبو جهم ابن حذيفة لَيْلَةً قَتْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِئْنَا مَنْزِلَهُ فَسَمِعْنَا لَهُ فَافْتَتَحَ وَقَرَأَ (الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ) إِلَى (فَهَلْ

تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ) فَضَرَبَ أَبُو جَهْمٍ عَلَى عَضُدِ عُمَرَ وَقَالَ انْجُ وَفَرَّا هَارِبَيْنِ فَكَانَتْ من مُقَدِّمَاتِ إِسْلَامِ عُمَرَ رضي الله عنه،

–আমি ও আবু জাহম বিন হুযাইফা গোপনে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে হত্যার সংকল্প স্থির করি। তাই আমরা উভয় তাঁর গৃহের নিকট উপস্থিত হয়ে শুনতে পাই যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সূরা 'হাক্কা' তিলাওয়াত করছেন–

ٱلْحَاقَّةُ ۝١ مَا ٱلْحَاقَّةُ ۝٢ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحَاقَّةُ ۝٣ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌۢ بِٱلْقَارِعَةِ ۝٤ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا۟ بِٱلطَّاغِيَةِ ۝٥ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا۟ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۝٦ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَٰنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۝٧ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنۢ بَاقِيَةٍ ۝٨

–(১) তা সত্যিই ঘটমান; (২) কেমনই তা ঘটমান। (৩) আপনি কি জেনেছেন তা কেমন সত্য ঘটমান। (৪) সামুদ ও আদ এমন কঠোর কষ্টদায়ক কে অস্বীকার করেছে। (৫) অতঃপর সামুদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়েছে সীমা অতিক্রমকারী বিকট শব্দ দ্বারা। (৬) বাকী রইলো আদ; তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে অতি বিকটভাবে গর্জনকারী ঝঞ্ঝা বায়ু দ্বারা। (৭) তা তাদের উপর সজোরে প্রবাহিত করলেন সাত রাত ও আটদিন লাগাতার; অতঃপর ঐসব লোককে সেগুলোতে দেখবেন ভূপাতিত, যেমন খেজুর গাছের পতিত কাণ্ড। (৮) অতঃপর আপনি কি তাদের মধ্যে কাউকে অবশিষ্ট দেখতে পাচ্ছেন?।[১]

তখন আবু জাহম হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)'র কাঁধে হাত দিয়ে বললো, চলো পালিয়ে প্রাণ বাঁচাই। তাই তারা উভয়েই সেখান থেকে পলায়ন করে। বলা হয় যে, ঐ ঘটনা হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ইসলাম গ্রহণের প্রাথমিক কারণ হয়েছে।

[১]. আল কুরআন : সূরা হাক্কাহ, ৬৯:১-৮।

এ সংক্রান্ত বিষয়ে এটাই হল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপদেশমূলক ঘটনা। আর ঐ ঘটনা এজন্য যথেষ্ট যে, কুরাইশরা মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে হত্যা করার দৃঢ় সংকল্প করে ঐকমত্যে উপনীত হয়। সুতরাং তারা রাতের অন্ধকারে হত্যা করার জন্য সমবেত হয়। তিনি ঘর থেকে বের হয়ে তাদের সামনে দাঁড়ান। মহান আল্লাহ তা'আলা তাদের দৃষ্টি আড়ালাবৃত করে দেন। আর মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের মাথার উপর ধূলি নিক্ষেপ করে তাদের সম্মুখ দিয়ে নিরাপদে গৃহ ত্যাগ করে চলে যান।

অনুরূপ হিজরতের সময় তিনি যখন সাওর পর্বতের গুহায় আত্মগোপন গোপন করেন, তখনও আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কাফিরদের দৃষ্টিশক্তি থেকে নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যে গুহার দ্বার সম্মুখে মাকড়সার দ্বারা জাল বানিয়ে দেন। এমনকি তারা যখন গুহায় প্রবেশ করতে যায়। তখন উমাইয়া বিন খলফ দাঁড়িয়ে বলল, গুহার ভেতরে তোমাদের কী কাজ? তোমরা কী দেখতে পাও না যে, গুহার মুখে মাকড়সা জাল বুনেছে। আমার ধারণা হয় যে, এ জাল মুহাম্মদের জন্মের পূর্বে বুনা হয়েছে। ঐ সময় গুহার মুখে বসে দুটি কবুতরও ডিমে তা দেয়। এ অবস্থা দেখে কুরাইশরা বললো, "গুহার ভেতরে যদি কেউ থাকতো তাহলে কবুতর বসে থাকতো না।"

এ সম্পর্কে ঐ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, যা হিজরতের সময় সুরাকা বিন জুশামের সাথে সংঘটিত হয়েছে। কুরাইশরা মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বন্দী করার জন্য পুরষ্কার ঘোষণা করে। সুরাকা এ সংবাদ জানার পর অশ্বারোহণ করে তাঁদের পেছনে ধাওয়া করে। এমনকি সে মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খুব নিকটে পৌছে যায়। মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার বিপক্ষে দোয়া করেন। ফলে তার অশ্বের পা মাটিতে ধ্বসে যায় এবং সে অশ্ব পৃষ্ঠ থেকে মাটিতে লুটে পড়ে। তখন সে তীরের সাহায্যে শুভাশুভ পরীক্ষা শুরু করে। পরীক্ষায় বিপরীত ফল দেখা দেয়। তবুও সে দ্বিতীয়বার অশ্বে আরোহণ করে মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর তিলাওয়াতের শব্দ শুনতে পায়। কিন্তু মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার প্রতি মুখ ফিরেও তাকান নি। হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বার বার পেছনে দেখতে ছিলেন। মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্ভীকভাবে বললেন, لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا -'চিন্তা কারো না নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাদের সাথে আছেন।' অতঃপর পুনরায় অশ্বের পেট পর্যন্ত মাটিতে ধ্বসে যায় এবং সে অশ্বপৃষ্ঠ হতে মাটিতে পড়ে

যায়। সে ঘোড়াকে ধমক দেয়ায় ঘোড়া থমকে দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু তার পায়ের গোড়ালী দিয়ে ধূয়া বের হতে শুরু করে। তখন মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে নিরাপত্তা পত্র লিখে দেন। উক্ত নিরাপত্তা পত্র হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কৃতদাস ইবনে ফুহাইরা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক লিপিবদ্ধ করা হয়।

এক বর্ণনায় হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক লিপিবদ্ধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তখন সুরাকা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে কুরাইশদের গতিবিধির বিষয় অবগত করে।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুরাকাকে বললেন, তুমি আমার কথা কাউকে কিছু বলবেনা। অতঃপর সে ফিরে চলে আসে। রাস্তায় যার সাথে সাক্ষাত হয়েছে তাকে সে বলে অনর্থক কষ্ট করে লাভ নেই। মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এপথ দিয়ে যাননি।

অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে– সুরাকা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উভয়কে উদ্দেশ্য করে বলে যে, আমার মনে হয় আপনারা উভয় আমাকে বদদোয়া করেছেন। এখন আপনারা উভয় আমার জন্য দোয়া করুন। তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর জন্য দোয়া করেন এর ফলে সুরাকা নাজাত পায়। সে সময় সুরাকার অন্তরে একথা দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয় যে, একদিন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিজয়ী হবেন।

অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে,

أَنَّ رَاعِيًا عَرَفَ خَبَرَهُمَا فَخَرَجَ يَشْتَدُّ يُعْلِمُ قُرَيْشًا فَلَمَّا وَرَدَ مَكَّةَ ضُرِبَ عَلَى قَلْبِهِ فَمَا يَدْرِي مَا يَصْنَعُ وَأُنْسِيَ مَا خَرَجَ لَهُ حَتَّى رَجَعَ إِلَى مَوْضِعِهِ،

–জনৈক রাখাল তাদের উভয়ের সন্ধান পেয়ে যায়। তাই সে কুরাইশদের অভিহিত করার জন্য দ্রুতগতিতে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করে। কিন্তু যখন সে মক্কা পৌছে তখন তার অন্তর থেকে তা দূর করে দেয়া হয়। এমনকি সে মনে করতে পারে নি যে, সে কি উদ্দেশ্যে মক্কায় এসেছে? যে উদ্দেশ্যে সে মক্কায় এসেছে তাও সে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়। অবশেষে সে ব্যস্ত হয়ে বাসস্থানে ফিরে যায়।

এক বর্ণনায় ইবনে ইসহাক উল্লেখ করে বলেন, একদিন আবু জাহল মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে পাথর নিক্ষেপের জন্য হাতে পাথর নিয়ে আসে। ঐ সময় মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সিজদারত ছিলেন। অপর কুরাইশরা দূরে দাঁড়িয়ে অবস্থা দেখে যে, সে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র মাথায় পাথর নিক্ষেপ করে কি না। কিন্তু পাথর তার হাতের সাথে জমাট বেধে যায় এবং তার উভয় হাত ঘাড় পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। তাই সে বাধ্য হয়ে উল্টো দিকে কুরাইশদের নিকট ফিরে আসে। কিন্তু কোনো অবস্থায় উক্ত পাথর তার হাত থেকে পৃথক করতে পারেনি। এ অবস্থা দেখে সে মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট গমন করে দোয়া করার আবেদন করে। মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার জন্য দোয়া করার পর তার হাত নড়াচড়া করা আরম্ভ করে।

সে একবার কুরাইশদের সাথে শপথ করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, আমি সুযোগ ফেলে তাঁর মাথা চুর্ণবিচুর্ণ করে দেবো। পরে কুরাইশরা তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে সে বললো, "মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকটবর্তী হবার পর আমি একটি নর উট দেখতে পাই। ঐ ধরনের উট এর পূর্বে আমি জীবনে কোন দিন দেখিনি। আমি দেখি উটটি আমার দিকে হা করে তেড়ে আসছে।" হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ذاك جِبْرِيلُ لَوْ دَنَا لَأَخَذَهُ ওটা উট ছিল না। বরং তিনি ছিলেন হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম)। যদি সে আমার নিকট আসত তাহলে তাকে পাকড়াও করা হতো।

আল্লামা সমরকন্দি (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, মুগীরা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি একদা মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট আসে। আল্লাহ তা'আলা তার দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত করে দেন। তাই সে মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে দেখতে পায়নি। তবে সে তাঁর কথাবার্তা শুনতে পায়। সে তার সাথীদের নিকট ফিরে আসার পর সাহাবীদেরও দেখতে পায়নি। তখন তার সাথীরা তাকে ডাকতে শুরু করে। এতদ এ ঘটনাদ্বয়কে কেন্দ্র করে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়–

إِنَّا جَعَلْنَا فِىٓ أَعْنَٰقِهِمْ أَغْلَٰلًا فَهِىَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾

–আমি তাদের ঘাড়সমূহে বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি যে, সেগুলো থুতনী পর্যন্ত পৌঁছেছে। সুতরাং তারা উর্ধ্বমূখী হয়ে রয়েছে। এবং আমি তাদের সম্মুখে প্রাচীর স্থাপন করেছি এবং তাদের পেছনে একটা প্রাচীর। আর তাদেরকে উপর থেকে আবৃত করে দিয়েছি। সুতরাং তারা কিছুই দেখতে পায় না।[১]

এ সংক্রান্ত ব্যাপারে নিম্নোক্ত ঘটনাও সংঘটিত হয়েছে। যেমন- ইবনে ইসহাক উল্লেখ করেছেন যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবীদের সাথে নিয়ে বনী কোরাইজা গোত্রে যাত্রা করেন এবং তাদের মহল্লায় গিয়ে উচ্চ দেয়ালে ঠেক দিয়ে বসেন। তখন আমর ইবনে জাহহাস উপর থেকে পাথর নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে উপরে উঠে বসে। তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উঠে মদিনা অভিমূখে ফিরে আসেন, তাঁকে এ বিষয় জানিয়ে দেয়া হয়। উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓا۟ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

–হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ করো যখন একটা সম্প্রদায় চেয়েছিলো যে, তোমাদের বিরুদ্ধে হস্ত সম্প্রসারণ করবে। তখন তিনি তাদের হাত তোমাদের উপর থেকে রুখে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহকে ভয় করো, মুসলমানদেরকে আল্লাহরই উপর ভরসা করা চাই।[২]

আল্লামা সমরকন্দি (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى بَنِي النَّضِيرِ يَسْتَعِينُ فِي عَقْلِ الْكِلَابِيَّيْنِ اللَّذَيْنِ قَتَلَهُمَا عَمْرو بن أُمَيَّةَ فَقَالَ لَهُ حُيَيُّ بن أَخْطَبَ اجْلِسْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ حَتَّى نُطْعِمَكَ وَنُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَنَا فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ

১. আল কুরআন : সূরা ইয়াসীন, ৩৬:৮-৯।
২. আল কুরআন : সূরা মায়িদা, ৫:১১।

عَنْهُمَا وَتَوَامَرَ حُيَيٌّ مَعَهُمْ عَلَى قَتْلِهِ فَأَعْلَمَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَامَ كَأَنَّهُ يُرِيدُ حَاجَتَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ،

–মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বনী কিলাব গোত্রের আমর বিন উমাইয়্যাহ কর্তৃক নিহত দু'ব্যক্তির মৃত্যুপণ পরিশোধ করার বিষয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে বনু নযীর গোত্রে উপস্থিত হন। এটা ইহুদীদের প্রসিদ্ধ গোত্র। তখন গোত্র অধিপতি হুয়াই বিন আখতাব বলল, হে আবুল কাসেম! (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি বসুন। আমাদের সাথে আহার করুন। আপনি যে উদ্দেশ্যে এসেছেন তা পূর্ণ করা হবে। মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে সাথে নিয়ে বসে পড়েন। তখন হুয়াই বিন আখতাব কুরাইশদের সাথে পরামর্শ করে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। ইতোমধ্যে হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) এসে তাঁকে এ গোপন ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সাবধান করে দেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বসা থেকে উঠে দাঁড়ান, মনে হয় তিনি কোন প্রয়োজন পূর্ণ করতে যাচ্ছেন। এমনকি এ অবস্থায় তিনি মদীনাতে এসে পৌছেন।

হাদিস বিশারদগণ এ সংক্রান্ত বর্ণনা হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। একদিন আবু জাহল কুরাইশদের সাথে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, যদি আমি সুযোগ পাই তাহলে তার ঘাড় চুর্ণবিচুর্ণ করে দেব। সেহেতু একদিন মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে কাবা গৃহে নামায পড়তে দেখে কুরাইশরা আবু জাহলকে তার সে প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করে দেয়। তাই সে লম্বা জাম্প দিয়ে মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট গমন করে। কিন্তু সে নিকটবর্তী হয়ে উল্টো পিছনের দিকে সরে পড়ে। সে যেন উভয় হাত দিয়ে নিজেকে রক্ষা করছে। উপস্থিত লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, আমি তাঁর নিকটবর্তী হবার পর একটি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড দেখতে পাই। মনে হয় যে, আমি উক্ত গর্তে পড়ে যাচ্ছি। ঐ অবস্থায় আমি ভীষণ ভীত হয়ে পড়ি। আর আমি পাখা নাড়ার শব্দ শুনতে পাই। মনে হয় উক্ত পাখা দিয়ে সমস্ত পৃথিবী ঘিরে রাখা হয়েছে। মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ لَوْ دَنَا لَاخْتَطَفَتْهُ عُضْوًا عُضْوًا،

–ওগুলো ছিল ফিরিশতা। যদি সে আমার নিকট আসত তাহলে তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলা হতো। মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর এ আয়াত অবতীর্ণ হয়–

كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ ﴿٦﴾

–হাঁ, হাঁ! নিশ্চয় মানুষ ঔদ্ধত্য করে।[১]

এখান থেকে উক্ত সূরার শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করে দেখুন।

বর্ণিত আছে যে, শাইবা ইবনে ওসমান হুনাইনের যুদ্ধে মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে একাকী পেয়ে যায়। বদরের যুদ্ধে তার পিতা ও চাচা হযরত হামজা এর হাতে নিহত হয়। এ অবস্থা দেখে সে বলল, আমি আজ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে হত্যা করে পিতা ও চাচার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করবো। সুতরাং যখন ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হয় মুজাহিদ বাহিনী এলোমেলো হয়ে যায়। এ সুযোগে সে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পেছনে পেছনে চলতে শুরু করে। যাতে সুযোগ পেলে সে মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আঘাত করতে পারে।

শাইবা বিন ওসমান নিজেই বর্ণনা করে যে, আমি যখন মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট গমন করি তখন আমার সম্মুখে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড দেখতে পাই। যা বিদ্যুৎ থেকে দ্রুতগতি ও তীব্র ছিল। তখন আমি পেছনে পলায়ন করতে শুরু করি।

মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার অবস্থা বুঝতে পারেন। তাই তিনি পেছন থেকে আমাকে ডাক দিয়ে আমার বক্ষের উপর তাঁর ডান হাত রাখেন। আমার বুকে হাত রাখার পূর্বে তিনি আমার নিকট সর্ব নিকৃষ্ট ব্যক্তি ছিলো। কিন্তু যখন তিনি আমার বুকের উপর হাত রাখেন, তখন তিনি আমার নিকট সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তিতে পরিণত হন। তিনি আমাকে বললেন, أُدْنُ فَقَاتِلْ –আরও নিকটে এসো এবং আল্লাহর রাস্তায় গিয়ে যুদ্ধ কর।

আমি সামনে অগ্রসর হয়ে কাফিরদের হত্যা করতে শুরু করি। জীবনবাজি রেখে মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে রক্ষা করি। যদি ঐ সময় আমার কাফির পিতাও আমার তরবারী সামনে আসতো তাহলে আমি তার উপর আক্রমণ

---

[১]. আল কুরআন : সূরা আলাক্ব, ৯৬:৬।

করতেও দ্বিধা করতাম না। তবে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ অবস্থায় পতিত হলে আমি কিন্তু তাঁর উপর আঘাত করতাম না।

ফুযালা বিন আমর থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

أَرَدْتُ قَتْلَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عام الفتح هو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ قَالَ: أَفَضَالَةٌ؟ قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ (مَا كُنْتَ تُحَدِّثُ بِهِ نَفْسَكَ؟) قلت: لا شيء، فَضَحِكَ وَاسْتَغْفَرَ لِي وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي فَسَكَنَ قَلْبِي، فو الله مَا رَفَعَهَا حَتَّى مَا خَلَقَ الله شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ، وَمِنْ مَشْهُورِ ذَلِكَ خَبَرُ عَامِرِ بْنِ الطُّفَيْلِ وَأَرْبَدَ بن قَيْسٍ حِينَ وَفَدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ عَامِرٌ قَالَ لَهُ أَنَا أَشْغَلُ عَنْكَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ فَاضرب به أَنت فَلَمْ يَرَهُ فَعَلَ شيئا فلما كله فِي ذَلِكَ قَالَ لَهُ والله مَا هَمَمْتُ أن أَضْرِبَهُ إِلَّا وَجَدْتُكَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَفَأَضْرِبُكَ؟ وَمِنْ عصمَتِهِ لَهُ تعالى أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْيَهُودِ وَالْكَهَنَةِ أَنْذَرُوا بِهِ وَعَيَّنُوهُ لِقُرَيْشٍ وَأَخْبَرُوهُمْ بسوطته بِهِمْ وَحَضُّوهُمْ عَلَى قَتْلِهِ فَعَصَمَهُ اللهُ تَعَالَى حَتَّى بَلَغَ فِيهِ أَمْرَهُ، وَمِنْ ذَلِكَ نَصْرُهُ بِالرُّعْبِ أَمَامَهُ مَسِيرَةَ شهر،

–আমি মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে হত্যা করার সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। তিনি যখন কাবা গৃহে তাওয়াফ করেন, তখন আমি উদ্দেশ্য সফল করার লক্ষ্যে তাঁর নিকটবর্তী হলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি ফুযালা? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি ফুযালা। তিনি অমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি মনে মনে কি চিন্তা করছো? আমি বললাম, না কিছুই না তো। তিনি আমার কথা শুনে মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, আমার নিকট এসো! আমি তোমার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করব। একথা বলে তিনি আমার বুকের উপর হাত রাখেন। তাতে আমার অন্তর প্রশান্ত হয়ে যায়। আল্লাহর শপথ! তিনি আমার বক্ষ থেকে তখনও হাত সরিয়ে নেননি, ঐ অবস্থায় আমার নিকট পৃথিবীতে তাকে সবচেয়ে বেশী প্রিয় মনে হয়।

এ সংক্রান্ত বিষয় হযরত আমের বিন তোফায়েল ও আরবাদ বিন কায়েসের বর্ণনা অতি প্রসিদ্ধ। যখন তারা উভয়জন প্রতিনিধি হিসেবে মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে উপস্থিত হয়। আমের স্বীয় সাথীর সাথে পরামর্শ করে স্থির করে যে, আমি তোমার এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মাঝে আবরণ দূর করে দেবো যাতে তুমি অতি সহজে তাঁকে আঘাত করতে পারো। কিন্তু আমের তার সাথীকে কিছুই করতেছে না দেখে জিজ্ঞেস করলে সে বললো, আল্লাহর শপথ! আমি যতবারই মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আঘাত করার উদ্যোগ নিয়েছি ততবারই দেখি তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছ। তুমি বলো, আমি তোমাকে হত্যা করে ফেলব কী?

মহান আল্লাহ তা'আলা যেভাবে রক্ষা করার ঠিক সেভাবেই রক্ষা করেছেন। তন্মধ্যে এটাও আছে যে, কুচক্রী ইহুদি ও যাদুবিদরা লোকজনকে দেখিয়েছে আর কুরাইশদেরকে সবকিছু বলেও দিয়েছে। তন্মধ্যে এটাও বলেছে যে, একদিন তিনি তোমাদের উপর বিজয় হবেন এবং স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবেন। এ জন্য তারা কুরাইশদেরকে ভীষণ উত্তেজিত করেছে যাতে তারা মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে তাড়াতাড়ি হত্যা করে ফেলে। কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সকল প্রকার অমঙ্গল ও ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করেন। আর এভাবে তাঁর দ্বীন পরিপূর্ণতা লাভ করে। আল্লাহ তা'আলার হেফাজতের মধ্যে এটাও ছিল যে, মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁকে 'রু'ব' বা প্রতাপ সঞ্চারকারী ভয় দান করেছেন। যার ফলে এক মাসের দূরত্বে থেকেও শত্রুরা তাঁর প্রতি ভীষণ ভীত হয় পড়তো। মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেও তাঁর সম্পর্কে এরূপ কথা বলেছেন।

ষষ্ঠবিংশ পরিচ্ছেদ

مِنْ مُعْجِزَاتِهِ الْبَاهِرَةِ

হুযুর (ﷺ) এর অত্যুজ্জ্বল মু'জিযাসমূহ

আল্লাহ তা'আলা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে তাঁর পবিত্র সত্তার মত উজ্জ্বল মু'জিযা ও সুস্পষ্ট নিদর্শন দান করেছেন। তাঁকে দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় কল্যাণ ও মারিফাতের জ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ করেন। তাঁকে শরীয়াতের বিধি-বিধান দান করেন। তাঁকে আল্লাহর বান্দাদের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনাকারী ও জনসাধারণের কল্যাণকামী হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এর সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পূর্ববর্তী উম্মাতদের সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় ঘটনাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান দান করেন। তাদের উপর অবতীর্ণ কিতাবসমূহ ও শরীয়াতের বিধি-বিধান, তাদের জীবন চরিত্র, ব্যক্তিগত জীবন পদ্ধতি, আল্লাহর নির্দেশিত বিশেষ দীন, দীর্ঘায়ু লাভকারী ব্যক্তিবর্গের গুণাবলী, তাদের মতদ্বৈতাপূর্ণ অভিমতসমূহ, জ্ঞানী-গুণীদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ অভিজ্ঞতা, পূর্ববর্তী কাফির উম্মাতদের মতবিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহ, পূর্ববর্তী কিতাব সম্পর্কে তাদের মতভেদ ও রহস্যের গোপন খবর অভিহিত করেন। আর ঐ বিষয়সমূহ যা তারা গোপন করেছে এবং তাদের কিতাবসমূহে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের খবরও তাঁকে অভিহিত করেন। অথচ আরবদের ভাষায় হাজার হাজার নতুন নতুন শব্দের সংযোজন ঘটেছে। যার কারণে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে বিভিন্ন অভিমতের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তাঁর ভাষার সঠিক ব্যবহার যথা ফাসাহাত সম্পর্কিত উদাহরণ, উপমা, বিশুদ্ধ প্রবাদ বাক্য বলা ও ওইগুলোর সঠিক মর্মার্থ উদ্ধার করা ইত্যাদি বিষয় অভিহিত করা হয়েছে। তিনি তাদের কবিতা ও কাব্যসমূহের মর্মার্থের সঠিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতেন।

মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁকে 'জামিউল কালাম' বা ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য বলার ক্ষমতা দান করেন। তিনি এমন উদাহরণ-উপমা পেশ করতেন যার ফলে দুষ্প্রাপ্য শব্দের ব্যবহার ও তার সঠিক মর্মার্থ ব্যক্ত করে অনেক সহজতর করে দিতেন। তিনি শরীয়তের বিধি-বিধান এমনভাবে সুবিন্যস্ত করেন, যা সকল প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত ছিল। তাঁর প্রবর্তিত শরীয়াতের সুন্দর আখলাক, আদব, শালীনতা, সৌজন্যবোধও প্রশংসনীয় ছিল। সুতরাং তাঁর প্রতিটি বিষয় ছিল জ্ঞানীদের নিকট প্রশংসনীয়। এমনকি ঐ বিষয় ঐ সকল কাফির ও অজ্ঞ লোক যাদের মধ্যে সুস্থ চিন্তা ও ন্যায়পরায়নতা ছিল; তাদের নিকটও প্রশংসনীয় ছিল।

তাঁর বিরুদ্ধাবাদীদের এগুলো অস্বীকার করার সাহস ছিলনা। যদি তারা এ সম্পর্কে কোন বাদ-প্রতিবাদ বা কোন কিছু বলার চেষ্টা করতো তখন তাদের বলা হতো ওটা তোমাদের মনগড়া কথা। বরং অবস্থা ছিল এরূপ যে, জাহেলী যুগের খ্যাতনামা জ্ঞানী-গুণী ও অহংকারী-দাম্ভিক ব্যক্তিবর্গ তাঁর কথা শুনার পর সত্য বলে স্বীকার করত এবং তারা বলত এটা হল ন্যায়পরায়ণতা। এর জন্য কোন দলীল-প্রমাণের প্রয়োজন হতোনা।

তিনি পবিত্র ও উত্তম বস্তুসমূহ হালাল বা বৈধ, আর নিন্দনীয় ও মন্দ বস্তুসমূহ নিষিদ্ধ বা হারাম স্থির করেন। অনুরূপ মানুষের প্রাণ, ইজ্জত-সম্মান, ধন-সম্পদকে অকল্যাণ ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। তিনি আপামর মানুষের ইহকালীন তাৎক্ষনিক শাস্তি ও পরকালীন কঠোর আজাব থেকে মুক্তি লাভ করার পথনির্দেশনা দান করেন। সে সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান জানা এমন এক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব যিনি সে বিষয় অভিজ্ঞ ও যিনি শিক্ষায় আত্মমগ্ন ও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত পুস্তকাদি অধ্যয়নের অভ্যাসে অভ্যস্ত। তার পক্ষে এ সব শিক্ষা দেয়া সহজ।

তিনি ঐ সমস্ত বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। যথা চিকিৎসাবিদ্যা, স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা। ফারায়িজ বা সম্পত্তি বন্টন ব্যবস্থার হিসাব নিকাশ ও বংশধারা। এ বিষয় মনে হয় ঐসব জ্ঞানীগুনী ব্যক্তিবর্গ তাঁর বাণীর সারবস্তু সংগ্রহ করে তাদের স্ব-স্ব জ্ঞান ভাণ্ডার পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ করে নিয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ প্রথমে স্বপ্নের ব্যাখ্যায় যওয়া যাক। এ বিষয়ে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বর্ণনা করেছেন,

الرُّؤْيَا لِأَوَّلِ عَابِرٍ وَهِيَ عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ،

–স্বপ্ন প্রথম ব্যাখ্যাকারীর ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রতিফলিত হবে এবং অতি শীঘ্র বাস্তবায়িত হবে।

তিনি আরও বর্ণনা করেছেন,

الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ رُؤْيَا حَقٌّ وَرُؤْيَا يُحَدِّثُ بِهَا الرَّجُلُ نَفْسَهُ وَرُؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ،

–স্বপ্ন তিন প্রকারের হয়। (১) সত্য স্বপ্ন (২) মানুষের ধারণা ও স্বীয় চিন্তাভাবনা অনুযায়ী হওয়া, অর্থাৎ মানুষ দিনে যে সমস্ত বিষয় চিন্তাভাবনা বা কল্পনা করে রাতে তা স্বপ্নের জগতে তার সম্মুখে ভেসে

উঠে। (৩) চিন্তার কারণে যে স্বপ্ন দৃষ্টিগোচর হয়। এটা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বর্ণনা করেছেন,

إِذَا تَقَارَبَ الزَّمَانُ لَمْ تكد رؤيا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ،

–কিয়ামতের পূর্বক্ষণে মু'মিনের স্বপ্ন মিথ্যা হবেনা।

তিনি আরও বর্ণনা করেছেন,

أَصْلُ كُلِّ دَاءٍ الْبَرَدَةُ،

–সকল প্রকার ব্যাধির বীজ ও জড় হলো বদহজমী।

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে এক হাদীসে বর্ণিত আছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বর্ণনা করেছেন,

الْمِعِدَةُ حَوْضُ الْبَدَنِ وَالْعُرُوقُ إِلَيْهَا وَارِدَةٌ،

–পাকস্থলী হলো দেহের চৌবাচ্চার মতো। দেহের সকল শিরা-উপশিরা পাকস্থলীর সাথে মিলিত হয়েছে। যদিও এ হাদিস সহীহ বলা হয়নি।

হাদিস বিশারদ ইমাম দারেকুতনী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এ হাদিস সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে,

خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ السَّعُوطُ وَاللَّدُودُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشِيُّ وَخَيْرُ الْحِجَامَةِ يَوْمَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ،

–'দাওয়া' বা ওষুধসমূহের মধ্যে উত্তম ঔষুধ হল "আতর"-নাকে ঘ্রাণ নেয়া, 'লদুদ' মুখ দিয়ে যা পাকস্থলীতে প্রবেশ করে, 'হাজামত' বা শিঙ্গা লাগানো। আর 'মাসহাল' বা জুল্লাব বা বিরেচক ওষুধ। শিঙ্গা লাগানোর উত্তম তারিখ প্রতি চাঁদের ১৭, ১৯, ও ২১ তারিখ।

হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَفِي الْعُودِ الْهِنْدِيِّ سَبْعَةُ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ،

–উদে হিন্দী চন্দন "কুস্তেবাহারী" বা "কালোজিরা"র মধ্যে সাত প্রকার ব্যাধির নিরাময়তা বিদ্যমান। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নিমোনিয়া রোগের চিকিৎসা।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বর্ণনা করেছেন,

مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ – إِلَى قَوْلِهِ – فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ،

–আদম সন্তানের পূর্ণ উদর থেকে মন্দ আর কোন পাত্র নেই। ...খাদ্য ভক্ষণ করা যেহেতু জরুরি তাই পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য, অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস গ্রহণ করার জন্য খালি রেখে দেবে।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে "সাবা" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, সে পুরুষ না নারী? না এটা কোন দেশের নাম? তখন মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

رَجُلٌ وَلَدَ عَشَرَةً تَيَامَنَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ وَتَشَاءَمَ أَرْبَعَةٌ،

–সে হল পুরুষ। তার দশ পুত্র ছিল। তন্মধ্যে ছয় জন ইয়ামানে বসতি স্থাপন করে। আর অবশিষ্টরা সিরিয়াতে বসতি স্থাপন করে।

এ হাদিস অতিদীর্ঘ, আর তাঁর এ জবাব 'ফাযার' বংশধারা সম্পর্কিত ছিলো। অথচ আরববাসীরা বংশধারা জ্ঞানে পারদর্শী ছিলো। তবুও তারা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট ঐ বিষয় জানতে বাধ্য হয়েছে।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বর্ণনা করেছেন,

حِمْيَرُ رَأْسُ الْعَرَبِ وَنَابُهَا وَمِذْحِجُ هَامَتُهَا وَغَلْصَمَتُهَا وَالْأَزْدُ كَاهِلُهَا وَجُمْجُمَتُهَا وَهَمْدَانُ غَارِبُهَا وَذُرْوَتُهَا،

–হিময়ার ছিলো আরববাসীর নেতা। মর্যাদার দিক দিয়ে সে ছিলো আরবদের মস্তকতুল্য, শক্তির দিক দিয়ে সে ছিলো আরবদের দাঁত সদৃশ। আর 'মাযহিজ' গোত্র ছিলো তাদের মাথা ও ঘাড়ের মতো। 'আযদ' ছিলো তাদের কাঁধ ও বাহু। আর হামদান ছিলো তাদের মাথার ঝুটি বা খোঁপা সৃদশ।

হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বর্ণনা করেছেন,

إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السموات وَالْأَرْضَ،

–সময় বির্বতনের সাথে সাথে ঐ দিনে একত্রিত হয়েছে যেদিন আল্লাহ তা'আলা আকাশ-যমীন সৃষ্টি করেছেন।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাউজে কাউসার সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন,

زَوَايَاهُ سَوَاءٌ،

–তা বর্গাকার বিশিষ্ট হবে।

তিনি যিকির সম্পর্কিত হাদীসে বর্ণনা করেছেন,

وَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، فَتِلْكَ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ عَلَى اللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسِمِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ،

–নেকীসমূহ দশগুণ বৃদ্ধি করা হবে। ১৫০ হল মুখের উপর। (অর্থাৎ তিনি তাসবীহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর ৩০ বার করে পড়লে ১৫০ বার হয়।) তা কিয়ামতের দিনে মীযানে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে ১৫০০ হবে।

একদা তিনি এক স্থান সম্পর্কে বলেছেন,

نِعْمَ مَوْضِعُ الْحَمَّامِ هَذَا،

–এ স্থান স্নানাগারের জন্য কতইনা উত্তম হবে।

তিনি আরও বর্ণনা করেছেন,

مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ،

–ক্বিবলা হলো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যবর্তী স্থান।

তিনি আকরা' কিংবা উয়াইনাকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন,

أَنَا أَفْرَسُ بِالْخَيْلِ مِنْكَ،

–আমি তোমাদের চেয়ে ঘোড়া সম্পর্কে বেশী জ্ঞাত।

আর তিনি লেখককে বলেন,

ضَعِ الْقَلَمَ عَلَى أُذُنِكَ فَإِنَّهُ أَذْكَرُ للممل،

–তোমার কলম কানের উপর রাখো। কেননা এতে শ্রুতলিপির কথা অতি সহজে স্মরণ আসবে।

এরূপ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজে কোনদিন লেখেননি। তাঁকে যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। যাতে একথা প্রমাণিত হয় যে, তিনি অক্ষরসমূহ চিনতেন এবং সেগুলোর সৌন্দর্য জানতেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, তিনি বলেছেন-

لَا تَمُدُّوا بِاسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ،

–তোমরা বিসমিল্লাহ লম্বা করে লিখবেনা। কেননা লম্বা করে লিখলে 'সীন' বা এর মত দেখা যাবে। ইবনে শাবান হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে এ বর্ণনা নকল করেছেন।

অপর এক হাদীসে হযরত মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনে লেখালেখি করতেন। তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

أَلِقِ الدَّوَاةَ وَحَرِّفِ الْقَلَمَ وَأَقِمِ الْبَاءَ وَفَرِّقِ السِّيْنَ وَلَا تُعَوِّرِ الْمِيْمَ وَحَسِّنِ اللهَ وَمُدَّ الرَّحْمٰنَ وَجَوِّدِ الرَّحِيْمَ،

–তোমার দোয়াত ডান দিকে রাখো। কলম গতিশীল কর। 'বা' অক্ষর সোজা করে লেখ। 'সীন' (س) অক্ষরকে করাতের দাঁতের মতো লেখ। 'মীম' (م) অক্ষর অন্ধ করবেনা। অর্থাৎ মাঝখান খালি রাখ। 'আল্লাহ' (الله) শব্দ পরিপাটি করে লেখ। 'আর রহমান' (اَلرَّحْمٰنُ) শব্দ আটসাট করে লেখ। 'আর রহীম' (اَلرَّحِيْمُ) শব্দকে পরিস্কার করে লেখ।

একথা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট যে, যদিও হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, তিনি লিখতেন না, তবে তিনি শ্রুতলিপির আদ্যপ্রান্ত অবগত ছিলেন। এছাড়াও যথার্থভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি অন্যান্য প্রাচীন জাতির ভাষায়ও পারদর্শী ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, তাঁর سَنَةٌ سَنَةٌ 'সানাহ সানাহ' শব্দের উল্লেখ করা। হাবসী ভাষায় এর অর্থ হল 'ভাল আছি'। অথবা وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ তাঁর 'হারাজ' বেশী হবে বলে উল্লেখ করা, এর অর্থ হল 'হত্যা'।

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বর্ণনা করেছেন– أَشْكَنْبْ دَرْدْ ফারসী ভাষায় এর অর্থ হল– পেট ব্যাথা। অথচ এমন বিষয় সেই জানতে পারে যে সারা জীবন পুস্তকাদি পাঠে অভ্যস্ত। অথবা যে বিদ্বান ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ করেন। অথচ তাঁর উপাধী ছিল 'উম্মী'। যেমন– আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, 'তিনি না লেখাপড়া শিখেছেন, না তিনি কোন শিক্ষকের নিকট শিক্ষা লাভ করেছেন'। না তাঁর লালন পালন এমন সম্প্রদায়ে হয়েছে যারা বিদ্যা শিক্ষায় পারদর্শী ছিল। না লেখাপড়া জানা লোকদের সাথে তাঁর চলাফেরা ও উঠাবসা ছিল। নবুওয়াত প্রকাশের করার পর তিনি এসব জ্ঞান লাভ করেন। পবিত্র কুরআন মাজীদে বর্ণিত আছে–

وَمَا كُنتَ تَتْلُوا۟ مِن قَبْلِهِۦ مِن كِتَٰبٍ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا لَّٱرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿٤٨﴾

–এবং এর পূর্বে আপনি কোন কিতাব অধ্যয়ন করতেন না এবং না আপন হাতে কিছু লিখতেন যে, মিথ্যাচারীরা সন্দেহপোষণ করবে।[১]

আরববাসীদের জ্ঞান ছিল সামান্য। তাদের বংশধারা, অতীতকালের ঘটনা প্রবাহ ও কবিতার পংক্তি আওড়ানো ব্যতীত আর কিছুই তাদের জানা ছিলনা। এর বাইরে তাদের আর কোন জ্ঞানই ছিলনা। ঐ সমস্ত বিষয়ে তারা সারাজীবন জ্ঞান অর্জন করে সফলতা লাভ করে। তবুও তারা সারাজীবন এ কাজে আত্মনিয়োগ করে এবং জ্ঞানীগুণীদের সাথে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হত। তবুও তাদের এ জ্ঞান মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পরিপূর্ণ বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডারের তুলনায় ছিলো বিন্দুতুল্য। অবিশ্বাসী কাফিরদের পক্ষে তা অস্বীকার করার অবকাশ ছিলনা। আমি যা উল্লেখ করেছি তাদের জন্য এটা প্রতিহত করার কোন উপায়ও ছিলনা যে, أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ –এটা হলো অতীতের কিচ্ছা কাহিনী, বা إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ –কোন মানুষ এটা তাঁকে শিখিয়ে দিয়েছে- এছাড়া তাদের বলার আর কিছুই ছিলনা। তাদের এ কথা মিথ্যা প্রমাণ করে মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন–

لِّسَانُ ٱلَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِىٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِينٌ ﴿١٠٣﴾

১. আল কুরআন : সূরা আনকাবুত, ২৯:৪৮।

–তারা যার প্রতি এটা নিক্ষেপ করে তার ভাষা তো আরবী নয়, আর এটা হচ্ছে স্পষ্ট আরবী ভাষা।[১]

এরপর তারা তাঁর সম্পর্কে যা কিছু বলছে তাহলো সরাসরি চোখে ধূলি দেয়ার মতো। কেননা তাদের অভিমত হল যে, হযরত সালমান ফার্সী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এগুলো হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে শিক্ষা দান করেন। অথবা এটা তিনি কোন রোম দেশীয় কৃতদাস থেকে শিক্ষা লাভ করে কুরআন বলে প্রচার করেন। অথচ হযরত সালমান ফার্সী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তো হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেন হিজরতের পরে। অথচ তার অনেক পূর্বে কুরআন মাজীদের অধিকাংশ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আর যে রোম দেশীয় কৃতদাস সম্পর্কে এ অভিযোগ পেশ করা হয় তিনি তো ইসলাম গ্রহণ করে নিজেই হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট কুরআন শিক্ষা করে। তার সঠিক নাম সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। কারও অভিমত হল যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনেক লোকজনের সাথে ঐ কৃতদাসকে নিয়ে সাফা পাহাড়ের নিকট বসাছিলেন। এ সম্পর্কে সবচেয়ে মজার কথা হলো, যে দু'ব্যক্তি হযরত সালমান ফার্সী ও রোম দেশীয় কৃতদাসের কথা বলা হয়েছে, তারা উভয় তো 'আজমী' বা অনারবী ছিল। আর আরবের খ্যাতনামা জ্ঞানী ভাষাবিদ যারা অত্যন্ত অহংকারী, দাম্ভিক ও সুবক্তা ছিল তারা এ কুরআনের মুকাবিলায় সম্পূর্ণ অক্ষম হয়েছে। বরং তারা এ কালামের শ্রুতিমধুরতা, বাচনভঙ্গি ও মাধুর্যতার সৌন্দর্য অনুভব করতে অক্ষম হয়েছে। সালমান, বিল'আম রোমী, ইয়াইস, জবর, ইয়াসার যে নামই হোকনা কেনো, সে রোম দেশীয় কৃতদাস তো সারাজীবন আপামর জনসাধারণের সাথে কথাবার্তা বলেছে, কিন্তু তাদের কারও নিকট থেকে এ ধরণের কথা প্রকাশ পেয়েছে কী? যে ধরণের কালাম নিয়ে মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবির্ভূত হয়েছেন। আর না তাদের কারও নামে এ কথা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অসংখ্য দুশমন ছিলো। তারা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে অপদস্ত ও অপমান করতে অতি উৎসাহী ছিলো। তার প্রতি হিংসা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি লাভ করে। তবুও তারা সে রোম দেশীয় কৃতদাসের নিকট শিক্ষা লাভ করে কুরআনের মুকাবিলায় সামনে অগ্রসর হয়নি কেনো?

১. আল কুরআন : সূরা নাহল, ১৬:১০৩।

অনুরূপ তারা দলীয় লোকদের পক্ষ থেকে দলীল প্রমাণ পেশ করতো। যেমন- নযর বিন হারেস বলত যে, মিথ্যা কল্পকাহিনী তাঁর কিতাবে উল্লেখ করা হচ্ছে। মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তো সর্বদা স্বদেশবাসীর সাথে বসবাস করেছেন। তিনি কখনো আহলে কিতাবীদের দেশে যাননি। না তিনি এ ক্ষেত্রে তাদের নিকট থেকে কোন প্রকার সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করেছেন। বরং তিনি সর্বদা মক্কাতে ছিলেন। কৈশোর ও যৌবনে তিনি পূর্ববর্তী আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) এর চিরন্তন নীতি অনুযায়ী মাঠে বকরী চরাতেন। ঐ সময় একবারও তিনি শহরের বাইরে যাননি। আর বিদেশ ভ্রমণেও তিনি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেননি। যাতে তিনি কিছু না কিছু লেখাপড়ার সুযোগ লাভ করতেন। উচ্চশিক্ষা লাভ করার তো প্রশ্নই আসেনা। সফরের সময়ও তো তিনি স্বীয় আপনজন ও সঙ্গী-সাথীদের সাথে সাথে অবস্থান করতেন। মক্কাতে অবস্থানকালেও তো তাঁর ঐ অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। তখন না তিনি কোন ইহুদী আলেম বা পাদ্রী বা কোন জ্যোতির্বিদদের নিকট গমন করেছেন। যদি এরূপ হতো তবুও কুরআনের মতো মু'জিযা আনায়ন করা এমন এক আশ্চর্যজনক কাজ, যা প্রতিটি ওযর-আপত্তি প্রতিহতকারী ও দলীল প্রমাণ রহিতকারী ও প্রত্যেক ব্যাপারে হকের দিগন্ত উন্মোচনকারী।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

إِنبَاؤه مَعَ الْمَلَائِكَةِ وَالْجِنّ

জিন ও ফিরিশতাদের দ্বারা হুযুর (ﷺ) কে সাহায্য করা

মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য বাহ্যিক মু'জিযার অন্যতম একদিক হল জিন ও ফিরিশতাদের দ্বারা তাঁকে সাহায্য করা। আল্লাহ তা'আলার ফিরিশতাদের দ্বারা তাঁকে সাহায্য করানো। আর জিনদের দ্বারা তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করানো। অসংখ্য সাহাবী তা স্বচক্ষে অবলোকন করেছেন।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী-

وَإِن تَظَٰهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَىٰهُ وَجِبْرِيلُ وَصَٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ﴿٤﴾

-এবং যদি তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে জোট বাঁধো (একে অপরকে সাহায্য করো) তাহলে আল্লাহ তা'আলা, জিবরাঈল ও সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনগণ তাঁর সাহায্যকারী এবং এরপর ফেরেশতাগণ সাহায্যকারী রয়েছে।[১]

অপর এক আয়াতে বর্ণিত আছে-

إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ أَنِّى مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۚ سَأُلْقِى فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلرُّعْبَ فَٱضْرِبُوا۟ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُوا۟ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾

-যখন হে মাহবুব! যখন আপনার পালনকর্তা ফিরিশতাদের নিকট ওহী প্রেরণ করতেন, আমি তোমাদের সাথে আছি। তোমরা মুসলমানদের অবিচলিত রাখো। অনতিবিলম্বে, আমি কাফিরদের হৃদয়সমূহে ভয়-ভীতির সঞ্চার করবো, সুতরাং কাফিরদের ঘাড়সমূহের উপর আঘাত করো এবং তাদের একেকটা জোড়ার উপর আঘাত করো।[২]

---

১. আল কুরআন : সূরা তাহরীম, ৬৬:৪।
২. আল কুরআন : সূরা আনফাল, ৮:১২।

অপর এক আয়াতে বর্ণিত আছে–

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿٩﴾

–যখন তোমরা আপন পালনকর্তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছিলে, তখন তোমাদের প্রার্থনা কবুল করেছিলেন; আর বলেছিলেন আমি তোমাদের সাহায্যকারী হাজার হাজার সারিবদ্ধ ফিরিশতা দ্বারা।[১]

অপর এক আয়াতে বর্ণিত আছে–

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ

–এবং যখন আমি আপনার প্রতি কতগুলো জিনকে ফেরালাম, যারা কান লাগিয়ে কুরআন শুনছিলো। অতঃপর যখন সেখানে হাযির হলো তখন পরস্পরের মধ্যে বললো, চুপ থাকো। অতঃপর যখন পাঠ করা সমাপ্ত হলো, তখন আপন সম্প্রদায়ের দিকে সতর্ককারী হয়ে ফিরে গেলো।[২]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনায় বর্ণিত আছে–

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ﴿١٨﴾

–নিশ্চয় আপন পালনকর্তার বহু বড় নিদর্শন দেখেছেন।[৩]

رَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي صُورَتِهِ له ستمائة جَنَاحٍ، وَالْخَبَرُ فِي مُحَادَثَتِهِ مَعَ جِبْرِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَمَا شَاهَدَهُ من كَثْرَتِهِمْ وَعِظَمِ صُورِ بَعْضِهِمْ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ مَشْهُورٌ وَقَدْ رَآهُمْ بِحَضْرَتِهِ جَمَاعَةٌ من أَصْحَابِهِ فِي مَوَاطِنَ مُخْتَلِفَةٍ فَرَأَى أَصْحَابه جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي صُورَةِ رَجُلٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ،

১. আল কুরআন : সূরা আনফাল, ৮:৯।
২. আল কুরআন : সূরা আহকাফ, ৪৬:২৯।
৩. আল কুরআন : সূরা নজম, ৫৩:১৮।

–হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) কে আসল আকৃতিতে অবলোকন করেছেন। তাঁর ছয়শত ডানা রয়েছে। তাঁর মিরাজের সফরে হযরত জিবরাঈল, ইসরাফীল (আলাইহিস্ সালাম) এর সাথে কথোপকথনের কথা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে। তাছাড়া আরও বড় বড় ফিরিশতাদের দেখার কথা প্রসিদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে।[১] হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনে বিভিন্ন সাহাবীগণ ফিরিশতাদেরকে বিভিন্ন আকৃতিতে দেখেছেন। তাঁর সাহাবীগণ হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) কে মানুষের আকৃতিতে দেখেছেন। যখন তিনি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে ইসলাম ও ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন।[২]

হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত উসামা বিন যায়িদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) কে মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনে হযরত দাহয়াতুল কালবী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর আকৃতিতে দেখেছেন। হযরত সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর ডান ও বাম পাশে হযরত জিবরাঈল ও মীকাঈল (আলাইহিস্ সালাম) কে সাদা পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছেন।[৩]

১. এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ইমাম জালাল উদ্দিন সাইয়্যুতি কর্তৃক লিখিত 'আল হাবায়িক ফী আখবারিল আলায়িফ' গ্রন্থ পাঠ করুন। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে, মক্কার মুশরিকরা যখন দারিদ্র্য ও উপবাস নিয়ে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে উপহাস করত তখন হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) আগমন করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনার রব আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। আপনার পূর্ববর্তী নবী-রাসূল সকলে পানাহারের বিষয় মুখাপেক্ষী ছিলেন। এ বিষয় আলোচনা চলা অবস্থায় হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) এর আকৃতি বিবর্ণ হয়ে সরিষার বীজের ন্যায় ক্ষুদ্রাকার হয়ে যায়। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, হে জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম)। তোমার এ কী অবস্থা হয়েছে? তিনি বললেন, আজকের দিনে আকাশের ঐ দরজা খোলা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে কারও জন্য খোলা হয়নি। একথা বলার পর তাঁর আকৃতি পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। তিনি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বললেন, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনার জন্য সুসংবাদ! তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করুন! তিনি জান্নাতের চাবি রক্ষক রিদওয়ান। জান্নাতের চাবি রক্ষক রিদওয়ান বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন, তাঁর সাথে মুক্তার মতো উজ্জ্বল একটি বস্তু ছিলো। তিনি বললেন, এটা হলো যমীনের ধনভাণ্ডারের চাবিগুচ্ছ। এটা আপনাকে দেয়া হলো। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমার দুনিয়ার ধনসম্পদের প্রতি কোনো আসক্তি নেই।

২. এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বিভিন্ন হাদীস ও মিশকাত শরীফে বর্ণিত আছে। হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) এক ব্যক্তির আকৃতি ধারণ করে মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁকে ইসলাম, ইহসান ও কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন এবং তিনি জবাব দেন।

৩. বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে, তাঁরা উভয় ওহুদ যুদ্ধে ঐ ফিরিশতাদের মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করতে দেখেছেন।

এ ধরণের অনেক বর্ণনা অনেক সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে। কোন কোন সাহাবী বদরের যুদ্ধে ফিরিশতাদের তাঁদের ঘোড়া হাঁকাতে দেখেছেন। কেউ কেউ কাফিরদের ঘাড় উড়াতে দেখেছেন। কিন্তু আঘাতকরীকে দেখতে পাননি।

আবু সুফিয়ান বিন হারেস বদর যুদ্ধে সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তিদের কালো ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে আকাশ ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলতে দেখেছেন। তাঁরা অতি দীর্ঘাকৃতির ছিলেন, কোন সিপাহী তাদের সমকক্ষ ছিলনা।

হযরত ইমরান বিন হোসাইন (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথে ফিরিশতারা মোসাহাফা বা করমর্দন করেছেন।

হযরত হামযা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কাবা গৃহের নিকট হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) কে দেখে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যান।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) লাইলাতুল জিনে জিনদের দেখেছেন। তাদের আলাপ আলোচনা শুনেছেন।[১] এবং তাদের 'যত' সম্প্রদায়ের লোকদের মতো দীর্ঘাকৃতির দেখেছেন।[২]

হযরত ইবনে সাদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে-

أَنَّ مُصْعَبَ بن عُمَيْرٍ لَمَّا قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ أَخَذَ الرَّايَةَ مَلَكٌ عَلَى صُورَتِهِ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ (تَقَدَّمْ يَا مُصْعَبُ) فقال لَهُ المَلَكُ لَسْتُ بِمُصْعَبٍ فَعَلِمَ أَنَّهُ مَلَكٌ،

১. হযরত ইবনে মাস'উদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আবু নাঈম "দালায়িলুল নুবুওয়াত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হল এই যে, হযরত ইবনে মাসুদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, এক রাতে আমি ব্যতীত আসহাবে সুফফাগণ রাতের খাবার খান। তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে তাঁর গৃহে এ খেয়ালে নিয়ে যান যে, গৃহে কোন খাবারের ব্যবস্থা করা যায় কিনা। কিন্তু গৃহ থেকে দাসী বের হয়ে বললো, গৃহে খাওয়ার মতো কিছুই নেই। আমি নিরুপায় হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হই। এ অবস্থায় উক্ত দাসী আমাকে ডেকে নিয়ে যায়। আমিও দেখি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খেজুরের ডাল হাতে নিয়ে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমাকে বললেন, চলো আমি যেখানে যাব তুমিও সেখানে যাবে। এরপর আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'বাকীউল গারকাদ' স্থানে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানে তিনি এক গাছের নিকট দাগ দিয়ে আমাকে বসিয়ে বললেন, দাগের বাইরে যাবেনা। এরপর সে স্থানে জিনেরা আগমন করে ভোর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাতে বায়াত গ্রহণ করে।

২. 'যত' আধাকৃতির কালো বর্ণের লোকদেরকে বলা হয়। 'কামুস' অভিধান গ্রন্থে রয়েছে, 'যাত' জাঠ শব্দ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। অর্থাৎ দীর্ঘাকৃতির অধিকারী।

–উহুদের যুদ্ধে হযরত মাস'আব বিন উমায়ের (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) শহীদ হবার পর ফিরিশতা তাঁর আকৃতি ধারণ করে পতাকা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে বললেন, হে মাস'আব সামনে অগ্রসর হও। একথা শুনে ফিরিশতা বললেন, আমি মাস'আব নই। তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বুঝতে পারেন যে, এতো ফিরিশতা।

একাধিক বর্ণনাকারী থেকে এ বর্ণনা বর্ণিত আছে যে, তাঁরা হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করে বলেন,

بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَ شَيْخٌ بِيَدِهِ عَصًا فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نَغْمَةُ الْجِنِّ، من أَنْتَ؟ قَالَ أَنَا هَامَةُ بن الهيم بن لاقس بن إِبْلِيسَ) فَذَكَرَ أَنَّهُ لَقِيَ نُوحًا وَمَنْ بَعْدَهُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ سُوَرًا مِنَ الْقُرْآنِ،

–একদিন আমরা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনে লাঠি হাতে এক বৃদ্ধকে বসা দেখতে পাই। সে এসে মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সালাম করে। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, এটা তো জিনের আওয়াজ। তুমি কে? প্রত্যুত্তরে সে বলল, "আমি হামা বিন হায়্যিম বিন লাকিস বিন ইবলিস"। সে আরও বলল, আমি হযরত নূহ (আলাইহিস্ সালাম) এর সাক্ষাৎ পেয়েছি। এরপর অন্যান্য নবীদের দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে পবিত্র কুরআন মাজীদের কয়েকটি সূরা শিক্ষাদান করেন।[১]

ওয়াকেদি থেকে এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে,

قَتَلَ خَالِدٌ عِنْدَ هَدْمِهِ الْعُزَّى لِلسَّوْدَاءِ الَّتِي خَرَجَتْ لَهُ نَاشِرَةً شَعْرَهَا عُرْيَانَةً فَجَزَلَهَا بِسَيْفِهِ وَأَعْلَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ تِلْكَ الْعُزَّى.

১. বায়হাকী : দালায়িলুন্ নবুয়্যাত, বাবু মা রুভিয়া ফী কুদুমি হা-ম্মা, ৬:১৭, হাদিস নং : ২১১৫।

–হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে যখন ওজ্জা প্রতিমা ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়। তিনি এক কুৎসিত কালো অগোছালো নারী দেখতে পেয়ে তাকে তরবারী দিয়ে হত্যা করে ফেলেন। এরপর তিনি এ ঘটনা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সমীপে পেশ করেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এতো ওজ্জা দেবী।

তিনি আরও বর্ণনা করেছেন,

إِنَّ شَيْطَانًا تَفَلَّتَ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ صَلَاتِي فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ فَأَخَذْتُهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أَخِي سُلَيْمَانَ (رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) فَرَدَّهُ اللهُ خَاسِئًا،

–শয়তান গতরাতে আমার নামাযের উপর হামলা করে নামায নষ্ট করার ইচ্ছা করে। আল্লাহ আমাকে ক্ষমতা দান করেছেন। তাই আমি তাকে বন্দী করে ফেলি। আমার ইচ্ছা ছিলো যে, আমি তাকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখি। যাতে তোমরা সবাই তাকে দেখতে পারো। কিন্তু আমার ভাই হযরত সোলাইমান (আলাইহিস্ সালাম) এর দো'আ স্মরণ হবার কারণে আমি তাকে ছেড়ে দিই।[1] দো'আটি হচ্ছে এই رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ –হে আমার রব আমাকে ক্ষমা করো এবং আমাকে এমন রাজ্য দান করো যা আমার পর কারো জন্য উপযোগী না হয়, নিশ্চয় তুমি বড়ই দাতা।[2] আমি তাকে বন্দী করিনি। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে অকৃতকার্য করে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। একথা অতি প্রসিদ্ধ।

১. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু কাওলিল্লাহি তা'আলা ওয়া ওয়াহাবনা লি দাউদা ওয়া সুলাইমানা, ১১:২৩৫, হাদিস নং : ৩১৭০।
খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু মা লা ইয়াজুজু মিন, পৃ. ২১৬, হাদিস নং : ৯৮৭।

২. আল কুরআন : সূরা সোয়াদ, ৩৮:৩৫।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

مِنْ دَلَائِلِ نُبُوَّتِهِ وَعَلَامَاتِ رِسَالَتِهِ مَا تَرَادَفَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ عَنِ الرُّهْبَانِ وَالْأَحبار

পূর্ববর্তী যাজক, পাদ্রী ও পণ্ডিতগণ কর্তৃক হুযুর (ﷺ) এর নবুওয়াতের নিদর্শন ও আলামত বর্ণনা

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নবুওয়াতের আলামত ও নির্দশনের বিষয় বর্ণিত হাদিসসমূহ ইহুদী ও খ্রিস্টান আলেমদের থেকেও বর্ণিত হয়েছে। আর তাঁর উম্মাত থেকে বর্ণিত হাদিসসমূহেও রয়েছে। ঐ বর্ণনাসমূহের মধ্যে তাঁর পবিত্র নাম, মোহরে নবুওয়াতের বর্ণনাও রয়েছে। যা তাঁর পিঠের উভয় কাঁধের মাঝখানে বিদ্যমান ছিল। তুব্বা, আউস বিন হারেসা, কাব বিন লুয়াই, সুফিয়ান বিন মাজাশি' ও কুসবিন সা'আদার মতো পূর্ববর্তী একত্ববাদী, তাওহীদে বিশ্বাসীদের কবিতায়ও তা বিদ্যমান। এছাড়াও জায়িদ বিন আমর বিন নুফায়েল, ওরাকা বিন নওফেল, আসফালান হিমিয়ারীর বর্ণনায়ও উল্লেখ রয়েছে।

ইয়ামানবাসী ইহুদী আলেম শামাউন তুব্বার বন্ধু ছিল। সে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর বিষয় উল্লেখ করেছে। তা তাওরাত ও ইনজিলে লিপিবদ্ধ আছে। আলেমগণ ঐ বিবরণসমূহ একত্রিত করে সংকলন করেছেন। তাওরাত ও ইনজিলে বর্ণিত বর্ণনাসমূহ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর ঐসব ইহুদী আলেম যারা পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হন। যথা হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম ও সাঈদের দু'পুত্র ইবনে ইয়ামীন ও মুখায়িরিক, হযরত কা'ব ও বুহাইরা পাদ্রী,[1] হাবসা অধিবাসী নাসতূর[2], খ্রিস্টান আলেম বুসরা,[3] দাগাতের,[4] সিরিয়ার ও নজরানের পাদ্রীগণ ছাড়াও আরো অনেক খ্রিস্টান আলেম ইসলাম গ্রহণ করেন।

১. হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাল্যকালে তাঁর চাচা আবু তালিবের সাথে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রতিমধ্যে বুসরা নামক স্থানে বুহাইরা পাদ্রী কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলাকে আমন্ত্রণ করে। সে উক্ত আমন্ত্রণে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে দেখে আবু তালিবকে সতর্ক করে বললো যে, এ বালককে ইহুদীদের হাত থেকে নিরাপদে রাখুন। এ বালক শেষ নবী হবেন।

২. নাসতূর নাজ্জাশীর দরবারের প্রসিদ্ধ খৃষ্টান আলেম ছিলেন। সে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সত্য নবী বলে স্বীকার করেছে।

৩. বুসরা খ্রিস্টান আলেম ছিল। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার নিকট নিজ নামের মোহরাঙ্কিত পত্র হযরত দাহইয়া (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর মারফতে প্রেরণ করেন। সে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সত্য নবী বলে স্বীকার করে।

৪. দাগাতের রোমের প্রসিদ্ধ পাদ্রী ছিল, সে হযরত দাহইয়া (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে। খ্রিস্টানরা তাকে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে শহীদ করে ফেলে।

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের দু'জন খ্রিস্টান আলেম ও নেতৃস্থানীয় লোকজন, মিশরের বাদশাহ মাকুকাশের সাথী ইবনে সুরিয়া, ইবনে আখতাব ও তার সহোদর ভাই কাব বিন আসাদ, জোবায়ির বিন বাতীয়া প্রমুখ ইহুদী আলেম হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নবুওয়াত স্বীকার করে। তবে তারা প্রতিহিংসা ও দুর্ভাগ্যবশতঃ ইসলাম গ্রহণ করেনি। এ সম্পর্কে অসংখ্য বর্ণনা বর্ণিত আছে। যা গণনা করা সম্ভব হয়নি।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ কথা বলে ইহুদী ও খ্রিস্টান আলেমদেরকে সজাগ করেছেন যে, তোমাদের কিতাবে আমি ও আমার সাহাবীদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে এবং ওইগুলোর মধ্যে আমার নবুওয়াতের প্রমাণ রয়েছে। সেহেতু তোমাদের সহীফাসমূহে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বৈশিষ্ট্যর বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। সহীফা ও আসমানী কিতাব পরিবর্তনের কারণে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের নিন্দাবাদ করেছেন। কেননা তারা সত্যকে গোপন করে সত্য কথা বলা থেকে বিরত রয়েছে। তিনি তাদেরকে মুবাহালার আহবান জানিয়েছেন। কিন্তু তারা সকলে মুবাহালা না করে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছে।[২]

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। এতে তারা ভীষণ ভীত হয়ে পড়ে। যদি তাঁর কথা তাদের কিতাবের বিপরীত হত তাহলে তাদের জন্য মুকাবিলা করা ছিল অনেক সহজ। কেননা তিনি স্বীয় জান-মাল বিসর্জন দিয়েছেন। বাসস্থান পরিত্যাগ করেছেন। সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। তিনি তাদের আল্লাহর বাণী পাঠ করে শুনিয়ে ঘোষণা দান করেন।

قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٣﴾

–হে রাসূল! আপনি তাদের বলে দিন তোমরা তাওরাত এনে আমার সামনে তিলাওয়াত করো যদি তোমরা সত্যবাদী হও।[৩]

---

[২]. মুবাহালার ঘটনা কুরআন মাজীদ ও হাদীস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খ্রিস্টান আলেমদের তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সকলকে নিয়ে আসার জন্য আহবান করে বলেন, আমি ও আমার আহলে বায়তদের নিয়ে আসছি। আমরা উভয় শপথ করে বলবো, যে মিথ্যা দাবী করে, তার উপর আল্লাহর লা'নত বা অভিসম্পাত হোক। একথা শুনে খ্রিস্টান আলেমগণ অস্বীকার করে। কারণ তারা মিথ্যার উপর ছিলো।

[৩]. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:৯৩।

যদি তারা সত্যবাদী হত তাহলে অবশ্যই তারা তাওরাত কিতাব তাঁর সামনে এনে তিলাওয়াত করত। কিন্তু তারা তা না করে তাঁর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। এর দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, তাওরাতের আয়াত সমূহে সত্যবাদীদের সাক্ষী বিদ্যমান ছিল।

তিনি জ্যোতির্বিদদের আল্লাহর আযাব সম্পর্কে ভয়ভীতি প্রদর্শন করেছেন। যেমন- শাফি বিন কুলাইব, সাক, সাতীহ, সাওদা বিন কারেব, খুনাফির, নাজরানবাসী আফ'আ, জজল বিন জজল কিন্দী, ইবনে খালাছা দাওসী, সাদবিন বিনতে কারীজ ও ফাতেমা বিনতে নোমান প্রমুখ। তাদের সংখ্যা গণনা করা কঠিন। এমনকি তাদের প্রতিমা সমূহের মুখ দিয়ে তাঁর নবুওয়াতের সত্যতার বাণী ঘোষিত হয়েছে। যখন তাঁর রিসালাতের বহিঃপ্রকাশ হয়েছে তখন প্রতিমা সমূহ তাঁর স্বীকৃতি দিয়েছে। জিনদের গায়েবী আওয়াজ, প্রতিমা গৃহের প্রতিমা, কুরবানীর স্থান থেকে অদৃশ্য আওয়াজের মাধ্যমে তাঁর নবুওয়াতের সাক্ষী প্রকাশিত হয়েছে। প্রাচীন শিলালিপি ও কবরের প্রাচীরে তাঁর নবুওয়াতের সততা ও সত্যতার স্বাক্ষর বিদ্যমান পাওয়া যায়। সেগুলো অতি প্রসিদ্ধ। বরং ঐ সমস্ত লেখা দেখে অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে।

উনত্রিশতম পরিচ্ছেদ

مِنْ ذَلِكَ مَا ظَهَرَ مِنَ الآيَاتِ عِنْدَ مَوْلِدِهِ وَمَا حَكَتْهُ أُمُّهُ وَمَنْ حَضَرَهُ مِنَ الْعَجَائِبِ

হুযুর (ﷺ) শুভ জন্মের সময় সংঘটিত বিস্ময়কর ঘটনা

তাঁর পৃথিবীতে শুভ জন্মের সময় যে সমস্ত মু'জিযা ও আশ্চর্যজনক ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছে এবং যা তাঁর মাতা ও উপস্থিত অন্যান্য নারীগণ বর্ননা করেছেন এখন ঐ মু'জিযাসমূহ আলোচনা করা হবে। যেমন- তাঁর পৃথিবীতে আগমনের সময় মাথা উপরের দিকে উঠিয়ে রাখা এবং তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখছেন।

তাঁর পৃথিবীতে আগমনের সময় তাঁর মাতা তাঁর থেকে বিচ্ছুরিত নূর দেখেন। ঐ সময় উসমান বিন আবুল আসের জননীও উপস্থিত ছিল। তিনি বলেন, আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলী একেবারে নিচে নেমে এসে যায়। তাঁর পৃথিবীতে আগমনের সময় এক নূর প্রকাশিত হয়। তখন চতুর্দিকে সে নূর ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায়নি।

হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর মাতা হযরত শিফা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

لَمَّا سَقَطَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَدِىْ وَاسْتَهَلَّ سَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ رَحِمَكَ اللهُ وَأَضَاءَ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى قُصُورِ الرُّوم.

–তিনি পৃথিবীতে আগমনের সময় মাতৃউদর থেকে বের হয়ে যখন আমার হাতের উপর আসেন তখন তিনি হাঁচি দিয়ে "আলহামদুলিল্লাহ" পাঠ করেন। তখন আমি গায়েবী আওয়াজ শুনতে পাই যে, জনৈক ঘোষক বলছে, رَحِمَكَ اللهُ অর্থাৎ– আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করেছেন। তখন পৃথিবীর পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত আলোকিত হয়ে যায়। ঐ আলোর মধ্যে আমি রোম সাম্রাজ্যের প্রাসাদ সমূহ অবলোকন করি।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দুধ মা হালিমা ও তাঁর স্বামী হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বরকতের উল্লেখ করে বলেন,

وَدُرُوْرُ لَبَنَيْهَا لَهُ وَلَبَنِ شَارِفِهَا وَخِصْبِ غَنَمِهَا وَسُرْعَةِ شَبَابِهِ وَحُسْنِ نَشْأَتِهِ وَمَا جَرَى مِنَ الْعَجَائِبِ لَيْلَةَ مَوْلِدِهِ مِنَ ارْتِجَاجِ إِيوَانِ كِسْرَى

وَسُقُوطِ شُرُفَاتِهِ وَغَيْضِ بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّة وخمود نار فَارِسَ وَكَانَ لَهَا أَلْفُ عَامٍ لَمْ تَخْمَدْ،

–আমাদের উটনীসমূহ দুধে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আমাদের বকরীসমূহ সবল ও সতেজ হয়ে যায়। তাঁর দৈহিক বৃদ্ধিও অতি তাড়াতাড়ি হতে থাকে। তাঁর পৃথিবীতে আগমনের সময় আশ্চর্যজনক ঘটনাবলীর মধ্যে এটাও ছিল যে, পারস্য সম্রাট কিসরার রাজপ্রাসাদে কম্পন দেখা দিয়ে গম্বুজ ভেঙ্গে পড়ে। তাবরীয়া হ্রদের সম্পূর্ণ পানি শুকিয়ে যায়। ইরানের অগ্নিউপাসকদের হাজার বছরের প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড নিভে যায়।

তাঁর মু'জিযাসমূহের মধ্যে এটাও এক মু'জিযা যে,

أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَكَلَ مَعَ عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ وَآلِهِ وَهُوَ صَغِيرٌ شَبِعُوا وَرَوُوا فَإِذَا غَابَ فَأَكَلُوا فِي غَيْبَتِهِ لَمْ يَشْبَعُوا، وَكَانَ سَائِرُ وَلَدِ أَبِي طَالِبٍ يُصْبِحُونَ شُعْثًا وَيُصْبِحُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَقِلًا دَهِينًا كَحِيلًا،

–বাল্যকালে তিনি যখন চাচা আবু তালিবের অন্যান্য বালকদের সাথে আহার করতেন তখন সকলে পরিতৃপ্ত হয়ে যেতো। যখন তিনি তাদের সাথে আহার করতেন না, তখন অন্যরা তৃপ্তি লাভ করতে পারত না। আবু তালিবের শিশুরা সকাল বেলায় ঘুম থেকে ব্যাকুল অবস্থায় জাগ্রত হত। আর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সকাল বেলায় ঘুম থেকে হাসিখুশি ও অত্যন্ত আনন্দিত পরিপাটি নয়ন যুগলে খুশি ভরা অবস্থায় জাগ্রত হতেন।

উম্মে আইমান যার উপর তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। তিনি বলেন,

مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَى جُوْعًا وَلَا عطَشًا صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا،

–বাল্যকালে তাঁকে কখনো ক্ষুধা ও তৃষ্ণার অভিযোগ করতে দেখেনি। পরবর্তী জীবনেও তাঁর ঐ অভ্যাস বিদ্যমান ছিল।

ঐ সমস্ত আশ্চর্যজনক ঘটনাবলীর মধ্যে এটাও ছিল যে, আকাশকে উল্কাপাত থেকে সংরক্ষণ করা হয়। কেননা শয়তান আকাশে আড়িপাতা বন্ধ করে দেয়। এরপূর্বে তারা চুরি করে গোপনে আকাশের কথাবার্তা শুনতো।

তিনি বাল্যকাল থেকে মূর্তিকে ঘৃণা করতেন এবং অন্ধকার যুগের রীতি-অভ্যাস থেকে বিরত থাকতেন। তাঁকে মহান আল্লাহ তা'আলা অতিউত্তম চরিত্রে ভূষিত করেছেন। নিন্দনীয় অভ্যাস থেকে সংরক্ষিত রেখেছেন।

তাঁর সতর আবৃত করার প্রসিদ্ধ ঘটনা হল এই যে, কাবাগৃহ পুণঃনির্মাণের সময় আপামর জনসাধারণের সাথে তিনিও পাথর সংগ্রহে নিয়োজিত হন। তখন তিনি স্বীয় পরিধেয় লুঙ্গি খুলে কাঁধের উপর রেখে পাথর বহন করার ইচ্ছা পোষণ করেন। তাই পরিধানের লুঙ্গি খোলা মাত্রই জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ঐ অবস্থা দেখে তিনি তাড়াতাড়ি লুঙ্গি পরে নেন। এ অবস্থা দেখে তাঁর চাচা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, কি হয়েছে? তিনি বললেন, إِنِّي نُهِيتُ عَنِ التَّعَرِّي "আমাকে সতর অনাবৃত করতে নিষেধ করা হয়েছে।"

ওই বিস্ময়কর ঘটনাবলীর মধ্যে এটাও রয়েছে যে, তাঁর সফরকালে দ্বি-প্রহরে মেঘমালা তাঁর উপর ছায়া দান করত।

এক বর্ণনায় হযরত খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) ও তাঁর সাথী অন্যান্য মহিলাদের থেকে বর্ণিত আছে,

رَأَيْنَهُ لَمَّا قَدِمَ وَمَلَكَانِ يُظِلاَّنِهِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِمَيْسَرَةَ فَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ رَأَى ذَلِكَ مُنْذُ خَرَجَ مَعَهُ فِي سَفَرِهِ،

–এক সময় তিনি সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করার সময় তাঁরা দেখতে পায় যে, দু'জন ফিরিশতা তাঁর মাথার উপর ছায়া দান করেছে। তাঁরা একথা স্বীয় কৃতদাস মায়সারা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা)-যিনি সিরিয়া সফরে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথী ছিলেন- তার নিকট বললে, প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন,"এ অবস্থা তো আমি সফরের শুরু থেকে দেখছি"।

এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে। হযরত হালিমা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেন,

رَأَتْ غَمَامَةً تُظِلُّهُ وَهُوَ عِنْدَهَا،

–তিনি বাল্যকালে আমার নিকট অবস্থান করার সময় একখণ্ড মেঘ তার উপর ছায়া দান করতে দেখেছি। এ বর্ণনা তাঁর দুধ ভাই থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

ঐ সমস্ত বিস্ময়কর ঘটনার মধ্যে এটাও ছিল যে,

أَنَّهُ نَزَلَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ قَبْلَ مَبْعَثِهِ تَحْتَ شَجَرَةٍ يَابِسَةٍ فَاعْشَوْشَبَ مَا حَوْلَهَا وَأَيْنَعَتْ هِيَ فَأَشْرَقَتْ وَتَدَلَّتْ عَلَيْهِ أَغْصَانُهَا بِمَحْضَرِ من رآه وميل فيء الشَّجَرَةِ إِلَيْهِ فِي الخبر الآخر بحتى أَظَلَّتْهُ،

–নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বে কোন এক সফরে তিনি এক শুকনো গাছের নিচে অবস্থান করায় সে বৃক্ষের চতুর্দিকে সবুজ ও সতেজ হয়ে যায়। আর শুকনো গাছ ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে যায়। গাছের শাখা-প্রশাখাসমূহ ফলের ভারে নিচের দিকে নুয়ে পড়ে। আর তখন উপস্থিত লোকজন এদৃশ্য স্বচক্ষে অবলোকন করেছে।

অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে। ঐ গাছ লম্বা হয়ে তাঁর উপর ছায়া দান করে।

একথাও বর্ণিত আছে যে,

أَنَّهُ كَانَ لَا ظِلَّ لِشَخْصِهِ فِي شَمْسٍ وَلَا قَمَرٍ لِأَنَّهُ كَانَ نُورًا، وَأَنَّ الذُّبَابَ كَانَ لَا يَقَعُ عَلَى جَسَدِهِ وَلَا ثِيَابِهِ،

–চন্দ্র ও সূর্যের আলোতে তাঁর পবিত্র দেহ মুবারকের ছায়া যমীনে পড়তো না। কেননা তাঁর দেহ ছিল নূরের। তাঁর পবিত্র দেহ মুবারকে ও পরিধানের কাপড়ে কখনো মশা-মাছি বসতো না।

তাঁর নবুওয়াতের দলীল-প্রমাণের মধ্যে এটাও এক প্রমাণ যে, তাঁর নবুওয়াত প্রকাশের সময় নিকটবর্তী হলে একাকীত্ব ও নির্জনতা তাঁর অতি প্রিয় হয়। তারপর তিনি জীবনের শেষভাগে স্বীয় ইহজগত ত্যাগের বিষয় জানিয়ে দেন। তাঁর কবর তাঁর বাসস্থান মদীনাতে হবে। আর তাঁর গৃহ ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান বেহেশতের বাগানের অংশে পরিণত হবে একথাও জানিয়ে দেন।

তাঁর ইহজগত ত্যাগের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ইখতিয়ার দিয়েছেন।[১] আর তাঁর ওফাত সংক্রান্ত হাদীসে তাঁর অনেক মু'জিযা ও বৈশিষ্ট্যের

[১]. বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় বর্ণিত আছে, তাঁর ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলে তিনি একদিন ভাষণ দান করে বলেন, মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে দুনিয়া ও আখিরাতের নিয়ামতসমূহের কোন একটি গ্রহণ করার ইখতিয়ার দান করেন। আল্লাহর বান্দা আখিরাতের নিয়ামতসমূহ বেছে নিয়েছে। একথা শুনার পর হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কাঁদতে শুরু করেন। হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, তাঁর প্রতি দেখুন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আখিরাতের নিয়ামতসমূহ গ্রহণ করেছেন এ কথা শুনে তিনি কান্না জুড়ে দিয়েছেন। হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এ কথা

কথা বলা হয়েছে। ফিরিশতাগণ তাঁর জানাযার নামায পড়েন।[১] রূহ কবজ করার জন্য মালাকুল মওতকে তার অনুমতি গ্রহণ করতে হয়েছে।[২] যা তাঁর পূর্বে আর কারও নিকট থেকে গ্রহণ করা হয়নি। তাঁর ইহজগত ত্যাগের পর লোকজন ফিরিশতাদের আওয়াজ শুনেছে যে,

أَنْ لَا تَنْزِعُوا الْقَمِيصَ عَنْهُ عِنْدَ غُسْلِهِ،

–গোসলের সময় তাঁর দেহের পোশাক যেন খোলা না হয়।

অন্যান্য বর্ণনায় বর্ণিত আছে, তাঁর ইহজগত ত্যাগের পর হযরত খিজির (আলাইহিস্ সালাম) ও ফিরিশতাগণ তাঁর আহলে বাইতের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। তাঁর মু'জিযা ও বরকতসমূহ তাঁর জীবিত থাকাকালেও ইহজগত ত্যাগের পর সাহাবীদের উপর প্রকাশিত হয়েছে। যেমন– হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর চাচা হযরত আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে সাথে নিয়ে তাঁর উসিলা দিয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া করেন।[৩]

এছাড়াও আরো অনেকে তাঁর পরিবারবর্গ থেকে বরকত লাভে নিজেদের ধন্য করেছেন।

বুঝতে পারেননি। হযরত আবু বক্‌র (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বুঝতে পেরেছেন যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ওফাত হয়ে যাবে।

১. জানাযার নামাযের অর্থ– মাগফিরাত লাভের দোয়া করা নয়। বরং তাঁর পবিত্র দেহ মুবারকের নিকট দাঁড়িয়ে দুরূদ ও সালাম পাঠ করা। একাজ শুধু জানাযার জন্য নির্দিষ্ট নয়। বরং এটা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

২. হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) গৃহের দরজায় দাঁড়িয়ে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট আরজ করেন, মালাকুল মাউত দরজায় দাঁড়িয়ে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি লাভের অপেক্ষায় আছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গৃহে প্রবেশের অনুমতি দান করেন। তিনি গৃহে প্রবেশ করে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনার রূহ কবজ করার ব্যাপারে আমাকে আপনার অনুমতি নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আপনি যা আদেশ করবেন। তাই গ্রহণ করা হবে। যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে রূহ কবজ করা হবে। নতুবা ফিরে যাবো। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রূহ কবজ করার অনুমতি দান করেন। এ বৈশিষ্ট্য দুনিয়ার আর কোন নবী লাভ করতে পারেননি।

৩. হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর খিলাফতকালে ১৭ হিজরীতে অনাবৃষ্টির কারণে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন হযরত কা'ব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আবেদন করেন। বনী ইসরাঈলের অভ্যাস ছিল তারা এ ধরণের বিপদের সম্মুখীন হলে আম্বীয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) এর বংশধরদের উসিলা দিয়ে আল্লাহর দরবারে বৃষ্টি বর্ষণের জন্য দোয়া করতো। সুতরাং আপনিও তাই করুন। তখন হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মদীনাবাসী ও হযরত আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে সাথে নিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে উপস্থিত হয়ে এ বলে আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করতে আরম্ভ করেন যে, হে আল্লাহ! আমরা তোমার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চাচার মাধ্যমে তোমার নৈকট্য লাভ করতে ইচ্ছুক। আর তাঁকে আমাদের সুপারিশকারী মনোনীত করেছি। অতঃপর তিনি জনসাধারণের দিকে মনোযোগী হয়ে বললেন, হে লোক সকল! আপনারা মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট গুনাহ মাফ চেয়ে দোয়া করুন। অতঃপর হযরত আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) দাঁড়িয়ে মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়ার বরকতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

ত্রিশতম পরিচ্ছেদ

خَاتِمَةٌ وَتَذْيِيلٌ

পরিশিষ্ট

কাযী আবুল ফযল (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, এ অধ্যায়ে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সুস্পষ্ট মু'জিযাসমূহের সূক্ষ্ম বিষয় আলোচনা করা হবে। আর নবুওয়াতের আলামত সম্পর্কে আলোচিত বর্ণনাসমূহ এর জন্য যথেষ্ট। তাছাড়া অধিকাংশ মু'জিযার সম্পর্কে আলোচনা করা থেকে বিরত থেকেছি। ঐগুলো বাদ দিয়ে এখন ঐ সমস্ত বিষয় আলোচনা করব। আমি দীর্ঘ হাদিসসমূহ থেকে শুধু আমার আলোচ্য বিষয় উল্লেখ করব, যা আমার উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তাছাড়া হাদীসের অবশিষ্ট অংশ সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে পরিত্যাগ করি। আর বহু সংখ্যক গরিব হাদীসের (অপ্রসিদ্ধ) মধ্যে শুধুমাত্র ঐ সমস্ত হাদিস উল্লেখ করব, যা সহীহ ও কোন না কোন উপায়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং ঐ সমস্ত গরিব হাদিসগুলো হাদীসের ইমামগণ বর্ণনা করেছেন। তবুও ঐ বর্ণনাসমূহের বর্ণনাকারীদের ধারাবিবরণী সংক্ষিপ্তকরণার্তে পরিত্যাগ করি। তবে একথা বলা প্রয়োজন যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মু'জিযাসমূহ যদি পুরোপুরিভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় তাহলে তা কয়েক খণ্ডের বিরাট বিরাট দপ্তর হবে।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মু'জিযাসমূহ ও অন্যান্য আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) এর মু'জিযাসমূহ দু'টি কারণে অতি স্পষ্ট ও প্রকাশ্য। এক কারণ হলো যে, তাঁকে অধিক সংখ্যক মু'জিযা দান করা হয়েছে। অন্যান্য নবীকে যে ধরণের মু'জিযা দেয়া হয়েছে, অনুরূপ মু'জিযা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেও প্রদান করা হয়েছে। বরং তার চেয়ে আরও বেশী পরিমাণ দেয়া হয়েছে। বর্ণনাকারীগণ সেগুলো বর্ণনাও করেছেন। আপনারা যদি সেগুলো জানতে চান তাহলে এ সম্পর্কিত বিষয় ও পূর্ববর্তী আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) এর মু'জিযা সম্বলিত অধ্যায় পাঠ করুন। তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় সে সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে সক্ষম হবেন। আর আমি এ সম্পর্কে বলছি যে, তাঁকে অসংখ্য মু'জিযা দেয়া হয়েছে। সেটা এজন্য যে সমস্ত কুরআন মাজীদই এক অপূর্ব মু'জিযা। কমপক্ষে তাঁর বিস্ময়কর বাচনভঙ্গি, বিশেষজ্ঞদের মতে সূরা-আল-কাউসার যথা- إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ সহ এধরণের আয়াতসমূহ। কোন ইমামের মতে, কুরআন মাজীদের প্রতিটি আয়াত স্ব-স্ব স্থানে এক একটি জাজ্জ্বল্যমান মু'জিযা।

অপর একদল আলেম আরও বাড়িয়ে বলেছেন যে, পবিত্র কুরআন মাজীদের প্রতিটি বাক্যই এক একটি মু'জিযা। চাই তা এক বাক্যই হোক না কেনো। এটাই বাস্তব সত্য যা আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি। কেননা পবিত্র কুরআন মাজীদে মহান আল্লাহর তা'আলা ঘোষণা করেছেন–

فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ

–এর অনুরূপ একটা সূরা নিয়ে এসো।[১]

এটাতো অতি কম। যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। এরূপ হওয়া সত্ত্বেও তাদের অক্ষমতা লক্ষণীয় হয়েছে। এর আলোচনা অতি দীর্ঘ। তবুও কথা হলো যে, সম্ভবতঃ পবিত্র কুরআন মাজীদে ৭৭ হাজারেরও বেশী বাক্য রয়েছে। এ সংখ্যা কোন কোন আলেমদের গণনা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়েছে। আর সূরা আল কাউসার إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ এ দশটি বাক্য রয়েছে। এভাবে যদি পুরো কুরআন মাজীদকে সূরা কাউসারের মতো ভাগ করা হয় তাহলে কুরআনুল করীমে বাক্যের সংখ্যা ৭ হাজারের বেশী হবে। যার প্রতিটি বাক্যই এক একটি মু'জিযা। তারপরও এটার মু'জিযা হবার বিষয়টি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ হলো যে, এর "বালাগাত" বা ভাষালঙ্কারের দিক থেকে। তৃতীয় কারণ হল– কাব্যিক রচনাশৈলী বা "নজম'। তাহলে এর ধরণের সংখ্যা হবে দ্বিগুণ। তারপর তার 'ই'জায' বা বিস্ময়কর বাচনভঙ্গির দিক থেকেও তা দ্বিগুণ হবে। একত অদৃশ্য বা গায়েবী বিষয়ের খবর দেয়া। কেননা যখন এভাবে একই সূরাতে অদৃশ্য বা গায়েবী বিষয়ের খবর দেয়া হয়েছে। তার মধ্যেও প্রতিটি বিষয়বস্তু এক একটি মু'জিযা। আর দু'বারে এ সংখ্যা দ্বিগুণ হবে।

অতঃপর 'ই'জায' বা অলৌকিকত্বের দ্বিতীয় প্রকার যা আমি আলোচনা করছি। তাতে এ সংখ্যা দ্বিগুণ হবে। এটাওতো পবিত্র কুরআন মাজীদেরই। যদি কোন সংখ্যা কুরআন মাজীদের মু'জিযায় গ্রহণীয় না হয়, তবুও এর দলিল প্রমাণ গণনা করে নির্ধারণ করা সম্ভব হবেনা। অতঃপর মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ সম্পর্কে যে সমস্ত হাদিস বর্ণনা করেছেন, সেগুলোও ঐ বিষয়ের দলিল। যার প্রতি আমি ইঙ্গিত প্রদান করছি। যা সংখ্যায় অনেক বেশী প্রমাণিত হয়েছে।

১. আল কুরআন : সূরা ইউনুস, ১০:৩৮।

দ্বিতীয় কারণ হল যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মু'জিযাসমূহ ছিল স্পষ্ট। কেননা পূর্ববর্তী আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) এর মু'জিযা ছিল সমসাময়িক শক্তি মোতাবেক এবং যে বিষয়ে সমসাময়িক লোকজন পারদর্শী ছিল সে অনুযায়ী। যেমন- হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর সময় লোকজন যাদুবিদ্যার চূড়ান্ত সীমায় পৌছেছে। এ কারণে তাঁকে তাদের প্রতিহত করার মু'জিযা প্রদান করা হয়েছে। আর তিনিও সে ধরণের মু'জিযা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। যার কারণে তিনি তাদেরকে চূড়ান্তভাবে পরাভূত করে দেন। আর তিনি এমন কিছু করে দেখান, যা করতে তারা ছিল সম্পূর্ণ অক্ষম। হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর মু'জিযা (লাঠি ও হাত উজ্জ্বল হওয়া) এরও হয়েছে। তাঁর সময় চিকিৎসাবিদ্যা উন্নতির চরম শিখরে পৌছেছিল। আর চিকিৎসকের সংখ্যা ছিলো অধিক। তখন স্বাভাবিকভাবে হযরত ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) এমন বস্তু নিয়ে এসেছেন, যার মুকাবিলায় তাঁর সম্প্রদায়ের চিকিৎসকগণ অক্ষম হয়। হযরত ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) তাদের নিকট এমন এক চিকিৎসা নিয়ে এসেছেন। যার সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিলনা। অর্থাৎ তাঁর মৃতকে জীবিত করা, জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করা। কোন চিকিৎসা ছাড়া কুষ্ঠরোগীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে দেয়া। এ অবস্থা অন্যান্য আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) এর মু'জিযাও রয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে যখন পাঠান, তখন আরববাসীরা চারটি বিষয়ে পারদর্শী ছিলো। যথা– (১) বালাগাত বা অলংকার শাস্ত্রে (২) কাব্য বা কবিতায়। (৩) ইতিহাসে (৪) জ্যোতির্বিদ্যায়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ করেন যাতে এ চার বিষয় তাদের পরাজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পবিত্র কুরআন মাজীদের "ফাসাহত" বা প্রাঞ্জলতা, "বালাগাত" বা ভাষালঙ্কার, "ইখতিসার" বা সংক্ষিপ্ততার রীতিনীতি সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের ছিলো। পবিত্র কুরআন মাজীদের কাব্যিক ধারাবিবরণী ছিল অত্যন্ত অলৌকিক বা আশ্চর্যজনক। এ কারণে তারা এর উসুল বা বাকপদ্ধতির মুকাবিলা করতে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিল। কুরআন মাজীদ তার সংঘটিতব্য ঘটনাবলীর আগাম বিবরণ, ফিতনা-ফাসাদ, গোপনীয় রহস্যাবলী ও অন্তরের গোপন রহস্যের পর্দা উন্মোচন করে। কুরআন যা-ই বলেছে বাস্তবে তাই প্রতিফলিত হয়েছে। যার সম্পর্কে কুরআন যা খবর দিয়েছে তার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। চাই যদিও সে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রাণের দুশমনই হোকনা কেনো। অনুরূপ কুরআন জ্যোতিষীকে বাতিল করে দিয়েছে। জ্যোতিষীর যদি একটি কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে তাহলে অন্য দশটি কথা মিথ্যা

প্রমাণিতও হয়েছে। এর বিপরীতে কুরআন যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছে বা হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে সমস্ত বিষয়ের খবর দিয়েছেন তা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা উল্কাপাতের মাধ্যমে নক্ষত্রের নিকট গোপনীয়ভাবে বসে থাকা জ্যোতিষীকে স্ব-মূলে উৎপাটন করে দিয়েছেন।

পবিত্র কুরআন মাজীদ পূর্ববর্তী যুগের ধ্বংসজ্ঞ ও তাদের নবীদের ঐতিহাসিক বিবরণ প্রকাশ করে। যা জানার পর ঐ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ এর মুকাবিলা করতে অক্ষম হয়েছে। পবিত্র কুরআন মাজীদে এসব বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন মাজীদের এ মু'জিযা ছাড়াও তার অলৌকিক বিস্ময়কর দ্বিতীয় দিক প্রকাশ্য ও স্পষ্ট রয়েছে এবং তা মহাপ্রলয় অবধি অবশিষ্ট থাকবে। আর কিয়ামত পর্যন্ত যত লোকের আগমন ঘটবে তাদের সবার জন্য এটা দলিল হিসেবে চিহ্নিত হবে। আর এর কারণসমূহ ঐ ব্যক্তির জন্য গোপনীয় নয়, যে এ বিষয়ে গবেষণা করে এর অলৌকিক বিস্ময়তার জন্য গভীরভাবে চিন্তা করে। কেননা এর মধ্যে যে সমস্ত অদৃশ্য বা গায়েবী খবর রয়েছে তার যথার্থ প্রতিফলন সব যুগেই হচ্ছে। এমন কোন সময় অতিবাহিত হয়নি যাতে কুরআনে বর্ণিত ভবিষ্যত বাণী বাস্তবায়িত হয়নি।

এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত আগত লোকদের ঈমান ও বিশ্বাস দৃঢ়তর হয় এবং কুরআন মাজীদ অকাট্য দলিল হিসেবে প্রমাণিত হয়।

আরো একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হল যে, শুনাকথা দেখা বিষয়ের সাথে কখনো এক সমান হতে পারেনা। ঘটনা প্রত্যক্ষ করার কারণে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। নফস বা প্রবৃত্তি ইলমুল ইয়াকীন বা শুনা বিষয়ের চেয়ে আইনুল ইয়াকীন অর্থাৎ দেখে বা প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে বেশী প্রশান্তি ও স্বস্তি লাভ করে।[১] যদিও উভয় বিষয় তার নিকট হক বা সত্য।

অন্যান্য আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) এর তিরোধানের পর তাঁদের মু'জিযাসমূহ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাঁদের বাহ্যিক দেহ পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার সাথে সাথে তাঁদের মু'জিযাসমূহের অবসান হয়েছে। কিন্তু আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মু'জিযা হলো আল কুরআন যা কখনো বিলুপ্ত হবেনা। বরং

১. ইয়াকীন বা নিশ্চিত বিশ্বাস তিন প্রকার– যথা ইলমুল ইয়াকীন, আইনুল ইয়াকীন, হাক্কুল ইয়াকীন। ইলমুল ইয়াকীন হলো কোন বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা। আইনুল ইয়াকীন হলো সে বস্তু চোখে দেখা। আর হাক্কুল ইয়াকীন হলো, সে বস্তুর হাকীকত সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হাজার হাজার মানুষ বলে যে, রাবী এক নদীর নাম। এর দ্বারা রাবী নদীর অস্তিত্ব জানা গেলো। এটা হলো ইলমুল ইয়াকীন। তারপর রাবী নদী স্বচক্ষে দেখা হল আইনুল ইয়াকীন। আর যখন সে রাবী নদীতে সাঁতার কেটে কূলে উঠে আসলো, সেটা হলো হাক্কুল ইয়াকীন।

প্রতিনিয়ত এর অভিনব নিদর্শন প্রকাশ পাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে কখনো ঘাটতি দেখা দেবেনা। এ কথার প্রতি হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাদীসে ইঙ্গিত করেছেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বর্ণনা করেছেন,

مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

–এমন কোনো নবী পৃথিবী থেকে বিদায় নেননি, যাকে কোন মু'জিযা দেয়া হয়নি। যা দেখে কমবেশি লোকজন ঈমান গ্রহণ করেছে। আল্লাহ তা'আলা মু'জিযা হিসেবে আমার উপর ওহী অবতীর্ণ করেছেন। আশা করা যায় কিয়ামতের মাঠে আমার অনুসারীদের সংখ্যা বেশি হবে।[১]

এ হাদীসের বর্ণনা কোন কোন আলেমদের মতে স্পষ্ট, প্রকাশ্য ও সঠিক। আর অপর একদল আলেমদের মতে হাদীসের অর্থ হল, মু'জিযা বহিঃপ্রকাশের ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় অর্থ প্রকাশ করা। তারা বলেন, তা হল যে, 'ওহী'ও এক ধরণের মু'জিযা। এটা কোন নিছক ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা বা কোন বাহানা নয়। বরং এটাই সঠিক ও সত্য। এ ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করার কিছু নেই। এর বিপরীতে অন্যান্য আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) এর মু'জিযাসমূহ নিয়ে তাদের বিরোধিতাকারীগণ বিভিন্ন ধরণের সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করে এটাকে অন্যান্য বস্তুর সাথে মিশ্রিত করে এরূপ ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি করে দূর্বল বিশ্বাসীদের ফিরিয়ে নিয়েছে। যেমন– হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর লাঠির মুকাবিলায় জাদুকরদের রশি ও লাঠি সাপে পরিণত করে দেয়া। আর এটা হল ঐ ধরণের মু'জিযা যা যাদুকররা স্বীয় জাদুর গুণে মনগড়া তৈরি করেছে। যদি তারা ইচ্ছে করতো তাহলে ঐ ধরণের অনেক প্রতারণা করতে পারতো। কিন্তু কুরআন মাজীদ এমন এক মু'জিযা যার মধ্যে কোন প্রকার প্রতারণা ও জাদুর

১. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু কাইফা নাযালাল ওহী, ১৫:৩৭৮, হাদিস নং : ৪৫৯৮।
খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু উজুবিল ঈমান বি রিসালাতি নাবিয়্যিনা, ১:৩৬৪, হাদিস নং : ২১৭।
গ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফী সিফাতিল হাউযি, ৮:৪৮১, হাদিস নং : ২৩৬৭।
ঘ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু ফীল হাওযি ওয়াশ্ শাফা'আত, পৃ. ২১৬, হাদিস নং : ৫৫৯৪।
ঙ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আবী হুরাইরা, ১৭:১৭৭, হাদিস নং : ৮১৩৫।

বিন্দুমাত্র স্থান নেই। এ কারণে এটা তাদের সামনে অন্যান্য মু'জিযার মুকাবিলায় অতি স্পষ্ট ও প্রকাশ্য। এটা সম্পূর্ণ এরূপ যেমন কোন কবি বা বক্তার প্রতারণার মাধ্যমে যেভাবে কবি বা বক্তা হওয়া যায়না। কেননা এরূপ করার কারণে তার আসল রূপ অল্পক্ষণ পরে প্রকাশিত হয়ে যায়। মোটকথা প্রথম অর্থ (যা আমি পূর্বে আলোচনা করেছি) অত্যন্ত সহজ সরল ও পছন্দনীয়। আর হাদীসের দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় চক্ষু কখনো খোলে কখনো বন্ধ হয়ে যায় (অর্থাৎ সেটা অতি স্পষ্ট নয়)।

আর পবিত্র কুরআন মাজীদের তৃতীয় 'ই'জায' বা অলৌকিক বিস্ময়তা সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তারা বলত যে, 'আল্লাহর বাণী মুকাবিলায় কালাম বা বাক্য তৈরী করা তাদের ক্ষমতা ও আওতার মধ্যে ছিলনা। তবুও আল্লাহ তা'আলা তাদের এরূপ করা থেকে বিরত রাখেন। আর না তারা একাজ করছে বা করতে পারছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারীদের একদলের অভিমত হল যে, এ ধরণের কালাম পেশ করায় যদিও তাদের ক্ষমতা ছিল তবুও না তারা পূর্বে কখনো এ সম্পর্কে কিছু করতে পেরেছে, আর না পরবর্তীতে কিছু করতে পারবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদেন এ কাজের ক্ষমতা দেননি। আর না তারা একাজে সক্ষম হয়েছে। উপরে উল্লেখিত উভয় দৃষ্টিকোণ স্পষ্ট ও প্রকাশ্য। ঐ উভয় দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী যদি একথা বলা হয় যে, আরববাসীর কুরআনের মুকাবিলা করার ক্ষমতা ছিল। অথবা একথা বলা হয় যে, কুরআনের মুকাবিলায় কালাম পেশ করার বস্তু ছিল। উভয় অবস্থায় আরববাসীর বিপদ-আপদ, নির্বাসন-বন্দি হয়ে অপমানিত লাঞ্ছিত হওয়া, জীবন ধ্বংস, ধনসম্পদ বির্সজন, হুমকি-ধমকি ও কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হতো। এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ হলো যে, তারা এর অনুরূপ উদাহরণ পেশ করতে অক্ষম ছিলো। এর একমাত্র কারণ হলো যে, তারা কুরআনের মুকাবিলা করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এর বাস্তবতা হল এই যে, যদিও কুরআনের উদাহরণ, উপমা উপস্থাপন করতে তাদের সামর্থ ছিল, তবুও পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। তাই মহান আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে একাজ থেকে বিরত রেখেছেন। ইমাম আবুল মায়ালী প্রমুখ এ অভিমত গ্রহণ করে বলেন যে, কুরআন মাজীদ আমাদের নিকট মু'জিযা হবার বিষয় আশ্চর্যজনক বিষয়ের তুলনায় স্বভাবতই তা অতি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন। কেননা লাঠি সাপে রূপান্তরিত করে দেয়া- এ ধরনের আশ্চর্যবস্তু দেখার পর দর্শকদের অন্তরে তাৎক্ষনিকভাবে এরূপ সন্দেহের উদ্রেক হয় যে. এ বিশেষ বৈশিষ্ট্য এ ধরণের কর্মকারকদের দ্বারা এ কারণে সম্ভব যে, তারা এ ক্ষেত্রে বেশী পারদর্শিতা অর্জন করেছে। যদি কোন সুষ্ঠ সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তি এ ভ্রান্ত ধারণা দূর করে দেয়, তাহলে সেটা হবে ভিন্ন কথা। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে লোকজনের এ কুরআনের মুকাবিলায়

কালাম পেশ করার চ্যালেঞ্জ করা যা তাদের কালামের বিষয়বস্তু। আর একথা বলা হয়েছে যে," এর অনুরূপ বাক্য তৈরি করে নিয়ে এসো।" তাদের পেশ না করা এবং উপকরণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তার মুকাবিলায় বাক্য তৈরি করে পেশ না করা, এটা আর কিছুই নয় যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজীবকে এর মুকাবিলা করা থেকে বিরত রাখেন। এটা সম্পূর্ণ এরূপ যে, কোন নবীর এমন বলা যে, আমার নির্দশনও মু'জিযা স্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতে লোকজনকে শক্তি থাকা সত্ত্বেও মুকাবিলা করায় অক্ষম করে দেন। যদিও বাস্তবে তাই হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা সত্য সত্যই তাদেরকে মুকাবিলা করা থেকে বিরত রাখেন। তাহলে একথা বলতে হবে যে, এটা অতি স্পষ্ট নিদর্শন ও দলিল বা এ ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে লাভ করা হয়েছে।

অপর একদল আলেমদের অভিমত হল এই যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মু'জিযাসমূহ অন্যান্য আম্বীয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) এর মু'জিযাসমূহের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করার কারণ এ নয় যে, তিনি তো একথা বলেননি যে, আরববাসী অনেক বেশি বুদ্ধিমান ও সূক্ষ্ম জ্ঞানসম্পন্ন ছিলো। এ কারণে তারা স্বীয় জ্ঞান-প্রজ্ঞার দ্বারা একথা বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে, পবিত্র কুরআন মাজীদ মু'জিযা। এর বিপরীতে অন্যান্য লোকদের যেমন– মিশরীয় ও বনী ঈসরাইলরা- একথা বুঝতে সক্ষম হয়নি। তারা ছিল নির্বোধ ও অবিবেচক। এ কারণে ফিরাউন তাদের নিকট থেকে স্বীকৃতি আদায় করেছে যে, সে তাদের রব। ঈমান গ্রহণ করার পর সামেরী গো-শাবকের পূজা করে। আর তারা সকলে হযরত ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) এর ইবাদত করা আরম্ভ করে। অথচ তারা সকলে ঐ কথায় ঐক্যমতে উপনীত হয়েছে যে, তাঁকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছে। যাকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছে, সে উপাস্য হবে কীভাবে? কুরআন মাজীদে এরশাদ করা হয়েছে–

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ

–তাঁকে না হত্যা করেছে এবং তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করেছে বরং তাদের জন্য তারই সদৃশ্য একটা তৈরি করে দেয়া হয়েছিলো।[১]

এ কারণে তাদের নিকট এ ধরণের মু'জিযাসমূহের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তা ছিলো তাদের মোটা বুদ্ধির উপযোগী। যে বিষয়ে তারা সন্দেহ পোষণ করতোনা।

---

[১]. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:১৫৭।

এছাড়াও তারা দাবি করত যে, لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً –আমরা স্বচক্ষে আল্লাহকে না দেখা পর্যন্ত আপনার উপর ঈমান আনবোনা।[১] তারা ছিল সম্পূর্ণ নির্বোধ। তারা মান্না ও সালওয়ার উপর ধৈর্যধারণ না করে উত্তম জিনিসের পরিবর্তে অকেজো নিম্নমানের বস্তুর জন্য আবেদন শুরু করে। তাদের মুকাবিলায় আরবের অধিকাংশ লোকজন অজ্ঞ ও মূর্খ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলাকে চিনতো। এ কারণে তাদের নিকট এটা অত্যাবশ্যকীয় ছিল যে, তারা প্রতিমাকে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের মাধ্যম স্থির করে। তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক ছিল যারা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আবির্ভাবের পূর্বে স্বীয় জ্ঞান-প্রজ্ঞা, নিষ্ঠা ও সততার বদৌলতে এক আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিলো। সুতরাং হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কিতাব নিয়ে তাদের নিকট আগমন করেন, তখন তারা এ হিকমতকে অনুধাবন করে স্বীয় বুদ্ধিমত্তার আলোকে প্রথমে এ মু'জিযাকে বুঝতে পেরে তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। আর স্বীয় ঈমান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে থাকে। তাঁর সান্নিধ্যে আসার কারণে দুনিয়া ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। পার্থিব ধনসম্পদ সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাঁর সাহায্যার্থে স্বীয় পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততিদের তরবারী দ্বারা আঘাত করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি।

সম্মানিত গ্রন্থকার ওই সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। যা দ্বারা উৎসাহ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাবে। আর সে সমস্ত কথায় এমন সৌন্দর্য্য লুকায়িত আছে যদি কেউ সেগুলো অনুভব করার ইচ্ছে করে তাহলে তারা যাচাই করলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবে। এরপরও আমাদের প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মু'জিযাসমূহ ও তাঁর আবির্ভাব সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমি যা আলোচনা করেছি। সেগুলো তাকে গোপনে ও প্রকাশ্যে সঠিক পথের দিশা দানে ধন্য করবে। অতিরিক্ত জানার প্রয়োজন থেকে মুক্ত করে দেবে।

আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, তিনি আমার জন্য যথেষ্ট ও আমার উত্তম অভিভাবক।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

[১]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:৫৫।

হযরত মোল্লা আলী কারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-
'আমি যখনই 'শিফা' গ্রন্থটি দেখি তখন পবিত্র গুণাবলির অধিকারী সত্তা মহান নবীর সর্বোত্তম গুণকীর্তন দেখতে পাই।'

হযরত আল্লামা আহমদ শিহাব উদ্দিন খাফাজি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

'সালফে সালেহীনের মতে, 'আশ-শিফা' গ্রন্থের পাঠ রোগের প্রতিষেধক এবং জটিলতার সমাধান। এটা পরীক্ষিত বিষয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতে এটার দ্বারা ডুবে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া এবং মহামারীর মতো ব্যাধি হতে মুক্তি মেলে। সঠিক ও বিশুদ্ধ আস্থা থাকলে মনের আকাঙ্ক্ষাও পূরণ হয়।'

[নাসীমুর রিয়াজ খ-- ১, পৃ. ৫২]

প্রথিতযশা ইতিহাসবিদ আল্লামা মুস্তাফা বিন আব্দুল্লাহ (যিনি হাজি খলিফা নামে প্রসিদ্ধ) বলেন-
'এটা অনেক উপকারী গ্রন্থ; ইসলামের ইতিহাসে এমন আর কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি। আল্লাহ তা'আলা গ্রন্থকারের প্রচেষ্টার প্রতিদান দান করুক এবং তাঁকে তাঁর করুণা ও অনুকম্পা দ্বারা সিক্ত করুক।'

[কাশফুজ জুনুন, খ-- ২, পৃ. ১০৫৩]

সনজরী পাবলিকেশন

৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫
৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০
e-mail: sanjarypublication@gmail.com